BIRJABATI BIRABHOGYA(VOL I)
A Collection of Bengali Historical Novels
by *CHITTARANJAN MAITY*
Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Calcutta 700 073

প্রথম প্রকাশ : কলিকাতা পুস্তকমেলা
জানুয়ারি ১৯৫৮

প্রচ্ছদ : সুধীর মৈত্র

ISBN - 81-7612-251-3

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে। দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

বর্ণ-গ্রন্থন : অনুপম ঘোষ। পারফেক্ট লেজারগ্রাফিক্স
২ চাঁপাতলা ফার্স্ট বাই লেন, কলকাতা ৭০০ ০১২

মুদ্রক : স্বপনকুমার দে। দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

ঐতিহাসিক উপন্যাস পাঠে
যাঁরা আগ্রহী

লেখকের অন্যান্য বই

শৈলপুরী কুমায়ুন
কলাভূমি কলিঙ্গ
অগ্নিকন্যা
অনেক বসন্ত দুটি মন
ভোরের রাগিণী
ডাঃ জনসনের ডায়েরী
রোদ বৃষ্টি ভালোবাসা
কন্যা কাশ্মীর
হিরণ্যগড়ের বধূ
আঁধার পেরিয়ে
বর্ষা বসন্ত ছুঁয়ে
রিসেপশনিস্ট
ফরেস্ট বাংলো
নির্জনে খেলা
মোহিনী
কালের কল্লোল
পরমা
আর্য অনার্য
আপন ঘর
সাইক্লোন
মহাকালের বন্দর
ত্রিবেণী
মরু মৃগয়া
বন পর্ব
মেঘ ময়ূরী
কালের রাখাল
জয়িতা
অনুরাগিণী
মন অরণ্য
শ্রেষ্ঠ গল্প
অমৃত নিকেতন
স্বপ্নশিখর
পদধ্বনি
লীলা সঙ্গম
নীলাঞ্জনা
দাহা তিসি গোংগা
মনের মধ্যে মন
তুমি রবে নীরবে
আকাশ হারিয়ে যায়
তিন্নির রোদ আর বৃষ্টি
অক্ষয় বটের কড়চা
অথ হংস মরালী কথা
নিষাদী

'ইতিহাসকে কেবল জ্ঞানে নহে,
কল্পনার দ্বারা গ্রহণ করিলে
তবেই তাহাকে যথার্থভাবে
পাওয়া যায়।''

ইতিহাসকথা — রবীন্দ্রনাথ

যুগাবসান থেকে যুগান্তরের দিকে সভ্যতার প্রবাহ

চিত্তরঞ্জন মাইতির ঐতিহাসিক উপন্যাস

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

১. যে কোনও পাঠকের কাছে একজন লেখককে আবিষ্কার করতে পারা সৌভাগ্যের কথা। পাঠক-সমালোচকেব কাছে সেই আবিষ্কার আরো বেশি আনন্দের কারণ হয়ে ওঠে। আর সে আনন্দ-প্রাপ্তি বিরল ঘটনা। শ্রীচিত্তরঞ্জন মাইতির ষোলখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস পাঠ আমার কাছে তাই বিরল আনন্দ।

সাধারণত আমাদের দেশে ঐতিহাসিক উপন্যাস ও নাটকের উপাদান সংগ্রহ করা হয়ে থাকে মুঘল-রাজপুত আমল থেকে। বস্তুত মুঘল-রাজপুত ইতিহাস বাংলা তথা ভারতীয় ভাষায় উপন্যাস নাটকের প্রধান রসদ-ভাণ্ডার। এখান থেকেই লেখকেরা সংগ্রহ করেন মাল-মশলা। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সেগুলিতে না আছে ইতিহাসনিষ্ঠা, না আছে পরিবেশ-নিষ্ঠ', না আছে সমকালীন সমাজসত্যের প্রতি আনুগত্য। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকে বারংবার আমরা তা দেখেছি। যে নবাব সিরাজদৌল্লাকে বা ভুঁইয়া প্রতাপাদিত্যকে ঐতিহাসিকেরা নিষ্ঠুর প্রজাপীড়ক স্বদেশমমতাহীন বলে প্রমাণ করেছেন, নাটকে উপন্যাসে তাদেরকেই মহান চরিত্র বলে দেখানো হয়েছে। মুসলমান ও রাজপুত ইতিহাস এ জাতীয় লেখকদের কাছে বড়ই মুখরোচক বলে মনে ধরেছে, রোমাঞ্চ-রহস্য-রিরংসা-হিংসা-প্রলোভন-যড়যন্ত্র-হত্যার চানাচুরকে ইতিহাসের মোড়কে উপস্থিত করতে আগ্রহের অভাব দেখা যায় নি।

অবশ্য একথা সত্য যে, সাহিত্য ইতিহাসের অধীন নয়, দাসানুদাস নয়। কিন্তু ইতিহাসের বিকৃতিসাধনের অধিকারও সাহিত্যের নেই। এ বিষয়ে চরম কথা বলা যায় না। তবে সকলেরই মনে পড়বে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কথা — রাজসিংহ উপন্যাসের আদ্যোপান্ত সংশোধিত পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ (১৮৯৩)-এর 'বিজ্ঞাপনে' (ভূমিকায়) তিনি লেখেন :

"রাজসিংহের পূর্ব তিন সংস্করণে যে ঐতিহাসিক ঘটনাটি অবলম্বন করা হইয়াছিল, তাহা একটা অতি গুরুতর ঐতিহাসিক ঘটনার একটি ক্ষুদ্র অংশমাত্র। মোগল সাম্রাজ্যের প্রধান কথা, হিন্দুদিগের সঙ্গে মোগলের বিবাদ। মোগলের প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দুদিগের মধ্যে প্রধান রাজপুত ও মহারাষ্ট্রীয়।

মহারাষ্ট্রীয়দের কথা সকলেই জানে। রাজপুতগণের বীর্য অধিকতর হইলেও, এদেশে তেমন সুপরিচিত নহে। তাহা সুপরিচিত করার যথার্থ উপায়, ইতিহাস। কিন্তু ইতিহাস লিখিবার পক্ষে অনেক বিঘ্ন। প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনা কি, তাহা স্থির করা দুঃসাধ্য। মুসলমান ইতিহাস লেখকরা অত্যন্ত স্বজাতি-পক্ষপাতী, হিন্দুদ্বেষক। হিন্দুদিগের গৌরবের কথা প্রায় লুকাইয়া থাকেন — বিশেষতঃ মুসলমানদিগের চিরশত্রু রাজপুতদিগের কথা। রাজপুত ইতিহাসের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় না — স্বজাতি পক্ষপাত নাই,

এমন নহে। মনুষী নামে একজন বিনিসীয় চিকিৎসক মোঘলদিগেব সময়ে ভাবতবর্ষে বাস করিয়াছিলেন। তিনিও মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাস লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, কক্রু নামে একজন পাদ্রি তাহা প্রকাশিত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই তিন জাতীয় ইতিহাসের পবস্পরের সহিত অনৈক্য আছে। ইহাদের মধ্যে কাহার কথা সত্য, কাহার কথা মিথ্যা, তাহা মীমাংসা দুঃসাধ্য। অন্ততঃ এ কার্য বিশেষ পরিশ্রমসাপেক্ষ।

ইতিহাসের উদ্দেশ্য কখনও কখনও উপন্যাসে সুসিদ্ধ হইতে পারে। উপন্যাসলেখক সর্বত্র সত্যের শৃঙ্খলে বদ্ধ নহেন। ইচ্ছামতো অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য কল্পনার আশ্রয় লইতে পারেন। তবে, সকল স্থানে উপন্যাস, ইতিহাসের আসনে বসিতে পারে না। কিন্তু এই গ্রন্থে আমার যে উদ্দেশ্য, তাহাতে এই নিষেধ বাক্য খাটে না। এখানে বুঝাইতেছি, এই উদ্দেশ্য কি। ....যখন বাহুবল আমার একমাত্র প্রতিপাদ্য, তখন উপন্যাসের আশ্রয় লওয়া যাইতে পারে।

বিশেষতঃ উপন্যাসের ঔপন্যসিকতা রক্ষা করিবার জন্য কল্পনাপ্রসূত অনেক বিষয়ই গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত করিতে হইয়াছে।

স্থূল ঘটনা অর্থাৎ যুদ্ধাদির ফল, ইতিহাসে যেমন আছে, প্রায় তেমনই রাখিয়াছি। কোনও যুদ্ধ বা তাহার ফল কল্পনাপ্রসূত নহে। তবে যুদ্ধের প্রকরণ, যাহা ইতিহাসে নাই, তাহা গড়িয়া দিতে হইয়াছে। ঔরঙ্গজেব, রাজসিংহ, জেব উন্নিসা, উদিপরী, ইঁহারা ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ইঁহাদের চরিত্র ইতিহাসে যেরূপ আছে, সেইরূপ রাখা গিয়েছে। উপন্যাসে সকল কথা ঐতিহাসিক হইবার প্রয়োজন নাই।''

আজ থেকে একশো চার বছর পূর্বে লিখিত বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তি আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি না। যেদিন বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক উপাদানে অপ্রতুলতা সম্বন্ধে উপরিউক্ত ''বিজ্ঞাপনে' দুঃখ করেছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংস্করণে বঙ্কিমের ঐতিহাসিক উপন্যাস বিচারে প্রবৃত্ত হয়ে ঐতিহাসিক আচার্য যদুনাথ সরকার একটি প্রবন্ধ লেখেন (১৯৩৮), তাঁর অভিমত — ''আজ এরূপ দুঃখ করিবার কারণ নাই। বঙ্কিমের পর এই অর্ধশতাব্দীরও কম সময়ের মধ্যে যেসব ঐতিহাসিক উপাদান আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার ফলে এই রাজপুত-মুঘল সংঘর্ষের ইতিহাস একমাত্র সমসাময়িক বর্ণনা হইতে যেমন বিস্তৃত ও বিশুদ্ধভাবে রচনা করা যায়, এমন আর কোনও যুগের ভারত-ইতিহাসে সম্ভব নয়।''

বিনয়ী আচার্য যদুনাথ মুঘল-ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর গবেষণার কথা এখানে উল্লেখ করেননি। তবে যেদিন বঙ্কিমচন্দ্র ঔরঙ্গজেব-চরিত্র (রাজসিংহ, চতুর্থ সংস্করণ, ১৮৯৩) অঙ্কন করেন, সেদিন তাঁকে মূলতঃ কল্পনার উপর নির্ভর করতে হয়েছিল। পরবর্তীকালে যদুনাথের গবেষণায় যে ঔরঙ্গজেব-চরিত্র আমরা পাই, তাঁর সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র-অঙ্কিত ঔরঙ্গজেব চরিত্রের পার্থক্য নেই। এখানেই কল্পনাশীল ঔপন্যাসিকের জয়যাত্রা।

রাজসিংহ উপন্যাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ('রাজসিংহ' প্রবন্ধ, সাধনা, চৈত্র ১৩০০/১৮৯৩) বিরাট ইতিহাস পট তথা কল্পনাক্ষেত্র এবং জীবননদীর কথা বলেছেন -- '.....তাহার এক একটি খণ্ড এক একটি নির্ঝরের মতো দ্রুত ছুটিয়া চলিয়াছে। প্রথম প্রথম তাহাতে কেবল আলোকের ঝিকিমিকি এবং চঞ্চল লহরীর তরল কলধ্বনি -- তাহার পরে, ষষ্ঠখণ্ডে দেখি ধ্বনি গম্ভীর, স্রোতের পথ গভীর এবং জলের বর্ণ ঘনকৃষ্ণ হইয়া আসিতেছে, তাহার পর সপ্তম খণ্ডে দেখি, কতক বা নদীর স্রোত, কতক বা সমুদ্রের তরঙ্গ, কতক বা অমোঘ পরিণামের মেঘগম্ভীর গর্জন। কতক বা তীব্র লবণাশ্রুনিমগ্ন হৃদয়ের সুগভীর ক্রন্দনোচ্ছ্বাস, কতক বা কালপুরুষ লিখিত ইতিহাসের বিরাট ব্যাকুল বিস্তার। কতক বা ব্যক্তিবিশেষের মজ্জমান তরণীব প্রাণপণ হাহাধ্বনি। সেখানে নৃত্য অতিশয় রুদ্র, ক্রন্দন অতিশয় তীব্র এবং ঘটনাবলী ভারত-ইতিহাসের একটি যুগাবসান হইতে যুগান্তরের দিকে ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে।''

ইতিহাসের এই অপ্রতিহত প্রবাহ — যুগাবসান থেকে যুগান্তরের দিকে অগ্রগতি, মহাকালের বিশাল প্রেক্ষাপট ও কালের ঘূর্ণিবাত্যায় মানব সভ্যতা-সমাজ-সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন ঐতিহাসিক উপন্যাসের মূলরস। ওই রস যাঁব করায়ত্ত, তিনিই ঐতিহাসিক উপন্যাস ও নাটকের সার্থক রচয়িতা।

ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসকার উপন্যাস-শিল্পের বিকাশ আলোচনা করতে গিয়ে নির্দেশ করেছেন

ছয়টি দশককে (১৭৯০ খ্রিঃ — ১৮৬০ খ্রিঃ) এবং 'প্রকৃতিতে প্রত্যাবর্তনের কাল' বলে চিহ্নিত করেছেন। এই সময়কার ঐতিহাসিক পটভূমিতে যে কয়টি ঘটনার উল্লেখ করেছেন তা হল — ইউরোপীয় যুদ্ধ (আঠারো শতকের শেষে ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের যুদ্ধ, ১৮১৩—১৮১৫, নেপোলিয়নের উত্থান ও পতন, ফরাসি রিপাবলিকের মৃত্যু, ইংলণ্ডের লিবারেলদের হর্ষ বিষাদ, ফরাসী বিপ্লবের অবসানে অনেক স্বপ্ন ও মূল্যবোধের অবসান, হতাশা ও বেদনার কবিদের স্বপ্নভঙ্গ, যুদ্ধ শেষে দুই দেশে আর্থিক সংকট এবং তা রোধে নানা আর্থিক সংস্কার — আইন প্রণয়ন (রিফর্ম বিল ১৮৩২)। আর এইসব কিছুকে পেছনে ফেলে প্রকৃতিতে প্রত্যাবর্তন, প্রকৃতি সম্পর্কে নবদৃষ্টি — কাব্যে ও উপন্যাসে — রোমান্সে ও রোমান্টিকতায় তার রূপায়ণ। এ প্রসঙ্গে উক্ত ইতিহাসকারের অভিমত :

Of the different kinds of prose, composition, the moral showed in this period the most marked development. This was largely due to the work Scott and Jane Austen, who respectively established the historical and domestic types of novel.

With regard to the work of Scott, we can here only briefly summarize what has already been said. He raised the historical novel to the rank of one of the major kinds of literature, he brought to it knowledge, and through the divine gift of knowledge made it true to life, he fired historical characters with living energy, he set on foot the device of the unhistorical hero – that is, he made the chief character purely fictitious, and caused the historical persons to rotate about it; he established a style that suited many periods of history; and pervading all these advances was a great and genial personality that transformed what might have been mere lumber into an artistic product of truth and beauty.'' (Edward Albert -- A History of English Literatures 3rd Edns 1955, G. G. Harrap, London. p.361)

ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্পর্কে এডওয়ার্ড অ্যালবার্টের এই বক্তব্য চূড়ান্ত কথা। ঐতিহাসিক উপন্যাসলেখক সাহিত্যে আনেন জ্ঞানের সম্ভার, এই জ্ঞানসম্ভার ব্যবহারের দিব্য সামর্থ্য তাঁর থাকে, এবং তার মারফৎ তিনি তা জীবনে সত্যরূপে শিল্পমাধ্যমে সঞ্চার করে দেন। তিনি ঐতিহাসিক চরিত্রগুলিকে জীবনীশক্তিতে পূর্ণ করে তোলেন, এবং অনৈতিহাসিক চরিত্রকে নায়করূপে উপস্থিত করেন। সোজা কথা, তিনি প্রধান চরিত্রকে পুরোপুরি কল্পনাসৃষ্টরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ঐতিহাসিক চরিত্রসমূহকে তাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত করান। তিনি এমন একটি বিশিষ্ট গদ্যশৈলী ও বর্ণনা ভঙ্গি গড়ে তোলেন যা উপযুক্ত কাল-পরিবেশ সৃজনে সফলতা পায়। এবং এইসব কিছুর সদ্ব্যবহারের উপরে থাকে এক প্রসন্ন শিল্পী-ব্যক্তিত্ব, যা ইতিহাসের মতো ঘটনাকে প্রাণদান করে, সত্য ও সৌন্দর্যের প্রতিমারূপে গড়ে তোলে।

ঐতিহাসিক উপন্যাসলেখকের সামনে এর চেয়ে বড় কোনও লক্ষ্য নেই। এই লক্ষ্য যিনি ভেদ করতে পারেন তিনিই সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাসলেখক। ওয়াল্টার স্কট, বঙ্কিমচন্দ্র, হরপ্রসাদশাস্ত্রী, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, গজেন্দ্রকুমার মিত্র এই ধরনের সফল লেখক। আমাদের প্রজন্মে এই ধরনের সফল লেখক শ্রী বারীন্দ্রনাথ দাশ, শ্রী শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রী চিত্তরঞ্জন মাইতি। আর কেউ কেউ থাকতে পারেন।

কোন্ কাহিনী সফল ঐতিহাসিক উপন্যাস — তা নিয়ে মতভেদ থাকবেই। আমি যে লেখকের একটি উপন্যাসকে সফল বলে চিহ্নিত করছি, সেটি অপরের কাছে গ্রাহ্য নাও হতে পারে। তবে কোন্‌টি অসফল, তা নিয়ে মতভেদ থাকতে পারে না। মুঘল-পাঠান-রাজপুত নিয়ে ঝালচচ্চড়ি-কাহিনী যে ঐতিহাসিক উপন্যাস নয় তা আমরা জানি। আজাদীর পরে পরেই বাংলাভাষায় এই ধরনের ঝালচচ্চড়ির রোমান্সকাহিনী ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভেক ধরে দেখা দিয়েছিল বন্যার মতো এবং বন্যার জলের মতো তা দ্রুত অপসারিত হয়েছে।

যা সফল ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়, তা 'রচা কথা'। এ বিষয়ে চূড়ান্ত মতামত বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছেন সীতারাম উপন্যাসের (৩য় সংস্করণে, ১৮৯৪) পরিশিষ্টে। বিস্ময়ের কথা, বঙ্কিমচন্দ্র সীতারাম উপন্যাসকে

ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে গণ্য করেননি (১ম সং. ১৮৮৭)। কারণ তা ইতিহাস সত্য থেকে দূরবর্তী। তবে পরবর্তী ৩য় সংস্করণে প্রথম সংস্করণকে ভেঙেচুরে পুরোটা বদলেছেন। তখনি তা হয়ে উঠেছে ঐতিহাসিক উপন্যাস। 'সীতারাম'এর পরিশিষ্ট এমত —

''আমাদের পূর্বপরিচিত বন্ধুদ্বয় রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদ ইতিপূর্বেই পলাইয়া নলডাঙ্গায় বাস করিতেছিল। সেখানে একখানি আটচালায় বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন।

রামচাঁদ। কেমন হে ভায়া! মহম্মদপুরের খবরটা শুনেছ?

শ্যামচাঁদ। আজ্ঞে হাঁ — সে তো জানাই ছিল। গড়-টড় সব মুসলমানে দখল করে নিয়েছে।

রামচাঁদ। রাজা-রানীর কি হলো, কিছু ঠিক খবর রাখ?

শ্যামচাঁদ। শোনা যাচ্ছে, তাঁদের না কি বেঁধে মুরশিদাবাদ চালান দিয়েছে। সেখানে না কি তাঁদের শূলে দিয়েছে।

রামচাঁদ। আমিও শুনেছি তাই বটে, তবে কি না শুনতে পাই যে, তাঁরা পথে বিষ খেয়ে মরেছেন। তারপর মড়া দুটো নিয়ে গিয়ে বেটারা শূলে চড়িয়ে দিয়েছে।

শ্যামচাঁদ। কত লোকেই কত রকম বলে! আবার কেউ কেউ বলে, রাজা-রানী না কি ধরা পড়ে নাই— সেই দেবতা এসে তাঁদের বার করে নিয়ে গিয়েছেন। তারপর নেড়ে বেটারা জাল রাজা-রানী সাজিয়ে মুরশিদাবাদে নিয়ে শূলে দিয়েছে।

রামচাঁদ। তুমিও যেমন! ওসব হিন্দুদের রচা কথা, উপন্যাসমাত্র।

শ্যামচাঁদ। তা এটা উপন্যাস না ওটা উপন্যাস, তার ঠিক কি? ওটা না হয় মুসলমানের রচা। তা যাক্ গিয়ে —আমরা আদার ব্যাপারী — জাহাজের খবরে কাজ কি? আপনার আপনার প্রাণ নিয়ে যে বেঁচে এয়েছি, এই ঢের। এখন তামাকটা ঢেলে সাজ দেখি।

রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদ তামাক ঢালিয়া সাজিয়া খাইতে থাকুক। আমরা ততক্ষণ গ্রন্থ সমাপন করি।''

এই পরিশিষ্ট অংশ থেকে দুটি সত্য বেরিয়ে আসে — এক, অনেক সময়েই ইতিহাস সৃষ্ট আখ্যান 'রচা কথা', তার মূল্য নেই। দুই, যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস সত্য থেকে বিচ্যুত হয় না।

এডওয়ার্ড অ্যালবার্টের উপরি-ধৃত অভিমত থেকে জেনেছি, ঐতিহাসিক উপন্যাসলেখক দেশ-কাল ইতিহাস পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞানসম্ভারের অধিকারী, সে সম্ভার ব্যবহারের দিব্যশক্তি তাঁর থাকে, এবং তার মারফৎ তিনি তা জীবনে সত্যরূপে সঞ্চার করে দেন। এর যেখানে অভাব, সেখানেই তা 'রচা কথা', তার বেশি মূল্য তাকে আমরা দিতে পারি না।

২. শ্রী চিত্তরঞ্জন মাইতির ঐতিহাসিক উপন্যাসের কাল প্রস্তরযুগ থেকে খ্রিস্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত এবং তা জ্ঞানসম্ভার সমৃদ্ধ ও জ্ঞানের ভিত্তিতে রূপায়িত। এই তিনটি বৈশিষ্ট্য পাঠককে চমকিত করে। এখানেই পাঠক এক নতুন আবিষ্কারের আনন্দ লাভ করেন। উপন্যাসগুলি ঘটনাক্রমিক সাজালে তালিকা এমতো হয় —

১। প্রস্তর যুগের মানুষের গুহাবাস, শিকারী জীবন ও পশুপালকের বৃত্তি। ('দাহা তিসি গোংগা')।
২। মানুষের কৃষিকর্ম ও তার বিস্তার। ('তিলাই রুবাই মাক')।
৩। অশ্বের ব্যবহার ('ভোগ')।
৪। মহেঞ্জোদড়ো-ইরান-ব্যাবিলন-মিশর ('কালের কল্লোল')।
৫। সরস্বতী নদীতীরে আর্য-বসতি ('প্লাবন')।
৬। মৌর্য যুগ ('প্রথম মৌর্য')
৭-৮। মধ্য এশিয়া ও চীনে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ('মরুমৃগয়া' ও 'অনির্বাণ')।
৯। সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের কাল ('বৈজয়ন্তী')।
১০। দ্বীপময় ভারত ('বিজয়'/ 'কনকমঞ্জরী')।

১১। সপ্তদশ শতকের ভারত · জাহাঙ্গীর, সতীদাহ ('অগ্নিকন্যা')।

১২। মুঘল আমলের শেষ পর্বের ভারত ('শাহজাদা সুজা')।

১৩। নীলকরদের আমল ('হিরণ্যগড়ের বধূ')।

১৪। বস্ত্রশিল্প — মসলিন ('সাঁঝের শিশির')।

১৫। খুনী ঠগীদের কথা ('ফুলমতিয়া')।

১৬। ব্রিটিশদের সঙ্গে আদিবাসীদের সংগ্রাম ('শনিচারি')।

শ্রী চিত্তরঞ্জন মাইতির এই ষোলটি উপন্যাস তাঁর বহু প্রসারিত অধ্যয়ন ও জ্ঞান, মানবসভ্যতার দূরবিসর্পীপথের স্বচ্ছন্দ পরিক্রমা এবং মানবজীবনের বিচিত্র লীলারহস্য চিত্রণ সামর্থ্যের পরিচয়বাহী।

প্রথম উপন্যাস 'দাহা তিসি গোংগা' প্রস্তর যুগের মানবসমাজকে নিয়ে লিখিত। উপন্যাসলেখকের বিস্তীর্ণ গভীর অধ্যয়ন এর পিছনে সক্রিয়, কিন্তু সেই বিপুল অধ্যয়ন-শ্রমের স্বেদচিহ্ন এখানে পড়েনি, তা সযত্নে মুছে দিয়ে লেখক গড়ে তুলেছেন এক আখ্যান। গোড়াতেই সংশয় জাগতে পারে, যখন মানুষ সুসংগঠিত সমাজভুক্ত নয়, পুরাণ-ঐতিহ্য-ধর্মচেতনায় সমৃদ্ধ নয়, মানবমনের বিচিত্র অনুভূতি বিকশিত নয়, সেইকালের মানুষকে নিয়ে উপন্যাস লেখা যায় কি? সেদিন তো একালের মতো ইতিহাস ছিল না, আখ্যানও ছিল না, ছিল না সংগঠিত গ্রামসমাজ যেখানে কথাকোবিদ গ্রামবৃদ্ধেরা উদয়ন-বাসবদত্তার কাহিনী শোনাতো, যেখানে প্রাথমিক প্রয়োজনের তাগিদ সামলে গুহাবাসী নরনারীরা প্রয়োজনাতিরিক্ত শিল্পকর্মে মনোনিবেশ করত না। লেখক তাদেরকে, প্রস্তরযুগের গুহাবাসীদের নিয়েও উপন্যাস লিখেছেন। সে কারণে 'দাহা তিসি গোংগা' আমাদের সপ্রশংস সাধুবাদের দাবীদার।

এখানে মানব ইতিহাসের মুখ্য ধারানুযায়ী পাঁচটি যুগ এবং প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধার বিষয়ে তিন প্রকারের পাঁজি-পাত (records) সম্পর্কে দুয়েকটি কথা মনে করা যেতে পারে। এরই মাধ্যমে আমরা 'দাহা তিসি গোংগা' উপন্যাসলোকে — প্রস্তরযুগের মানবলোকে প্রবেশাধিকার পাব।

সভ্যতার ক্রম-নির্ণয়ের একটি কার্যকরী পন্থা (দ্রষ্টব্যঃ আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'সাংস্কৃতিকী', খণ্ড ৪, এপ্রিল ১৯৯৩, পৃ ১০—১১) গ্রহণ করা যেতে পারে। —

[১] প্রাগৈতিহাসিক যুগ Prehistoric Age : (ক) আদিম যাযাবর বর্বর অবস্থা, (খ) পুরাতন পাথরের অস্ত্রের যুগ, (গ) নূতন পাথরের অস্ত্রের যুগ, (ঘ) ধাতুর যুগের আভাস : মানবসভ্যতার ঊষাকাল, (ঙ) তামা ও ব্রোঞ্জের যুগ।

[২] প্রাচীন সভ্যতার প্রথম যুগ Ancient Age : ৩০০০ খ্রিঃ পূঃ হইতে আনুমানিক ৬০০ খ্রিঃ পূঃ পর্যন্ত।

খাল্‌দেআ (ব্যাবিলন)-দেশ আক্কাদীয় ও শেমীয় (সুমের ও শেমীয় আক্কাদ) জাতিদ্বয় কর্তৃক সভ্যতার পত্তন; এবং মিশরের সভ্যতার উত্থান ও বিকাশ। 'হিত্তী' Hittite প্রভৃতি পশ্চিম-এশিয়ার জাতিগণের কাল, ঈজিয়ান সাগরের উপকূলে ও ক্রীটে সভ্যতার বিকাশ· আর্যজাতির প্রসার — (ক) ভারতে আগমন, ও দ্রাবিড় জাতির সহিত মিলিত আর্য জাতি কর্তৃক আর্য-দ্রাবিড় বা হিন্দু সভ্যতার পত্তন ও বিকাশ, (খ) পারস্যে ও পশ্চিম এশিয়ায় প্রসার, (গ) গ্রীসে নবাগত আর্য ও আদিম অনার্য ঈজিয়ান জাতির সভ্যতার মিশ্রণের ফলে পরবর্তিযুগের গ্রীক সভ্যতার উত্থান ও বিকাশ। উত্তর-চীনে চীনা সভ্যতার উত্থান।

[৩] প্রাচীন সভ্যতার দ্বিতীয় যুগ — ৬০০ খ্রিঃ পূঃ হইতে ৬০০ খ্রিঃ অব্দ — সুসভ্য প্রাচীন যুগ Classical Age · এই যুগে হিন্দু (আর্য-দ্রাবিড), গ্রীক (আর্য-ঈজিয়ান), চীনা, লাতীন — এই কয় জাতির সভ্যতার কাঠামো দাঁড়াইয়া গিয়াছে, প্রাচীন মিশর, আসিরিয়া-বাবিলোন, হিত্তী নিষ্প্রভ। এই যুগে — দার্শনিক ও পণ্ডিতগণের উদ্ভব; — ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষিদের যুগের অবসান, এবং বুদ্ধ ও মহাবীরের উত্থান; পাণিনি, কপিল, কৌটিল্য, কাত্যায়ন, পতঞ্জলি, পারস্যে জরাথুশ্ত্র (Zarathustra), গ্রীসে

পিথাগোরাস (Pythagoras), আনাক্সিমান্দ্রস্ (Anaximandros), সোক্রাতেস্ (Sokrates), প্লাতোন (Plato), আরিস্তোতল্ (Aristotel) প্রভৃতি; য়িহুদী জাতির মধ্যে য়েশায়াহ্ (Isaiah) প্রভৃতি তাত্ত্বিকগণের উত্থান; চীনে লাও-ৎসে, (Lao-tze) ও খুঙ্-ফু-ৎসে (K'ung-fu-tze) বা (Confucius) এবং মেঙ্-ৎসে ও চুঅঙ্-ৎসে (Chwang-tze) র উদ্ভব। প্রাচীন পারস্য সাম্রাজ্য, গ্রীস ও পারস্যের সংঘাত; পেরিক্লেস (Perikles)-এর যুগ, তৎপরে গ্রীকরাজ আলেক্সান্দর কর্তৃক এশিয়ায় গ্রীক সভ্যতার প্রসার; ভারতে মৌর্য, অন্ধ্র, গুপ্তবংশ (হর্ষদেবের সঙ্গে ভারতে এই যুগের অবসান বলা যায়); — ফিনীক্ জাতির বিস্তারে, ও রোমের সহিত সংঘর্ষে ফিনীক্ জাতির নাশ; রোমক সাম্রাজ্যের বিস্ত র ও পতন, পারস্যের সাসসানি (Sassanian) যুগ; চীন সাম্রাজ্যের পত্তন, এই যুগে গ্রীসদেশে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার ও চিন্তাপ্রণালীর বনিয়াদ প্রস্তুত হইল।

[৪] মধ্যযুগ Middle Ages — ৬০০ —১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ। নবীন জাতিগণের উদ্ভব — উত্তর ইউরোপের জাতিদের বিকাশ, খ্রিষ্টান, ও মুসলমানি সভ্যতার উত্থান, মুসলমান সাম্রাজ্যের প্রসার, দামাস্ক নগরে এবং স্পেনে উম্ময়য় বংশীয় খলীফাগণের এবং বাগদাদে আব্বাস-বংশীয় খলীফাগণের যুগ; ভারতে রাজপুত-জাতির উত্থান ও শঙ্করাচার্য প্রমুখ আচার্যবৃন্দ, চীনে থাঙ্ T'ang এবং সুঙ্ Sung বংশ, ইউরোপে নরম্যান রাজ-জাতির বিস্তার, এবং পশ্চিম ইউরোপে যোদ্ধৃশ্রেণীর আভিজাত্য ও ভূমির অধিকারমূলক শাসন-পদ্ধতির (Feudalism) প্রসার ও পালেস্তীনে খ্রিষ্টান ও মুসলমান সভ্যতার সংঘর্ষ, খ্রিষ্টানধর্ম কর্তৃক ইউরোপের স্বাধীন চিন্তার খর্বতা। ইহার পরে প্রাচীন গ্রীক যুগের সাহিত্য-চর্চার ফলে নূতন প্রাণের সাড়া (Renaissance)।

[৫] আধুনিক বা বৈজ্ঞানিক যুগ Modern Age : ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দের পর হইতে। এই যুগে ধর্ম ও চিন্তার স্বাধীনতা, লুট্যার Luther প্রভৃতি সংস্কারকগণের উদয়, আমেরিকা আবিষ্কারে বিজ্ঞানের জয়; আধুনিক জাতিগুলির উদ্ভব ও তাহাদের বিশিষ্টতার পরিপুষ্টি রুষ জাতির অভ্যুদয়, প্রাচ্যে উদ্বোধন।

মানবসভ্যতার এই দশহাজার বছরের পথরেখা অনুকরণ করেছেন ঔপন্যাসিক চিত্তরঞ্জন। এই অনুসরণ, পর্যবেক্ষণ, অধ্যয়ণের বিপুল শ্রমের স্বেদ মুছে ফেলে তিনি আমাদেরকে তার ফল ফুল উপহার দিয়েছেন। একটি জ্ঞানসমৃদ্ধ চিন্তাঋদ্ধ কল্পনা বলীয়ান অনুভূতি-উজ্জীবিত লেখকমনের রূপায়ণ হয়েছে আলোচ্যমান ষোলটি ঐতিহাসিক উপন্যাসে।

চিত্তরঞ্জনের উপন্যাসগুলি মানব-ইতিহাসের এই তিন মুখ্য ধারার অন্তর্ভুক্ত। অনায়াসলক্ষণীয় — প্রাগৈতিহাসিক যুগের আওতায় পড়ে তিনটি উপন্যাস — 'দাহা তিসি গোংগা' 'তিলাই রুবাই মারু', 'ভোগ', প্রাচীন সভ্যতার প্রথম যুগের অন্তর্ভুক্ত হয় পরবর্তী তিনটি উপন্যাস — 'কালের কল্লোল', 'প্লাবন', 'মরুমৃগয়া'। প্রাচীন সভ্যতার দ্বিতীয় যুগের ও মধ্যযুগের অন্তর্ভুক্ত হয় পরবর্তী তিনটি উপন্যাস — 'বৈজয়ন্তী', 'বিজয়', 'কনকমঞ্জরী'। আধুনিক যুগের অন্তর্ভুক্ত হয় পরবর্তী ছ'টি উপন্যাস — 'অগ্নিকন্যা', 'সাঁঝের শিশির', 'ফুলমতিয়া', 'শাহজাদা সুজা', 'হিরণ্যগড়ের বধূ', 'শনিচারি'।

যে অসাধারণ দুটি সারস্বত কর্ম — বিস্তীর্ণ জ্ঞানক্ষেত্র থেকে মানবসভ্যতার অগ্রগতি সম্পর্কে জ্ঞানসঞ্চয় ও উপন্যাসে তার ফলবান রূপায়ণ — চিত্তরঞ্জন করেছেন এবার আমরা তার সম্যক পরিচয় নিতে চাই। গোড়াতেই স্বীকার্য, যিনি জ্ঞানবান জীবনশিল্পী, তাঁর কাছে সমালোচক নগণ্য। তবু রসগ্রাহী পাঠকরূপে সমালোচক যে এই বিপুল রসসম্ভার থেকে রস আহরণে আদৌ অনধিকারী নন, তা সাহিত্যদর্পণকার মানেন আর সে কারণেই আমরা ভরসা করে এই পথে অগ্রসর হতে পারি।

গোড়াতেই কবুল করতে হয়, চিত্তরঞ্জন গল্প বলতে জানেন। গল্পবুননে উপস্থাপনে ভাষার সৌন্দর্যে অভীপ্সিত লক্ষ্যে তিনি অনায়াসদক্ষতায় পৌঁছে যান।

ভারতচন্দ্র রায়ের কাব্যে দূতী নায়ককে বলেছিল — 'নাগর হে গিয়াছিনু নাগরীর হাটে। কথায় তাহারা সব মনের গাঁট কাটে।'' এই মনের গাঁট কাটা বিদ্যায় চিত্তরঞ্জন দক্ষ। তাঁর কাহিনীর টান পাঠক অস্বীকার

করতে পারে না আব সেই টানে সে ভেসে চলে লেখকের সঙ্গে যুগ থেকে যুগে। 'দাহা তিসি গোংগা' উপন্যাসে মানবসভ্যতার আদিযুগের মানুষের অগ্রগতির ধাপগুলি দেখিয়েছেন। গুহাবাসী মানুষ গুহার দেয়ালে ছবি আঁকে, প্রকৃতির ভয়ংকর রূপ দেখে তার মনে দেবতাব জন্ম হয়, সে পশুচারণ শেখে। তা থেকে পরবর্তী ধাপে অগ্রসর হয়, গুহাবাসী শেখে পশুপালন। যাযাবর ভ্রাম্যমান জীবন থেকে পৌঁছে যায় স্থায়ী বাসস্থানে — পশুপালন ও কৃষিজীবন তাদের ভ্রাম্যমাণ জীবনটাকে একেবারে বদলে দেয়। যৌথ জীবনের চালক এক জনই। সে দলপতি। তার কথা আদিম নরগোষ্ঠীকে শুনতেই হবে। অন্যগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক কেবল সংঘর্ষ রক্তপাত ও নিধন। তা থেকে মানুষ আরো অগ্রসর হয়। এক গোষ্ঠীর ছেলে অপর গোষ্ঠীর মেয়েকে শত্রু না ভেবে অন্য সম্পর্কে গ্রহণ করে। শুরু হয় জীবনের এক নতুন পর্যায়।

মানবসভ্যতার আদিযুগের এই পটভূমিতে গড়ে উঠেছে 'দাহা তিসি গোংগা'। এই তিনটি শব্দ তিনটি মানুষের নাম। সেদিনকার মানুষের ভাষা ছিল অপরিণত, নামকরণে তার ছাপ মুদ্রিত। দলপতি লহুর এক মেয়ে (তিসি), দুই ছেলে (গোংগা আর দাহা)। অন্য গোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের নেই কোনও সদ্ভাব। তবু কী জানি কেমনে হল — অপর গোষ্ঠীর ছেলের (লা) প্রতি আসক্ত হল লহুর মেয়ে (তিসি)। তিসি ও লা'র দুই সন্তান — ঝুরা আর টিথু। লহুর প্রতিবেশী কুবাই। তার সঙ্গে লহুর তেমন কিছু সদ্ভাব নেই। কুবাইয়ের মেয়ে (থিরি) লহুর ছেলের (দাহা) আকর্ষণ উপেক্ষা করতে পাবল না। দুজনে সংসার বাঁধতে চায়। থিরি শত্রু কর্তৃক অপহৃতা। তারই সঙ্গে মিলিত হয়ে দাহা নতুন জীবন শুরু করতে চায়। গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে একদিন দলপতি লহুর মৃত্যু ঘটে। দলপতির অবর্তমানে দল ভাঙে, নতুন দল তৈরি হয়, নতুন দলপতি দেখা দেয়।

মানবসভ্যতার আদিম যুগে গুহামানব কীকরে পশুচারণ শিখল, তা থেকে এল পশুপালনে, যাযাবর জীবন থেকে ঘর বাঁধার স্বপ্নে ধরা দিল — এরই মনোরম কাহিনী এই উপন্যাস।

খুবই আকর্ষক এইসব ঘটনা। লেখক কীভাবে এগুলিকে রূপায়িত করছেন তা আগ্রহের সঙ্গে আমরা লক্ষ করি। উপন্যাসের সূচনায় দলপতি লহুর শেষ বিশ্রামের বর্ণনা। আসলে সেটাই উপন্যাসের পরিণতি। সেই ঘটনা থেকে শুরু করে লেখক দলপতির জীবনকথার সূচনায় চলে গিয়েছেন। অন্য গোষ্ঠীর সঙ্গীহারা ছেলে (লা) দাহার গোষ্ঠীতে এসেছিল, সে-ই তাদের শিখিয়েছিল পাখি ধরার ফাঁদ, পশুধরার ফাঁদ, পাথর সাজিয়ে ঘরবানানো, মৃত পশুর ছাল ছাড়িয়ে পোশাক তৈবি। তিসি আর লা'র পারস্পরিক আসক্তির একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন লেখক (পৃ১৮-১৯)।

এটি পড়লে মনে হয় আমরা পঞ্চাশ হাজার বছর পূবেকার পূর্বপুরুষের প্রেমলীলা প্রত্যক্ষ করছি। এই বিবরণ ইতিহাসনিষ্ঠ, সেইসঙ্গে বহুযুগের ওপার থেকে বহে নিয়ে আসে অচেনা রোমান্টিক বার্তা।

"একদিন দূরেব ঝর্ণায় জল আনতে গিয়েছিল তিসি। শেষ বেলায় একাই ফিরছিল। হঠাৎ পথের একটা বাঁকে কে যেন তাকে জড়িয়ে ধরল পেছন থেকে। চামড়ার জলপাত্রটা পড়ে গেল পাথরের এবড়ো খেবড়ো রাস্তায়। বক বক করে গড়িয়ে গেল পাত্রের সবটুকু জল।

ভীষণ ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠল তিসি। প্রথম মনে হয়েছিল, কোনও বাঘ ভালুক তাকে আক্রমণ করেছে, কিন্তু পরক্ষণেই সে বুঝতে পারল কোনও হিংস্র জন্তুর থাবা তাকে বিদ্ধ করছে না। সুতরাং এ কোনও পাহাড়ি মানুষের খেলা ছাড়া আর কিছু নয়। তবে যে মানুষটা তাকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে সে যে অত্যন্ত শক্তিমান তাতে সন্দেহ নেই। তিসি চেষ্টা করেও তার মুখ দেখতে পেল না।

মানুষটা পেছন থেকে তাকে একেবারে শূন্যে তুলে নিল। এখন তিসির মুখ আকাশের দিকে। সে স্বভাবে অত্যন্ত শান্ত, তাই চিৎকার করে বাতাস কাঁপিয়ে তুলল না। সে জানে, এখানে চিৎকার করলে কোনও শব্দই তার আস্তানায় গিয়ে পৌঁছবে না। অতএব এর শেষ দেখা যাক।

শূন্যের দিকে তাকিয়েও তিসি বুঝতে পারছিল তাকে ঝর্ণার ধারে নিয়ে আসা হয়েছে। কলকল জলপ্রবাহের শব্দ তার কানে এসে বাজছিল। একসময় তাকে নিয়ে অপহরণকারী ঢুকল একটি পর্বতগুহায়। এই গুহা একটি শৈলশিবাকে ভেদ কবে চলে গেছে। আর ঝর্ণাটিও প্রবাহিত হয়েছে তার ভেতরদিয়ে।

এখানে দুটি হাতের মধ্যে তিসিকে ধরে নিয়ে অতি সাবধানে গুহাটি পার হচ্ছিল অপহরণকারী। এখন দুজনের মুখ একেবারে পরস্পরের অভিমুখে। কিন্তু অন্ধকারে একটি অবয়বধারী ছাড়া আর কিছু বোঝা যাচ্ছিল না। গুহার মাঝপথে থেমে গেল মানুষটি। মসৃণ একটি শিলা, প্রকৃতির খেয়ালে গুহার একপাশে পড়েছিল। তাকে স্পর্শ করে ঝর্ণার জল বড মিঠে সুর তুলে বাজছিল। মানুষটি তিসিকে তারই ওপর বসিয়ে দিয়ে নিজে ঝর্ণার জলে পা ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

এমনি কতক্ষণ কেটে গেল। দুজনেই নির্বাক। তিসির বি'ায়ের শেষ ছিল না। যে পুরুষ ধর্ষণ করবার জন্য তাকে এই নির্জন গুহায় বহন করে এনেছে সে তো অ. পক্ষা করে থাকবে না এতক্ষণ! দ্রুত তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে তাকে এই নির্জন অন্ধকার গুহায় ছেড়ে দিয়ে পালাবে।

তিসির এখন ভয় পাবার কিছু নেই। শুধু তার চরম পরিণতির জন্য প্রতীক্ষা করা।

অবশেষে তিসি কৌতূহলী হয়ে উঠল। সে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটাকে বলল, তুমি কে ? কেনই বা আমাকে এনেছ?

কোনও কথা নেই।

তিসি আবার বলল, কথা বল! তুমি ছাড়া আমি এই অন্ধকার গুহা থেকে বেরুতে পারব না।

এখনও নিস্তব্ধ। কেবল জলস্রোতের ছলছল কলকল শব্দ গুহার মধ্যে বাজতে লাগল।

এবার সত্যিই ভয় পেয়েছে তিসি। এতক্ষণ নিজের ওপর ভয়ঙ্কর একটা অত্যাচারের যে ভয় ছিল তা চলে গিয়ে অন্ধ গুহায় আটকে পড়ার ভয়টা প্রবল হয়ে দেখা দিল। তিসি আর্ত কান্নায় ভেঙে পড়ে বলল, তুমি যে-ই হও, কথা বল। আমার কাছে এস।

লা- লা, বলার সঙ্গে সঙ্গে দুটো হাত তিসিকে স্পর্শ করল।

এমন বিস্মিত আর অভিভূত কোনও দিন কোনও কিছুতেই হয়নি তিসি। সে আকুল আবেগে লা-কে বুকের কাছে টেনে নিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

এক মুহূর্তে এত উত্তেজনা আর এত আনন্দ তিসির জীবনে আর কখনও আসেনি। তিসি তো মনে মনে লা-কে প্রতিদিনই কামনা করেছে। শুধু মুখ ফুটে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারেনি। তার রাত্রির নিদ্রা লা-এর স্বপ্নে উতলা হয়েছে। লা গোঙা বলে তার মনে কোনওদিন কোনও বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়নি। বরং লা-এর প্রতিটি কাজ, প্রতিটি আচরণ সে পাশে থেকে দেখেছে আর মনে মনে.তারিফ করেছে। সে শুধু প্রতীক্ষা করেছিল এমন একটি দিনের জন্য, যেদিন লা'ই তাকে তার জীবনের সঙ্গে বেঁধে নেবার কথা বলবে।।

সেদিন দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে গুহার জলস্রোতে অজস্র কলধ্বনি তুলে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। আর নিষ্ক্রান্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে আকাশে পরিপূর্ণ একটি চাঁদকে দেখেছিল। চাঁদ যে এমন মোহময় হতে পারে, তার জোৎস্নায় প্লাবিত চরাচর যে এমন রহস্যময় হতে পারে তা এর আগে ওদের দুজনের একজনও অনুভব করেনি।

সেদিন রাতে গোষ্ঠীর সকলে দেখল লা তার গুহায় তিসিকে রাত্রিবাসের জন্য ডেকে নিয়ে গেল।''

কৌতুক বোধ হয়, পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে আমাদের গুহাবাসী প্রস্তরযুগের পূর্বপুরুষরা এভাবে প্রেম নিবেদন করত। প্রেমিক যুগল মিলিত হত, ভেসে যেত আবেগে আশ্লেষে, অনুভব করত রাকা চন্দ্রেব সৌন্দর্য। সে দিন আমাদের কাছ থেকে অনেক অনেক দূর। বহুযুগের ওপার হতে সে বার্তা বহন করে এনেছে 'দাহা তিসি গোংগা'। তিসি আর লা-এর দুই সন্তান ঝুরা আর টিথু। টিথুর জন্মের পর গোংগা আর লা বেরিয়ে গিয়েছিল শিকারে। একটা হরিণ শিকার করে এনেছিল। গোষ্ঠীর সকলে সেটিকে আগুনে সেঁকে তৃপ্তি করে খেয়েছিল।

লেখক নিপুণভাবে আমাদের সামনে প্রস্তরযুগের গুহাবাসীদের জীবনকাহিনী তুলে ধরেছেন। আমাদের মতোই তাদের জীবনে ছিল জন্ম-মৃত্যু-বিচ্ছেদ-বিরহ। তবে বিরহবেদনার প্রকাশ ছিল না সূক্ষ্ম। আনন্দ উল্লাস তৃপ্তি ছিল, তবে তা ছিল হিংস্র বন্য উদ্দাম। সর্বকিছু নিয়ে তারা সেদিন বেঁচেছিল। তারা অচেনা পৃথিবী ও প্রকৃতিকে ভয় করত। ভয়ংকর প্রকৃতি ও আকস্মিক বিপৎপাতকে তারা তুষ্ট করতে চাইত

পশুবলি দিয়ে ও অবোধ চিৎকারে। তারই মধ্য থেকে একদিন দেবতার জন্ম হল।

লেখক সেটি চমৎকার দেখিয়েছেন। পরবর্তি কালের নৃতাত্ত্বিক, ভাষাতাত্ত্বিক ও অধ্যাত্মভাবনা জিজ্ঞাসায় তা সমর্থিত হয়েছে। এখানে লেখক পববর্তী সমাজবিজ্ঞান ও আধিদৈবিক আধিভৌতিক চিন্তাকে দিয়েছেন শিল্পরূপ। বর্ণনাটি এমতো — তখন পশুপালনের যুগ।

"দাহা ওর দলবল নিয়ে সাবধানে চলতে চলতে একসময় গিরিপথ পার হয়ে যায়। এসব জায়গায় বেলা বাড়লেই ঝড় ওঠে। কখনও কখনও প্রচণ্ড তুষার ঝড় বইতে থাকে। তার মুখে পড়লে আর রক্ষে নেই। বরফের তলার জীবন্ত সমাধি হয়ে যাবে। এর সঙ্গে আছে হিমবাহ। কখন অতর্কিতে পাহাড় থেকে নেমে এসে নদীর স্রোতের মতো ভাসিয়ে, ডুবিয়ে তলিয়ে নিয়ে যাবে তা কেউ জানে না।

একবার দাহার ভেড়ার পালের কিছুটা দূব দিয়ে হিমবাহটা বেরিয়ে যায়। দাহা মহা বিপদের হাত থেকে এক চুলের জন্য বেঁচে গিয়ে হঠাৎ একটা আশ্চর্য অনুভূতি লাভ করে। সে কৃতজ্ঞতায় হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে। তার দুটো হাত জড়ো হয়ে আসে বুকের ওপর। চোখ দিয়ে অনর্গল অশ্রু ঝরে পড়তে থাকে। একটা অদৃশ্য শক্তি যে তাকে একটুর জন্য রক্ষা করেছে, সে রকম একটা ধারণা তার মনে বদ্ধমূল হতে থাকে।

উপত্যাকায় ফিরে এসে বছর ঘুরলে নির্দিষ্ট সময়ে সে আবার যখন ওপথে যায় তখন ঠিক ঐ জায়গাটিতে এসে সে হাঁটু গেড়ে বসে। হাত জোড় করে অদৃশ্য শক্তির উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা জানায়।

এমনি করে একদিন ভয়, বিস্ময়, কৃতজ্ঞতা মিলে দাহার অন্তরে দেবতার জন্ম হয়।

এরপর উপত্যকায় কোনও বৃক্ষ দাহাকে ফল দিলে সে ভাবত, এর আড়ালে নিশ্চয় রয়েছে কোনও বৃক্ষদেবতা। পিপাসার্ত দাহা ঝর্ণার জল পান করতে করতে ভাবত, এখানে রয়েছে কোন জল-দেবতা।

আবার যখন প্রচণ্ড গর্জনে মেঘ ডাকত, ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকে উঠত, পাহাড় পর্বত কেঁপে উঠত সে গর্জনে, তখন গুহার ভেতর ভীরু মেষগুলোকে নিয়ে দাহা ভাবত, কোনও ক্রোধী দেবতা শাসন করছে পৃথিবীকে"।

'তিলাই রুবাই মারু'তে রয়েছে কৃষিকর্মের বিস্তার। আকর্ষণীয় একটি কাহিনীর ভেতর দিয়ে লেখক দূরদূরান্তে কৃষির বিস্তাব ঘটিয়েছেন। এখানে ধরিত্রীর প্রতীক হিসেবে সৃষ্টিশীল এক নারী বীজভাণ্ড থেকে বীজ ছড়িয়ে চলেছে। তাকে অনুসরণ করছে বহু পুরুষ ও রমণী।

বন্য পরিবেশ থেকে দুর্দান্ত কোনও মানুষ অশ্ব ধরে কিভাবে তাকে তালিম দিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নিয়ে যাচ্ছে তারই চিত্তাকর্ষক কাহিনী 'ভোগ' উপন্যাসে লিপিবদ্ধ। ইতিহাসের প্রবাহ পথে সভ্যতার অগ্রগমনে অস্ত্র, বাহন এবং মানুষের ধ্যানধারণা কিভাবে রূপান্তবিত হচ্ছে তার অনুপুঙ্ক্ষ বর্ণনায় সমৃদ্ধ চিত্তরঞ্জনের এই উপন্যাসগুলি। গুহাচিত্র, তার বিষয় ও বর্ণবিন্যাস পর্যন্ত লেখকের সুপরিজ্ঞাত।

পূর্বেই লিখেছি, আলোচ্যমান উপন্যাসলেখকের অধ্যয়ন বিস্তীর্ণ ও দূরব্যাপ্ত, জ্ঞানের সঞ্চয়ন সমৃদ্ধ এবং মানবেতিহাস সম্পর্কে ধারণা সার্মগ্রিক। তার প্রমাণ আমরা 'দাহা তিসি গোংগা'তেই পেয়ে যাই। মনে হয় তিনি নিম্নধৃত বইগুলি দেখে তাঁর জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছেন—

Bouquet A.C., 'Comparative Religion'

Do 'Hinduism' in 'Chamber's Encyclopadia'

Dwrant, will, 'The story of Civilization

Garbe R. 'Encyclopaedia of Religion and Ethics'

Griffith R. T. H. 'The Hymns of the Rigveda'

Hastiys, James, 'Encyclopaedia of Religion and Ethics'

Muller Max (ed) 'The Sacred Books of the East

Piggott, Stuart, 'Prehistoric India'

Ramakrishna centenary Committee, 'The cultural Heritage of India'

Majumder, R. C. 'Suvarnadip'

পরবর্তী তিনটি উপন্যাস মহেঞ্জোদড়ো-ইরান-ব্যাবিলন-মিশরীয় সভ্যতা ('কালের কল্লোল')

সরস্বতীনদীতীরে আর্য-বসতি ('প্লাবন') এবং মধ্য এশিয়ার কুচদেশের প্রেক্ষিতে বৌদ্ধধর্মের প্রসার ও কুমারজীবের কাহিনী ('মরুমৃগয়া' ও 'অনির্বাণ')।

সদ্য-উদ্ধৃত আকর গ্রন্থগুলি এই উপন্যাস লেখককে প্রাচীন সভ্যতার প্রথম যুগের প্রেক্ষাপটে উপন্যাসত্রয়ী রচনায় প্রভূত সাহায্য করে। জ্ঞানসমৃদ্ধ কল্পনাপ্রবণ শিল্পীচিত্তের অধ্যয়ন শুষ্ক গবেষণামাত্র না হয়ে জীবনের শিল্প রূপায়ণ হয়ে উঠেছে। এখানেই শিল্পীর জিত্, তার কাছে পরাস্ত ঐতিহাসিক, প্রত্নগবেষক, সমালোচক।

প্রাচীন সভ্যতার প্রথম পর্যায়ের আলোচনায় গোড়াতেই প্রশ্ন ওঠে আদি সভ্যতার পত্তন হয় কোথায়? মিশরে, না মেসোপোতামিয়ায়? না খাল্‌দো (বাবিলোন) দেশে আক্কাদীয় শেমীয় জাতি দুটির হাতে?

যদি একটু পিছিয়ে যাই, তবে স্বীকার করতে হয়, পূর্ণাঙ্গ মানুষের উদ্ভব পাঁচ লক্ষ বছর পূর্বে (যদিও এ-নিয়ে এখনও মতভেদ আছে)। মানবজাতির উদ্ভবের পর কয়েক হাজার বছর বর্বর অবস্থায় বন্য পশুর মতো যাযাবর জীবন ধারণ করত, পরে গাছের উপরে বা পর্বত গুহায় বাস করত। মানুষ আগুন জ্বালাতে শিখল, কুটির নির্মাণ শিখল, দল-বদ্ধ হয়ে থাকার সুবিধা অনুধাবন করল। পাথরের অস্ত্র ঘযে মেজে চিক্কন করে ধারালো করে তুলল, এবং ক্রমে ধাতুর ব্যবহার শিখল।

'দাহা তিসি গোংগা' উপন্যাসে এই পর্যায়ের মানুষকে পাঠক পেয়েছেন।

সোনা, রূপো প্রভৃতি সহজলভ্য ধাতুর ব্যবহার আগে প্রচলিত হয়, পরে তামার সঙ্গে অন্য ধাতু মিশিয়ে একপ্রকার কঠিন ধাতু (ব্রোঞ্জ) মানুষ ব্যবহারে লাগাল। মিশ্রধাতুর পর লৌহের যুগ। যখন মানুষ লোহার ব্যবহার শিখল তখন সভ্যতার পথে সে অনেকটা অগ্রসর হয়েছে। পশুচারণ থেকে পশুপালন, মেষ অশ্ব চারণ থেকে পালন, এবং অশ্ব থেকে গো-পালন ---- মানবসভ্যতার কয়েকধাপ অগ্রগমনের পদক্ষেপ। মৃগয়া থেকে কৃষি — মানবসভ্যতার পালা-বদল হয়ে গেল। তার ফলে কৃষিই আদিসমৃদ্ধ মানবসভ্যতাগুলির ধাত্রী হয়ে উঠল এবং তা নদীর ধারেই গড়ে উঠল।

"কৃষিকর্ম শিক্ষার ফলে মানুষ এককালে অনেক দিনের উপযোগী খাদ্যের সংস্থান করতে সক্ষম হইল। তখন সে জীবন ধারণের উপায় সহজ করিয়া জীবনকে সুখ ও স্বাচ্ছন্দে যুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে সময় পাইল, নিজ অবস্থা উচ্চ করিবার অবকাশ পাইল। এইজন্যেই দেখা যায় যে, বড়ো নদী থাকায় যেখানে ভূমি উর্বরা এবং খাদ্যদ্রব্য সুলভ, যেখানে রাস্তা-ঘাটের সুবিধা আছে এবং অনেক লোক একত্রে অনায়াসে থাকিতে পাবে, আক্রমণকারী বিদেশির হস্ত হইতে আত্মরক্ষা যেখানে সহজ এবং যেখানকার জলবায়ু ভালো, এরূপ স্থলেই উচ্চ-জাতীয় সভ্যতার উদ্ভব হইয়াছে, পাহাড়িয়া জাতির মধ্যে বা শীত-প্রধান দেশের লোকেদের মধ্যে নহে। এইজন্যই দেখা যায় যে, আদি সভ্যতার উৎপত্তি-ভূমি নীল-নদের তীর-দেশ (মিশর), এউফ্রাতেস ও তিগ্রিস নদীর মধ্য-ভূমি (খাল্‌দেঅ), সিন্ধু ও গঙ্গা এবং গোদাবরী কৃষ্ণা ও কাবেরী নদীর কূল (ভারতবর্ষ), এবং হয়াঙ-হো নদের কূল (চীন)।" (সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, তদেব, পৃ১২)।

আলোচ্যমান উপন্যাসলেখক মানবসভ্যতার পত্তন ও বিকাশের এই মর্মসত্যটি জানেন বলেই তিনি অভ্রান্তভাবে তাঁর তিনটি উপন্যাসকে (কালের কল্লোল, প্লাবন, মরুমৃগয়া) নদীমাতৃক কৃষিসভ্যতার প্রেক্ষিতে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর ইতিহাস-ভূগোল-জ্ঞান যে অভ্রান্ত তার আরো প্রমাণ পাই তৃতীয় উপন্যাসটিতে (মরুমৃগয়া) — মধ্যএশিয়ার কুচদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রসার কাহিনীতে। নগরপ্রধান রাষ্ট্র, বহুবিস্তৃত জনপদ, সুর-অসুর-শ্রেণীভুক্ত মানুষের মধ্যে সংঘর্ষ। আর্য-অনার্য সভ্যতা-সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব -- পৌরাণিক প্রেক্ষাপটে বা তৎপূর্বেকার প্রাগৈতিহাসিক প্রেক্ষিতে উপন্যাসলেখক বৃহত্তর ভারতের প্রাচীন জীবনের ছবি এঁকেছেন এই তিনটি উপন্যাসে। এই প্রথম উপন্যাসে এল দেশপ্রেমের কথা (একালের দেশপ্রেমের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই), এলো দেবতার কথা, এলো যাগযজ্ঞের কথা। এই তিনটি উপন্যাস পড়লে সেকালের মানুষের সুখদুঃখ বিরহ মিলন ভক্তি প্রেম ঈর্ষা সংশয় প্রতিহিংসা বিশ্বাসঘাতকতা ষড়যন্ত্র হিংসা হত্যার কাহিনী আমরা যেমন জানতে পারি, তেমনি আমাদের মনের মধ্যে অস্পষ্টভাবে মানুষের ধর্মাচরণের মধ্য থেকে একটি মূল সত্য আভাসিত হয়ে ওঠে ---

পৃথিবীর তাবৎ ধর্মের মধ্যে ঈশ্বরের যে সমস্ত মানবধর্মানুসারী কল্পনা এক ঈশ্বরের নাম করেই হোক, অথবা সেই এক ঈশ্বরের বহুবিধ প্রকাশ কল্পনা করেই হোক, গড়ে উঠেছে, ভারতবর্ষের শিব-উমার মতো বিশ্বন্ধর বিশ্বম্ভর সর্বগ্রাহী বিরাট বিশাল অতলস্পর্শী ব্যোমচুম্বী কল্পনার মধ্যেও তার প্রকাশ ঘটেছে—

মহেশ্বরে বা জগতা মহীশ্বরে
জনার্দনে বা জনদন্তরাত্মনি।
ন বস্তুভেদ প্রতিপত্তিরস্তি মে
তথাপি ভক্তিস্তরুণেন্দুশেখরে।

এই কল্পনা মানুষকে আশ্রয় দেয় — আলোচ্যমান উপন্যাসলেখক তা জানেন। জানেন বলেই তিনি বারবার মানুষের মধ্যে সেই ঈশ্বরকে সকল শুভ শ্রী-কল্যাণ শ্রী -লক্ষ্মী শ্রীকে প্রত্যক্ষ করেন। আগে তাই উৎসবপ্রমত্ত পণিরমণীকুলের নায়িকা বীরাকে দেখে তুর্বসু মনে মনে উচ্চারণ করে ('প্লাবন'):

চন্দ্রাং প্রভাসাং যশসা জ্বলন্তীং শ্রিয়ং লোকে
দেবজুষ্টামুদাবাম।
তাং পদ্মিনীনীং শরণমহং প্রপদ্যে অলক্ষ্মীর্মে
নশ্যতাং ত্বাং বৃণে।।

এভাবেই তিনি দেবধ্যান-জীবনধ্যানকে একসূত্রে বাঁধেন। আর সেকারণেই তিনি শমন-ধৃত মানবকণ্ঠে বুদ্ধবাণীর উচ্চারণ শোনেন। তাই মহাস্থবির ধর্মমতি ('মরুমৃগয়া') উচ্চারণ করেন বুদ্ধের অমৃত বাণী :

'মেত্তঞ্চ সব্বলোকস্মিং মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং।
উদ্ধং অধো চ তিরিযঞ্চ অসম্বাধং অবেরমসপত্তং।।

— ঊর্ধ্বে অধোতে চারদিকে সমস্ত জগতের প্রতি বাধাহীন হিংসাহীন শত্রুতাহীন অপরিমিত মানস ও মৈত্রী রক্ষা করবে। শমন-ধৃত মানবকণ্ঠে আজও বুদ্ধদেবের এই অমৃতবাণী উচ্চারিত হচ্ছে।

আর অসুরভূমিতে বন্দী মহেঞ্জোদড়োর শ্রেষ্ঠীপুত্র তুর্বাণ আর্যকন্যা উর্বীর সঙ্গলাভের মাধুর্য আস্বাদন করে আর অন্ধ উন্নানীর কাহিনী শুনে চমৎকৃত হয়। প্রাগার্য মহেঞ্জোদড়োতে আর্য দেবতার ধ্যান-স্বপ্ন-কল্পনা ছিল না, তাই তুর্বাণ ও দেববন্দনামন্ত্র উচ্চারণ করেনি ('কালের কল্লোল') বিধ্বংসী বন্যার আগমনে।

এবার পরপর তিনটি উপন্যাস — 'কালের কল্লোল', প্লাবন', আর 'মরুমৃগয়া'র আলোচনা করা যেতে পারে। বলা যায়, সমৃদ্ধ প্রাচীন অতীতে পরিভ্রমণ করা যেতে পারে।

কালের কল্লোল উপন্যাসের সূচনায় আঁধির চমৎকার ছবি পাই : "আকাশটা পিত্তল হয়ে গেল। আগুনের যে গোলাকার পিণ্ডটা অনেক ওপরের আকাশ থেকে ঝলকে ঝলকে তাপ উগরাচ্ছিল সেটা এখন দূরের টিলার মাথায় স্থির হয়ে আছে। কেমন যেন ঘোলাটে রহস্যময় চোখ মেলে তাকিয়ে দেখছে চারদিকে। হঠাৎ দেখতে দেখতে পীত রঙটা পাংশু হয়ে উঠল। আর ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই দিকবিদিক কাঁপিয়ে যেন কোটি কোটি বৃহদাকার অদৃশ্য পাখির পাখা বেজে উঠল।

থমকে দাঁড়িয়েছে সার্থবাহের পুরো দলটা। মিহি বালির আঁধি পাক-খাওয়া নতর্কীর ঘাগরার মতো ঘুরতে ঘুরতে এগিয়ে এল। সামনের দৃশ্যপট মুছে গেছে। যেন সীমাহীন সমুদ্রের উত্তাল ঘোলাটে ঢেউ ডুবিয়ে দিল সবকিছু।

সেই প্রচণ্ড আঁধির ধাক্কায় কে কোথায় ছিটকে পড়ল। ওদের অসহায় আর্ত চিৎকার ভেসে গেল ঝড়ের গর্জনে।

তুর্বাণ উড়ে চলেছে।"

আঁধির ধাক্কায় উড়ে চলেছে উপন্যাসের নায়ক — সিন্ধুতীরের মহেঞ্জোদড়োর শ্রেষ্ঠীপুত্র তুর্বাণ।

উপন্যাসের এই সূচনা চমকপ্রদ। দূর ইতিহাসের হারিয়ে যাওয়া পথ ঢেকে গেছে মরুবালুতে আর সময়ের ধূলায়। তারই মধ্য থেকে লেখক তুলে এনেছেন নায়ককে। তুর্বাণ মহেঞ্জোদড়ো থেকে সার্থবাহের সঙ্গে যাচ্ছিল বরেরুতে (বাবিলোন-এ)। পথিমধ্যে এই আঁধি বদলে দিল তার জীবনকে।

ইতিহাস এভাবেই মানুষকে, তার জনপদকে, তার সভ্যতাকে, তার কীর্তিকে বদলে দেন। ধ্বংস করে দেন। কালের রাখাল তাড়িয়ে নিয়ে যান কালের মেঘগুলোকে। যেখানে কাল দয়াহীন, প্রকৃতি নির্মম, মানবভাগ্য সম্পর্কে উদাসীন। উপন্যাসটি পড়তে পড়তে একথা মনে হয়। লেখক গভীর অধ্যয়ন আর নিপুণতায় বেঁধেছেন সময়ের স্রোতকে। তুর্বাণ যখন চৈতন্য ফিরে পেল তখন সামনে দেখল এক তরুণীকে। ইতিহাসের পরিহাসে দেখা হল এক পরিত্যক্ত জনহীন প্রান্তে হারিরুদ নদীর তীরে আর্যকন্যা উর্বীর সঙ্গে সিন্ধুতীরের মহেঞ্জোদড়োর শ্রেষ্ঠীপুত্র তুর্বাণের।

কোথায় প্রাগার্য নগর-সভ্যতার গর্বোন্নত প্রতিনিধি সিন্ধুতীরের মহেঞ্জোদড়ো, আর কোথায় রুক্ষ পার্বত্য অঞ্চলের গুহাবাসী হারিরুদ নদীতীরবর্তী আইরণ গোষ্ঠীর কন্যা। আইরণ গোষ্ঠী অশ্বপালনে দক্ষ। তুর্বাণ কোনওদিন অশ্ব দেখেনি। তুর্বাণ অবাক হয়ে আর্যসভ্যতার প্রতিনিধি উর্বীকে দেখছে, অশ্ব দেখছে। দুজনে দুজনার ভাষা বোঝে না, কিন্তু মনের কথা স্পর্শে চাহনিতে ব্যবহারে পৌঁছে দিচ্ছে পরস্পরকে। আর্যকন্যা উর্বী চিকিৎসার্থ নির্জনগুহাবাসিনী, গোষ্ঠীর লোকেরা জানতে পারলে তুর্বাণের আর রক্ষা থাকবে না — এটুকু তুর্বাণ বুঝেছে, জেনেছে উর্বীর হাতেই সে নিরাপদ। এক পতিত প্রান্তর আর নির্জন পর্বত। কীভাবে যে উর্বীর কাছে পৌঁছে যাচ্ছে আহার, তা তুর্বাণ বোঝে না। কিন্তু উর্বীর চোখের নীল তারা তাকে অভয় দেয়, আশ্বাস দেয়, ভালবাসা দেয়। অপরপক্ষে উর্বীর কাছেও তুর্বাণ এক বিস্ময় — শক্তি সৌন্দর্যে গড়া এক যুবা, দেহবর্ণ অনুজ্জ্বল। কিন্তু যৌবনের লাবণ্যে ভরা। গৌরী আর্যকন্যাকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করল গোষ্ঠী-বহির্ভূত তুর্বাণ।

এভাবেই শুরু হয়েছে 'কালের কল্লোল'। লেখক কেবল বিদেশে বাণিজ্যযাত্রী সার্থবাহের পায়ে পায়ে অগ্রসর হননি। সেইসঙ্গে ইতিহাসের পথও অনুসরণ করেছেন। পূর্বোক্ত ইতিহাস উৎসগ্রন্থ থেকে আহরণ করেছেন উপাদান, রচনা করেছেন এক উপন্যাস — কালের প্রতিমা।

গুহাবাসিনী, আরোগ্যের জন্য অপেক্ষাকারিণী উর্বীর সঙ্গে তুর্বাণের প্রণয়ের কোমল নম্র বর্ণনা লেখক দিয়েছেন। তুর্বাণ তার নগরে দেখেছিল গর্দভ, এবার দেখল অশ্ব, দেখেছিল প্রাচীরমণ্ডিত নগর, এবার দেখল শষ্পাচ্ছাদিত হরিৎ প্রান্তর, শস্যক্ষেত্র, নদীমাতৃক সভ্যতা। পুরোহিতকন্যা উর্বী জানে আর্য উপাসনা মন্ত্র। তুর্বাণের কাছে তা দুর্বোধ্য। মহেঞ্জোদড়োর নগরপ্রধান গুর্বাকের পুত্র তুর্বাণ তার সমস্ত সংস্কার ভুলে আর্যকন্যা আইরণ গোষ্ঠীর গৌরী মেয়ে উর্বীর প্রেমে পড়ল।

লেখক নিপুণভাবে সার্থবাহ-দলের যাত্রাপথের বিবরণ দিয়েছেন। মহেঞ্জোদড়ো থেকে জলপথে বা স্থলপথে বণিকরা যেত বরেরুতে, সুসানগরে। উর, উম্মা, সুরুম্পক নগরের অস্তিত্ব সেদিন লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু বণিকদের কারবার উঠে যায়নি। তুর্বাণের পিতা নগরপ্রধান গুর্বাক তারই মতো একদিন দলছাড়া হয়ে গিয়েছিল। উপসাগর থেকে ইলাম বা বরেরুতে মাল লেনদেনের সুবিধা ছিল। ওখান থেকে নদী-দোয়াব ধরে গর্দভের পিঠে পণ্য চলে যেত বরেরুতে। সুমের থেকে নীলনদের দেশগুলি পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগের মানুষ সিন্ধুনগরীর সূক্ষ্ম বস্ত্রের বিশেষ অনুরাগী ছিল। তাই নিয়ে ও আরো অনেক পণ্য — সেগুনের মূল্যবান কাঠ, হিমালয়-জাত দেওদার, পাথরের রঙীন মালা, গজদন্তের সুদৃশ্য খেলনা, রৌপ্যপাত্র, নিপুণ কারুকার্যখচিত সোনার অলংকার। মরুপ্রান্তরে গুহামুখে দেখা হল এক মহিলার সঙ্গে — তিনিই তুর্বাণকে পথের নিশানা দিলেন। উর্বী বলেছিল রাতে পথ চলবে নক্ষত্র দেখে। ওই মহিলা জানালেন — খাড়া পশ্চিম থেকে একটুখানি দক্ষিণ ঘেঁষে মরু পেরিয়ে যেতে হবে— মিত্তানিদের রাজ্যের দক্ষিণে পড়বে বরেরু। পাহাড়ি দস্যুদের এড়িয়ে, কাশ্‌সুদের এড়িয়ে এগিয়ে চলবে — তবেই পৌঁছে যাবে বরেরুতে।

লেখক নিপুণভাবে প্রাচীনকালের ভূগোলের অনুবর্তী হয়ে যাত্রাপথের বিবরণ দিয়েছেন। সেইসঙ্গে দিয়েছেন ইতিহাস — গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে বিবাদ, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সংঘাত। লেখকের এই ভূগোল ও ইতিহাস বিবরণ, একালের গবেষণা সমর্থিত। পূর্বোক্ত গবেষণা-উৎসসমূহ তার পরিচায়ক। 'কালের কল্লোল'এ তার পরিচয় আছে। কাশ্‌সুদের সঙ্গে মিশরীয়দের সংগ্রামের আবর্তে পড়ে গিয়েছিল তুর্বাণ। তার ভয় হল,

নীলনদের দেশের অজেয় বাহিনীর মুখোমুখি হয়ে তার প্রাণটা বুঝি যায়। সেদিনকার ইতিহাসের বিবরণ লেখক নিপুণভাবে দিয়েছেন:

"কয়েকশ বছর আগে হিক্‌সস্‌দের কাছে হেরে গিয়ে জন্মের মতো জিতে গিয়েছিল নীলনদের দেশের ফারায়োরা। মহেঞ্জোদড়ো, ববেরুর অধিবাসীদের মতো এরাও জানত শুধু তামা আর ব্রোঞ্জের অস্ত্র গড়তে। সেসব অস্ত্র হিক্‌সস্‌দের লোহার অস্ত্রের কাছে একেবারে অকেজো হয়ে গেল। তাই একশোটি বছর মুখ বুজে সয়ে গেল হিকসস্‌দের শাসন। তারপর একদিন বিজয়ীদের কাছ থেকে শিখল লোহার অস্ত্র তৈরির কৌশল, আর শিখল অশ্বের ব্যবহার। তখন কুকুরের মতো তাড়িয়ে দিল হিকসস্‌দের। ফারায়োরা বীরের বেশে নতুন বিদ্যুৎগতিসম্পন্ন অশ্বে চেপে এগিয়ে চলল সিনাই উপত্যকা পেরিয়ে পূর্বদিকে। জয়লক্ষ্মী তাদের বরণ করে নিল। নতুন যুদ্ধ সজ্জায়, যুদ্ধকৌশলে তারা হল অজেয়।"

যুদ্ধে লৌহ নির্মিত অস্ত্র ও অশ্বের ব্যবহার — প্রাচীনযুগের সাফল্যের মূলে ছিল এই দুটি আয়ুধ। মধ্যযুগে এলো বারুদের ব্যবহার। আর আধুনিক যুগে এলো আকাশ থেকে বোমার ব্যবহার। মানব সভ্যতার ইতিহাসে যুদ্ধের এই তিনপর্যায় সম্পর্কে আলোচ্যমান উপন্যাস- লেখকের ধারণা তেমনি স্বচ্ছ, যেমন স্বচ্ছ প্রাচীন যুগের ভূগোল এ ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান। জ্ঞানসমৃদ্ধ মানবজীবনের কুশলী রূপদক্ষ উপন্যাসলেখক চিত্তরঞ্জনের ঐতিহাসিক উপন্যাস এ কারণেই আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। ইতিহাসের বস্তুপিণ্ড নয়, ইতিহাসের রস আয়ত্ত করেছেন এই উপন্যাসলেখক। এবং তার সঙ্গে মিশিয়েছেন জীবনের বিরহমিলন বিচ্ছেদ আনন্দের কথা।

কীভাবে একদিন আঁধিতে দলছাড়া তূর্বাণ ঘরে ফিরে এলো, 'কালের কল্লোল' কেবল তারই কাহিনী। আর্যকন্যা উর্বী, মরুকন্যা সারিণা তাকে ভালবাসা ও আশ্রয় দিয়েছে, পথের দিশা জানিয়েছে। অসুর-ইলাম যুদ্ধ। অসুর রাজধানীর চেরিব-উন্নানী প্রেমকথা — এ সবকিছুর মধ্যে দিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছে ইতিহাস, কালের রাখাল তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে কালের মেষগুলোকে : এই অনুভূতি সঞ্চার করে লেখক পাঠকমনে সঞ্চার করে দেন কালের বিশাল অনুভূতি। মহেঞ্জোদড়ো-ইরাণ-বাবিলন-মিশর-প্রাচীন ইতিহাসের সত্য আবিষ্কার করেছেন উইল ডুরান্ট, এইচ. জি. ওয়েলস, মমসেন, গিবন, গ্যাটে, ম্যুলার, গ্রিফিথ, পিগট, রমেশচন্দ্র মজুমদার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। তাঁদের গবেষণার সারাৎসার আত্মস্থ করে আলোচ্যমান উপন্যাসলেখক আমাদের পৌঁছে দিয়েছেন প্রাচীন পৃথিবীতে — সমৃদ্ধ অতীতে। বরেরু রাজকন্যা বেলদিনা ও সূত্রক উন্নানীর প্রেমকথার পাশাপাশি পাই তূর্বাণ-আন্দ্রা ও তূর্বাণ-উর্বীর প্রেমকথা। কিন্তু এইসব ভালবাসা সার্থকতায় পৌঁছয়নি। কালের রাখাল তাড়িয়ে নিয়ে চলেছেন ঘটনার মেষগুলিকে, ছিটকে পড়েছে প্রেমিক-প্রেমিকা, বহুযুগের ওপার হতে শোনা যায় ইতিহাসের দীর্ঘশ্বাস।

ইতিহাসের রথচক্রতলে পিষ্ট হয় কত মানুষ। রক্তাক্ত সংগ্রামে কেউ হারায় পিতাকে, সন্তানকে, জননীকে, প্রিয়াকে। তবু মানুষের অন্তরে বারবার জেগে ওঠে —ভুলিব না, ভালবাসা ব্যর্থ নয়, প্রেমের কাছে আত্মসমর্পণ বৃথা নয়। একদিনের সুখস্বপ্ন আর একদিন মুছে যায়। যেমন মুছে গিয়েছিল তূর্বাণের জীবনে। দীর্ঘ দশটি বসন্ত অতিক্রান্ত — কোথায় সে ফিরে পাবে তার উর্বীকে। এই পাওয়া আর হারানোর কথায় ভরে উঠেছে 'কালের কল্লোল'। পাশাপাশি দুটি ছবি :

(ক) রাতে বৃষ্টি ঝরছে অঝোরে। গুহার বাইরে একটানা একটা শব্দ তুলে বয়ে যাচ্ছে জলের ধারা। মাঝে মাঝে চমকে উঠছে বিদ্যুৎ। ওরা বসে আছে গুহার ভেতর। উর্বীর মাথাটা রয়েছে তূর্বাণের বুকের ওপর। বামবাহুতে উর্বীর কণ্ঠ বেষ্টন করে ডান হাতে ওর কপালে দিয়ে ওকে বুকে চেপে ধরেছে তূর্বাণ।.....

সেই গভীর বর্ষাঝরা রাতে গুহার অন্ধকারে কয়েকটি কথা উচ্চারিত হল।

দোহাই তোমার তূর্বাণ, আমার নিবিড় বাঁধন শিথিল করে দিও না। আমি রোগগ্রস্ত।

তূর্বাণ বলল, তোমার দেহমন সবকিছু ভালবাসি থেকে আমার উর্বী। তোমার রোগ, রোগমুক্তি, — সব।

না, না, না — উর্বীর কণ্ঠস্বর ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে এল।

বাইরের উত্তাল প্রকৃতি ছোট গুহার ভেতর যেন আছড়ে পড়ল। তরুণ তূর্বাণের যৌবনশক্তির কাছে

সব সমাজ-শাসন, সব নিষেধের ভাষা ভেসে চলে গেল।''

দশটি বসন্ত পরে তুর্বাণ ফিরে এসেছিল উর্বীর সন্ধানে।

(খ) ''তুর্বাণ ছুটে এসে দাঁড়াল সেই পাহাড়ের তলায় যার ওপর সন্তর্পণে উর্বী তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। ...এবার উত্তরে ফেলল সন্ধানী দৃষ্টি। ওই তো চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে হারিরুদ নদী। অন্ধকারে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অরণ্যভূমি। কিন্তু কোথায় সেই সারি সারি কুটির। .....শূন্য প্রান্তর খাঁ খাঁ করছে।.....তুর্বাণের কণ্ঠ দিয়ে প্রবল আর্তনাদের মতো বারবার উচ্চারিত হতে লাগল একটি নাম, উর্বী, উর্বী, উর্বী। পাহাড়ে পাহাড়ে আশ্চর্য প্রতিধ্বনি উঠল সে নামের।''

এই বেদনা বিচ্ছেদের পাশেই রয়েছে মহাকালের শাসন। সে শাসনে ধ্বংস হল মহেঞ্জোদড়ো। একদা প্রমথনাথ বিশী মহেঞ্জোদড়ো ধ্বংস হয়ে যাওয়া নিয়ে লিখেছিলেন ''সিন্ধুনদের প্রহরী'। চিত্তরঞ্জনের কৃতিত্ব ইতিহাসের বহুশ্রুত কাহিনীকে নিজস্ব দৃষ্টিতে উপস্থিত করেছেন উপন্যাসের শেষাংশে। ভাগ্যের পরিহাসে একদিন তুর্বাণ, উর্বী-পুত্র, তারই আত্মজ পূষণের বর্শাঘাতে মৃত্যু মুখে পতিত হল। মৃত্যুর পূর্বে আত্মজকে তুর্বাণ আত্মপরিচয় দিয়ে যায়। পূষণের হাহাকারকে ছাপিয়ে এলো এক অন্ধ শক্তির গর্জন — তাও শোনায় হাহাকারের মতো। সিন্ধুতীরের নগর-প্রান্তর চূর্ণ করে দিয়ে, নগরীকে গ্রাস করতে ছুটে আসছে সে। পূষণের প্রসারিত বাহুতে পিতা তুর্বাণের প্রাণহীন দেহ। পশ্চাতে সিহলী আর জননী আন্দ্রা। সামনে এগিয়ে আসছে সেই কল্লোলমুখর মহাস্রোত যা সবকিছুর ওপর শান্তির অতল যবনিকা টেনে দেয়।

এখানেই 'কালের কল্লোল' উপন্যাসের মহতী সমাপ্তি। তার রূপকার আমাদের আলোচ্যমান উপন্যাসলেখক শ্রী চিত্তরঞ্জন মাইতি।

'কালের কল্লোল' উপন্যাসের বিশাল প্রেক্ষাপট। রূপায়ণের সৌন্দর্য ও পরিণতির গাম্ভীর্য পাঠকের মনকে অভিভূত করে। এই উপন্যাসে জোতিষ ও জ্যোতির্বিদ্যা, কৃষিবিদ্যা ও শস্ত্রবিদ্যা, সিন্ধুনদ, হারিরুদ নদী, ইউফ্রাতেস নদী, তিগ্রিস নদী তীরবর্তী ও পারস্য উপসাগর তীরবর্তী অঞ্চলের সংঘটিত শেমী ও আব্বাস জাতির সংঘর্ষের সত্যনিষ্ঠ পরিচয় পাই। এখানেই উপন্যাসলেখকের কৃতিত্ব। তিনি ইতিহাস ও মানব কাহিনীকে এক সূত্রে বেঁধেছেন; ইতিহাসের বিপুল সম্ভার ব্যবহার করে ইতিহাস রসটিকে তুলে ধরেছেন।

এই বক্তব্যের সমর্থনে নিম্নধৃত অভিমত প্রণিধানযোগ্য : ''মেসোপোতামিয়ায় এউফ্রাতেস ও তিগ্রিস্ নদীর মোহনায় পারস্য উপসাগরের তীরে আনুমানিক ৮০০০-৭০০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে (মতান্তরে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম-চতুর্থ সহস্রকে) 'খাল্‌দেআ' Chaldea দেশের সভ্যতার সূত্রপাত। যে জাতি কর্তৃক এই সভ্যতার পত্তন তাহা 'আক্কাদ' Akkad ও 'সুমের' Sumer এই দুই নামে পরিচিত। ভাষা আকৃতি-গত সাদৃশ্য বিচার করিয়া জানা যায়, এই 'আক্কাদ সুমের' জাতি তুর্কী বা প্রাচীন যুগের তাতার-তুরাণী জাতির সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল, এবং কেহ কেহ ইহাদিগকে ভারতের সুসভ্য প্রাচীন দ্রাবিড় জাতির সহিত সম্পৃক্ত মনে করেন। আক্কাদ-সুমের জাতির সভ্যতা বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, ইহারা কৃষিকর্মে বিশেষ পটু ছিল, এবং নক্ষত্রাদি পর্যবেক্ষণ বিষয়ে ইহারা যাহা করিয়া গিয়াছে, তাহাই আধুনিক জোতিষ বিজ্ঞানের ভিত্তি। যে সময়ে 'আক্কাদ-সুমের' জাতি খালদেআ দেশে বসবাস করিতেছিল, সেই যুগে আরবদেশের মরুভূমিতে 'শেমী' Semite নামে একটি জাতি যাযাবর বৃত্তি অবলম্বন করিয়া বাস করিত। এই শেমী জাতির অনেক শাখা, তাহার মধ্যে য়িহুদী ও আরব অন্যতম। শেমী জাতির লোকেরা সুসভ্য আক্কাদ-জাতির সহিত সংঘর্ষে আসে; ইহার ফলে সুসভ্য কিন্তু অপেক্ষকৃত দুর্বল আক্কাদীয়গণ, এই পরাক্রান্ত বর্বর জাতির সহিত মিশিয়া গিয়া আপনার স্বতন্ত্র জাতীয় অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে। কিন্তু ইহাদের সভ্যতা, রীতি-নীতি, দেবতাধর্ম সমস্তই নবাগত শেমীয়রা গ্রহণ করে, কেবল ইহাদের ভাষা লয় নাই। আক্কাদীয় নগর 'কা-দিঙ্গিরা' (অর্থাৎ 'দেবদ্বার') শেমীয় ভাষায় অনুদিত হইয়া বাব্-ইলু বা 'বাবিলোন' নামে পরিচিত হইল। এই শেমীয় প্রধান মিশ্র জাতির দ্বারা পুরাতন আক্কাদ-সুমের জাতির সভ্যতা নূতন ভাষায় নূতন ভাবে, কতকটা পরিবর্তিত আকারে 'বাবিলোনের সভ্যতা' নামে পরিচিত। আক্কাদ-জাতি লিপি বিদ্যার সহিত পরিচিত ছিল; শেমীয়রা

সেই লিপি বিদ্যা গ্রহণ করিল, তাহাকে নূতন আকার দিল। আক্কাদের প্রাচীন কাহিনী ঐতিহ্য ও বিধিও ইহারা গ্রহণ করিল। এই নূতন বাবিলোন হইতে উত্তরে 'অশুর' Ashur বা আসিরিয়া Assyria দেশে এই সভ্যতার এক শাখা প্রতিষ্ঠিত হইল। এবং বহু শতাব্দী ধরিয়া এই 'আসিরীয়-বাবিল' সভ্যতা প্রতীচ্য এশিয়ায় অটুট রহিল। এই সকল ব্যাপার খ্রিঃপূঃ ৫০০০-৩৬০০ এর মধ্যে (মতান্তরে খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ - ১ম সহস্রকের পূর্বার্ধে) ঘটিয়াছিল।

দক্ষিণ-পশ্চিম পারস্যে আক্কাদ-সুমের জাতির জ্ঞাতি 'এলাম' Elamite গণ একটি রাজ্য স্থাপন করে। 'শুশান' Shushan বা সুসা Susa নগরী এই রাজ্যের কেন্দ্র ছিল। এলামীয়গণ বহুকাল ধরিয়া আপনাদের স্বাতন্ত্র্য ও ভাষা বজায় রাখে, কিন্তু পরে তাহারা আক্কাদীয়গণের ন্যায় শেমীয়দের মধ্যে এবং আর্যজাতীয় পারসীকদের মধ্যে মিশিয়া যায়''। (সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সাংস্কৃতিকী, ৪র্থ খণ্ড, ১৯৯৩, পৃ ১৩)।

'কালের কল্লোল' উপন্যাসের লেখক মহেঞ্জোদড়োর নগরপ্রধান শ্রেষ্ঠী গুর্বাকের পুত্র তুর্বাণের সঙ্গে আমাদের এই প্রাচীন সমৃদ্ধ জগতে ঘুরিয়ে এনেছেন। আমরা তুর্বাণের হাতধরে উপরি-ধৃত কালখণ্ডে প্রাচীন সভ্যতার ও জনপদগুলির সঙ্গে পরিচিত হই। এটাই লেখকের বড় কৃতিত্ব। ইতিহাসরস ও দূরত্বসঞ্জাত রোমান্স রসকে তিনি আমাদের হৃদয়ের সুরে বেঁধেছেন।

সরস্বতীনদীতীরে আর্য-বসতি নিয়ে রচিত হয়েছে 'প্লাবন' উপন্যাস। এটিও 'কালের কল্লোল' উপন্যাসের উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে। স্বীকার্য, লেখকের পক্ষে এ বড় সামান্য কৃতিত্ব নয়।

আর্য সভ্যতা বা হিন্দু সভ্যতা কোনও খাঁটি গব্যঘৃত নয়, তা মিশ্রণজাত। ''আমাদের হিন্দু সভ্যতাটা যে একটা মিশ্র ব্যাপার, তা সর্ববাদিসম্মত। ....ভারতের ইতিহাসের আরম্ভ আর্যভাষী লোকের আগমন থেকে সত্যি, কিন্তু তার ইমারতের বুনিয়াদ হচ্ছে প্রাগ আর্য যুগে, ভারতের নিজস্ব দ্রাবিড়ের সভ্যতায়। আদিকালের আর্য কখন কোন সময়ে নিজের ভাষা আর বিশিষ্ট সভ্যতা গড়ে তোলে, তা জানা যায় না। এই ভাষা সভ্যতার স্রষ্টাব'লে Proto Nordic অর্থাৎ আদি-উদীচ্য নাম দিয়ে একটা জাতির অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেকে বিশ্বাস করেন। আদি আর্যসভ্যতা যা এদের মধ্যে বিকশিত হয়েছিল, তা সমসাময়িক মিশর, বাবিলোন, এজিয়ান সভ্যতার কাছে দাঁড়াতেই পারে না; অনার্য জাতির সংস্পর্শে আর সাহচর্যে অর্ধ-বর্বর খুব সম্ভব মিশ্র-আর্য, গ্রীক, পারসিক, হিন্দু সভ্যতা গঠনে নিজের ভাষা দান করে ধর্মের কবিতার সূত্র কতকগুলি দিয়ে অংশগ্রহণ করে। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, হিন্দুধর্ম চিন্তা সভ্যতার ইতিহাস, ভারতের আর্য ও দ্রাবিড় ভাষার, মুখ্যত এই আর্য-অনার্যের সম্মিলনের ইতিহাস।'' (সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'সাংস্কৃতিকী', তৃতীয় খণ্ড, ১৯৮২, পৃ ৭-৮)

সরস্বতী নদীতীরে উচ্চারিত হয়েছিল পুণ্যবেদসূক্ত — এর পিছনে কোনও পূর্বঋণ ছিল না — এই গালগল্প বাদ দিয়েই আমাদের সরস্বতী নদীতীরে আর্যবসতির উপাখ্যান জানতে হয়। আলোচ্যমান উপন্যাসলেখক 'প্লাবন' উপন্যাসে সত্যের বন্ধমুখ অনাবৃত করেছেন। আমাদেরকে পৌঁছে দিয়েছেন সেই সম্পন্ন অতীতে। আদীন নদী সরস্বতী নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত সুবাস্তু জনপদের কাহিনী এই উপন্যাসে রূপায়িত। 'অনব'রাজ দিবোদাস-রানী সরণ্যুর কন্যা শশ্বতী। দুই বন্ধু তুর্বসু আর শুনক। শশ্বতী আর তুর্বসুকে নিয়েই গড়ে উঠেছে এক জটিল প্রেমকাহিনী। সেনাপতি তুর্বসু শেষ পর্যন্ত শশ্বতীকে পায়নি, নিহত হয়েছে যুদ্ধে। অপরদিকে দ্রুহ্যবদেশের রাজা দেববাতের পালিতা কন্যা বাক্ (ওরফে পরজ) তুর্বসুকে পেয়েও পেল না। অন্যদিকে বীরা তুর্বসুর খুব কাছাকাছি এসেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। কাহিনী সূচনায় তুর্বসু-শশ্বতীর কথা। মধ্যে তুর্বসু পরজের ও তুর্বসু-বীরার কথা, কাহিনীশেষে পরজ জীবনে না পেয়ে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পেল তুর্বসুকে। 'কালের কল্লোল' উপন্যাসের মতো 'প্লাবন' উপন্যাসের পরিণতি মহান্ ট্রাজেডিতে। দূরব্যাপ্ত কাল ও সম্পন্ন অতীতের বিশাল প্রেক্ষাপটে এভাবেই লেখক সঞ্চার করে দিয়েছেন ইতিহাসরস ও রোমান্সরস, পাঠক অজান্তেই মহাকাব্যের বিশাল রসের স্বাদ পেয়ে যায়।

চিত্তরঞ্জনের ইতিহাসনিষ্ঠা, জ্ঞানচর্চা ও কাহিনী বয়ন-নৈপুণ্যে পাঠক বারবার মুগ্ধ হয়। ঋষি চরমানের

পুত্র শুনক আর তুর্বসু — দুই বন্ধুর মধ্যে ভালবাসা আর তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার কাহিনী যেমন আকর্ষক, শশ্বতী, পরজ, বীরার প্রেমাবেগ তেমনি আকর্ষক। অনবরাজ্য আর দ্রুহ্যবরাজ্য — দুয়ের মধ্যে সংঘর্ষে কেবল অগণিত সেনা নিহত হয়, নিহত হয় একটি রক্তগোলাপ, যার নাম প্রেম। 'প্লাবন' উপন্যাসে ইতিহাস সমর্থিত পটভূমিতে ঘটনার ঘনঘটা আছে কিন্তু তাকে ছাপিয়ে উঠেছে মানবহৃদয়ের ট্রাজিক আর্তনাদ, যে আর্তনাদ আমরা শুনেছি বঙ্কিম-সৃষ্ট চরিত্রের কণ্ঠে —'ইয়া আল্লা! আমাকে পারতেই হইবে।'

মৃত্যুর সেই আঁধার অম্বরতলে অনব-দ্রুহ্যব রাজ্যের মানবমানবীরা জীবন নিয়ে খেলা করে, কেউ হারে, কেউ জেতে, আর পরজের মতো অসামান্যা রমণী প্রিয়জনকে না পেয়ে তাকে দূর থেকে অব্যর্থ বাণনিক্ষেপে হত্যা করে।

এই উপন্যাসলেখক আমাদের চোখের সামনে সেই সম্পন্ন অতীতের জীবনের রঙ্গশালার দ্বার উন্মোচিত করে দিয়েছেন।

শশ্বতী একদিন চেয়েছিল তুর্বসুকে। কিন্তু রাজা দিবোদাস তাকে সেনাপতিপদে বৃত করে যুদ্ধে পাঠালেন, যুদ্ধে অনবরাজ্য জিতল বটে, কিন্তু তুর্বসু জীবিত ফিরতে পারল না। এই ট্রাজিক সুরটি উপন্যাসের গোড়াতেই বেঁধে দেওয়া হয়েছে। মনে হয় লেখক কোনো দ্বিধা করে তারসপ্তকের শেষ স্বরে তাঁর উপন্যাস-বীণার সুর বেঁধে নিয়েছেন। সে কারণে 'প্লাবন' উপন্যাস গোড়া থেকেই চড়া সুরে বাঁধা।

তুর্বসুর মৃত্যুতে দুই চরিত্রের ভিন্ন প্রতিক্রিয়া লেখক গোড়াতেই তুলে ধরেছেন। বন্ধু শুনকের ও প্রেমাকাঙ্ক্ষিনী রাজকন্যা শশ্বতীর প্রতিক্রিয়া।

তুর্বসুর মৃত্যুতে অন্তরে তৃপ্ত বাহিরে দুঃখিত রাজজামাতা শুনক দস্যু কবষের রাজ্য আক্রমণ করতে গিয়ে বন্দী হয়েছিল, বন্ধু তুর্বসু লড়াই করে তাকে উদ্ধার করে আনে, বিনিময়ে দেয় তার প্রাণ। বন্ধু তুর্বসুর চিতার অগ্নি প্রজ্বলিত হলে সে উচ্চারণ করল, 'হে মৃত, তোমার দৃষ্টি সূর্যালোকে যাত্রা করুক, তোমার শ্বাস বায়ুপ্রবাহের সঙ্গে মিশে যাক, তুমি তোমার অর্জিত পুণ্যে আকাশ ও ধরিত্রীতে গমন কর। তোমার দেহ জল ও উদ্ভিদে মিশে যাক।'

আর্যদের শ্রাদ্ধকর্মে যে মহান মন্ত্র উচ্চারিত হয়, তারই প্রতিধ্বনি শোনা গেল শুনকের কণ্ঠে। এবং বেদোক্ত আত্মার উর্ধ্বগতি-বিবরণের অনুসৃতি — 'তুর্বসু ধূমের মধ্যে প্রবেশ করছে। ধূম পেরিয়ে প্রবেশ করছে রাত্রির অন্ধকারে। এরপর ছয়মাস চলল তার দক্ষিণায়নের ভেতর দিয়ে যাত্রা। দক্ষিণায়ন থেকে পিতৃলোক। পিতৃলোক থেকে আকাশ। আকাশ থেকে চন্দ্রমণ্ডল। চন্দ্রমণ্ডলে অবস্থান করে কর্মক্ষয়। তারপর আবার আকাশে পতন। বায়ুরূপে পরিণতি। মেঘের আকারে বিরাজ। তারপর বৃষ্টিরূপে ভূমিতলে অবতরণ। যব ও ব্রীহি ইত্যাদি শস্যের মধ্যে প্রবেশ। খাদ্যরূপে ওই শস্যের জীবদেহ পুষ্টি ও শুক্রে পরিণতি লাভ। অবশেষে ওই শুক্রের প্রাণীদেহ ধারণ। যে যায় সে এমনি করেই ফিরে আসে।''

বেদোক্ত আত্মার এই উর্ধ্বগমন ও প্রত্যাগমন আর্য সভ্যতাকে ধারণ করে আছে, মরণশীল মানুষকে ভূর্ভুবঃস্বঃ লোকের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছে। এই বিশ্বাস সামান্য মানুষকে বিশ্বের নৃত্যচ্ছন্দের সঙ্গে বেঁধেছে। 'প্লাবন' উপন্যাসের গোড়াতেই লেখক সরস্বতী নদীতীরে বসতি স্থাপনকারী আর্যদের এই মহান ধর্মবিশ্বাসকে উপস্থাপিত করেছেন।

ঠিক তারপর রাজা দিবোদাস-কন্যা শশ্বতীর প্রতিক্রিয়ার বিবরণ। প্রেমবেদনায় আর্ত সুন্দরীর অব্যক্ত বেদনা এখানে ব্যক্ত হয়েছে। দুই বন্ধু, দুই যোদ্ধা, শুনক আর তুর্বসু। শশ্বতী তো মনে মনে চেয়েছিল তুর্বসুকে। কিন্তু রাজাদেশে তুর্বসু প্রধান সেনাপতি হয়ে যুদ্ধযাত্রা করল আর শুনক লাভ করল শশ্বতীকে।

''রাজদুহিতা শশ্বতীকে হারানোর আঘাত ভুলতে পারল না তুর্বসু। হৃদয় থেকে একদিন সব আঘাত মুছে যায়, শুধু মোছে না ভালবাসার আঘাত। .....যৌবন শক্তি প্রার্থনা করে, সম্পদ আহরণের চেষ্টা করে। পৃথিবীর অধীশ্বর হতে চায়, কিন্তু বোধ হয় তার সবচেয়ে প্রার্থিত বস্তু প্রেম। পার্থিব জগতে শক্তিহীন কপর্দকহীন হয়েও যৌবন চায় প্রেমের জগতে সম্রাট হতে। তুর্বসু সেই সাম্রাজ্যের অধিকার হারিয়ে মনের জগতে সর্বহারা হয়ে গেল।''

এবার অনবরাজের প্রধান সেনাপতি তুর্বসুর দিগ্বিজয়। দেশভ্রমণে ও যুদ্ধে বেরিয়ে দেববাতের পালিতা কন্যা বাক্ (ওরফে পরজ)-এর সঙ্গে তার পরিচয় ও প্রণয়। কিন্তু কর্তব্যানুরোধে পরজকে ছেড়ে তার প্রত্যাবর্তন। পরজ এই প্রত্যাখ্যান ভুলতে পারে না, তাই কাহিনীশেষে তারই নিক্ষিপ্ত বাণে তার প্রেমের ধন তুর্বসুর মৃত্যু। সেই মহান ট্রাজেডির অন্য প্রতিক্রিয়া অনবরাজকন্যা শশ্বতীর। —

"শশ্বতী শয়নগৃহের বাতায়নপথে তাকিয়েছিল সরস্বতীর বহমান স্রোতধারার দিকে। তার গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিল জলের ধারা। তুর্বসুর চিতা কখন নিভে গেছে। ....রাত্রি গভীর; বাইরে জ্যোৎস্নায় প্লাবিত চরাচর। সরস্বতীর উপল-আহত তরঙ্গপ্রবাহে চন্দ্রালোকের ঝিলিমিলি। সেদিকে পলকহীন দৃষ্টিতে চেয়ে আছে শশ্বতী। স্মৃতির আঘাতে হৃদয়ের সঞ্চিত অশ্রুর উৎস-মুখ খুলে গেছে আজ। দুটি চোখ ছাপিয়ে গাল বেয়ে সে অশ্রুবিন্দু গড়িয়ে পড়ছে বুকে। বিনি সুতোয় গাঁথা হয়ে চলেছে অশ্রুমুক্তার মালা।"

সংস্কৃত আলংকারিক বলেছেন, কাব্যের সন্তানবৃত্তি। বোধ করি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ কালিদাসের মেঘদূত কাব্য। এক বিরহিনী যক্ষবধূর ও এক বিরহী যক্ষের বিরহবেদনা বহু শতাব্দী ধরে কাব্যপাঠকের মনে নতুন করে জন্ম নেয়। এখানে কাব্যের সন্তানবৃত্তি। সন্তানের জন্মের মধ্যে মানুষ যেমন নিজেকে রেখে যায়, পাঠক মনে কবি-সৃষ্ট বিরহবেদনা সেভাবেই নিত্যনবজন্ম লাভ করে।

সেই অনন্ত প্রেমবেদনা তুর্বসুর। শশ্বতীর, এবং পরজের। তাই লিখতে ইচ্ছে করে, চিত্তরঞ্জনের 'প্লাবন' কেবল ভারতে আর্যদের প্রথম বসতিস্থাপনকালের ইতিহাস সমর্থিত কাহিনীমাত্র নয়, সেই সঙ্গে চিরন্তন রোমান্টিক বেদনার কাহিনী। সেই বেদনায় প্রেমিক-প্রেমিকার অন্তস্থলে বিন্দু বিন্দু রক্তক্ষরণ হয়; বাইরে তা দেখা যায় না। কেবল [illegible] সাহিত্যিকের প্রসাদে তা অমরতা পায়। যেমন পেয়েছে পরজের কাহিনী।

ঋষি দেববাতের পালিতা কন্যা, নতুননামধারিণী বাক্ (পরজ)-এর সঙ্গে পরিচয়ে তুর্বসু প্রীত, তৃপ্ত, অভিভূত ও গ্রস্ত হয়েছিল। পরজ তাকে জানিয়েছিল, আজ পালক-পিতা ঋষি দেববাতই তার একমাত্র আশ্রয়, সব ধ্যান সব জ্ঞান তাঁরই কৃপায়। কিন্তু শুধু আশ্রয় কিংবা জ্ঞানই মানুষকে জীবনে পূর্ণতা দেয় না। পরজের জীবনকাহিনীতে লেখক তা দেখিয়েছেন। সে কারণে পালকপিতা-ই তার একমাত্র আশ্রয় —পরজের এই কথার উত্তরে তুর্বসু বলেছে—

"পরজ, মানুষের জীবন বড় বিচিত্র। আঁকাবাঁকা বহমান একটা নদীর সঙ্গে তার কিছুটা তুলনা চলে। তার ঘূর্ণি, আমাদের জটিল জীবনের ঘূর্ণাবর্ত। তার কলধ্বনি, আমাদেরই অন্তরের উন্মুখ ভাষা। তার জলের দাক্ষিণ্য, তার বন্যার ভাঙন, সবকিছুই আমাদের চরিত্রের ধর্ম। তবে সে যে কখন কোন পথে চলবে তা আমাদের অজানা। তার মিলন ঘটতে পারে কোনও মহা জলনিধিতে, নয়তো লুপ্ত হতে পারে তার ধারা ধূসর কোনও মরুভূমির বালুকারাশির অতল গর্ভে। শুধু স্রোতে ভেসে চলা ছাড়া আমাদের কতটুকুই বা করণীয় আছে পরজ।

বাক্ বলল, কতদিন পরে তুর্বসু আমাকে নিজের ভেতর ফিরিয়ে দিল। তোমার মুখে ডাকা পরজ নামটা আমাকে অনেক দূরের অতীতে নিয়ে চলে গেল। আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ তুর্বসু। তুমি আমার হারানো দিনের দ্বার খুলে স্মৃতির গন্ধমাখা সোনালি অতীতটাকে দেখিয়ে দিলে।"

এই বাক্-এর আসল পরিচয় কী? তার আসল নাম পরজ। তার মা দক্ষিণ দেশের এই দস্যুরাজার অন্তঃপুরের দাসী ছিলেন। তারই গর্ভের সন্তান পরজ। তার জন্মের পর মহারানী মা ও শিশুকন্যাকে প্রাসাদের বাইরে বের করে দেয়। অনেকদিন পর মহারানীর মৃত্যু হলে পরজ অন্তঃপুরের প্রধানা পরিচারিকার দয়ায় প্রাসাদে দাসীরূপে কাজ করার অধিকার পেল। সেই দস্যুরাজের সঙ্গে দ্রুহ্যবরাজের যুদ্ধ হল। দস্যুরাজ পরাজিত হলেন। সন্ধির শর্তানুযায়ী দ্রুহ্যবরাজ কশুর সেনাপতি পেলেন দুহাজার ধেনু, বহুমূল্য স্বর্ণপিণ্ড, দশজন শ্রেষ্ঠ দাসী। পরাজিত বৃদ্ধরাজাই পরজের পিতা। কিন্তু তিনি তাকে রক্ষা করতে পারেননি। দ্রুহ্যবদেশে এসে পরজ প্রতিনিয়ত উত্ত্যক্ত হত রাজার পুত্রের দ্বারা। তাকে বাঁচায় রাজকন্যা মদয়ন্তী। সেই তাকে ঋষি দেববাতের কাছে সমর্পণ করে।

সেদিনকার আর্যসভ্যতার পরিচয় এই ঘটনায় উদ্ঘাটিত। পরজ জন্ম থেকে সুখবঞ্চিত। কিন্তু তুর্বসুকে

ভালবাসলেও তাকে তার পাওয়া হল না। দুজন দুজনে পরস্পরকে ভালবাসলেও পাওয়া হল না। সেদিন অনার্যদের আর্যরা আখ্যা দিয়েছিল — দাস, দস্যু, পিশাচ, রাক্ষস। এমনি এক দস্যুরাজার দাসীর কানীন কন্যা পরজ, বিজিতের কাছে উপহার সামগ্রীরূপে দত্তা। আজ পরজ দাসীকন্যা নয়, সে বাক্ — সূক্তরচনা করতে শিখেছে পালকপিতা ঋষি দেববাতের কাছে। বাকের মুখ দিয়ে লেখক ঋষির নানা ভাবনার কথা বলিয়েছেন। সভ্যতার আদি মূল — সব মানুষ একই গোত্রের — এই মহৎ বাণী শুনিয়েছেন। ঋষির মুখে বাক্ শুনেছে অগ্নিবন্দনা — 'অগ্নির্বৈ মুখং দেবানাম্'। হে অগ্নি, তুমি দেবতাদের মুখস্বরূপ। দ্যুলোক, ভূলোক, অন্তরীক্ষলোক, সর্বত্র তুমি বিরাজমান। তোমার জন্ম দ্যুলোকে, সেখান থেকে নেমে এসেছ পৃথিবীতে।

এভাবেই উপন্যাসলেখক ঋষি দেববাত ও তার পালিতা কন্যা বাকের মুখ দিয়ে বেদোক্ত সূক্ত ও মন্ত্রগুলি আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন।

তুর্বসু পরজের বিদ্যাবত্তা ও তীরন্দাজী দুয়েরই পরিচয় পেয়েছে। মুগ্ধ হয়েছে। তুর্বসু পরজের ছবিকে — চিন্তাকে আপন হৃদয়ে স্থান দিতে চেয়েছে। তারপর তারই কাছ থেকে পণিদের দেশে যাবার গোপন সংবাদ সংগ্রহ করেছে। অভীষ্ট সিদ্ধ করেছে। কিন্তু দুজনে মিলতে পারে নি। দুটি হৃদয় পরস্পরকে পায়নি। কর্মপাশবদ্ধ দুটি হৃদয়।

এরপর দস্যুরাজ কবষের দুর্গ আক্রমণ করে প্রধান সেনাপতি তুর্বসু জয়লাভ করেছে। গোপন সোপানপথ বেয়ে দুর্গে প্রবেশকালে আকস্মিকভাবে তার সঙ্গে দেখা হয়েছে এক রমণীর। তার নাম পরজ। যুদ্ধের চরম মুহূর্তে তারা পরস্পরকে ফিরে পেল। তুর্বসু ফিরে পেল তার জীবনের হারানো পাখিকে। কিন্তু তখন আর সময় নেই। মৃত্যুর রণধ্বনি বেজে উঠেছে। দস্যুরাজ কবষ দুর্গ রক্ষার সব দায়িত্ব দিয়েছেন অশ্বারোহিণী পরজকে। তারই মুহূর্তের দুর্বলতায় দুর্গতলের জলযন্ত্রের দ্বার খুলে ফেলল তুর্বসু। জলকল্লোলে ভেসে গেল দুর্গ। পরাভূত হল দস্যুরাজ কবষের গর্ব ও অপরাজিত দুর্গ। দস্যুরাজ কবষ আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন। বিজয় গৌরবে চলেছে বিজয়ী বাহিনী — সামনে সেনাপতি তুর্বসু। ফেরার পথে তুর্বসু পরজের জন্যে বুকের মাঝখানে একটি অব্যক্ত ব্যথা অনুভব করছিল।

হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ তীর ছুটে এল সামনের পাহাড় থেকে। বিঁধে গেল তুর্বসুর বুকের ঠিক সেই বিন্দুতে যেখানে আপন বুকের রক্ত ঝরিয়ে পরজ একদিন তিলক এঁকে দিয়েছিল।

সকলে চেয়ে দেখল, শুভ্রবসনা একটি মেয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল সামনের পাহাড়ের তলদেশের কূপের মধ্যে।

সেনাপতি তুর্বসুও সে দৃশ্য দেখল। তার মুখে ফুটে উঠল অপার্থিব এক হাসি। মৃত্যুশয্যায় শায়িত তুর্বসুর বারবার মনে হতে লাগল, একটি মেয়ে তার বুকের মধ্যে চুলে ভরা মুখখানা ডুবিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে। একবার তার মনে হল, এ পণিরাজের পুত্রবধূ বীরা। আবার মনে হল, রাজা কবষের দাসীকন্যা পরজ। শেষ নিঃশ্বাস নির্গত হবার পূর্ব মুহূর্তে তার মনে হল, এ কন্যা শশ্বতী।"

এখানেই 'প্লাবন' উপন্যাসের মহতী সমাপ্তি।

চিত্তরঞ্জনের ঐতিহাসিক উপন্যাস মহানদীর মতো, সাগরের মতো বহমান। প্রস্তর যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত প্রবহমান যে জীবনধারা, তাকেই তিনি নিপুণভাবে চিত্রিত করেছেন। তার সব কটি ঐতিহাসিক উপন্যাস পড়লে অনুধাবন করা যায় এক বিশাল পটভূমিতে চিত্রিত হয়েছে ইতিহাসের মানবজীবনের নানা পর্যায়। এই পরিব্যাপ্ত পটভূমির সামগ্রিকতা ও বিস্তার চিন্তা করলে আমাদের বিস্মিত হতে হয়।

প্রথম মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তকে নিয়ে রচিত উপন্যাস "প্রথম মৌর্য" পড়তে গিয়ে লেখকের এই দ্বিবিধ নৈপুণ্যের কথা আবার নতুন করে মনে পড়ে। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম দুই-তিন শতাব্দীর ভারতের জীবন সম্পর্কে তাঁর অধ্যয়ন গভীর এবং নিশ্ছিদ্র। ইতিহাসের তন্নিষ্ঠ পর্যালোচনা ও তৎকালীন পৃথিবীর ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে গভীর অধ্যয়ন এই উপন্যাসের পটভূমিতে রয়েছে। কিন্তু উপন্যাসের মধ্যে

লেখকের ইতিহাস অধ্যয়নের শ্রম-বিন্দু কোথাও ফুটে ওঠেনি, পরন্তু খ্রিস্টপূর্ব সময়ের একটি বস্তুনিষ্ঠ পটভূমিই প্রাধান্য পেয়েছে। সম্রাট প্রথম চন্দ্রগুপ্তের উত্থানের চমকপ্রদ কাহিনী আমরা ইতিহাসে সংক্ষেপে পেয়েছি। কিন্তু তাকে উপন্যাসের কাঠামোর মধ্যে জীবন্ত প্রতিভাত করে তোলার শিল্পসামর্থ এখানে দেখা যায়। লেখক কত অনায়াস নৈপুণ্যে সেদিনের পটভূমিতে একটি গতিশীল জীবনকাহিনীকে পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন। ইতিহাসের ঘটনাপুঞ্জ থেকে তিনি তার ঈপ্সিত কাহিনীকে বেছে নিয়েছেন, তাতে সঞ্চার করে দিয়েছেন জীবনের উত্তাপ, রূপ, রস।

আগত প্রায় সন্ধ্যালগ্নে একটি ষোড়শী কঙ্করময় পথের উপর দিয়ে ছুটে চলেছে শোন নদীতে শেষ খেয়া নৌকার আশায়। যুবতীর প্রতিপদক্ষেপে ত্রাস, শঙ্কা আর উদ্বেগ। এখান থেকেই উপন্যাসের সূচনা। সেই ত্রস্ত যুবতীর ছুটে চলার গতি সঞ্চারিত হয়েছে উপন্যাসের মধ্যে। এক অচেনা অশ্বারোহী যুবকের মুখোমুখি হয়েছে যুবতী। লজ্জিত, সংকুচিত উদ্বিগ্ন যুবতী সেই অশ্বারোহীর কাছে আত্মপরিচয় দিয়েছে — ''আমি 'ময়ূর-পোষক' গ্রামে আমার বাবার বাড়িতে যাব বলে পথে বেরিয়েছি। আসছি 'পিপ্পলিবন' থেকে। আমি ওখানকার মোরিয় বংশের কুলবধূ।'' সেই অপরিচিত অশ্বারোহী যুবকের সামনে দাঁড়িয়ে যুবতী তার অসহায়তা প্রকাশ করেছে এবং সে রাতটুকু অরণ্যের মধ্যে তারই স্কন্ধাবারে কাটিয়েছে। এই যুবকের নাম ধননন্দ। সেই রাতটুকু তাকে নিবিড় আশ্লেষে জড়িয়ে ধরে কাটিয়েছে সেই যুবতী, তার নাম মুরা।

ইতিহাসের ঘটনার গতিপথ সরল রেখায় চলে না, চলে বক্রগতিতে। সেই ধননন্দ আর মুরার মিলনে জাত পুত্র পরবর্তিকালে সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত নামে খ্যাত হলেন। কীভাবে তা ঘটল তারই বিচিত্র কাহিনী এই উপন্যাস। অবশ্য উপন্যাসকার ইংগিত দিয়েছেন, শ্বশুরালয়ে অত্যাচারিত হবার পূর্বে মুরার স্বামী-সান্নিধ্য ঘটে থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে চন্দ্রগুপ্তের পিতৃপরিচয় নির্দেশ করা সম্ভব নয়।

এই উপন্যাস লেখক জানেন জীবন প্রবাহিত হয় নদীর মতো, তা সরল গতিতে চলে না। জীবন রক্তাক্ত জটিল এবং স্ববিরোধী। 'প্রথম মৌর্য' পড়তে পড়তে আমাদের একথা বারবার মনে হয়। পশুপালক দম্পতির স্নেহে পালিত শিশু সম্পর্কে জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ ঋষি সৌম্য তার জননী মুরাকে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তোমার পুত্র একদিন রাজচক্রবর্তী হবে, আর তখন ওই ময়ূর-পোষক গ্রাম, মোরিয় বংশ আর তোমার মুরা নাম থেকে তার প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের নাম হবে মৌর্য সাম্রাজ্য এবং সে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য নামে বিদিত হবে।

এখান থেকে কাহিনী চলতে শুরু করেছে। তার গতি দ্রুত, পদে পদে চমক, রোমাঞ্চ, উত্তেজনা আর রোমান্স। মনে হয় লেখক এই ইতিহাস কাহিনীর রথকে অতিদ্রুত ছুটিয়ে নিয়ে চলেছেন কিন্তু কোথাও এই রথ ইতিহাসের রাজপথ থেকে স্খলিত হচ্ছে না। দ্রুতগতির ফলে রথচক্র থেকে বিকীর্ণ হচ্ছে স্ফুলিঙ্গ, তার নেমি থেকে উঠছে বিচিত্র ধ্বনি। কিন্তু লেখক নিপুণভাবে সেই ইতিহাস রথকে চালনা করে নিয়ে যাচ্ছেন। নন্দবংশ, শিশুনাগ বংশ, চন্দ্রগুপ্তের আদিবাসী অস্ত্রগুরু হওয়া, শিশুনাগ বংশের স্বৈরিণী রানীর স্বেচ্ছাচারিতা এবং এক ক্ষৌরকারকে প্রথমে উপপতিত্বে বরণ ও পরে তাকে মহাপদ্মনন্দ নামে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করার কূটকৌশল, এই পাপিষ্ঠ দম্পতির প্রজাপীড়ন, ওই বংশের শেষরাজা ধননন্দের বিরুদ্ধে ঋষি সৌম্যের শিষ্য ব্রাহ্মণ চাণক্যের প্রতিশোধ গ্রহণের সংকল্প এবং চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্তের মিলিত অভিযানে এই নন্দবংশের পতন এবং মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনে আরোহণ — এই সমস্ত ঘটনা অতিদ্রুত সংঘটিত হয়ে যায়। লেখক তার পাঠককে মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গের মতো টেনে নিয়ে যান তাঁর অভিপ্রেত কাহিনীর পরিণতির দিকে।

সুদূর গ্রীসের ম্যাসিডনের তরুণ রাজা আলেকজাণ্ডার বিনা বাধায় জয় করে নেন এশিয়া-মাইনর-সিরিয়া, মিশর, পারস্য। পারস্য সম্রাট তৃতীয় দরায়ুসের বিশাল বাহিনীকে বিধ্বস্ত করে দিয়ে পার্সিপলিসকে ধ্বংস করে দেন এবং হিন্দুকুশ অতিক্রম করে ভারতের অভিমুখে অগ্রসর হন। গান্ধারের পুষ্কলাবতী, তক্ষশীলা, সৌভূমি, পৌরব, মল্লরাজ্য, মোসিকেনস — গান্ধার ও সিন্ধুদেশের এই সব রাজ্যকে হতমান করে সম্রাট আলেকজাণ্ডার এসে পৌঁছুলেন তক্ষশীলায়। লেখক অনায়াস নৈপুণ্যে ইতিহাসের পাতা থেকে

এই কাহিনীকে জীবন্ত করে তুলেছেন। তক্ষশীলার রাজা অম্ভি আলেকজাণ্ডারকে উপঢৌকন দিয়ে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন, পৌরবের রাজা পুরু অশঙ্কচিত্তে গ্রীক সম্রাটের মুখোমুখি হয়েছেন, সে সকল কাহিনী লেখক অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পাঠকের কাছে উপস্থিত করেছেন।

এই উপলক্ষে রাজা অম্ভির উপাখ্যানের মধ্য দিয়ে চন্দ্রগুপ্তের অশ্বারোহণ কৌশল ও ধনুর্বিদ্যা কৌশলকে লেখক তুলে ধরেছেন। সেই তরুণ চন্দ্রগুপ্তকে রথ দৌড় আর তীর নিক্ষেপ খেলার পটভূমিতে প্রথম দেখল এক গ্রীক তরুণী। তার নাম ইকো, আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি সেলিউকাসের মাতৃহীনকন্যা। আর সেই তরুণ অপরিচিত যুবক চন্দ্রগুপ্ত গ্রীক সম্রাটের মুখোমুখি হয়েছে। তাঁকে গোপনে গ্রীক রণকৌশল আয়ত্ত করার অপরাধে সম্রাট মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন —তাঁকে খরস্রোতে ভাসিয়ে দেওয়ার আদেশ দিয়েছেন। সেলিউকাস কন্যা ইকোর কৌশলে চন্দ্রগুপ্তের প্রাণ বেঁচে যায়। গ্রীক রণকৌশল পারদর্শী চন্দ্রগুপ্তের শৌর্যে ধ্বংস হয়ে যায় নন্দবংশের বৈভব আর অহঙ্কার। লেখকের ভাষা ও বর্ণনা এই ঘোরতর যুদ্ধের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে চলেছে —

'রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর ভেঙে পড়ল প্রতিরোধ। সমুদ্রের প্রবল ঘূর্ণিঝড়তাড়িত তরঙ্গ যেভাবে আছড়ে পড়ে ভেঙে দেয় তীরের সমস্ত প্রতিরোধ চন্দ্রগুপ্তের সৈন্যবাহিনীর আক্রমণে তেমনি বিধ্বস্ত হয়ে গেল বিশাল নন্দ-বাহিনী।''

চন্দ্রগুপ্ত সম্রাট উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসলেন। ঋষি সৌমের ভবিষ্যদ্‌বাণী সার্থক হল। কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের বিজয় অভিযান তখনও শেষ হয়নি। আলেকজাণ্ডারের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পথে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অধিকৃত ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি পুনরায় স্বাধীনতা লাভের জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল। তাদের সঙঘবদ্ধ করে গ্রীকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত। সমগ্র উত্তর ভারতের শাসন কর্তৃত্ব নিয়ে চন্দ্রগুপ্ত যখন রাজচক্রবর্তীর মহিমায় বিরাজিত তখনই আলেকজান্ডারের এক সেনাপতি ভারতে গ্রীকরাজ্যগুলি পুনরুদ্ধারের জন্য অভিযান করল। সিন্ধুনদের দুই তীরে চূড়ান্ত সংঘর্ষের জন্য অপেক্ষমান গ্রীকবাহিনী আর চন্দ্রগুপ্তের বাহিনী। স্বীকার করতেই হয় লেখক চন্দ্রগুপ্তের চতুরঙ্গ বাহিনীকে গ্রীক শক্তির মুখোমুখি করে দিয়েছেন যে লেখনী-নৈপুণ্যে তা দ্রুতগতি সমৃদ্ধ ও কাব্য শক্তি সম্পন্ন।

ইতিহাস কাহিনীর অন্যতম মূল উপাদানে রোমান্সের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছেন লেখক। যুদ্ধের পূর্বক্ষণে জ্যোৎস্নার অস্পষ্ট আলোর রহস্যময় পরিবেশে কীভাবে সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত ও সেলিউকাস কন্যার দেখা হল তার একটি রোমাঞ্চপূর্ণ আখ্যান তুলে ধরেছেন লেখক। সিন্ধুনদের পরপারে ছদ্মবেশী চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে শ্বেতবসনা রহস্যময়ী রমণীর দেখা হল —এ তো সেই ইকো, যে চন্দ্রগুপ্তের প্রাণ-বাঁচিয়েছিল। সেই রজনীতে চন্দ্রগুপ্ত জেনেছে অভিযানকারী সেনাপতি সেলিউকাস, আরও জেনেছে তাঁর সামনে সেলিউকাস কন্যা ইকো। সেই অস্পষ্ট সন্ধ্যায় পরস্পরকে তারা হৃদয় দান করেছে। গ্রীক স্কন্ধাবারের আলো দেখা যায় দূরে। কেবল নির্জনতা নয়, নতুন্ ভালোবাসায় মোহিত হয়েছে দুই যুবক যুবতী। পরদিন প্রভাতে যুদ্ধ হয়নি, সন্ধি হয়েছে। বিনা রক্তপাতে বিজয়ীর সম্মান লাভ করেছে সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত। সেলিউকাস সম্রাটকে দিয়ে গেছেন তাঁর অধিকৃত কাবুল, কান্দাহার, হীরাট, বেলুচিস্তান এবং সেই সঙ্গে তাঁর কন্যাকে।

বিজয়ী সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত নবপরিণীতাকে নিয়ে রাজধানী পাটলীপুত্র প্রবেশের পূর্বে পৌঁছেছেন ঋষি সৌম্যের আশ্রমে এবং লাভ করেছেন ঋষির আশীর্বাদ। এখানেই কাহিনী শেষ হতে পারত। চন্দ্রগুপ্ত প্রতিষ্ঠিত মৌর্যবংশ ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজবংশের মর্যাদালাভ করবে, ঋষির এই ভবিষ্যদ্‌বাণী একদিন সত্যে পরিণত হবে — এ কথা জানিয়েই লেখক উপন্যাস শেষ করতে পারতেন।

কিন্তু লেখক তা করেননি, কাহিনীর পরিণতিকে দিয়েছেন অন্যতর মাত্রা। তার ফলে উপন্যাসটি লাভ করেছে এক বিশিষ্টতা। শেষ অনুচ্ছেদে আমরা তা জানতে পারি, যা ঐতিহাসিক সত্য থেকে দূরবর্তী নয়।

''সাম্রাজ্য শাসনেব দু'টি সুবর্ণ যুগ পার হয়ে যাওয়ার পর এল সেই প্রতীক্ষিত মুহূর্ত। সন্ন্যাসী এসে দাঁড়ালেন সম্রাটের সামনে। জৈন সাধু ভদ্রবাহু বললেন, সম্রাটের পরিধেয় খুলে ফেলে চলে এসো আমার

সঙ্গে। তোমার ভোগবাসনাব নিরঞ্জনের সময় এসেছে। একটি বাক্য উচ্চাবণ করলেন না ভারত সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত। রাজবেশ পরিত্যাগ করলেন।

পেছনে পড়ে রইল সিংহাসন, পুত্র পরিজন। জৈন সাধু ভদ্রবাহুকে অনুসরণ করে চলে এলেন তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত মহীশুর রাজ্যের অন্তর্গত শ্রবণবেলগোলায়। সেখানে পদ্মাসনে উপবেশন করে জৈন-ধর্মের অনুশাসন অনুযায়ী গ্রহণ করলেন আমৃত্যু অনশন ব্রত। আত্মচিন্তায় মগ্ন সম্রাটের মুখমণ্ডলে ধীরে ধীরে ফুটে উঠল নিরাসক্ত সংসার বিবাগী এক সন্ন্যাসীর দিব্যজ্যোতি।''

লেখক অব্যর্থ নৈপুণ্যে 'প্রথম মৌর্য' উপন্যাসটিতে যথার্থই এক নতুন মাত্রা সংযোজন করে দিয়েছেন।

'মরু মৃগয়া' উপন্যাস আমাদেরকে নিয়ে যায় মধ্যযুগের সমৃদ্ধ এশিয়ার বিশাল প্রেক্ষিতে। মধ্য এশিয়ার কুচদেশ লেখকের কলমের গুণে পাঠকের কাছে জীবন্ত হয়ে ওঠে। লেখকের জ্ঞানসমৃদ্ধ মনন ও কল্পনাসমৃদ্ধ শিল্পভাবনার রমণীয় পরিণয় ঘটেছে এখানে। বস্তুত এ ব্যাপারে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর একমাত্র বরিষ্ঠ প্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী। দুজনেরই ইতিহাস-ভূগোল ক্ষেত্রে অধ্যয়ন গভীর ও দূরবিস্তৃত। দুজনেরই হাতে আছে কল্পনার এমন এক তুলি যার বিশাল আঁচড়ে ফুটে উঠে মধ্যযুগের দেশ-মহাদেশ-বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রসারের ইতিহাস ও তথাগতের মাহাত্ম্যের দিগ্বিজয় কাহিনী। বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত কুমারজীব এই উপন্যাসে উঠে এসেছেন প্রত্যক্ষ জীবন্ত চরিত্র হিসাবে।

চিত্তরঞ্জনের নিশ্ছিদ্র ভৌগোলিক জ্ঞান এই উপন্যাসেও পাঠককে মধ্য এশিয়ার জগতে পথের দিশা দেখায় — তক্ষশীলা মথুরা কৌশাম্বী শ্রাবস্তী বৈশালী পাটলিপুত্র — মধ্যযুগের এক একটি জনপদ আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন সাহিত্য' (১৯০৭) গ্রন্থে ও সমকালীন কাব্যে এইসব সমৃদ্ধ জনপদ-নগর-রাজধানীর নাম উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাসলেখকের দায়িত্ব কবি-ভাবুকের চেয়ে বেশি। তাঁকে সেই সমৃদ্ধ অতীতের পাষাণ কায়া দিতে হয়। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বঙ্কিমচন্দ্র, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী যে-কাজ করেছেন, আলোচ্যমান উপন্যাসলেখকও তা করেছেন। ভারত সভ্যতার দিগ্বিজয়ের কথা — হিমালয় পেরিয়ে বুদ্ধবাণী প্রসারের ইতিহাস এখানে চোখের সামনে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। ভারত কেবল আর্যের, হিন্দু সংস্কৃতি কেবল বৈদিক সংস্কৃতি নয়, অন্-আর্যের সঙ্গে মিশ্রণে গড়ে উঠেছে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি। অন্-আর্য ও আর্যের সভ্যতা ও জগৎ নিয়ে হিন্দু অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈন সভ্যতা। এই বিশ্বাস জোরের সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ একালের ভারত তত্ত্ববিদেরা। আলোচ্যমান উপন্যাসলেখকও তা মানেন।

'মরু-মৃগয়া' উপন্যাসের প্রেক্ষিত রূপে ভারত-সভ্যতার মিশ্র চরিত্র ও তার দিগ্বিজয়ের কথা স্মর্তব্য।

''মিশ্রণের ফলে ভারতে যে হিন্দু-সভ্যতার সৃষ্টি হইল তাহা এমন এক অনুপ্রেরণা লইয়া জন্মগ্রহণ করিল যাহার জীবনী শক্তি অমৃতধারার মতো এখনও প্রবাহিত হইতেছে। ভারতে এই মিশ্র সভ্যতার উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় শ্রেষ্ঠ চিন্তা-সম্পদ উপনিষদের উদয় এবং বৌদ্ধ ও জৈন চিন্তার অভ্যুত্থান, এবং মানুষের জ্ঞান ও চিন্তা-ভাণ্ডারে ইহাদের সমকক্ষ বস্তু আর কিছুরই নাম করিতে পারা যায় না। ব্রাহ্মণের জ্ঞান ও সাধনা এবং বৌদ্ধের মৈত্রী ও করুণা মিলিত হইয়া এশিয়া খণ্ডের বহুল অংশে মানবের মনে ভাবধারার মন্দাকিনী প্রবাহিত করিল। বসুধার সহিত কুটুম্বিতাব বোধ এবং মানব মাত্রেরই মুক্তির কামনা প্রাচীন কালের ব্রাহ্মণ ও ভিক্ষুকে তাহাদের উদার বাণী লইয়া ভারতের বাহিরেও যাত্রা করিবার জন্য এক অপূর্ব প্রেরণা দিল। এই প্রেরণার ফলে তাঁহারা প্রাচীন কাল হইতে পরিচিত জলপথ অবলম্বন করিয়া পূর্বাঞ্চলে যাত্রা করিলেন। মোন্ এবং খ্মের ও মালয়, সুমাত্রা যব-দ্বীপের লোকদিগকে ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ চিন্তা ও মনোভাবের দ্বারা জয় করিয়া আত্মীয় করিয়া লইলেন, অপিচ পশ্চিমে ও উত্তরে এই প্রেরণার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া দুর্গম তুষার সঙ্কুল গিরিপথ লঙ্ঘন পূর্বক সুদূর আগতদেশ মধ্য-এশিয়ার শক-স্থান, শূলিকদেশ বা সুগ্দ্, কুস্তন বা খোটান, কুক্ষ বা কুচার, ভোট বা তিব্বত, মহাচীন, কোরিয়া এবং জাপানেও

গিয়া পৌঁছিলেন। এইরূপে ভারত নিজের আত্মসাধন করিয়া, অপার্থিব সিদ্ধি লাভ করিয়া বাইরে নিজেকে ছড়াইয়া দিল।'' (সুনীতিকুমারের 'ভারত-সভ্যতার দিগ্বিজয়ের কথা' নিবন্ধটি ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে আনন্দবাজার পত্রিকা বার্ষিক সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত /১৯২৯-এর ফাল্গুন; পরে 'সাংস্কৃতিকী' তৃতীয় খণ্ডে, ১৯৮২, প্রকাশিত, পৃ১১-১২)।

মধ্য-এশিয়ায় সুদূর অজ্ঞাত দেশ কুচ বা কুচার 'মরু-মৃগয়া' উপন্যাসের পটভূমি। সেদিন ভারতে সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের আধিপত্য। বৌদ্ধ সংঘের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল বলে জানা যায়। হিন্দু ধর্মের বেদ উপনিষদের বাণী ও বৌদ্ধবাণী, দুয়েরই প্রচারে তাঁর আপত্তি ছিল না। এই উপন্যাসে বারবার উচ্চারিত হয়েছে বুদ্ধবাণী: গোদানের (খোটান) দিকে এগিয়ে চলেছে বুদ্ধযাত্রা, রথে আছেন স্থবির ধর্মমতি। সঙ্গে চলেছেন বহু নগ্নপদ ভিক্ষু। তাঁরা এসেছেন ভারত থেকে। আরো চলেছে অন্ত্যজ মানুষজন — তারা এসেছে চোক্কুর (ইয়ারকন্দ), শূলিদেশ (কাশগড়) থেকে। সবাই উচ্চারণ করছে এক মন্ত্র :

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
ধম্মং শরণং গচ্ছামি
সংঘং শরণং গচ্ছামি।

তিরিশ হাত উচ্চতাবিশিষ্ট রথ প্রবেশ করল খোটান (গোদান) রাজপথে। পৌঁছে গেল রাজপ্রাসাদের সামনে। মহাস্থবির ধর্মমতি উচ্চারণ করতে লাগলেন বুদ্ধের অমৃতবাণী : মেতঞ্চ সব্বলোকস্মিং মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং। উদ্ধং অধো চ তিরিযঞ্চ অসম্বাধং অবেরমসপত্তং — ঊর্ধ্বে অধোতে চারিদিকে সমস্ত জগতের প্রতি বাধাহীন হিংসাহীন শত্রুতাহীন অপরিমিত মানস এবং মৈত্রী রক্ষা করবে।

মন্ত্রের মতো জনসমুদ্র সেই বাণী উচ্চারণ করতে লাগল। পারস্য, চীন, বঙ্গ, চোক্কুক (ইয়ারকন্দ), শূলিদেশ (কাশগড়) থেকে এসেছে ব্যবসায়ীগণ -- তারা নিজ নিজ পণ্য নিয়ে রাজপথের দুধারে বসে গেছে। কুচ (বা কুচার) দেশের মহারাজা অমিত্রবিজয় নগ্নপদে এগিয়ে গিয়ে মহাস্থবির ধর্মমতি ও শোভাযাত্রাকে অভ্যর্থনা জানালেন।

এখানে 'মরুমৃগয়া' উপন্যাসের প্রেক্ষাপট আমাদের প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। মহাস্থবীরের সঙ্গে এসেছে কুমারায়ণ ও জীবা। এরাই এ উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা। তাদেরই পুত্র কুমারজীব।

কাহিনীর মধ্যে কাহিনী বুননের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ধারাটি চিত্তরঞ্জন এখানে রক্ষা করেছেন। (স্মর্তব্য, এখানে এই কাজ আরও কিছু লেখক করেছেন)। কুমারায়ণের মুখে জীবা সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত-বেতসা-কুমারায়ণের ত্রিভুজ আকর্ষণ-বিকর্ষণের কাহিনী ও বেতসার অগ্নিতে আত্মাহুতির পরিণাম কাহিনী শুনেছে। সেই সঙ্গে পাঠকেরও লেখকের সঙ্গে সমুদ্রগুপ্ত-অধ্যুষিত ভারত-পরিক্রমা করার সুযোগ আসে। এটি মূলকাহিনী নয়, কিন্তু এটি উপলক্ষ করে আমরা সেদিনকার ভারত ও বহির্ভারতকে চিনে নিই।

উপন্যাসলেখক একটি মহান সংকল্প কুমারায়ণ ও জীবার মাধ্যমে পাঠকের কাছে উপস্থিত করেছেন। গোমতী বিহারে মহাশ্রমণ ধর্মমতির আশীর্বাদ ভিক্ষা করে জীবা ও কুমারায়ণ কুচীর উদ্দেশে যাত্রা করল। চোক্কুক, শূলি ও ভুরুকের সার্থবাহের পথ ধরে দুটি অশ্বের পৃষ্ঠে যাত্রা করল তারা দুজনে। জীবার সঙ্গে তার প্রথম প্রণয় মুহূর্তের কথা কুমারায়ণের মনে আসছিল যাত্রার শুরুতে। এই দীর্ঘযাত্রা তাদের দুজনকে খুব কাছাকাছি এনেছিল। জীবা বান্ধবীর নাম করে যে ভালবাসার অভিনয় করে যাচ্ছিল, সে আড়াল ছেড়ে কুমারায়ণের কাছে প্রেমের মহিমায় নিজেকে প্রকাশ করল। দুটি দেশের দুটি হৃদয় এক সূত্রে বাঁধা পড়ল।

ভারতের সঙ্গে কুচী দেশের, সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার সঙ্গে রোমক ভাষার যোগসাধনের কথা জানতে পারি জীবার কথা থেকে। জীবা জানায় বহু শতাব্দী পূর্বে তাদের পূর্বপুরুষ রোম থেকে বেরিয়ে যাযাবর হয়ে অগ্নিদেশে ও কুচীতে আসে। পাঁচশো বছর আগে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা তাদেরকে দীক্ষা দেন। আজ ভারতের কুমারায়ণের সঙ্গে রোমাগত কুচীদেশকন্যা জীবার প্রণয়সম্পর্ক গাঢ় হতে চলেছে।

আশ্চর্য এই মেল-বন্ধন। দেশে দেশে যুগে যুগে মানুষের সঙ্গে মানুষের মেলবন্ধন ঘটে। ঘুচে যায় ভাষা-ধর্মাচার-সংস্কারের বাধা। গুরুদক্ষিণার কথা উঠেছে প্রেমিকযুগলের যাত্রাকালে। জীবা জানিয়েছে,

একদিন সে তার গুরুকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, গুরুদক্ষিণা দেবে। আজ সে কুমারায়ণকে সেই সংকল্প জানায় —যদি আমাদের প্রথম পুত্রসন্তান হয় তা হলে তার নামের সঙ্গে জড়িয়ে থাকবে আমাদের দুজনের নাম।

সে নাম হবে কুমারজীব (কুমারায়ণ + জীবা) — কুমারায়ণের এই প্রস্তাব মেনে নেয় প্রেমময়ী জীবা। কুচীনগরী জীবার নিজের দেশ। প্রতিবেশী দেশ অগ্নিদেশ। আবার এক কাহিনী— স্বয়ংবর প্রতিযোগিতা কাহিনী। শেষ পর্যন্ত কীভাবে কুমারায়ণ তাতে জিতে জীবাকে পেল, তার কাহিনী পাঠককে মুগ্ধ করে।

এই উপন্যাসে সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের অকথিত কাহিনী, অগ্নিদেশের যুবক রাজার লালসা যেমন আছে, তেমনি আছে কুমারায়ণ ও জীবার প্রেম। শেষ পর্যন্ত উভয়ের প্রেমের শ্রেষ্ঠ ফল পুত্রকে (কুমারজীব) অর্পণ করে সংঘের কাছে। তারই কাহিনী শেষ পর্যন্ত প্রাধান্য পায়।

'মরু-মৃগয়া' উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বে আমরা কুমারজীবের জীবনকথা পাই। তাঁর জননী জীবা বিতস্তা তীরবর্তী শ্রীনগরে মহারাজ মেঘবাহনের কাছে তাদের কথা বলেছিল। জীবা ও কুমারায়ণ কুচী দেশ থেকে কীভাবে শ্রীনগরে (ভারতে) এসে পৌঁছল, সেই দুর্গম পথ অতিক্রমণের কথা লেখক আমাদের জানিয়েছেন। আমরা চোখের সামনে দেখতে পাই পার্বত্য পথে তাদের যাত্রা।

মহারাজ মেঘবাহনের প্রশ্নের উত্তরে জীবা জানায় কীভাবে কুমারায়ণের সঙ্গে তার পরিচয় প্রণয় ও বিবাহ ঘটল। — ''আমার স্বামী ছিলেন এই ভারতবর্ষেরই মানুষ। তিনি অতিশয় বিদ্বান ও সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান ছিলেন। তক্ষশীলা ছিল তাঁর শিক্ষাক্ষেত্র। একসময় তিনি (কুমারায়ণ) গৃহত্যাগ করে বণিক দলের সঙ্গে কুচীর দিকে যাত্রা করেন। অনেক বাধা-বিঘ্নের ভেতর দিয়ে যাত্রা করে তিনি অবশেষে কুচীর রাজগৃহে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানেই আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও বিবাহ।''

কুচীদেশে বৌদ্ধধর্ম পূর্ব থেকেই ছড়িয়ে পড়েছিল, কিন্তু কুচদেশের রাজকন্যা জীবার মুখে বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ প্রত্যাশিত ছিল না। কুমারায়ণের সঙ্গে প্রেম জীবাকে ভারত ও সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে পরিণীত করেছিল।

প্রাচীন সভ্যতার — ভারতের দিগ্বিজয়ের এ এক স্মরণীয় ঘটনা — সুদূর কুচী রাজ্যের সঙ্গে ভারতের এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সম্পর্ক। সেই আত্মীয়তা চূড়া স্পর্শ করেছে জীবা-কুমারায়ণের পুত্র কুমারজীবের মধ্যে। এই তিনজনই ঐতিহাসিক চরিত্র। লেখক তাঁদেরকে একালের পাঠকের কাছে প্রত্যক্ষ করে তুলেছেন।

কুমারজীব বৌদ্ধশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। তার পিতা-মাতা তাকে সংঘের কাছে উৎসর্গ করেছিলেন। তার দীর্ঘ জীবন কেটেছে চীনদেশে। 'মরুমৃগয়া' উপন্যাসে এই কাহিনীর সূচনা, তারই অন্ত্যভাগ 'অনির্বাণ' উপন্যাসে কুমারজীবের চীনবিজয়ের কাহিনী। (এদুটিকে যুগল-উপন্যাস বা একই উপন্যাস বলা যায়।) কুমারজীবের শাস্ত্রবিদ্যার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছিল শস্ত্রবিদ্যা।

চিত্তরঞ্জন মাইতির উপন্যাসের বুনন-কৌশল অনুধাবন করে চমৎকৃত হতে হয়। একদিকে তিনি ইতিহাস ও জীবনকে এক সূত্রে বেঁধেছেন, অপরদিকে কাহিনীর মধ্যে কাহিনী বয়ন করে প্রাচীন কথকোবিদদের মতো শ্রোতাদের মন্ত্র মুগ্ধ করে রেখেছেন। মহারাজা মেঘবাহন জীবাকে দুটি কাহিনী শুনিয়েছেন — তাঁর গুরু মাধবস্বামীর পরিব্রাজক জীবনের কথা। তৎকর্তৃক উদ্ধারপ্রাপ্তা কুমারী বাক্-এর কাহিনী। মাধবস্বামী ছিলেন চিকিৎসক — তিনি তাঁর বিদ্যা প্রয়োগ করে মগধে সম্রাট সমুদ্রগুপ্তকে শল্যচিকিৎসায় আরোগ্য করেছিলেন। এ কাহিনী শুনে জীবা মহারাজ মেঘবাহনকে সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত ও তাঁর স্বামী কুমারায়ণের পরিচয়ের কাহিনী বললেন। তারপর মেঘবাহন তাঁকে বাক্ নাম্নী মেয়েটির কাহিনী বললেন। আবার একদিন জীবার মুখে মেঘবাহন জাতকের কাহিনী শুনলেন। ধীরে ধীরে তাঁর জীবন বদলে যেতে লাগল।

এভাবেই লেখক গল্পের মালা গেঁথে কাহিনী গড়ে তুলেছেন। পাঠক তাঁর হাত ধরে মধ্যযুগের ভারত ও এশিয়ার দূরবিস্তীর্ণ অঞ্চলে মানস পরিভ্রমণ করে আসতে পারেন।

বুদ্ধ কাহিনী শুনে মহারাজ মেঘবাহনের ঘটেছিল দিব্য-উপলব্ধি। তিনি জীবার ইচ্ছানুসারে কাশ্মীরে পর্বত-উপরে বৌদ্ধ ভিক্ষুণীদের জন্য একটি বিহার নির্মাণ করিয়ে দিলেন। বাকের সঙ্গে বন্ধু বিক্রমকেশরীর

মিলন ঘটিয়ে কুমারজীব কুমারী চম্পাব কাছেও বিদায় নিলেন। তাকে বুদ্ধের কৃপাধন্য ভিক্ষুণীর জীবনের দিশা দেখালেন। এবং তারপর জননী জীবার সঙ্গে কাশ্মীর তথা ভারত ছেড়ে কুমারজীব ফিরে চললেন কুচীর পথে। পথে পড়ল হুঞ্জাদের গ্রাম। ভারতযাত্রার পথে সে গ্রামে এসেছিলেন মা ও ছেলে।

লেখক এই সূত্রে প্রাচীন ভারতের সেই সুদীর্ঘ পথরেখা অংকন করেছেন। কাশ্মীর থেকে পাহাড় পেরিয়ে হুঞ্জাদের গ্রাম। দুর্গম পামীর মালভূমিতে যাযাবর কিরঘিজদের সঙ্গে দেখা। বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত কুমারজীবের ব্যক্তিত্ব ও করুণা-প্রভাবে তারা গ্রহণ করল বৌদ্ধধর্ম। পামীর পার হয়ে শূলি, চোক্কুক, গোদান। চার বছর বাদে সেই পথে মাতা পুত্র ফিরে চলেছেন। কুমারজীব প্রচার করে যাচ্ছেন বুদ্ধবাণী। যাত্রার লক্ষ্য কুচীর বৌদ্ধবিহার। তখন চীনাসৈন্যরা অবরোধ করেছে কুচী নগর। কুচীর মহারাজ রজতপুষ্পের সঙ্গে দীর্ঘকাল পরে মিলন তার ভগিনী জীবার। দূত এ'স জানাল, চীন সম্রাট অবরোধ তুলে নেবেন একটি শর্তে — মহাপণ্ডিত কুমারজীবকে চীন গমনে অনুমতিদা'। অন্যথায় ধ্বংস হবে কুচী। দ্বিধা না করে মহাজ্ঞানী কুমারজীব চীনাদের সঙ্গে চিরকালের জন্যে চলে গেলেন কুচী ছেড়ে, রক্ষা পেল কুচী আর চীনদেশ লাভ করল এক মহাজ্ঞানী বৌদ্ধ পণ্ডিতকে।

কুমারজীবের চীন যাত্রা — ইতিহাসের এই সত্য-কঙ্কালে লেখক এভাবেই প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছেন। উপন্যাসের শেষ অনুচ্ছেদটি অনুপম : "যাত্রার দিন দেখা গেল চীন-সম্রাট নিজের রথে পরম সমাদরে তুলে দিলেন বৌদ্ধ ভিক্ষু কুমারজীবকে। সেই রথ আকর্ষণ করে নিয়ে চলল সাতটি শ্বেত বর্ণের অশ্ব। সম্রাট স্বয়ং সেই রথের পশ্চাতে অশ্বারোহণে চললেন ধর্মচক্র বহন করে। প্রদীপ্ত সূর্যের দেশে বিশ্বের রাজাধিরাজ যাত্রা করলেন মহাধর্মবিজয়ে।" এখানেই উপন্যাস শিল্পপরিণতির শিখরে উপনীত হয়েছে।

কালক্রমের দিক থেকে এইসঙ্গে 'বৈজয়ন্তী' উপন্যাস, যার কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত, যিনি পূর্ববর্তী উপন্যাস যুগলে বারবার দেখা দিয়েছেন। হিন্দু ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত। সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত ও লিচ্ছবী রাজকন্যা কুমারদেবীর পুত্র কাচ। এই পুত্রই কালক্রমে সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত নাম ধারণ করে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এদেরকে ঘিরেই মগধ-বৈশালী গুপ্তবংশ-লিচ্ছবী বংশের আত্মীয়তা-সম্পর্ক আবর্তিত হয়েছে। কাচের সঙ্গী ভিলসা। কাচের বধূ নাগকন্যা দত্তা। অন্যদিকে সঙ্গীতশাস্ত্রীর সুন্দরী কিশোরী দৌহিত্রী মুক্তামালা। এ দুই নারীর টানাপোড়েনে রাজপুত্র কাচ গড়ে উঠেছে। প্রাসাদষড়যন্ত্র ও গুপ্ত রেষারেষি মগধের রাজনীতিকে করে তুলেছিল বিষাক্ত। সম্রাট সমুদ্রগুপ্তকে নিয়ে গড়ে উঠেছে 'বৈজয়ন্তী' উপন্যাস।

পাঠক এই উপন্যাসে অনেকটা পরিচিত পরিবেশ পেয়ে যায়। ঈর্ষা মাৎসর্য ভালবাসা হিংসা প্রতিহিংসা কুটিল ষড়যন্ত্রে আবিল রাজ-পরিবেশ কীভাবে হিন্দু ভারতের কেন্দ্রশক্তিকে ভেতরে দুর্বল ও বাইরে দুর্ধর্ষ করে তুলেছিল, তার নিখুঁত ছবি এখানে পাই। ইতিহাসনিষ্ঠা আর কল্পনাশক্তি, দুয়ে মিলে গড়ে উঠেছে এক সমৃদ্ধ অতীত। সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত সম্পর্কে ঐতিহাসিক বলেন —

Samudragupta, the second Gupta monarch, who reigned for forty or fifty years, was one of the most remarkable and accomplished kings recorded in Indian history. He undertook and succeeded in accomplishing the formidable task of making him self the paramount power in India. He spent some years first in thoroughly subduing such princes in the Gangetic plain as declined to acknowledge his authority. He then brought the wild forest tribes under control and finally executed a military progress through the Deccan, advancing so far into the peninsula that he came into conflict with the pallava ruler of Kanchi (Canjeeverum) near Madras. Samudragupta did not attempt to retain permanently his conquests in the south, being content to receive homage from the vanquished princes and to bring back to his capital a vast golden treasure. He celebrated the 'asamedha' or horse sacrifice, which had long been in abeyance, in order to mark successful assertion of his claim to imperial rank, and

struck interesting gold medals in commemoration of the event.

At the close of Samudragupta's triumphal carrier (330-380 A. D.) his empire — the greatest in India since the days of Asoka — extended on the north to the base of the mountains, but did not include Kashmir. The eastern limit probably was the Brahmaputra. The Narbadā may be regarded as the frontier of the south. The Jamuna and Chambal rivers marked the western limit of the territories directly under the imperial government, but various tribal states in the Punjab and Malwa, occupied by the Iaudheyas, Mālavas, and other nations, enjoyed autonomy under the protection of the paramount power. (Smith's 'Oxford History of India' Revised Forth Edition, ed. by P. Spear, O.U.P. 1982, PP166).

চিত্তরঞ্জন মাইতির 'বৈজয়ন্তী' উপন্যাসের অধিনায়ক সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত। তাঁকে ঘিরেই এর ঘটনাবলী আবর্তিত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ বঙ্কিম রচনাবলীতে ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির ভূমিকা লিখতে গিয়ে আচার্য যদুনাথ সরকার প্রাধান্য দিয়েছেন বিশেষ বিশেষ যুগের পরিবেশকে। কাহিনী বানানো হলেও ক্ষতি নেই। যথার্থ যুগ-পরিবেশটি ফুটে উঠেছে কি-না দেখতে হবে। সেদিক থেকে চিত্তরঞ্জনের ঐতিহাসিক উপন্যাসাবলী যে সার্থকতা অর্জন করেছে তা পাঠক এতক্ষণে অনুধাবন করতে পেরেছেন। 'বৈজয়ন্তী' উপন্যাসে তা বিশেষ সার্থকতা মণ্ডিত হয়েছে।

গুপ্ত-লিচ্ছবী বংশজাত সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের যে চিত্রটি এখানে অঙ্কিত তা ইতিহাস-সম্মত, যুগানুসারী ও বস্তুনিষ্ঠ।

লেখক কিরূপে ইতিহাসকে বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করেছেন তা এবার দেখা যেতে পারে। আরো দেখা যাবে ইতিহাস কীভাবে কাব্যসৌন্দর্য ও শিল্পভাবনায় মণ্ডিত হয়েছে।

মিথিলার অনতিদূরে লিচ্ছবীরাজ ভবদেবের প্রাসাদ অভিমুখে পাটলিপুত্র থেকে হস্তীপৃষ্ঠে যাত্রা করেছিলেন তাঁরই কন্যা কুমারদেবী। (সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের মহারানী)। সঙ্গে অশ্বপৃষ্ঠে তাঁর পুত্র যুবক কচ (সমুদ্রগুপ্ত)। তাঁর সঙ্গী কিশোর ভিলসা (দর্বাহার-পুত্র)। পথে এক রাতে কচ পর্ণকুটিরে এক বৃদ্ধ বীণকার ও কিশোরী মুক্তামালার সঙ্গে পরিচিত হয়। অল্প পরিচয়েই কচ মুক্তামালার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হয়। মাতামহ-প্রাসাদে পৌঁছবার পরে যুবক কচের দিবাস্বপ্ন ও কাব্যচর্চার একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন লেখক। তাঁর ইতিহাসনিষ্ঠার সঙ্গে কাব্য-সৌন্দর্য ও শিল্পভাবনার যে রমনীয় পরিণয় সাধিত হয়েছিল তার পরিচয় 'বৈজয়ন্তী' উপন্যাস থেকে নিতে পারি।

"আহারাদির পর নির্দিষ্ট কক্ষে বিশ্রাম করছিল কাচ। একটি উচ্চভূমির ওপর প্রস্তরনির্মিত প্রাসাদ। মুক্ত বাতায়নপথে প্রশস্ত প্রান্তর চোখে পড়ে। কয়েকজন কিণাশ (কৃষক) দূরে ক্ষেতের কাজ করছিল। এক ঝাঁক কলবিঙ্ক (চড়াই) উড়ে উড়ে মাঠ থেকে সংগ্রহ করে বেড়াচ্ছিল শস্যকণা। বিটঙ্কবেদিকা (পায়রা বসার জায়গা) থেকে পারাবতদের কলকূজন শোনা যাচ্ছিল। প্রান্তরের শেষে নীল আকাশ ছুঁয়ে দিগন্তের অর্ধবৃত্তাকার বনরেখা। ওই বন যেখানে শেষ হয়েছে তারই দক্ষিণ প্রান্ত ছুঁয়ে স্বচ্ছধারা একটি প্রবাহিনী বয়ে চলেছে।

দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রামে অভ্যস্ত নয় কাচ। সে বাতায়নপথে চেয়ে চেয়ে দেখছিল রৌদ্রস্নাত প্রকৃতির মন্থর জীবনলীলা।

হঠাৎ কাচের চোখের সামনে ভেসে উঠল একটি কিশোরীর আলেখ্য। চতুর্দিকে ইন্দ্রধনুর মতো সুরের বলয় সৃষ্টি হয়েছে। তার মাঝে একখানা বীণা হাতে ধরে দূর বনরেখা থেকে প্রান্তরের দিকে এগিয়ে আসছে কিশোরী।

কাচের মনে হল এ কিশোরী যেন তার স্বপ্নে দেখা। স্বপ্নের ঘোর কেটে গেলেই মিলিয়ে যাবে এমন অপরূপ একখানা ছবি।

কাচ তার কিঙ্করকে পেটিকা থেকে ভূর্জপত্র আর লেখনী বের করে আনতে বলল। ভূর্জপত্র শয্যার ওপর বিছিয়ে আপন মনে লিখল তার প্রথম কবিতা —

'কপালে আঁকা ছিল তার চন্দনতিলক,
মনে হলো, আকাশের চন্দ্রমা ধরা দিয়েছে ললাটে।
কিংশুকের ডালে ডালে আধফোটা ফুলের উৎসব,
মনে হলো, তারই হাতে জ্বালিয়ে দেওয়া
সারি সারি দীপশিখা।
তখন ব্রহ্মবীণায় উঠেছিল আনন্দরাগিণী,
মনে হলো, প্রবাহিনীর কলধ্বনি —
জেগে উঠেছে সেই বীণার তন্ত্রীতে।
জ্যোৎস্নার উত্তরীয়খানি ওড়াচ্ছিল মধুমাস লক্ষ্মী,
তারই তলায় দাঁড়িয়ে কোন সুরকন্যা —
তার চোখের দুটি কালো ভ্রমরীকে উড়িয়ে দিল।
আমি দাঁড়িয়ে রইলাম নিস্পন্দ মন্ত্রমুগ্ধ।
আমার আঁখি-ভ্রমর কখন যে বন্দী হলো,
তা জানতে পারিনি।'

বিদেশী পথিক।'

ইতিহাস বলে, সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত (পূর্বেকার নাম কাচ) বীণকার, কবি, সংগীতজ্ঞ, শিকারদক্ষ এবং তিনি বিষ্ণু-উপাসক হিন্দু। — "Samudragupta was a man of exceptional personal capacity and unusually varied gifts. His skill in music and song is commemorated by certain rare gold coins or medals which depict the king seated on a couch playing the Indian lute (vinã). He was equally proficient in the allied art of poetry and is said to have composed numerous works' worthy of the reputation of a professional author. He took much delight in the society of the learned, whose services he engaged in the defence of the scriptures. He was a Brahmanical Hindu with a special devotion to Visnu, like the other members of the house." (Ibid, pp167)

এভাবেই লেখক ইতিহাস ও কল্পনার পরিণয় সাধন করেছেন। মগধ-বৈশালী, গুপ্ত-লিচ্ছবীর সম্পর্কস্থাপনের মধ্যদিয়ে সেদিনকার ভারতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিল গুপ্ত সাম্রাজ্য। ইতিহাসকার সমুদ্রগুপ্তের অশ্বমেধ যজ্ঞের উল্লেখ করেছেন। লেখক কল্পনাবলে তার অপরূপ বর্ণনা দিয়েছেন 'বৈজয়ন্তী' উপন্যাসে। আর্যাবর্ত ও দক্ষিণাপথ বিজয় শেষে সম্রাট 'সর্বরাজছেত্তা' সমুদ্রগুপ্ত 'অশ্বমেধ পরাক্রম' উপাধি নিলেন যজ্ঞ-শেষে।

দক্ষিণপূর্ব এশিয়া একদিন ছিল বৃহত্তর দ্বীপময় ভারত। ভারতের সেই আধিপত্য নিয়ে চিত্তরঞ্জন মাইতি লিখেছেন যুগল উপন্যাস 'বিজয়' ও 'কনকমঞ্জরী'। লেখকের ব্যাপক অধ্যয়ন ও দূরবিস্তৃত অন্বেষণ, জ্ঞানসমৃদ্ধ বিশ্লেষণ ও কল্পনাভূয়িষ্ঠ জীবনচিত্রণের উজ্জ্বল পরিচায়ক এই যুগল উপন্যাস। লেখকের ইতিহাসনিষ্ঠা তর্কাতীত। তথ্য সংগ্রহে তিনি অক্লান্ত এবং তার শিল্পরূপায়ণে নিপুণ। লেখক যেসব তথ্য-সূত্র বা উৎস ব্যবহার করেছেন এখানে তার উল্লেখ করা যেতে পারে : The Early History of India, by V. A. Smith 4th Ed. (Oxford, 1923), Cambridge History of India, the Oxford History of India, by V. A. Smith. 4th Ed by P. Spear, (Ox. U. P.1982) Corpus Inscriptionum Indicarum, vol-iii, (Calcutta, 1888) by Bhandarkar, British Museum. Catalogue of the coins of the Gupta Dynastics by J.Allen (London 1914) New History of the Indian People, vol vi, Ed. R. C. Majumdar. R. K. Mookerjee's 'Harsha'

(Oxford, 1925) R. Grousset's In the the Footsteps of Buddha. Leon, London, 1932, G. codes' Les Etas Hindouises D' Indochine et d' Indonesia' (Pan's 1948) D. G E. Hall's 'A History of south East Asia' (London, 1955) and books by R. May, R. C. Majumder, H. G. Quaritch Wales, & N. K. S. Shastri.

ইংরেজী, ফরাসি ডাচ ভাষায় লিখিত নিম্নধৃত গবেষণা গ্রন্থের 'সাংস্কৃতিকী' (৩য় খণ্ড, ১৯৫২, ৪র্থ খণ্ড ১৯৫৩। ১ম খণ্ড ১৯৫১, ২য় খণ্ড ১৯৫৫), 'রবীন্দ্র-সংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ', ১৯৪০, পরিবর্ধিত ২য় সং ১৯৫৪)। শেষোক্ত গ্রন্থে সুনীতিকুমার মালয় দেশ (সিঙ্গাপুর, মালাক্কা, কুআলা-লুম্‌পুর, ইপোঃ, তাই-পিঙ, পিনাঙ্) সুমাত্রা, যবদ্বীপ-বাতাবিয়া, বালিদ্বীপ, যবদ্বীপ (সুরাবায়া, শূরকর্ত, প্রাম্বানন, যোগ্যকর্ত, বোরো-বুদুর, বান্দুঙ), শ্যামদেশ বা সিয়াম (বাঙ্কক) অর্থাৎ দ্বীপময় ভারতের বিশদ বিবরণ দিয়েছেন।

আলোচ্যমান উপন্যাসলেখক তাঁর যুগল উপন্যাস 'বিজয়' 'কনকমঞ্জরী'তে এই সুবিপুল গবেষণালব্ধ জ্ঞানভাণ্ডার অবলীলায় পরিভ্রমণ শেষে জ্ঞান ও কল্পনার সমন্বয়ে সাহিত্যের এক কল্পলোক নির্মাণ করেছেন। সেই কল্পলোকে প্রবেশের পূর্বে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের রচনার মাত্র দুটি অংশ উদ্ধার করি। এর থেকে উপন্যাসযুগলের পটভূমি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে বলে আশা করি। ---

(ক) খ্রিস্টজন্মের পূর্বের ও পরের কয়েক শতকের মধ্যেই ওদিকে ক্যাস্পিয়ন হ্রদ ও সিন-কিয়াঙ্ বা চীনা-তুর্কীস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব-ইরাণ ও আফগানিস্তানের ভিতর দিয়া, সমগ্র ভারতবর্ষ ও লঙ্কাদ্বীপকে ধরিয়া, এদিকে ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, দক্ষিণ ইন্দোচীন, মালয় উপদ্বীপ, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বালিদ্বীপ, লম্বক প্রভৃতি এবং বোরনিও, সেলেবেস্ ও ফিলিপীন পর্যন্ত লইয়া এক 'বৃহত্তর ভারত' গড়িয়া উঠিল। এই বৃহত্তর ভারতের লোকেরা (দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের লোকেরা বিশেষ করিয়া) ধর্মে ও সভ্যতায় ভারতীয় হইয়া উঠিল, এবং সংস্কৃত তাহাদের মধ্যে সাদরে গৃহীত হইল। তাহাদের ভাষা লিখিত ভাষা ছিল না। ভারতবর্ষ হইতে তাহারা বর্ণমালা ও লিপি গ্রহণ করে। ভারতীয় লিপিতে তাহাদের ভাষা-সমূহ প্রথম লিখিত হইল। ভারতীয় পুস্তকের — বৌদ্ধশাস্ত্রের ও রামায়ণ মহাভারতাদি ব্রাহ্মণ্য গ্রন্থের — অনুবাদের সহায়তায় তাহাদের সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপিত হইল বা সুদৃঢ় করা হইল; সংস্কৃত ভাষায় তাহাদের রাজারা নিজ অনুশাসন উৎকীর্ণ করাইতে লাগিলেন। ঠিক ভারতবর্ষে যেমনটি হইত। তাহাদের ভাষা-সাহিত্য ভারতীয় (সংস্কৃত) সাহিত্যের আদর্শে পুষ্ট হওয়ার ফলে, এবং ভারতীয় বর্ণমালা গৃহীত ও ভারতীয় লিপিতে তাহাদের ভাষা লিপিবদ্ধ হওয়ার ফলে, সংস্কৃত শব্দ এইসকল ভাষায় ভূরি-ভূরি প্রবেশ লাভ করিতে লাগিল।" (সাংস্কৃতিকী, ২য় খণ্ড, পৃ ১১১, 'এশিয়া খণ্ডে সংস্কৃত ভাষার প্রসার ও প্রভাব' নিবন্ধ)।

(খ) আর্য ও দ্রাবিড়কে বাদ দিলে ভারতের যোগ হইতেছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে। ভারত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ারই অংশ। ভারতে কোল প্রভৃতি অস্ট্রিক জাতির সহিত ইন্দোচীনে ও মালয় দ্বীপপুঞ্জে অধ্যুষিত তাহাদের জ্ঞাতিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। নৌযোগে ওই সব অঞ্চলে যাতায়াত ছিল, এরূপ অনুমান হয়। আর্যদের আগমনের পরে এবং আর্য, দ্রাবিড় ও অস্ট্রিকের সংমিশ্রণের ফলে যখন পাঞ্জাবে ও গঙ্গাতটে আনুমানিক ৫০০ শত খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যেই হিন্দু সভ্যতার পত্তন হইল, তখন সমতল থেকে গঙ্গাতীরে ও অন্যত্র উর্বরদেশে যে অস্ট্রিক জাতি ভারতে বাস করিত, তাহারাও ধীরে ধীরে সেই সভ্যতা গ্রহণ করিল এবং নিজভাষা পরিত্যাগ করিয়া আর্যভাষা গ্রহণ করিয়া হিন্দু জাতিতে পরিণত হইল। কিন্তু নূতন ধরনের সভ্যতা ও মনোভাব তাহাদের মধ্যে গৃহীত হইলেও, ইন্দোচীন ও দ্বীপুঞ্জের জ্ঞাতিদের সহিত তাহাদের যোগসূত্র ছিন্ন হইল না এবং এই যোগসূত্রকে অবলম্বন করিয়াই ভারতের হিন্দু-সভ্যতার পূর্বাভিমুখে সম্প্রসারণ। .....ইন্দোচীন ও মালয় দ্বীপপুঞ্জে হিন্দুসভ্যতার বিস্তার হইতেছে হিন্দু-পূর্বযুগের ভারত ও ওই অঞ্চলের অবিচ্ছিন্ন সম্পর্কের এক সহজ অভিব্যক্তি।" (সাংস্কৃতিকী, ৩য় খণ্ড, পৃ ১১ — 'ভারত সভ্যতার দিগ্বিজয়ের কথা' নিবন্ধ)।

যুগল-উপন্যাস 'বিজয়' ও 'কনকমঞ্জরী'র এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট লেখক উপস্থাপিত করেছেন তাঁর জ্ঞানসমৃদ্ধ পর্যবেক্ষণ ও কল্পনাসমৃদ্ধ শিল্পায়ন মারফৎ। দ্বীপময় ভারতে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রসার

লেখকেব কলমেব গুণে পাঠকেব কাছে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে।

'বিজয়' উপন্যাসের সূচনায় দুটি চলচ্ছবি পাঠককে মুগ্ধ করে। পাহাড়ের আড়ালে সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে ছায়াবৃতা ধরণীতে সৈগন নদীতীরে চলেছে এক অসাধারণ শোভাযাত্রা। বনের অন্তরালে আত্মগোপনকারী এক পুরুষ বিস্ময়ের সঙ্গে সেই শোভাযাত্রা দেখছেন। সারিবদ্ধভাবে নগ্ন ঊর্ধ্বদেহ সুন্দরী তরুণীরা চলেছে। হাতে প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ ও পূজার উপকরণ। শ্বেত ও রক্তপুষ্পে গাঁথা মালা কণ্ঠ থেকে নেমে এসেছে নাভিমূলে। পৃষ্ঠে প্রপাতের মতো কেশরাশি। বাহুতে অঙ্গুলি প্রমাণ স্ফীত লতা-নির্মিত সর্প-বলয়। অন্তরালবর্তী পুরুষ কৌণ্ডিন্য সঙ্গী অনুচরের কাছে শুনলেন, সেই রাতে হবে নাগপূজা। নাগবংশের রাজকুমারী উল্বলিফ সখীদের নিয়ে এই পূজা করবেন। নাগপূজার এক অসাধারণ ছবি লেখক দিয়েছেন। কৌণ্ডিন্য ও তার সঙ্গী উফান দেখলেন, এক ভীষণ নাগ পূজাবেদির উপর বৃক্ষকাণ্ডে দোল খাচ্ছে। তার সামনে উৎসর্গিত হরিণকে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে গিলে ফেলল। দ্বিতীয় দিনে এক সম্মোহিত কন্যাকে বন্দী করে ফেলে রাখা হল বেদিতে। সারা দিন নাচগানের পর সন্ধ্যায় সেই নাগরাজ আবার নেমে এল। এ রাতে তার লক্ষ্য ওই অর্ধ্ব সম্মোহিতা তরুণী। দুচার ছোবল দিল, মেয়েটি একবার হাতের ছোরা দিয়ে নাগকে আঘাত করল। তারপর নাগরাজ চূড়ান্ত আক্রমণের মুহূর্তে অন্তরাল থেকে নিক্ষিপ্ত দুটি তীর নাগরাজের ব্যাদিত মুখগহ্বরে বিঁধে গেল। নাগরাজ হল গতপ্রাণ। রক্ষা পেল বন্দিনী। নাগরাজকন্যা উল্বলিফ এই ঘটনায় বিস্মিত, ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ, উৎকণ্ঠিত।

দ্বিতীয় ছবি। কম্বোজ থেকে তক্ষশিলার পথে যাত্রা করেছে দশজন অশ্বারোহী। প্রপাপালিকা কিশোরীর কাছ থেকে তারা পেল তৃষ্ণার জল। মেয়েটির নাম দিশা। দলপতির নাম জয়বাহু। এ পৃথিবীতে দিশার আর কেউ নেই পিতা ব্রাহ্মণ উদারক ছাড়া। প্রপা-পালিকার কাজে সারাদিন যায়। তারপর উদারকের কাছে কুটিরে ফিরে যায়। এই জয়বাহু কম্বোজ-রাজপুত্র। এই জয়বাহুরই অপরনাম কৌণ্ডিন্য। দীর্ঘ যাত্রাপথে নাগপূজার ওই ভয়ংকর দৃশ্য বনান্তরাল থেকে সে দেখেছে, তারপর নাগকে তীরবিদ্ধ করে বাঁচিয়েছে এক তরুণীকে।

এমন করেই চতুর্দশী দিশার সঙ্গে আলাপ হল কম্বোজ-রাজপুত্র জয়বাহু ওরফে কৌণ্ডিন্যের — তার সঙ্গে দিশা ভাই-সম্পর্ক পাতিয়েছে।

দিসার জলসত্রে অপর এক অতিথি শ্রীমার (মদন)।

তরুণ শ্রীমারের কাছে চতুর্দশী দিসা প্রতিদিন শেখে অশ্বচালনা, শস্ত্রচালনা ও মল্লযুদ্ধ। এই চর্চাকালে দুটি তরুণ হৃদয় কাছাকাছি আসে। লেখক চমৎকারভাবে দেখিয়েছেন তাদের মানসিক নৈকট্য। — একদিন প্রসারিত প্রান্তরে দিগন্ত ছোঁয়া পথের ওপর দাঁড়িয়ে শ্রীমারের হাত ধরে দিশা উচ্চারণ করল ঋষি অথর্বার ভূমিসুক্ত :

> 'যে তে পন্থানো বহবো জনায়না
> রথস্য বর্ত্মা-অনসশ্ চ যাতবে।
> যৈঃ সংচরন্তি-উভয়ে ভদ্রপাপাস্
> তং পন্থানং জয়েম-অনমিত্রম্ অতস্করং
> যত্-শিবং তেন নো মৃলঃ।'

— 'যে সকল পথের ওপর দিয়ে তোমার লোকেরা চলাচল করে, রথ ও শকট যাতায়াত করে, দুষ্ট ও শিষ্ট দু'রকমের মানুষেরই যার ওপর দিয়ে আনাগোনা, সেই পথকে আমরা জয় করে নেব। তাকে করে তুলব শত্রুহীন আর তস্করশূন্য। হে পৃথিবী, যা শুভ তাই দাও আমাদের। সুখী কর, নন্দিত কর।'

ভারতের প্রাচীনতম শাস্ত্রের এই সূক্ত কেবল পৃথিবীর কাছে সারা মানবজাতির জন্যে শুভ প্রার্থনা করেনি, সেইসঙ্গে দুটি তরুণ হৃদয়ের জন্যও শুভ প্রার্থনা করেছে। দিসার পিতাও স্বপ্ন দেখেন, দুটি তরুণ হৃদয় অচিরে মিলিত হবে।

একদিকে নাগরাজ্যেব রাজা উরাসিন, তাঁর কন্যা উল্বলিফ অন্যদিকে বণিক কৌণ্ডিন্য (কম্বোজ

রাজকুমাব জয়বাহু) ও তাব বন্ধু উফান: একদিকে জয়বাহু — রানী উষীব-এর চম্ বাজ্য (চম্পা) জয়, অন্যদিকে জয়বাহুর সঙ্গে উম্বলিফের প্রণয়, এবং নাগমুখ থেকে রক্ষা-পাওয়া রাজকন্যা-সখী উষীরের প্রতি জয়বাহুর আশ্বাস — বহু চরিত্র ও ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে দ্বীপময় ভারতে ভারত সংস্কৃতি-সভ্যতার প্রসারের ইতিহাস শিল্পরূপায়িত হয়েছে। নাগরাজ্যের নিয়ম অনুযায়ী রাজকন্যার (উম্বলিফ) সঙ্গে বিবাহের পর তার স্বামী (জয়বাহু) তার যে কোনো সখীকে দ্বিতীয় রানী হিসেবে নির্বাচিত করতে পারেন। জয়বাহু সে-ভাবেই উষীরকে আপনার সঙ্গিনী গ্রহণ করেছে। কাহিনীর রমণীয় পরিণতিতে আরও-একটি রমণীয়-ঘটনা সংঘটিত। সেই জলসত্রের প্রপা-পালিকা দিসার সঙ্গে কাহিনী শেষে মহারাজ জয়বাহুর দেখা হয়েছে — এখন সে চম্পার রানী (দিসা) আর তার স্বামী শ্রীমার জয়বাহুর পুরাতন শিষ্য। শিষ্যের সঙ্গে গুরুর, ভ্রাতার সঙ্গে ভগ্নীর মিলনে পরিণাম আরো রমণীয় হয়ে উঠেছে।

যুগল উপন্যাসের অন্যতম 'কনকমঞ্জরী'। যবদ্বীপে ভারত-সংস্কৃতির প্রসারের কাহিনী এখানে রূপায়িত। লেখক ঐতিহাসিক গবেষকদের পথরেখা অনুসরণ করে দ্বীপময়ভারতের আর এক বর্ণোজ্জ্বল সমৃদ্ধ অতীতকে দেখিয়েছেন। কাহিনীতে কল্পনা থাকলেও উপন্যাসের কাঠামো ইতিহাসাশ্রয়ী। বস্তুত, ইতিহাস ও কল্পনার রমণীয় পরিণয় সাধনে লেখক সিদ্ধহস্ত।

যবদ্বীপের মহারাজ অদ্রিবিজয়, এক বণিকের কাছে বঙ্গদেশীয় একটি কন্যার সঙ্গে বিবাহের যে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন তা পূরণ করতেই বঙ্গদেশ থেকে বহিত্র-যোগে তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে যবদ্বীপ যাত্রা করেছিল একটি দল। পথে ঝড়ে নৌকাডুবি। কাহিনী রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি' উপন্যাসের পথ ধরে এগোয়নি। কয়েক হাজার বছর পিছিয়ে যে কাহিনীর সূত্রপাত 'কনকমঞ্জরী' উপন্যাসে, তার সূচনাতেই লেখক তাম্রলিপ্ত থেকে যবদ্বীপে নৌযাত্রা মারফৎ পাঠককে নিপুণভাবে বুঝিয়ে দিলেন তাঁর অভিপ্রায়টি। উপস্থাপনা ও সূত্রপাতের এই চমৎকারিত্ব পাঠককে মুগ্ধ করে। নৌকাডুবি থেকে উদ্ধারপ্রাপ্তা কনকমঞ্জরী ভাস্কর অগ্নিহোত্রীর কাছে যে কাহিনী বলে তা থেকেই আমরা এই যবদ্বীপ-ভারত সম্পর্ক জানতে পারি। বণিক সুদত্তের কন্যা কনকমঞ্জরী ও সখী শৈলবাসিনী। কনকমঞ্জরীর উদ্ধারকর্তা শিল্পী অগ্নিহোত্রী এক নবকুমার, যে বঙ্কিমের নবকুমারের মতোই পরের জন্য ঝাঁপায়। কিন্তু এখানেও পরিণাম বঙ্কিমপথে নয়, বরং সমৃদ্ধ অতীতে ভারতের জলপথে দ্বীপময় ভারত-বিজয়ে। তার ঐতিহাসিক সাক্ষ্য পূর্বেই নিয়েছি। তার একটি উদাহরণ 'বিজয়', অপরটি 'কনকমঞ্জরী'। নৌকাডুবির পর আরও দুজন যবদ্বীপ রাজপ্রাসাদের অনতিদূরে উদ্ধার পেয়েছিল — কনকমঞ্জরীর সখী শৈলবাসিনী ও তার পিতা চতুরানন। তিনিই পথ বাতলালেন — আজ থেকে তোমার নাম শৈলবাসিনী নয়, তুমি বণিকশ্রেষ্ঠ সুদত্তের কন্যা কনকমঞ্জরী। এখানেই কৌতুকে জটিলতায়, আনন্দে বৈপরীত্যে, ছদ্মবেশে ও আত্মপরিচয় গোপন প্রয়াসে গড়ে উঠল নতুন কাহিনী। চতুরানন মহারাজ অদ্রিবিজয়ের কাছে আপন কন্যাকে কনকমঞ্জরীর নামেই পেশ করল। আসল কনকমঞ্জরী ও অগ্নিহোত্রীকে শেষ পর্যন্ত উদ্ধার করল একটি চীনা জলযান, যার আরোহিনী 'ওয়াংফুলি' বা 'চম্পকশিখা'।

কাহিনীর মধ্যে কাহিনী-বৃত্ত রচনায় লেখক নিপুণ — এ পরিচয় আমরা বারবার পাই। এখানেও— ওয়াংফুলি ও তার সঙ্গী চেন তিয়ানমিঙ, ওরফে চম্পকশিখা ও অগ্নির কাহিনী লেখক শুনিয়েছেন। চম্পকশিখার নিজস্ব জীবনকথা আর-এক গল্প, তাও এখানে পাই।

সেই সূত্রে আমরা দ্বীপময় ভারতে ভারত-সংস্কৃতির বিজয়াভিযানের পরিচয় পাই ওয়াং ফলি ওরফে চম্পকশিখার কথায় — 'কম্বোজ, চম্পা, বালী, সুমাত্রা, যবদ্বীপে তো ভারতীয় নামের ছড়াছড়ি। এসব দেশে হিন্দুধর্ম আর বৌদ্ধধর্ম এসেছে ভারত থেকে। ভারতের ব্যবসায়ী, রাজপুত্র, পুরোহিত, বৌদ্ধভিক্ষু, দলে দলে এইসব দেশে উপনিবেশ গড়ে তুলেছেন। নতুন নতুন রাজ্যের পত্তনও করেছেন তাঁরা। অপূর্ব সব মন্দির, বিহার গড়ে উঠছে এসব দেশে। ভারতীয় স্থপতিরাই নির্মাণের কাজ করছেন। সবকিছু দেখলে তোমার মনে হবে, ছোট একটা ভারতবর্ষই যেন গড়ে উঠছে।''

এভাবেই লেখক দ্বীপময় ভারতে ভারতীয় সংস্কৃতি-সভ্যতার প্রসার দেখিয়েছেন। কনকমঞ্জরীর কাছে

চীনা চম্পকশিখার জীবনকাহিনী বিশেষ কৌতূহলপ্রদ, পাঠকের কাছেও তা-ই। তারপর পাঠক ফিরে আসে মূল কাহিনীস্রোতে — কম্বোজের ঘাটে পৌঁছবার পরে কনকমঞ্জরী আর অগ্নিহোত্রী কাহিনী, মহারাজ আর নকল কনকমঞ্জরীর কাহিনী পাশাপাশি বয়ে চলেছে, কম্বোজের রাজধানী যশোধরপুর (ওরফে আঙ্কোরথম-এ) কনকমঞ্জরীর ভাগ্যান্বেষণ শুরু হল। এই কাহিনীর সরণী বেয়ে শেষ পর্যন্ত পৌঁছে গেল তার সখী শৈলবাসিনীর কাছে। সে-ই উদ্যোগী হয়ে কনকমঞ্জরী ও রূপদক্ষের বিবাহ দিল। মহারাজ শিল্পীকে নালন্দার বুদ্ধ মন্দির নির্মাণের ভার দিয়ে ভারতে পাঠালেন। এইভাবেই পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক মেল-বন্ধন ঘটল। ইতিহাসের বাস্তব ঘটনার প্রেক্ষাপটে লেখক এই উপন্যাসে রূপ দিয়েছেন বৃহত্তর ভারতকে। এখানেই মনে পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথের 'শ্রীবিজয়লক্ষ্মী' কবিতা (যা সুনীতিকুমারের খাতায় কবি লিখেছিলেন 'যবদ্বীপ') --

> তোমায় আমায় মিল হয়েছে কোন্ যুগে এইখানে।
> ভাষায় ভাষায় গাঁট পড়েছে, প্রাণের সঙ্গে প্রাণে।
> ডাক পাঠালে আকাশপথে কোন্ সে পুবেল বায়ে
> দূর সাগরের উপকূলে নারিকেলের ছায়ে।
> গঙ্গাতীরের মন্দিরেতে সেদিন শঙ্খ বাজে,
> তোমার বাণী এপার হতে মিলল তারি মাঝে।

এর পরই আমরা লেখক চিত্তরঞ্জন মাইতির হাত ধরে চলে আসি নিকট অতীতে — মধ্যযুগের হিন্দুস্তানে — মুঘল শাসনের শেষ পর্যায়ে — খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দে। প্রথম উপন্যাস 'অগ্নিকন্যা' — সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে সতীদাহ-কাহিনী, দ্বিতীয় উপন্যাস 'শাহজাদা সুজা'।

এ দুটি উপন্যাসও লেখকের জ্ঞানসমৃদ্ধ কল্পনাসমৃদ্ধ মনের ফসল। বস্তুত বিস্তৃত অধ্যয়নলব্ধ জ্ঞান ও শিল্পপ্রেরণালব্ধ কল্পনার রমনীয় পরিণয় হয়েছে চিত্তরঞ্জনের ঐতিহাসিক উপন্যাসে।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনকাল (সিংহাসনের আরোহণ —২৪ অক্টোবর ১৬০৫ — মৃত্যু ২৮ অক্টোবর ১৬২৭) এবং শাহজাহানের শাসনামলে (সিংহাসন প্রাপ্তি ফেব্রুয়ারি ১৬২৮ ও বন্দিত্ব মে ১৬৬০) তাঁর চারপুত্রের মধ্যে সিংহাসনের জন্য রক্তাক্ত লড়াই ও শেষপর্যন্ত কূটকৌশলী নির্মম আওরঙ্গজীবের সিংহাসন-দখল (জুন ১৬৫৯) — এই পটভূমিতে যুবরাজ সুজার বাহাদুরপুর-লড়াইয়ে পরাজয় (ফেব্রুয়ারি ১৬৫৮, পরাজিত সুজার পলায়ন, শেষপর্যন্ত আরাকানে মৃত্যু মে ১৬৬০) উপন্যাসদুটি রচিত। লেখক আচার্য যদুনাথ সরকারের 'ঔরংজীব', জাহাঙ্গীরের স্মৃতিকথা দেখেছেন এবং সহজেই অনুমান করা যায় তৎকালে বিদেশী পর্যটকদের ভ্রমণরোজনামচাও দেখেছেন। ফার্সি, উর্দু, ইংরেজি ভাষায় লিখিত সুপ্রচুর তথ্যাদি সংবলিত গ্রন্থসমূহ তাঁর মতো জ্ঞানসমৃদ্ধ তথ্যনিষ্ঠ বিচারমনস্ক লেখকের দৃষ্টি এড়ায়নি বলে মনে হয়। উল্লেখ্য গ্রন্থাদি : Memoirs of Jahangir (R.A S. 1909, 1914, 2 Vols by Royers and Beveridge, 'History of Hindustan Reign of Jahangir' (Vol I, 1788, Calcutta by Gladuin) 'Pilgrimes' (Observations by travellers by Purchas, 1905) 'Early Travels in India' (by Foster 1558-1619), 'Embassay' (by Sir Thomas Rowe), 'The Travels' (By Peter Mundy) 'Anecdotes of Aurungzib and Historical Essays' (1912 by Sir Jadunath Sarkar), 'History of Aurangzib (same author, 1925) 'Shivaji & His times (Same author, 1919) Grant Duff (History of the Maharastras' 1826).

এই কালের (খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকের) ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নায়কেরা তৎকালীন পর্যটকদের দৃষ্টিতে এবং অসংখ্য নথীপত্রে, বৃত্তান্তে, রোজনামচায় পাঠকের কাছে জীবন্ত। এত তথ্য থাকার ফলে এখানেও তথ্য বিকৃতি সম্ভব নয়।

'অগ্নিকন্যা' উপন্যাসে অনিচ্ছায় সহমরণ থেকে পলায়িতা কপূরমঞ্জরীর কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গেই উঠে এসেছে কাদম্বিনীর কাহিনী। তার পাশাপাশি প্রবাহিত মীনাবাজার (মুঘল অন্তঃপুরে মেয়েদের দ্বারা চালিত)

ও জাহাঙ্গীরের মৃগয়া — মেহের উন্নিসাকে দেখে তার নেশা ও শেষপর্যন্ত তাকে লাভের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কাহিনী। অখ্যাত ব্যক্তি চরিত্রের ভাগ্যবিপর্যয়ের কাহিনীর পাশাপাশি ইতিহাসখ্যাত চরিত্রের লোভ, মৃগয়া বিপর্যয় ও সাফল্যের কাহিনীর বয়ন পাঠককে মুগ্ধ করে।

উপন্যাসের সূচনায় অনিচ্ছায় সহমরণে নীত কর্পূরমঞ্জরীর ঊর্ধ্বশ্বাস পলায়নের ছবি — সেদিনকার হিন্দু সমাজের নির্মম আচার-সংস্কারে যুপবদ্ধ নারীর প্রাণ বাঁচানোর মর্মান্তিক কাহিনী পাঠকের মর্মমূলকে বিদ্ধ করে। পুকুরের তলায় ডুব দিয়ে অনেক পরে ভেসে উঠে আঁধার প্রান্তর পেরিয়ে পালাচ্ছে — বৃষ্টিধারা, অচেনা কঙ্করময় পথ, বালুরাশি পেরিয়ে সে পালাচ্ছে। শেষরাতে মসজিদ চত্বরে আশ্রয়লাভ, ভোরে আজানের ডাকে তার ঘুম ভাঙল — সামনে ত্রাণকর্তার ভূমিকায় এক বৃদ্ধ। তাঁর কাছে কর্পূরমঞ্জরী আশ্রয় পেল।

বঙ্গদেশের গ্রাম থেকে অনেক দূরে সেইক্ষণে মুঘলরাজধানী আগ্রার প্রাসাদে মীনাবাজারে জাহাঙ্গীরের মৃগয়া — সেই লাজুক কিশোরীর নাম মেহেরউন্নিসা। সেখানে প্রাণ মৃত্যু-আকর্ষিত নয়, বরং যৌবনের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত। "আমার দিল্, আমার জান — পুষ্পিত লতার মতো কোমল হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে মেহেরউন্নিসার প্রশ্নের উত্তর দিতেন শাহজাদা।" কোথায় গরীব কর্মচারীর মেয়ে, আর কোথায় মুঘল শাহজাদা। সম্রাট আকবরের আদেশে শাহজাদাকে যেতে হল রাজপুতানায়, আর মির্জা ঘিয়াস তার কন্যার সঙ্গে শের আফগানের শাদী দিলেন, সম্রাটের আদেশে তারা চলে গেল সুবে বাংলায় — বর্ধমানে। মনের দুঃখ মনে চেপে মেহেরউন্নিসা চলে গেল। কিন্তু সম্রাট হবার পর জাহাঙ্গীর তার প্রথম যৌবনের মৃগয়া মেহেরউন্নিসাকে ছলেবলে রক্তঝরিয়ে করায়ত্ত করলেন। মেহেরউন্নিসা হল ভারতসম্রাজ্ঞী। এই ইতিহাস প্রসিদ্ধ কাহিনীর পাশে দুঃখী-মেয়ে কর্পূরমঞ্জরীর কাহিনী ডালপালা মেলেছে। আল্লার দাস বৃদ্ধ জায়গীরদার সাধুচরিত্র পয়গল খাঁর সাহায্যে কর্পূরমঞ্জরী আবার উঠে এল স্বাভাবিক জীবনযাপনের ক্ষেত্রে। তাকে পয়গল খাঁ পাঠিয়ে দিলেন টোলের পণ্ডিত গরীব রামনারায়ণ ভট্টাচার্যের বাড়ি। এক রাতে নদীপথে এসে কর্পূরমঞ্জরী পৌঁছল পণ্ডিতের বাড়ি। স্বাহা ওরফে চাঁপার সঙ্গে তার খুব ভাব হল। গল্পের মধ্যে গল্প। ফতেমাবিবির গল্প, কর্পূরমঞ্জরীর দল গঠন করে সহমরণ-অত্যাচার থেকে মেয়েদের বাঁচাবার গল্প। ডাক্তার বার্ণাডের গল্প। না, ডাক্তার বার্ণাডের গল্প রচাকথা নয়, বার্ণিয়ের ভ্রমণ বৃত্তান্তে এই ঘটনার বিবরণ পাই— মোগল সম্রাটের এক প্রিয় বেগমকে ডাক্তার বার্ণাড চিকিৎসা করে সুস্থ করে তোলেন। তারপর পুরস্কার। ডাক্তার নর্তকী কলাবতীকেই (পূর্বতন জীবনে কাদম্বিনী, কর্পূরমঞ্জরীর সখী) চাইলেন। প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সম্রাট বিদেশি ডাক্তারের হাতে সমর্পণ করলেন কলাবতীকে। লালসামন্ত দিলীপ সিংহের হাত থেকে নর্তকী কর্পূরমঞ্জরীকে বাঁচাল যাজক ইমানুয়েল। হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান — সর্বধর্মের ভালমন্দ দেখে কর্পূরমঞ্জরী ঈশ্বরের ন্যায়বিধান ও সত্যের অনুভূতি লাভ করল। আগ্রা থেকে চলে গেল খ্রিস্টধর্মান্তরিতা কর্পূরমঞ্জরী ও ললিতা। যাজক ইমানুয়েলের পুত্র গঞ্জেলো ললিতাকে নিয়ে গেল তার মার কাছে। তার সঙ্গে গিয়ে কর্পূরমঞ্জরী ফিরে পেল তার কতকাল আগে হারিয়ে যাওয়া দিদি কেতকী মঞ্জরীকে। গঞ্জেলো ও ললিতা পর্তুগাল আর বঙ্গ ধরা দিল প্রেমের বন্ধনে।

খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকের ইতিহাসনিষ্ঠ পটভূমিতে লেখক সেদিনকার রাজনৈতিক-সামাজিক-বাণিজ্যিক অস্থিরতা ও ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার মাঝে কর্পূরমঞ্জরী ও সহচরিত্রগুলির মাধ্যমে গড়ে তুলেছেন এক সাম্য-ন্যায়-প্রেমের জগৎ। সে জগৎ যতটা কল্পনাশ্রয়ী ততটাই বাস্তবাশ্রয়ী। এটাই লেখকের কৃতিত্ব।

সহমরণ নিয়ে ইতঃপূর্বে আরও দুটি উপন্যাস লিখেছেন সুশীল রায় ও কুমারেশ ঘোষ। কিন্তু চিত্তরঞ্জন মাইতি এই বিষয়টিকে তুলে নিয়েছেন এক উচ্চতর তলে — যেখানে সব হিংসা, ঈর্ষা, মাৎসর্য, অনৈক্যের অবসান ঘটে ঈশ্বরের আকাশতলে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনে।

পরবর্তী উপন্যাস সম্রাট শাহাজাহানের সিংহাসন নিয়ে চার ভ্রাতার লড়াইয়ের পটভূমিতে রচিত — 'শাহজাদা সুজা'। বস্তুত শাহজাহানের চারপুত্রের মধ্যে সবচেয়ে দুর্ভাগা সুজা। তাকে নিয়েই রচিত হয়েছে

উপন্যাসটি। রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' উপন্যাসে সুজার দুর্ভাগ্য পরিণামের কথা বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্যমান লেখক তাকে নিয়েই একটি উপন্যাস লিখেছেন। বস্তুনিষ্ঠা, ইতিহাসনিষ্ঠা ও কল্পনাগুণে তা পাঠককে টানে।

রাজমহলে সুবে বাংলার সুবাদার সুজা পিতা সম্রাট শাজাহানের লাহোরের রঙমহলে প্রতি ঋতুতে ফুলের উৎসবের অনুসরণে শুরু করেছিলেন পুষ্প-উৎসব। উপন্যাসের সূচনায় সুজার প্রাসাদে বসন্ত-উৎসবের ফুলের মেলা, রোশনাই, বেগম আর হারেমবাসিনী কাঞ্চনদের নিয়ে নৃত্যগীত, যুবরাজ সুজার পান ভোজন। উপন্যাসের শেষে আরাকানের মহারাজ সুধর্মাও মহারানীর নির্দেশে মহারাজের রানীবাগে নতুন বুলবুল গুলরুখ বানুকে জীবনযৌবন সমর্পণে রাজি না হওয়ায় ছিদ্রযুক্ত বজরায় বন্দী অবস্থায় বজরাসমেত নদীতে ডুবে মরতে হল। গুলরুখ বানু চেয়েছিল তার প্রেমিক-স্বামী সুলতান মুহাম্মদের বুকে মাথা রেখে স্বর্গ-সুখ অনুভব করতে। কিন্তু তা হল না।

যে উপন্যাসের সূচনায় ঋতুরাজ বসন্তের ফুলের উৎসব, তার শেষে প্রেমিক-বিচ্ছিন্না নায়িকার সলিল-সমাধি। এই ফ্রেমে বাঁধা পড়েছে শাহাজাদা সুজার জীবন, যা দুর্ভাগ্যতাড়িত। শক্তিমান, সুন্দর, স্বাচ্ছন্দ্যপ্রিয়, কলাবিদ্যানুরাগী, নৃত্যগীতানুরাগী এবং অবশ্যই রমণীসঙ্গসুখী সুজা মুঘল সিংহাসন পেলেন না, জীবনটাও রক্ষা করতে পারলেন না। সুজার পিয়ারী কাঞ্চনী রেশমী যদি নিজেকে বন্দী মনে করে তবে তার প্রিয় সুজাও নিজেকে বন্দী মনে করে। রেশমীর নসীব আর সুজার নসীব কি এক সূত্রে বাঁধা? মুঘল সিংহাসনের দাবীদার সুজার জীবন এক অজানা দুর্ভাগ্যের দ্বারা গ্রস্ত?

দারা, মুরাদ, আওরঙ্গজীব ও সুজা — সম্রাটের চারপুত্র। তাদের ভগিনী জাহানারার মতে, মুরাদ মনে করে তার মতো বীর ভূভারতে নেই। সুজা বিলাসপ্রিয়, উচ্ছৃঙ্খল, নিত্য অসন্তুষ্ট, দারা সর্বধর্মের প্রতি উদার মনোভাব সম্পন্ন কিন্তু পরিস্থিতি বিচারে অক্ষম, সর্বজ্ঞমনোভাব সম্পন্ন, কর্ণপাত করে না কারুর পরামর্শে, আর আওরঙ্গজীব আত্মগোপণকারী কৌশলী নির্মম, ছদ্ম-অভিনেতা, ক্রুরচক্রী। জাহানারার এই বিশ্লেষণ নির্ভুল, শেষ পর্যন্ত সিংহাসনের লড়াইয়ে আওরঙ্গজীব জিতেছে, বাকি তিনজন তার কূটচক্রে ধ্বংস হয়ে গেছে।

সুজাকে তাড়না করে ফিরেছে তার দুর্ভাগ্য। শিশ্‌মহলের কাঞ্চনমেলা থেকে শ্রেষ্ঠ কাঞ্চনী রেশমীকে নির্বাচন করেছিলেন সুজা। তাকে সুজা তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন রাজমহলে তাঁর হারেমে। কিন্তু রেশমীর জীবনে এলো পরপর বিপর্যয়, সে নিজেকে রক্ষা করতে পারল না, যেমন তার কর্তা সুজা পারলেন না নিজেকে রক্ষা করতে।

মুঘল রাজ্য-রাজনীতির কূটচক্রজাল কীভাবে সামান্য নরনারী ও যুবরাজকে এক দুর্ভাগ্যসূত্রে বেঁধে দেয়, তার নিপুণ গ্রন্থন হয়েছে চিত্তরঞ্জনের এই উপন্যাসে।

মুঘলদের নিয়ে উপন্যাস লেখায় বাঙালি উপন্যাস লেখকদের ক্ষান্তি নেই। বঙ্কিমচন্দ্রে তার শুরু। প্রমথনাথ বিশী, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, বারীন্দ্রনাথ দাশ, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ও আরো অনেকে মুঘলদের নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন, যেগুলি সাহিত্যে স্থায়িত্বের দাবীদার। ঔরঙ্গজীবের পুত্র মুহাম্মদ গুলরুখ বানুকে জয় করেছিল শস্ত্রবিদ্যা, সৌন্দর্য আর হৃদয় দিয়ে। গুলরুখকে মুহাম্মদ প্রেম-পত্র পাঠায় পারাবতের পাখায় বেঁধে— 'দূর, দূরে থাকে না / যদি ভাল লাগার স্মৃতি দিলের মধ্যে থাকে; / মেঘ ঋতু মানে না/ যদি মনের ময়ূর পেখম মেলে ধরে।' উত্তরে পারাবত উড়ে গেল গুলরুখের পত্র নিয়ে— 'আমি যদি বাতাস হতাম / তাহলে বইতাম তোমার বুকের ভেতর দিয়ে; / আমি যদি নিদ্রা হতাম/ তাহলে তোমাকে উপহার দিতাম কিছু স্বপ্ন।'

সুলতান মুহাম্মদ তার প্রিয়া গুলরুখ বানুকে নিয়ে যখন নদীবিহার করে তখন তার মনে পড়ে যায় তার দাদু বাদশা শাজাহানের পিতা সম্রাট জাহাঙ্গীরের কথা। তিনি তার প্রিয়তমা পত্নী নূরজাহানকে নিয়ে এমনি এক জ্যোৎস্নাভরা পূর্ণিমা-রাতে কাশ্মীরের হ্রদে তাদেরই মতো নৌবিহার করেছিলেন। কিন্তু জাহাঙ্গীর-নূরজাহানের নৌকাবিহার উপনীত হয়েছিল রমণীয় পরিণামে, দুর্ভাগ্য সুজা ও তার পুত্র মুহাম্মদ সেই রমণীয় পরিণামে পৌঁছল না, গুলরুখও পেল না সে সুখ, বরং আরাকান-রাজের আদেশে তার ভাগ্যে জুটল

জীবন্ত সলিল-সমাধি।

লেখকের বয়ননৈপুণ্য পাঠককে চমৎকৃত করে দেয়। মুঘলসম্রাট, যুবরাজ, তাদের পত্নী-প্রেয়সী-প্রেমিকার ভাগ্য অনেক সময়ই দুর্ভাগ্যতাড়িত। সূচনায় বসন্ত উৎসবের হিল্লোল উপন্যাসশেষে দুঃখের তরঙ্গে পরিণত। গুলরুখ যখন তার বন্দী প্রেমিক ও স্বামী মুহাম্মদের সঙ্গে মিলিত হতে পারল না, তখন সে বরণ করে নিল আরাকান রাজের কঠিন শাস্তি — জীবন্ত সলিল-সমাধি। এই ট্রাজেডি শীর্ষে উপনীত হয়েছে উপন্যাসের শেষে যখন ডুবন্ত বজরার মাস্তুলে উড়ে এসে বসল এক পারাবত। আসলে সে মহাকালের যাত্রী। এর পাখায় বাঁধা একখানি লিপি, যুগযুগান্তরের প্রেমিকের দীর্ঘশ্বাসে ভরা। —

'জাতা হুঁ দাগ্-এ হসরৎ-এ হস্তী লিয়ে হুয়ে,
হুঁ শমা-এ কুশ তহ্ দরদুর-এ মহফিল নহী রহা।'

জীবনের অপূর্ণ বাসনার ক্ষতচিহ্ন বুকে নিয়ে চলে যাচ্ছি, এক নির্বাপিত প্রদীপ আমি, মহ্ফিলে রাখার যোগ্য নই আর। এই ট্রাজিক দীর্ঘশ্বাসে উপন্যাসের সমাপ্তি। শাহজাদা সুজা ও তাঁর কন্যা গুলরুখবানুর জীবনচিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে লেখক মহাকালের বেদনাকে স্পর্শ করেছেন। এখানেই লেখকের কৃতিত্ব।

৬. দীনবন্ধু মিত্র নীলকরদের নিয়ে লিখেছিলেন 'নীলদর্পণ' নাটক। সেই শুরু। তারপর নীলকরদের নিয়ে নাটক-উপন্যাস অনেকে লিখেছেন। বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় কোনও-না-কোনওভাবে নীলকরদের নিয়ে লিখেছেন। চিত্তরঞ্জন মাইতির 'হিরণ্যগড়ের বধূ' উপন্যাসে কাহিনীর পশ্চাতপটে নীলকরদের ক্রিয়াকলাপের অস্পষ্ট ছোঁয়া আছে। সেই পটভূমিতে প্রাধান্য পেয়েছে প্রেমের কাহিনী। হিরণ্যগড়ের ছোট কুমার বাহাদুর রাজা রায় অ্যানা হেপবার্ণের সঙ্গে সিঁড়ি ভেঙে উঠে এল অন্দরমহলের শয়নকক্ষে — সেখানে জ্বলছে হীরের অঙ্গুরীয়। পর্দা সরে যায়, অতীতের একটি খণ্ডাংশ দেখা দেয় — ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের এক মধ্যাহ্ন ঝলসে ওঠে। ওডেন হেপবার্ণের নীলকুঠির উত্তরাধিকারিণী তার একমাত্র কন্যা অ্যানা হেপবার্ণ সেই নীলকুঠির বর্তমান পরিচালিকা ও অধিকারিণী।

অ্যানার জীবনকাহিনীর শুরু আরও আগে। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে ভারতের ব্রিটিশ সরকার আইন করে ইউরোপীয়দের জমি কিনে কুঠি বানাবার অধিকার দিয়েছিলেন। জমিদার দুর্লভ রায়ের আটশো বিঘা জমি কিনে তারই মাঝে ওডেন নির্মাণ করেন এই বিশাল নীলকুঠি। আজ নেই নীলকর ওডেন হেপবার্ণ। আছে দুর্লভ রায়, অ্যানা হেপবার্ণ ও দুর্লভ রায়ের ভাই রাজা রায়। এই বঙ্গদেশে থেকে গেল অ্যানা, তার পিতা ফিরে গেছে ইংল্যাণ্ডে। অ্যানা একাই চালায় তার নীলকুঠি ও নীলচাষের ব্যবসা। হিরণ্যগড়ের জমিদারেরা যেদিন থেকে নীলচাষের পত্তন করল সেদিন থেকে ওডেন সাহেবের কুঠির সঙ্গে শুরু হল প্রতিযোগিতা। এরই মধ্যে শুরু ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত, দলাদলি নীলকরে নীলকরে।

রাজা রায় অ্যানা হেপবার্ণের কাছে গল্প শুনছে — নীলকুঠিকে ঘিরে চক্রান্তের গল্প, অত্যাচারী ফলমন সাহেবের গল্প। ফলমনের লোভ-লালসা-অত্যাচার-নিপীড়নের বিরুদ্ধে যখন কেউ দাঁড়াতে পারছিল না তখন অ্যানা-ই সাহস করে প্রতিরোধ করেছিল। ফলমনকে অ্যানা শেষ পর্যন্ত গুলি করেছিল।

অ্যনা মাঝে মাঝে নদী পার হয়ে নৌকা করে রাতে এসে ভেড়ে রাজা রায়ের জলমহলে। অ্যানার কাছে রাজা শোনে অনেক গল্প। রাজা রায়ের সুরের টান মেশে অ্যানার হৃদয়ের তানের সঙ্গে। নদীর উপর ঝুঁকে পড়া জালি-ঘেরা বারান্দায় বসে অ্যানা, তদগত চিত্তে শোনে রাজা রায়ের কণ্ঠে ঠুংরির মিঠে টান — 'নদীয়া বৈরী হো রাম / সৈঁয়া রহে ওহী পার / গহ্রী নদীয়া নাওয়া পুরানি / অব্ ক্যায়সে উতরুঁ পার রে —'

গান শুনে মুগ্ধ হয়ে যায় অ্যানা। এক প্রিয়সঙ্গবিধুরা নারীর দীর্ঘশ্বাস ঠুংরির সুরে ছাড়া পায় — সামনে বইছে দুস্তর নদী — নৌকাখানাও জীর্ণ। এ অবস্থায় নদীর ওপারে প্রিয়ের সঙ্গে সে কেমন করে মিলিত হবে। আজ এই নদীই হলো তার বৈরী।

অ্যানা আর রাজা রায় গানের আলোচনায় মত্ত হয়ে ওঠে। তৎকালের পরিস্থিতির সঙ্গে গানের মিলটি লক্ষণীয়। অ্যানা আর রাজা মিলবে কী করে? ঘাট ছুঁয়ে বইছে বৈরী নদী। অ্যানার বৈঠার ঘায়ে একসময় নৌকা দূরে চলে যায়, রাজা রায় গুন গুন করে গান ধরে — নদীয়া ধীরে বহনা মেরা সৈঁয়া উৎরঙ্গে পার

রে —'

মৈত্রেয়ী ওরফে মেরীর কাছে অ্যানা হেপবার্ণ তার জীবনের অনেক কাহিনী শুনিয়েছিল, উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল — কেমন করে সে নিজেকে রক্ষা করবে নেকড়েদের হাত থেকে। আনা তার গুরু ভট্টাচার্য মশাইয়ের কাছে পাঠশেষে কুঠিতে ফেরার পূর্বে প্রণাম করে যেত। পণ্ডিতমশায় পড়াতেন শাস্ত্র অলঙ্কার কাব্য, পড়াতেন অভিসারিকা রাধার কথা। কেমন করে রাধা সব বিপদ পেরিয়ে যায় কৃষ্ণের কাছে। অ্যানা মনে মনে ভাবে, কেমন করে সব বাধা-বিপদ দূর করে রাজা রায়ের কাছে পৌঁছবে। জলসাঘরের ঝিলের ধারে বাঁধা রাজা রায়ের নৌকায় উঠে অ্যানা যায় রাজার কাছে, সেখানে রাজা গান ধরে — পিয়া নহী আয়ে/ বহুত দিনন বিতি / জবসে গয়ে মারী / শুধাহু ন লীনী / চৈন নহী জিয়ারা মেরা।

সেই গানের কথা মনে করেই অ্যানা পৌঁছে যায় রাজা রায়ের কাছে।

হিংস্র নেকড়ের দল অ্যানার বিরোধী নীলকর সাহেবেরা অ্যানার বিরুদ্ধে আদালতে খুনের অভিযোগ এনেছিল। কিন্তু তা প্রমাণ হল না, বরং প্রমাণ হল, আত্মরক্ষার জন্য গুলি চালাতে বাধ্য হয়েছিল অ্যানা। হেরে গেল নেকড়ের দল, হেরে গেল রাজা রায়ের দাদা। ফলমনের হত্যাকারী বলে অ্যানাকে শাস্তি দিতে না পারায় দুর্লভ রায় হতাশায় ভেঙে পড়লেন।

আর কোনও বাধা নেই মিলনের। রাজা রায়কে আমন্ত্রণ জানাল অ্যানা — তোমাকে দেব আমার সবসেরা রত্ন। তা হল হীরক অঙ্গুরীয়। আজ সেটাই দিলাম। সেই হীরক অঙ্গুরীয়-পরিহিতা সালঙ্কারা মৈত্রেয়ীকে। তোমার পক্ষে এই শ্রেষ্ঠ উপহার — হিরণ্যগড়ের বধূ।

প্রেমের আত্মদানে প্রেমের সার্থকতা — অ্যানা হেপবার্ণ তার জীবনে এটাই প্রমাণ করে বিদায় নিল। নীলকুঠির পটভূমিতে এই অসামান্যা নারীর অসামান্য সার্থত্যাগে উজ্জ্বল হল হিরণ্যগড়। এখানে ইতিহাস বিকৃত নয়, বস্তুনিষ্ঠ, কিন্তু প্রধান নয়, তা প্রেমের আত্মত্যাগের মহান পটভূমি।

শতাব্দীর সিঁড়ি বেয়ে, না লিখে লেখা উচিত, সহস্রাব্দের সিঁড়ি বেয়ে প্রবাহিত চিত্তরঞ্জন মাইতির ঐতিহাসিক উপন্যাস-তটিনী।

আমাদের চেনাকালের — আধুনিক কালের সূচনা লগ্নে — আঠারো আর উনিশ শতকের পটভূমিতে ইতিহাসাশ্রিত ঘটনাবলীও লেখকের বর্ণসম্পীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ব্রিটিশ শাসনের সূচনাকালে সুবে বাংলার দুটি বড় ঘটনা — বাংলার বিখ্যাত তাঁত শিল্পের ধ্বংস সাধন আর ঠগী দমন। প্রথমটির জন্য আমরা ব্রিটিশ-শাসনকে ধিক্কার দিই, দ্বিতীয়টির জন্য সাধুবাদ।

কিন্তু অত সরল হিসাবে ইতিহাসের পাওনা মিটিয়ে দেওয়া যায় না।

বাংলার তাঁতশিল্পের খ্যাতি প্রাচীনযুগে ছড়িয়ে পড়েছিল য়ুরোপ-খণ্ডে। মধ্যযুগেও তা অব্যাহত ছিল। ব্রিটিশ শাসনামলে তা ধ্বংস হল।

ব্রিটেনের কলের বস্ত্র-বিপণনের জন্য বণিক তথা শাসক ব্রিটিশ বাংলাব তাঁতশিল্পীদের উৎখাত করে। এই সাদামাটা কাহিনী লেখকের বিন্যাস নৈপুণ্যে পেয়েছে রক্তমাংসের জীবন।

বস্তুত 'সাঁঝের শিশির' ইতিহাসাশ্রিত কাহিনীতে লেখক আমাদের পৌঁছে দেন অনতি অতীত বঙ্গে যেখানে তাঁতশিল্পের কেন্দ্রগুলিকে ধ্বংসের আয়োজন করেছিল ব্রিটিশ শাসক।

লক্ষ্যা নদীতীরে প্রতি শুক্রবার তাঁতবস্ত্রের হাট বসে। সেই হাটের উপর ব্রিটিশ বণিক-শাসকের লোভের দীর্ঘছায়া পড়ে। সূক্ষ্ম মসলিন বস্ত্রের কেনাবেচা হয়। এবং প্রতি হাটেই ঠকে যায় তাঁতীরা। এই হাটের তাঁতিদের দুর্ভাবনার ছবিটি লেখক অনায়াস নৈপুণ্যে এঁকেছেন। —

"অনেক সময় খাটুনির তুলনায় মজুরী পোষায় না তাদের, তবুও তৈরি মাল ছেড়ে দিতে হয়।" ফড়েদের সর্দার সদাশিবের নতুন কথা শুনে তাঁতিরা অবাক হয়। সাহেবের এদেশীয় নায়েবের আবির্ভাব ঘটল। বজরা নিয়ে তার আগমন তাঁতিদের খুব শুভঙ্কর নয়। মাঝে মাঝে বড় বড় শহর থেকে আড়তদাররা আসছে। তাদের পছন্দমতো বস্ত্র বুনতে হবে। সদাশিবের কথায় প্রকাশ পেল আশংকা — "লাক্ষার বাজার উঠল, এখন ব্যবসা গুটোও, আসমানে মাকু ছোটাও। নবাবরা আর মিহি কাপড় পরবে না। সাহেবসুবোর জন্যে মোটা থান কাপড় তৈরি করতে পার তো কর।" সদাশিবের এই কথা শুনে তাঁতিরা আতঙ্কিত।

পুরুষানুক্রমে তারা মসলিন তৈরির কাজে যে দক্ষতা দেখিয়ে এসেছে, তা ছিল তাদের গৌরব, সম্মান ও সম্পদের হেতু। সাহেবদের কথায় যদি মোটা কাপড়-ই তৈরি করতে হয়, তবে আর রইল কী?

গ্রামে গ্রামে রটে গেল এই অশুভ বার্তা। সাহেবরা আর তাদের নায়েব গোমস্তাদের এই চক্রান্ত গোড়ায় তাঁতিদের অসহযোগিতায় বাধা পেল। কিন্তু সাহেবরা তাঁতিদের কেবল জাতে নয়, ভাতে মারার ব্যবস্থাও করল। তারই নিপুণ কাহিনী 'সাঁঝের শিশির'।

সর্বনাশের অন্যদিকের ছবি ভানুমতী। তার বাবা নেই, মা নেই, আছে কেবল শুভার্থী বেন্দাবনদা। যে ভানুমতীর বোনা মিহি সুতোর বাণ্ডিল লাক্ষ্যার বাজারে বেচতে যায়।

ভানুমতী বা তার সখী মঞ্জরীর জীবন ও জীবিকা মিহি সুতো তৈরী। তারই সুন্দর বর্ণনা— 'ভানুমতী দাওয়ায় বসল তুলো ধুনতে। মুগার তৈরি ধনুকের ছিলাটি অদ্ভুত একটানা একরকম শব্দ করে চলল। হাওয়ায় ভেসে হালকা কুয়াশার রাশ যেন জড়ো হচ্ছে ওপারে। দোয়া দুধের ওপরে সদ্য জমে ওঠা ফেনার মতো কোমল মসৃণ আর সাদা সেগুলো। ....এই ধনুকের ছিলার শব্দটা ভানুমতীকে কেমন যেন আচ্ছন্ন করে ফেলে। মাঝে মাঝে সে থেমে যায়, কিন্তু তার কান থেকে মুছে যায় না সেই আশ্চর্য শব্দের রেশ।

সে ছবি দেখে তার ধনুক থেকে মিহি মিহি তুলোর রাশ উড়ে চলেছে আকাশে। সোনালি রোদ্দুর তাদের গায়ে পড়ে ঝিলমিল করে উঠছে।''

ভানুমতী আর শত শত তাঁতির সেই স্বপ্ন কীভাবে ব্রিটিশ বণিক-শাসকের ষড়যন্ত্রে আর পীড়নে বিনষ্ট হয়ে যায়, তারই আলেখ্য 'সাঁঝের শিশির'। লেখকের গল্প-বুনট আর কথনের নৈপুণ্য পাঠককে টেনে নিয়ে যায়। একটি অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কীভাবে বিনষ্ট হয় বাংলার তাঁত শিল্প তা আমরা জেনে যাই ভানুমতীর মতো মেয়েদের প্রাত্যহিক সুখদুঃখের কথায়। ভানুমতীর মতো স্বপ্ন দেখে তার ঘরের আগন্তুক। চরকায় মিহি সুতো কাটাতেই সে আনন্দ পায়। ভানুমতী তাকে নিয়ে সুতোর মসলিন বুনতে চায়, মনের মসলিনও বুনতে চায়। কিন্তু সেই আগন্তুক সোমেশ্বর আর ভানুমতীর স্বপ্ন ভেঙে যায় সাহেবদের চক্রান্তে।

ইতিহাসাশ্রিত এই কাহিনীতে রূপায়িত বাংলার তাঁতিদের সুখ-দুঃখ।

অনতি অতীতের আর-একটি ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস 'ফুলমতিয়া'। এই ছোট উপন্যাসটির পটভূমি ঠগী-অধ্যুষিত মধ্যভারত। একদিকে বুন্দেলখণ্ড আর বাঘেলখণ্ডের জমিদারেরা সংঘবদ্ধ, অপরদিকে ব্রিটিশ সরকার শক্ত হাতে ধরেছে টলটলায়মান ভারত রাষ্ট্র তরণীর হাল। স্বাভাবিকভাবেই জমিদারশ্রেণী হাত মেলাল হিন্দুস্তানের নতুন প্রভু ব্রিটিশরাজের সঙ্গে। সেই পটভূমিতে এক অসামান্য তেজস্বিনী নারী ফুলমতিয়ার কাহিনী। তার বিদ্রোহ রক্তচোষা সামন্ততান্ত্রিক জমিদারশ্রেণীর বিরুদ্ধে। এই শ্রেণীর পীড়ন লালসার শিকার হয়েছে ফুলমতিয়ার মতো অসংখ্য নারী। রামখিলাওনের মতো সংখ্যাহীন গরীব পুরুষ। আর অত্যাচারী লম্পটের ভূমিকায় আছে শামসের। সামন্তশ্রেণী, বর্ণাভিমাণী হিন্দু মুসলমান, ভূস্বামী ও ব্যবসাদার শ্রেণীর দ্বারা নির্যাতিত ভারতের নিচুতলার রমনী পুরুষ। শতাব্দীর পর শতাব্দী চলছে এই পীড়ন ধর্ষণ অত্যাচার। এরই বিরুদ্ধে ফুলমতিয়ার লড়াই। ফলমতিয়ার মতো অসহায় দুর্বল যুবতী নারীকে শমসের সিং দখল করেছে, তার জলসাঘর ও অন্দরমহলে তুলে এনেছে — এই কাহিনী আমাদের অতিপরিচিত। লেখক সেই পরিচিত কাহিনীতে নতুনত্ব এনেছেন ফুলমতিয়ার সাহসিকতা, বিদ্রোহ আর হার না মানা মনোভাবের আলেখ্যের মাধ্যমে।

দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে এই ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস। এর পথের বাঁকে বাঁকে উত্তেজনা রোমাঞ্চ লড়াই। পদে পদে চমক। যে ফুলমতিয়া ইচ্ছামতো ঘর বাঁধতে পারেনি, শমসের সিং-এর মতো লম্পট জমিদারের দ্বারা উপভুক্ত হয়েছে, সে-ই ফুলমতিয়া শমসের সিং-এর হারেম থেকে পালিয়ে এসে শুরু করেছে নতুন জীবন। পিছনে ফেলে এসেছে তার শিশুপুত্র গুলাবকে যার জনক ওই অত্যাচারী শমসের। কিন্তু ফুলমতিয়া নতজানু হয়ে ললাটের লিখন মেনে নেয়নি, পরন্তু লড়াই দিয়েছে। সে গড়ে তুলেছে এই বাগীদল, ঠগীর দল।

''ঝড়ের মুখে খবর উড়ল দিকে দিকে — এক আশ্চর্য যাদুকরী সারা অঞ্চল জুড়ে তার যাদুর খেলা

দেখিয়ে চলেছে। এই মুহূর্তে সবাইকে বিস্মিত করে দিয়ে সে চোখের সামনে এসে হাজির হচ্ছে পরমুহূর্তে পলক ফেলতে না ফেলতেই সে অদৃশ্য। কখনও সাদা একটা ঘোড়ায় চড়ে ঝকমকে তলোয়ার উঁচিয়ে সে চিৎকার করে এসে দাঁড়াচ্ছে জমিনদার আর শেঠদের সামনে, কখনও-বা দেখা যাচ্ছে কালো পোশাকে সর্বাঙ্গ ঢেকে কালো ঘোড়ায় চেপে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে দিগন্তে।

ফুলমতিয়া ঠগীর দল গড়েছিল, তারপর নিজেই সে দল ভেঙে দিল। আর অন্যান্য ঠগীদের, ঠ্যাঙাড়েদের অত্যাচার দমনে এগিয়ে এল।

ফুলমতিয়ার দুষ্টের দমনকারী, শিষ্টের পালনকারী-রূপটি লেখক যত্নের সঙ্গে গড়ে তুলেছেন। আসলে পুরুষশাসিত সামন্ততান্ত্রিক যে ভারতীয় সমাজ, তারই বিরুদ্ধে ফুলমতিয়ার লড়াই। সে লড়াই চমকপ্রদ রোমাঞ্চকর। তার যাদুকরী নামটা প্রচারিত হল সর্বত্র। লোকের মুখে মুখে ফিরতে লাগল নামটা! নামের সঙ্গে একদিকে মিশে রইল ভক্তি, অন্যদিকে ভয়। অনুর্বর পাথুরে প্রান্তরে, নর্মদা-তীরের বনভূমিতে, জমিদার-জোতদারদের মঞ্জিলে অতর্কিতে হানা দেয় যাদুকরীর দল। ছত্রভঙ্গ করে দেয় অত্যাচারী জমিদারের বাহিনীকে। ভূপাল, বিদিশা, ছত্তরপুরের পথে প্রান্তরে অরণ্যে পাহাড়ে যে ঠগীদের দল লুণ্ঠন চালায় ঘটনাক্রমে ফুলমতিয়া তার নেত্রী হয়ে দাঁড়াল। আবার সে-ই ঠগীদের দল ভেঙে দিল। তার স্বপ্ন, তার ঈপ্সা, তার জননী হৃদয়ের বেদনা কীভাবে আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছল, তারই কাহিনী এই উপন্যাস। কীভাবে ফুলমতিয়া ওরফে গুলাবী উদ্ধার করল তার সন্তান গুলাবকে, তারই আবেগমথিত কাহিনী এই উপন্যাস। পাঠকের চোখের সামনে লেখক কুশলতার সঙ্গে উন্মোচিত করেন এক ইতিহাসাশ্রিত জীবনকাহিনী, যা হাসিতে অশ্রুতে শোণিতে প্রতপ্ত আবেগে ভরপূর।

চিত্তরঞ্জনের ঐতিহাসিক উপন্যাসের আলোচনার শেষ পর্যায়ে আমরা উপনীত। তাঁর সাম্প্রতিকতম ঐতিহাসিক উপন্যাস, 'শনিচারি'। সারান্দা জঙ্গলের পটভূমিতে আদিবাসী ও ইংরেজদের সংঘর্ষ। আদিবাসীদের স্বাধীনতা ও সম্মান রক্ষায় উঠে এসেছে এক নারী — শনিচারি। তাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে এই উপন্যাস। হাসপাতালের ডাক্তার জনসনের জবানবন্দিতে আমরা এই অসামান্যা বিদ্রোহিনীর ক্রিয়াকলাপ জানতে পারি। সে কেবল আদিবাসীদের হৃদয়ের রানী, নেত্রী নয়, সে জঙ্গলবাসীদের লড়াইয়ে সেনাপতি। তাকে আদিবাসীরা শ্রদ্ধা করে, শ্রদ্ধা করেন ডাক্তার জনসন। তিনি জেনেশুনেই বিপদ বরণ করেছেন। আহত শনিচারি ও তার সঙ্গীকে গোপনে আশ্রয় দিয়ে, চিকিৎসা করে, আরোগ্যদান করে, আহার দিয়ে, আর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য কর্মচারীদের কাছ থেকে তাদেরকে লুকিয়ে রেখে। কেবল চাকুরি খোয়ানো নয়, প্রাণ সংশয় হতে পারে জেনেও ডাক্তার জনসন এই ঝুঁকি নেন। তাঁর জবানীতে শুনি এই কাহিনী।

সিংভূমের সারান্দা ফরেস্টে কোনও পর্যটক এলে আচ্ছন্ন হয়ে যাবে বিচিত্র অনুভূতিতে। সাতশোটি পাহাড় সারান্দা নাম নিয়ে সবুজ অরণ্যের পোশাক পরে দক্ষিণ পশ্চিম থেকে উত্তরপূর্বে চলে গেছে। একদিকে উঁচু পাহাড়, অন্যদিকে পাহাড়ী বন। মাঝে সরু পথ। পাহাড়ের গায়ে আদিম অরণ্য। শাল, হেসেল, বীজা, শিমূলের ঘনবসতি। কুইনারেঞ্জ ধরে লতাগুল্মে সমাচ্ছন্ন সারান্দা বনভূমির অপ্রশস্ত পথ ধরে নেমে এলে পাওয়া যাবে কোয়েল নদী। নদী পেরিয়ে চলতে থাকলে পাওয়া যায় 'ছোটনাগরা' নামে পাহাড়ঘেরা আদিবাসী গ্রাম। আদিবাসী হো-দের ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর। সেগুলি পেরিয়ে এগোলেই পাওয়া যাবে পাথর-গড়া মন্দির আর ইঁটের তৈরি ভাঙাগড়ের ধ্বংসস্তূপ। আরো এগিয়ে গেলে শাল মহুয়া ঘেরা পরিচ্ছন্ন জমি। সেখানে কয়েকটি বাংলো টাইপের ঘড়ো ঘর। একটির ওপরে সাদা রঙ করা ক্রশ। চার্চ খ্রিস্টধর্মের চিহ্ন। একটু দূরেই চার্চের সামনে বাঁধানো বেদির ভেতরে ঈষৎ উঁচু মঞ্চ। ওই মঞ্চ আদিবাসী 'হো'দের 'আদিং'। ওর ভেতরে রাখা আছে কোন আদিবাসীর আত্মা। এখানেই দেখা হবে এক বৃদ্ধ পাদ্রির সঙ্গে। তিনি চার্চের ভেতর থেকে একটি জীর্ণ পুঁথি হাতে তুলে দেবেন। সেটিই 'ডাক্তার জনসনের ডায়েরি'। অজানা অরণ্যের মানুষের সাহসের, সংগ্রামের, আত্মসম্মানের, আত্মত্যাগের ইতিহাস — আদিম অরণ্যের বিচিত্র প্রাণরহস্যের ইতিহাস ওই ডায়েরি।

ওই শাল-মহুয়া-কেঁদ-হেসেল-শিমূলে ভরা, দিনে অজস্র পাখির কাকলি আর হরিণের ডাকে মুখরিত। সন্ধ্যার পরে নানা পোকার একটানা ঝিঁঝি-ধরা ডাকে স্পন্দিত এক অজানা জগতের দুয়ার খুলে দেয় ওই ডায়েরি।

এমনভাবেই — কবিত্ব আর রহস্য — প্রকৃতির আনন্দ ও সরল হো-দের মাদলের শব্দে ভরা জগতে একদিন যে রক্ত ঝরানো লড়াই হয়েছিল তারই সাক্ষী হয়ে ছিলেন ডাক্তার জনসন। জামদা থেকে ঘোড়ায় চড়ে ডাক্তার ফরেস্ট রেঞ্জার হাডসনের সঙ্গে পৌঁছেছিলেন কুমডি বাংলোয়। প্রকৃতির রুদ্র ভয়াল রূপ দেখলেন গ্রীষ্মে, পলাশ শিমূল মহুয়ার গন্ধে মাতাল-করা বসন্তের রূপ দেখলেন চৈত্রে, আর বর্ষায় দেখলেন প্রকৃতির অঝোর বৃষ্টিঝরা রূপ। সরকারি রিজার্ভ ফরেস্টের ডাক্তারের চাকুরি নিয়ে তিনি এসেছিলেন। কেবল প্রকৃতি আর তার কোলের সন্তান হো-মুণ্ডা-শবর-সাঁওতালদের দেখলেন; হো-মুণ্ডা-সাঁওতালদের জন্মগত অরণ্যের অধিকার ফিরে পাবার সংগ্রামে অজান্তে জড়িয়ে পড়লেন। এই আদিবাসীদের নিয়ে লিখেছেন সুবোধ ঘোষ, মহাশ্বেতা দেবী। লিখেছেন চিত্তরঞ্জন মাইতি। ঊনবিংশ শতাব্দের শেষ প্রহরে ১৮৯৮-৯৯ খ্রিস্টাব্দে কুমডি-জামদা-কেন্দ্রিক অরণ্য অঞ্চলে হো-দের অরণ্যের অধিকার ফিরে পাবার লড়াইয়ের শরিক হয়ে গিয়েছিলেন ডাক্তার জনসন। তারই আশ্চর্য কাহিনী, আনন্দবেদনা মিশ্রিত কাহিনী, এই উপন্যাস।

এই অধিকার ফিরে পাবার জন্য যে আদিবাসী সম্প্রদায় লড়াই করেছে, তার নায়িকা শনিচারি, — একটি মেয়ে, যার প্রাণশক্তি অগাধ, সাহস অপরিমেয়, নেতৃত্বদানের ক্ষমতা জন্মগত, মাধুর্য সর্বপরিব্যাপ্ত। তাকে তার সম্প্রদায়ের ছেলে বুড়ো মেয়ে বুড়ি, কে না মানে!

ফরেস্ট রেঞ্জার হাডসনের কাছ থেকেই ডাক্তার জনসন জানতে পারলেন ব্রিটিশ সরকার একদল মিশনারীকে সারান্দা ফরেস্টে পাঠাচ্ছে আদিবাসীদের মধ্যে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য। এখানেই সংঘাতের সূচনা। সুবোধ ঘোষ ও মহাশ্বেতা দেবীর গল্প-উপন্যাসে সংঘাতের সূচনা এভাবেই হয়েছে। চার্চ স্থাপনের সূত্র ধরে এল পাদ্রি পিটর (হাডসনের পত্নীর পূর্বপ্রণয়ী) — আদিবাসীরা চাক্ আর না চাক্, সাসাংদাতে তৈরি হতে যাচ্ছে একটি চার্চ।

বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের অরণ্য-ডায়েরিতে পাঠক বারবার পেয়েছেন বনভূমি থলকোবাদের কথা। সেখানে গিয়ে আমাদের এই কথাশিল্পী সাধক বিভূতিভূষণ অরণ্যের মহান মৌন রূপের সামনে বসে থাকতেন। সেই থলকোবাদ — অরণ্যে গড়ে উঠেছে ডাক্তারের হাসপাতাল। একদা ঘোড়ায় চড়ে কুমডি বাংলোর দিকে যাবার পথে ডাক্তার অরণ্যের রূপে অভিভূত হলেন। কাঞ্চন-টেকোমা-আরাবা গাছে ফুলের সমারোহ। সেই ঝাঁকে ঝাঁকে অজস্র পাখি। শীতের দুপুরে অরণ্যের সেই রূপ ডাক্তারকে মুগ্ধ করেছিল। ডাক্তারের চোখের সামনেই একটি চিতা এক আদিবাসীকে আক্রমণ করল। তীরধনু নিয়ে লোক এসে পড়ায় বাঘ পালাল। আহত মানুষটাকে ডাক্তার নিয়ে এলেন তাঁর হাসপাতালে। এভাবেই অরণ্যের রুদ্ররূপ আর আদিবাসীদের সঙ্গে ডাক্তারের পরিচয় ঘটল।

থলকোবাদ অঞ্চলে প্রধান আদিবাসী সম্প্রদায় হো। তাদের মধ্যেই ডাক্তারের সেবাকর্ম। সেদিনের বাঘের হাত থেকে যাকে ডাক্তার বাঁচিয়েছিলেন, এক সকালে সে এসেছে গ্রামের সরল মানুষদের নিয়ে ডাক্তারকে কৃতজ্ঞতা জানাতে, সঙ্গে ফুল মুরগী আর খরগোস। ডাক্তারসাহেবকে তারা দেবতা বলে জানল। কিন্তু পরিস্থিতি শান্ত থাকল না। 'বনকাটা নিষেধ' যেদিন হো-রা অমান্য করল সেদিনই ব্রিটিশ পুলিশ-আর্মি এগিয়ে এল। থলকোবাদ, বরাইবুরু, ছাতমবুরু পাহাড়, গুয়া — সর্বত্রই এসে গেল পুলিশ আর আর্মি। কেবল কাঠকাটার অধিকার, অরণ্যের অধিকার চাই — এই দাবি নিয়ে সংঘবদ্ধ হল হো-সম্প্রদায়। তাদেরই নেত্রী রাজকুমারী শনিচারি। আদিং-এ হো-দের পূর্বপুরুষদের আত্মা বাস করে। তাকে পূজা না দিয়ে জোর করে খ্রিস্টান বানাবার চেষ্টায় জ্বলে উঠল অশান্তির আগুন।

রোগীর চিকিৎসা আর অরণ্যের রূপসন্ধানে শান্তিতে জীবন কাটাতে পারলেন না ডাক্তার জনসন। কেন সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার বিদ্রোহী হো-দের চিকিৎসা করবে, এ নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর

বিরোধ বাধল। বসন্তের লালরূপ ছেড়ে সাবান্দা বর্ষায় হবিৎ-রূপ নিল। কোয়েল আব কারো নদীতে বন্যা এল। মাদলের দ্রিম্-দ্রিম্ শব্দে বসন্তের আগমন সূচনা না করে বিদ্রোহের, সংগ্রামের সূচনা করল। এমনি মুহূর্তে ডাক্তার বিদ্রোহী হো-দের নেত্রী শনিচারির দেখা পেলেন। আক্রান্ত হল গীর্জা সাসাংদাতে। কিন্তু তার সূচনা হয়েছিল শাসক ব্রিটিশরাজের কাজে — হো-দের দেবতা সিংবোঙ্গা আর মারঙবোঙ্গার আস্তানা ছিল ছাতমবুরু পাহাড়ে — ব্রিটিশ সরকার সেখানে আকরিক লোহার সন্ধান পেয়েছিল। দেবস্থানে বসল পুলিশ। আহত হল হো-দের ধর্মবিশ্বাস। তখনি জ্বলে উঠল অসন্তোষের ধূমায়িত আগুন। তারপর থেকে আর কোনও বাঁধ রইল না। পুলিশ-আর্মি-ফরেস্ট রেঞ্জারদের পরিকল্পনা ছিল গ্রীষ্মে যখন বনে আগুন লাগবে তখন তা নেভাবার কোনও চেষ্টা করা হবে না। মরুক পুড়ে আদিবাসী। আগুনে পোড়া রোগীদের ডাক্তার চিকিৎসা করতে চাইলেন। কড়া সরকারি নির্দেশ এল, তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা যাবে না। এই হল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন দমননীতি। ডাক্তার তা মানতে রাজি হলেন না। সরকার ঘোষণা করল আগুনে-পোড়া রোগীকে যারা হাসপাতালে বয়ে আনবে তারা শাস্তি পাবে। মানুষের প্রতি মানুষের নির্মমতায় ডাক্তার ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি রাতে গোপনে পাহাড়ি গ্রামে গিয়ে রোগীদের চিকিৎসা শুরু করলেন। সেদিন থেকে তিনি হয়ে গেলেন আদিবাসী-বন্ধু। ডাক্তার তাঁর থলকোবাদ-হাসপাতালে চেনাশোনা কোনও ইংরেজ বা সান্ত্রীকেও রাখেননি। তারা থাকলে রাতে চিকিৎসার প্রয়োজনে আদিবাসীরা না আসতে পারে। অথচ রাতেই তারা আসে চিকিৎসা করাতে। ডাক্তার এবার জানতে পারলেন, বিদ্রোহীদের নেত্রী রাজকুমারী শনিচারি।

অবশেষে শনিচারির সঙ্গে ডাক্তার জনসনের দেখা হয়ে গেল। যেসব বিদ্রোহী আদিবাসী সরকারের কাছে নতি স্বীকার করবে, সরকার তাদের খাদ্যের ব্যবস্থা করবে। ধীরে ধীরে ক্ষুধার্ত মানুষ আসতে লাগল। কিন্তু নেত্রী শনিচারির সন্ধান দিলে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার সরকার দেবে — এই ঘোষণার কোনও ফল হল না। নেত্রীর প্রতি তাদের আনুগত্য দেখা গেল, ইনফরমার-স্বামীকে ছোরা মেরে হত্যা করে এক আদিবাসী যুবতী নিজের বুকে ছোরা বসিয়ে দিল।

শেষ পর্যন্ত এক মার্চের রাতে চাঁদের আলোয় শনিচারি এল ডাক্তারের জীবনে। গাছের আড়ালে আলো-আঁধারে কে যেন পাহাড় ধরে উঠে আসছে — ডাক্তার ছুটে গেলেন। পা দিয়ে প্রচুর রক্তপাত হচ্ছে। সামনে দাঁড়িয়ে আছে শনিচারি। ডাক্তার তাকে হাসপাতালে নিয়ে এলেন। পায়ের ভেতর দিয়ে ব্রিটিশ সৈন্যের গুলি চলে গেছে। ডাক্তার তার চিকিৎসা করে ডিসপেনসিং রুমে তাকে লুকিয়ে রাখলেন। ২৩ মার্চ থেকে ১১ এপ্রিল — শনিচারি ডাক্তারের ডিসপেন্সিং রুমেই ছিল। ডাক্তার তার কাছ থেকেই হো-দের লড়াইয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষার সাফল্য-ব্যর্থতার কথা জানতে পারলেন। কিশোর বামিয়ার তার প্রতি গভীর ভালবাসা, হো-দের তার প্রতি অন্ধ আনুগত্য। তার পাশাপাশি চলেছে ব্রিটিশ সরকারের অকথ্য অত্যাচার। খুঁজে খুঁজে হো-দের কুঁড়েঘরে আগুন লাগিয়ে তাদের আশ্রয়-হারা করে দিচ্ছে।

আশ্রয়চ্যুত ক্ষুধার্ত দেশবাসীকে যদি রক্ষাই না করা যায়, তবে নেতৃত্ব দিয়ে লাভ কি — ডাক্তারকে একথা শুধিয়েছে বিদ্রোহী-নেত্রী শনিচারি। 'অনেক ভেবে দেখেছি, যাদের রক্ষা করার ক্ষমতা নেই, তাদের শুধু ধ্বংসের ভেতর ঠেলে দেবার কোনও অধিকার নেই। আমি ওদের দুর্ভিক্ষের সময় খেতে দিতে পারিনি, তাই শুধু উত্তেজনার সৃষ্টি করলে কোনও ফলই ফলবে না।' — নেত্রীর এই স্বীকৃতি ডাক্তার জনসনকে ভাবিয়েছে। ডাক্তার চিকিৎসা করে তাকে সুস্থ করে তুলতে চান, কিন্তু নিজের সুস্থতায় শনিচারিব আগ্রহ নেই, যদি না তার সম্প্রদায়কে সে বাঁচাতেপারে। সেই জ্যোৎস্নারাতে ডাক্তারের হাত ধরে শনিচারি পাহাড়ের পথে কষ্ট করে ধীরে ধীরে উঠতে লাগল। তারপর নিচের দিকের পথ বেয়ে এক স্থানে এল, যেখানে কেবল ছাইয়ের স্তূপ — ব্রিটিশ সরকার আগুন দিয়ে হো-দের গ্রাম পুড়িয়ে দিয়েছে, আছে কেবল ছাই। শনিচারি সেখানে অনেকক্ষণ প্রার্থনা করল। এইখানেই বনদেবতা 'জায়েরা' তার কিশোর অনুগামী সংগ্রামী বামিয়াকে রাতের আশ্রয় দিত। রাতের আঁধারে আঙুল তুলে ডাক্তারকে শনিচারি দেখাল, ওই দূরের পাহাড় দুটির নিচে উপত্যকায় আমার জন্মস্থান। তার কত দিনের কত খেলার আশ্রয়। দূর থেকে

ভেসে আসা মাদলের শব্দের সুরে সে সুর মিলিয়ে গুন্‌গুন্ করে গান করল। জ্যোৎস্নাধোয়া আকাশের নিচে আপনমনে ঘুরল, খোঁপায় ফুল পরল, তারপর ফিরে এসে ডাক্তারের সঙ্গে আহার সেরে নিল। দেখে মনে হয়, তার চোখেমুখে তৃপ্তি উপচে পড়ছে। ডাক্তারকে ঘুম পাড়িয়ে সে নিজের ঘরে চলে গেল।

একটা ভারী জিনিস ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ার শব্দে ডাক্তারের ঘুম ভেঙে গেল। ডিসপেনসিং রুমের শয্যায় শনিচারি নেই। আলো নিয়ে ডাক্তার বাংলোর বাইরে বেরিয়ে এলেন। ওই তো, নিচে পথের ওপর পড়ে আছে শনিচারি। তখন তার অন্তিম মুহূর্ত। ডাক্তারের চিৎকারে শনিচারি একবার তাকাল। কষ্ট করে বলল — 'আজ এই শেষ মুহূর্তে তোমাকে গ্রহণ করলাম ডাক্তার। পঙ্গু হয়ে, তোমার বিপদের কারণ হয়ে বেঁচে থাকতে পারলাম না। কথা দাও, তুমি আমার দেশের মানুষকে ভালবাসবে।' আর কোনও কথা নয়; চিরদিনের মতো বন্ধ হয়ে গেল শনিচারির হৃদস্পন্দন।

শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন মাইতির লেখা ঐতিহাসিক উপন্যাস পরিক্রমা শেষে আবিষ্কারের আনন্দ, পাঠের আনন্দ, লেখকের হাত ধরে প্রাগৈতিহাসিক যুগের গুহামানবদের কাল থেকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ প্রহর পর্যন্ত দীর্ঘপথ পরিক্রমার আনন্দ লাভ করলাম। ঐতিহাসিক উপন্যাসলেখক সাহিত্যে আনেন জ্ঞানের সম্ভার। এই জ্ঞানসম্ভার ব্যবহারের দিব্য সামর্থ্য তাঁর থাকে, এবং তার মারফৎ তিনি তা জীবনে সত্যরূপে শিল্পমাধ্যমে সঞ্চার করে দেন। সন্দেহ নেই, চিত্তরঞ্জন তাঁর সুবিপুল অধ্যয়ন, জ্ঞানসঞ্চয়ন ও তার শিল্পরূপায়ণ মারফৎ পাঠকসমাজকে তৎসৃষ্ট জগতের আনন্দলোকে প্রবেশাধিকার দিয়েছেন। সেই আনন্দের অংশীদার বর্তমান রচনাবলীর রসাস্বাদনকারীও। স্বীকার্য, যুগাবসান থেকে যুগান্তরের দিকে মানবসভ্যতার নিত্যযাত্রার একটি রূপ চিত্তরঞ্জনের কলমের জাদুতে তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিতে ফুটে উঠেছে।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়
প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও প্রফেসর,
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

দাহা তিসি গোংগা

ওরা লহুর দেহটাকে তুলে এনে পাথর-সাজানো কবরের ভেতর শুইয়ে দিল। বর্শা-ফলক রেখে দেওয়া হল পাশে। তিসি খানিকটা খরগোশের মাংস আর বুনো কন্দ যোগাড় করে রেখেছিল। এখন বাবার হাতের নাগালের মধ্যে সেটা এনে রেখে দিল। দাহা আর গোংগা দু'ভাই মিলে বাবার কবরের ওপর চাপিয়ে দিল পাঁচখানা লম্বা লম্বা পাথর।

ঝুরা আর টিথু একটু দূরে একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে তাদের বুড়ো দাদার শেষকৃত্য দেখছিল। এইটাই শেষ কবর। এ ক'দিন মায়ের দু'ভাই মিলে সারি সারি কবর তৈরি করেছে। এক একটা মৃতদেহ তুলে এনে কবরের ভেতর পর পর শুইয়ে দিয়েছে। মা প্রতিটা কবরের ভেতর রেখে দিয়েছে কিছু কিছু খাবার।

ভয়ঙ্কর উত্তেজনা আর আতঙ্কের ভেতর কেটে গেছে কয়েকটা দিন। কখনো নদীর জলে গা ডুবিয়ে, কখনো জঙ্গলের গভীরে আবার কখনো বা গুহার অন্ধকারে ঘুপটি মেরে বসে। দূর থেকে দু'দলের রণহুঙ্কার শুনে টিথু ভয় পেয়ে মাঝে মাঝে কেঁদে উঠেছে। ঝুরা ভাইকে বুকে চেপে ধরে সাহস দেবার চেষ্টা করেছে।

এবার তিসি ছেলেমেয়ের দিকে এগিয়ে এল, হাতে ধরা আছে মাটি খোঁড়ার খোন্তা। গোংগা হাতে তুলে নিয়েছে একটা বর্শা। দাহা, গুহার কাছে গিয়ে ডাক দিয়ে বের করে আনল কয়েকটা, ভেড়া। কারুর মুখে কথা নেই, তবে এখন যে ওরা জায়গাটা ছেড়ে যাবার জন্য প্রস্তুত তা বোঝা যাচ্ছিল।

হঠাৎ দাহা পেছনের পাহাড়টার দিকে মুখ করে দাঁড়াল। পরক্ষণেই চীৎকার করে উঠল, ঝড়! ঝড়!

ওরা সকলে পেছনের পাহাড়ের দিকে তাকাল। অতিকায় কালো একটা পাখি দুটো ডানা মেলে পাহাড়ের ওপর থেকে ভেসে আসছে। তার চোখে বিদ্যুতের চকমকি।

পাহাড়ী ঝড় মুহূর্তে তাণ্ডব শুরু করে দিল। তিসি ছেলেমেয়ের হাত ধরে টানতে টানতে ছুটল একটা গুহার দিকে। গোংগা ঢুকল দাহার গুহায়। ভেড়া নিয়ে দাহা সেখানে আগেই ঢুকে পড়েছিল। গুহাটা ছিল লম্বা আর চওড়ায় অনেকখানি। ওদের বাবা লহু তার যৌবনে একদিন বনে শিকার করতে এসে এই গুহাটির খোঁজ পেয়ে যায়। শেষে সবদিক দিয়ে জায়গাটি বসবাসের অনুকূল দেখে নিজের লোকজনদের এখানে নিয়ে আসে। অবশ্য সে সময় দলপতি ছিল তার বুড়ো বাবা। লহুর বাবা গোহাই সানন্দে তার দলটিকে এখানে নতুন পত্তনি গড়ার অনুমতি দিয়েছিল।

তিনদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ঝরল। ফুলে ফেঁপে উঠল সামনের নদীটা। জল উপচে জঙ্গলের ধারে জলাটা ভরে দিল। আরও কয়েকটা দিন পিছিয়ে গেল ওদের যাত্রা।

গোংগা ঐ বৃষ্টি মাথায় করেই তার বর্শা নিয়ে বেরিয়ে গেল জলার দিকে। মাছ, কচ্ছপ আর পাখি ধরতে সে ওস্তাদ। শুধু তাই নয়, সে একজন নিপুণ শিকারী। ধনুক, বর্শা আর কুঠার চালাতে তার গোষ্ঠীর একজনও তার সমকক্ষ ছিল না।

গোংগা হরিণের পায়ের বাঁকানো দুটো হাড় ঘষে সুঁচলো করে, খাঁজ কেটে, কাঠের ডালে বেঁধে সড়কি তৈরি করেছে। ওটা ওর মাছ গেঁথে তোলার অস্ত্র।

নদীর একটা বাঁকে ঝোপের আড়ালে ও ঢেকে রেখেছিল ডোঙাটা। তাই লড়াইয়ে জিতে ওপরের পাহাড়ের মানুষগুলো ওদের সর্বস্ব নিয়ে চলে গেলেও ডোঙাটার সন্ধান পায়নি। পেলে ওটাকে ওরা পাথর ঠুকে ভেঙে নদীতে ডুবিয়ে দিয়ে যেত।

ঝোপের আড়াল থেকে ও টেনে আনল ডোঙাটা। সঙ্গে সঙ্গে বাবার কথা মনে পড়ল। এই নদীর কূল ধরে তার বাবা লহু একবার কোথায় যেন চলে গিয়েছিল। আসে না, আসে না। দলের সব মানুষ নানারকম অনুমান করতে লাগল। শেষে একদিন তার বাবা ফিরে এল। আর ফিরে এসেই জঙ্গল থেকে একটা মোটা গাছ কেটে, তাঁর গুঁড়ি কুঁদে এই ডোঙাটা বানাল। এর আগে এমন অদ্ভুত একটা জিনিস কেউ দেখেনি। তারপর ওটা যখন নদীতে ভাসানো হল, আর বাবা একটা লম্বা গাছের ডাল হাতে নিয়ে ওতে বসে চালাতে লাগল, তখন উত্তেজনা আর বিস্ময়ে কারুর মুখে কোন কথা ছিল না।

গোংগার বাবা অতি ছোট্ট একটা দলের দলপতি থাকলে কি হবে, তার মাথায় ঘুরত অনেক কিছু। সে আরও একবার চলে গিয়েছিল দল ছেড়ে। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পেছনের পাহাড়ে উঠে যেতে কেউ কেউ তাকে দেখেছিল। সে কারুর সঙ্গে তখন কথা বলেনি, কারুর প্রশ্নের জবাব দেয়নি। তাকে দেখে নাকি মনে হয়েছিল, সে লহুই নয়। অচেনা, অন্য কোন গোষ্ঠীর লোক। যখন ফিরে এল সে, হাতে তার একটা অদ্ভুত জিনিস! একখানা বুনো বাঁশের বাখারি। তার দুই প্রান্তে খাঁজ কেটে একখানা লম্বা লতার মত কি যেন দিয়ে বাঁধা হয়েছে। পরে জানা গিয়েছিল, ওটা মৃত পশুর অন্ত্র শুকিয়ে তৈরি করা হয়েছে। লম্বা, সরু একটা ডালের মাথায় পাথরের তীক্ষ্ণ ফলা লাগানো। ওটা ঐ অস্ত্রের মাঝখানে ঠেকিয়ে টান দিয়ে ছেড়ে দিলেই বোঁ করে অনেকখানি দূরে উড়ে চলে যায়। কখনো বা গাছের কোন কাণ্ডে গেঁথে গিয়ে ঝুলতে থাকে।

কদিন ধরে ঐরকম অনেকগুলো ধনুক বানানো হল। পাথরের ফলা তৈরি হতে লাগল ঘস্ ঘস্ শব্দে। লহু বলল, এগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে খরগোশ আর পাখি মারা যায়।

অমনি শুরু হয়ে গেল নতুন তৈরি ধনুকে লক্ষ্যভেদ। সারা দলের ভেতর এই নিয়ে ছড়িয়ে পড়ল উন্মাদনা। গোংগার বয়স তখন কম হলে কি হবে, সে-ই ক'দিনের ভেতর দলের সেরা ধনুর্বিদ বলে পরিচিত হল। পশুপাখি সবই মারা পড়তে লাগল নতুন অস্ত্রে।

লহুর মুখে এক সময় শোনা গিয়েছিল তার হঠাৎ করে চলে গিয়ে নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের কাহিনী।

তার মনে হল, সে আশপাশের অঞ্চল ঘুরে দেখবে। যেই ভাবা সেই কাজ। চলতে লাগল ঘন জঙ্গল চিরে। দুদিন ধরে পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে পা রেখে সূর্য যেদিকে ওঠে সেইদিকে হাঁটতে লাগল। কখনো পাহাড়ের গায়ে জটিল জঙ্গলের গাছপালা কুঠার দিয়ে কেটে কেটে, কখনো বা ভয়ঙ্কর পাহাড়ী নদীর ছোট বড় পাথরের চাঁইয়ের ওপর পা রেখে রেখে।

পাথরের টুকরো ছুঁড়ে সে পাখি মারত, আবার বাগে পেলে দু'একটা খরগোশকেও সে ঘায়েল করত। দুটো পাথরের টুকরো ছিল তার পাশে। তাই ঠুকে ঠুকে সে আগুন জ্বালত। শুকনো ডালপাতার স্তূপে আগুন ধরিয়ে মৃত পশু-পাখির মাংস ঝলসে নিত আর তাই খেয়ে নতুন করে সঞ্চয় করত চলার শক্তি।

তৃতীয় দিনে একটা ঘটনা ঘটল। রাতে সে একটা গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল। গুহার সামনে জঙ্গল। সে দিনের আলো থাকতে শুকনো ডাল আর পাতা গুহার মুখে জড়ো করে রেখেছিল। রাত নামার সঙ্গে সঙ্গে শীতের প্রচণ্ডতা বাড়ল। লহু আগুন জ্বালিয়ে দেহটাকে উত্তপ্ত করে তুলল। তাছাড়া হিংস্র, থাবাওয়ালা কতকগুলো জন্তু রাতের অন্ধকারে খাবারের খোঁজে বেরোয়। তারা আগুনকে ভয় পায়। তাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য বনের ধারে পাহাড়ী গুহায় রাতে আগুন জ্বেলে রাখতে হয়।

একটা দেয়ালে হেলান দিয়ে বসেছিল লহু। চোখ দুটো বন্ধ হয়ে আসছিল ঘুমে। মাঝে মাঝে চমকে জেগে জেগে উঠছিল আর এক এক টুকরো কাঠ ফেলে দিচ্ছিল আগুনে।

একবার এমনি করে শুকনো কাঠের টুকরো আর কিছু পাতা ছুঁড়ে দিতেই আগুনটা শব্দ করে জ্বলে উঠল। ঠিক সেই মুহূর্তে অগ্নিকুণ্ডের ওপারে একজন কেউ এসে দাঁড়াল বলে মনে হল।

পাশে পড়ে থাকা কুঠারখানা হাতে তুলে নিয়ে আত্মরক্ষা আর আক্রমণের ভঙ্গীতে বসল লহু। গুহার ছাদ নিচু থাকায় উঠে দাঁড়ানোর কোন সুবিধা ছিল না তার।

লহু বাইরের ছবি দেখতে পেলেও বাইরের থেকে গুহার ভেতরটা দেখা যাচ্ছিল না। সেই মূর্তি স্থির হয়ে অগ্নিকুণ্ডের ওপারে তেমনি দাঁড়িয়েছিল।

জঙ্গলের নানারকম প্রাণীর সঙ্গে পরিচয় আছে লহুর কিন্তু এটিকে তাদের ভেতর কোন পর্যায়েই ফেলা যাচ্ছিল না। লোমশ ভালুকের মত অজস্র লোমে গা ঢাকা। কিন্তু ভালুকের মত চারপায়ে ভর রেখে সে দাঁড়িয়ে ছিল না। দু-পায়ে ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আগুন আর ধোঁয়ার জন্য বাইরের মূর্তিটা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠছিল না। অন্ধকার বনভূমিতে আলোর অংশ ছিল বড়ই কম।

লহু বড় চিন্তায় পড়ল। যে জানোয়ারই হোক্, সে যদি একসময় জায়গা ছেড়ে চলে যায় তাহলে তাকে অকারণে ঘাঁটিয়ে লাভ নেই। অন্ধকারে গুহা থেকে বেরিয়ে গিয়ে যদি যুদ্ধ করতে হয় তাহলে জানোয়ারটার জয়ী হবার সম্ভাবনা বেশী থাকবে। এদিকে যদি হঠাৎ করে গুহার মধ্যে ঢুকে আসে তাহলে সমূহ বিপদ। ছোট্ট গুহায় ঠিকমত কুঠার চালাবার সুযোগ পাওয়া যাবে না। অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর মূর্তিটা যখন এক পা-ও নড়ল না, আর ঐ আগুনটাও নিভে আসতে লাগল তখন লহু বাইরে বেরিয়ে আক্রমণেরই সিদ্ধান্ত নিল। বিদ্যুৎগতিতে বেরিয়ে গিয়ে আঘাত হানতে হবে। ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে সে ভয়ঙ্কর একটা চিৎকার করে গুহা থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল। এখন কুঠারখানা ঘুরিয়ে আঘাত করার সুযোগ সে পেয়েছে।

পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল মূর্তি। আলো যেখানে পৌঁছবে না, সেই অন্ধকার বনে সে গা ঢাকা দিয়েছে। হতবাক হয়ে গুহার ভেতর ফিরে এল লহু। কতকগুলো পাতা আর কাঠ ছুঁড়ে দিল অগ্নিকুণ্ডে। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। কাঁপা কাঁপা ছায়া গুহার গায়ে নেচে বেড়াতে লাগল।

ঠিক এমনি সময়ে মানুষের গলার একটা কান্না শোনা গেল। একটি মেয়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদছে।

লহু বিস্মিত। এত রাতে এই গভীর পাহাড়ী বনে মেয়েটা এল কোথা থেকে ! কোনও গোষ্ঠীর থেকে এখানে ছিটকে এসে পড়েছে!

মেয়েটির কান্না থেমে গেল, কিন্তু সে এগিয়ে এল না আগুনের কুণ্ডের কাছে।

এবার আশ্বাসের গলায় লহু বলল, ভয় নেই, সামনে এসে দাঁড়াও।

লহুর ভাষা হয়ত বুঝল না মেয়েটি, তবে লহুর গলার স্বরে কোমল একটা আমন্ত্রণ ছিল তা সে বুঝতে পারল।

কয়েকবার এদিক থেকে ডাকাডাকির পর মেয়েটি ভয়ে ভয়ে অগ্নিকুণ্ডের সামনে এসে দাঁড়াল। তার গায়ে গাঢ় বাদামী ভালুকের চামড়ার পোশাক।

এবার লহু প্রশ্ন করল, তুমি অন্ধকাব বনে একা কি করছ?

মেয়েটি লহুর ভাষা এবারও বুঝতে পারল না। তবে তার বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে যে প্রশ্ন করছে, এটা বুঝল। সে হাত-পা নেড়ে তার গোষ্ঠীর ভাষায় যা জানাল তার মোদ্দা অর্থটা বুঝে নিতে অসুবিধে হল না লহুর।

মেয়েটি সঙ্গীর সঙ্গে শিকার করতে এসেছিল বনে। একটা জানোয়ারের পেছনে সঙ্গীটি ধাওয়া করে গেলে ওদের ছাড়াছাড়ি হয়। তারপর থেকে ও শুধু অপেক্ষা আর ডাকাডাকি করেছে। কোন উত্তর পায় নি। এদিকে সূর্য ডুবে অন্ধকার নেমেছে। পথের চিহ্ন মুছে গেছে। সে কতক্ষণ একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়েছিল। তারপর দূর থেকে আগুনের শিখা দেখে ও এখানে চলে এসেছে।

লহু বলল, রাতে হিংস্র জানোয়ারগুলো খাবারের খোঁজে ঘোরাঘুরি করছে, তাছাড়া শীতে জমে যাবার যোগাড়, তুমি গুহার ভেতরে চলে এসো।

লহুর কথা না বুঝলেও তার আন্তরিক আমন্ত্রণের ভাষাটি বুঝে নিতে মেয়েটির অসুবিধা হল না। সে পায়ে পায়ে লহুর সঙ্গে গুহার ভেতর ঢুকল।

ভোরের আলো দেখা দেওয়া মাত্রই জেগে উঠল লহু। মেয়েটি গুহায় নেই। কৌতূহল দমন করতে না পেরে সেও বেরিয়ে পড়ল।

এদিক ওদিক খানিকটা ঘোরাঘুরির পর মেয়েটির দেখা মিলল। সে একটা গাছের কাণ্ড বাঁ হাতে জড়িয়ে ধরে পাহাড়ের নীচের দিকে ঝুঁকে কি যেন দেখছিল।

লহুর পায়ের সাড়া পেয়ে সে চমকে ফিরে তাকাল। এবার লহুকে কাছে ডেকে নীচের দিকে কিছু

দেখতে বলল। লহু কিন্তু লক্ষ্যবস্তুটা ঘন জঙ্গলের আড়ালে থাকায় দেখতে পেল না।

অনেকবার হাত তুলে দেখানোর পর যখন মেয়েটি ব্যর্থ হল তখন গাছের তলায় পড়ে থাকা ধনুকটি তুলে নিল। একটি তীর ছিলায় জুড়ে লক্ষ্যবস্তুটির দিকে ছুঁড়ে মারল।

ততক্ষণে বিস্ময়ের অবধি নেই লহুর। তীর একটা জায়গায় গিয়ে পড়ল, এবং সেখানে পোশাকের মত একটা কিছু দেখাও গেল। কিন্তু লহুর বিস্ময়টা ছিল অন্য জায়গায়। সে এই প্রথম একটি হাতিয়ার দেখল, যার থেকে ক্ষুদ্র আকারের বর্শার মত একটি বস্তু অনেকদূর অব্দি ছুঁড়ে মারা যায়!

মেয়েটি বলল, দেখতে পেয়েছ?

লহু ভাষা না বুঝেও জানিয়ে দিল, সে পোশাকের একটা প্রান্ত দেখতে পেয়েছে।

মেয়েটি অত্যন্ত বিহ্বল হয়ে পড়েছে বলে মনে হল। বলল, তুমি কি আমাকে নীচে নামতে একটু সাহায্য করবে?

লহু মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জানতে চাইল, এ অস্ত্র তোমার সঙ্গীটি সঙ্গে নেয় নি কেন?

মেয়েটি বলল, এটা দিয়ে পাখি, সজারু, খরগোশ মারা যায়। ও একটা বুনো বরার পেছনে বর্শা নিয়ে তাড়া করেছিল। আমি এই তীর ধনুক নিজের কাছে রেখেছিলাম।

ওরা দুজনে সাবধানে নিচের পাহাড়ে নামতে লাগল। কয়েকখানা তীর আর ধনুক লতায় বেঁধে কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়েছিল লহু। মাঝে মাঝে মেয়েটিকে নামতে সাহায্য করছিল সে।

একসময় ওরা এসে পৌঁছল নির্দিষ্ট জায়গাটিতে। এসেই একটা ভয়াবহ দৃশ্য দেখতে পেল। বরাহটির পিঠ থেকে পেট ভেদ করে বেরিয়ে গেছে শিকারীর বর্শা। অন্যদিকে জানোয়ারটি তার তীক্ষ্ণ দাঁত দিয়ে চিরে দিয়েছে আক্রমণকারীর পেট। দুজনেরই প্রাণহীন দেহ পড়ে আছে পাশাপাশি।

মেয়েটি তার সঙ্গীর দেহের ওপর আছড়ে পড়ে কাঁদতে লাগল।

কতক্ষণ পরে লহুর দিকে মুখ তুলে বলল, আমি একে ওপরে নিয়ে যাব।

লহুও দৃশ্যটা দেখে বিচলিত হয়েছিল। সে বলল, আমি তোমার সঙ্গীকে ওপরে বয়ে নিয়ে যাচ্ছি, তোমার কোনও চিন্তা নেই।

বন্য বরার দেহ থেকে লহুই বর্শাটা টেনে বের করে নিয়ে মেয়েটির হাতে দিল। সে নিজে এক ঝটকায় লোকটিকে কাঁধে তুলে নিয়ে হাঁটতে লাগল।

ওপরের গুহার সামনে মৃত মানুষটিকে নামিয়ে রেখে হাঁপাতে লাগল লহু। মেয়েটি সঙ্গীর শোকে কাতর, তবু চোখে মুখে কৃতজ্ঞতা।

কিছু পরে মনে হল, মেয়েটি যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সে কান পেতে কোনওকিছু শোনার চেষ্টা করছে। পরক্ষণেই সে দ্রুত পায়ে উঠে দাঁড়াল একটা টিলার ওপর। কপালে দুহাত ঠেকিয়ে দূরে কিছু একটা দেখার চেষ্টা করতে লাগল।

একসময় চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটি, ঐ আসছে, ওরা আসছে।

বলতে বলতেই সে যেন গড়িয়ে নেমে এল নীচে।

লহু দেখল, মেয়েটির মুখেচোখে উদ্বেগের ছায়া।

কি হল? কোন কিছু বিপদ ঘটবে নাকি ?

মেয়েটি বলল, আমাদের খোঁজে দলের লোকেরা এদিকে আসছে। ওরা সারারাত আমাদের ফিরতে না দেখে চিন্তিত হয়েছে। ওরা এসে পড়ার আগে তুমি চলে যাও, নইলে তোমার বিপদ হতে পারে।

উঠে দাঁড়াল লহু। মেয়েটি আবার কৃতজ্ঞতা জানাল চোখের পাতা ভিজিয়ে।

যাবার আগে লহু বলল, একটা জিনিস চাইব তোমার কাছে।

চোখে প্রশ্ন চিহ্ন এঁকে মেয়েটি লহুর দিকে তাকাল।

ধনুক আর শরগুলোর দিকে আঙুল তুলে দেখাল লহু।

ওগুলো দেবে আমাকে ?

মেয়েটি সামান্য সময় কিছু চিন্তা করল, তারপর ইঙ্গিতে বলল, নিয়ে যাও। যত দ্রুত পার, ওদের এখানে পৌঁছবার আগেই উল্টো দিকের পথ ধরে চলে যাও।

লহুর ধনুক নিয়ে আসার এই হল কাহিনী।

গোংগা বাঘের মত শিকারী হয়েছে। তার লক্ষ্য যেমন অব্যর্থ তেমনি নতুন নতুন ফাঁদ তৈরিতে কিংবা কৌশল অবলম্বনে বুদ্ধিও তার খোলে সহজে।

দাহা পেয়েছে বাপের ঘুরে বেড়ানোর স্বভাব। সে হয়ত সামান্য দু'দশটা ভেড়া নিয়ে বেশ কিছুকালের জন্য দেশছাড়া হল। আবার হঠাৎ করে একদিন উদয় হল তার।

লহুর মেয়ে তিসির স্বভাবটি বড় শান্ত। দলপতির মেয়ে বলে কোনওদিন তার কোনও অহংকার ছিল না। সে দলের সকলের জন্য নিঃশব্দে কাজ করে যেত। মা মারা যায় ছোটবেলায়। তাই অল্প বয়স থেকেই তাকে নিতে হয়েছিল সংসারের দায়িত্ব।

তিসির পরেই গোংগা আর তারপরে দাহার জন্ম। দু'ভাইকে সে-ই সেবা যত্নে বড় করে তুলেছে।

গোংগা ডোঙা নিয়ে নদীর ওপারে চলে গেল। জলার সরু মুখটা দিয়ে তখন তর্ তর্ করে স্রোত বইছে। এখানে ডোঙাটাকে ঠেলে জলার মধ্যে এনে ফেলতে হয়।

গোংগা দেখল, জল চলাচলের সরু মুখটা দিয়ে জলার স্রোত নদীর মধ্যে এসে পড়েছে। অজস্র মাছ ঐ পথে নদী থেকে ঢুকে পড়ার জন্য হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দিয়েছে।

গোংগার আর জলায় নামতে হল না। সে নদীর কূলে একটা পাথরের চাঁইতে ডোঙাটা বেঁধে সড়কি চালিয়ে মাছ ধরতে লাগল।

অন্য সময় হলে মাছগুলো সড়কিতে গেঁথে তোলার পর যখন আহত মাছের দেহের কাঁপন সড়কির তলায় হাতে এসে লাগত তখন আনন্দের স্রোত বয়ে যেত গোংগার দেহের ভেতর দিয়ে। কিন্তু আজ অনেক মাছই সে ধরল, তবু সামান্য আনন্দের দোলা লাগল না তার মনে। মানুষের প্রয়োজন কোন রকম দুঃখকেই মানে না, তা সে যত বড় দুঃখই হোক। এতবড় একটা বিপর্যয়ের পরেও তাই গোংগাকে বেরুতে হল আহারের সন্ধানে।

বেশ কয়েকটা মাছ ধরে নিয়ে ডোঙা চালিয়ে আস্তানার দিকে ফিরছিল গোংগা। মাছগুলো ডোঙার কোলে তখনও আছাড় পাছাড় খাচ্ছিল। নিস্তেজ হয়ে নেতিয়ে পড়ছে, আবার প্রাণ ফিরে পাবার জন্য ছটফট, আকুলি-বিকুলি করছে। গোংগা স্রোতের টানে ডোঙাটা ভাসিয়ে দিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল মাছগুলোর দিকে। তার হঠাৎ মনে হল, এগুলো মাছ নয়, তাদেরই দলের মুমূর্ষু মানুষগুলো লড়াই-এর মাঠে ছড়িয়ে পড়ে আছে। একটু জলের জন্য, একটু হাওয়ার জন্য আকুলি-বিকুলি করছে।

ডোঙার সঙ্গে একটা পাথরের ধাক্কা লাগতেই গোংগা সচেতন হয়ে উঠল। সে ডোঙাটাকে কূলে বেঁধে রেখে মাছ কটা নিয়ে বৃষ্টির ভেতর হাঁটতে লাগল। জীবনে এই প্রথম গোংগা আহত মাছের সঙ্গে আহত মানুষের একটা তুলনা তার ভাবনায় ধারণ করতে পারল।

বাইরে বৃষ্টি ঝরছিল আর গুহার দেয়ালে মাথা ঠেকিয়ে অঝোরে কাঁদছিল তিসি। লা আর তার কাছে ফিরে আসবেনা, সে তাকে বলিষ্ঠ বুকের ভেতর খরগোশের মত জড়িয়ে ধরে পিষে আদর জানাবে না, একথা তিসি কেমন করে মেনে নেবে। খুক ছোট সে তখন। গুহার ভেতর গোংগা আর দাহাকে নিয়ে রয়েছে। বাবা লহু কদিন ধরে ঘরে নেই। পড়শী হিলি বুড়ি সমবায় রান্নাশালা থেকে খাবার দিয়ে যায়। গোংগা সামান্য ক্ষিদে পেলে কিংবা অসুবিধে হলে ছাদ মাথায় তুলে চেঁচাতে থাকে। তাকে নানা কথা বলে ভুলিয়ে রাখতে হয় তিসিকে। ঐ রে ভল্লুক আসছে! ওরে বাবা, বরার কত বড় দাঁত দেখেছিস!

অমনি কান্না থেমে যায় গোংগার। সে হাতের মুঠি উঁচিয়ে বলে ওঠে, মারব। ভল্লুকে মারব। বরাকে মারব।

গোংগার বীরত্ব দেখে পশুরা পালিয়ে যায়। দাহা বড় একটা চেঁচামেচি করে না। সে হয়তো একটা ভেড়াকে নিয়ে আদর করতে থাকে। কখনও বা বিশ্রামরত একটা ভেড়ার গায়ে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ে।

বাবা ফিরে এল। সঙ্গে তিসির চেয়ে বড় একটা ছেলে। বনের ভেতর কি কাজে যেন এসেছিল। পথ হারিয়ে আর ঘরে ফিরতে পারেনি। কদিন বনেই কেটেছিল। ঐ পথে ফিরে আসছিল লহু। একটা গাছের তলা দিয়ে আসার সময় লা, লা — শব্দ ভেসে এল। লহু থমকে দাঁড়াল। চারদিকে তাকাতে লাগল। আবার লা, লা। কোন জন্তু কিংবা মানুষের মুখ থেকে এ ধরনের আওয়াজ বেরুতে কখনও শোনেনি লহু। এক সময় মনে হল শব্দটা আসছে গাছের ওপর থেকে। অমনি ওপরের দিকে তাকাতেই ছেলেটির সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল।

লহু বলল, কি করছ ওখানে, নেমে এসো।

ছেলেটি সড়সড়িয়ে গাছ থেকে নেমে এল।

ওর হাতে কোন অস্ত্র নেই দেখে লহু অবাক হল। হিংস্র জন্তুতে ভরা বন। বিরাটাকার সাপেরও দেখা মেলে এসব বনে। এখানে কেউ একটা বর্শা কিংবা কুঠার ছাড়া ঢোকে !

তুমি একা এখানে কি করছ?

লা, লা।

তুমি ঘরে যাবে না?

লা, লা।

লহু বুঝল, ছেলেটি গোঙা। সে বলল, তুমি আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল, আমি তোমাকে তোমার ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসব।

ছেলেটি লহুর অঙ্গভঙ্গি থেকে কিছু একটা আন্দাজ করে নিল। সেও হাত পা নেড়ে বুঝিয়ে দিল, ঘরে ফেরার পথ সে হারিয়ে ফেলেছে।

যাবে আমার সঙ্গে?

মাথা নাড়ল ছেলেটি। এই গভীর বনে একা পড়ে থাকার চেয়ে দয়ালু লোকটির সঙ্গে চলে যাওয়াই সে বিবেচনার কাজ বলে মনে করল। তাছাড়া এ ক'দিন সে একা একাই বনে ঘুরছে, তার গোষ্ঠীর কোনও লোক তাকে খোঁজ করে আসেনি। হয়তো তারা ধরে নিয়েছে তাকে বাঘে খেয়েছে।

লহু তাকে সঙ্গে নিয়ে এল। সে সব কথায় লা, লা করে বলে তার নাম রাখা হল, লা। এরপর দলের সবাই তাকে লা বলে ডাকতে লাগল। সে থাকত লহুর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে একই গুহায়।

লা অন্য গোষ্ঠী থেকে এসেছে, তাই সে তার গোষ্ঠীর কতকগুলো ক্রিয়া কর্ম সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। এই যেমন পাখি ধরার ফাঁদ। একটা একটা দড়ির ফাঁস খানিক খানিক ব্যবধানে ফেলে রেখে মূল দড়িখানা দূরে টেনে নিয়ে গিয়ে শিকারী বসে থাকবে। ফাঁসের ভেতরের খাবারে পাখিরা মুখ দিলেই শিকারী সুযোগ বুঝে টান দেবে তার দড়িতে।

পাখি ধরার এই কৌশলটি লা-ই শিখিয়ে দিয়েছিল লহুর গোষ্ঠীর সবাইকে।

তাছাড়া লা একটু বড় হলে সমবয়সীদের নিয়ে শিকারে বেরুত। সে বনের ভেতর ঢুকে ভাঙা ডালপালা আর তছনছ করা ঝোপঝাড় দেখে বুঝতে পারত কোন্ কোন্ জানোয়ার সে পথ দিয়ে যাতায়াত করে। অমনি বন্ধুদের সাহায্যে সে বেশ বড় করে গর্ত খুঁড়ে রাখত। গর্তের ওপর সরু সরু ডাল বিছিয়ে, তার ওপর ঘাস পাতা ছড়িয়ে রাখা হত। ওরা দূরে বসে থাকত পশুদের ফেরার অপেক্ষায়; ভালুক হেঁটে আসত হন্‌হন্ করে, হাতি আসত হেলেদুলে গদাই লস্করি চালে। বরাগুলো পথ চলত ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ তুলে। কারু নিস্তার নেই। ঐ গর্তে পা পড়েছে কি হুমড়ি খেয়ে ঢোকো ভেতরে। এরপর দু'তিনদিন ভেতরে থাকার পর যখন নিস্তেজ হয়ে পড়ত তখন বড় বড় পাথর ঠুকে মারা হত তাদের। তুলে ছাল ছাড়িয়ে নেওয়া হত। লহুর গোষ্ঠীর মানুষজন ছিল খুবই কম। লা ঐসব জানোয়ারের চামড়ায় সকলের পোশাক তৈরী করে দিত। পশুর নাড়ী শুকিয়ে তীক্ষ্ণধার সূচীমুখ অস্ত্র দিয়ে চামড়া ফুটো করে তার ভেতর ঢোকান হত। এইভাবে দুই

প্রান্ত জুড়ে তৈরি হত পোশাক।

একসময় নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে একখানা বড় বাড়ি তৈরি করল লা। যার ভেতর বসে বন্ধুরা শিকারের মতলব আঁটত। হাসি ঠাট্টা গল্পগুজব করত।

অবশ্য নিজের মগজ খাটিয়ে বাড়িটা তুললেও এর পেছনে লা-এর ছোটবেলার স্মৃতি কাজ করেছিল। সে তাদের গোষ্ঠীতে এ ধরনের একটা বাড়ির ভেতরেই বাস করত।

পাথরের পাশে পাথর সাজিয়ে তৈরি হয়েছিল মেজে। বেশ সমান করেই পিটিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। মেজের চারদিকে গাছের মোটা মোটা ডাল-পালা পুঁতে তাদের ওপরে আবার ছাউনি করা হয়েছিল ডালপাতার। আর ঐ ডালপাতার ছাউনির ওপরে চাপান হয়েছিল চামড়া। সে সব চামড়া আবার চারদিকে ঝুলিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। এরপর ছাদের ওপর চাপান হয়েছিল হাতির মত বড় বড় প্রাণীর হাড়গোড়। সহজে যাতে চামড়ার ছাউনি ঝড়ে উড়ে না যায় তারই ব্যবস্থা।

এ বাড়িখানা দেখে লন্থ আর তার গোষ্ঠীর সব্বাই লা-কে কাঁধে তুলে নেচেছিল।

লা ছিল সবার প্রিয়। সে সাধ্যমত সকলের সব কাজে সাহায্য করত। তিসির স্বভাবের সঙ্গে অদ্ভুত একটা মিল ছিল তার।

যৌবনে খুবই বলশালী হয়ে উঠল লা। সে অনেক ভারী একখানা পাথর একাই বয়ে নিয়ে যেতে পারত। তার সঙ্গে খেয়াল খুশির যুদ্ধে সহজে কেউ এঁটে উঠতে পারত না।

একদিন দূরের ঝর্ণায় জল আনতে গিয়েছিল তিসি। শেষ বেলায় একাই ফিরছিল। হঠাৎ পথের একটা বাঁকে কে যেন তাকে জড়িয়ে ধরল পেছন থেকে। চামড়ার জলপাত্রটা পড়ে গেল পাথরের এবড়ো থেবড়ো রাস্তায়। বকবক করে গড়িয়ে গেল পাত্রের সবটুকু জল।

ভীষণ ভয় পেয়ে চীৎকার করে উঠল তিসি। প্রথমে মনে হয়েছিল, কোনও বাঘ ভালুক তাকে আক্রমণ করেছে, কিন্তু পরক্ষণেই সে বুঝতে পারল কোন হিংস্র জন্তুর থাবা তাকে বিদ্ধ করছে না। সুতরাং এ কোন মানুষের খেলা ছাড়া আর কিছু নয়। তবে যে মানুষটা তাকে জাপটে ধরে রেখেছে সে যে অত্যন্ত শক্তিমান তাতে সন্দেহ নেই। তিসি চেষ্টা করেও তাব মুখ দেখতে পেল না।

মানুষটা পেছন থেকে তাকে একেবারে শূন্যে তুলে নিল। এখন তিসির মুখ আকাশের দিকে। সে স্বভাবে অত্যন্ত শান্ত, তাই চীৎকার করে বাতাস কাঁপিয়ে তুলল না। সে জানে, এখানে চীৎকার করলে কোন শব্দই তার আস্তানায় গিয়ে পৌঁছবে না। অতএব এর শেষ দেখা যাক।

শূন্যের দিকে তাকিয়েও তিসি বুঝতে পারছিল তাকে ঝর্ণার ধারে নিয়ে আসা হয়েছে। কলকল জল প্রবাহের শব্দ তার কানে এসে বাজছিল। একসময় তাকে নিয়ে অপহরণকারী ঢুকল একটি পর্বত গুহায়। এই [illegible] একটি শৈলশিরাকে ভেদ করে চলে গেছে। আর ঝর্ণাটি প্রবাহিত হয়েছে তার ভেতর দিয়ে।

এখানে দুটি হাতের মধ্যে তিসিকে ধরে নিয়ে সাবধানে প্রায়ান্ধকার গুহাটি পার হচ্ছিল অপহরণকারী। এখন দুজনের মুখ একেবারে পরস্পরের অভিমুখে। কিন্তু অন্ধকারে একটি অবয়বধারী ছাড়া আর কিছু বোঝা যাচ্ছিল না। গুহার মাঝপথে থেমে গেল মানুষটি। মসৃণ একটি শিলা, প্রকৃতির খেয়ালে গুহার একপাশে পড়েছিল। তাকে স্পর্শ করে ঝর্ণার জল বড় মিঠে সুর তুলে বাজছিল। মানুষটি তিসিকে তারই ওপর বসিয়ে দিয়ে নিজে ঝর্ণার জলে পা ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

এমনি কতক্ষণ কেটে গেল। দুজনেই নির্বাক। তিসির বিস্ময়ের শেষ ছিল না। যে পুরুষ ধর্ষণ করবার জন্য তাকে এই নির্জন গুহায় বয়ে এনেছে সে তো অপেক্ষা করে থাকবে না এতক্ষণ! দ্রুত তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে তাকে এই নির্জন অন্ধকার গুহায় ছেড়ে দিয়ে পালাবে।

তিসির এখন ভয় পাবার কিছু নেই। শুধু তার চরম পরিণতির জন্য প্রতীক্ষা করা।

অবশেষে তিসি কৌতূহলী হয়ে উঠল। সে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটাকে বলল, তুমি কে ? কেনই বা আমাকে এখানে এনেছ?

কোনও কথা নেই।

তিসি আবার বলল, কথা বল। তুমি ছাড়া আমি এই অন্ধকার গুহা থেকে বেরুতে পাবব না।

এখনও নিস্তব্ধ। কেবল জলস্রোতের ছলছল কলকল শব্দ গুহার মধ্যে বাজতে লাগল।

এবার সত্যি ভয় পেয়েছে তিসি। এতক্ষণ নিজের ওপর ভয়ঙ্কর একটা অত্যাচারের যে ভয় ছিল তা চলে গিয়ে অন্ধ গুহায় আটকে পড়ার ভয়টা প্রবল হয়ে দেখা দিল। তিসি আর্ত কান্নায় ভেঙে পড়ে বলল, তুমি যে-ই হও, কথা বল। আমার কাছে এস।

লা-লা, বলার সঙ্গে সঙ্গে দুটো হাত তিসিকে স্পর্শ করল।

এমন বিস্মিত আর অভিভূত কোনও দিন কোনও কিছুতেই হয়নি তিসি। সে আকুল আবেগে লা-কে বুকের কাছে টেনে নিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

এক মুহূর্তে এত উত্তেজনা আর এত আনন্দ তিসির জীবনে আর কখনও আসেনি। তিসি তো মনে মনে লা-কে প্রতিদিনই কামনা করেছে। শুধু মুখ ফুটে নিজেকে উৎসর্গ করে দিতে পারেনি।। তার রাত্রির নিদ্রা লা-এর স্বপ্নে উতলা হয়েছে। লা গোঙা বলে তার মনে তো কোনও দিন কোনও বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়নি। বরং লা-এর প্রতিটি কাজ, প্রতিটি আচরণ সে পাশে থেকে দেখেছে আর মনে মনে তারিফ করেছে। সে শুধু প্রতীক্ষা করেছিল এমনি একটি দিনের জন্য, যেদিন লা-ই তাকে তার জীবনের সঙ্গে বেঁধে নেবার কথা বলবে।

সেদিন দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরে গুহার জলস্রোতে অজস্র কলধ্বনি তুলে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। আর নিষ্ক্রান্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে আকাশে পরিপূর্ণ একটি চাঁদকে দেখেছিল। চাঁদ যে এমন মোহময় হতে পারে, তার জ্যোৎস্নায় প্লাবিত চরাচর যে এমন রহস্যময় হতে পারে তা এর আগে ওদের দুজনের একজনও অনুভব করেনি।

সেদিন রাতে গোষ্ঠীর সকলে দেখল লা তার গুহায় তিসিকে রাত্রিবাসের জন্য ডেকে নিয়ে গেল।

তিসি কাঁদছে। তার পুরনো দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।

ঝুরা আর টিথুর জন্মের পর ওরা জ্যোৎস্নায় সারারাত ধরে নেচেছিল। তিসি সে নাচে যোগ দিতে পারেনি কিন্তু সে বসে বসে দেখেছিল ওদের উন্মাদ নৃত্য। ভোজেরও ব্যবস্থা ছিল অঢেল। টিথুর জন্মের সময় প্রচণ্ড শীতে কাঁপছিল চরাচর। ওরা সারারাত কয়েকটা আগুনের কুণ্ড ঘিরে নেচেছিল।

গোংগা আর লা সকালবেলা টিথুর জন্মের পর বেরিয়ে গিয়েছিল শিকারে। একটা হরিণ শিকার করে কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে ফিরছিল দুজনে। তাই দেখে গোষ্ঠীর সকলের সে কী উল্লাস-নৃত্য! আগুনে সেঁকে তৃপ্তি করে খেয়েছিল তারা হরিণ মাংস।

লা কেবল শক্তিশালীই ছিল না, সে ছিল পরোপকারীও। পেটের দাহ হয়েছে, শিকার করতে গিয়ে মচকে গেছে পায়ের হাড়, ভাবনা নেই — লা ছুটেছে বন থেকে শেকড়বাকড়, ছাল পাতা আনতে। রাত জেগে সেবা করবে সে, যতক্ষণ না আহত, পীড়িত মানুষগুলো আরাম বোধ করে। এ কাজে সানন্দে তিসিও তার সঙ্গী হয়েছে প্রতিবার।

ঘুমের মধ্যে টিথু কেঁদে উঠল একবার। ঝুরা পাশ ফিরে ছোট ভাইটাকে জড়িয়ে শুল। যে আতঙ্কের ভেতর দিয়ে কেটেছে তাদের দিন তাতে সেগুলো যে স্বপ্নের ভেতরেও ঘোরাফেরা করবে, এতে আর আশ্চর্যের কি আছে।

বাইরে বৃষ্টি ঝরছে। গুহার মুখে পাথর সাজিয়ে, মাথার ওপর চামড়ার ছাউনি দিয়ে লা যে প্রবেশ-পথটি তৈরি করেছিল তার ওপর বৃষ্টির ফোঁটা অদ্ভুত এক ধরনের বাজনা বাজিয়ে চলেছে। এসব ফেলে রেখে চলে যেতে হবে তাদের। সম্পূর্ণ অপরিচিত জায়গায় আবার নতুন করে ঘর বাঁধতে হবে, যেখানে বন্ধু নেই, আত্মীয় নেই। লা আর কোনদিনও থাকবে না তার পাশে। হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল তিসি।

ভেড়াগুলোর মাঝখানেই শুয়েছিল দাহা। তার চোখে ঘুম আসেনি। একটু দূরে গুহার একপ্রান্তে গোংগা প্রবল গর্জনে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিল।

বৃষ্টি সামান্য থেমে আবার চড়বড়িয়ে এল। লা-এব তৈবি মিলন-কুঠিব ছাউনির ওপব সে শব্দ দ্রুত লয়ে বাজতে লাগল।

দাহার মনে হল, কদিন আগে যে লড়াইটা হয়ে গেছে সেটা আবার শুরু হয়েছে। মেঘের ডাকে, বিদ্যুতের চমকে, বৃষ্টির শব্দে, ঝড়ের গর্জনে চরাচর তোলপাড়।

বিপক্ষের মানুষগুলো ঐ ঝড়ের পাখিটার মতই পাহাড় থেকে নেমেছিল। যত কাছে এগিয়ে আসছিল, ততই তাদের রণ-হুঙ্কার বেড়ে উঠছিল। দলপতি লহু তার অতি ক্ষুদ্র দলটি নিয়ে দাঁড়িয়েছিল একটা টিলার আড়ালে। সকলের হাতেই হাতিয়ার। যদি তাদের পরিত্যক্ত সামান্য আস্তানাগুলোকে উপেক্ষা করে কোন বড় দলের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য মালভূমি দিয়ে নেমে যায় তাহলে স্বস্তি। না হলে লোকবল যতই স্বল্প হোক না কেন তারা লড়াইয়ের জবাব দেবে লড়াইতে।

দলের দ্বিতীয় প্রধান হল কুবাই। সে দলের প্রধান হবার জন্য বহুবার দলপতি লহুর সঙ্গে বচসা আর দ্বন্দ্বযুদ্ধ করেছে। অস্ত্র নিয়ে, অস্ত্র ছাড়া। প্রতিবার হার মানতে হয়েছে কুবাইকে। লহুর বুকখানা এতবড় চওড়া। সে ক্ষমা করে দিয়েছে শত্রুকে।

শেষবার কুবাই যখন যুদ্ধের ডাক দেয় তখন গোষ্ঠীর যে যেখানে ছিল এসে হাজির হল।

লহু বলল, বল, এবার কি নিয়ে যুদ্ধ করবি? কুঠার না বর্শা?

কুবাই তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল।

তবে কি ?

কোন হাতিয়ার নয়।

লহু বলল, খালি হাতে যুদ্ধ হবে?

উত্তর দিল কুবাই, হাত নয়, যুদ্ধ হবে শুধু মাথা দিয়ে।

সকলে চেঁচিয়ে উঠল, সে কি রকম?

কুবাই বলল, পাহাড়ের অনেক ওপরের খাঁজে দাঁড়িয়ে শিংওলা ছাগলগুলো যেমন ঢুঁ মেরে মেরে যুদ্ধ করে, আমরাও তেমনি করব সামনের পাহাড়ের খাঁজে দাঁড়িয়ে।

মেনে নিল লহু।

প্রায় সারাদিন যুদ্ধ চলল। এক শৈলশিরা থেকে অন্য শৈল শিরায় তাড়া করে ফিরল দুজন দুজনকে। দর্শকরা নীচে দাঁড়িয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে ওদের অজা-যুদ্ধ দেখতে লাগল। কুবাইয়ের মাথায় অজস্র চুল আর লহু বিরল কেশ। এই সুযোগটা নিতে চেয়েছিল কুবাই। দুজনে এক একবার মুখোমুখি হলেই প্রবল বিক্রমে মাথায় মাথা ঠুকছিল। কেউ চোখে অন্ধকার দেখে বসে পড়লেই অন্যজন বসে বসে তাকে ঢুঁ মারার চেষ্টা করছিল। এইভাবে শুয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে, পালিয়ে ওদের যুদ্ধ গড়াল সন্ধ্যা অব্দি। অবশেষে একটি পাহাড়ের ফাটলে আটকে গেল কুবাইয়ের পা। সে যন্ত্রণায় কাতরাতে লাগল। এই সুযোগে তার মাথার চারদিকে ঘুরে ঘুরে ঢুঁ মেরে তাকে একেবারে পেড়ে ফেলল লহু। প্রায় জিভ বের হয়ে এসেছে কুবাইয়ের। সে নিস্তেজ হয়ে ভেঙে পড়ল। দলের মানুষগুলো নীচ থেকে চীৎকার করে লহুকে বিজয়ী ঘোষণা করল।

লহুর সেই মুহূর্তে মনে হল, সে দলপতি। অমনি তার দলের আহত একটি লোকের ওপব কর্তব্যবোধ জেগে উঠল। সে পাহাড়ের ফাটল থেকে অনেক চেষ্টায় মুক্ত করল কুবাইয়ের পাখানা। তারপর নিজের পিঠে আহত মানুষটাকে তুলে নিয়ে পাহাড়ের উৎরাই পথে নেমে গেল।

সে সময় দিনে রাতে কুবাইকে সেবাযত্ন করেছিল দুজন। একজন, লহুর ছেলে দাহা আর অন্যজন কুবাইয়ের মেয়ে থিরি।

দাহার স্পষ্ট মনে আছে বাবাই তার ওপর কুবাইয়ের সেবার ভার দিয়েছিল। বন থেকে ওষুধের পাতা আর শেকড় এনে থেতো করে কুবাইয়ের গায়ে লাগিয়ে দেওয়া, অথবা বন-বরার চর্বি দিয়ে মালিশ করা, সে সময় তার নিত্য কর্ম ছিল। এ কাজে ওকে সাহায্য করত থিরি। আর এই সুযোগে তারা পরস্পর ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। অন্ধকার গুহায়, বনের গভীরে থিরিকে সে বুকের মধ্যে টেনে নিয়েছে। তাদের দেহের

মিলন ঘটেছে বার বার। যার ফলে ঝর্ণায় জল আনতে যাবার পথে থিরি তাকে বলেছে, বাচ্চা এসেছে পেটে।

সে জানত, বাবা তাকে কুবাইয়ের মেয়ের সঙ্গে ঘর বাঁধার অনুমতি দেবে না। গোষ্ঠীর মানুষ বলে কুবাইকে বাবা ক্ষমা করতে পারে কিন্তু তার মেয়েকে ঘরে তুলে এনে ঐ ধূর্ত মানুষটাকে কাছে টেনে নেবার কোনো মতলবই বাবার ছিল না। তাই থিরি আর সে এ নিয়ে বড় চিন্তায় পড়েছিল। চিন্তাটা খুব বেশি রকম মাথায় ঘুরছিল, থিরির পেটের বাচ্চাটাকে নিয়ে।

একদিন সে সব কথা খুলে বলল দিদিকে। তার কথা শুনে কতক্ষণ তিসি চুপচাপ বসে রইল। পরে বলল, কথাটা শুনলে বাবা তোকে দল থেকে তাড়িয়ে দেবে, আর থিরির বাবা তাকে পাথর ঠুকে ঠুকে মেরে ফেলবে।

তবে?

আরও খানিক চিন্তা করে তিসি বলল, লা-কে সব বলি। বাবা ওর কথা খুব শোনে। এদিকে কুবাই লা-কে হাতে রাখতে চায়। যদি কিছু করতে পারে তবে ও-ই পারবে। দিদির কথায় সেদিন একটা পথের নিশানা দেখতে পেয়েছিল সে।

লা-কে যে তিসি সব কথা বুঝিয়ে বলেছে তা দাহা বুঝতে পেরেছিল লা-র আচরণ থেকে। লা তাকে জড়িয়ে ধরে পরের দিনই মনের খুশী প্রকাশ করেছিল।

কিন্তু দাহা আর থিরির গোপন মিলনের কথা উভয় পক্ষের কাউকেই আর জানাতে পারেনি লা। সুযোগ খুঁজতে খুঁজতে লড়াইটা এসে গেল।

পাহাড় থেকে পঙ্গপালের মত নেমে আসতে দেখা যাচ্ছিল শত্রুপক্ষকে। লা-ই প্রথম ঘটনাটা লক্ষ্য করে। সে সামনের টিলায় উঠেছিল চকমকি পাথর সংগ্রহের জন্য, আর ঠিক সে সময়ই তার চোখ গিয়ে পড়ে দূরের পাহাড়ে।

ওরা তখনও পাহাড়ের অনেক ওপর থেকে নিচের দিকে পাহাড়ী ঝর্ণার মত নামছিল। লা প্রায় গড়িয়ে নেমে এল নিচে। ছুটে চলল লহুকে খবরটা দেবে বলে। লহু কিন্তু তখন তার আস্তানায় ছিল না। সে গিয়েছিল নদীর ওপারের জলাভূমিতে ডোঙায় চড়ে মাছ ধরতে।

একটা কিছু করতে হয়। গোংগা, সে এবং আরও অনেকে জড়ো হল লা-এর উদ্বিগ্ন ডাক শুনে। কুবাইকে তার গুহাতেই পাওয়া গেল। সব শুনে কুবাই গোষ্ঠীর লোকজন নিয়ে টিলায় উঠে ঘটনাটা সরজমিনে দেখে এল। এখন সে একটা সুযোগ পেয়ে গেছে মাতব্বরী করার।

আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল মেয়েদের ভেতর। কুবাই বলল, মেয়েরা সকলে বনের ভেতরে ঢুকে গা ঢাকা দিক। এখুনি চলে যাক তারা। আর সমস্ত পুরুষেরা হাতিয়ার নিয়ে চলে যাও টিলার আড়ালে।

একটু সময় চিন্তা করে কুবাই বলল, আমি ওদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেব।

কুবাই নিজের বর্শাখানা আর অনুগত একজনকে নিয়ে পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গেল।

কুবাই চলে গেলে লা আড়ালে তাকে ডেকে নিয়ে ইঙ্গিতে বলল, দাহা, তুমি তিসি আর আমার ছেলেমেয়েকে নিয়ে নদী পেরিয়ে জলার ধারে চলে যাও। সেখানে ঝোপ জঙ্গল, জলার মধ্যে লুকিয়ে থাকার অসুবিধে হবে না।

গোংগাকে ডেকে নিয়ে নদীর ধারে ঝাঁকড়া গাছটা দেখিয়ে বলল, তুমি তীর ধনুক নিয়ে ডাল-পাতার আড়ালে গাছের মগডালে চেপে বসে থাক। দরকার বুঝলে তীর ছুঁড়বে।

দাহার মনে আছে, সে লা-র কানে কানে বলেছিল, আমি তিসিদের নিয়ে চলে যাচ্ছি, কিন্তু থিরির কি হবে?

লা ইঙ্গিতে বলেছিল, তিসির ব্যাপারে আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারি, কিন্তু থিরির ব্যাপারে নয়। এখুনি কুবাইকে ঘাঁটিয়ে লাভ নেই। আমি থাকছি দলের সঙ্গে, টিলার পেছনে বনের দিকেও নজর রাখব। মেয়েরা কাছে পিঠে বনের আড়ালে লুকিয়ে থাকবে।

দাহা সেদিন তাদের আর একখানা ডোঙায় চেপে চলে গিয়েছিল তিসিদের নিয়ে নদীর পারের জলাভূমিতে। লহু্র সঙ্গে দেখা হয়েছিল তার। বাবাকে সে সবকথা জানিয়েছিল। তার অনুপস্থিতিতে কুবাই-এর সিদ্ধান্তের কথাও।

লহু বলেছিল, কুবাই-এর ব্যাপার-স্যাপার আমার ভাল লাগছে না। পাহাড়ী দলটা আমাদের মত অতি ছোট কোনো গোষ্ঠীকে দখল করার জন্য আসছে বলে মনে হয় না। ওরা ওপারের কোনো বড় দলের তাড়া খেয়ে হয়তো নীচের দিকে নেমে চলেছে। কুবাই-এর মতলব বোঝা যাচ্ছে না। ও ওদের সঙ্গে যোগ দিলে একটা লড়াই লেগে যেতেও পারে। আমাদের তৈরি থাকতে হবে।

কথাগুলি বলে লহু আর একদণ্ডও দাঁড়ায়নি। বাবা চলে যাবার পর সেদিন সে তিসি, ঝুরা আর টিথুকে জলার পাশে একটা ঝোপের আড়ালে বসিয়ে রেখে নিজে লম্বা একটা গাছের ওপর উঠে বসেছিল। সেখান থেকে দেখা যাচ্ছিল সবকিছু।

সে দেখল, তার বাবা ওপারে পৌঁছে ডোঙাটাকে ঝোপের আড়ালে রেখে দিল। অতি দ্রুত ছুটে চলে গেল দলের মাঝখানে।

দলের লোকেরা কুঠার আর বর্শা নিয়ে টিলার আড়ালে দাঁড়িয়েছিল। লহু তাদের কি সব যেন বুঝিয়ে দিয়ে উঠে গেল টিলার ওপর। ঠিক টিলার ওপরে সে দাঁড়াল না। চূড়ার ওপরে পড়ে থাকা একটা পাথরের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখল আর মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে দেখতে লাগল।

সে আরও দেখল, পাহাড় থেকে যারা নেমে আসছে তাদের দিকে এগিয়ে চলেছে কুবাই। লোকটার সত্যি ভয়ডর বলে কিছু নেই। সঙ্গে তার চেলা মুকাকেও দেখা যাচ্ছিল।

মানুষগুলো সংখ্যায় অনেক। আসছে তো আসছেই। ঐ তো কুবাই আর মুকা ওদের ভেতর মিশে গেল।

ওদিকে দেখা গেল টিলার ওপর থেকে বাবা দ্রুত নিচে নেমে যাচ্ছে। চীৎকার করে হাত নেড়ে নেড়ে সকলকে সতর্ক করে দিচ্ছে।

লা ছুটে চলে গেল টিলার পেছনের জঙ্গলে। হাতে লম্বা একখানা বর্শা। মেয়েরা লড়াইয়ের কথা শুনে ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে। পাবারই কথা। তারা ঘন বনে সিঁধিয়ে গিয়ে গা ঢাকা দেবার চেষ্টা করছে।

দেখতে দেখতে পৌঁছে গেল পাহাড়ী মানুষগুলো। সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল ওদের কুঠার আর বর্শার গড়নই আলাদা। এত মানুষ দেখে ভয়ে ওর দম বন্ধ হয়ে আসছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হচ্ছিল, দলের লোকদের সঙ্গে এসময়ে সে থাকতে পারলে ভাল হত।

ঐ তো দলপতি লহু টিলার ওপর গোষ্ঠীর সব মানুষকে নিয়ে জড়ো করছে। তারা বড় বড় পাথরের টুকরো সাজিয়ে রাখছে। টিলার ওপরে ওঠার পথের দিকে এবার একদল বর্শা তাক করে দাঁড়াল।

মানুষগুলো টিলার দিকে এগিয়ে গেল। এত মানুষ এর আগে কখনও দেখেনি দাহা।

শুরু হয়ে গেছে লড়াই। উত্তেজনায় কাঁপছে সে। টিলার ওপরে দাঁড়ান বর্শাধারীরা স্থির হয়ে আছে।

ওপর থেকে পাথরের টুকরো শিলা-বৃষ্টির মত পড়ছে। প্রথম যে দলটি টিলায় ওঠার চেষ্টা করছিল তাদের অনেকেই আহত হয়ে নিচে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে।

ওদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে একদল লোক। এখন আর ওরা টিলায় ওঠার চেষ্টা করছে না। ওদের একদল গুহা আর ছাউনির ভেতর ঢুকে ঢুকে খাবার বের করতে লেগে গেছে।

সারাদিন আর কোনো লড়াই হল না। সকলেই অভুক্ত। দুর্ভাবনায়, উত্তেজনায় সবাই ভুলে গেছে খাবার কথা। আর মনে পড়লেও কি হবে। খাবার তো হাতের কাছে নেই। ওরা কিন্তু আগুন জ্বালিয়েছে। আগুনের আলোয় দেখা যাচ্ছে ওদের কাঁপা কাঁপা চেহারাগুলো।

তিসি গাছের তলায় দাঁড়িয়ে ঘন ঘন জিজ্ঞেস করে জেনে নিচ্ছে যুদ্ধের খবর। বাবাকে, গোংগাকে, লাকে সে দেখতে পাচ্ছে কি না জিজ্ঞেস করছে।

ভোররাতে মনে হল লার গলার একটি তীক্ষ্ণ আওয়াজ। সে আওয়াজ সবাইকে অবাক করে দিয়ে দূরে কাছে বাজতে লাগল। মনে হল অনেকগুলো লোক বনের ওখানে মজুত আছে। বন থেকে মাঝে মাঝে

আর্তনাদ শোনা যাচ্ছিল। আহত মানুষের প্রাণফাটা চীৎকাব। পরে একদিন দাহা বনে ঢ়ুকে দেখেছিল, বহু মানুষের শব এদিকে, ওদিকে আর খাদে ছড়িয়ে পড়ে আছে। একা লা মেয়েদের রক্ষা করতে গিয়ে ঐ মানুষগুলোকে হত্যা করেছে। কিন্তু লা শেষ অবধি নিজেকে বাঁচাতে পারেনি।

তখন ভোর হয়ে গেছে। টিলার নিচে ঘিরে দাঁড়ানো আক্রমণকারীদের অনেকেই তখন ছুটে চলেছে বনের দিকে। দাহা এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে বনের ছবি। ঐ তো মুকা পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে শত্রুপক্ষের লোকজনদের। ভোর রাতে যারা মেয়েদের ধরে আনার জন্য বনে ঢুকেছিল তারাই নিহত হয়েছে লা-এর বর্শার আঘাতে। অথবা লা তাদের ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে পাশের খাদে। এর মাঝে সে অদ্ভুত চীৎকার করে জানাবার চেষ্টা করেছে, সে একা নয়, আরও অনেকে আছে তার সঙ্গে।

এখন বনের ভেতর দ্রুত এগিয়ে চলেছে কুঠার আর বর্শাধারীর দল। কুবাই, কুবাই-এর অনুচর মুকা লাফাতে লাফাতে তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

ঐতো ঝোপের ভেতর থেকে মেয়েদের টেনে টেনে এনে জড়ো করছে সে। মেয়েরা কপাল চাপড়ে কাঁদছে। থিরি কই! তাকে তো মেয়েদের ভেতর দেখা যাচ্ছে না। মুকা ছোটাছুটি করে কাকে যেন খুঁজছে। নিশ্চয়ই থিরিকে। থিরি যে কুবাই-এর মেয়ে সেটা জানিয়ে দেবে আক্রমণকারীদের।

সে হঠাৎ দেখতে পেল, দুজন প্রায় গড়াতে গড়াতে নেমে যাচ্ছে বনের ওপারে খাদের দিকে। থিরিকে নিয়ে নিশ্চয়ই আড়ালে লুকোবার চেষ্টা করছে লা। দলবলকে নিয়ে সেদিকে ছুটল মুকা। ইঁদুরের মত তার গতিবিধি। সে সকলের আগেই পৌঁছে গেল ওদের কাছে।

থিরিকে কি যেন বোঝাবার চেষ্টা করছে মুকা। দাহা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, থিরি রাগে মুকার বুকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবার চেষ্টা করছে। শেষে মুকা থিরিকে টেনে হেঁচড়ে ওপরে নিয়ে যাবার কসরৎ করতে লাগল। এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ওদের কথাবার্তা শুনছিল লা। এখন আর ও স্থির থাকতে পারল না। হাতের রক্তাক্ত বর্শাখানা এবার চালাল মুকার বুক লক্ষ করে। মুকা বর্শায় গাঁথা হয়ে একটা পাহাড়ী সাপের মত এঁকে বেঁকে ভাঙচুর হতে লাগল।

বোধহয় মুকাকে মেরে মনের ঝাল মেটাচ্ছিল লা, কিন্তু সে লক্ষ করেনি শমন তার পেছনে এসে গেছে। জানতে পারল থিরির প্রাণফাটা চীৎকারে। কিন্তু তখন আর কিছু করার ছিল না। একটা কুঠার শূন্যে উঠে চকিতে নেমে এল লা-এর ডান কাঁধে। সঙ্গে সঙ্গে বুক পর্যন্ত দু'ফাঁক হয়ে গেল। লা পাকা ফলটির মত মাটির ওপর খসে পড়ল। থিরি সে দৃশ্য দেখে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ার মুখে দু'তিনটে লোক তাকে ধরে ফেলল। এবার অচৈতন্য থিরিকে লোকগুলো বয়ে নিয়ে চলল বনের ভেতর দিয়ে।

সমস্ত শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছিল গাছের ওপর বসে। দাহার মনে হচ্ছিল, সে তখুনি নীচে পড়ে যাবে। কোনরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে সে নীচে নেমে এল। তার দিকে এতক্ষণ চেয়ে বসেছিল তিসি। ওকে নামতে দেখে আকুল হয়ে খবর জানতে চাইল। এখন তিসিকে কি বলবে দাহা। থিরি আর তার ছেলের চিন্তায় সে আকুল, তার ওপর লা-এর এই পরিণতি দেখে বুকখানা তার ভেঙে দুমড়ে গেছে।

বলল, খবর ভাল না। লড়াই চলছে।

দাহাকে নামতে দেখে কেঁদে উঠল টিথু। সে কিছু খেতে চায়। ঝরা কিছু বলল না, কেবল দাহার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল। তার মুখখানা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে।

ঝরাকে নিয়ে জলাভূমির জঙ্গলে খাবারের খোঁজে ঢুকলো সে। এখন তিসির কাছ থেকে কিছু সময় সে পালিয়ে থাকতে চায়।

পড়ন্ত বেলায় আবার সে গাছে উঠল। এখন লড়াই প্রায় শেষের মুখে। টিলার নিচে আর ওপরে ওঠার পথ জুড়ে বহু মৃতদেহ। পাহাড়ী মানুষদের একটা দল টিলার ওপরে ইতিমধ্যে উঠে এসেছে। মুখোমুখি লড়াই চলেছে দুপক্ষের। বাবার দিকে তাকাতে পারছে না সে। রক্তে ভিজে গেছে তার সারা শরীরটা। ঘুরে ঘুরে কুঠার চালিয়ে সে শত্রু নিধনে ব্যস্ত।

ও কে ! পেছন থেকে বাবাকে ধাক্কা দিয়ে টিলার নিচে ফেলে দিতে উদ্যত। ঐ তো কুবাই। এখন স্পষ্ট

হয়ে উঠেছে তার চেহারা। কিন্তু কোথা থেকে একটা তীর উড়ে এসে বিঁধে গেল কুবাই-এর পিঠে। সে ধাক্কাটা দিয়েই তীর বেঁধা অবস্থায় টাল সামলাতে না পেরে লহুর সঙ্গে জড়িয়ে টিলার ওপারে গড়িয়ে পড়ল।

ওরা এখন সবার দৃষ্টির বাইরে চলে গেলেও সে ঠিকই গাছের ওপর থেকে বাবা আর কুবাইকে দেখতে পাচ্ছিল। কুবাই গভীর জঙ্গলের ভেতর উল্টে পাল্টে পড়ে গেল। আর লহু মস্ত বড একটা পাথরের ফাটলে আটকে রইল।

পরের দিন ভোরে দেখা গেল, টিলার ওপরে আর নিচে শুধু মৃতদেহ ছড়িয়ে পড়ে আছে। বিজয়ী পাহাড়ীরা রণহুঙ্কারে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে মালভূমির দিকে নেমে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

ওরা গোষ্ঠীর কতকগুলি ছোট ছোট বালক-বালিকা আর মেয়ের দলকে সঙ্গে নিয়ে চলতে শুরু করল। ঐ তো অসহায় থিরি মুখ নিচু করে চলে যাচ্ছে ওদের সঙ্গে।

গাছের ডাল সে জোর করে জড়িয়ে ধরেছিল, না হলে হয়তো পড়েই যেত নীচে।

ওরা চোখের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যেতে হাহাকার করে উঠেছিল সে। গাছ থেকে নেমে এসে সে মাটিতে আছড়ে পড়েছিল। তার অবস্থা দেখে কেঁদে উঠেছিল তিসি আর দুটো ছেলে মেয়ে।

ডোঙাতে সবাইকে তুলে নিয়ে দাহা যখন ওপারে পৌঁছল তখন গোংগা পাহাড়ের খাঁজ থেকে তার মৃতপ্রায় বাবাকে উদ্ধার করে এনেছে। গাছের আড়ালে থেকে সে-ই তীর ছুঁড়ে যথাসময়ে কুবাইকে ঘায়েল করেছিল। সে দেখতে পেয়েছিল লহুর দেহ গড়িয়ে পড়ে একটা খাঁজে আটকে গেল।

সে রাতটাও একটা দূরের গুহায় সবাই মিলে আতঙ্কে কাটাল।

যুদ্ধের আভাস পেয়ে যে ভেড়াগুলোকে বনের দিকে তাড়িয়ে দিয়ে ছিল, তারা রণহুঙ্কার শুনে ভয়ে কটা দিন তফাতে তফাতেই ছিল, এখন আবার সাহসে ভর করে ফিরে এল তারা।

তিসি নির্বাক। লা-এর মৃত্যুর খবর শুনে বুকখানা তার পাথর হয়ে গেছে।

লহুকে বাঁচাবার অনেক চেষ্টা করা হল, ক্ষতগুলোতে প্রলেপ লাগান হল, কিন্তু কিছুতে কিছু হল না। ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে এল লহু।

মৃত্যুর আগে ছেলেমেয়েদের কাছে ডাকল। তার নির্দেশে তারই ব্যবহার করা একটা বর্শা আনা হল। এ বর্শাটা তার যোয়ান বয়সে তার বাবা গোহাই হাতে তুলে দিয়ে বলেছিল, এটা একটা লাঠির মাথায় ফলা নয়রে, এতে আছে তোর খাবার, তোর বলবিক্রম।

বর্শাটা নিয়ে গোংগার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল. শেষ সময়ে এটা তোকে দিয়ে গেলাম। আমি যা পারিনি, তুই তা পারবি।

এবার গুহার মধ্যে রাখা বহুদিনের পুরানো একটা খোন্তার খোঁজ পড়ল। সেটা আনা হলে তিসির হাতে তুলে দিয়ে বলল, এটা তোর মা বন থেকে কন্দ খুঁড়ে আনবার জন্য নিয়ে যেত। তোর মায়ের জিনিস তোর হাতে তুলে দিলাম। মাটিতে তোর খাবার রয়েছে। ঠিকমত এটাকে ব্যবহার করিস, মাটি তোকে খাবার দেবে।

দাহার ডাক পড়ল এবার। সে কাছে এলে লহু বলল, তুই আমার ছোট ছেলে। এখন আমার বলতে আর কিছু নেই, শুধু এই কটা ভেড়া ছাড়া। এগুলো তোকে দিয়ে গেলাম। যত যত্ন করবি, তত ফল পাবি। এরা কোন দিনও কমবে না। দিনে দিনে বেড়ে চলবে। এর থেকে খাদ্য, পানীয় আর পরিধেয়, তিনটেই পাবি। শুধু পাবি না ঘর। আকাশের তলায়, ঘাসের জমিতে সংসার পাততে হবে।

বেশ কিছু সময় চুপ করে থেকে লহু অতি ধীরে বলল, যত তাড়াতাড়ি পার এ জায়গা ছেড়ে চলে যাও। যে যার মত নতুন জায়গা নিজেরাই বেছে নিতে পারবে।

এই কটি কথা বলে লহু চোখ বুজল।

কদিনের প্রবল বর্ষণের শেষে আকাশে কোমল সোনালি রোদ্দুর উঠল। তিসি বলল, এখন তাহলে চলা

যাক্।

ওরা নদীর তীর বরাবর হাঁটতে লাগল। গোংগা দড়ি বেঁধে তার ডোঙাটাকে টেনে নিয়ে চলছিল। তিসি চলেছিল ছোট ছেলে টিথুর হাত ধরে, আর ভেড়ার পাল তাড়িয়ে নিয়ে চলছিল দাহা। কখনও বা দলছুট ভেড়াদের দলে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করছিল তিসির মেয়ে ঝুরা।

তিনটে সূর্য আর তিনটে চাঁদের উদয় অস্ত দেখে ওরা এক সময় একটা পাহাড়ের ধারে এসে পৌছল। পাহাড়ের তলায় ঘন বন। নদীটা এখানে বেশ চওড়া হয়ে দুটো শাখায় বিভক্ত হয়েছে। একটি শাখা পাহাড়ের একপ্রান্ত বেষ্টন করে ভিন্নমুখে বয়ে চলে গেছে। আর নদীর মূল প্রবাহটি কিছুদূর গিয়ে সৃষ্টি করেছে একটি ছোট্ট দ্বীপ। ঐ দ্বীপের সঙ্গে মূল ভূখণ্ডের পাহাড় আর ব'নের ব্যবধান মাত্র একটি অপরিসর খালের। দ্বীপটি অতি ক্ষুদ্র হলেও তার মধ্যে একখণ্ড নিবিড় বন আছে।

তিসি বলল, এ জায়গাটা আমার বেশ পছন্দ। অনেক দূরে কোথাও না গিয়ে ঐ ছোট্ট দ্বীপটাতে ঘর বাঁধলে ভাল হয়।

দিদির কথা শুনে গোংগা বলল, বেশ তাই হবে, তুই এখানেই থাক।

এরা ডোঙায় চড়ে খাল পেরিয়ে উঠল সেই দ্বীপে। পুরানো একটা গাছে অনেক পাখির বাসা। পলিমাটিতে তৈরি জায়গাটা ভারী উর্বর।

কয়েকদিন সেখানে থেকে ওরা তিসি আর তার ছেলেমেয়েদের জন্য একটা ঘর বানাল। ওপরে দেওয়া হল সঙ্গে নিয়ে আসা চামড়ার ছাউনি। ওখানে বন ঢুঁড়ে দেখা গেল মাটির তলায় অনেক কন্দ রয়েছে। তাছাড়া নানা ধরনের বন্য ফুলে ফলে ছেয়ে আছে ঝোপঝাড়। অজস্র কচ্ছপ ডাঙায় উঠে ডিম পেড়ে যায়। ভারী উপাদেয় সে ডিম।

গোংগা বলল, দিদি, তুই আমার ডোঙাটা কাছে রেখে দে, খাল পারাপারের দরকার হলে কাজে লাগবে।

তিসি বলল, ওটার কি আর কিছু দরকার হবে, আমি তো এই দ্বীপেই থাকব।

তবু থাক ওটা তোর কাছে। কখন কি বস্তু কি কাজে লেগে যাবে, তা আগে থেকে বলা যায় না।

তিসি আর তার ছেলেমেয়েকে ঐ দ্বীপে রেখে গোংগা আর দাহা বেরিয়ে পড়ল। দিদি তার দু'ভাইকে অনেক চোখের জল ফেলে বিদায় দিল। ডোঙায় করে দুজনকে পৌঁছে দিয়ে এল নদীর চওড়া দিকটার ওপারে।

আরও ক'দিনের পথ পেরিয়ে ওরা এসে পৌঁছল এমন একটা জায়গায় যেখানে নীল শৈলমালা বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত। স্বাভাবিক ভাবে পাহাড়ের তলদেশ অরণ্য-সমাচ্ছন্ন। একাধিক ঝর্ণা পর্বতের গা বেয়ে কলধ্বনি তুলে ঝরে পড়ছে। ঐ সব ঝর্ণার জল থেকে সৃষ্টি হয়েছে নাতিদীর্ঘ একটি জলাশয়। তীরভূমি বিচিত্র বর্ণের উপলে আকীর্ণ।

গোংগা ভাইয়ের মুখের দিকে তাকাতেই দাহা হেসে বলল, বুঝেছি, তুই এখানেই থাকতে চাস। জায়গাটা সত্যিই ভাল।

তুইও এখানে থাক।

দাহা বলল, তা হয় না। আমাদের কোনও ঘর বাঁধতে নেই। এক চারণভূমি থেকে অন্য চারণভূমিতে পশুচরিয়ে বেড়ানো আমাদের কাজ। গাছের তলা, পাহাড়ের গুহা থেকে আমাদের তো কেউ আর তাড়িয়ে দিতে পারবে না।

গোংগা বলল, বাবা মারা যাবার সময় এ ধরনের একটা কথা তোকে বলেছিল। বেশ তাই হোক।

দাহা গোংগার কাছ থেকে চলে যাবার আগে বনের ভেতর দু'ভাই মিলে শক্ত কাঠের ডালপালা দিয়ে একটা আস্তানা বানালো। অবশ্য সে আস্তানাটা হল একটা মোটা গাছের কাণ্ড আর ডালের খাঁজে। পশুদের উপদ্রব থেকে কিছুটা রেহাই পাবার জন্য এ ধরনের ব্যবস্থা করা হল। এবার দাহা পা বাড়াল তার ভেড়াদের নিয়ে চলে যাবার জন্য।

গোংগা বলল, দাহা, হয়তো আমাদের আবার দেখা হবে।

দাহা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, একসঙ্গে এতকাল ছিলাম, এখন সবাই আলাদা হয়ে গেলাম, তবু ভুলতে কি আর পারব। কোনো দিন ভেড়া চরাতে চরাতে হয়তো তোর আস্তানায় এসে পড়ব।

দাহা তার ভেড়ার পাল তাড়িয়ে নিয়ে চলে গেল। গোংগা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে দাহার শেষ ছায়াটি মুছে যাওয়া পর্যন্ত চেয়ে রইল।

।। দুই ।।

ঝুরা এসে বলল, দেখ মা, আমি কতগুলো কচ্ছপের ডিম এনেছি।

তিসি মেয়ের হাত থেকে ডিমগুলো নিয়ে বলল, খুব কাজের মেয়ে হয়েছ তুমি। ভাই কই?

পাখি দেখছে।

তুমি ওর কাছে যাও, একা একা ও যেন নদীর ধারে না যায়।

ঝুরা বড় শান্ত আর বাধ্য মেয়ে। টিথু অনেকটা বেশি চঞ্চল। অবশ্য এ বয়সে ছেলেদের সবকিছু নেড়ে চেড়ে দেখার আগ্রহ বেশি হয়। টিথু খরগোশের পেছনে ছুটতে ভালবাসে। পাখি উড়ে গেলে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

আকাশ পরিষ্কার। চারিদিক রোদে ঝলমল করছে। কদিন আগে অঝোরে বৃষ্টি ঝরে গাছপালার ধুলো ধুয়ে মুছে দিয়ে গেছে, বনের সবুজ পাতার ওপর রোদ যেন পিছলে পড়ছে।

ঝুরা ভায়ের কাছে চলে গেল। তিসি খোন্তাখানা নিয়ে বেরুল বনের দিকে। সে বনে ঢুকেই বিশেষ একটি লতা দেখে তার গোড়ায় খোন্তা চালাল। খানিকটা মাটি খুঁড়তেই মিলে গেল মস্তবড় একটা মেটে আলু। আলুটার চারদিকে কচ্ছপের মুখের মত মুখ বেরিয়েছে। তিসি মুখগুলোকে ভেঙে ছড়িয়ে দিয়ে কন্দটাকে কাঁধে তুলে নিয়ে এল। আজ সে বড় খুশি। কদিন আলুটাকে কেটে একটু একটু করে পুড়িয়ে খাওয়া যাবে। তার সঙ্গে কচ্ছপের ডিম তো আছেই। ছেলেমেয়ে দুটো খাই খাই করছে কদিন ধরে।

দুপুরের খাওয়া শেষ হলে টিথুর হাত ধরে খেলতে বেরিয়ে গেল ঝুরা। নদীর ধারে এল, যেখানে বন হঠাৎ থেমে গেছে। সেখানে একটা গাছের পাতার ওপর ঝিলমিলে রঙের পোকা এসে বসে। ঝুরা এ কদিন লক্ষ্য করেছে পোকাগুলোর গতিবিধি। ওরা সবুজ রঙের পাতা থেকে যখন উড়ে যায় তখন ফুটো ফুটো হয়ে যায় পাতা। তার মনে একটা ভাবনা জেগেছে, ওরা কি পাতা খায়!

সে একদিন খপ্ করে একটা পোকা ধরেছিল ভাইকে দেখাবার জন্য। চকচকে রঙ বেরঙের পোকা, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। টিথুর হাতে দিতে সে ভয় পেয়ে ছেড়ে দিল। পোকাটা অমনি বোঁ-ও-ও শব্দ করে উড়ে পালাল।

একদিন ঝুরা নদীর ধারে গিয়ে দেখল, একটা কচ্ছপ একটু দূরে জল থেকে ডাঙায় উঠে গুটি গুটি এগিয়ে চলেছে। সে কৌতূহলী হয়ে উঠল, যাচ্ছে কোথায় জীবটা।

একটু পরে পা দিয়ে মাটি আঁচড়ে একটা গর্ত খুঁড়ে ফেলল আর তার ওপর দিব্যি থেবড়ে বসে পড়ল। কিছুক্ষণ পরে ঐ গর্তটার ওপর মাটি চাপা দিয়ে আবার গুটি গুটি জলে নেমে গেল।

ও নদীতে চলে গেলে ঝুরা ঐ গর্তটার কাছে গিয়ে মাটি সরিয়ে দেখল কচ্ছপ ডিম পেড়ে রেখে গেছে। আগের দিন ও যে ডিম পেড়েছিল সেগুলো পড়েছিল মাটিতে। বন থেকে একটা বেজিকেও বেরিয়ে আসতে দেখেছিল। ওকে এগিয়ে যেতে দেখে বেজিটা সরেও গিয়েছিল। এখন ঝুরা বুঝতে পেরেছে ঐ বেজিটা আসলে কচ্ছপের ডিমগুলো মাটি খুঁড়ে বের করেছিল নিজে খাবে বলে। ও সেদিন এসে পড়ায় ডিমগুলো ছড়িয়ে রেখে পালিয়েছিল। ঝুরার একটা অভিজ্ঞতা হল, কচ্ছপ জল থেকে উঠে এসে কেমন করে ডিম পেড়ে যায়। তারপরেও কচ্ছপ সম্বন্ধে অনেকগুলো নতুন নতুন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছিল ঝুরা। ডিম থেকে বাচ্চাগুলো বাইরের সাদা খোলাটা ফাটিয়ে কেমন করে বেরিয়ে আসে, মা তাদের কেমন করে জলে ডেকে নিয়ে চলে যায়, — এইসব অনেক দৃশ্য সে দেখেছিল দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

টিথুটার এসব ব্যাপারে ঝোঁক নেই, সে কেবল পাখি দেখলে মেতে ওঠে। শয়ে শয়ে পাখি সকালের আলো ফুটলেই ওদের আস্তানার সামনের ঝাঁকড়া গাছটায় জটলা করে। ওদের কিচমিচ শব্দে রোজ টিথুর ঘুম ভেঙে যায়। ও মায়ের পাশ থেকে চুপি চুপি পা টিপে টিপে উঠে আসে। বাইরে সে পাখিদের উঁচু গলার কলরব শুনতে পায়। ওরা যখন দল বেঁধে হৈ-হৈ করতে করতে গাছ ছেড়ে উড়ে যায় তখন সেও হাত দুটোকে সামনে পেছনে ডানার মত টানতে টানতে তাদের পেছন পেছন অনেকখানি ছুটে যায়। পাখিগুলো ঝাঁক বেঁধে নদীর চরে গিয়ে বসে। খির্ খির্ করে ছুটে যায়, আবার লাফিয়ে লাফিয়ে ঘোরে। ঠোঁটে ঠুকরো ঠুকরো কি সব তুলে তুলে খায়। অবাক হয়ে টিথু দেখতে থাকে ওদের চলাফেরা।

একদিন একটা ঘটনা ঘটল।

টিথু সেদিনও ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল পাখিদের কলরব শুনে। আজ পাখিরা নদীর চরের দিকে না গিয়ে অন্য দিকে উড়ল। টিথু দেখল, ওরা বনের দিকে যাচ্ছে। ও আর কোনদিকে না তাকিয়ে ছুটল বনের দিকে। বনের ভেতর ঢুকে এদিক ওদিক করতে গিয়ে একসময় ও হারিয়ে গেল। বনের অনেকখানি ভেতরে চলে এল ও। পাখিদের কলরব শোনা যাচ্ছিল। ও একটা গাছের তলায় থমকে দাঁড়াল। সামনে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা। ঐ ফাঁকাটুকু ঘিরে চারদিকে গাছগাছালি। ফাঁকা জায়গায় বসে পাখিগুলো ফুরুৎ ফুরুৎ করে এদিক ওদিক উড়ছে, নিজেদের ভেতর কি সব বলাবলি করছে আর এক ধরনের দানা মাটি থেকে কুড়িয়ে কুড়িয়ে খাচ্ছে।

এদিকে রোদে ছেয়ে গেছে চারদিক, টিথুর দেখা নেই। কিছুক্ষণ হাঁকডাক চলল, সাড়া নেই। তিসি আর ঝুরা ছুটল নদীর দিকে। যেখানে দিদির সঙ্গে এসে রোজ দাঁড়ায় কচ্ছপ দেখবে বলে, সেখানে পাওয়া গেল না তাকে। রঙীন পোকাদের গাছতলায় খোঁজা হল, টিথু নেই।

এবার উদ্বেগে আকুল হয়ে তিসি ঢুকল বনে। সঙ্গে চলল ঝুরা। ভাইকে এতক্ষণ দেখতে না পেয়ে চোখে তার জল এসে গেছে।

অনেকখানি বন চঁড়ে দেখতে পাওয়া গেল টিথুকে। তিসি ছেলেকে জড়িয়ে ধরে বুকে তুলে নিল।

এবার ঘরে ফেরার পালা, কিন্তু ফিরতে গিয়েও ফেরা হল না। ফাঁকা জায়গাটা তিসির চোখকে টেনে ধরল।

তখনও পাখিগুলো হুটোপুটি করে খাচ্ছিল শস্যের দানা। তিসি ছেলেকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে ফাঁকা জায়গাটার মাঝখানে চলে গেল। শস্যের দানাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখতে লাগল। পাশেই লম্বা লম্বা ঘাসের মত কিছু কিছু ছড়িয়ে পড়েছে মাটিতে। পাখিগুলো খাচ্ছে সেই বীজ। তিসি ভাবল, পাখি যখন খাচ্ছে তখন এ দানাগুলো মুখে ফেলে দেখা যেতে পারে। সে দানাগুলো ঘসে ঘসে প্রথমে তাদের খসখসে খোসা বের করে দিলে। তারপর মুখে পুরে চিবুতে লাগল।

আশ্চর্য হয়ে গেল তিসি। দানাগুলো বিস্বাদ তো নয়ই বরং বেশ সুস্বাদু। আর অজস্র তেমনি বীজ লেগে আছে গাছের মাথার দিকে।

পাশাপাশি লম্বা ঘাসের মত গাছগুলো শস্যের ভারে নুয়ে পড়েছে।

অনেকগুলো গাছ বীজ সমেত তুলে নিয়ে ঘরে ফিরে এল তিসি। শক্ত ডাল দিয়ে পিটিয়ে গাছ থেকে ছাড়িয়ে নিল বীজ। তারপর হাতে না ঘসে পাথরের ওপর বীজগুলো রেখে আর একখানা পাথর দিয়ে ঘসে খোসা ছাড়িয়ে দেওয়া হল। দাঁতের বদলে ঐ পাথর দিয়েই পেশাই করা হল দানাগুলো। অনেক সাদা গুঁড়ো জমে উঠল। তিসি পাথরের পাত্রে একটুখানি জলে ঐ গুঁড়ো গুলে ছেলেমেয়েকে দিয়ে নিজে খেল। এ জিনিসটার নতুন স্বাদ, আবার পেটও ভরে থাকে।

তিসি সারা বন ঢুঁড়ল কিন্তু তেমনি লম্বা ঘাসের মত গাছ আর দেখতে পেল না কোথাও।

এদিকে প্রকৃতির পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে উধাও হয়ে গেল সে গাছ। মাঝে মাঝে বীজ সংগ্রহের আশা নিয়ে তিসি বনের সেই নির্দিষ্ট জায়গাটিতে আসত। কিন্তু গাছগুলি নষ্ট হয়ে যাওয়ায়, সে আর এল না।

বর্ষা আর শীত চলে গিয়ে এল বসন্ত। বনের গাছে গাছে মরা ডালে ডাকল সবুজের বান। চোখকে

টেনে নিল ডালে ডালে লাল ফুল।

তিসি কিসের যেন আকর্ষণে ঢুকল বনের মধ্যে। প্রথম যেদিন লা তাকে ঝর্ণার ধারে তুলে নিয়ে যায় সেদিন ফেরার পথে তার জন্যে গাছের ডাল নুইয়ে লাল ফুল পেড়ে দিয়েছিল। লা জানত, সে লাল ফুল বড় ভালবাসে।

তিসি বনের ভেতর লাল ফুলের দেখা পেল, কিন্তু গাছের অনেক ওপরের ডালে থাকায় সে পাড়তে পারল না। নিচে যে কটি ফল পড়েছিল তাই কুড়িয়ে মাথার ঘন চুলের ভেতর গুঁজে রাখল। ঘরে ফিরে ঝুরাকে দিতে হবে। টিথু দিদির হাতে ফুল দেখে বায়না ধরবে। তাকেও দিতে হবে ফুল।

পায়ে পায়ে কখন তিসি চলে এসেছে বনের সেই ফাঁকা জমিটার সামনে। অনেকদিন পরে এসে অবাক হয়ে গেল। সেই লম্বা ঘাসের মত গাছগুলো মাটি ফুঁড়ে কখন যেন জেগে উঠেছে। সবুজ মলমল করছে। তাদের মাথায় ছড়া ছড়া বীজ।

বীজগুলো গাছ থেকে ভাঙতে গিয়েও ভাঙল না তিসি। বিকেলের পড়ন্ত রোদের মত রঙ ধরবে যখন গাছে তখনই সে বীজ সংগ্রহ করবে।

আস্তানায় ফিরতে ফিরতে ভাবনা এল, কোত্থেকে আবার গজিয়ে উঠল এ গাছ। অনেক ভাবনার পরে তার মনে হল, নিশ্চয়ই মাটির তলায় জমা ছিল বীজগুলো, সময়মত গাছ হয়ে বেরিয়ে এসেছে।

কিছুকাল পরে গাছের সবুজ শরীরে যখন ধরল রোদ্দুরের রঙ তখন তিসি সংগ্রহ করল প্রচুর শস্য। সে অনেকদিন ধরে অল্প অল্প করে খেল। এবার পাথরের পাত্রে বীজের গুঁড়ো অল্প জলে গুলে আগুনে সেঁকে খেল। অনেক ভাল লাগল খাবারটা।

কিছু বীজ রেখে দিয়েছিল তিসি। শীতের সময় যখন গাছের পাতা ঝরে পড়ল তখন তিসির মনে হল, এই উপযুক্ত সময়। সে বাবার দেওয়া খোন্তা আর ঐ বীজ নিয়ে চলল বনের ভেতর। খোন্তা দিয়ে প্রথমে খুঁড়ে ফেলল ফাঁকা জায়গার সবটুকু অংশ। তারপর বীজগুলো সব ছড়িয়ে দিল সেখানে।

এরপর চামড়ার থলিতে নদী থেকে জল বয়ে এনে সময়ে সময়ে ছড়ানো হতে লাগল নতুন ক্ষেতে।

ধীরে ধীরে গাছ বেরিয়ে বড় হয়ে উঠল। এখন বীজের কোন চিহ্ন নেই গাছের শরীরে। এক সময় সবুজ বীজ দেখা দিল গাছের আগায়। তারপর সে বীজকে দুধে পুষ্ট হতেদেখল তিসি।

শীত চলে গেলে এল গ্রীষ্মের দিন। উপভোগ্য উষ্ণতা। আর ঠিক সেই সময় ফসল পেকে তিসিকে তোলার জন্য আমন্ত্রণ জানাল।

তিসি এ বছর আরও অনেক ফসল ঘরে তুলল। সে ঐ শুকনো ঘাস পাকিয়ে পাকিয়ে মরাইয়ের মত একটা কিছু বানাল। তার ভেতর রেখে দিল ঝাড়ানো শস্যের দানা। প্রয়োজনমত ঐ পাত্র থেকে নিয়ে ব্যবহার করতে লাগল তিসি।

দুচার বছরের ভেতরে ছেলেমেয়ে দুজনেই এই চাষের কাজে সাহায্য করতে লাগল তাদের মাকে।

এ এক নতুন জীবন, নতুন উন্মাদনা। তিসি এই শস্যের বীজ ছড়াবার জন্য নতুন নতুন জমির খোঁজ করতে লাগল। আরও কোন ধরনের বীজ কোথাও আছে কিনা, তার খোঁজ করতে একদিন তিসি বেরুল খালের ওপারের পাহাড়ের দিকে।

ছেলেমেয়েদের সাবধানে থাকতে বলে ডোঙা চালিয়ে ওপারের ডাঙায় গিয়ে উঠল তিসি। ডোঙাটা বেঁধে রেখে খোন্তা হাতে ও এগিয়ে চলল পাহাড়ের দিকে। সেই একই রকম পাহাড়, গায়ে ঘন বন আর একপাশে নদীর রেখা।

তিসি পাহাড়ে পৌঁছে বন চিরে ওপারে উঠতে লাগল। তার চোখের দৃষ্টি ঘুরতে লাগল এদিকে ওদিকে। যদি নতুন কোনো একটা ফাঁকা জায়গা চোখে পড়ে। যদি সেখানে খাবার উপযুক্ত কোনো বীজের সন্ধান পাওয়া যায়।

কিন্তু সারাদিন এদিক ওদিক ঘুরে একবোঝা ক্লান্তিই শুধু সংগ্রহ করল তিসি। সে নেমে আসছিল বিষণ্ন মনে এমন সময় কি যেন দেখে সে থমকে দাঁড়াল।

প্রথমে চিনতে না পারলেও অল্প সময়ের ভেতরেই সে বুঝল, সামনের পাহাড়ী গুহাটার দিকে মুখ করে একটা মানুষ চুপচাপ কি যেন ঘসে চলেছে।

এতদিন পরে আস্ত একটা পুরুষমানুষ দেখে উৎসাহের সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা উত্তেজনাও জেগে উঠল তিসির মনে।

সে সামনে এগিয়ে গিয়ে নির্ভীক গলায় বলল, কে তুমি?

লোকটি প্রথমে কিছু শুনতে পেল না, সে যেমন ঘসে চলেছিল তেমনি ঘসেই চলল।

এবার তার অনেক কাছে এগিয়ে গিয়ে তিসি বলল, এই গুহাতেই থাক তুমি?

লোকটা মনে হল, এইবার সম্বিত ফিরে পেয়েছে। সে পেছ' ফিরে তিসিকে দেখল। বেশ খানিকটা বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটে উঠল তার চোখে মুখে।

এবারও তিসি নিজের বুকে প্রথমে আঙুল ঠেকিয়ে, তারপর লোকটির দিকে আঙুল তুলে বলল, আমি তিসি, তুমি কে?

লোকটা তিসির ভাষা না বুঝলেও ওর প্রশ্নের বিষয়টা বুঝতে পারল। সে অমনি বলল, আমি গোহর, ছবি এঁকে গুহা ভরে তুলি। এই পাহাড়ের অনেকগুলো গুহাতে আমি ছবি এঁকেছি, আরও অনেক বাকী আছে।

কথার সঙ্গে সঙ্গে আকার ইঙ্গিতে বোঝানোর চেষ্টা চলল।

তিসি সূর্যের আলোতেই গুহার অনেকখানি অংশ দেখতে পাচ্ছিল। সে হাঁটু গেড়ে বসে উঁকি দিয়ে দেখতে লাগল। একটা নতুন জগৎ তার চোখের সামনে ফুটে উঠল; সে কখনও গুহার ভেতরে ছবি দেখেনি। প্রকৃতির রঙ ছাড়া আর কোনো রঙ যে ব্যবহার করা যায় তা তার ধারণার বাইরে। সে অবাক হয়ে গুহার ভেতরের ছবিগুলোতে চোখ বোলাতে লাগল।

মানুষটা মধ্য যৌবনে পৌঁছেছে। শরীরের গঠন বেশ আকর্ষণীয়। এক ঝলক দেখেই তিসির পছন্দ হয়েছিল মানুষটাকে। এখন তার ছবি দেখে সে একেবারে মুগ্ধ।

ঐ তো হরিণের দল ছুটে চলেছে প্রাণভয়ে। শিকারীরা বর্শা উঁচিয়ে ছুটেছে তাদের পেছনে পেছনে। আরে এ যে লা আর গোংগা না। অবিকল তাদের মত। তিনদিক থেকে হরিণগুলোকে ঘিরে আসছে ওরা। ঐ তো একটা হরিণ পেছন ফিরে এক লহমা তাকিয়ে নিচ্ছে। শিকারীরা আর কত দূর! সে ওদের কাছ থেকে পালাতে পারবে তো? ঘরে বাচ্চাগুলো তার পথ চেয়ে আছে।

হরিণটাকে দেখে তিসির মনটা টিথু আর ঝুরার জন্যে হু হু করে উঠল। সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এমন ছবি আমি কোনও দিন দেখিনি।

লোকটি বলল, এখনও অনেক ছবি বাকী, আর দেখবে না?

তিসি লোকটির বক্তব্য বুঝতে পেরে বলল, শিগ্‌গির আর একদিন এসে তোমার ছবি দেখে যাব।

মানুষটা কি বুঝল কে জানে, হাসল।

তিসি নিচে নেমে যাচ্ছিল, গোহর পটুয়া পেছন থেকে হাঁক মেরে বলল, থাক কোথায়?

পেছন ফিরে দাঁড়াল তিসি।

লোকটি এবার ইঙ্গিতে মাথা নেড়ে জানতে চাইল তিসির ডেরাটা কোথায়।

তিসি বুঝল ওর ইঙ্গিত। আঙুল তুলে দেখাল, আবার মুখেও বলল, ঐ নদীর চরে।

এবার দ্রুত পায়ে নেমে চলল তিসি। অনেকক্ষণ ঘর ছাড়া, ছেলেমেয়ে দুটো কি করছে কে জানে!

আস্তানায় পৌঁছে ওদের দুজনকে দেখতে না পেয়ে তিসি আবার ছুটল নদীর ধারে। দূর থেকে দেখল, দু'ভাইবোনে দাঁড়িয়ে কি যেন করছে। কাছে আসতে টিথুই প্রথম ছুটে এল মায়ের সামনে। হাতে তার একটা কচ্ছপ।

আমি এটাকে ধরেছি মা।

কোথায়?

ডিমের ওপর বসেছিল। ঝুরা বলছে, ছেড়ে দে। ছাড়ব কেন মা?

কচ্ছপটা খাদ্য হিসেবে উপাদেয় হলেও এই মুহূর্তে ওটাকে তার ভাবী বাচ্চাদের কাছ থেকে সরিয়ে নেবার ইচ্ছে হল না তিসির। সে টিথুকে বলল, ওকে কাছে না পেলে ওর ছেলেমেয়েরা খুব কষ্ট পাবে। এখন ওকে ছেড়ে দাও। বাচ্চাগুলো বড় হয়ে গেলে তখন ধরবে!

টিথু মায়ের কথায় কচ্ছপটাকে ডিমের কাছে রেখে এল। সেটা কিন্তু আর এক মুহূর্তও সেখানে রইল না। থপ্ থপ্ করে প্রাণ ভয়ে জলের দিকে দৌড়ে পালাল।

ঝুরা বলল, মা ওটা এক্ষুণি আবার আসবে।

মনে মনে হাসল তিসি। মেয়ের এত বুদ্ধি হয়ে গেছে। সে এখন থেকেই মায়ের মন বুঝতে শিখেছে।

বেশ খানিকটা দূরে গিয়ে তিসি ফিরে তাকাল। সত্যিই তো, জল থেকে ডাঙায় উঠে এসেছে কচ্ছপটা। সে ঝুরাকে পেছন থেকে ডাক দিয়ে বলল, ঐ যে তোর কচ্ছপ রে।

ঝুরা তার অনুমান ঠিক হয়েছে দেখে আনন্দে হাততালি দিয়ে বলল, আমি বলেছি না মা।

রাতে মায়ের দুপাশে শুয়েছে দু'ভাই বোন। টিথু বলল, ওবেলা পাহাড়ে কেন গিয়েছিলে মা?

ছেলের প্রশ্নে প্রথমে চমকে উঠল তিসি। তারপর সহজ গলায় বলল, নতুন বীজের খোঁজে।

ঝুরা বলল, একদিন আমিও তোমার সঙ্গে যাব মা।

টিথু অমনি বলল, আমিও মা।

তিসি বলল, এখন কারুর যাবার দরকার নেই। তেমন ক্ষেত দেখতে পেলে আমি নিজেই নিয়ে যাব।

গভীর রাত। ঘুমিয়ে পড়েছে ছেলেমেয়েরা। ঘুম এল না তিসির চোখে। জেগে জেগে সে একখানা গুহার স্বপ্ন দেখতে লাগল। গুহাটার আধখানা দেখা যাচ্ছে, বাকী আধখানা অন্ধকার। অনেক ছবি আঁকা রয়েছে সেখানে। সে অবাক হয়ে দেখছে, চোখ ফেরাতে পারছে না। কিন্তু যতটুকু বাইরের আলোয় দেখা যাচ্ছে ততটাই আবার আছে অন্ধকারে ঢাকা। তার মন ঐ না দেখাটুকু দেখার জন্য আকুল হয়ে উঠেছে।

মুখ ফেরাতেই তিসি দেখতে পেল, তার পেছনে পটুয়া দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার মুখে হাসি। তিসি ঘরে ফিরে আসার জন্য পা বাড়াতেই লোকটি বলল, এখনও অনেক ছবি বাকী, আর দেখবে না?

তিসি মনে মনে ভাবল, একবার যখন ছবি দেখা শুরু হয়েছে তখন সবকিছু না দেখে কি পারবে?

আজকাল প্রতি রাতেই কোনও না কোনও সময়ে ঘুম ভেঙে যায় তিসির। সারা শরীর কাঁপতে থাকে। মাথাটা কেমন গরম হয়ে ওঠে, হু হু করে বুকটা। সে বেরিয়ে আসে ঘরের বাইরে। নদীর চরে, বনের ধারে সে এলোমেলো পা ফেলে ঘুরে বেড়ায়। জোনাকিগুলো অন্ধকারে জ্বলে আর নেভে। ঘুরে ঘুরে নাচতে নাচতে আবার অদৃশ্য হয়ে যায়।

কোনও রাতে ঝিঁঝির একটানা ঝিঁ ঝিঁ শব্দ শুনে তার ঘুম ভেঙে যায়। মাথাটা ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে। কোন রাতে বা একটা পাখি আর্তগলায় কঁকিয়ে কঁকিয়ে কাঁদে। তিসি বুঝতে পারে, ওর মুক্তি নেই। সাপে জড়িয়ে ধরে গিলতে শুরু করেছে ওকে। উড়তে চাইলেও ওড়ার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে একেবারে।

আজ রাতে ঘুম ভেঙে যেতেই সে বেরিয়ে এলো বাইরে। আর ঠিক তখুনি চাঁদের অস্পষ্ট একটা আলো তার চোখে এসে পড়ল। সে চোখ তুলে তাকাল পাহাড়ের দিকে। ঝকঝকে আধখানা চাঁদ উঁকি দিয়ে কাকে যেন খুঁজছে। আবছা অন্ধকারে কেউ লুকোচুরি খেলছে এ পারের রহস্যময় গাছপালা, পথ ঘাটের আড়ালে।

তিসি নদীর ধারে এসে দাঁড়াল। ওপর থেকে ঢল নেমে কানায় কানায় ভরে উঠেছে নদী। ছোট্ট ডোঙাখানা স্রোতের আঘাতে ছলাৎ ছলাৎ শব্দ করছে।

তিসি নিজের রক্তে স্রোতের তীব্র বেগ অনুভব করল। সে ডোঙাটার বাঁধন খুলে দিয়ে তাতে লাফিয়ে উঠল। একসময় স্রোতের টানে পেরিয়ে গেল ওপারে। চাঁদ আকাশের অনেকখানি ওপরে উঠে গেছে। এখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে চারিদিক। তিসি নদীর চর পেরিয়ে সবুজ বনের সীমায় এসে পৌঁছল। কয়েকদিন আগে একবার সে এই বনের পথে পাহাড়ে উঠেছিল আর পাহাড়ের একটা গুহাতে দেখা হয়ে গিয়েছিল সেই পটুয়া মানুষটার সঙ্গে। হ্যাঁ, তিসি আজ, এই রাতে তারই টানে এই পাহাড়ে ছুটে এসেছে।

একটা তীব্র আকর্ষণ তিসির হাত ধরে যেন পাহাড়ের ওপব টেনে তুলতে লাগল। বড় বড় গাছের ছায়া মাড়িয়ে তিসি একসময় এসে পৌঁছল সেই পরিচিত গুহার সামনে।

জ্যোৎস্নার ঢল নেমেছে বাইরে কিন্তু গুহার ভেতরে ঘন অন্ধকার। সামান্য সময় প্রবেশ-মুখের সামনে দাঁড়িয়ে সে ভেতরের মানুষটার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনার চেষ্টা করতে লাগল। হ্যাঁ, ঐ তো থেমে থেমে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে পটুয়া।

তিসি, ছোট্ট একটা নুড়ি গড়িয়ে দিল গুহার অন্ধকারে। দীর্ঘ শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। এবার একটা নুড়ি ছুঁড়ে দিল সে। কিচুক্ষণের ভেতরেই বেরিয়ে এল ঘরের মানুষ বাইরে। তিসি গুহার পাশে একটা গাছ বাঁ হাতে বেষ্টন করে দাঁড়িয়েছিল। গোহর পটুয়া ঘুম জড়ান চোখ মুছে সেদিকে তাকাল। তার চোখে মুখে ফুটে উঠল বিস্ময়ের চিহ্ন।

তিসি শুধু চেয়ে রইল, কোনও কথা বলল না। রহস্যময়ী রাতের অন্ধকারে ততোধিক রহস্যময়ী রমণী।

গোহর প্রথমে কথা বলল, এত রাতে ঐ আস্তানা থেকে একা এলে?

তিসি গোহরের ভাষা না বুঝলেও প্রশ্নটা বুঝে নিয়ে মাথা নাড়ল।

এবার পটুয়া তিসির হাত ধরে বলল, চল, আমরা বনের ভেতরে ঘুরে বেড়াই।

তিসি বাধা দিল না। সে গোহরের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে আরও ওপরে উঠে এল।

ওরা পাহাড়ের ওপর থেকে উপত্যকার দিকে তাকাল। চাঁদের আলোয় উপত্যকা মায়াময়। নদীটা পাহাড় বেষ্টন করে সাপের খোলসের মত বয়ে গেছে। সারি সারি গাছ সাদা কুয়াশার আবরণে গা ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে।

রাতের একটা হাওয়া বয়ে এল উপত্যকা থেকে। সারা শরীরে ভাল লাগার একটা শিহরণ খেলে গেল। সেই মুহূর্তে দুজন অনুভব করল দুজনের উত্তাপ। আলিঙ্গনে গোহর আবদ্ধ করল তিসিকে। জনমনুষ্য কোথাও নেই। পশুরা বনের গভীরে, পাহাড়ের কন্দরে। পাখিরা গাছের শাখায় ঘুমে অচেতন। জেগে আছে একটি পুরুষ আর একটি নারী। তাদের গভীর আলিঙ্গনের ছবি স্তব্ধ হয়ে দেখছে আদিম অরণ্যবৃক্ষ আর তার চেয়েও আদিম, আকাশের ঐ চাঁদ।

তিসির কটি বেষ্টন করে গোহর তাকে নিয়ে এল গুহায়। নত হয়ে দুজনে ঢুকল গুহার ভেতর।

গোহরের গলা শোনা গেল, দেয়ালের দিকে যেও না।

তিসি গোহরের হাতের টান দেখে বুঝল, তাকে দেয়ালের দিকে সিঁধিয়ে যেতে বারণ করা হচ্ছে। সে অমনি বলল, কেন?

গোহর তিসির গলার স্বর থেকে তার কথার অর্থ বুঝে নিল। সে বলল, দেয়ালের ছবিতে আজ সবে রঙ লাগানো হয়েছে। শরীরের ঘষা লাগলেই মুছে যাবে।

তিসি গোহরের কথার অর্থ বুঝতে পারল না। তবে এটুকু বুঝল, বিশেষ কোন কারণে তাকে দেয়ালের দিকে যেতে বারণ করা হচ্ছে।

ভোরের আলো ফুটলে দুটি আদিম নরনারী গুহার মধ্যে উঠে বসল। গোহর দেয়ালের একটা ছবিতে আঙুল ঠেকিয়ে একটু রঙ তুলে আনল। এবার রঙ মাখা আঙুলটা তিসির চোখের সামনে তুলে ধরতেই সে সব ব্যাপারটা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারল।

গুহার বাইরে বেরিয়ে এসে চরের দিকে হাত বাড়িয়ে তিসি বলল, এখন অমি ঘরে ফিরব।

গোহর বলল, এরপর যেদিন আসবে সেদিন দিনের আলোয় এসো। আমি গুহাগুলোতে ঘুরে ঘুরে আমার আঁকা ছবি দেখাব।

তিসির এবার কথাগুলো বুঝতে কোন অসুবিধে হল না। সে খুশীতে মাথা নেড়ে একটুখানি হেসে ঘরের পথে পা বাড়াল।

তিসির কাছে চরের জীবন হয়ে উঠল, কৃষি-জীবন। মাটির নীচের কন্দ খুঁড়ে তার বিশেষ একটা অংশ

মাটিতে পুঁতে দিলে আবার লতাপাতা মেলে সে বড় হয়ে ওঠে। বিশেষ একটা আবহাওয়ায় তাকে খুঁড়ে তুললে তেমনি পুষ্ট আস্ত একটা কন্দ মিলে যায়।

ক্ষেতের বীজ সংগ্রহ থেকে মাটি তৈরি, বীজ বপন, জলসেচন প্রভৃতি সব কাজই সে ধাপে ধাপে করে যায়। প্রতি বছরই অধিক পরিমাণ ফসলে ভরে উঠছে তার ক্ষেত। এদিকে বিশেষ বিশেষ খাদ্যবস্তুকে আগুনে গরম করে সেঁকে কিংবা পুড়িয়ে খাবার স্বাদ আর সুখ সে বুঝতে শিখেছে।

একদিন একটা ঘটনা ঘটল। ছেলেমেয়েরা গিয়েছিল নদীর চরে। তিসি চাষের ক্ষেত তদারকি করতে বনে ঢুকেছিল। দুপুরের খাবার খেয়ে সবাই বেরিয়েছে, তাই তাড়া ছিল না কারও ঘরে ফেরার।

কাজের ঝোঁকে তিসি কতক্ষণ যে মাটি কুপিয়ে চলেছিল, খেয়াল ছিল না তার। রোদ্দুরে তখন লেগেছে মরা হলুদ রঙ। হঠাৎ মাথা তুলে মুখ ফেরাতেই দেখল, কয়েকজন মানুষ তার দিকে এগিয়ে আসছে। তিসি প্রথমে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ভাল করে চেয়ে দেখার পর সে চীৎকার করে ছুটল সেদিকে। টিথু আর ঝুরা যার দুটো হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে আসছে সে আর কেউ নয়, গোংগা। সঙ্গের আর কয়েকটা মানুষ তিসির একেবারে অচেনা।

তিসি ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল গোংগাকে। কতদিন পরে ভাইবোনের দেখা। গোংগার বুকে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে তিসি বলল, তুই কত বড় হয়ে গেছিস! তোকে দেখে সেই গোংগা বলে আর চেনাই যায় না।

সত্যিই গোংগাকে চেনা সহজ ছিল না। তার শরীরের গড়ন অনেক সুন্দর আর রঙ অনেক উজ্জ্বল হয়েছে। তার পোশাক চামড়ার হলেও বেশ নরম আর মসৃণ। কোমরে পশুলোমের দড়িতে ঝোলানো ছোট্ট অথচ সুদৃশ্য একটি কুঠার।

গোংগা তার সঙ্গী মানুষগুলোর সঙ্গে তিসির পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, এরা আমার দলের লোক। সারাক্ষণ এরা আমার সঙ্গে থাকে। লড়াই হোক, শিকার হোক, এরা কখনও আমাকে ছেড়ে পালাবে না। আমার গোষ্ঠীর মানুষজন এই নির্দেশ দিয়ে রেখেছে এদের ওপর।

তিসি বলল, তুই তাহলে এদের দলপতি হয়েছিস?

আমাকে এরা অনেক পরীক্ষার পর দলপতি করেছে।

কথা বলতে বলতে ওরা গেল তিসির ঘরের কাছাকাছি।

তিসি বলল, নদী পার হলি কেমন করে?

আমরা ওপার থেকে চেঁচাচ্ছিলাম। ঝুরা ঠিক শুনতে পেয়েছে। শুধু শুধু শোনা নয়, সে আমাকে এতখানি দূর থেকে চিনতেও পেরেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে ডোঙাটা চালিয়ে নিয়ে গেছে ওপারে। তারপর তিন ক্ষেপে আমরা পেরিয়েছি।

তিসি এবার যোগ করল, ঝুরা আর টিথু দুজনেই এখন ডোঙা চালাতে পারে।

গোংগা বলল, এরা দুজনেই এখন বেশ বড় হয়ে উঠেছে।

ভায়ের মন্তব্যে মনে মনে খুশী হয়ে উঠল তিসি।

ঘরের একেবারে কাছে এসে পড়েছে ওরা। হঠাৎ গোংগা বলল, তোর জন্যে এতদূর থেকে একটা জিনিস এনেছি।

খুশী হয়ে উঠল তিসি, কি জিনিস রে?

ঐ দেখ।

সত্যিই এতক্ষণ ভায়ের সঙ্গে কথায় কথায় তিসি এতই মগ্ন ছিল যে ঘরের দিকে একবার ভাল করে চেয়েও দেখেনি।

একি ! এগুলো তো বুনো মোষ, এদের বেঁধে আনলি কি করে?

তুই আমাদের পুরনো বনে মোষগুলোকে ছুটতে দেখেছিস কিন্তু বশ মানতে দেখিসনি। আমাদের এই নতুন দলের মানুষজন বুনো মোষকে বশ মানাবার কৌশল জানে। এরা অনেককাল থেকে এই কৌশলটি রপ্ত করেছে।

তিসি বলল, সত্যি অবাক কাণ্ড!

শুধু তাই নয়, এদের দুধ দুইয়ে খেয়ে দেখিস, কি মিষ্টি। সঙ্গে অনেকখানি পাহাড়ী মধুও এনেছি তোর জন্যে।

ভাই এতসব জিনিস এনেছে দেখে খুশীতে ভরে উঠল তিসির মন।

কদিন মহা আনন্দে একসঙ্গে কাটাল সবাই। ছোট্ট ঘরে এতগুলো মানুষের থাকবার জায়গা নেই, কিন্তু তাতে কি। বাইরের খোলা মাঠে রাতে শুয়ে রইল সবাই। দিনের রোদ্দুরে ছায়াভরা গাছতলা।

একটা ঝাঁকড়া গাছ আছে তিসির আস্তানার পাশে। গরমের হাওয়া বইলেই থলো থলো সবুজ ফলগুলো ধীরে ধীরে কালো হয়ে ওঠে। ঐ কালো ফলগুলো টিথু গাছে চড়ে পড়ে আনে। খেতে চমৎকার।

কদিন ধরে গোংগার লোকেরা গাছের ডালে বসে বসে ফলগুলো পেড়ে খেল।

এদিকে মোষের দুধ কেমন করে দুয়ে নিতে হয় তা তিসিকে শিখিয়ে দিল গোংগা। স্ত্রী পুরুষে মিলে চার পাঁচটা মোষ। বাচ্চা আছে দুটো।

তিসি জিজ্ঞেস করে, কি করে মোষগুলোকে সেদিন নদীর এপারে আনলি রে?

গলায় দড়ি বেঁধে রেখেছিলাম, ডোঙার সঙ্গে সঙ্গে জলে সাঁতরে এসেছে। বাচ্চা দুটোকে ডোঙায় এনেছি। এরা জল খুব ভালবাসে।

কোনও দিন বা নিভৃতে তিসির ক্ষেতের ধারে বসে ভাইবোনে কথা হয়।

তুই যেখানে আছিস সেখানে কি শুধু বন? না, পাহাড়ও আছে?

পাহাড়ের গায়ে ঘন বন আর নদী, সবই আছে।

তিসি এবার কৌতূহলী হয়ে উঠল, হ্যাঁ রে কেউ এসেছে ঘরে, না এখনও একা একা ঘুরে বেড়াস?

গোংগার একেবারে সহজ জবাব, একটা নয় রে দিদি, অনেকগুলো।

বিস্ময়ে আঁতকে ওঠে তিসি, সে কি রে!

হ্যাঁ দিদি। একজনকে লড়াইয়ে হারিয়ে যখন দলপতি হলাম তখন তার সব কটাই আমার হয়ে গেল। এটা ঐ দলের বহুদিনের নিয়ম। তবে আমি সেরা সুন্দরীটিকে রেখে বাকীদের বিলিয়ে দিয়েছি।

যে লোকটার সঙ্গে তোর লড়াই হয়েছিল, সে কি এই দলেরই সর্দার ছিল আগে?

হ্যাঁ।

তোর সঙ্গে লড়াই লাগল কেন?

সে অনেক কথা। যেদিন দাহা আমাকে ছেড়ে চলে গেল, সেদিন গাছের ওপর তৈরি ঘরখানাতে শুয়ে তোদের কথা ভাবছিলাম। মনটা বড় খারাপ হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ কয়েকটা লোকের গলার শব্দ শুনে আমি ঘর থেকে উঁকি দিলাম।

তিন চারটে লোক গাছে ওঠার তাল করছিল। দুটো লোক নিচে দাঁড়িয়ে তাদের উৎসাহ দিচ্ছিল।

আমি বেরিয়ে এসে বললাম, তোরা এখানে মরতে এসেছিস কেন? কি মতলব তোদের?

ওরা বলল, সর্দারের তলব, আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।

আকারে ইঙ্গিতে আমরা উভয়পক্ষের বক্তব্য বুঝতে পারছিলাম। মনে মনে ভাবলাম, এসেছি এ বনে বাস করতে, এদের সঙ্গে শত্রুতা করে লাভ নেই। বললাম, চল তোদের সর্দারের কাছে।

আমি আমার হাতিয়ার নিয়ে গাছের তলায় নেমে এলাম। ওরা এবার আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।

ওঠা-নামা করতে করতে এক সময় আমরা পাহাড়ের নিচে নেমে এলাম। যেখানে ওরা আমাকে এনে দাঁড় করাল সেখানে একটা জলাশয়। ওপর থেকে নেমে আসা একটা ঝোরার জল ওতে এসে পড়ছে। আমি দূর থেকে এই জলাশয়টা দেখেছিলাম।

এবার নীচ থেকে ওপরের দিকে তাকালাম। ঐ তো গাছের ওপর পাখির বাসার মত আমার ঘরখানা দেখা যাচ্ছে।

লক্ষ করিনি, একটু দূরে একটা গাছের তলায় সর্দার বসে আছে। তার পায়ের তলায় বসে আছে একদঙ্গল সুন্দরী যুবতী। কয়েকজন বর্শাধারী দাঁড়িয়ে আছে সর্দারকে ঘিরে।

সর্দার ইঙ্গিত করতেই লোকগুলো তার কাছে আমাকে নিয়ে গেল।

সর্দার এবার কথা বলল। তার চোখমুখের ভাব দেখে মনে হল, লোকটা আমার ওপর রেগে গেছে। সে ওপরে আমার ঘরের দিকে আঙুল তুলে বলতে চাইল, ওখানে ঘর বেঁধেছিস কোন সাহসে, এটা আমার এলাকা।

মনে মনে ভাবলাম, এখানে গায়ের জোর দেখাতে গেলে মরতে হবে। তাই মাথা নুইয়ে বললাম, আমার ভুল হয়ে গেছে। এখন দয়া করে আমাকে দলে নিয়ে নাও।

লোকটা আমার কথার অর্থ বুঝল। তার ভাবগতিক দেখে মনে হল, সে আমার ওপর রাগ করে নেই।

তবু আমার শক্তি পরীক্ষা করে নিতে চাইল দলের সর্দার। ওদের দলের একটা জোয়ানকে ডাকল। জলাশয়টা দেখিয়ে বলল, মাটিতে পা না ঠেকিয়ে যতবার পারিস পারাপার করে দেখিয়ে দে।

লোকটা সঙ্গে সঙ্গে ডাঙায় পোশাক ছেড়ে জলে লাফিয়ে পড়ল। পা না ঠেকিয়ে কয়েকবার এপার ওপার করে ডাঙায় উঠে এল। শেষের দিকে লোকটা বড় কাহিল হয়ে পড়েছিল। প্রতিবার সাঁতারের শেষে একটা করে লোক জলাশয়ের ধারে এসে দাঁড়াচ্ছিল।

এবার সর্দার আমাকে জলে নামতে আদেশ করল। আমিও ওর মত ডাঙায় পোশাকটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

জলটা জানোয়ারের মত আমাকে কামড়ে ধরল। কিন্তু তখন মাথায় একটা চিন্তা, সর্দারের দলে আমাকে যে কোনও রকমে ঢুকতে হবে।

বারকয়েক পারাপার করে যখন আবারও সাঁতার শুরু করলাম তখন পেছনে সর্দারের বউদের হৈ-চৈ শুনতে পেলাম। তারা খুশীতে তারিফ করছিল। ফেরার মুখে চেয়ে দেখি, যতগুলো লোক ওর দিকে দাঁড়িয়েছে, তার চেয়ে বেশী লোক আমার দিকে এসে দাঁড়িয়েছে।

একসময় সর্দার আমাকে ডাক দিয়ে জল থেকে ওঠাল। তখন মেয়ে পুরুষ সকলেই হাত তুলে, চীৎকার করে আমার প্রশংসা করছে।

আমি কাছে আসতে সর্দার ইঙ্গিতে আমাকে আমার আস্তানায় যেতে বলল। আরও বলল, কাল শিকার চলবে, তখন আর একবার তোমার শক্তি পরীক্ষা হবে।

আমি চলে যাবার সময় সকলে আর একবার উল্লাস প্রকাশ করল, এমনকি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী সাঁতারুটি পর্যন্ত, কিন্তু সর্দারের মুখখানা কেমন যেন থমথমে দেখলাম।

[illegible]াতে একটা মেয়েলি গলার ডাক শুনে ঘুম ভেঙে গেল। আমি হুড়মুড় করে ঘর থেকে বেরিয়ে মুখ নিচু করে বললাম, কে ?

মেয়েটি একবার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে ভয়ার্ত গলায় বলল, পালাও, না হলে সর্দার তোমাকে বিপদে ফেলবে।

কথার মাঝখানে তিসি কৌতূহলী হয়ে উঠল, কি নাম রে মেয়েটার?

গোংগা বলল, রুরু। সর্দারের সবচেয়ে ছোট আর আদরের সে।

তিসি বলল, তারপর বলে যা তোর কথা।

আমি গাছ বেয়ে নিচে নেমে এসে বললাম, তোমাকে আমি সেদিন সর্দারের পায়ের তলায় বসে থাকতে দেখেছিলাম। তুমি কে ?

মেয়েটি আমার প্রশ্নটা বুঝে নিয়ে বলল, আমি সর্দারের বউ।

এবার প্রশ্ন করলাম, তুমি আমাকে পালাতে বলছ কেন? কি বিপদ?

• আগামীকাল যে শিকার হবে তাতে বন থেকে বুনো মোষের পাল তাড়া করে নিচে নামাবে। তোমাকে ওরা নিচের ঐ খোলা জায়গাটায় দাঁড়িয়ে থেকে ওদের দিকে হাতিয়ার চালাতে বলবে।

আমি মোটামুটি ওর কথার অর্থ বুঝে নিয়ে বললাম, তাতে কি, শিকারে আমার কোনো ভয় নেই।

ও বলল, অল্প নয়, অনেক বড় একটা দল ক'দিন আগে এই বনে এসে ঢুকেছে। তাড়া খেয়ে তারা যখন হুড়মুড়িয়ে নিচে নামবে তখন তাদের সামনে পড়লে কেউ রক্ষে পাবে না।

বললাম, আমার মত তুচ্ছ একটা লোককে এই বিপদের কথা জানাতে তুমি এতদূর এলে! নিজে যে ঘোর বিপদে পড়ে যাবে।

ও বলল, আমি সবকিছু জানি, আর সবদিক সামলে রেখে এসেছি।

বললাম, তুমি এখন ফিরে যাও। কোন ভয় নেই। কাল আমি সর্দারের শিকারের দলেই থাকব।

মেয়েটি বনের ভেতর দ্রুত মিলিয়ে গেল।

পরের দিন খুব ভোরেই সর্দারের লোকজন কুঠার আর বর্শা হাতে এসে পৌঁছল। আমাকে তাড়া লাগিয়ে নামাল গাছের ওপর থেকে। ঠিক আগের রাতে সর্দারের সুন্দরী বউটি যা বলে গিয়েছিল আজ আমার ওপর সেই আদেশই হল।

আমি একটা কুঠার কোমরে বেঁধে নিয়ে নেমে গেলাম নিচে। চারদিকে সবুজ ঘাসের জমি। মাঝখানে একটা মাঝারি আকারের গাছ।

আমি প্রথমে গাছের তলায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমার ওপর আদেশ হয়েছিল, একটা মোষকে অন্তত ঘায়েল বা পাকড়াও করতে হবে।

আগে থেকেই ওরা মোষগুলোর সন্ধান রেখেছিল। এবার মহা সোরগোল তুলে তাড়া লাগাল।

দেখলাম, সর্দার একটা টিলার ওপর দাঁড়িয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে।

তাড়া খাওয়া মোষগুলো এবার নামতে শুরু করেছে। হুড়মুড় করে নেমে আসছে তারা। পায়ের ঘায়ে ছিট্‌কে বেরিয়ে যাচ্ছে নুড়িগুলো।

এরপর সমান জমি পেয়ে ওরা প্রচণ্ড বেগে এগিয়ে আসতে লাগল। বিরাট শরীর আর ভয়ঙ্কর সব শিঙ্‌। সঙ্গে সঙ্গে ভেবে নিলাম সামনে পড়লে আর রক্ষে নেই।

ওরা একেবারে কাছে এগিয়ে এলো, আর আমি লাফ দিয়ে গাছের একটা ডাল ধরে ঝুলতে লাগলাম।

ওরা ভয়ঙ্কর বেগে আমার নিচ দিয়ে বেরিয়ে যেতে লাগল। ঐ তো পালের গোদাটা। তার চেহারা আর শিঙ্‌ দেখেই মালুম হল। ও ঠিক আমার নিচ দিয়েই ছুটে যাচ্ছিল। আমি লাফিয়ে উল্টোমুখে ওর পিঠে চড়ে বসলাম। ও চমকে গিয়ে আরও জোরে দৌড় শুরু করে দিল। আমি ততক্ষণে ঘুরে বসে ওর শিঙ্‌ পাকড়ে ধরেছি। ওর পেটের একদিকে জোরে পা চালাতেই ও দল ছেড়ে অন্য একদিকে ছুট লাগাল। আমি ওর পিঠে জুৎ করে বসে ওকে গুঁতো মেরে মেরে ইচ্ছেমত চালাতে লাগলাম।

যখন সমস্ত দলটা অনেকদূরে বেরিয়ে গেল আর সর্দারের নির্দেশে শিকারীরাও এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল তখন আমি মোষটাকে দৌড় করিয়ে সর্দারের কাছাকাছি নিয়ে গেলাম। চেঁচিয়ে ইঙ্গিতে বললাম, বল, এখন এটাকে নিয়ে কি করব? দড়ি দাও তো বেঁধে ফেলি, নইলে কুঠার দিয়ে কেটে টুকরো করে ফেলি।

সর্দার বুনো মোষটার ফোঁসফোসানি শুনে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। বলল, ওটাকে মেরেই ফেল।

আমি লাফ দিয়ে মোষটার পিঠ থেকে নেমে পড়লাম। মোষটা কিছু দূর এগিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। তারপর পেছন ফিরে ভয়ঙ্কর শিঙ্‌ উঁচিয়ে তেড়ে আসলে লাগল।

আমি একবার পাশে সরে দাঁড়ালাম। ও বেরিয়ে গেল। আমি ছুটলাম ওর পেছন পেছন। জানতাম, ও ফিরে দাঁড়াবে। ঠিক তাই হোল, কিছু দূর গিয়ে ও থমকে দাঁড়িয়ে ভারী শরীরটা পেছনে ঘোরাতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে ওর শিঙের মাঝখানে কুঠার চালালাম। মোষটা ঘায়েল হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

আবার চারদিক থেকে উল্লাসের স্রোত বইল। দেখলাম, পাহাড়ের ওপর মেয়েরাও দাঁড়িয়ে উল্লাস প্রকাশ করছে। ওদের ভেতর সর্দারের সেই সুন্দরী বউটাকেও দেখলাম। এদিকে পুরো শিকারীর দলটা এক কাণ্ড করে বসল। তারা ছুটে এসে আমাকে শূন্যে তুলে আনন্দে নাচতে লাগল। শেষে আমাকে সর্দারের কাছে নিয়ে গিয়ে বলল, এ আমাদের লোক, এ আমাদের কাছেই থাকবে।

এত লোকের ইচ্ছার ওপর সর্দার অন্য কোনও কথা বলতে পাবল না। আমাকে তার দলে রাখতে বাধ্য হল।

দিনে দিনে আমার কাজকর্ম দেখে দলের মানুষগুলো আমার ভক্ত হয়ে উঠল। ওরা আমাকে যত জড়িয়ে ধরল, সর্দারের ঈর্ষা তত বেড়ে গেল। সর্দার আমাকে একটার পর একটা বিপদে ফেলার চেষ্টা করে চলল আর আমি জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে লাগলাম।

এ কাজে আমাকে সাহায্য করত সর্দারের অতি প্রিয় বউ, রুরু। সে আগে ভাগে সর্দারের পরিকল্পনাটা আমাকে জানিয়ে দিত। তার ফলে আমি সাবধান হয়ে যেতাম।

আমার আর রুরুর এই গোপন যোগাযোগের ব্যাপারটা আন্দাজ করে সর্দার একদিন রুরুর চরম শাস্তির পরিকল্পনা করে ফেলল।

তিসি অধীর আগ্রহে বলল, রুরুর শাস্তি! কি রকম?

গোংগা বলল, সর্দার কতকগুলো তুকতাক জানত, সেজন্যে সকলে তাকে ভয় করত, কেউ লোকটাকে ভালোবাসত না।

তিসি বলল, কি রকম?

লোকটা কখনো বাঘ, কখনো ভালুক, কখনো হরিণ সেজে বনের ভেতর ঘুরে বেড়াত। কারণ জানতে চাইলে বলত, পশুতে ছেয়ে যাবে বন।

সর্দার আদেশ দিয়ে রেখেছিল, জন্তুকে মেরে তার মাংস কেটে নিও, কিন্তু হাড় নয়। ঐ হাড়গুলো এক জায়গায় জড়ো করে রাখলে জন্তুরা আবার ফিরে আসবে। জন্তুরা নাকি মরে না, ওরা ফিরে ফিরে আসে।

তিসি অবাক হয়ে বলল, সত্যি?

গোংগা বলল, কে জানে, হয়তো তাই। এখন শোন সর্দারের কারসাজির কথা।

একদিন আমাকে ডেকে বলল, কাল আমি শিকারে যাচ্ছি, তুমি আমার সঙ্গে থাকবে।

বললাম, নিশ্চয়ই।

পরদিন সর্দারের ডেরায় ভোরবেলা গিয়ে পৌঁছলাম।

সর্দার আমাকে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে অপেক্ষা করতে বলল।

আমি বর্শা নিয়ে চলে গেলাম। নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে অপেক্ষা করতে লাগলাম। বহুক্ষণ পরে সর্দার একাই এল। এসে বলল, বনের ভেতর মস্ত একটা হরিণকে চরতে দেখে এসেছি,চল, ওটাকে শিকার করি।

আমি আর সর্দার দুজনেই ছুটলাম। দূর থেকে সর্দাব আমাকে হরিণ দেখিয়ে বলল, এখন ধীরে ধীরে চল, হরিণটা পালিয়ে যেতে পারে।

আমরা গাছপালার আড়ালে নিজেদের ঢেকে ঢেকে এগোতে লাগলাম। হরিণটার শিঙ্ আর মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, বেশ বড়োসড়ো আকারের জানোয়ারটা।

একসময় সর্দার আমার হাত টেনে ধরে বলল, আর না, এখান থেকেই বর্শা ছোঁড়।

আমি বর্শা তুললাম। মনে হল, হরিণটা আমাকে দেখতে পেয়েছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে বর্শা ছুঁড়লাম। হরিণটা মুহূর্তে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চীৎকার করে উঠল।

গোংগা, গোংগা।

মেয়েলি গলার আওয়াজ শুনে আমি ভয়ানক চমকে উঠলাম। রহস্যটা জানার জন্য মুহূর্তে সর্দারের দিকে ফিরে দাঁড়ালাম। একি ! মৃত্যু আমারই শিয়রে। সর্দারের হাতের কুঠাব আমার কাঁধের ওপর নেমে আসছে।

আমি ছিটকে বেরিয়ে গেলাম। সব ঘটনাটাই চোখের পলকে ঘটে গেল।

ছুটে আসছে সর্দার, আমার হাতে বর্শা নেই। হরিণেব দিকে সেটা আমি আগেই ছুঁড়ে মেরেছি।

আমি আমার হাতিয়ারখানা আনবার জন্যে হরিণটা যেদিকে ছিল সেদিকে ছুটলাম। পেছনে ছুটে আসছে কুঠার হাতে সর্দার। একটা বাঘের মত শক্তি তার গায়ে।

হরিণটাকে দেখতে পেলাম। মাটিতে পড়ে গোঙাচ্ছে। তার একটা পায়ে গাঁথা হয়ে আছে আমার বর্শা।

মুহূর্তে আহত হরিণটার পা থেকে বর্শাখানা টেনে নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম। পেছন থেকে ভেসে এল কোনও একটি আহত মেয়ের গলার আওয়াজ। তখন সেদিকে তাকাবার অবস্থা আমার নয়। সর্দারের সঙ্গে ঘণ্টা খানিক ধরে চলল আমার প্রবল লড়াই। শেষে লড়াই করতে করতে সর্দারকে ঠেলে নিয়ে গেলাম গোষ্ঠীর আস্তানায়। সেখানে তাকে মাটিতে ফেড়ে পেলে সব কথা বললাম।

গোষ্ঠীর বুড়োরা বলল, বিচার হবে।

আমি বললাম, বেশ। তবে এখুনি হরিণটাকে বন থেকে তুলে আন। আর আমি একটি মেয়ের গলার স্বর শুনেছি, তাকে দেখতে পেলে নিয়ে এসো।

কিছুক্ষণ পরেই গোষ্ঠীর লোকেরা বয়ে আনল প্রায়-অচেতন এক'টি নারী দেহ। সঙ্গে হরিণের পুরো একটি চামড়া।

আমি চমকে প্রায় আঁতকে উঠলাম। এ যে রুরু! রক্ত তখনও ঝরে পড়ছিল রুরুর পা থেকে।

সর্দার চেঁচিয়ে উঠল, আমি রুরুকে হরিণের চামড়ায় মুড়ে একটা গাছের তলায় রেখে এসেছিলাম। তোমরা জান, ওর ছেলেপুলে নেই। এ অবস্থায় ওর কাছে যদি বাচ্চাকে নিয়ে কোন হরিণী এসে দাঁড়াত তাহলে ও মা হতে পারত। কিন্তু গোংগা সব জেনেও কেন যে রুরুকে মারার জন্য বর্শা ছুঁড়ল, তা আমি বুঝতে পারিনি। তাই ওকে আমি আক্রমণ করেছিলাম।

আমি সবাইকে বন থেকে একটা বিশেষ গাছের কিছু পাতা আনতে বললাম। পাতা নিয়ে এলে রুরুর ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিলাম। মুহূর্তে রক্ত বন্ধ হয়ে গেল। আমাদের কাছে পিঠেই আর একটা ঝোপ ছিল। তার একটা শেকড় থেঁতো করে নাকের কাছে কিছুক্ষণ ধরতেই জ্ঞান ফিরে এল। তুই তো জানিস আমাদের এসব লতাপাতার গুণ।

তিসি বলল, ওরা বুঝি জানে না?

না দিদি, ওরা কোন জায়গা কেটে গেলে রক্তের ওপর ধুলো ছড়িয়ে দিত।

তিসি সাগ্রহে জানতে চাইল, এখন শেষ পর্যন্ত কী হল, তাই বল।

জ্ঞান ফিরে আসতে রুরু সর্দারের অনেক অপকর্মের কথা সবাইকে জানিয়ে দিল।

গোষ্ঠীর বৃদ্ধরা বলল, গোংগার সঙ্গে সর্দারকে লড়াই-এ নামতে হবে। একজনের মৃত্যু পর্যন্ত চলবে এ লড়াই। যদি কেউ নিজের ক্ষমতা বুঝে লড়াই থেকে সরে দাঁড়াতে চায় তাহলে তাকে গোষ্ঠী ছেড়ে চলে যেতে হবে। কোন দিনও সে আর ফিরতে পারবে না।

তিসি বলল, লড়াই হয়েছিল?

হয়েছিল বৈকি। অনেকগুলো দিন। ক'বার আমি মারা পড়তে পড়তে বেঁচে গেলাম। বাবার বর্শাটা নিয়েই আমি লড়াই করতাম।

সেদিন এমনি লড়াই করতে করতে আমরা একেবারে উঠে গেলাম পাহাড়ের চূড়ায়। সর্দার ছিল চিতা বাঘের মত হিংস্র আর ধূর্ত। সে জানত, ঐ পাহাড়ের চূড়ায় একটি ফাটল আছে। সে আমাকে লড়াই-এর উত্তেজনায় ফেলে ওর দিকে টেনে নিয়ে চলেছে।

ফাটলটা ও আগেই লাফ দিয়ে পেরিয়ে গেছে কিন্তু আমি ওটা দেখতে পাইনি। আমার চোখ সেঁটে আছে ওর হাতিয়ারের দিকে। হঠাৎ কি মনে হল, আমি সজোরে বর্শাখানা ওর দিকে ছুঁড়ে মারলাম।

সর্দার আমার বর্শার মার এড়াবে বলে শূন্যে লাফ দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে টাল রাখতে না পেরে ফাটল দিয়ে গলে গভীর গিরিখাদের অতলে চলে গেল।

আমি শেষ পরিণতিটা দেখব বলে ছুটে যাচ্ছিলাম কিন্তু নিচের উল্লাসধ্বনিতে থমকে দাঁড়ালাম। ওর পতনে সকলে উল্লসিত। তাই চীৎকার করে আমাকে তাদের আনন্দের কথা জানাচ্ছিল।

আমি যদি সেই মুহূর্তে ওদের চীৎকার শুনে থেমে না যেতাম তাহলে ঐ গভীর ফাটলের অন্ধকারে চিরদিনের মত আমাকে হারিয়ে যেতে হতো।

তিসি বলল, অবাক হবার মত তোর কাহিনী গোংগা।

তারপর থেকেই আমি ওদের সর্দারের পদ পেয়েছি। রুরু বহুবার আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে। সে এখন আমার সবচেয়ে প্রিয় সঙ্গী।

কদিন ভাইবোনে গল্পগুজব করে মনের আনন্দে কাটাল। তিসি, বীজের চাষ করছে দেখে আর সেগুলো খেয়ে পরখ করে গোংগা আর তার সঙ্গীরা তো অবাক।

গোংগা বলল, দিদি, রোজ পরিশ্রম করে পশুপাখি না মারলে আমাদের খাবার জুটবে না, কিন্তু তুই দেখছি বেশ পথ বের করেছিস। অনেকদিন এই দানাগুলোকে রেখে দেওয়া যায় আর ব্যবহার করা যায় দরকার মত।

তিসি বলল, এখানে অত পশুপাখি পাব কোথা থেকে বল। তাই একটা কিছু উপায় বের করে নিতে হয়েছে।

টিথু গোংগার দলের একটি যুবকের সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেলেছে। তার কাছ থেকে সারাদিন শিখছে বর্শা আর কুঠার চালানোর কৌশল। নদীর চরে সারাদিন ছুটে বেড়ায়। গতি দ্রুত না হলে শিকারী হওয়া যাবে কেমন করে?

ঝুরা অন্য একটি যুবকের সঙ্গে নদীতে ডোঙা চালিয়ে অনেক দূর চলে যায়। তারা উভয়ে উভয়ের ভাষা শিখে নেবার চেষ্টা করে। কিশোরী ঝুরার যুবকটিকে বড় ভাল লাগে। তার হাসি, তার কথা, তার সুপুষ্ট দেহ, সব কিছুই তাকে কাছে টানে। অন্যদিকে ঝুরা যুবকটির চোখে স্বপ্নের রমণী। সে তাকে যতক্ষণ কাছে পায় ততক্ষণ তার চোখে মুখে আনন্দ উপচে পড়ে।

ঝুরা বলে, ও বিদেশী, তুমি কবে যাবে?

যুবক বলে, সর্দারের আদেশ হলেই যেতে হবে।

ওখানে গিয়ে আমাকে মনে পড়বে?

তোমাকে ভুলতে পারব না।

সেখানে এমন নদী আছে?

যুবক বলে, ঝর্ণা আছে, অনেক স্রোত।

এমন ডোঙায় চড়ে ঘুরে বেড়ানো যায়?

না, সেখানে এ জিনিস নেই। এতে চড়ে বড় মজা, ভারী আরাম।

ওরা কোন দিন বা বনের আড়ালে চরে নৌকো বেঁধে রেখে বনের ভেতর ঢুকে যায়। যুবকটি ঝুরাকে বিভিন্ন গাছে চড়ে টক মিষ্টি ফল পেড়ে দেয়। ঝুরা লাল ফুল ভালবাসে। যুবকটির চোখ লাল ফুলের খোঁজে ঘুরে বেড়ায়। যেখানে সে লাল ফুল দেখে তুলে এনে ঝুরার মুঠি ভরে দেয়। ফুল পেয়ে ঝুরার চোখে খুশী ঝিলিক দিয়ে ওঠে। সে খুশীটুকু যুবকটি উপভোগ করে।

কিশোরীটিকে যুবকটির ভাল লেগেছে, খুব ভাল লেগেছে।

তিসি আর গোংগা এসব কিছু লক্ষ করেছে. তারা এ নিয়ে মাঝে মাঝে আলোচনায় বসে।

গোংগা বলে, ভুসুক ছেলেটা আমার বড় বাধ্য। তাকে কাজ দিলে সে হাসিল করবেই। গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে যখন লড়াই বাঁধে তখন জিৎ না হওয়া অব্দি তাকে বিশ্রাম নিতে দেখা যায় না।

তিসি বলে, ঝুরা ওকে খুব পছন্দ করে। দুজন ডোঙায় চেপে ঘুরে বেড়ায়।

গোংগা বলে, আমি তো ওদের দুজনকে আমার কাছে রেখে দিতে চাই, কিন্তু তুই কি ঝুরাকে ছেড়ে থাকতে পারবি?

কতক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে তিসি। এই মুহূর্তে তার লা-র কথা মনে পড়ে যায়। ছোট্ট ঝুরাকে কাঁধে চাপিয়ে নিয়ে সে বনে যেত পাখি ধরতে। সারা পথ ঝুরা বকবক করত আর লা আকারে ইঙ্গিতে মেয়ের কথার জবাব দিয়ে যেত।

তিসি বলল, ওকেও তো একদিন মা হতে হবে গোংগা, তখন আমি পুরুষ পাব কোথায়? তার চেয়ে তুই ওকে ভুসুকের সঙ্গে জোড়া দিয়ে তোর কাছে রেখে দে, আমি নিশ্চিন্তে থাকব।

গোংগা বলল, দিদি, টিথুকে দেখেছিস?

কেন বলতো?

ও এখন কদ্দুর বর্শা ছুঁড়তে পারে জানিস?

ছেলের কৃতিত্বে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তিসির মুখ। বলে, আমি কেমন করে জানব গোংগা।

প্রায় আমার সমান দূরত্বে ও সেদিন বর্শা ছুঁড়েছে।

তিসি বলল, তাজ্জব।

গোংগা বলল, পারবে না কেন, ও যে লা-র ছেলে। আমাদের গোষ্ঠীতে কেউ কি লা-এর মত বর্শা ছুঁড়তে পারত ?

লা-এর প্রসঙ্গে এই মুহূর্তে তিসির মনটা ভারী হয়ে উঠল। সে কোনও কথা না বলে চুপ করে বসে রইল।

এক সময় গোংগা আবার কথা শুরু করল। এবার স্পষ্ট করেই বলল, আমি তোর টিথুকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই দিদি। আর ওকে নিয়ে যাব বলেই আমি এখানে এসেছি। ওকে এখন থেকেই সর্দার হবার জন্য গড়ে তুলব। নিজের হাতে তৈরি করব আমি।

তিসি পরিষ্কার গলায় বলল, নিয়ে যা। ও যদি বাপের মত, কি তোর মত পুরুষ হয় তাহলে তার চেয়ে আনন্দের আর কি হতে পারে।

ভাইবোনে আবার বিচ্ছেদ হল। টিথু আর ঝুরা মাকে ছেড়ে চলল নতুন জীবনে। কদিন ছেলেমেয়ের জন্য চোখের জল ঝরল তিসির। স্বপ্নে ওরা কতবার এসে দাঁড়াল, আবার চলে গেল। তিসির বুক থেকে শুধু বেরিয়ে এল দীর্ঘশ্বাস।

তিসি ভাবে তার ছেলেমেয়েরা একদিন গোষ্ঠীর সকলের চোখে পড়বে, একি কম কথা। আজ গোংগা বাইরে গিয়েছিল বলেই না সে তার বাবার মত দলের সর্দার হতে পেরেছে।

কয়েকদিন পরে যখন দুঃখের চাপটা কমে এল তখন হঠাৎ মনে হল সামনের পাহাড়ে যাবার কথা। সেই পটুয়া মানুষটার কাছে একদিন সে গভীর রাতে শরীরের তাগিদে ছুটে গিয়েছিল। আজ তার শুধু মনে হল, মানুষটার সঙ্গে অনেকগুলো দিন তার যোগাযোগ নেই। সে তাকে পাহাড়ের গুহাগুলোতে নিয়ে গিয়ে তার আঁকা ছবি দেখাবে বলেছিল।

তিসি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। ঘরের ভেতর যা কিছু খাবার ছিল তা একটা পাত্রে জড়ো করে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

ও দূর থেকে দেখল, মানুষটা বনের দিকে চেয়ে চুপচাপ বসে আছে।

তিসি অনেক কাছে গেল, কিন্তু লোকটার ধ্যান ভাঙল না। যেমন বসেছিল তেমনি বসে রইল।

কি দেখছে ও! তিসি ওর একটু দূরে একটা গাছতলায় বসে ওর দৃষ্টিকে অনুসরণ করে বনের দিকে তাকাল।

অনেকগুলো গাছ আর ঝোপঝাড় নানা রঙের ফুলে ছেয়ে গেছে। সেখানে জুটেছে মৌমাছি আর প্রজাপতি। কি যেন একটা পাখি ডাকছে। আর একটা পাখি তার উত্তর দিচ্ছে।

এবার সূর্যের দিকে চোখ ফিরিয়ে কি যেন দেখল মানুষটা। মাটিতে আঁকিবুকি কাটল।

তিসি গাছতলা থেকেই বলল, কি দেখছ পটুয়া?

মানুষটি প্রথম চমকে উঠে তাকাল। ওর ইঙ্গিত বুঝতে পেরেছে সে। উৎসুক হয়ে উঠল, কখন এলে?

আগে বল, কি পাখি ওটা?

ফুল পাখি।

বনে যখন অনেক ফুল ফোটে তখন ও আসে। তাই আমি ওর এই নাম দিয়েছি।

তুমি এতক্ষণ এখানে বসে বসে কি করছিলে?

আমি দেখছিলাম, সূর্যের আলোটা যেই গতবারের দাগে এসে ঠেকল অমনি ঝোপে-ঝাড়ে, গাছের ডালে অনেক ফুল ফুটতে শুরু করে দিল। আর ঐ পাখি দুটোও এসে গেল কোথা থেকে।

তুমি তো এসব বেশ খেয়াল রাখতে পার!

তিসির কথায় উৎসাহিত হল পটুয়া। বলল, গুহার কাছে এস, দেখিয়ে দিচ্ছি।

তিসি কাছে এলে সে বলল, এই যে দাগটা দেখছ, সূর্যের আলো যখন এখানে এসে পড়তে থাকে তখন ঐ উপত্যকার ওপর দিয়ে কনকনে একটা হাওয়া বয়ে আসে। আর ঠিক তখনই গাছের পাতাগুলো রঙ বদলাতে বদলাতে খসে পড়ে যায়।

তিসি অবাক হয়ে শুনছিল। একসময় বলল, তোমার মত এমন করে আমি কখনও ভেবে দেখিনি।

এবার গোহর পটুয়া বলল, আজ তো আকাশে অনেক আলো রয়েছে, গুহাগুলো ঘুরে ঘুরে দেখবে নাকি ? ছবি তো এঁকেছি, কেউ দেখারই নেই।

দেখব বৈকি, তাইতো এলাম। আচ্ছা, আগে তুমি কিছু খেয়ে নাও।

তিসি পাত্র খুলে পটুয়ার সামনে ধরে দিল।

খুশী হয়ে খেতে লাগল গোহর পটুয়া। খেতে খেতে পুরনো কথার খেই ধরে বলল, সাপেরা ওসময় খায় না।

কোন সময়?

ঐ যে সময় ঠাণ্ডা হাওয়া বয়, গাছের পাতা ঝরে পড়ে।

তুমি কি করে জানলে?

গোহর বলল, সাপে যখন জানোয়ার ধরে গিলতে শুরু করে তখন আমি পশুটার আওয়াজ শুনে বুঝতে পারি। কিন্তু ঐ ঠাণ্ডা হাওয়া বইলে সে শব্দ আর শোনা যায় না। সাপেদেরও বড় একটা চোখে পড়ে না।

তিসি প্রশংসার সুরে বলল, তুমি অনেক কিছু জান পটুয়া।

তোমার এই খাবারটা কিন্তু বেশ লাগল। এটা কি দিয়ে তৈরি করেছ?

তিসি বলল, একরকম বীজকে গুড়ো করে গরম করেছি জলে গুলে। এর সঙ্গে খানিকটা মধু মিশিয়ে দিয়েছি।

খুব ভাল লাগল। এরকম খাবার কোনদিন খাইনি।

তুমি যদি কোনদিন আমার চরে আস তাহলে এ বীজ আর তার গাছ দেখাব।

ওখানে কি তোমার গোষ্ঠীর লোকেরা থাকে ?

না, আমি একা থাকি।

গোহর অবাক হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল তিসির মুখের দিকে। পরে বলল, এতবড় একটা চরে তুমি একা থাক, অবাক কাণ্ড !

তুমিও তো এতবড় বনে একাই থাক।

গোহর হাসল। কোথায় যেন একটা কষ্টের কাঁটা লেগে আছে সে হাসিতে। বলল, আমি খোঁড়া তাই দৌড়ঝাঁপ করে শিকারের ক্ষমতা আমার নেই। দল ছাড়া অনেকদিন।

গোহরের ওপর সহানুভূতিতে গলে গেল তিসির মন। সেদিন রাতে সে গোহরকে একটুখানি পা টেনে টেনে চলতে দেখেছিল। এত বলিষ্ঠ, এত সুন্দর মানুষটা কিন্তু ঐ একটু পায়ের ত্রুটির জন্য সবার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারল না। তা হোক, একা আছে বলেই না আজ তিসি মানুষটার এত কাছাকাছি আসতে পারল। তিসি বলল, আমিও একা, তুমিও একা, ভালই হল।

গোহর বলল, তিসি, আমরা একসাথে থাকতে পারি না?

তিসি কিছু সময় চুপ করে থেকে বলল, এই তো বেশ আছি আমরা। দুজন মস্ত বড় দুটো জায়গা নিয়ে আছি। ইচ্ছে হলে তুমি আমার চরের আস্তানায় কাটিয়ে আসবে কিছুকাল। আমিও খুশি মত কাটিয়ে যাব

তোমার গুহাব ডেরায়।

গোহর বলল, তাই হবে।

তিসি বলল, কই ছবি দেখাবে যে?

গোহর উৎসাহিত হয়ে উঠল। বলল, চল, চল। আগে উপত্যকার দিকে মুখ করে থাকা দুটো গুহা তোমাকে দেখিয়ে আনি।

ওরা একটা টিলা ঘুরে আসতেই গুহার মুখোমুখি হল। আলো পড়ে গুহার প্রায় সবটুকু অংশই দেখা যাচ্ছিল। ওরা হামা দিয়ে ঢুকল ভেতরে।

এক দঙ্গল বুনো মোষ ছুটে চলেছে। মাথায় বিশাল দুটি শিঙ্। লাল্‌চে হলুদ জমিনের ওপর ঘন বাদামী আর নীল্‌চে কালো রঙ দিয়ে আঁকা জন্তুগুলো বড় জীবন্ত মনে হচ্ছিল। তাড়া খেয়ে যেন তারা উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাচ্ছে।

আর একটা দেয়ালে হরিণগুলো যেন হাওয়ায় ভেসে ছুটে যাচ্ছে। ধনুকে তীর জুড়ে তাদের তাক্‌ করছে শিকারীর দল।

অন্য একটি গুহায় তিসিকে নিয়ে গেল গোহর। এখানে বর্শা হাতে হরিণের পেছনে ধাওয়া করেছে শিকারী। হরিণটা কিছুদূর ছুটে গিয়ে মুখ ফিরিয়ে দেখছে তার আক্রমণকারী কতদূরে।

ভিন্ন দেয়ালের গায়ে মৈথুন-রত দুটি বৃহৎ আকারের বন্য মোষ।

তৃতীয় গুহায় দুই গোষ্ঠীর মধ্যে যুদ্ধ-চিত্র। ধনুক, কুঠার আর বর্শা নিয়ে ঘোরতর যুদ্ধ। আহত সৈনিকদের কেউবা ধরাশায়ী, কেউবা পতনোন্মুখ। ধনুকে তীর জুড়ে নিক্ষেপ করছে কোন বীর। কারু বা নিক্ষিপ্ত বর্শা বাতাস ভেদ করে ছুটে চলেছে।

ওরা ফিরে এল গোহরের বসবাসের গুহাটিতে, যেখানে গোহর সবেমাত্র তার কাজটি সম্পূর্ণ করেছে। ওখানে সমস্ত দেয়ালজুড়ে একটি মাত্র নাচের ছবি। পুরুষটি কোমর দুলিয়ে হাত দুটি প্রসারিত করে রয়েছে। আর তার চারদিক ঘিরে নাচছে মেয়ের দল। ঘুরে ঘুরে নাচছে তারা।

ঐ তো এক কোণে, শিঙ্‌ওয়ালা একটা হরিণ বর্শাবিদ্ধ হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। বীরের সম্মানে গোষ্ঠীর নারীদের নৃত্য-লীলা।

তিসি বলল, এমন সব ছবি এই আমি প্রথম দেখলাম। আমার খু-উ-ব ভাল লেগেছে পটুয়া।

গোহর দুহাতে জড়িয়ে ধরল তিসিকে।

তুমি পাশে থাকলে আমি আরও অনেক ছবি আঁকতে পারব।

তিসি অনেকদিন পরে আবার একটা উত্তাপের ছোঁয়া পেল। অর্ধ্বস্ফুট গলায় বলল, তোমাকে ছেড়ে আর আমি কোথাও যাব না।

সেইদিনই গোহর এলো তিসির আস্তানায়। নতুন একটা জীবন শুরু হল দুজনের। তারা ভুলে গেল তাদের মধ্য-যৌবনের কথা। আদিম দুটি নরনারী রাতের অন্ধকারে পরস্পরকে আলিঙ্গন করে ভাবল, তারা এই প্রথম জীবনের মধুরতম, তীব্রতম উত্তাপ পাচ্ছে।

একদিন তিসি বলল, পটুয়া, তুমি শুধু পাহাড়ের গায়ে গুহা খুঁজে খুঁজে ছবির পর ছবি তৈরী করে যাবে। তোমাকে গাছের ফল কুড়োতে হবে না, শশক সজারু আর পাখি ধরার জন্য জাল পাততে হবে না। আমি চাষ করে যে ফসল ঘরে তুলব, নদী নালায় যে মাছ ধরব, তাতেই দুটো প্রাণীর দিব্যি চলে যাবে।

তোমার একার কষ্ট হবে না?

না। হলে তোমায় ডাকব।

তবু গোহর ফসল তোলার সময় সাহায্য করে তিসিকে। দুজনে ফসল বয়ে আনে। পলি পড়েছে যেসব জায়গায়, সেখানে ফসল বেশী ফলে। তাই বন থেকে চরের দিকে অনেকখানি এগিয়ে গেছে তিসির চাষ।

বছর ঘুরে এল। একদিন ক্ষেতের ধারে বসেছিল দুজনে। সবুজ গাছগুলোর মাথায় শিষ জেগে উঠেছে। খোসার ভেতর জন্ম নিচ্ছে নতুন বীজ। হঠাৎ সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে গোহর বলে উঠল, কেউ

মরে না, সব আবার বেঁচে ওঠে।

তিসি অবাক হয়ে বলল, কি বলছ তুমি! মরে গেলে কেউ আবার বাঁচে নাকি ?

নিশ্চয়ই বেঁচে ওঠে। এই তো গত বছর গাছগুলো শুকিয়ে মরে গেল। বীজগুলো ঝরে পড়ল। এখন দেখ সেই মরে যাওয়া শুকনো গাছ আবার ফিরে এসেছে তার বীজ নিয়ে।

তিসি অবাক হয়ে চেয়ে থাকে গোহরের মুখের দিকে। তার মনে হয়, এই ভাবুক পটুয়াটি তাদের মত মানুষ নয়। এর ভাব-ভাবনা, চালচলনই আলাদা।

যেদিন গোহর খবর পেল তিসির গর্ভে সন্তান এসেছে সেদিন সে চলে গেল নদীর ধারে। চরের ওপর মাটি জমিয়ে তৈরি করল একটি শায়িত নারী-মূর্তি। সেই নগ্ন-মূর্তিটির উদর ভেদ করে উঠেছে একটি গাছ। সেই গাছের ডালে একটি ফল ধরেছে।

সারাদিনের চেষ্টায় ঐ মূর্তিটি গড়ে গোহর যখন এক দৃষ্টে সেদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল, তখন তার পাশে এসে দাঁড়াল তিসি। সে কুল পেড়ে, ফল কুড়িয়ে ঘরে ফিরে দেখে, গোহর নেই। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরও যখন তাকে ফিরতে দেখল না তখন সে নদীর ধারে ডোঙার কাছে গেল। গোহর ডোঙা নিয়ে ওপারে যায়নি তো?

না, ডোঙা ঠিক জায়গাতেই বাঁধা রয়েছে।

তিসি এবার চর ঘুরে এসে পৌঁছল ঠিক জায়গায়। শিল্পীর ধ্যান ভাঙল না। সে তখন মগ্ন হয়ে দেখছিল তার সদ্য গড়ে তোলা সৃষ্টিকে।

এ কার মূর্তি ? পেছন থেকে জিজ্ঞেস করল তিসি।

চমকে পেছন ফিরে তাকাল পটুয়া। হাসিতে উদ্ভাসিত হল মুখ।

এ তোমার মূর্তি তিসি।

অমনি মূর্তির সামনে হাঁটু ভেঙে বসে তিসি একমনে দেখতে লাগল।

নাভির ওপর একটা গাছ। ফলও ফলে আছে তাতে।

অর্থ খুঁজে না পেয়ে জিজ্ঞাসু চোখ মেলে তাকাল তিসি। শিল্পী বলল, নারী আর বৃক্ষে কোনও তফাৎ নেই। নারী সন্তান দেয়, বৃক্ষ দেয় ফল।

তিসি কতক্ষণ চেয়ে রইল পটুয়ার মুখের দিকে। তারপর নিবিষ্ট হয়ে আবার সেই মূর্তিটা দেখতে লাগল।

।। তিন ।।

দুর্ধর্ষ হয়ে উঠেছে গোংগা। ভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে লড়াই, গোংগা ছুটেছে সবার আগে। অন্য সর্দারদের মত সবাইকে এগিয়ে দিয়ে সে পেছনে থাকে না। তাই গোষ্ঠীর কোনও মানুষ আড়ালেও তার সমালোচনা করে না, সবাই তার অনুগত। গোংগাকে সবাই ভালবাসে, তাকে একান্ত আপনজন বলে ভাবে।

এদিকে তিসির ছেলে টিথু আর ঝুরার মানুষ ভুসুক, গোংগার ছায়াসঙ্গী। আনন্দ উল্লাসে আর লড়াইয়ের মাঠে তারা সমান সজাগ।

পূর্বের সর্দার আগামার ছিল অনেকগুলি নারী। তারা ছিল গোংগার অধিকারে। একমাত্র রুরুকে কাছে রেখে অন্যদের সে ইচ্ছেমত পুরুষ বেছে নেবার সুযোগ করে দিল। নিহত সর্দার আগামার ছেলেমেয়েদের সে যত্ন করে গোষ্ঠীর যা শিক্ষা তা দেবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল।

তাছাড়া সর্দার বলে বেশি কোনও আরাম অথবা সুযোগ সে নিতে চাইত না।

দলের বুড়োদের সে সম্মান করত। বুড়োদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবার চেষ্টা কবত সে। ছোটদের পরামর্শ উপেক্ষা করত না কখনও।

একবার দেখা গেল দল বেঁধে ছোট বড় নানা জাতেব পশু ধূ ধূ ফাঁকা প্রান্তর পেরিয়ে চলে আসছে। তারা এসে ঢুকছে গোংগাদের পাহাড় আর জঙ্গলে।

গোংগা এর সঠিক কোনও কারণ অনুমান করতে পারল না। সবার কাছে জিজ্ঞেস করে গোংগা কিন্তু সবাই প্রায় নিরুত্তর।

এক বুড়ো জীবনে অনেক কিছু দেখেছে, সে বলল, এ বছর প্রচণ্ড খরায় জ্বলছে চারদিক। মনে হয় দূরের ঐ পাহাড়ে ঝর্ণার জলে টান পড়েছে, তাই জল তেষ্টায় পালিয়ে আসছে জানোয়ারগুলো। দেখ গিয়ে, আমাদের জলের কুণ্ডে ওরা পেটভরে শুধু জলই শুষে নিচ্ছে।

কথাটা মনে ধরল গোংগার। ভুসুক আর একটা কথা যোগ করল, জানোয়ারগুলো আসছে, পেছন পেছন মানুষজনও আসবে। তখন আমাদের আস্তানা ওরা দখল করার চেষ্টা করবে।

চমকে উঠল গোংগা। ভুসুক বয়সে ছোট কিন্তু বুদ্ধি আছে ওর। ভেবেছে ঠিক।

অমনি সাজ সাজ রব পড়ে গেল। বর্শা কুঠার ধনুক নিয়ে সবাই তৈরি হয়ে রইল। পাহাড়ে, টিলায়, বনের আড়ালে অপেক্ষা করতে লাগল দলে দলে। গোংগা বলল, কেউ ওদের আগে আক্রমণ করবে না। ওরা যদি কুণ্ডে জল খেয়ে যেমন চলছিল তেমনি এগিয়ে চলে যায় তাহলে ওদের কোনও রকমে বাধা দেওয়া হবে না। আর যদি থাকবার চেষ্টা করে গায়ের জোরে তাহলে সব শক্তি দিয়ে ওদের তাড়াতে হবে।

ভুসুক ঠিকই অনুমান করেছিল। জানোয়ারদের প্রায় পিছে পিছেই আসতে লাগল বিশাল এক গোষ্ঠী। গোংগাদের গোষ্ঠীর চেয়েও বড়। তারা হাতিয়ার উঁচিয়েই আসছিল।

তারা প্রথমে কুণ্ডের কাছে গেল। খুশি মত স্নান, পান করল। কিন্তু নড়ল না। কুণ্ডের চারদিক ঘিরে আস্তানা গাড়ল। বর্শা উঁচিয়ে কুণ্ড পাহারা দিতে লাগল।

এখন গোংগাদের গোষ্ঠীর কোন মানুষের পক্ষে ওদের ডিঙিয়ে জল আনতে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ল। এদিকে ঝর্ণার জল প্রায় শুকিয়ে ক্ষীণ ধারায় বইছিল। এত মানুষের পক্ষে ঐটুকু জল প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম।

গোংগা বলল, চল নামি, এই মুহূর্তে আঘাত হানতে না পারলে ওরা আমাদের শুকিয়ে মারবে।

ঠিক হল, পাহাড়ের ওপরে গাছের আড়াল থেকে ধনুর্ধারীরা তীর ছুঁড়বে। আর পাহাড়ের দু'প্রান্তের জঙ্গল থেকে বর্শা আর কুঠারধারীরা একযোগে আক্রমণ করবে।

বর্শাধারীদের দলের পরিচালনায় রইল টিথু, আর কুঠারধারীদের চালনা করবার ভার পেল ভসুক। ধনুর্ধারীদের নিয়ে পাহাড়ের ওপর রইল গোংগা। তার মত নিপুণ তীরন্দাজ এ গোষ্ঠীতে কেউ ছিল না। সে লক্ষ্য রাখবে ভুসুক আর টিথুর ওপর। ওরা নিপুণ যোদ্ধা। তবু যদি কেউ পেছন থেকে ওদের আঘাত হানার চেষ্টা করে তাহলে গোংগাই তীরবিদ্ধ করবে তাদের।

পাহাড়ের ওপর থেকে গোংগার গর্জন শোনা গেল, তোরা এখুনি কুণ্ড ছেড়ে চলে যা না হলে বিপদ ঘনিয়ে আসবে।

নিচে থেকে লোকগুলো গোংগার দিকে বর্শা আর কুঠার তুলে ধরল।

আবার গোংগার চীৎকার শোনা গেল, মরতে চাস তো মর। তবে এখনও বলি, কেউ যদি হাত থেকে হাতিয়ার ফেলে দিয়ে খালি হাতে দাঁড়িয়ে থাকিস তাহলে আমাদের লোক তাকে আঘাত করবে না। আমি তাকে নিজের লোক মনে করে রক্ষা করব।

বলা শেষ করেই প্রথম তীর ছুঁড়ল গোংগা। এটাই ছিল তার লড়াইয়ের সঙ্কেত। অমনি দুদিক থেকে মার মার শব্দে ছুটে এল গোংগার বাহিনী। কোনওরকম প্রস্তুত হবার আগেই শত্রুপক্ষকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে লাগল। বহু মানুষ হাতিয়ার ফেলে ঊর্ধ্বশ্বাসে সামনের প্রান্তর দিয়ে ছুটে পালাল। কেউ বা মারা পড়ল সমানে সমানে লড়াই করে।

সন্ধ্যার কিছু আগে যুদ্ধ থামলে দেখা গেল, বহু মানুষ প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে। আবার কিছু মানুষ পড়ে আছে প্রাণহীন দেহ নিয়ে। আহতের আর্তনাদও শোনা যাচ্ছে। কিছু মানুষ গোংগার নির্দেশ অনুযায়ী হাতিয়ার ফেলে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

নিজের এবং বিপক্ষ দলের আহতদের সেবার ব্যবস্থা করল গোংগা। যারা হাতিয়ার ফেলে দিয়েছিল তাদের দলভুক্ত করে নিল।

এরপর ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর বৃষ্টিপাত হল। মেঘের ডাকে, বজ্রপাতে, বাতাসের দমকের সঙ্গে আকাশ ভাঙা বৃষ্টিতে যেন প্লাবন বয়ে গেল। খরায় পুড়ে যাওয়া চরাচর বৃষ্টির জলে সবুজ হয়ে উঠল।

গোংগা এই সময়টাকে উপযুক্ত ভেবে ভুসুকের নেতৃত্বে একদল লোককে পাঠিয়ে দিল সেই খরার রাজ্যে, যেখান থেকে মানুষজন কিছুদিন আগে চলে এসেছিল। এই দলে রইল সেখানকার কিছু মানুষ আর গোংগার দলের কিছু। ভুসুকই হবে সে অঞ্চলের গোষ্ঠীপতি। তাহলে সদ্ভাব থাকবে উভয় অঞ্চলের মানুষের।

ঝুরা চলে গেল ভুসুকের সঙ্গে। মনে উত্তেজনা, একটা নতুন জীবন, নতুন দেশ। মনের মানুষ রইল সঙ্গে।

যাবার সময় টিথু দিদিকে অনেকখানি পথ এগিয়ে দিয়ে এল। হাত ধরে বলল, পাহাড়ের ওপর যে লম্বা গাছটা থেকে তোকে লাল ফুল পেড়ে দিতাম, সেটাতে আবার ফুল ফুটলে আমি তুলে নিয়ে যাব তোর কাছে।

গোংগা টিথুকে মনের মত করে গড়ে তোলে। টিথু এখন বলিষ্ঠ সুন্দর এক তরুণ। তার মুখের আদল ঠিক তার মায়ের মত। অন্যদিকে ঝুরা মায়ের স্বভাবটি পেলেও গড়ন-গাড়নে হয়েছে একেবারে বাবা।

গোংগা নিঃসন্তান। অনেকেই তাকে একাধিক স্ত্রী রাখার জন্য পীড়াপীড়ি করেছিল কিন্তু কারু কথা শোনেনি গোংগা। রুরুকে সে কোনও রকম মনের কষ্টই দিতে চায় না।

একদিন রাতে গোংগার বুকে হাত বোলাতে বোলাতে রুরু বলল, তুমি আর একটা মেয়ে ঘরে নিয়ে এসো।

কেন?

সে তোমাকে ছেলে অথবা মেয়ে দেবে।

আমি কাউকে চাই না রুরু, তোকেই চাই।

রুরু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে, আমি তোমাকে একটাও ছেলেমেয়ে দিতে পারলাম না। মেয়েরা আমার দোষ দেয়। গালমন্দ করে।

তুই তাদের বলিস তারা যেন তাদের সব কটা ছেলেমেয়েকে তোর কাছে পাঠিয়ে দেয়। তুই তাদের পালনপোষণ করবি। তারা সকলে হবে তোর আর সর্দারের ছেলে।

রুরু বার বার তার জীবন দিয়েছে বলেই যে সে রুরুর ওপর কৃতজ্ঞ, তা নয়, রুরুর কাছে টানবার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। তার চোখের চাহনি এমন ভাবে টানে যেখান থেকে এক পা-ও সরে আসার উপায় নেই। ঠোঁট টিপে সে যখন হাসে তখন বুকখানা দুলে ওঠে। তার চলা, তার কথা বলা সবই বুকের রক্ত তোলপাড় করে দেয়।

দিনের আলোয় গোংগা তার নতুন কোন কাজের জন্য গোষ্ঠীর বুড়োদের ডেকে পরামর্শ করে। কিন্তু রাতেরবেলা রুরুর সঙ্গে চলে তার পরামর্শ। রুরু বিষয়টার এমন একটা সহজ সমাধান করে দেয় যা মেনে না নিয়ে উপায় থাকে না।

জ্যোৎস্না রাতে চুপচাপ রুরুকে সঙ্গে নিয়ে গোংগা বেরিয়ে পড়ে। বনের ভেতর ঢুকে কোন মসৃণ পাথরের ওপর পাশাপাশি বসে। গোংগা তার আগেকার জীবনের গল্প করে যায়। রুরু সে গল্প শোনে।

ছোট ছোট মন্তব্যও করে।

দাহা কি তোমার মত দেখতে ?

না, বরং কতকটা তিসির মত।

তুমি?

আমার মায়ের মত।

প্রসঙ্গ পাল্টায় রুরু, তোমার মুখে শুনেছি লা মানুষটা বোবা। তিসি তাকে পছন্দ করল কি করে?

গোংগা বলে, লা বোবা ঠিক কিন্তু প্রচণ্ড শক্তি তার গায়। বুদ্ধি, কৌশলেও তার জুড়ি মেলা ভার। এমন মানুষকে সঙ্গী বেছে নিয়ে তিসি ঠিক কাজই করেছিল।

পাল্টা প্রশ্ন করে গোংগা, আমাকে ভালোবেসেছিলি সে কি আমি বোবা ছিলাম না বলে?

রুরু বিচিত্র হাসি হাসে। বলে, কত মানুষই তো বোবা নয়, তাবলে সবাইকে কি ভালোবাসা যায়।

তবে, আমাকে তোর মনে ধরেছিল কি জন্যে বল?

রুরু বলে, ঐ যে তুমি সাঁতার কেটে আমাদের সেরা সাঁতারুটাকে হারিয়ে দিলে, তাতেই আমার মন জয় করে নিলে। যে সব সময় জোরে ছুটতে পারে অথবা চোখের পলকে হাতিয়ার ছুঁড়ে ছুটন্ত জানোয়ারকে ঘায়েল করতে পারে তাকে কেন জানি না ভীষণ ভাল লাগে। সে চোখের পলকে আমার মন কেড়ে নেয়।

গোংগা বলে, আজ আমি না হয় ছুটন্ত জানোয়ারকে হাতিয়ার ছুঁড়ে ঘায়েল করতে পারি, কিন্তু যেদিন পারব না সেদিন কি তুই আমাকে ছেড়ে পালাবি?

দুটো বাহু দিয়ে কঠিন বাঁধনে গোংগার গলা জড়িয়ে ধরে রুরু বলে, তুমি চিরদিন ছুটে চলবে, কোনদিন বুড়োদের মত বসে থাকবে না।

আশ্চর্য মানুষের মন। পরদিনই গোংগা গিয়েছিল শিকারে। রুরুর ভালোবাসা পাবার ক্ষমতা আছে কিনা তাই পরীক্ষা করতে গিয়েছিল সে। সবাইকে বলেছিল, বন থেকে ফাঁকায় জানোয়ারগুলো তাড়িয়ে দেবে, কিন্তু ফাঁকায় কেউ তাদের তাড়া করবে না। যা করবার সে নিজেই করবে।

গুহার মুখে বসেছিল রুরু গোংগার শিকার-পর্ব দেখবে বলে।

শিকারীদের তাড়া খেয়ে শিঙওয়ালা একটা হরিণ পাহাড় থেকে লাফিয়ে নামল সমতলে। তারপর ফাঁকা পেয়ে দৌড় লাগাল।

বর্শা হাতে সমতল ঘাসের জমিতে দাঁড়িয়েছিল গোংগা। হরিণটাকে ছুটতে দেখে সেও ছুটল তার পেছন পেছন। ওটাকে বর্শায় বিদ্ধ করতেই হবে।

একসময় গোংগা তার সবটুকু শক্তি নিঙড়ে দিয়ে হরিণটার কাছাকাছি এসে পৌঁছল। আর অব্যর্থ লক্ষ্যে ছুঁড়ল বর্শা। বিদ্ধ হয়ে গেল হরিণ । কিন্তু ততক্ষণে প্রায় নিঃশেষিত হয়ে গেছে গোংগার দমটুকু। সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল হতচেতন হয়ে।

সেবার অনেকগুলি দিনের সেবা শুশ্রূষায় তাকে সুস্থ করে তুলেছিল রুরু।

সেই গোংগা আর সেই রুরু, যারা পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়েছিল বৃক্ষ আর বাকলের মত, তাদের জীবনে ঘটে গেল এক অভাবিত ঘটনা। ঘটনাটি শুরু হল এক দ্বি-প্রহরে।

পাহাড়ে উঠেছিল টিথু বনমোরগের খোঁজে। এমন সময় চোখে পড়ল তার একটা দৃশ্য। সমতল তৃণভূমির ওপর দিয়ে একটা জানোয়ার ছুটে আসছে। কাছাকাছি এসে পড়তে দেখা গেল, জানোয়াবটার ওপরে একটা মানুষ চেপে বসে আছে। আর জানোয়ারটা একেবারে অচেনা।

তাজ্জব ব্যাপার। টিথু তরতরিয়ে নেমে গেল নিচে। লোকটা তখন পাহাড়ের তলায় এসে ঠেকেছে।

টিথু মুখোমুখি হতেই লোকটি জানোয়ারটার পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল।

টিথু দেখল, জানোয়ারটার রঙ অনেকটা আগুনের মত লালচে হলুদ। মাথায় শিঙ নেই। ঘাড়ে লোম ঝলর ঝলর করে ঝুলছে। পেছনের লেজটাও তেমনি।

লোকটাকে দেখে বেশ চালাক চতুর বলে মনে হল।

টিথুই প্রথম কথা বলল, এ জানোয়ারটার নাম কি ? এমন জন্তু কখনও দেখিনি। তুমিই বা এর ওপর চাপলে কি করে?

ভাষা না বুঝলেও ইঙ্গিতে সব বোঝা গেল।

লোকটি বলল, এ এক আশ্চর্য জন্তু। এর নাম ঘোড়া। এ খুব জোরে ছুটতে পারে। মানুষকে পিঠে নিয়ে এ ছুটে চলে। এর ওপর চড়ে শিকার করা খুব সুবিধের। এটাব ব্যবহার কেবল আমার মুলুকের লোকেরাই জানে।

লোকটি যেভাবে বলে যাচ্ছিল তাতে বিষয়টা বুঝতে কোনওরকম অসুবিধে হচ্ছিল না।

টিথু সমস্ত ঘটনাটা দেখে এবং শুনে এমনি অভিভূত হয়ে গেল যে সে লোকটাকে খাতির করে ডেকে নিয়ে গেল তাদের আস্তানায়।

ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষ জড়ো হয়ে গেল সেই তাজ্জব জীবটিকে দেখতে।

লোকটির কাছ থেকে আরও জানা গেল সে এসেছে বহুদূর দেশ থেকে। এ জীবটির ওপর সওয়ার হয়ে ঘুরে বেড়ানোই তার সখ।

গোংগা সহজে ছাড়ল না লোকটিকে। সর্দারের ঘরে তার থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হল। অমেক খাতির দেখানো হল, অনেক গল্পগুজব চলল তার সঙ্গে।

লোকটিও অবাক হল, এদের একটি বিদ্যা দেখে। এরা মোষ জাতীয় জীবকে বশ মানিয়েছে। তার কাছ থেকে মিষ্টি দুধও আদায় করছে।

ঘোড়ায় চড়ে অদ্ভুত সব খেলা দেখাতে লাগল লোকটা। এসব দেখতে গোষ্ঠীর মেয়ে পুরুষ ভেঙে পড়ল মাঠে।

তীর ছুঁড়ল, বর্শা ছুঁড়ল ঘোড়ার পিঠে চেপে। তা বিদ্ধ করল লক্ষ্যবস্তু।

এদিকে সারা মাঠ জুড়ে ঘোড়া ছুটল ডাইনে বাঁয়ে, আবার কখনো চক্রাকারে।

এত গতি জন্তুটার! তার পিঠে চেপে এত কসরৎ মানুষটার!

উল্লাসের সময়েও কারু মুখে কথা নেই, সবাই কেমন বোবা বনে গেছে।

নিজের গুহায় লোকটার মুখোমুখি বসে আছে গোংগা। দুজনকে খাবার সাজিয়ে দিয়ে একটু দূরে বসে আছে রুরু। এ ক'দিন সে সবকিছুই দেখছে, কেবল মুখে কোনও ভাবান্তর নেই। এই অদ্ভুত মানুষ আর জন্তুটা সম্বন্ধে গোংগা উচ্ছ্বাসে তার সঙ্গে আলোচনা করতে চেয়েছে— কোনও উৎসাহ নেই।

গোংগা খেতে খেতে মানুষটাকে বলল, তোমরা কি করে এই জীবটাকে ধর?

আমরা প্রথমে জেনেনি বনের কোন জায়গাটায় এগুলো দাঁড়ায়। তারপর গাছ থেকে শক্ত ফাঁস ফেলে ওদের গলাটা আটকাই। সঙ্গে সঙ্গে ফাঁসের লতাটা গাছের মোটা ডালে জড়িয়ে বেঁধে ফেলি। সে সময় ভীষণ লাফঝাঁপ করে। একটু ঠাণ্ডা হলে সবাই মিলে ওকে পাকড়াও করি।

গোংগা বলল, বেশ জীব, শিঙ্ নেই যে খুঁচিয়ে মারবে। পিঠে একবার চেপে বসতে পারলেই হল। যেখানে খুশি চালিয়ে নিয়ে চল।

লোকটা বলল, সবাই এর ওপর চড়তে পারে না, পারলেও ঠিকমত চালাতে পারে না। একে ছোটাবার কায়দা জানা চাই।

বিস্ময়ের আওয়াজ গোংগার গলায়, আচ্ছা!

লোকটা হাত নেড়ে বলল, আমি গাছের ডাল থেকে সিধে ঝাঁপিয়ে পড়ি বুনো ঘোড়ার পিঠে। ওর ঘাড়ের লম্বা লোমগুলো ধরে ওর গায়ের সঙ্গে প্রায় লেপটে থাকি। সারাটা দিন ও আমাকে পিঠে নিয়ে এলোপাথাড়ি দৌড়য়। অন্য কেউ হলে অনেক আগেই পড়ে যেত পিঠ থেকে।

গোংগার মনে হল, গোষ্ঠীতে ঢোকার আগে সে এমনি একটা পরীক্ষা দিয়েছিল। ছুটন্ত বুনো মোষের পিঠে লাফিয়ে চড়ে তাকে ঘায়েল করেছিল।

গোংগা বলল, বিদেশী বন্ধু, তুমি যদি আমাকে একটা ঘোড়া দাও তাহলে তার বদলে যা চাও তাই পাবে।

লোকটা বলল, এ আর এমন কি ব্যাপার। ঘোড়া একটা এনে দেব তার বদলে না হয় কিছু চেয়েই নেব।

গোংগা উৎসাহে বলল, তোমাকে আগাম আমি আমার সেরা মোষটা দিয়ে দিতে পারি।

নেব নেব, তোমার কাছ থেকে একটা জিনিস নিশ্চয়ই নেব।

সেদিন গোংগা মনে মনে বড় একটা সুখ অনুভব করেছিল।

এ ক'দিন সর্দারের হেপাজতেই ছিল ঘোড়া আর তার সওয়ার। ভাল ভাল খাবার তৈরি করে রুরু যেমন গোংগা আর বিদেশী মানুষটাকে খাওয়াত, তেমনি ঘোড়ার জন্যে নিজের হাতে কেটে আনত ঘাস। সে চুপচাপ সব কাজই করে যেত। ঘোড়ার পিঠে পেটে, ঘাড়ের লোমে হাত বুলিয়ে দিত।

ঘোড়াটা চিনে ফেলেছিল রুরুকে। সে যখন দূর থেকে রুরুকে তার জন্যে ঘাসের বোঝা মাথায় বয়ে আনতে দেখত তখন পা ঠুকে ঠুকে চিঁহি চিঁহি ডাক পাড়ত।

অনেকসময় গোংগাকে ঐ দৃশ্যটা দেখিয়ে বিদেশী মানুষটা হেসে বলত, ঐ যে ঘোড়ার আসল মালিক আসছে।

গোংগাও সে হাসিতে যোগ দিত।

একদিন দেখা গেল, ঘোড়ার আসল মালিক উধাও। রুরু ঘাস কাটতে বনে ঢুকল, আর ফিরল না। ঘোড়াওয়ালা ঘোড়া নিয়ে বেরিয়েছিল হাওয়া খেতে, সেও আর এমুখো হল না।

গোংগা বলতে লাগল, তার বউকে নিশ্চয় বাঘে খেয়েছে। গোংগাকে ছেড়ে সে পালাবার মেয়েই নয়।

কিন্তু বনবাদাড়ে অনেক টুঁড়েও বাঘে চিবানো একটুকরো হাড় কিংবা পোশাকের সামান্য একটা টুকরোও খুঁজে পাওয়া গেল না।

গোংগা বিদেশীকে আগাম দিতে চেয়েছিল তার সেরা মোষটা, রসিক মানুষটি তার বউকেই নিয়ে উধাও হল তার ঘোড়ার সামনে বসিয়ে।

কিছুদিনের ভেতর গোংগার মাথায় কিছু গোলমাল দেখা দিল। সে জ্যোৎস্না রাতে বনের মধ্যে একা একা ঘুরে বেড়ায়। গাছের ফাঁকে ফাঁকে ছায়া আর আলোয় যে অবয়ব গড়ে ওঠে তার দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে। রুরু, রুরু ডাকতে ডাকতে ছুটে যায়।

কখনও বা বনের গাছের ধাক্কা খেয়ে লুটিয়ে পড়ে। কপাল ফেটে রক্ত গড়ায়। টিথু খুঁজে খুঁজে গোংগাকে কাঁধে বয়ে নিয়ে আসে গুহায়।

ইতিমধ্যে একটা লড়াই হয়ে গেল। ভসুক যে পাহাড়ে দলপতি হয়ে বসেছিল, সেখানে অনেককাল পরে ফিরে আসতে লাগল তার পুরনো অধিবাসীরা। তারা চাইল তাদের দখল। এখন নতুন আর পুরনো দলে লাগল তুমুল লড়াই।

খবর এল গোংগার কাছে। কিন্তু গোংগা তখন নামেই সর্দার, কোনও কিছু ভাববার ক্ষমতা তখন আর তার নেই।

সবাই মিলে পরামর্শ করে টিথুকেই দিল সর্দারের দায়িত্ব। টিথু গোষ্ঠীর লোকলস্কর নিয়ে চলল লড়াই করতে। ভুসুক আর টিথু মিলে ক'দিন ঘোরতর যুদ্ধের পর হটিয়ে দিল আগন্তুকদের। তাদের ভেতর যারা

আত্মসমর্পণ করল, তারাই শুধু পেল ভুসুকদের পাহাড়ী অঞ্চলে থাকার অধিকার।

দেখা হল ভাইবোনে। গোংগার অবস্থার কথা টিথুর মুখে শুনে কেঁদে ভাসাল ঝুরা।

ভুসুক বলল, তোদের ওখানে যাবার আগে ও ব্যাটা ঘোড়া নিয়ে আমার এখানেও এসেছিল। আমি তাকে বলেছি, এটায় চড়ে সহজে শিকার করা যায় কিন্তু তাতে আনন্দ কোথায়? জানোয়ারের সঙ্গে সমানে ছুটে যে বর্শা চালিয়ে তাকে ঘায়েল করতে পারে সে জানবে অনেক বেশী ক্ষমতা ধরে।

সে আমাকে কয়েকটা ঘোড়া এনে দেবে বলেছিল।

আমি তাকে বলেছিলাম, ঘোড়ায় আমার কাজ নেই। ঘোড়ায় চড়লেই মানুষ খোঁড়া হয়ে যাবে। সে আর নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে কোন কাজ করতে চাইবে না।

লোকটা সরে পড়েছিল।

টিথু বলল, আচ্ছা, কি উদ্দেশ্য নিয়ে লোকটা ঘোরাফেরা করছে বলতে পার?

আমার কাছে ঘোড়া এনে দেবার কথা বলে আগাম চাইল চামড়ার কিছু পোশাক। আমি একটুকরোও কিছু দিইনি।

ভুসুককে বলে টিথুর সঙ্গে ঝুরা গেল গোংগাকে দেখতে। কিন্তু হায়! ঝুরার সে আশা আর পূর্ণ হল না। টিথু যেদিন লড়াইয়ে গেল, তার পরের দিন সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই যে গোংগা উধাও হয়ে গেল, তাকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

এদিকে গোংগা দিগ্‌বিদিক ঘুরতে ঘুরতে একদিন এসে পড়ল একটা পাহাড়ী বনের ভেতর। সে একটা গাছের তলায় পড়ে থাকা কিছু ফল কুড়িয়ে খেল, আর একটা ঝোরার জল খেয়ে অনেক দিন পরে একসঙ্গে ক্ষুধা তৃষ্ণা মেটাল।

আকাশ জ্বলছিল। চরাচর জ্বলছিল। এ বছরও বোধহয় খরায় জ্বলে যাবে দিক দেশ। শুকিয়ে যাবে কত ঝর্ণার জল, পুড়ে যাবে পায়ের তলার ঘাস। মানুষ আর পশু দলে দলে বেরিয়ে পড়বে খাবার আর জলের সন্ধানে।

গোংগার ঘুম এল অনেকদিন পরে। দু'চোখ ভেঙে ঘুম নামল। সে একটা পত্র বহুল গাছের তলায় ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ে রইল।

মাঝরাতে স্বপ্ন দেখল গোংগা। সেই বিদেশী ঘোড়াওয়ালা তার লাল ঘোড়ায় চড়ে ফাঁকা মাঠে দৌড়ের কসরৎ দেখাচ্ছে। শেষ সূর্যের সোনালি লাল আভাটা ঘোড়ার রঙের সঙ্গে, কেশরের লোমের সঙ্গে মিশে জ্বলন্ত আগুনের রূপ নিয়েছে। ঐতো লোকটা এবার মাঠ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। যাবার সময় কাকে যেন তুলে নিল তার ঘোড়ার সামনে। এবার চোখের পলকে বেরিয়ে যাচ্ছে সে। না, ওকে যেতে দেওয়া হবে না। গোংগা ঠিক চিনেছে, ও পালাচ্ছে ওর সব সেরা ধন রুরুকে নিয়ে।

প্রবল একটা চীৎকার করে ঘুম থেকে জেগে উঠল গোংগা। কিন্তু এখানেও সেই ঘোড়সওয়ার। ঐতো সেই আগুন রঙের ঘোড়া। হু হু করে বাতাস চিরে ছুটছে বনের ভেতর দিয়ে। বন কাঁপছে তার দাপটে। ঐতো ডাল পাতার আড়ালে ঝিলিক দিয়ে উঠছে এখানে ওখানে।

গোংগা ওকে ধরবেই। কোথায় পালাবে ও তার রুরুকে নিয়ে।

প্রথম যৌবনের সেই দূরন্ত গতি আর একবার জেগে উঠল গোংগার পায়ে। সে নিমেষে বনের গভীর থেকে গভীরে ঐ ঝড়ের মত দ্রুতগামী আগুন-রঙা অশ্বের খোঁজে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পরদিন বনের পাশ দিয়ে ভেড়ার পাল তাড়িয়ে নিয়ে যেতে যেতে একটি মেষপালক দেখল, সর্বগ্রাসী দাবানলে বনের প্রায় সব অংশটাই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এখনও ঠিক মধ্যিখানে দগদগে খানিকটা আগুন ধিক্ ধিক করে জ্বলছে।

।। চার ।।

একটা সুর ভাঁজতে ভাঁজতে চলেছে দাহা। কদিন হল, গলায় কি যেন মিষ্টি একটা শব্দ বার বার ফিরে ফিরে বাজছে। কোনো কথা নয়, কোনো অর্থ নয়, শুধু একটা ভাল-লাগা আওয়াজ গলার ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আসছে।

এই সুরটা যেদিন প্রথম গলা দিয়ে বেরুল সেদিন দাহা বসেছিল নীরবে একটি ছোট্ট পাহাড়ী ঝর্ণার ধারে। কুল কুল শব্দ তুলে বয়ে যাচ্ছিল ঝর্ণাটা। একটা পাখি অপূর্ব রঙীন পাখা মেলে উড়ে এল। স্রোতের ওপর সামান্য জেগে থাকা একটা মসৃণ পাথরের টুকরোর ওপর সে বসল. স্রোতে ঠোঁটটি ঠেকিয়ে সে জল খেল। পাথরে ধাক্কা লেগে জলের রেণুগুলো ছড়িয়ে পড়ছিল। মাঝে মাঝে পাখা মেলে দিয়ে সে গায়ে মেখে নিচ্ছিল জলকণাগুলো। হয়তো অনেকখানি পথ উড়ে এসেছিল গরম হাওয়ার ভেতর দিয়ে।

ছোট্ট নরম শরীরটা যখন তার জুড়িয়ে গেল তখন সে উড়ে বসল গাছের ডালে। যে গাছের তলার ছায়ায় আরাম করে এলিয়ে বসেছিল দাহা।

মনের খুশীতে কি মিষ্টি সুর তুলল পাখিটা। দাহা ওকে দেখতে লাগল। দাহা ওর গলার থেকে উঠে আসা স্বর শুনতে লাগল। জলের কুলকুল ধ্বনি, পাখির সুর, হাওয়ার ছোঁয়ায় পাতার মাঝে মাঝে বেজে ওঠা— সব মিলেমিশে কেমন যেন একাকার হয়ে গেল।

ঠিক ঐ মুহূর্তে দাহার গলা দিয়ে বেরুল সুর। সে আপন মনে কতক্ষণ বসে বসে ঐ সুর ভাঁজতে লাগল।

এখন ভেড়ার পাল নিয়ে চলতে চলতে কিংবা গাছের ছায়ায় বসে দাহা যে সুর ভাঁজে সেটার সঙ্গে তার প্রথম দিনের পাওয়া সুরের প্রায় কোন মিলই নেই। কিন্তু এটাও একটা সুর আর এতেই মজে আছে সে।

এবার উপত্যকা ছেড়ে ওপরের দিকে উঠছে দাহা। উপত্যকার বনের সীমায় সে কয়েকটা গাছ দেখল। এ গাছ আগে কখনও তার চোখে পড়েনি। ডালে ডালে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল। মৌমাছিরা ভীড় জমিয়েছে।

দাহা বেশ কিছু সময় সেই গাছগুলোর গায়ে হাত বুলিয়ে, তাদের চারদিকে মনের খুশীতে ঘুরে ঘুরে বলল, আমি আবার আসব তোমাদের কাছে। ওপরের পাহাড়ে যখন শীতের হাওয়া তাড়া করবে তখন আমি নেমে আসব এই উপত্যকায়। তোমাদের আমি দেখে যাব।

নিজের মনে কথা বলে চলে দাহা। সে কোন গোষ্ঠীর ভেতর বাস করে না তাই তার মুখোমুখি কথা বলার সঙ্গী নেই। সে গাছপালা, ফুল পাখির সঙ্গে কথা বলে। আর কথা বলে তার ভেড়াগুলোর সঙ্গে।

কি হল, উঠতেই যে পারছিস না পাহাড়ে ? বুঝেছি, এন্তার ঘাস খেয়ে ফুলে উঠেছে পেট। বেশ, সামনের ঐ গাছতলায় চল, খানিকটা বিশ্রাম নিয়ে নিবি।

ভেড়াদের বিশ্রাম করতে দিয়ে নিজেও জিরিয়ে নেয় দাহা।

বনে ঢুকলে অনেক সময় কাঁটা ফোটে ভেড়াদের পায়ে। সে তখন আশপাশের গাছ থেকে লম্বা একটা কাঁটা ভেঙে আনে। কাঁটা দিয়ে কাঁটা খুঁচিয়ে তোলে। এ সময় ভেড়াটাকে বগলে চেপে ধরতে হয়। সেটা গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে থাকে। কাঁটা তুলে দিয়ে দাহা বলে, এত চেঁচাচ্ছিলি কেন? পায়ে কাঁটা ফুটলে কেউ চলতে পারে? এখন দেখ কত আরাম।

বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে ওর ভেড়ার সংখ্যা এখন অনেক বেড়ে গেছে। বাচ্চাগুলো অনেক সময় পাহাড় ডিঙোতে পারে না, ঝর্ণার জল পেরুতে পারে না, তখন মিহি সুরে কাঁদে। তাদের করুণ কান্নায় ভিজে ওঠে দাহার মন। সে তার চামড়ার পোশাকের খাঁজে দু'একটা ঢুকিয়ে নেয়। বাকিগুলো ওঠে তার কোলে অথবা কাঁধে।

অনেক উঁচু পাহাড়ে ওরা উঠে যায়। সেখানে বৃষ্টি নেই বললেও চলে। নিচের উপত্যকায় তখন হয়তো অঝোর বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে।

ওরা বরফে ছাওয়া গিরিপথ পার হয়। *নতুন নতুন অঞ্চলে যাবার প্রেরণা ওদের দাঁড়িয়ে নিয়ে চলে! পিছল বরফের ওপর দিয়ে আবার উৎরাইতে নেমে চলা। বড় সাবধানে পা রাখতে হয় বরফে। কোন* বরফের চাঁইয়ের ওপর পা দিলেই ভেঙে যায়। ঐসব বরফের নিচে বইছে নদী। অসাবধানে পা পড়লেই তলিয়ে যেতে হবে। স্রোতে টেনে নিয়ে যাবে কোন অতলে। ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে মৃত্যু।

দু'চারটে ভেড়া প্রতিবছর খোয়া যায়। হয়, এমনি বরফ নদীতে ডুবে, নয়তো তাড়াহুড়ো করে পথ চলতে গিয়ে খাদে উল্টে পড়ে।

দাহা ওদের সাবধানে চালিয়ে নিয়ে যায়। কত পথ পেরিয়ে ওরা হয়তো খুঁজে পায় সবুজ ঘাসে ভরা জমি। ভেড়াগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘাস খেতে থাকে। পাশের ঝর্ণায় মুখ ডুবিয়ে বরফগলা জল খায়।

দাহার সঙ্গে মজুত থাকে সারা বছর বন থেকে সংগ্রহ করা শুকনো ফল। সে সেই ফলের শক্ত খোসা ফাটিয়ে ভেঙে তার ভেতরের শাঁস চিবিয়ে খায়। আর তার পানীয় হল ভেড়ার দুধ।

চারদিকে বরফের পাহাড়, মাঝে সবুজ ঘাসের ঢেউ খেলানো জমি। তার ভেতর ভেড়াগুলো মনের খুশীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর ইচ্ছে মত খাচ্ছে।

সন্ধ্যে নামে। বরফের চূড়ায় ঝকঝকে হলুদ রঙটা মুছে গিয়ে লালের ছোঁয়া লাগে। সে লাল আবার অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। দাহার ভেড়াগুলো শুয়ে পড়ে সেই ঠাণ্ডা প্রান্তরে। ওরা একসঙ্গে এক মুখে চলে, আবার একই জায়গায় ঘন হয়ে গায়ে গা ঠেকিয়ে শুয়ে থাকে। ঘন লোমের পোশাক কে যেন পরিয়ে দিয়েছে তাদের গায়ে।

রাতে দাহা ওদেরই ভেতর শুয়ে থাকে কুণ্ডলী পাকিয়ে। প্রচণ্ড শীতে থরথর করে কাঁপতে থাকে চরাচর। আকাশের চাঁদ, তারা, ঘোলাটে চোখ মেলে চেয়ে থাকে। কয়েক মাস ঘাসের জমিনে কাটিয়ে ওরা যখন নিচের উপত্যকার দিকে ফিরে আসে তখন পেছনে তাড়া করে উত্তুরে হাওয়া।

দাহা ওর দলবল নিয়ে সাবধানে চলতে চলতে একসময় গিরিপথ পার হয়ে যায়। এসব জায়গায় বেলা বাড়লেই ঝড় ওঠে। কখনো কখনো প্রচণ্ড তুষার ঝড় বইতে থাকে। তার মুখে পড়লে আর রক্ষে নেই। বরফের তলায় জীবন্ত সমাধি হয়ে যাবে। এর সঙ্গে আছে হিমবাহ। কখন অতর্কিতে পাহাড় থেকে নেমে নদীর স্রোতের মত ভাসিয়ে, ডুবিয়ে, তলিয়ে নিয়ে যাবে তা কেউ জানে না।

একবার দাহার ভেড়ার পালের কিছুটা দূর দিয়ে হিমবাহটা বেরিয়ে যায়। দাহা মহা বিপদের হাত থেকে এক চুলের জন্য বেঁচে গিয়ে হঠাৎ একটা আশ্চর্য অনুভূতি লাভ করে। সে কৃতজ্ঞতায় হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে। তাব দুটো হাত জড়ো হয়ে আসে বুকের ভেতর। চোখ দিয়ে অনর্গল অশ্রু ঝরে পড়তে থাকে। কেটা অদৃশ্য শক্তি যে তাকে একটুর জন্য রক্ষা করেছে, সে রকম একটা ধারণা তার মনে বদ্ধমূল হতে থাকে।

উপত্যকায় ফিরে এসে বছর ঘুরলে নির্দিষ্ট সময়ে সে আবার যখন ওপথে যায় তখন ঠিক ঐ জায়গাটিতে এসে সে হাঁটু গেড়ে বসে। হাত জোড় করে অদৃশ্য শক্তির উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা জানায়।

এমনি করে একদিন ভয়, বিস্ময়, কৃতজ্ঞতা মিলে দাহার অন্তরে দেবতার জন্ম হয়।

এরপর উপত্যকায় কোনও বৃক্ষ দাহাকে ফল দিলে সে ভাবত, এর আড়ালে নিশ্চয়ই রয়েছে কোনও বৃক্ষ দেবতা। পিপাসার্ত দাহা ঝর্ণার জল পান করতে করতে ভাবত, এখানে রয়েছে কোনও জল-দেবতা।

আবার যখন প্রচণ্ড গর্জনে মেঘ ডাকত, ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকে উঠত, পাহাড় পর্বত কেঁপে উঠত সে গর্জনে, তখন গুহার ভেতর ভীরু মেষগুলোকে নিয়ে দাহা ভাবত, কোন ক্রোধী দেবতা শাসন করছে পৃথিবীকে।

দাহা তার ভেড়ার পাল নিয়ে দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়াত। কত গোষ্ঠীর কত মানুষকে সে দেখত, তাদের কত কর্মকাণ্ড, কত আচার-আচরণ। তাদের লড়াই, তাদের পরধন লাভের ইচ্ছা। দাহা কিন্তু চলে যেত ওদের পাশ দিয়ে। যেমন করে নদীর স্রোত দুই তীর ছুঁয়ে চলে যায় অথচ গায়ে লাগে না কোনও

আঁচড়।

যখন সে অলস মধ্যাহ্নে কোন গাছের তলায় বসে থাকে আর ভেড়ার পাল খেয়াল খুশীতে চরতে থাকে তার সামনে তখন তার মন উদাসী হয়ে যায়। সে তখন ঘুরে বেড়ায় তার ফেলে আসা জীবনের পথে পথে।

মৃত্যু মাথার কাছে দাঁড়িয়ে, বাবা একটি একটি করে সন্তানদের হাতে তুলে দিচ্ছে তার শেষ সম্বল। ভাবতে ভাবতে কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে দাহার মন। সে যা পেয়েছে তার কি কোন তুলনা আছে। দেশে দেশে, পাহাড়ের গুহায় গুহায়, গাছের শান্ত ছায়ায় তার ঘর। আকাশের গ্রহ নক্ষত্রের সঙ্গে তার নিত্যদিনের পরিচয়। পৃথিবীর বুকে বৃষ্টির খেলা, সবুজে শ্যামলে পৃথিবীর ভরে ওঠা, ফুল ফোটা, পাতা ঝরা সবই সে দেখছে দুচোখ মেলে। তারপর আছে তার ভেড়ার পাল। তারা তাকে খাবারের যোগান দিচ্ছে।

এখন সে ওদের কাছ থেকে আর একটা জিনিস পেয়েছে, সেটা ওদের গায়ের ঘন লোম। একবার কেটে নিলে, দেখেছে, আবার সেটা গজিয়ে ওঠে। আর ঐ লোমগুলো পাকিয়ে পাকিয়ে, গেঁথে গেঁথে সে তৈরি করেছে এমন একটা জিনিস যা গায়ে জড়িয়ে রাখলে শীতের ঠাণ্ডায় অনেক আরাম পাওয়া যায়।

মাঝে মাঝে কত কথাই না তার জানতে ইচ্ছে করে। নদীর চরে তিসি এখন কি করছে? গোংগাই বা তার শিকারী জীবনটা কাটাচ্ছে কিভাবে?

হ্যাঁ, মনে পড়ে যায় আর একজনের কথা, যার কথা সে মনে আনতে চায় না। মনে পড়লেই বুকের ভেতর কেমন মোচড় দিয়ে ওঠে।

থিরি কোথায় এখন, কি করছে? তাদের সন্তান কিভাবে ভূমিষ্ঠ হয়েছে? সে কি ঘাতকদের হাত থেকে বেঁচে আছে এখনও!

চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে যায়। অপরাহ্নের আলো নিভে আসে। এখন একটা আশ্রয়ের খোঁজ পেতে হবে। রাতের মত কোন গুহার আশ্রয়। পরদিন আবার চলা. আবার নতুন পথ, অপরিচিত বনভূমি, পাহাড়-পর্বতকে আবিষ্কার করতে করতে চলা।

দাহা এবার শীতের তাণ্ডব শুরু হবার কিছু আগেই নেমে এসেছে নিচের উপত্যকায়। ওপরে তুষার পাহাড়ের কোলে শীতের হাওয়া বয়ে আসতেই সে তার দলবল নিয়ে দ্রুত পা চালিয়ে হিমের রাজ্য পেরিয়ে এসেছে। এখন কিছুকাল ছোট ছোট পাহাড় আর উপত্যকাতে সে ঘুরে বেড়াবে।

হঠাৎ ঝমঝমিয়ে খানিকটা বৃষ্টি হয়ে গেল। এ সময় এসব জায়গায় মাঝে মাঝে বৃষ্টি নামে। যেমন হুড়মুড়িয়ে এসে পড়া, তেমনি নিঃশব্দে সরে যাওয়া। সন্ধ্যার মুখে বৃষ্টিটা হয়ে যেতেই ঠাণ্ডাটা জাঁকিয়ে পড়ল। দাহা তার ভেড়ার পাল নিয়ে ঢুকে পড়ল একটা গুহার আশ্রয়ে। গুহার ভেতর শীতের প্রকোপ অনেক কম। ঘন হয়ে তাকে ঘিরে শুয়ে আছে ভেড়াগুলো। তাদের মাঝে জেগে বসে আছে দাহা। সামনে একটি পত্র-বহুল গাছ। শীতের সময় তার পাতার রঙ যায় বদলে। সবুজ থেকে রোদ্দুরের মত হলুদ হয়ে যায়। তারপর যখন খর উত্তুরে হাওয়া বইতে থাকে তখন দুটি একটি করে পাতা খসে পড়তে পড়তে একেবারে হয়ে যায় পত্র শূন্য। এখন ঐ গাছের পাতায় সারাক্ষণ যেন রোদ্দুরের খেলা।

এদিক ওদিক দুদিকেই পাহাড়, সামনে উপত্যকা। এখনও সবুজ ঘাসে ভরে আছে উপত্যকার শরীর। ভেড়াগুলো এই ঘাসের ময়দানটা পেয়ে ভারী খুশী। ঝর্ণার জল আর সবুজ ঘাস। ব্যস, আর কিসের দরকার?

ঠিক গুহাটার উল্টোদিকে ঘাসের ময়দান পেরিয়ে গেলেই ছোট্ট একটা বন; ওদিকে কোনদিন যায়নি দাহা। দরকার পড়েনি তাই যাওয়া হয়ে ওঠেনি।

প্রতিদিন দাহা গাছতলায় বসে চামড়ার থলে থেকে তার সঞ্চিত লোমগুলো বের করে আনে। সে এখন ঐ লোমগুলো জুড়ে জুড়ে দড়ি পাকাবার একটা যন্ত্র বানিয়ে নিয়েছে; অনেক চিন্তা আর পরিশ্রমে ঘষে ঘষে একটা পাথরের চাকতি তৈরি করেছে সে। তার মাঝখানটা ফুটো করে ঢুকিয়ে দিয়েছে একটা সরু

কাঠি। এখন ঐ কাঠিটাতে পাক দিলেই চাকতিটা ঘুরতে থাকে। এমনি করে দিনের পর দিন খেটে সে লোমের দুটো পোশাক বানিয়ে ফেলেছে। সে নিজের এই আবিষ্কারে নিজেই অবাক বনে গেছে। দাহা ভাবে, কয়েক বছরের ভেতরেই সে অনেকগুলো পোশাক তৈরি করে ফেলবে, আর যদি তিসি, গোংগাদের সঙ্গে আবার কোনদিন দেখা হয়ে যায় তাহলে সেগুলো তাদের দিয়ে দেবে। ভবিষ্যতের সেই মিলন দৃশ্যের কথা ভেবে দাহা পুলকিত হয়ে ওঠে। দূরের বন থেকে নিশাচর জন্তুদের সম্মিলিত ডাক শোনা যায়। সেদিকে চোখ মেলে এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে দাহা।

কি যেন জ্বলছে! নিশ্চয়ই কেউ ওখানে ডালপাতা জড়ো করে আগুন জ্বালিয়েছে। তাহলে মানুষের বসতি আছে ওখানে।

ক'দিন পরে একটি ঘটনা ঘটল।

বেলা পড়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে গাছতলায় দাঁড়িয়ে দাহা তার ভেড়াদের ডাক দেয়। সে ডাক শুনে ভেড়াগুলো কান খাড়া করে দাঁড়ায়। তারপর পালের গোদা সামনে পা বাড়ালেই বাকী সবাই তার পাশে পাশে আর পেছন পেছন চলতে থাকে। তারা গাছতলায় দাহার চারদিকে জড়ো হয়। তখন দাহা তাদের গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করে। সারাদিন খাওয়া-দাওয়া চলা ফেরার খোঁজ খবর নেয়। তাদের এক একটিকে ধরে ধরে কথা বলে যায় যতক্ষণ না সন্ধ্যা ঘন হয়ে নামে।

সেদিন দাহা প্রতিদিনের মত ওদের খোঁজখবর নিচ্ছিল, এমন সময় সে দেখল, একটি দুধেলা ভেড়া ফেরেনি।

আশ্চর্য! এমন ঘটনা তো কোনদিন ঘটেনি তার এই মেষপালক জীবনে। ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ঠিক, কিন্তু সেটা অসাবধানে খাদে কিংবা নদীনালায় পড়ে গিয়ে। এখানে এমন প্রশস্ত উপত্যকায় একটি ভেড়ার কি করে বিপদ ঘটা সম্ভব! তাছাড়া দলছুট হয়ে হাবিয়ে যাবার প্রশ্ন ওঠে না। এই জীবগুলি বড় একতাবদ্ধ। একের পেছনে আর একটি সদা-সর্বদা ঘুরে ফিরছে।

যদি কোনও হিংস্র জন্তুর দ্বারা আক্রান্ত হত তাহলে কোলাহল পড়ে যেত। সেক্ষেত্রে দাহা তার কুঠার নিয়ে ছুটত রক্ষাকর্তার ভূমিকায়। কিন্তু এসবের কিছুই ঘটল না অথচ হারিয়ে গেল তার দুধেলা ভেড়াটি।

মিহি গলায় কেঁদেকেটে দুটো বাচ্চা খুঁজতে লাগল মাকে। তাদের প্রবোধ দেবার জন্য দুটোকেই কোলে তুলে দাহা আদর জানাতে লাগল।

সূর্য ডুবল, অমনি দেখা গেল, ভেড়াটা গুহার দিকে আসছে।

উদ্বেগে ঝুঁকে পড়ল দাহা, কি ব্যাপার! এত দেরী যে? দলছাড়া হয়ে কোথায় গিয়েছিলি?

অপরাধীর মত সেইখানে দাঁড়িয়ে রইল ভেড়াটা মুখ নিচু করে।

দাহা তাকে আর ধমক লাগাল না, কিংবা ভর্ৎসনাও করল না। শুধু বলল এই নে বাচ্চা। কতক্ষণ বেচারারা দুধ খেতে পায়নি, কেঁদেকেটে খুন।

বাচ্চা দুটোকে কোল থেকে নামিয়ে দিতেই তাদের আর এক প্রস্থ শোক উথলে উঠল। তারা কান্নার সুরে — এতক্ষণ কোথায় ছিলি, কোথায় ছিলি— বলতে বলতে ছুটল মায়ের কাছে। ঈষৎ পা ভেঙে পুরুষ্টু পালানটা নামিয়ে ধরতেই দু'ভাইবোনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পেছনের দিকে সরু লিকলিকে পা-গুলো ঠেলে বাঁটে মুখের গুঁতো মেরে মেরে দুধ গিলতে লাগল।

দাহা অপরাধীকে উদ্দেশ্য করে বলল, দেখলি তো কত ক্ষিদে পেয়েছিল বাচ্চা দুটোর।

কতক্ষণ দুধ দেবার পর পা টেনে সিধে হয়ে দাঁড়াল মা-ভেড়াটা। বাচ্চা দুটো পেট পুরে দুধ টেনে নিয়ে এখন পরিতৃপ্ত। তবু একটা ঘুরে আর একবার পালানে মুখ দিতে যাচ্ছিল, মা-ভেড়াটা দিলে একটা পায়ের চাট। এখন আর বাচ্চাটা কাঁদল না। অন্যায়টা সে বুঝতে পেরেছে। এবার সে পালিয়ে এল দাহার কাছে। তার দেখাদেখি অন্যটাও।

ময়লা ধুলোর মত অন্ধকারের মেঘে ভরে উঠছে সারা উপত্যকা। রাতের মত সাঙ্গ-পাঙ্গদের নিয়ে

গুহার ভেতর ঢুকে পড়ল দাহা।

আজও সে বসে বসে দেখল, তেমনি আলো জ্বলছে ওপারের বনে। হয়ত উপত্যকায় আসার পর অনেকগুলো রাত সে লক্ষ করেনি। চোখ গিয়ে পড়েনি ঐ আলোটার ওপর। রাতে কোথাও আলো জ্বললে মনে হয়, কেউ আছে, অনেকখানি কাছাকাছি আছে।

পরের দিন আবার সেই একই ঘটনা। দল ছেড়ে ভেড়াটা যেন কোথায় হারিয়ে গেল। তারপর ফিরে এল সেই সন্ধ্যার মুখে। বাচ্চা দুটোকে দুধ খেতে দিল। একবার দাহার দিকে তাকাল। আজ দাহা কিছু বলল না। সে বাচ্চা দুটো নিয়ে দলবলের সঙ্গে ঢুকে গেল গুহায়।

পরের দিনও তাই।

কৌতূহলী হয়ে উঠল দাহা। সারাদিন সে গাছটির তলায় বসে থাকে। লক্ষ্য রাখে ভেড়াগুলোর ওপর। লোমের দড়ি পাকায়, পোশাক বোনে। এখানে এই নিশ্চিন্ত জীবনের মেয়াদ বেশী দিনের নয়। উপত্যকায় ঘাসের সঞ্চয় ফুরোলেই তাকে ভেড়ার পাল নিয়ে অন্য কোথাও চলে যেতে হবে। কিন্তু এরই ভেতর এই একটুকরো ঘটনা তাকে বেশ অবাক করে দিল, যায় কোথা এই ভেড়াটা! একেবারে পালিয়ে কোথাও গা-ঢাকা দেয় না। সন্ধ্যার মুখে ঠিক গুহায় ফিরে আসে।

পর পর আরও দুদিন একই ঘটনা ঘটল।

দাহা এক দুপুরে উপত্যকা পার হয়ে গেল উল্টোদিকে বনের ধারে। সে একটা গাছের ডালে উঠে বসে রইল। পাতায় ছাওয়া ডাল, তাই অনেকখানি সে নিজেকে আড়াল করতে পারল।

ওরা ঘাস খেতে খেতে একসময় এসে পড়ল বনের ধারে। আর ঠিক সেই সময় ঘটনাটি ঘটল।

দাহা দেখল, বনের প্রান্তে একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে একটি অতি ছোট বালক। সে হাতছানি দিয়ে কাকে যেন ডাকছে।

দাহা ছেলেটির দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারল না। এমন সুগঠন আর সুদর্শন ছেলে সে আগে কখনো দেখেছে বলে মনে পড়ল না।

সেই বালক এখন মিষ্টি সুর করে ডাকছে, দাহার মনে হল, হাল্কা গরমের দিনে যে পাখিটা ডাকে, তেমনি সুর।

ইতিমধ্যে মা ভেড়াটা নিঃশব্দে উঠে এসেছে বনের মুখে। ছেলেটি ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল। তারপর শুরু হল দুজনের খেলা।

শ্বাস রোধ করে যেন সে খেলা দেখতে হয়। প্রতিটি মুহূর্তে দাহার মনে হচ্ছিল, ভেড়াটা সত্যিকারের ভেড়া নয়। ও যেন ঐ ছেলেটাকে জন্ম দিয়েছে। যেমন করে সে তার বাচ্চাদের দুধ খাওয়ায় তেমনি করে দুধ দিচ্ছে ছেলেটাকে। হুমড়ি খেয়ে ভেড়ার বাচ্চার মত সে বাঁট থেকে দুধ টেনে খাচ্ছে। ভেড়াটা একটুও প্রতিবাদ করছে না।

বালকটি ভেড়ার সারা গায়ে যখন হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল তখন ও ছেলেটির গায়ে মাথায় মুখ ছুঁইয়ে আদর জানাচ্ছিল।

এবার ভেড়াটিকে কতদূর ঠেলে নিয়ে গেল ছেলেটি, অমনি ভেড়াটিও তাকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে এল আগের জায়গায়। এরপর গাছের আড়ালে আড়ালে দুজনের কতক্ষণ চলল লুকোচুরি খেলা।

এমনি আদরে সোহাগে ভরে উঠল খেলার আসর। কোনও সময়েই দাহার মনে হল না দুটি আলাদা প্রাণী।

ঠিক যখন সূর্যটা ডুবল, তখন গুহায় ফেরার জন্য ভেড়াটা চঞ্চল হয়ে উঠল, কিন্তু ছেলেটি সেই যে তার গলা জড়িয়ে রইল তাকে আর ছাড়ান গেল না।

গাছ থেকে নেমে এল দাহা। দৃশ্যটা তার কাছে বড় করুণ বলে মনে হল। বাঁ দিকের বনে তখন

একটুকরো আগুন জ্বলে উঠেছে। কয়েকটা লোককে দেখা যাচ্ছিল তার চারদিকে ঘিরে বসতে।

দাহা অগ্নিকুণ্ডের কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, তোমাদের ছেলেটিকে এখন ধরে আন, সে আমার ভেড়াটাকে ছাড়তে চাইছে না।

দাহার কথার ইঙ্গিতটা বুঝল ওরা। একটা লোক উঠে দাঁড়িয়ে ছেলেটা যেদিকে ছিল সেদিকে চলে গেল।

দাহা লোকটির পেছন পেছন গিয়ে পৌঁছল।

লোকটি ধমক দিয়ে ছেলেটিকে তার সঙ্গে চলে আসতে বলল, কিন্তু সেই যে সে ভেড়ার গলাটি জড়িয়ে আছে তা আর ছাড়ল না।

লোকটি তখন হাত পা নেড়ে বলল, তোমার যা খুশি তাই কর, এ আমার কথা শুনবে না।

দাহা বিরক্তির সুরে বলল, ছেলেটা তো তোমাদের।

লোকটা ইঙ্গিতে যা বলল তার অর্থ হল, ছেলেটাকে তারা এখানেই পেয়েছে। এখন ও যে চুলোয় যেতে চায় যাক।

দাহা তো অবাক। সে অমনি বলল, ও যখন ভেড়াকে ছাড়তে চাইছে না তখন আমি দুজনকেই নিয়ে চললাম।

লোকটা নিয়ে চলে যাবার ইঙ্গিত করে হাতটা ঝাড়ল। তারপর আপন মনে বকতে বকতে ফিরে গেল আগুনের ধারে।

দাহা মহা আনন্দে ছেলেটাকে কাঁধে তুলে নিল। তারপর বন ছেড়ে উপত্যকা পেরিয়ে গুহার দিকে চলতে লাগল। ভেড়াটা চলল তার পেছন পেছন।

এরপর সেই সুন্দর উপত্যকার পাহাড়ে পাহাড়ে কয়েকবার সূর্য উঠল আর ডুবল। ঘাস ধীরে ধীরে ফুরিয়ে এল। ওপারের বন থেকে কোন মানুষ আর এল না ছেলেটাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।

ছেলেটা সারাক্ষণ দাহার পেছন পেছন ঘুরছে। দাহা গাছের একটা সরু ডালকে চেঁছে-ছুলে ছেলেটার জন্য বানিয়ে দিয়েছে একটা লাঠি। সেই লাঠিখানা নিয়ে সে দাহার আদেশ পালন করে। ভোরবেলা ভেড়াদের উপত্যকায় দিয়ে আসে, আবার সন্ধ্যের আগে ফিরিয়ে আনে।

দাহা ছেলেটার নাম রেখেছে দামুন। আবার দামুন তার প্রিয় ভেড়াটিকে তুরি বলে ডাকে। এ নামও দাহাই দিয়েছে।

দামুন যখন তুরি, তুরি বলে ডাক দেয় তখন মুখের ঘাস ফেলে দিয়ে ছুটে আসে তুরি। বাচ্চাদের দুধ খাওয়াতে কাওয়াতে ডাক শুনল, অমনি পা দিয়ে বাচ্চা দুটোকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ছুটল দামুনের কাছে।

এবার উপত্যকা ছেড়ে চলে যেতে হবে নতুন কোন ঘাসে ভরা মাঠের সন্ধানে। এক সোনালি ভোরের আলোয় দাহার বাহিনী তৈরি হল। দামুনের মাথা ঘিরে ফুলের ফেটি, গলায় বনফুলের মালা। হাতে ছোট্ট একটি লাঠি। সামনে চলেছে দাহা, তার লম্বা লাঠিখানা হাতে নিয়ে।

উৎসাহে ফেটে পড়ছে দামুন। ছোট্ট দেহখানা, কিন্তু ক্লান্তির চিহ্নমাত্র নেই। পিছিয়ে পড়া ভেড়াগুলোকে সে ঠেলে এগিয়ে দিচ্ছে। দলছুটদের লাঠি নিয়ে তাড়া করে ফিরিয়ে আনছে দলে।

দাহা খানিক পথ গিয়ে যাত্রা বিরতি করল। দামুন যেভাবে ছুটে এসেছে তাতে ওকে বিশ্রাম দেওয়া দরকার।

দুপুরের খাবার খেল দুজনে একটা ঝর্ণার ধারে গাছতলায় বসে। এখানে গুহার আশ্রয় নেই, তবে পাহাড় থেকে বেরিয়ে আসা একখণ্ড পাথর পথের ওপর ঝুঁকে আছে। রাতে ওরই তলায় বিশ্রামের আয়োজন হতে পারে।

কয়েকটা গাছ জঙ্গল তৈরি করে দাঁড়িয়েছিল। ভেড়ার দল গাছের কাণ্ডে সামনের দুটো পা তুলে গাছে

নুয়ে পড়া ডাল থেকে পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগল! এ অঞ্চলে ঘাসের আকাল। দাহা জঙ্গল থেকে ছোট ছোট ডাল ভেঙে জড়ো করল। ভেড়াগুলো নিজেরা যা পারল সংগ্রহ করে খেল, বাকিটা দাহার জড়ো করা ডাল থেকে।

রাতে ডালপালা জড়ো করে আগুন জ্বালা হল। চিড় চিড় করে কাঠ পুড়ছে, ছায়া নাচছে। তারই কাছে পিঠে ঘুমিয়ে পড়েছে ভেড়াগুলো। পাহাড়ের দেয়ালে হেলান দিয়ে ঝিমুচ্ছে দাহা। দামুন, তুরির পেটের ভেতর আদ্দেকটা মাথা গুঁজে কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে আছে।

আলো নিভে গেল এক সময়। শুধু আঙরাগুলো দগ্ দগ্ করছে। একটা বীভৎস কালো দেহ আগুনের একটু দূরে এসে দাঁড়াল। কেউ জানল না। সবাই তখন ঘুমে অচেতন। এমনকি ভেড়াগুলোও ঘুমিয়ে।

হঠাৎ বনের ভেতর থেকে তীক্ষ্ম স্বরে একটা রাতচরা পাখি ডেকে উঠল। চমকে তন্দ্রা থেকে জেগে উঠল দাহা।

সামনে মৃত্যু দাঁড়িয়ে। ইতিমধ্যে একটা ভেড়ার বাচ্চাকে নখে চিরে ফেলে দিয়েছে। বেচারা শব্দ করারও সুযোগ পায়নি।

আর একবার থাবা তুলল। ঘা-টা এবার অব্যর্থ তুরিকে বিদ্ধ করবে। দাহার বর্শা বিঁধে গেল চকিতে। লোমের ঘন অরণ্য ভেদ করে তা পৌঁছল পশুটার দেহে। সে ভয়ঙ্কর আর্তনাদ তুলে দাহার দিকে এগিয়ে এল। বর্শাটা তখনও বিঁধে আছে তার দেহে। দাহা মুহূর্তে প্রাণ রক্ষার জন্য অন্ধকার ঢালুর দিকে এগিয়ে চলল।

ফিরে দাঁড়াল ভালুকটা। আর ঠিক সেই সময় পেছন থেকে একটা জ্বলন্ত ডাল কেউ গুঁজে দিল তার লোমের মধ্যে। মুহূর্তে আগুন লেগে পুড়তে লাগল লোম। ভালুকটা দিশাহারা হয়ে ছুটে চলল এদিক ওদিক। যত ছুটল তত হাওয়া লেগে আগুন লোম পুড়িয়ে চামড়ায় এসে লাগল। চীৎকারে রাতের অন্ধকার ছিঁড়ে খুঁড়ে গেল। এক সময় ভালুকটা পাগলের মত টলমল পায়ে গিয়ে ঢুকল বনের ভেতর। আর্তনাদ সমানে গুমরে গুমরে উঠতে লাগল।

ততক্ষণে দাহা ফিরে এসেছে অগ্নিকুণ্ডের ধারে। দামুন হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে তার আগুন নিভে যাওয়া সেই ডালটি, যা দিয়ে সে একটু আগে ভালুকের দেহে অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়ে দিয়েছে। দাহা জড়িয়ে ধরল দামুনকে। সেই মুহূর্তে ও যদি আগুনের খেলাটা না করত তাহলে ঐ আহত, ভয়ঙ্কর ভালুকটার হাত থেকে কেউই রক্ষা পেত না।

দাহা এবার চলল পাহাড়ের গা ঘেঁষে ঘেঁষে। সঙ্কীর্ণ পথ, বড় বড় পাথরের চাঁইতে আচ্ছন্ন। একটু বেচাল হলেই পা ভাঙবে, নয়তো গড়িয়ে পড়তে হবে গভীর খাদে।

মাঝে ম্যাঝে ঝর্ণা নেমে এসেছে ওপর থেকে। পথের ওপর দিয়ে বয়ে গিয়ে ঝরে পড়ছে নিচে। সেখানে অপরিসর একটি নদীর আকার নিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

ভেড়াগুলো অনেক হুঁশিয়ার। তারা দ্রুত চলছে, কিন্তু পা ফেলছে অতি সাবধানে।

একদিন ভীষণ শব্দ উঠল। সারা পাহাড়টা বুঝি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে। দাহা, সামনেই পাহাড়ের একটি ঝুঁকে পড়া ছাদের তলায় দামুনকে নিয়ে ঢুকে পড়ল। ভেড়াগুলোকে যতটা সম্ভব টেনে টেনে ঢুকিয়ে নিল ভেতরে।

ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ছে পাথরের টুকরো। বড় ছোট সব আকারের পাথর ছিটকে লাফিয়ে গড়িয়ে আসছে নিচে। মাথার ওপর পাথরের ছাদে গুমগুম আওয়াজ হচ্ছে। সেগুলো আবার ভেঙে টুকরো হয়ে খাদের মধ্যে চলে যাচ্ছে।

এমনি কতক্ষণ প্রস্তর-পতন চলতে চলতে এক সময় থেমে গেল। কিন্তু ধূলোর সাদা একটা মেঘ আবৃত করে রাখল চরাচর। বৃক্ষ, নদী, সবকিছু অদৃশ্য হয়ে রইল দৃষ্টির সামনে থেকে। এখন আবার একটু একটু

করে পরিষ্কার হয়ে গেল সেই মেঘ। আবার শুরু হল পথ চলা। ধুলোর সাদা মেঘটা সরে গেল। পথের কোনও চিহ্ন নেই। তবু পাথরের স্তূপ ডিঙিয়ে, এতবড় একটা দলকে পার করে নিয়ে ওরা ঠিক রাস্তাটি খুঁজে নিল।

কত সবুজ মাঠ জানাল ওদের আমন্ত্রণ। ওরা তার বুকে রইল সাময়িক সংসার পেতে। ভেড়ারা ঘুরতে লাগল মনের খুশীতে। কত ঝর্ণার জল পান করে ওরা শীতল হল। পাখির ডাক, ফুলের ফুটে ওঠা, ঝমঝমিয়ে বর্ষার নেমে আসা আর চন্দ্র সূর্যের নীলাকাশ পাড়ি, এসব আশ্চর্য যাদুতে ভরে উঠল গৃহহীনের হৃদয়।

দাহা কোন দিন খোলা প্রান্তরে শুয়ে আকাশের দিকে দু'চোখ মেলে দামুনকে বলে, এমন শান্তি কোথাও পাবি না রে। মানুষে মানুষে জায়গার দখল নিয়ে কত হানাহানি, কাটাকাটি, মারামারি! এখানে তার কিছু নেই। মনের খুশিতে শোয়া, বসা, ঘোরা আর আকাশের চন্দ্র, সূর্য, তারা দেখা।

দামুন ওসব কিছু তেমন করে বোঝে না, তবে এটুকু বোঝে তার আগেকার ছোট্ট জীবনে সে যাদের সঙ্গে কাটিয়েছে তাদের চেয়ে এ জীবন অনেক আনন্দের। সে তুরিকে জড়িয়ে ধরে নিবিড় ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। মা যেমন করে তার বাচ্চাটি ঘুমিয়ে পড়লে তার মাথায় মুখখানা ঠেকিয়ে শুয়ে থাকে, ঠিক তেমনি দামুনের মাথায় মুখখানা ঠেকিয়ে শুয়ে থাকে তুরি।

দাহা এখন চলার সঙ্গী পেয়েছে, সে চলে আর কথা বলে। শ্রোতা দামুন। সে দাহার কথা বোঝে না তবু শুনতে ভালবাসে। উত্তর দেয় নিজের মত।

দাহা বলে, নতুন নতুন দেশ দেখা ভারী মজার, তাই না রে?

দামুন মাথা নেড়ে তার সমর্থন জানায়।

দাহা আবার বলে, কত বিচিত্র রঙের পাখি দেখা যায়, কত নতুন সব জন্তু।

দামুনের মনে পড়ে যায়, ঐ তো সেদিন লেজ ঝোলা একটা পাখি দেখলাম, সেটাকে কোথাও দেখিনি। কি সুন্দর রঙ, কতবড় লম্বা লেজ।

দাহা আরও মনে করিয়ে দেয়, সেদিন সে কাঠবিড়ালীটা দেখলি না? তুই তো হাঁ করে সেটার দিকে চেয়েছিলি।

দামুন উৎসাহী হয়ে ওঠে, কি তরতরিয়ে উঠছিল না সেটা গাছে! একটা লাল ফুলে কুট করে কামড় বসিয়ে আমার দিকে তাকাল।

রাতে গুহার বাইরে জোনাকি পোকার নাচ দেখলেই দামুন চঞ্চল হয়ে ওঠে।

আমাকে ধরে দেবে একটা?

কি করবি জোনাকি নিয়ে?

অমি পুষব।

হাসে দাহা দামুনের ছেলেমানুষী দেখে। বলে কি খাওয়াবি ওকে।

ফল আর জল। আমরা যা খাই ওকেও তাই খাওয়াব।

তাহলে ও আর আলো জ্বালবে না। নেচে নেচে ঘুরবেও না।

এবার মহা চিন্তায় পড়ে গেল দামুন। সে জোনাকি পুষতে চায় কিন্তু সেজন্যে তার নাচ বন্ধ হয়ে যাক, আলো নিভে যাক, এটা সে একেবারেই চায় না।

এখন পরামর্শদাতা পাওয়া যায় কোথায়, দামুন তুরির পেটে কান চেপে বলতে লাগল, এখন কি করা যায় তুরি? গুড়গুড়িয়ে উঠল তুরির পেট। দামুন যেন শুনতে পেল, ওসব পুষে কাজ কি বাপু, চোখ মেলে যেমন দেখছ, দেখে যাও।

এমনি করে পথ চলতে চলতে উপত্যকায় যখন গরমের হাওয়া বইল তখন ভেড়ার পাল আব দামুনকে নিয়ে সে উঠতে লাগল ওপরের পাহাড়ে। এই গরম আর বৃষ্টির দিনগুলো সে কাটাবে তুষার পর্বতের ছনছনে সবুজ ঘাসে ভরা মাঠে।

পাহাড়ের শেষপর্বে কোন গাছপালা নেই। গিরিপথ পেরিয়ে নেমে যেতে হবে ওপারের ঢালে।

ওরা পাহাড়ের অনেকখানি ওপরে উঠে এসেছে। এখানে লম্বা লম্বা গাছের অরণ্য। পাথরের ওপর কোথাও কোথাও বরফ লেগে আছে। এখনও ওপরের পাহাড় থেকে বরফ গলে যায় নি।

অপরাহ্নের আলো গাছের ফাঁকে ফাঁকে এসে পড়েছে বনের মধ্যে। সব'ই ক্লান্ত। আজ এখানেই নিতে হবে রাতের বিশ্রাম। ভেড়াগুলো পাথরের ফাঁক থেকে সামান্য ঘাসটুকুও খুঁ্ে খাচ্ছে।

দাহা ভাবছে, বনের ভেতর থাকলেই সারারাত আগুন জ্বালিয়ে সজাগ থাকতে হবে। দামুন আপন মনে ভেড়াগুলোর সঙ্গে ঘুরে ফিরছে।

সূর্যের আলোর জ্যোতি ক্রমেই কমে আসতে লাগল। ছায়া ঘনাল বনের অন্তরে।

দাহা উত্তরমুখে আঙুল তুলে বলল, দেখ্ দামুন, বরফের পাহাড়ে কেমন রঙ লেগেছে।

তখন সূর্যাস্তের লাল ছড়িয়ে পড়েছিল শিখরে শিখরে। বনের ভেতর আবছা অন্ধকার, অথচ পর্বতের চূড়ায় আগুনের লাল জ্বলে জ্বলে উঠছে।

দামুন কখনো এ দৃশ্য দেখেনি, তাই সে অবাক চোখ মেলে সেদিকে চেয়েছিল। হঠাৎ দাহা চোখের কোণে দেখতে পেল, একটা ছায়া-মূর্তি গাছের আড়ালে সরে গেল। সে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না।

সন্ধ্যা নেমে আসায় ভেড়ারা এক জায়গায় এসে জড়ো হয়েছে। দাহা ভাবল, নতুন জায়গায় হয়ত তার দেখার ভুল। কোন গাছকেই সে ভুল করে মানুষের ছায়া বলে মনে করেছে।

দামুন সঙ্গে আনা ডালপালা এক জায়গায় জড়ো করল। দাহা পাথর ঠুকে আগুন ধরাল। ধিক্ ধিক্ করে জ্বলতে লাগল আগুন।

ওরা গাছে হেলান দিয়ে আগনের কাছে বসে রইল। ভেড়াগুলো শুয়ে পড়েছে। দামুন কাঠের টুকরো ফেলে ফেলে আগুনটাকে জাগিয়ে রেখেছে। এমন সময় ওরা এলো।

চমকে উঠল দাহা। সে হাতের কাছে টেনে আনল তার কুঠার। কিন্তু হাতের কুঠার তার শিথিল হয়ে হাতেই ধরা রইল।

কয়েকটি মেয়ে হাতে হাত বেঁধে তার সামনের অগ্নিকুণ্ডের পাশে এসে দাঁড়াল।

কটিতে সামান্য পোশাক মাত্র। আশ্চর্য সুঠাম তাদের দেহের গঠন। প্রতিটি মুখ সুন্দর কিন্তু তাতে বিষণ্ণতার ছাপ।

দাহা অবাক হয়ে চেয়ে রইল, কোন কথা মুখ দিয়ে বেরুল না।

ওদের ভেতর থেকে একটি মেয়ে এগিয়ে এল দাহার সামনে।

হাত মুখ নেড়ে যা বলল তার অর্থ হল, এই বনের পাশেই ওদের আস্তানা। ওরা দাহার আগুনের ধারে একটু বসতে চায়।

দাহা ইঙ্গিতে ওদের বসতে বলল। কিন্তু কোনও পুরুষকে ওদের সঙ্গে না দেখে তার বিস্ময়ের সীমা রইল না।

মেয়েগুলি আগুনের একদিকে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে পড়ল।

ওদের ভেতর একটি মেয়ে দামুনকে আদর করল। সঙ্গে সঙ্গে অন্যরাও।

একটি মেয়ে দাহার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, একে কি নামে ডাক ?

ার আকারে ইঙ্গিতে বলার পর দাহা বুঝতে পেরে বলল, দামুন।

এ তোমার কে ?

এবার ইঙ্গিতটা স্পষ্ট, তাই একেবারেই বুঝে নিয়ে উত্তর দিল, আমার ছোট্ট সঙ্গী।

ওরা সঙ্গী কথাটা হয়ত ঠিক বুঝল না, কিন্তু নিজেদের মত একটা কিছু ধারণা করে নিয়ে চুপ করে রইল।

ওরা এবার বলল, তুমি কোথা থেকে আসছ? যাবেই বা কোথা?

দাহা এ কথার উত্তর মুখে দিল, আবার বুঝিয়েও দিল আকারে ইঙ্গিতে।

এবার ওদের ভেতর একটি মেয়ে, যে এতক্ষণ প্রায় পলকহীন চোখে দাহাকে দেখছিল, সে বলল, কতকাল পরে একজন পুরুষকে দেখলাম।

মেয়েটির স্বর স্বগতোক্তির মত শোনাল। অন্য মেয়েগুলিও মাথা নেড়ে নেড়ে, কথা বলে সঙ্গিনীকে সমর্থন জানাল।

দাহা বলল, তোমাদের পুরুষরা কোথায়? তাদের দেখছি না কেন?

মেয়েরা দাহার কথার অর্থ বুঝতে পারল। তাদের ভেতর একজন বলল, তুমি যদি আমাদের আস্তানায় দয়া করে আস তাহলে সবকিছুই জানতে পারবে।

দাহার কৌতূহল ভীষণ বেড়ে গিয়েছিল। সে বলল, আজ রাতে আর নয়, রাত ভোর হলে সে তাদের আস্তানায় ঘুরে আসবে।

মেয়েরা প্রায় এক সঙ্গেই উঠে দাঁড়াল। তাদের মুখে আগের বিষণ্ণতার ছাপ আর ছিল না।

একটি মেয়ে হঠাৎ দাহার হাতখানা টেনে নিয়ে তাতে চুমু দিয়ে বলল, আমি রাত পোহালে এখানে এসে তোমাকে নিয়ে যাব।

ওরা নিজেদের ভেতর কথার কলধ্বনি তুলে বনের পথে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পরের দিন ভোরে দাহা আর দামুন তুষার-পর্বতের ওপর সূর্যোদয় দেখছিল, এমন সময় মেয়েটি দাহার পাশে এসে দাঁড়াল।

কালকের সেই মেয়েটি, যে দাহার হাতে চুমু খেয়ে আজ আসবে বলে বলেছিল।

মেয়েটির পোশাক আর সাজসজ্জায় আজ কিছু পরিবর্তন দেখতে পেল দাহা। কটিদেশ ঘিরে ও একটা হলুদ আর লাল ফুলের মালা জড়িয়েছে। গলায় সবুজ রঙের তিনটে পাথরে গাঁথা মালা। আজ ওর চোখ দুটো ভারী উজ্জ্বল।

দাহা বলল, আমি যাবার জন্য তৈরি। তবে আমার ভেড়াগুলোকে দেখবে কে ? তাছাড়া এখানে ঘাস অনেক কম। ওদের খুব তাড়াতাড়ি এখান থেকে নিয়ে চলে যেতে হবে।

মেয়েটি একটি একটি করে দাহার অসুবিধের কথাগুলো বুঝল। সব বুঝেসুঝে বলল, আমাদের মেয়েরাই তোমার ভেড়াগুলোর লক্ষ্য নজর করবে। তাছাড়া ওরা ঘাস সংগ্রহ করে এনে ওদের খাওয়াবে। তোমার ভাবনার কিছু নেই।

দাহা সবকিছু বুঝে-শুনে আশ্বস্ত হল। সে মেয়েটির সঙ্গে দামুনকে নিয়ে ওদের আস্তানায় গেল।

পাহাড়ের একধাপ নিচে প্রকৃতির খেয়ালে গড়া পর পর কয়েকটা গুহা। ঐ গুহাগুলোর ওপরে কদিন আগে প্রচুর বরফ পড়েছিল। এখনও তার চিহ্ন রয়েছে। গুহার থেকে সাদা রঙের শক্ত বরফের দানাগুলো মালার মত ঝুলছে।

মেয়েরা গুহাগুলোর সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল। তারা এগিয়ে এসে দামুনকে জড়িয়ে ধরে প্রথমে আদর করল, তারপর দাহার হাত ধরে ওদের একেবারে শেষ প্রান্তের গুহাটায় নিয়ে গেল।

গুহার সামনে বড় দুটো গাছ। তার তলায় মসৃণ একটা পাথর পড়ে আছে। সম্ভবত অনেক দিনের ব্যবহারে সেটা মসৃণ হয়ে গেছে।

ওবা তারই ওপরে দাহাকে এনে বসাল। কয়েকটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে অবাক হয়ে দাহা আর দামুনকে দেখছিল। এমন সময় ওদের ভেতর হৈ-চৈ পড়ে গেল। সকলে সেদিকে আকৃষ্ট হয়ে দেখল, একটা ভেড়া বাচ্চাদের গুঁতিয়ে সামনে এগিয়ে আসার চেষ্টা করছে।

দামুনের চোখ পড়তেই সে ছুটল সেদিকে। তুরিকে জড়িয়ে ধরল বুকে। চুমোয় চুমোয় ভরে দিল। তুরি ভোরবেলা বনের ভেতর চরছিল। সে দেখতেই পায়নি কখন দামুন তাকে ছেড়ে চলে এসেছে। যখন খেয়াল হল তখন এদিক ওদিক খুঁজতে লাগল। শেষে চোখ পড়ল নীচের দিকে। অমনি দৌড়।

দামুন আর মেয়েদের ভেতর থাকতে চাইল না। সে দাহাকে বলে তুরিকে নিয়ে চলল ওপরের পাহাড়ে।

মেয়েরা ব্যাপারটা বুঝতে পেরে সব কটি ছেলেমেয়েকে দামুনের সঙ্গে ওপরে পাঠাল। ওরা একসঙ্গে মিলে খেলাধুলো করবে আর ভেড়া চরাবে।

একটি প্রবীণাকে ওদের সঙ্গে পাঠানো হল। তাকে বলা হল, ভেড়াদের জন্য ঘাস সংগ্রহ করে রাখতে। তার হাতে দামুন আর ছেলেমেয়েদের জন্য খাবার দিয়ে দেওয়া হল।

ওরা দাহার জন্যও কিছু খাবার আনল। দাহা খাবারদাবার খেয়ে ওদের সঙ্গে গল্প করতে বসল।

এখন বল, তোমাদের এই আস্তানায় পুরুষ দেখছি না কেন?

ওদের মধ্যে নিজের নিজের ভাষায় কথা হচ্ছিল। কিন্তু আভাসে ইঙ্গিতে, আকারে প্রকারে সবাই সবার কথা বুঝে নিতে পারছিল।

দাহাকে যে মেয়েটি আজ ডেকে এনেছিল, সে-ই ছিল প্রধান বক্তা।

দাহার কথার উত্তর দিতে গিয়ে সে যা বলেছিল তার সহজ অর্থটি এই দাঁড়ায় —

নীচে এক চিলতে জমি ঘিরে একটা পাহাড়ী নদী বয়ে গেছে। সে জমিতে বুনো গাছগাছালি কম নেই। নদীতে মাছও প্রচুর। এই গুহাগুলো থেকে সেই জায়গাটা দেখা যায়।

ওরা দাহাকে দূরের সেই জায়গাটা দেখিয়েও দিল।

এখন, এখানকার পুরুষরা প্রায়ই নেমে যেত সেখানে। ফলমূল সংগ্রহ করে আর নদী থেকে মাছ ধরে নিয়ে আসত ওপরে।

একদিন তারা খালি হাতে ফিরে এল। ভয়ানক উত্তেজিত।

জানা গেল, ওখানে অন্য একটি দল এসে গেছে। তারা পাকাপাকি ডেরা বাঁধার মতলবেই এসেছে ওখানে।

ওদের যে করেই হোক হটিয়ে দিতে হবে, না হলে টান পড়বে নিজেদের খাবারে।

হাতিয়ার নিয়ে সব কটি পুরুষই সেদিন নেমে গিয়েছিল কিন্তু তাদের একজনও আর ফিরে আসেনি।

তাদের জন্য অপেক্ষা করে করে মেয়েদের চোখের জল শুকিয়ে গেছে। এখন এরা তাদের ফেরার আসা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছে।

দাহা মেয়েগুলির পরিণতির কথা ভেবে মনে মনে খুবই কষ্ট পেল। সে বলল, তোমরা খাবার জোগাড় কর কিভাবে?

আমরা এই বনে ছোট পশুপাখি যা পাই সংগ্রহ করি। তাছাড়া মাঝে মাঝে অনেকে একসঙ্গে নিচে নামি। ওখানে একটা নদী আছে, ঐ নদী থেকে মাছ ধরে আনার চেষ্টা করি। এইভাবে কোনরকমে আমাদের দিন চলে যায়।

দাহা ওদের সঙ্গে কথা বলে ভারী খুশী হল। সে চলে যাবার জন্য এবার উঠে দাঁড়াল। মনের ইচ্ছাটি জানানো মাত্র মেয়েগুলি সমস্বরে হৈ-হৈ করে উঠল। তারা কিছুতেই দাহাকে ছেড়ে দেবে না।

তোমাকে আমরাই খাবার জোগাব।

তোমার ভেড়া চরানোব ভার আমবাই নেব।

তোমার দামুনকে আমরাই দেখব।

শুধু তুমি আমাদের ছেড়ে কোথাও যাবে না।

কান্নায় ভেঙে পড়ল মেয়েগুলো।

ওদের হাহাকার আর কাতরতা দেখে দাহা ওদের প্রবোধ দিয়ে বলল. আমি এখন রইলাম তোমাদের কাছে, তোমরা আর চোখের জল ফেলো না।

দাহার মনোভাব জেনে ওদের মুখে হাসি ফুটল। চোখের জলের ওপর সে হাসি ভারী সুন্দর দেখাল।

গোষ্ঠীর দু'চারটি বৃদ্ধা দাহাকে একদিন তাদের কাছে ডেকে বলল, তুমি আমাদের বাঁচালে বাবা। আমাদের ছেলেরা যুদ্ধে গিয়ে মরেছে. তারা আর ফিরে আসবে না। আমরা বুড়ো হয়েছি, সন্তানের জন্ম দিতে পারব না। তোমাকে দেখে আশা জাগছে, আমাদের গোষ্ঠীটা লোপ পেয়ে যাবে না।

অবশ্য ওদের ভাষা না বুঝলেও ওদের দারুণ উদ্বেগ আর আন্তরিক আকাঙ্ক্ষাটুকু বুঝে নিতে দাহার অসুবিধে হল না।

ঐ মেয়েদের দলের সব থেকে সুন্দরী মেয়েটির নাম সু। সে সবার হয়ে কথা বলে দাহার সঙ্গে। তার কথা গোষ্ঠীর সকলে মেনে চলে।

কিছুদিন ওদের ভেতরে থেকে দাহা দেখল, এই সু মেয়েটি বুদ্ধিতে, আচার আচরণে সবার সেরা।

মেয়েদের সঙ্গে মিলেমিশে ও কাজ করত সারাদিন, তারই ফাঁকে ফাঁকে বেরিয়ে এসে দেখা করে যেত দাহার সঙ্গে। বনের ভেতর দুদণ্ড বসে কথা বলে যেত।

দাহা ভেড়া চরাবার ফাঁকে ফাঁকে সু-এর সঙ্গে একটু আলাপ করার জন্য যখন অধীর হয়ে উঠত, ঠিক তখনই যেন তার মনের কথা জানতে পেরে সু চলে আসত তার কাছে।

সু কিন্তু স্বার্থপর ছিল না। সে গোষ্ঠীর সকল মেয়ের মনের ইচ্ছে জানত, তাই সবার দিকে চেয়েই সে কাজ করত।

দাহা সু-কেই পছন্দ করত সবচেয়ে বেশী, কিন্তু তার সঙ্গে নির্দিষ্ট দিন ছাড়া রাত্রিবাস করার উপায় ছিল না। সু তাকে হাত ধরে রাত্রিবাসের জন্য দিয়ে আসত বিভিন্ন গুহায়।

কোনও কোনও দিন বনের ভেতর সঙ্গিনীর হাত ধরে আসত সু। দুচার কথার পর কাজের আছিলায় নিজেই উঠে যেত। ওদের অন্তরঙ্গ হবার সুযোগ দিত।

দিনে দিনে সু-র আচরণে দাহা সত্যিই অভিভূত হয়ে পড়ল। ভেড়া চরানোর সময় সু পাশে থেকে কথা বলে গেলে সে মনে মনে বড় তৃপ্তি পেত। কোনদিন সু তার কাছ থেকে জানতে চায়নি সে অন্য মেয়ের সঙ্গে কিভাবে রাত্রিবাস করেছে। সু কখনো নিজের প্রশংসা নিজের মুখে করত না। গোষ্ঠীর মেয়েদের প্রতিদিনের নানা কৃতিত্বের কথা সে দাহার সঙ্গে কথা বলার সময় শুনিয়ে যেত।

বছর ঘুরে এল। তুরির ছেলে মেয়ে হল। পালের অন্য ভেড়ারাও বাচ্চাকাচ্চার জন্ম দিল। সারাদিন তাদের বুকে পিঠে করে ঘুরে বেড়াতে লাগল দামুন।

দাহা একদিন সু-কে নিবিড় বাঁধনে বেঁধে বলল. সু, তোমার গোষ্ঠীর মেয়েদের অনেকেই মা হতে চলেছে, কিন্তু তুমি এখনও মা হতে পারনি।

সু বলল, তাহলে শোন, তুমি যে রাতে আমার গুহায় আস, শুধু সেই রাতটি দামুন থাকে তুরির গুহায়, বাকী প্রতিটি রাত ও থাকে আমার পাশে। রাতে সবাই ঘুমিয়ে গেলে চুপি চুপি নিয়ে আসে তুরিকে। আমি একদিকে আর তুরি একদিকে। ও নিশ্চিন্তে শুয়ে থাকে দুজনার মাঝখানে। ও আমাকে কি বলে ডাকে জান?

কি ?

তুরি। ওর কাছে আমি আর তুরি এক।

ও ঠিকই বলেছে। এ সময় তোমাকে আমার একটি কথা জানাতে চাই। দেরী হলে শেষে দামুনেরই কষ্ট

হবে।

বল কি কথা?

আমাদের যাবার ডাক এসেছে। এ গোষ্ঠী ছেড়ে এবারে চলে যেতে হবে। সঙ্গে শুধু তোমাকে নিয়ে যেতে চাই।

বিস্ময় সু-এর গলায়, তুমি চলে যাবে! এখানে কি তোমার যত্নের অভাব হচ্ছে? তোমাকে কি তেমন করে কেউ সঙ্গ দিচ্ছে না? তোমার মনে কি কেউ আঘাত দিয়েছে?

না, সু। এখানে এসে অনেক সুখ পেয়েছি আমি। কেউ আমাকে আঘাতও করেনি কোনদিন। তাছাড়া তোমাকে দেখলে আমি তো গত দিনগুলোর সব কষ্ট ভুলে যাই।

তবে তুমি চলে যাবে কেন দাহা?

আমি মেষচারকেরই জীবন বেছে নিয়েছি সু। আমাদের মাথার ছাউনি হল চন্দ্র, সূর্য, তারায় ভরা আকাশ। শয্যা হল সবুজ ঘাসের জমিন। কদাচিৎ গুহার আরাম। তোমাদের এই জীবন আমার জন্য নয় সু।

কতক্ষণ দাহার বুকে মুখ গুঁজে কাঁদল সু। এক সময় শান্ত হয়ে বলল, তুমি যখন যেতে চেয়েছ এখানকার জীবন ফেলে, তখন আমি বুঝে নিয়েছি তোমাকে আর ধরে রাখা যাবে না। তোমাকে ছেড়ে থাকতে হবে একথা আমি ভাবতে পারি না। তবু এই অসহায় গোষ্ঠীর মেয়েগুলোকে ফেলে কোথাও পালাতে পারব না।

দাহার ভেতরটা কি এক যন্ত্রণায় কুরে কুরে খেতে লাগল। কিছুক্ষণ নীরব থেকে সে বলল, আসা যাবার পথে আমাকেই ফিরে ফিরে আসতে হবে তোমার কাছে।

শেষ রাতে সু দাহার নিবিড় বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে নিঃশব্দে তাদের যাবার আয়োজন করে দিতে লাগল। বলল, এখন ভেড়াদের গুহা থেকে দামুনকে জাগিয়ে দিতে হবে।

দাহা বলল, দেখ গিয়ে হয়তো সে এখন তুরির কোলে মাথা গুঁজে শুয়ে আছে।

ওর কাছে আমি আর তুরি হয়তো এক ছিলাম। এখন কিন্তু তুরিই ওকে নিয়ে যাচ্ছে, আমি আর ওকে ধরে রাখতে পারলাম না।

সু-এর হাহাকার গুহার বিষণ্ণতাকে আরও গভীর করে তুলল।

ভোরের শুকতারা পুবের আকাশে জ্বলজ্বল করছে, চাঁদের আলো তখনও নিঃশেষ হয়ে মুছে যায়নি, দাহা আর দামুন তাদের ভেড়ার পাল নিয়ে গিরি পথের দিকে উঠে চলেছে। বনের গাছগুলোর আড়ালে একটি ছায়ামূর্তি ওদের বিদায়-যাত্রার ছবি দেখতে লাগল।

তিলাই রুবাই মারু

ভোরের নরম রোদে আদুড় গায়ে ঘোরাফেরা করছিল একটি কিশোরী। তার কোমরে ছিল ঘাস পাতার একটি ঘাঘরা। মাথাভরা চুলের জটা নেমেছিল কাঁধ অবধি। মেয়েটি ঘুরছিল আপন মনে, মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া বইছিল, বৃষ্টির দিনের হাওয়া। কখনও বা মেয়েটি দুটো হাত পাখির ডানার মতো মেলে দিয়ে বাতাস চিরে ছুটছিল, মুখ থেকে বেরিয়ে আসছিল অদ্ভুত সুরেলা একটা শব্দ। সেই মিষ্টি শব্দটা ছড়িয়ে পড়ছিল চারদিকে। যারা ভোরবেলা ক্ষেত চষছিল, তারা শুনছিল সে সুর, আর যেসব মেয়েরা ঘরের কাজ সারছিল তাদের কানেও সেই মধুর শব্দটা বেজে উঠছিল।

তিলাই কিশোরী, গোষ্ঠীর নেত্রীর একমাত্র কন্যা। এ সমাজে মা-ই প্রধান, পিতা কে, কেউ জানে না।

নেত্রী ধীরা আর সব মেয়েদের নিয়ে ভোর থেকে খাবার তৈরী করেছে। পুরুষগুলোকে আস্তানার বাইরের উঠোনে বসিয়ে সে খাবারগুলো খাইয়েছে। আধ-পোড়া কন্দ আর ঝলসানো বুনো শুয়োরের মাংস। পুরুষগুলো এখন মাঠের কাজে ব্যস্ত। অদ্ভুত একরকম যন্ত্র মাটিতে গেঁথে তারা ঢেলাগুলোকে আলগা করছিল। একজন হাতলওলা যন্ত্রটাকে ঠেলছিল আর সেটাকে টানছিল একটা গরু। চাষের এই প্রক্রিয়া তারা পেয়েছিল তাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে। তাদের ভেতর একটা কাহিনী প্রচলিত ছিল, কোন এক আদি মানবী মুঠো মুঠো বীজ হাতে নিয়ে মাঠে ছড়িয়ে দিয়েছিল, যার থেকে জন্মেছিল বীজওয়ালা এই শস্য। সে নারী কোনও এক জায়গায় থাকেনি। সে বীজ ছড়াতে ছড়াতে ওই আকাশটা যেখানে মাটিতে নেমেছে সেইদিকে ছুটে গিয়েছিল।

এখন অনেকগুলি গোষ্ঠীই এই চাষবাসের কায়দা কৌশলগুলো শিখে নিয়েছে।

ধীরা আস্তানার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে মুখের পাশে একটা হাত রেখে ডানদিকে ঘাড়টা একটু কাৎ করে তিলাই, তিলাই বলে হাঁক পাড়তে লাগল। ভোরের রোদ মেখে তিলাই তখন বাতাসের বিরুদ্ধে ছুটছিল। তার কানে মায়ের ডাক পৌঁছল না। ধূ ধূ মাঠের শেষে বন আর নদী। সেই বনের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল তিলাই। একটা পাখি যেন ভোরের রোদ মেখে শিস্ দিতে দিতে উড়ে গেল বনের দিকে।

বনের ভেতর ঢুকে তিলাই বড় বড় পাতাওলা একটা গাছের ফাঁকে দাঁড়িয়ে দেখল ভাল্‌লা নদীতে মাছ ধরছে। তার ডিঙিটা বাঁধা আছে একটা ঝোপের সঙ্গে। স্রোতে ডিঙিটা এদিক ওদিক হচ্ছিল, ঠিক যেন একটা জানোয়ার দড়ির বাঁধনটা খুলে পালাবার চেষ্টা করছে।

নদীর খুব ধারে একটা খাদ খুঁড়ে রেখেছিল ভাল্‌লা। তার চারদিকে উঁচু করে গাছের ডাল পুঁতে দিয়েছিল। জোয়ারের জল ডাল ছাপিয়ে ভরে দিয়েছিল গর্তটা। মাছগুলোও উপচে ওঠা জলের সঙ্গে ঢুকেছিল সেই গর্তে। ডালপালার ফাঁকে ভাঁটার টানে অতিরিক্ত জলটা বেরিয়ে যেতেই ভাল্‌লা নেমে পড়েছে ওই খাদের কোমর জলে। সেখানে হাল্‌টে হাল্‌টে সে মাছ ধরছিল আর ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছিল ডাঙার দিকে।

তিলাই-এর মাথায় একটা দুষ্টু বুদ্ধি চাপল। সে হামা দিয়ে একটা একটা করে সবকটা মাছ কুড়িয়ে জড়ো করতে লাগল বনের ভেতরের ওই গাছতলায়। অনেকটা নীচে থাকার জন্যে ভাল্‌লা তার কেরামতিটা দেখতে পেল না।

শেষ মাছটা ছুঁড়ে দিয়েই ভাল্‌লা ঝাঁকি মেরে উঠে পড়ল ওপরে। একি ! একটা মাত্র মাছ ছটফটাচ্ছে।

সে চারদিকে দৌড়ে দৌড়ে মাছের খোঁজ করতে লাগল। একবার নদীর ধারে গিয়ে বোঝার চেষ্টা করল, মাছগুলো লাফিয়ে জলে পালিয়েছে কিনা। কিন্তু মাছ জলে পালালে তার দেখা কি সহজে মেলে।

ভাল্‌লা হতাশ হয়ে উঠে দাঁড়াতেই খিল খিল একটা হাসির শব্দ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

ও, তোমার কারসাজি! বলেই লাফাতে লাফাতে বনের ভেতর গিয়ে ঢুকল ভাল্‌লা।

ততক্ষণে মাছগুলো কুড়িয়ে নিয়ে বনের ভেতর ছুটছিল তিলাই আর খিল খিল হাসি ছড়াচ্ছিল। ভাল্‌লা তার পিছু নিতেই সে একটি একটি করে মাছ পেছনে ফেলে ফেলে যেতে লাগল। ভাল্‌লা মাছ কুড়োয় আর তিলাই ততক্ষণে আরও অনেকখানি ছুটে বেরিয়ে যায়।

বনের মাঝখানে একটি জলাশয়। জঙ্গলের জানোয়াররা রোজ ঐ জলায় জল খেতে আসে। তিলাই ঐ জলায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। সে সাঁতার কাটছে আর তার সামনে জলচর একঝাঁক পাখি মুক্তোর দানার মতো জল ছড়াতে ছড়াতে ডানার ঝাপটা মেরে সামনের দিকে উড়ে চলেছে।

পেছন থেকে ভাল্‌লাও ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। হাসির তরঙ্গ তুলে তিলাই কখনো বা ডুবসাঁতার দিচ্ছে, আবার কখনো জলের ওপর স্রোতের মতো এঁকেবেঁকে ভেসে যাচ্ছে।

ওস্তাদ সাঁতারু ভাল্‌লা। তিলাই তার সঙ্গে এঁটে উঠবে কেন? একসময় তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে ভাল্‌লা উঠল ডাঙায়।

আজকাল ভাল্‌লার ছোঁয়ায় তিলাই কেমন একটা শিহরণ অনুভব করে। এই অনুভূতিটার স্পষ্ট বোধ এখনো তার হয়নি। তবু একটা রোমাঞ্চ কিছু সময়ের জন্য তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। ভাল্‌লাকে তার ভালো লাগে। গোষ্ঠীর অন্যসব ছেলের চেয়ে অনেক অনেক ভাল।

ভাল্‌লা যখন গরু তাড়িয়ে নিয়ে যায় তখন মায়ের চোখ ফাঁকি দিয়ে সে তার সঙ্গে পালায়। ভাল্‌লা গরুর বাঁটে মুখ লাগিয়ে দুধ চুষে চুষে খায়। ও কাজটা কিছুতেই পারে না তিলাই। তাকে অনেকবার ভাল্‌লা চেষ্টা করতে বলেছে কিন্তু ওই কাজ থেকে সভয়ে পিছিয়ে এসেছে সে।

বনের ধার ঘেঁষে মোষের পিঠে চেপে কতদিন অনেকদূরে চলে গেছে দুজনে। তিলাই ফুলের জন্য আবদার করেছে, রঙীন পতঙ্গ ধরতে চেয়েছে, সাধ্যমতো সে বায়না পুরণ করেছে ভাল্‌লা। ডাংগুলি অথবা ঢিল ছুঁড়ে পাখি মারতে ভাল্‌লা ভারী ওস্তাদ। যখন দুজনে আস্তানায় ফিরেছে তখন একরাশ গুগলি, শামুক, মাছ আর পাখি সঙ্গে করে ফিরেছে তারা। এসব দেখে ধীরা আর মেয়ের ওপর রাগ করতে পারে না। সুতাই-এর ছেলে ভাল্‌লা। সুতাই ধীরার বড় অনুগত।

ধীরা আর সুতাই-এর মিল একদিন কিন্তু ভেঙে গেল। ভাঙল একটি পুরুষের দখল নিয়ে। ভারী জোয়ান মরদ পুহা, তার ওপর নজর পড়েছিল দুজনেরই। ধীরে ধীরে একটা ঈর্ষার বীজ ছড়িয়ে পড়ছিল দুজনের রক্তে। পুহাকে একান্তে পাওয়ার জন্য আগুন জ্বলছিল দুজনের বুকে। কে পুহাকে উত্তাপ দিতে পারবে সেই নিয়ে রেষারেষি চলছিল নীরবে।

একদিন গোষ্ঠীনেত্রী ধীরার চোখ থেকে বেরিয়ে এল আগুনের শিখার মত লকলকে দুটো সাপ আর তার ছোবলে অন্ধ হয়ে গেল সুতাই। বনে যায় পুহা বুনো শূকর ধরতে। শূকরের পাল যে পথে যায় সেই পথে গভীর একটা গর্ত খুঁড়ে নরম ডালপাতা চাপিয়ে আসে সে। শূকরগুলো না বুঝে সেই ডালপাতায় পা দিলেই গর্তে পড়ে যায়, আর উঠতে পারে না। পুহা তখন শূকরটাকে খুঁচিয়ে মেরে ওপরে তুলে আনে।

পুহার এ-কাজে ধীরার উৎসাহ সবচেয়ে বেশী। যেদিন পুহার ফাঁদে শূকর ধরা পড়ে সেদিন গোষ্ঠীতে উৎসব লেগে যায়। সে রাতে ভোজের পর আগুন জ্বেলে ওরা ঘুরে ঘুরে নৃত্য করে। নৃত্যের শেষে পুহাকে নিয়ে ধীরা চলে যায় তার অন্ধকার গুহার আবাসে। সবাই জানে এটাই কানুন। কিন্তু সে রাতে সুতাইয়ের বুকের ভেতর অসহ্য এক ধরনের মোচড় দিতে থাকে।

একদিন ধীরা পুহার সঙ্গে সুতাইকে বন থেকে ফিরতে দেখল। তারা একটা বুনো শূয়োরকে লতা দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে আনছিল। সে দৃশ্য দেখে ঈর্ষার আগুনে জ্বলতে লাগল ধীরার সর্বাঙ্গ। সে রাতে ভোজের পর নাচ হল ঠিক কিন্তু ধীরা তার গুহায় পুহাকে নিয়ে গেল না।

পরের দিন গোষ্ঠীর লোকগুলোকে কাজে পাঠিয়ে সুতাইকে সঙ্গে করে বনের দিকে নিয়ে গেল ধীরা। বনে ঢুকেই ধীরা বলল, শূকরগুলো কেমন করে এসে পুহার ফাঁদে পা দেয় দেখিয়ে দে তো। সহজ বিশ্বাসে সুতাই বুনো শূয়োরের পথ ধরে হামা দিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল। গর্তের কাছে এসেই সে যেই থেমেছে অমনি পেছন থেকে তাকে লাথি মেরে ঠেলে ফেলে দিল ধীরা। হাতে ধরে থাকা একটা তীক্ষ্ণ ডাল দিয়ে খোঁচাতে লাগল, যেমন করে পুহা শূয়োরগুলোকে খুঁচিয়ে মারে।

গভীর গর্ত থেকে সুতাইয়ের ছটফটানি আর আর্তনাদ ভেসে আসতে লাগল। যখন নিস্তেজ হয়ে এল সুতাই তখন গোষ্ঠীতে ফিরে গেল ধীরা। তার মুখ থমথম করছিল।

সেদিন চষামাটিতে বীজ ছড়ানো হয়েছিল। হঠাৎ প্রবল একটা বর্ষণে স্রোতের মুখে বীজগুলো ভেসে গেল। সন্ধ্যার মুখে বৃষ্টি থামলে বনের মাথায় চাঁদ উঠল। ঝকঝকে চাঁদ। আকাশে মেঘের লেশমাত্র নেই।

বীজগুলো ভেসে গেল দেখে পুরুষের দল মাথায় হাত দিয়ে বসেছিল। ধীরা তাদের প্রবোধ দিচ্ছিল। একসময় পুহার কাছে গিয়ে ফিসফিস করে সে বলল, তোমার ফাঁদে শূকর পড়েছে।

পুহা দল থেকে উঠে বনের দিকে ছুটে গেল।

পুহা কিন্তু আর কোনও দিনও গোষ্ঠীতে ফিরে আসেনি।

পরের দিন সবাই গিয়ে দেখেছিল বনের ভেতর পুহা কিংবা সুতাইয়ের কোন চিহ্নই নেই। কয়েক ফোঁটা রক্তের দাগ ছড়িয়ে পড়েছিল এদিক ওদিক। আর একটা জিনিস খোয়া গিয়েছিল, ভাল্লার ডোঙাটা।

সকলে জানে সুতাইকে নিয়ে গোষ্ঠী ছেড়ে পালিয়েছে পুহা। কিন্তু কেন তার উত্তর কেউ পেল না। শুধু ধীরার বুকের গভীরে একটা দগদগে ঘা ধক্ ধক্ করতে লাগল।

কোন কোন রাতে ধীরার গুহা থেকে একটা আর্তনাদ শোনা যায়। ক্ষতবিক্ষত বুকের যন্ত্রণায় সে খোঁচা খাওয়া শূকরের মতো চীৎকার করতে থাকে।

এর কিছুকাল পরে সকলে দেখল, ধীরা তার গুহার সামনে বসে খিল খিল করে হাসছে। সে চেয়ে আছে সামনের দিকে তবু কারু দিকে চেয়ে নেই। সে কারু কোনও কথার উত্তর দিল না। আপন মনে বিড় বিড় করতে করতে একসময় বনের দিকে ছুটে পালিয়ে গেল!

এ ধরনের অঘটনের মুখোমুখি এরা কেউ কোনদিন দাঁড়ায়নি।

বেলা পড়ে এলেও ধীরা যখন আর ফিরে এল না তখন সবাই মিলে ধীরার খোঁজে বনে গিয়ে ঢুকল। তন্ন তন্ন করে খুঁজেও ধীরাকে বনের ভেতর পাওয়া গেল না।

তিলাই হঠাৎ নদীর ধারে মায়ের পরিত্যক্ত ঘাঘরাখানা আবিষ্কার করে হাঁউমাউ করে কেঁদে উঠল। সকলে সেখানে জড়ো হল। তাদের বুঝতে বাকি রইল না যে অদ্ভুত এক খেয়ালের বসে ঘাঘরা খুলে ফেলে দিয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ধীরা আর প্রবল স্রোতের টানে ভেসে গিয়েছে দিগ্ দিশাহীন কোন রাজ্যে।

পুহার সঙ্গে তার ডোঙায় চেপে মায়ের পালিয়ে যাওয়াটা মন থেকে মেনে নিতে পারেনি ভাল্লা। সে জানত না মায়ের সুতীব্র যন্ত্রণার কথা, সে শুধু জেনেছিল, যে মা তাকে এতখানি ভালবাসত সে তাকে ফেলে রেখে অজানা কোন দেশে উধাও হয়ে গেছে।

সে বছর অজন্মা হল, ফসল ঘরে উঠল ক'মুঠো মাত্র। পাখি আর মাছ মেরে কোনও রকমে প্রাণ বাঁচাতে লাগল মানুষগুলো। খরায় ফুটিফাটা হয়ে গেল মাটি। ঠা ঠা রোদ্দুরে শুষে নিল বনের ভেতর জলাশয়ের সবটুকু জল। পশুরাও জল না পেয়ে দিগন্তের দিকে অন্য কোন জলাশয়ের সন্ধানে পালিয়ে গেল। কেবল মানুষগুলো এতদিনের পুরনো আস্তানা ছেড়ে কোথাও যেতে পারল না। নদীর জলের স্রোতও ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। তারই ভেতর থেকে মানুষগুলো বাঁচার জল সংগ্রহ করতে লাগল।

পরের বছরেও যখন একই ঘটনা ঘটল তখন তিলাই গোষ্ঠীর মানুষজনকে ডেকে বলল, চল আমরা বন পেরিয়ে মাঠ পেরিয়ে ওই আকাশটা যেখানে মাটি ছুঁয়েছে, সেদিকে চলে যাই।

কে যেন বলল, সেদিকে জল পাব?

তিলাই ঘোরের ভেতর থেকে জবাব দিল, আমরা নদীর ধার ধরে যাব।

সেখানে খাবার পাব?

নদী মাছ দেবে, বন-বাদাড় থেকে কন্দমূল পাব।

একজন বলল, এমনি করে কতদিন চলবে?

যতদিন না আমাদের সংগ্রহ করা বীজ থেকে আবার ফসল ফলছে।

মেয়েরা কোঁদা কাঠের পাত্রে আর পাতার বড় বড় ঠোঙায় বীজ তুলে নিল। সেই পাত্রগুলো মাথার ওপর রেখে তারা তিলাই-এর পেছনে সারি দিয়ে দাঁড়াল। তিলাই-এর মাথার ওপর কাঠের পাত্রে বীজ। সে দুহাত উঁচু করে পাত্রটি ধরে আছে। সূর্যের তীব্র দাহে বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝরে পড়ছে সর্বাঙ্গ দিয়ে। তিলাই-এর পাশে লাঙল কাঁধে দাঁড়িয়ে আছে ভাল্লা। তার পেছনে আসবাবপত্র আর কঙ্কালসার গরুগুলোকে নিয়ে দাঁড়িয়েছে দলের অন্যসব লোকেরা। এবার ওরা চলতে শুরু করবে। এখন ওরা তিলাই আর ভাল্লাকে মনে মনে দলনেত্রী আর পরিচালক বলে-মেনে নিয়েছে।

ওরা চলতে শুরু করল। সূর্যের দহনের ভেতর দিয়ে, ফুটিফাটা প্রান্তরের ওপর দিয়ে, বন চিরে নদীর উঁচু নিচু পাড় ধরে ওঠানামা করতে করতে আকাশ যেখানে মাটি ছুঁয়েছে সেদিকটা লক্ষ করে এগিয়ে চলল।

কোনও এক রাতের শেষে ভোর হতে ওরা দেখল, একটা সবুজ সতেজ বনের ধারে ওরা এসে পৌঁছেছে। ওদের নদীটা শেষ হয়ে মিশেছে আর একটা অনেক বড় নদীতে। অনেক জল, নীল জল, ছল ছল শব্দে বয়ে চলেছে।

জায়গাটা ভারী পছন্দ হয়ে গেল সকলের। প্রথমে ভাল্লাই কথা বলল, কি মুরুব্বিরা, এখানেই থাকা যাক, কেমন?

সকলে চীৎকার করে মাথা নেড়ে সায় দিল। সমস্ত দলটাই ক্লান্ত, তারা পেরিয়ে এসেছে বহু বহু দূরের পথ। কতবার সূর্য ডুবেছে উঠেছে তার লেখাজোখা নেই। তাদের চলার পথে কত বিচিত্র মানবগোষ্ঠীর মুখোমুখি হয়েছে তারা। কোনও এক পাহাড়ের ধারে ছোট্ট একটি গোষ্ঠীকে তারা দেখেছিল আগুন জ্বালিয়ে পাথরের মতো কি পোড়াচ্ছে।

ইংগিতে ভাল্লা জানতে চাইল, কি করছ তোমরা?

পাথর গালিয়ে ধাতু বের করছি।

লোকগুলো বেশ ভাল। ওদের ভেতর একজন পাশের গুহা থেকে কতকগুলো কালো কালো যন্ত্র নিয়ে এল। কাঠের তৈরি হাতলের ভেতর সেগুলো ঢুকিয়ে একধরনের অস্ত্রের মত তৈরী করা হয়েছে।

আগ্রহে ভাল্লা জানতে চাইল, এসব কি ?

একটি লোক উঠে দাঁড়িয়ে ওই অস্ত্র হাতে নিয়ে একটা গাছে কোপ বসাল। সঙ্গে সঙ্গে শক্ত গাছটার অনেকখানি কেটে গেল।

লোকটি অস্ত্রটা গাছ থেকে বের করে এনে বলল, এ এক ধরনের ধাতু। পাথরের চেয়েও শক্ত। ওই যে বর্শাটা দেখছ ওটা চালিয়ে মাছ আর জানোয়ার দুই-ই মারা যায়। এমনকি লড়াই লাগলে ওটার ঘায়ে শত্রুরা একদম ঘায়েল হয়ে যাবে। তোমরা যে পাথরের অস্ত্রগুলো নিয়ে চলেছ ওগুলো বিশেষ কোন কাজের না। আমাদের আগে যেসব মানুষজন এখানে বাস করে গেছে তারা তোমাদের মত ওরকম অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করত। আমাদের গোষ্ঠীতে আজকাল ওসবের চল নেই।

ওদের ছেড়ে আসার সময় ভাল্লাকে ওরা একটা অস্ত্র উপহার দিয়েছিল। লোহার তৈরি একটা টাঙি। ভাল্লা জীবনে এতবড় সম্মান কখনো পায়নি। সে সারাক্ষণ ওই টাঙিখানা কোমরে ঝুলিয়ে রাখে।

আর একজায়গায় ওরা অদ্ভুত একদল মানুষকে দেখেছিল। রাতে বনের ধারে সেই মানুষগুলো আগুন জ্বালিয়ে ঘুরে ঘুরে নাচছিল। ওরা বনের পাশে পাহাড়ের ধারে রাতের মতো আস্তানা গেড়েছিল। ওরা দেখছিল বনের কোল ঘেঁষে সেই মানুষগুলোর নাচ। হঠাৎ ওদের চোখে পড়ল, মানুষগুলো আগুন ঘিরে নাচছে আর তাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নাচছে দুটো শিংওলা হরিণ। ওই দৃশ্য দেখে ওদের বিস্ময়ের অন্ত ছিল না। ওরা কে জানে কেমন মানুষ, তাই ওদের সঙ্গে আলাপ করতে সে রাতে এগোয়নি। অনেক রাতে

সাহসে ভর করে ভাল্লার বন্ধু রুবাই জঙ্গলে ঢুকে পড়েছিল। তখন রাতের আকাশ থেকে ঝরছিল চাঁদের আলো। আলো আর ছায়ায় বনের ভেতরটা রহস্যময় হয়ে উঠেছিল। রুবাই ঝাঁকড়া একটা গাছের মগডালে উঠে বসে বনের ভেতর তাকাতে লাগল। একদল মানুষ শুয়ে আছে জড়াজড়ি করে। তারা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। ওরাই তাহলে নাচছিল বনের বাইরে! কিন্তু সে হরিণগুলো গেল কোথায়? সেই নাচিয়ে হরিণ দুটো?

হঠাৎ রহস্যের জাল ছিঁড়ে গেল রুবাইয়ের চোখের সামনে। সে দেখল লোকগুলোর মাথার দিকে দুটো গাছের ডালে হরিণ দুটোর ছাল সমেত মাথা ঝুলছে। ও! ও দুটো পরেই তাহলে লোকদুটো নাচছিল।

যেমন নিঃসাড়ে রুবাই গাছে উঠেছিল, তেমনি নিঃশব্দে গাছ থেকে নেমে চলে গেল। রুবাই কিন্তু তার নৈশ-অভিযানের কথাটি সে রাতে কারুর কাছে বলল না। পরের দিন পথ চলতে চলতে একান্তে তিলাইকে কাছে পেয়ে চুপি চুপি তার কাছেই সব ফাঁস করল।

তিলাই ভারী অবাক হয়ে বলল, তোমার ভয় করল না ওখানে যেতে ?

ভয় কিসের? হরিণের নাচের রহস্যটা আমি জানতে চেয়েছি।

ওরা যদি তোমাকে ধরে ফেলত ?

তাহলে জন্মের মতো তোমার কাছছাড়া হয়ে থাকতে হত, হয়তো ওই হরিণের শিঙের গুঁতোয় আমায় মেরে ফেলত।

এ কথায় হঠাৎ তিলাই-এর চোখে জল এসে গিয়েছিল। সে রুবাই-এর হাতখানা ভীষণ জোরে চেপে ধরেছিল। উত্তেজনা সামলে ছেড়ে দিয়েছিল তার হাত। সে ছোঁয়া রুবাই ভুলতে পারেনি। সেদিন থেকে তিলাইও রুবাইকে অন্য চোখে দেখতে লাগল।

নতুন আস্তানায় ঘাঁটি গেড়ে বসল তিলাই-এর গোষ্ঠী। নতুন পত্তনি, তাই উত্তেজনা প্রবল। কিছু করার জন্য রক্তে যেন জোয়ার বইছে।

ওরা কিছুদিনের ভেতরেই নদীর চরিত্রটা বুঝতে পারল। একরাতে বান ডাকল নদীতে। কূল ছাপিয়ে জল তেড়ে এল অনেক দূর। আবার নেমে গেল সে জল। এমনি খেলা চলল বেশ কয়েকদিন ধরে। আবার নদী যে কে সেই।

ওরা দেখল, তীরে অনেক পলি জমেছে। ওরা বীজ ছড়াল তার ওপর। খুব তেজী ফসল ফলল সে বছর। ঘন সবুজ গাছ, পুরুষ্টু শিষ, আবার পেকে ওঠার সময় ঝকঝকে রোদ্দুরের রঙ ছড়াল।

হোগলার মতো লম্বা বড় বড় একরকমের গাছ জন্মায় ও অঞ্চলের জলায়। নদীর জল ঢুকে সৃষ্টি করেছিল ওই জলাগুলো।

তিলাই একদঙ্গল মেয়ের সঙ্গে ওই জলায় নেমে গাছগুলো কেটে আনল। ওই লম্বা লম্বা পাতার মতো গাছগুলো শুকনো হতে, ওরা তাই দিয়ে ঘরের ছাউনি তৈরি করল। একটা বড় ছাউনির তলায় পাথর আর মাটির প্রলেপে মেঝে তৈরি করে তার ভেতর ঝাড়াই-মাড়াই ফসলের দানাগুলো মজুদ করে রাখা হল।

এ অঞ্চলে বৃষ্টি বড় বেশী হয় না। তবে সারা বছর অনেক দূর থেকে নদী জল বয়ে আনে। সেই জলে চাষবাসের কাজ চলে।

ওরা মাটির পাত্র তৈরি করতে শিখেছিল। বেশ কিছুকাল আগে ওদের গোষ্ঠীর কোনও লোক অন্য এক গোষ্ঠীর কাছ থেকে এই বিদ্যেটা শিখে নিয়েছিল। সেই থেকে ওরা মাটির হাঁড়ি তৈরি করতে শিখেছে।

নদী থেকে কলসী ভরে মেয়েরা জল তুলে আনে, সে জল সংসারের কাজে লাগায়। চামড়ার মশকে পুরুষেরা জল তুলে আনে আর ক্ষেতে খামারে ছড়ায়।

দেখা গেল, ফসল রক্ষা করতে দরকার হচ্ছে অনেক জল। তাই ওরা একটা কৌশল আবিষ্কার করল। মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে অনেক পরিশ্রমে ক্ষেত অবধি টেনে আনল নদীর জল। বড় ছোট অনেকগুলো নালা তৈরি করল ওরা। সারাবছরের ফসল পুষ্ট হতে লাগল ওই নালার জলে।

ভোর থেকে ছেলে ছোকরাগুলো হল্লা করতে করতে বেরিয়ে যেত জলার দিকে। হাঁসেরা ঢেউ তুলে

ভেসে যেত জলের ওপর। ছেলেরা নিঃশব্দে ডুব সাঁতার দিয়ে ভুস ভুস করে ভেসে উঠে হাঁসগুলোকে পাকড়াও করত। হাঁসের মাংস ভারী সুস্বাদু। ওদের ভেতর একটি দল নুনের পাথর সংগ্রহ করতে বেরিয়ে পড়েছিল এক সময়। কারণ ওদের পূর্বপুরুষ থেকে জমানো নুনপাথরের ডেলাগুলো একেবারে ফুরিয়ে এসেছিল। তারা যখন হারানো পথ খুঁজে খুঁজে ফিরল তখন প্রায় দশটা বছর কোথা দিয়ে পার হয়ে গেছে। নুনের সংকটে ভুগছে সবাই।

তাদের মুখে শোনা গেল, বহু দূরের পাহাড় থেকে ওরা নুনের সন্ধান পায়। ওই পাহাড়ের কোলে বন্য জানোয়াররা নুন খেতে পাহাড়ে ওঠে। ওরা পাল পাল হরিণদের পাহাড়ের গা চেটে চেটে নুন খেতে দেখেছে। চাটতে চাটতে একেবারে ধবধবে সাদা করে ফেলেছে জায়গাটা।

একদিন ওরা পাহাড়ের ওপর থেকে হরিণদের ছুটে পালানোর শব্দ শুনেছিল। উঁকি দিতেই চোখে পড়েছিল একটা চিতা একটা হরিণের ঘাড় কামড়ে ধরেছে। জ্যোৎস্না রাতের আলোতেও ওরা সেই ঝকঝকে সাদা পাথরের ওপর ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরতে দেখেছিল।

নুন যারা আনতে গিয়েছিল তাদের সর্দার ছিল রুবাই। সে এখন তিরিশ বছরের পূর্ণ যুবক। এ দশ বছর এই পুরুষের দলটি কোন নারী সঙ্গ করেনি। শ্রমে, সৌন্দর্যে, লাবণ্যে পূর্ণ হয়ে উঠেছে রুবাই। বুকখানা যেন আরও চওড়া হয়েছে তার।

বলিষ্ঠ পেশীবহুল দেহ। কালো কোঁকড়া মাথা ভরা চুল নেড়ে সে যখন কথা বলছিল তখন তার দিকে চেয়ে মেয়েরা চোখের পলক ফেলতে পারছিল না। তিলাইয়ের চোখে মুখে মুগ্ধতা উপচে পড়ছিল। সে রাতে তিলাই বড় কাছে টেনে নিয়েছিল রবাইকে। ভাল্লা কিন্তু ঘুমোতে পারেনি সারারাত।

এরপর কারণে অকারণে ভাল্লা আর রুবাইয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলল বহুদিন ধরে। আজকাল ক্ষেত খামারের কাজ করতে গিয়ে ভাল্লা যখন হাঁপিয়ে ওঠে তখন অবলীলায় কাজ করে যায় রুবাই। এ ব্যাপারটা সকলেরই চোখে পড়েছে। যেন দিনে দিনে রুবাই-এর কাছে হার মানছে ভাল্লা।

মেয়েদের কাছেও আজকাল রুবাই-এর কদর ভাল্লার চেয়ে বেশী। এক ধরনের অদ্ভুত প্রাকৃতিক পরিবেশ এই অঞ্চলের। নদী জলে পূর্ণ। বান এলে পিছল পলি জমে দুই তীরে। সময়ে সবুজ শস্যে ভরে যায় সেই পলিপূর্ণ তীর। নদী-তীরবর্তী প্রান্তরগুলি শ্যামল অরণ্য-চিহ্ন এঁকে নদীর প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গেছে। কিন্তু পশ্চিমে কিছু দূর গেলেই মরুভূমির বালুরাশি দিগন্ত ছুঁয়ে ধূ ধূ করছে। প্রখর সূর্যে সেখানে চিতা জ্বলে। রোদ্দুর রঙের বালুকা কোথাও পাহাড় সৃষ্টি করে তৈরি করেছে এক রহস্যের জগৎ।

একদিন ভাল্লা আর রুবাই ওই প্রান্তরটাকে বেছে নিল তাদের যুদ্ধক্ষেত্র রূপে। দলনেত্রী তিলাই, কিন্তু দলে একজন পুরুষশ্রেষ্ঠ থাকবে। সে বৃদ্ধ হলে চলবে না। যৌবনের অফুরন্ত শক্তি থাকা চাই তার দেহে। নারীদের আকর্ষণ তার ওপরেই থাকবে সবচেয়ে বেশী। এতদিন ভাল্লা সেই সম্মানটুকু পেয়ে এসেছিল। কিন্তু এখন রুবাই তার ওই প্রিয় স্থানটুকু কেড়ে নিতে বসেছে। সুতরাং লড়াই অনিবার্য হয়ে উঠল।

একদিনে কিন্তু যুদ্ধ শেষ হল না, লড়াই চলল অনেকগুলো দিন ধরে। গোষ্ঠীর সকলেই এই লড়াই দেখতে লাগল। কখনো নদীর জলে পড়ে দুজনে দুজনকে অতলে টেনে নিয়ে যেতে চায়, আবার ভেসে উঠে ক্লান্ত শরীরগুলোকে তীরে টেনে আনে। কখনো বা কর্দমাক্ত পিচ্ছল পলিতে গড়াগড়ি দিয়ে লড়াই চালায়। তখন তাদের মানুষ বলেই মনে হয় না, মনে হয় যেন কোন জলের জীব।

সূর্যাস্তের পরে আর কোন যুদ্ধ চলে না। গোষ্ঠীর লোকেরাই সেই বুনো দুটো মোষকে টেনে নিয়ে আসে আস্তানায়। তখন সারাদিনের আস্ফালন, হুঙ্কার সবই নিভে যায়। দলনেত্রী এবং অন্যান্য মেয়েরা তাদের স্নান করিয়ে, সকলের সঙ্গে অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসিয়ে রাতের খাবার পরিবেশন করে। সারারাত তারা নিদ্রার অতলে তলিয়ে যায়। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়ে যায় হুঙ্কার। দুজনেই মল্লযুদ্ধ করতে করতে গড়িয়ে পড়ে মাটিতে।

একদিন স্থির হল ওরা মরুভূমিতেই যুদ্ধ চালাবে। সবাই এসে দাঁড়াল মাটির একটা উঁচু ঢিবির ওপর। এখানেই সবুজ শেষ হয়ে শুরু হয়েছে ধূ ধু মরুভূমি। এই মরুভূমির মধ্যে এই গোষ্ঠীর মানুষজন কোনদিনই

সাহস করে যাতায়াত করেনি।

প্রায়ই এর প্রখর উত্তপ্ত হাওয়ার আঁচ এরা পায়। তবে নদীর কাছাকাছি শ্যামল প্রান্তরে থাকে বলে এরা এই উত্তপ্ত বাতাসে সহজে আহত হয় না।

রুবাই আর ভাল্‌লা ছুটছিল বালির ওপর দিয়ে, কিন্তু বালি কাউকেই দেয় না দুরন্ত গতিতে তাকে অতিক্রম করতে। সে চলমান প্রাণীকে টেনে রাখতে চায়।

একজন আর একজনকে ধরবার জন্য ছুটেছে বালির প্রান্তরে। একসময় ভাল্‌লাকে দেখা গেল বালির একটা পাহাড়ের ওপর উঠে যেতে। বড় ক্লান্তিতে সে টানছিল তার পা দুটো। রুবাই তাকে অনুসরণ করে পাহাড়ে উঠতে লাগল। তারপর দুজনে জড়াজড়ি করে গড়িয়ে পড়ল বালু-পাহাড়ের ওপারে। তারা হারিয়ে গেল দলের মানুষের দৃষ্টির বাইরে।

গোষ্ঠীর মানুষগুলো একটা উত্তেজনা আর আবেগে কাঁপছিল থর থর করে। চোখের সামনে তারা দেখতে পাচ্ছিল না তাদের দুজন সব সেরা জোয়ান মরদের লড়াই। কখন আসে, কখন আসে, এই ভাবনায় তাদের কাটল বহু সময়। পশ্চিম আকাশে সূর্য অস্তে নামার আগে একটি ছোট কালো মানুষকে দূরে বালির পাহাড়ের ওপর উঠতে দেখা গেল। সে পাহাড়ের চূড়া থেকে বালিতে গড়াতে গড়াতে নেমে এল একেবারে নিচে। তারপর টলতে টলতে বালি ভেঙে গোষ্ঠীর মানুষগুলোর দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

দারুণ উৎকণ্ঠায় সবার সামনে এসে, জয়সূচক একটা চীৎকার দিয়ে মূর্ছিত ভাল্‌লা মাটিতে পড়ে গেল। সবাই তখন বিজয়ীকে তুলে নিয়ে চলে গেল তাদের আস্তানায়।

লড়াই-এ হেরে গেছে রুবাই, আর শুধু হেরে গেছে নয় নিহত হয়েছে ভাল্‌লার হাতে, এ সত্য মেনে নিতে পারছিল না দলের নেত্রী তিলাই। ক্লান্ত ভাল্‌লা দলের মানুষদের সেবায় জ্ঞান ফিরে পেল। কিছু খাদ্য গ্রহণের পর সে আবার ঘুমিয়ে পড়ল ক্লান্তিতে। একটু দূরে ধিক্ ধিক্ করে আগুন জ্বলছিল, একটা ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে অসছিল নদীর দিক থেকে। মানুষগুলো অগ্নিকুণ্ডের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে ঘুমচ্ছিল। এদের ভেতর ঘুমোতে পারেনি একজন। তার বুকে চেপেছিল একটা পাষাণের ভার। রুবাইকে সে আর কখনো দেখতে পাবে না একথা সে মন থেকে কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না।

গভীর রাতে যখন গোষ্ঠীর সকলেই ঘুমে অচেতন তখন তিলাই উঠে দাঁড়াল, সে নিঃশব্দে চলে গেল বালির প্রান্তরের দিকে।

একটা রহস্যময় জ্যোৎস্না খেলা করছিল ধূ ধূ ঢেউ খেলানো বালির ওপর। নিশি পাওয়ার মতো বালি ভাঙতে ভাঙতে সে এগিয়ে চলল মানুষের পায়ের চিহ্ন ধরে। একসময় অনেক কষ্টে উঠল বালির পাহাড়ের ওপর। ওপারে পাহাড়ের নীচে গভীর বালির খাদ, তারপর ধূ ধূ প্রান্তর। জ্যোৎস্না আর আবছা অন্ধকারে ঢেউ তোলা প্রান্তরের ওপারে কি আছে তা দেখা যাচ্ছিল না। কাঁপা কাঁপা গলায় রুবাই বলে ডাক পাড়ল তিলাই কিন্তু কেউ সে ডাকের উত্তর দিল না। কেবল একটা শব্দ বালির খাদ থেকে গুমরে গুমরে উঠতে লাগল। তিলাই ভাল করে তাকিয়ে দেখল খাদের মধ্যে জনমানুষের চিহ্ন নেই। কিন্তু কি যেন একটা ধাতব জিনিস নীচে পড়ে আছে বলে মনে হল। সে নেমে গেল নীচে। এখন চিনতে পেরেছে সে বস্তুটাকে। সে তার কাঁপা হাতে তুলে নিল ভাল্‌লার কোমরে বাঁধা ধাতুর টাঙিখানা। সেই টাঙিতে রক্তের চিহ্ন। ভাল্‌লা তাহলে রুবাইকে হত্যা করেছে! আর হত্যার পর তাকে এই অনন্ত বালিরাশির ভেতর কোথাও পুঁতে রেখে গেছে। তিলাই হাঁটুগেড়ে বসে বুকে করাঘাত করতে করতে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল।

ফিরে আসার সময় ভাল্‌লার টাঙিখানা সে বয়ে নিয়ে এল তাদের আস্তানায়। তখনও অঘোরে ঘুমোচ্ছিল দলের মানুষজন। তিলাই নিঃসাড়ে রক্তমাখা টাঙিখানা ভাল্‌লার কাছে ফেলে রেখে চলে গেল নিজের জায়গায়। ভোরবেলা ঘুম ভাঙতেই ভাল্‌লা দেখল টকটকে লাল সূর্যটা নদীর ওপারে জেগে উঠেছে। সে অবাক হয়ে আরও দেখল বালির খাদে ফেলে আসা রক্তমাখা টাঙিটা পড়ে আছে তারই পাশে। সে কোনও রকমেই এ রহস্যের সমাধান করতে পারল না। সবার অলক্ষে টাঙির রক্তটুকু মুছে নিয়ে সে বেঁধে ফেলল কোমরে।

হঠাৎ একটা হৈ-হৈ আওয়াজ উঠল মেয়েদের দিক থেকে। ভোরে ঘুম ভেঙে উঠে তারা তাদের পাশে দেখতে পাচ্ছিল না তাদের দলনেত্রীকে। তারা ইতিমধ্যেই নদীর দিকে তিলাইকে খুঁজে এসেছে। কিন্তু কোথাও তার চিহ্নমাত্র নেই। তাই তারা সমবেত গলায় চীৎকার করে ডাকতে লাগল তিলাইকে। পুরুষরাও ততক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে মেয়েদের পাশে। মুহূর্তে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল তারা দলনেত্রীর সন্ধানে। সারাদিন চুঁড়েও তিলাইকে কিন্তু খুঁজে পাওয়া গেল না। সবাই তখন বলতে লাগল, তিলাই তার মায়ের গতি লাভ করেছে।

এদিকে তিলাই তার শস্যেভরা পাত্রটি মাথায় নিয়ে চলছিল সূর্যের দিকে মুখ করে। সে দ্রুত পায়ে হেঁটে চলেছিল দিগন্তের দিকে। মাঝরাত থেকে হাঁটছিল সে, তাই দলের মানুষগুলোর পক্ষে তার হদিস পাওয়া আর সম্ভব ছিল না। তিলাই শুধু মনে মনে ভাবছিল, অজানা কোনও জায়গায় সে মানুষজনকে জড়ো করবে, যাদের মুখ সে কোনওদিন দেখেনি। আর তারপরই সে তাদের সামনে বীজ ছড়িয়ে নতুন নতুন শস্যক্ষেত্র তৈরি করবে।

।। দুই ।।

ধূ ধূ বালির প্রান্তরে বিচ্ছিন্ন কয়েকটা চামড়ার তাঁবু। সামনে শীতল জলে ভরা একটি জলাশয়। ওই পুষ্করিণীর চারদিক ঘিরে ফলন্ত খর্জুর বৃক্ষ। মরূদ্যানের পাশে এসে একদল মরুচর রাতের ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। অল্পদূরে টাঙানো একটা তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল একটি মেয়ে। আকাশের পূর্ণ চাঁদটার দিকে তাকালো সে। ঘন কালো চুল ছড়িয়ে পড়েছে তার পিঠে। সে অন্যমনে চাঁদের দিকে তাকাতে তাকাতে বালি ভেঙে এগিয়ে চলল। জলাশয়টা পার হয়ে অবলীলায় বালির কয়েকটা পাহাড় অতিক্রম করল সে। হঠাৎ সামনে একটা খাদ দেখে সে থমকে দাঁড়াল। একটা মানুষ পড়ে আছে! সে এমন ভাবে পড়ে আছে যে তার দেহে কোন প্রাণ আছে বলে মনে হচ্ছে না।

মরুচর তরুণীটি সভয়ে ডাক দিল, কে ওখানে?

নিচ থেকে কোন উত্তর উঠে এল না।

বার বার ডেকেও সে যখন সাড়া পেল না তখন তার ধারণা হল, মানুষটি মরুভূমিতে পথ হারিয়ে এই খাদে পড়ে প্রাণ হারিয়েছে। তরুণীটি ক্ষিপ্রপায়ে নেমে গেল খাদের ভেতর। এ যে বুকের ভেতর থেকে রক্ত ঝরে জমাট বেঁধে আছে! মানুষটার মুখের কাছে মুখ রেখে তরুণী মারু বোঝার চেষ্টা করল, মানুষটা এখনো বেঁচে আছে কিনা। সে বুঝতে পারল অতি ক্ষীণ শ্বাস প্রশ্বাস তখনও বইছে।

মারু যাযাবরদের সর্দার সাসাং-এর বড় আদরের মেয়ে। সারাদিন সূর্যের বড় উত্তাপ ছিল। রাতে তার ঘুম আসেনি। তাই সে মায়াময় চাঁদের আলোয় বেরিয়ে এসেছিল ঘুরে ঘুরে চারদিকটাকে দেখবে বলে। কিন্তু একি ভয়ঙ্কর একটা অবস্থার মাঝখানে সে পড়ল। কালো মত কি একটা অস্ত্র পড়েছিল মানুষটার পাশে। রক্তমাখা অস্ত্রটাতেসে হাত দিল না। মানুষটার দেহখানা প্রবল জোরে চেপে ধরে মারু তাকে টেনে তুলল খাদের ওপরে। তারপর টানতে টানতে তাকে একসময় এনে ফেলল জলাশয়ের কিনারে। ক্লান্তিতে জোরে জোরে নিঃশ্বাস টানছিল মারু, তার দেহ থেকে ঝরে পড়ছিল বিন্দু বিন্দু ঘাম। উত্তেজনায় সে ভুলে গিয়েছিল তার এতখানি পরিশ্রমের কথা। সে জলাশয় থেকে অঞ্জলি ভরে জল নিয়ে মানুষটার মুখে চোখে ছিটিয়ে দিতে লাগল। বুকের রক্ত জল দিয়ে ধুয়ে ফেলল সে. এর চেয়ে বড় উত্তেজনার বিষয় আর কি হতে পারে।

একসময় মানুষটা জোরে একটা শ্বাস ফেলে চোখ মেলল। মারুকে সামনে দেখে সে অবাক হয়ে জানতে চাইল, সে কোথায়? মারু ইঙ্গিতে কথা বলতে বারণ করল। নিজের হাতে অঞ্জলি ভরে জল এনে খাওয়ালো তাকে। এতক্ষণে রুবাই জ্ঞান ফিরে পেয়েছে, সে মনে করতে পারছে ভাল্‌লাকে। সে যখন খাদের ভেতর ফেলে তার বুকের ওপর লাফিয়ে চড়ে বসেছিল তখন হঠাৎ ভাল্‌লা তার কোমরে বাঁধা টাঙিখানা বের করে কোপ মেরেছিল তার বুকে। তারপর সে আর কিছুই জানে না।

রুবাই উঠে বসল মারুর মুখোমুখি। সম্পূর্ণ অচেনা মেয়েটিকে দেখে সে ভারি অবাক হল। এ তো তার তিলাই নয়। এর রং, পোশাক-আশাক, এর গড়ন গঠন সবই আলাদা। তার গোষ্ঠীর মেয়েদের সঙ্গে অনেক তফাৎ।

বিস্ময় ভরা দুটো চোখের দৃষ্টি মেলে মারুও চেয়েছিল রুবাই-এর দিকে। এই যুবককে নিয়ে সে কি করবে। রুবাই-এর রং উজ্জ্বল নয় কিন্তু তার সারা দেহের মধ্যে প্রবল একটা আকর্ষণ আছে। হয়তো ভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষ বলে রুবাই-এর প্রতি তার এই অতিরিক্ত আকর্ষণ।

শরীরটাতে ঝাঁকি দিয়ে উঠে দাঁড়াল রুবাই, সঙ্গে সঙ্গে তার ক্ষতস্থান বেয়ে আবার রক্ত গড়াতে লাগল। সেই ফোঁটা ফোঁটা রক্ত এসে পড়ল মারুর হাতে। অমনি মারু চীৎকার করে দলের লোকদের ডাকতে লাগল। ততক্ষণে রুবাই ঢলে পড়েছে বালির শয্যায়। তার মাথা মারু তুলে নিয়েছে কোলে।

মারুর চীৎকারে জেগে উঠল দলের লোকজন! মেয়ে পুরুষ সকলেই মরূদ্যানের দিকে ছুটে এল। একটা কোলাহল ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে।

মানুষগুলো বেশ সেবাপরায়ণ। তারা রুবাইকে বয়ে নিয়ে গেল তাদের তাঁবুতে। ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিল প্রলেপ। উটের দুধ পান করে কিছুটা সুস্থ হল সে। বাকি রাতটুকু রুবাই আচ্ছন্ন হয়ে ঘুমোতে লাগল।

ভোর হতে না হতেই তাঁবু তুলে মরুচর মানুষগুলো যাত্রার জন্য তৈরী হল। তারা উটের পিঠে মালপত্র চাপিয়ে শুরু করল তাদের চলা। রুবাই তখনো আচ্ছন্ন অবস্থায় ঘুমিয়ে ছিল। তাকে সর্দারের লোকেরা সাবধানে বেঁধে নিয়েছিল একটা উটের পিঠে।

সে তেমনি ঘুমন্ত অবস্থায় মরুপ্রান্তর পেরিয়ে চলল।

মধ্যাহ্নের কাছাকাছি আবার তাঁবু পড়ল। উটের পিঠ থেকে তাঁবুতে এসে ভারি আরাম বোধ করল রুবাই। সবার সঙ্গে বসে সে খাবার খেল। তার চোখ খুঁজতে লাগল রাতের সেই মেয়েটিকে। কিন্তু তাকে কাছেপিঠে কোথাও দেখা গেল না।

অপরিচিত মানুষগলো তাকে উৎসাহের সঙ্গে পরিচর্যা করল। রুবাই এসব মানুষকে কোনদিনও দেখেনি। তাছাড়া এতবড় একটা বালির প্রান্তর তার ভাবনায় কখনো স্থান পায়নি। আর এই বিশেষ জীবগুলোকে সে কোনদিনও দেখেনি। ভেড়া গবাদি পশুর সঙ্গে এর চেহারার অনেক তফাৎ। বিরাট একটা উঁচু মাংস পিণ্ডের পর গলাটা নিচু হয়ে আবার অনেক উঁচুতে উঠেছে। জীবগুলো এখন শুয়ে শুয়ে কি যেন চিবুচ্ছে। দু-একটা উট একটু দূরে একটা পাতাওলা কাঁটার ঝোপ চিবিয়ে চিবিয়ে সাবাড় করছিল।

যাত্রার তৃতীয় দিনে মরু ঝড় উঠল। একটা সোরগোল পড়ল সারা দলটার ভেতর। উটগুলো পা মুড়ে শুয়েপড়ল বালির ওপর। যাযাবর মানুষগুলো তাই করল। মেয়েদের উটের পেছনে ছিল রুবাই-এর উট। সবার দেখাদেখি সেও ঝড়ের দিকে পেছন করে মুখ ঢেকে বসল। আকাশ অন্ধকার করে বইতে লাগল মরুভূমির ঝড়। হঠাৎ রুবাই অনুভব করল, কে যেন একটা চামড়ার আবরণে তার পিঠ আর মাথাটা ঢেকে দিয়ে দিল। সেই ঝড়ের শব্দের ভেতর রুবাই তার উপকারী বন্ধুটির গায়ে হাত দিয়ে বুঝল, সে একজন স্ত্রীলোক। আর সেই স্ত্রীলোকটি যে তার উদ্ধারকারিণী তা বুঝতে তার বাকি রইল না। এ কদিনের চলার পথে সে জেনেছিল মেয়েটির নাম। অত্যন্ত ধীরে সে উচ্চারণ করল, মারু?

মারু সেই আঁধির মধ্যে রুবাইকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করল, পরমুহূর্তেই ঝড়ের গতিতে অদৃশ্য হয়ে গেল তার জায়গায়। অদ্ভুত পুরুষের মন! মারুর এক মুহূর্তের ছোঁয়ায় সে ভুলে গেল তার পূর্ব জীবনের কথা — ভাল্লার আঘাত, তিলাই-এর ভালবাসা, গোষ্ঠীর মানুষের এতদিনের বন্ধুত্ব!

রুবাই উটের দুধ আর মাংস খেতে শিখল। দু-একটি বছর ঘুরতে না ঘুরতেই রুবাই বনে গেল মরুচর এক যাযাবর। মরুভূমির চরিত্র এখন তার নখদর্পণে।

আর একটি বিষয় রুবাইকে বড় বিস্মিত করল। গোষ্ঠীতে সাধারণত সে মেয়েদের প্রাধান্যই দেখে এসেছে। কিন্তু এখানে এসে সে প্রথম দেখল, পুরুষই দলের প্রধান। তাদের নির্দেশেই সমস্ত দলটা পরিচালিত হয়। দলের মেয়েরা মরূদ্যানে থাকলে জল বয়ে আনে। আগুনে মাংস সেদ্ধ করে। উটের দুধ

দোহন করে। তাছাড়া খেজুরের গাছ থেকে পাকা খেজুর পেড়ে এনে একরকম সুস্বাদু খাবার তৈরি করতে মেয়েরা ওস্তাদ। ঐ পুরুষরা তাঁবু টাঙায় আর গোটায়। উটকে হত্যা করে মাংস কেটে আনে। উটকে পরিচর্যা করার পূর্ণ দায়িত্ব পুরুষের। তাছাড়া এক মরূদ্যান থেকে অন্য মরূদ্যানে নিয়ে যাবার দায়িত্বও তাদের। রুবাই দিনের পর দিন জড়িয়ে পড়তে লাগল মারুর ভালবাসার টানে। চোখের এমন মায়াময় দৃষ্টির সঙ্গে আগে কখনও তার পরিচয় ছিল না। মারুর হাতের একটুখানি ছোঁয়া, তার বাঁকা চোখের দৃষ্টি, তার চুপি চুপি কথা বলার ধরন তাকে একেবারে মোহগ্রস্ত করে ফেলল।

দলের পুরুষেরা কিন্তু রুবাই-এর প্রতি প্রসন্ন। তার শ্যামলা রঙ, তার সহজ আচরণ, আর সরল চোখের দৃষ্টি সবাই পছন্দ করত। রুবাই কিন্তু কোনও কাজে পেছপা ছিল না। সে পুরুষদের সব কাজেই সাহায্য করত। সাসাং-এর অনুমতি নিয়ে কখনো কখনো মেয়েরাও রুবাইকে নিয়ে যেত তাদের সঙ্গে খেজুর পাড়ার কাজে সাহায্য করতে। সেই ফাঁকে মারু সুযোগ খুঁজত রুবাই-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার।

কখনো বা মারুর সখীরাই ঘটিয়ে দিত উভয়ের যোগাযোগ। সাসাং-এর দৃষ্টি থেকে রুবাই-এর সঙ্গে মারুর মিলনের দৃশ্যগুলো সকলেই অতি সতর্কতার সঙ্গে গোপন রাখার চেষ্টা করত। রুবাই-এর ওপর সর্দারের ভালবাসায় কোনও খাদ ছিল না, কিন্তু ভিন্ন গোষ্ঠীর একটা মানুষ তার মেয়ের ওপর আধিপত্য করবে, এটা বোধহয় সে ভাবতেও পারত না। অদ্ভুত গতি ভালবাসার। তিলাই-এর ভালবাসার অংশীদার হতে গিয়ে ভাল্লার সঙ্গে যুদ্ধ করে আহত হতে হল তাকে। আবার এক ভালবাসা মৃত্যুর নির্জন গভীর খাদ থেকে তাকে তুলে আনল। রুবাই জানে না এই ভালবাসা কতদূর টেনে নিয়ে যাবে তাকে।

তাদের গোষ্ঠীতে সে দেখেছে, নারীরা তাদের ইচ্ছামতো ভোগের জন্য পুরুষকে টেনে নিয়ে যায়। এ গোষ্ঠীতে কিন্তু সে নিয়ম নেই। এখানে প্রায় প্রতিটি নারীই বিশেষ বিশেষ পুরুষের জন্য চিহ্নিত।

তিনখানি মরূদ্যানের অধিকারী ছিল সর্দার সাসাং। সে তার দলবল নিয়ে এক একটি মরূদ্যানে বেশ কিছুকাল ধরে কাটিয়ে দিত। তিনটি মরূদ্যানই প্রায় এক সরলরেখাতে গড়ে উঠেছিল, তবে পরস্পরের দূরত্ব কম ছিল না। দু-প্রান্তের দুটি মরূদ্যানে সাসাং-এর লোকেরা অতন্দ্র পাহারা চালিয়ে যেত। অন্য কোনও মরুচর যাযাবরের দল যাতে না মরূদ্যান দখল করে নেয়, সেদিকে সাসাং-এর লোকদের কড়া নজর ছিল। কেবলমাত্র মাঝের মরূদ্যানটিতে কোনও পাহারার ব্যবস্থা ছিল না। সেখানে সাসাং-এর দলের মেয়েরা প্রতি পূর্ণিমা রজনীতে মরু-সরোবরে স্নান করতে যেত। কোন কোন সময় সাসাংও সদলবলে যেত সেই সরোবরে। দুই প্রান্তের পাহারাদারেরা তীক্ষ্ণ নজর রাখত, যাতে না নতুন কোনও দল অরক্ষিত সরোবরটিতে কোনদিক থেকে ঢুকে পড়ে। এখন রুবাইকে সাসাং ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিভিন্ন মরূদ্যানে পাহারার কাজে পাঠায়। অল্পদিনের ভেতরেই সে তার সতর্কতা ও বিশ্বস্ততার পরিচয় দিতে লাগল। কিছুদিনের ভেতরেই সাসাং তাকে পাহারাদারদের দলপতি নিযুক্ত করে মরূদ্যান রক্ষার কাজে পাঠাতে লাগল। ঠিক এমনি দিনে শুরু হল একটি লড়াই। সেদিন আকাশে উদিত হয়েছিল পূর্ণচন্দ্র। এইসব রাত্রিতে রুবাই নিদ্রা ভুলে উটের পিঠে চড়ে ইতস্তত ঘুরে বেড়াত। এই রাতগুলিতে সে কল্পনা করত তার মারু মরু-সরোবরে স্নান করতে নেমেছে। ঊর্ধদেহ আবৃত করে নেমে এসেছে কালো চুলের রাশ। সে তার সখীদের সঙ্গে স্নিগ্ধ জলে ভাসিয়ে দিয়েছে তার দেহ। চাঁদের আলোয় ঝিলমিল জলের রাশি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ রুবাই-এর কল্পনার ছবি ভেঙে খান খান হয়ে গেল। আর একটি ছবি ধীরে ধীরে ফুটে উঠতে লাগল তার সতর্ক চোখের তারায়। পশ্চিম দিগন্তের সীমা ছুঁয়ে একটি উটের সারি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে মরূদ্যানের দিকে। কালো কালো বিন্দুগুলো নড়ছে।

বিরাট একটা বালিয়াড়ির ওপরে উটের পিঠে চেপে বসেছিল রুবাই। মুহূর্তে সে উটের মুখটা ফিরিয়ে ছুটল মরূদ্যানের দিকে। তার চিৎকারে জেগে উঠল সমস্ত পাহারাদার। দ্রুতগামী উটের পিঠে একজনকে সাসাং-এর মরূদ্যানের দিকে রওনা করিয়ে দিল সে। এখনই খবরটা সর্দারের কাছে পৌঁছান চাই। আরো কিছু যোদ্ধা হাতে রাখা দরকার।

রুবাই এবার মরূদ্যানের পুরো দলটিকে নিয়ে উঠে গেল বালির পাহাড়ের ওপর। আগন্তুক দলটিকে প্রথমে সাবধান করে দেবে, তারপর তার নির্দেশ অমান্য করে যদি এগিয়ে আসে, তাহলে ঝাঁপিয়ে পড়বে তাদের ওপর।

প্রস্তুত হয়ে হাতে অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে প্রতীক্ষা করছে সমস্ত দল। ক্রমে কালো বিন্দুগুলো স্পষ্ট আর বড় হয়ে উঠছে। একসময় ছোটবেলায় রুবাই তাদের বনের মধ্যে একটা বিরাট আকারের কালো রঙের সাপকে এঁকেবেঁকে এগিয়ে আসতে দেখেছিল। একটা জানোয়ারকে সদ্য গিলে তার মুখের দিকটা অনেক মোটা হয়ে গিয়েছিল। যে দলটা এগিয়ে আসছিল তাদের আঁকাবাঁকা গতিটা ছিল সেই সাপের মত।

হঠাৎ রুবাই-এর মনে হল, তার পাঠানো মানুষটি যদি যথাসময়ে সাসাং-এর কাছে খবরটা পৌঁছে দিতে না পারে, তাহলে হয়তো অন্য একটা বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে হবে তাদের। আজ পূর্ণিমার রাত্রিতে মাঝের মরূদ্যানে মেয়েরা নির্ভয়ে নেমেছে স্নান করতে। এ অবস্থায় নতুন দলের কাছে তারা পরাজিত হলে সর্দারের রমণীদের সন্ধান তারা পেয়ে যেতে পারে। তখন তার মারু ধরা পড়ে যাবে শত্রু-গোষ্ঠীর হাতে।

চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে একটা বিদ্যুৎ যেন ছুঁয়ে গেল তার সমস্ত শরীরটাকে। সে অন্যান্য রক্ষীদের লড়াইয়ের নির্দেশ দিয়ে তার উটের মুখ ফিরিয়ে ছুটল মাঝের মরূদ্যানের দিকে।

রুবাই মরু-সরোবরে যখন পৌঁছল তখন রাতের আর বড় বেশী বাকী নেই। মেয়ের দল মূল মরূদ্যানের ফিরে যাবার আয়োজনে ব্যস্ত ছিল। তারা হঠাৎ তাদের সামনে রুবাইকে আসতে দেখে বিস্মিত হল, সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের একটা ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে!

মারু দ্রুতপায়ে এগিয়ে আসছিল রুবাই-এর দিকে, হঠাৎ রুবাই চিৎকার করে শত্রুদলের আগমন সংবাদ ঘোষণা করল। অমনি আতঙ্ক আর কান্নার রোল উঠল মেয়েদের দলে।

রুবাই মারুর দিকে চেয়ে বলল, এই মুহূর্তে তুমি তোমার দলবল নিয়ে তোমার বাবার কাছে চলে যাও, নইলে বিপদ ঘটতে পারে। আর আমি এখন ফিরে যাচ্ছি লড়াই-এর জায়গায়।

রুবাই-এর ক্লান্ত শরীর থেকে ঘাম ঝরে পড়ছিল। মারু বিহ্বল দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইল। একসময় বলল, এই তোমার প্রথম লড়াই, এ লড়াই-এ তোমাকে জয়ী হতেই হবে। আমি তোমার অপেক্ষায় রইব।

মারু দলবল নিয়ে দ্রুত চলে গেল মূল মরূদ্যানের দিকে। রুবাই ফিরল রণক্ষেত্রে। এখন তার শরীর আর মন জুড়ে একটা অদম্য শক্তি কাজ করতে লাগল।

রুবাই যখন পৌঁছল তখন যুদ্ধ প্রায় শেষ। আগন্তুক হানাদারেরা হত অথবা বন্দি। রুবাই-এর আশ্চর্যের অন্ত রইল না, যখন সে দেখল স্বয়ং সাসাং তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে। এরই মধ্যে কখন নিঃশব্দে সমস্ত দলবল নিয়ে পাখির মত উড়ে এসেছে সে এখানে।

স্বয়ং সর্দারের সামনে বসল বিচারসভা। মেঘ গর্জনের মত আদেশ বেরিয়ে এল সর্দারের মুখ দিয়ে, মরু বালুতে ফেলে দাও এদের।

প্রহরীবেষ্টিত উটের পিঠে বন্দি অবস্থায় চলল আহত শত্রুরা। তারা ভাবছিল তাদের ভাগ্যের পরিণতির কথা। এ শাস্তির রহস্য তখনও বুঝতে পারেনি রুবাই। সে প্রহরীদের সঙ্গে সঙ্গে চলছিল অজানা এক বধ্যভূমির দিকে। সামনে সাসাং চলছিল উটের পিঠে, মাঝখানে বন্দির দল। সব শেষে সাসাং-এর সৈন্যবাহিনী। বেশ কিছু পথ যাবার পর থামল সর্দার, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দলটি পাষাণের মত স্থির হয়ে গেল।

পুরো দলটি যেখানে দাঁড়িয়েছিল, তার ডাইনে ছিল একটা বিস্তীর্ণ ঢাল। সারা জায়গাটা জুড়ে ছোটবড় অজস্র নুড়ি পাথর ছড়িয়েছিল।

সর্দারের নির্দেশে প্রহরীরা উটের উপর থেকে টেনে নামাল বন্দিদের। তারা আতঙ্কে চীৎকার করে উঠল। রুবাই কিন্তু এই আতঙ্কের মূল কারণটা সঠিক জানতে পারেনি। সে দেখল এক একটি বন্দীকে সেই ঢালের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া মাত্র মানুষটা নুড়ির ওপর দিয়ে সর সর করে নেমে চলে যাচ্ছে। অদ্ভুত একটা ঝন্ ঝন্ শব্দ উঠল চতুর্দিকে। হঠাৎ রুবাই দেখল, ধীরে ধীরে লোকটার পা দু'খানা বালির তলায় ডুবে গেল। একে একে কোমর বুক শেষে মাথাটা অদৃশ্য হয়ে গেল বালির তলায়।

কিছুক্ষণ সেই ঝম্ ঝম্ শব্দটা বাজতে লাগল। তারপরে আবার সব চুপ। গড়ানো নুড়িপাথরের খেলা তখন থেমে গেছে।

পর পর সমস্ত বন্দিদেরই চোরাবালুর গহ্বরে ডুবে যেতে হল। তাদের প্রাণফাটা আর্ত চীৎকার, নুড়ি-পাথরের ঝন্ঝনানি সবই একসময় মিলিয়ে গেল শূন্যে।

বিজয়ী দলটি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কতক্ষণ। কারু মুখে কোনও কথা নেই। সর্দার তাকিয়েছিল সেই গহ্বরের দিকে। সে তখন কি ভাবছিল কে জানে।

একসময় সাসাং মুখ ফিরিয়ে বলল, ফিরে চল। পুরো দলটি তখন চলতে শুরু করে দিল। আরোহী ছাড়া শত্রুপক্ষের একসারি উটও চলল সঙ্গে সঙ্গে। যুদ্ধের অমূল্য লাভ এই উটের দলটি। তাছাড়া শত্রুপক্ষের কিছু অস্ত্রশস্ত্রও সাসাং-এর অধিকারে এল। এবার এই মরূদ্যানটির প্রহরায় রুবাই ছাড়া অন্যান্যদের নিযুক্ত করা হল। আগে যারা ছিল, তাদের সঙ্গে যুক্ত হল কিছু নতুন প্রহরী।

এবার সর্দার রুবাইকে কাছে ডাকল, সাসাং এর গলায় ব্রজ্রের আওয়াজ শুনে কেঁপে উঠল রুবাই-এর চওড়া বুকখানা। এবার তোমার বিচারের পালা।

বিস্ময়ে রুবাই বলল, আমার বিচার!

হ্যাঁ এবার তোমার বিচার হবে। লড়াই-এর জায়গা ছেড়ে চলে যাবার জন্য তোমার বিচার হবে।

আমি আপনার মেয়েদের বিপদের কথা ভেবে তাদের সাবধান করতে গিয়ে ছিলাম।

গর্জে উঠল সর্দার সাসাং, আমি মেয়েদের রক্ষার ভার তোমাকে দিইনি, এই মরূদ্যান রক্ষার ভার দিয়েছিলাম তোমাকে।

এ কথার কোনও উত্তর দিতে পারল না রুবাই। সে যে মারুর আসন্ন বিপদের কথা ভেবে বিহ্বল হয়ে পড়েছিল, সে কথা সবার সামনে বলতে পারল না মুখ ফুটে।

কিছুক্ষণ স্থির থেকে রুবাই-এর দিকে মুখ ফেরাল সর্দার, আমার আদেশ পালন না করার অপরাধে এর আগে অন্যদের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছি, কিন্তু তুমি ভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষ বলে তোমাকে সে দণ্ড আর দেব না। তুমি তোমার একমাত্র উটটি সম্বল করে এই মরুপ্রান্তরের যেদিকে খুশি চলে যাও। একবিন্দু জল কিংবা এককণা খাদ্য রাখতে পারবে না তোমার সঙ্গে। সর্দারের নির্দেশে হতাশায় ভেঙে পড়া রুবাইকে দলের লোকেরা একটা উটের পিঠে চড়িয়ে দিয়ে উটটাকে অনেকখানি দূরে তাড়িয়ে দিয়ে এল।

একসময় রুবাই-এর উট দিগন্তের কোলে বিন্দু হয়ে হারিয়ে গেল। বিষণ্ণ মনে সর্দার সাসাং ফিরে এল তার মূল আস্তানায়।

যুদ্ধ জয়ের খবর পেয়ে আনন্দের কলরব উঠল মেয়ে মহলে। গর্বে মারুর বুকখানা ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। তার রুবাই দলপতি হয়ে যুদ্ধ করেছে। পিতা তাকে নিশ্চয়ই পুরস্কৃত করবেন। আর সেই পুরস্কার চেয়ে নিতে হবে রুবাইকে। রুবাই কি পারবে তার যথাযোগ্য পুরস্কারটি চেয়ে নিতে ?

কিন্তু রাতে ডাক পড়ল মারুর। পিতা সাসাং-এর তাঁবু থেকে তার ডাক এসেছে। মা-হারা মেয়ে মারু, বাবার স্নেহে সে এতবড় হয়ে উঠেছে। দলের সবার প্রতি মারুর আচরণে সর্দার সাসাং বড়ই সন্তুষ্ট। তাই মনে মনে কন্যাকে সাসাং প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করত। সেই রাত্রিতে মারু গিয়ে দাঁড়াল বাবার সামনে।

ক্লান্ত প্রহরীরা ঘুমে অচেতন। তাঁবুর ফাঁক দিয়ে এসে পড়েছে চাঁদের আলো।

ধীর গলায় সাসাং কথা বলল, রুবাইকে আমি শাস্তি দিয়েছি মারু।

চমকে বাবার দিকে মারু সবিস্ময়ে তাকাল। সে বুঝতেই পারছিল না, ঘটনাটা কি ঘটল।

তাকে যে কাজের ভার দিয়েছিলাম, সে কাজ না করে সে তোমাদের সাবধান করতে গিয়েছিল। তুমি জান আমার আদেশ অমান্য করলে তাকে শাস্তি পেতে হয়।

মারু জানে সর্দার সাসাং-এর শাস্তির অর্থ কি। হয় তাকে চোরাবালির গহ্বরে যেতে হবে, নয়তো জলাশয়ের ধারে খর্জুর বৃক্ষে বন্দি অবস্থায় থাকতে হবে। জল দেখবে কিন্তু একবিন্দু জলও পান করতে পারবে না। তিলে তিলে জলের দিকে তাকিয়ে মৃত্যু হবে তার।

মুখে হাত ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল মারু।

সর্দার যা সন্দেহ করেছিল ঠিক তাই। মারু রুবাই-এর প্রতি তার ভালবাসাকে গোপন করতে পারেনি।

সাসাং বলল, রুবাইকে আমি কারও চেয়ে কম ভালবাসতাম না, তবু তাকে শাস্তি দিলাম নিজের হাতে। তুমি জান ভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষের সঙ্গে আমাদের মেয়েদের সংসার করা চলে না। আমি গোষ্ঠীর নিয়ম ভেঙে এ কাজ যদি করি, তাহলে দলের কেউ আমাকে আর সর্দার বলে মানবে না। এখন বল তোমার ইচ্ছা কি ?

মারু তেমনি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

সর্দার সাসাং মেয়েকে গভীরভাবে ভালবাসত। মেয়ের মনের দুঃখ শোক তার বুকের মধ্যে এসেও বাজত।

বেশ কিছুক্ষণ নীরব থেকে সাসাং বলল, তোমার জন্য দুটো পথ খোলা আছে। আমার কাছে যদি থাকতে চাও, তাহলে দলের নিয়ম মেনে চলতে হবে। রুবাইকে মুছে ফেলতে হবে মনের থেকে। আর যদি তুমি রুবাই-এর খোঁজে যেতে চাও, তাহলে তাকে পাও আর না পাও এখানে ফেরার পথ তোমার বন্ধ হয়ে যাবে।

মারু এখন সোজাসুজি তাকাল বাবার মুখের দিকে। বলল, তুমি যদি অনুমতি কর তাহলে আমি রুবাই-এর খোঁজে বেরিয়ে যাই।

গভীর রাতে নিস্তব্ধ মরুপ্রান্তরের ওপর দিয়ে একটা দ্রুতগামী উটের পিঠে চেপে রুবাই-এর খোঁজে বেরিয়ে গেল মারু। গোপনে সব ব্যবস্থাই করে দিল সর্দার সাসাং। মশক ভরা জল আর থলে ভরা খাবার নিয়ে মারু তার উটটাকে দ্রুত চালিয়ে নিয়ে চলল মরুভূমির উত্তরদিকটা লক্ষ্য করে। সে জানত মরুপ্রান্তরে রুবাই-এর দিক নির্ণয় করা সব সময় সম্ভব নয়। যদি দক্ষিণ পশ্চিমে সে চলতে থাকে তাহলে বাঁচার আশা তার কম। কেবলমাত্র উত্তরদিকে চললে সে কোন মরূদ্যান অথবা নদীর সন্ধান পেতে পারে। মারুর অনুমান দক্ষিণ পশ্চিমে উঁচু বালির পাহাড় ভেঙে রুবাই হয়ত এগিয়ে যাবে না। সে উত্তরের প্রায় সমতল বালির ওপর দিয়ে তার উট নিয়ে চলার চেষ্টা করবে। কিন্তু একটা ভয় মারুর মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। মরুপ্রান্তরে পুরো একটি দিন সূর্যের তাপে দগ্ধ হয়ে পিপাসার্ত কোন মানুষ কি দীর্ঘসময় বেঁচে থাকতে পারে? এই চিন্তা তার বুকখানাকে কুরে কুরে খেতে লাগল।

রুবাই, রুবাই ডাক পাড়তে পাড়তে উটটাকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে মারু। মানুষের গলার একটুখানি সাড়া পাবার জন্য সে যেন শত শত কান পেতে আছে। যখন রুবাইকে পাবার আশা মারু প্রায় ছেড়ে দিয়েছে, তখন হঠাৎ তার চোখ পড়ল একটা কালো বিন্দুর ওপর। নিশ্চয়ই দূরের ঐ যাত্রী রুবাই ছাড়া আর কেউ নয়। সে অতি দ্রুত তার উটটাকে ছুটিয়ে নিয়ে চলল সেই দিকে।

এক সময় মারুর উট এসে গেল রুবাই-এর কাছাকাছি। রুবাই, রুবাই বলে মারু ডাক পাড়তে লাগল। কিন্তু এ কি ! রুবাই তার কোনও কথাই যেন শুনতে পাচ্ছে না। সে পাগলের মত সামনের দিকে তার উটটাকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে।

মুহূর্তে সমস্ত রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে গেল মারুর কাছে। সে দূরে তাকিয়ে দেখল একটা আশ্চর্য মরূদ্যানের ছবি। টলমল করছে জল। তীরে ফলন্ত খর্জুরবৃক্ষের সারি। পিপাসার্ত রুবাই ছুটে চলেছে সেই মরূদ্যান লক্ষ করে। চরাচরের অন্য কোনও শব্দ, অন্য কোনও দৃশ্য সে শুনতে কিংবা দেখতে পাচ্ছে না। মারু বুঝেছে, রুবাই এখন মোহাচ্ছন্ন। সে তার উট নিয়ে রুবাই-এর সামনে আড়াল তুলে দাঁড়াল। রোদ্দুরের তাপে ঝলসে গেছে রুবাই। দুটো চোখ রক্তে ভরে উঠেছে। সে মারুকে একেবারেই চিনতে পারছে না।

চোখের সামনে থেকে রুবাই-এর মরূদ্যানের ছবিটা মুছে যেতেই সে আচ্ছন্ন হয়ে উটের পিঠের উপর ঝুঁকে পড়ল। মারু লাফ দিয়ে তার উট থেকে নেমে রুবাইকে সাবধানে নামাল। তারপর মশক থেকে জল নিয়ে চোখে মুখে ক্রমাগত ছিটিয়ে দিতে লাগল। উটের ছায়ায় নিজে বসে রুবাইকে টেনে নিল তার কোলের ওপর। প্রতীক্ষা করতে লাগল সূর্যাস্তের।

এক সময পশ্চিম আকাশে রঙের ঢেউ তুলে সূর্য অস্ত চলে গেল। বিধাতাব করুণায় রাতেব দিকে একখণ্ড মেঘ ভেসে এল। মরুভূমির বুকের ওপর বৃষ্টি ঝরাতে ঝরাতে মেঘ চলে গেল দক্ষিণ থেকে উত্তরের দিকে। রুবাই এখন প্রকৃতিস্থ হয়ে মারুর মুখোমুখি বসে আছে। সে ভাবতেই পারছে না, কি করে মারু তার কাছে এসে পৌঁছল। যেভাবেই আসুক তার মনের মানুষ একেবারে তার কাছেই রয়েছে। রুবাই-এর মনে হল মনের মানুষ কাছে থাকলে ধূ ধূ মরুভূমির বুকেও শস্যের দানা ছড়িয়ে ফসল ফলান যায়।

মেঘটা উড়ে যেতেই ফুটফুটে চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়ল মরুভূমির বুকে।

মারু বলল, এই রাতের বেলাতেই আমাদের মরুভূমি পার হবার চেষ্টা করতে হবে। আমরা এখন যত দ্রুত পারি উত্তর-পূর্ব দিক লক্ষ করেই চলতে থাকব। শুনেছি ঐদিক দিয়ে একটা বড় নদী বইছে। হয়ত সেদিকে চলতে চলতে কোনও মরুদ্যানের সন্ধান আমরা পেয়ে যাব।

সামনে উট নিয়ে এগিয়ে চলল মারু, আর তার পেছনে ভালবাসায় বুক ভরে উট চালিয়ে চলতে লাগল রুবাই। এখন তার শরীরে ফিরে এসেছে আগের শক্তি। সে মারুকে শুনিয়ে বলতে লাগল, আমরা দুজনে ঘর বাঁধব এমন জায়গায় যেখানে মরুভূমির সঙ্গে সবুজ ফসলের ক্ষেত মিশে যাবে। আমি ফসল ফলাতে জানি মারু। আর তুমি জান মরুভূমির বুকে বেঁচে থাকার কৌশল। আমাদের কেউ আর পৃথক করে রাখতে পারবে না।

সত্য হল মারুর অনুমান। একসময় তারা একটা নদীর তীরে এসে পৌঁছল। রুবাই বলল, আমরা এখানেই থামব মারু। আমি যে দেশের ছবি দেখেছিলাম, মনে হচ্ছে এই সেই দেশ।

মারু বলল, এখানেও ফলন্ত খর্জুর বৃক্ষ রয়েছে, মরূদ্যান না থাকলেও আমাদের খাদ্যের অভাব হবে না। তাছাড়া অফুরন্ত পানীয় জল এখানে।

রুবাই কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

মারু বলল, কি ভাবছ?

আমরা একদিন এমনি একটা জায়গায় ঘর বেঁধেছিলাম। সেখানে নদী ছিল, আমরা মেয়ে-পুরুষ মিলে সেই নদীর তীরে অনেক ফসল ফলাতাম।

মারু জানতে চাইল, ফসল কি ?

একরকম বীজ ছড়িয়ে চাষ করলে একসময় সেই বীজ থেকে গাছ আর গাছ থেকে ফসল ফলে। ওই ফসলকে ঘসে মেজে দানা তৈরি হয়। ওই দানা গুঁড়িয়ে অথবা পুড়িয়ে খেতে হয়।

বিস্ময়ে মারু বলল, ওই খেয়ে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে?

রুবাই বলল, কেন পারবে না। তার সঙ্গে মাটি খুঁড়ে কন্দ বের করে পুড়িয়ে খাও। মাছ মাংসও আগুনে ঝলসে খাওয়া যায় তার সঙ্গে।

মারু বলল, সে দানা থাকলে আমরাও ফসল ফলাতে পারতাম।

রুবাই অনেক চিন্তা করে বলল, অনেক কষ্ট করে আমরা দুজনে যখন একসঙ্গে মিলেছি তখন বীজ আমি সংগ্রহ করবই। আর সেই বীজ বুনে আমি তৈরি করব ফসলের ক্ষেত। আমি নদী থেকে মাছ ধরার কৌশল জানি। তাছাড়া আমাদের যে দুটো উট রয়েছে তাদের বাচ্চাকাচ্চা হবে, আমরা উট থেকে দুধ আর মাংস পাব।

ভিন্ন গোষ্ঠীর দুটি নারী-পুরুষ মরু যেখানে শেষ হয়ে নদীর শ্যামলিমায় মিশেছে, সেখানে তাদের সংসার রচনা করল।

নিজের দল ছেড়ে চলে আসার পরে বীজ-ভাণ্ড নিয়ে তিলাই পাঁচটি বছর ঘুরে বেড়িয়েছে পৃথিবীর বুকে। কোথাও সে পায়নি তার মনের মানুষ, তাই গড়ে ওঠেনি তার স্থায়ী আস্তানা। হয়তো সে ভুলতে পারেনি রুবাইকে। তার স্মৃতিই এতকাল তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে তাকে। পাঁচ বছর পরে একটু একটু করে মুছে যেতে লাগল তার অতীত। একদিন দুটো নদীর সঙ্গমভূমিতে এসে সে থমকে দাঁড়াল। বহুকাল ধরে বিশাল একটা চর সৃষ্টি করেছে নদীর পলি। সেই চরের একদিকে অরণ্য ভূমির কোলে ঘন সবুজ তৃণভূমি। ওই তৃণভূমিতে তখন চরছিল একপাল গরু আর, কতকগুলো ভেড়া। তিলাই সারাদিন নদীর পাড়ে বসে কাটিয়ে দিল। একসময় সন্ধ্যার দিকে একটি নদী থেকে জল নামতে শুরু করল ভাঁটার টানে। অমনি পলির ঢিবি জেগে উঠল তার বুকে। সেই সুযোগে পশুচারকরা তাদের পশু নিয়ে পেরিয়ে এল এপারে। তারা জানোয়ারগুলোক তাড়িয়ে নিয়ে চলে গেল মূল ভূখণ্ডের দিকে।

তিলাই ভাবল, এই তার ফসল ফলানোর উপযুক্ত জায়গা। ভারী উর্বর এই নদীর পলি। তার ওপর ছড়িয়ে দেবে পশুদের পরিত্যক্ত পুরীষ। তাতে যে ফসল ফলবে, সে ফসল একা সে ঘরে তুলতে পারবে না। সেই চরেই ঘর বাঁধল তিলাই। বনের কাঠ পুড়িয়ে আগুন জ্বালাল। বুনো জানোয়ার আগুনের ভয়ে তিলাই-এর ফসল ক্ষেতে ঢুকে শস্য নষ্ট করতে পারে না।

দলে দলে পশুপালকরা আসে, তারা সারাদিন তাদের পশু চরিয়ে সন্ধ্যায় তিলাই-এর ক্ষেতের ধার দিয়ে চলে যায়। তারা বিস্ময়ে এই মেয়েটির দিকে চেয়ে থাকে, ততোধিক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে তার ফসল ক্ষেতের দিকে।

এই পশুচারকদের নিজস্ব কোনও আস্তানা নেই, এরা পশু নিয়ে নদীর ধারে ধারে শস্যক্ষেত্রগুলিতে ঘুরে বেড়ায়। একস্থান থেকে তাদের পশু নিয়ে চলে যায় অন্যস্থানে। তাই তিলাই বার বার একজন মাত্র পশুপালককে সেই চরের বুকে বহুদিন ধরে পশুচারণ করতে দেখে না। কয়েকদিনের দেখা একটি মুখ হঠাৎ চোখের সামনে থেকে চিরদিনের মতো সরে যায়। তিলাই-এর ভালবাসার দৃষ্টিতে একটি মুখ ধরা দিতে না দিতেই কোথায় হারিয়ে য়ায় কে জানে!

কিন্তু নারী-হৃদয়ে একটা সম্মোহনী আকর্ষণ আছে। তিলাই-এর হৃদয়ের ডাক একদিন পৌঁছুল একটি পশুপালকের হৃদয়ে। সে তৃষ্ণার্ত হয়ে একদিন জলপানের আশায় এল তিলাই-এর কুটিরের সামনে। তিলাই তাকে জলপানে তৃপ্ত করল।

পশুপালক কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য তিলাই-এর কাছ থেকে মাটির একটি ভাঁড় চেয়ে তাতে ভরে দিল গো-দুগ্ধ। ধীরে ধীরে তাদের ভেতর গড়ে উঠল একটা মধুর সম্পর্ক।

পশুপালক জানতে চায়, তুমি একা এখানে কিভাবে কাটাও?

তিলাই আঙুল দিয়ে নিজের ক্ষেত দেখিয়ে দেয়। বলে, আমি এই ক্ষেতে ফসল ফলাই।

পশুপালক আবাব বলে, এই ফসল দিয়ে তুমি কি কর?

এবার হাসল তিলাই। কথাটার সোজা উত্তর না দিয়ে বলল, পশু চরিয়েই বা তুমি কি কর?

বিস্মিত হয়ে পশুপালক বলল, কেন, পশু থেকে দুধ আর মাংস পাই। এসব খেয়ে আমরা বেঁচে থাকি।

তিলাই বলল, আমিও এই ফসল খেয়ে বেঁচে থাকি।

পশুচারকের মুখে এবার বিস্ময়ের ভাবটি লক্ষ করে তিলাই তার ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। পরক্ষণে একটি পাত্রে শস্যের চূর্ণ দানা নিয়ে এসে পশুপালকেব হাতে তুলে দিয়ে বলল, এই শস্য চূর্ণের সঙ্গে দুধ মিশিয়ে খাও, দেখবে কত সুস্বাদু। আমি সেদিন তোমার দেওয়া দুধের সঙ্গে আমার ফসলের দানা চূর্ণ করে মিশিয়ে খেয়েছিলাম। আর আজও সে স্বাদ আমার মুখে লেগে আছে।

এই চারণভূমি ছেড়ে পশুপালকটির চলে যাবার সময় হয়েছিল, কিন্তু তার আর যাওয়া হল না। তিলাই-এর দুধে ফেলা ফসলের স্বাদ তাকে এই চরে বেঁধে রেখে দিল।

শেযে সেই পশুপালকের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেল তিলাই-এর জীবন।

বিস্তীর্ণ চরে শুরু হল নতুন জীবনের লীলা। সোনালি সূর্য ওঠে, নদী থেকে বয়ে আসা হাওয়ায় বনের লতাপাতা কেঁপে কেঁপে ওঠে। জোয়ারের জলে চরের পলি বাড়তে থাকে, ফসলের সতেজ শীষগুলি নীল আকাশের দিকে মুখ তুলে চায়। পাখিরা ওড়ে, গবাদি পশু চরতে থাকে, কখনো বা মুখে হাম্বা হাম্বা ধ্বনি করে। তিলাই ছুটে গিয়ে তাদের শস্যের দানা খাওয়ায়। নদীতে তাড়িয়ে নিয়ে যায়, পশুরা বুকভরে পান করে শীতল জল।

তিলাই-এর হৃদয় ভরে আছে সুখে আর আনন্দে। সে কোনও দলের নেত্রী হতে চায় না, সে চায় এমনি একান্ত একটি আশ্রয় যেখানে একটি পুরুষের উত্তপ্ত বুকে সে মাথা রেখে কাটিয়ে দিতে পারবে। যেখানে ফসল সৃষ্টি করবে নতুন ফসল, যেখানে পশুতে জন্ম দেবে নতুন নতুন পশুশাবক আর বলিষ্ঠ নরনারী সৃষ্টি করবে তাদের সন্তান-সন্ততি।

এমনি নিরুদ্বিগ্ন, নিশ্চিন্ত জীবনের স্বাদ পেয়ে তিলাই ভুলে গেল তাঃ যাযাবর জীবনের কথা।

কালে সন্তান-সন্ততি হল তিলাই-এর। তারা একটুখানি বড় হতে না হতেই বাবা মাকে সাহায্য করতে লাগল। কেউ বা ক্ষেতের কাজে হাত লাগল, আবার কেউ বা পশু নিয়ে ঘুরতে লাগল চারণভূমিতে। তাদের মেয়েরা যখন কোমর ভেঙে মাথা নুইয়ে ফসলের গোছা নরম মাটিতে পুঁতত আর ছেলেরা গরু মোষের পিঠে চেপে চরিয়ে বেড়াত, তখন কুটিরের দাওয়ায় বসে তিলাই আর পশুপালক তাসা ভারী আনন্দে সে দৃশ্য উপভোগ করত। এখন উৎপন্ন ফসলের আর অপচয় হয় না, মনের মানুষ আর সন্তান-সন্ততিদের নিয়ে ফসল আর গোদুগ্ধ তিলাই ভাগ করে খায়।

।। চার ।।

একদিন মারুকে রুবাই বলল, চল আমরা বীজের সন্ধানে যাই। বীজ ছাড়া ফসল ফলানো সম্ভব হবে না।

মারু বলল, আমি যখন ছোট ছিলাম, তখন উটের পিঠে চেপে আমার হারানো মায়ের খোঁজে বেরিয়ে পড়তাম। আমার গোষ্ঠীর অন্য মেয়েদের মতো তাঁবুর ভেতর বন্দি জীবন আমার পছন্দ হতো না। আমি দুনিয়ার চারদিকে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসি রুবাই।

রুবাই বলল, তাহলে চল আমরা বেরিয়ে পড়ি। রুবাই আর মারু বেরিয়ে পড়ল পথে। তারা জানে চলতি পথে খাদ্যের অভাব হয় না। মাটি আর জলের বুক থেকে খাদ্য তুলে নিতে হয়। সে কৌশল যে জানে, পৃথিবীর বুকে বাঁচার অধিকার সে লাভ করে। ওরা হেঁটে পথ চলতে লাগল। সবুজ তৃণের পথ পেরিয়ে, অরণ্যের পাশ দিয়ে, নদীর রেখা ধরে কখনো বা ঊষর প্রান্তর পেরিয়ে ওরা এগিয়ে চলল। কত নাম না জানা দেশ, কত অপরিচিত মানুষের দলকে তারা পার হয়ে চলে গেল। নতুন নতুন গোষ্ঠী, তাদের ক্রিয়াকার্য গভীরভাবে লক্ষ করতে লাগল রুবাই। কোনও কোনও দলের আচার আচরণে দুঃখ পেল তারা, আবার কোনও দল সহৃদয় উত্তাপে ভরে দিল তাদের মন।

একদিন একটি পাহাড়ের কোল ঘেঁষে যেতে যেতে রুবাই আর মারু দেখল কতকগুলি মানুষ পাথরের টুকরোকে ঘষে ঘষে মসৃণ করছে। ওরা জিজ্ঞেস করে জানতে পারল, পাথরের ওপর পাথর চাপিয়ে বড় আকারের বাড়ি তৈরি হবে। কয়েকদিন থেকে বাড়ি তৈরির কৌশলটা কিছু পরিমাণে আয়ত্ত করল তারা। এরপর আবার চলা।

এক দ্বিপ্রহরে ওরা এক বনে ঢুকেছে, এমন সময় শুনতে পেল শক্ত কিছু দিয়ে কাঠের বুকে আঘাত করার শব্দ। ওরা এগিয়ে গিয়ে দেখল, কতকগুলো মানুষ শক্ত কোনও ধাতুর অস্ত্র বানিয়ে, তারই আঘাতে আঘাতে গাছ কেটে চলেছে।

এ ধাতুর অস্ত্র রুবাই-এর চোখে অচেনা ছিল না। এই অস্ত্রের আঘাতেই ভাল্লার কাছে তাকে মেনে নিতে হয়েছিল পরাজয়। রুবাই এগিয়ে গিয়ে কাঠুরেদের জিজ্ঞেস করল, তোমরা এই অস্ত্র কোথায় পেয়েছ?

আমাদের গোষ্ঠীর একদল মানুষ এই অস্ত্র তৈরি করে।

বিস্মিত হয়ে রুবাই জিজ্ঞেস করল, তোমরা এক গোষ্ঠীর মানুষ হয়ে ভিন্ন ভিন্ন কাজ কর কি রকম?

লোকগুলো অবাক হল রুবাই-এর কথায়, কেন, সকলকে একরকম কাজ করতে হবে তার কি কোনও মানে আছে?

রুবাই বলল, আমি যতগুলি গোষ্ঠী দেখেছি, তারা সকলে মিলে এক কাজ করে। হয় পশু চরায়, না হলে ফসল ফলায়।

কাঠুরেরা বলল, আমরা কিন্তু তা করি না। এই যে দলটা দেখছ, এরা শুধু কাঠ কাটে। আমাদের কাঠে গোষ্ঠীর বাড়িঘর তৈরি হয়। এই কাঠ কুঁদে আমরা ভেলা তৈরি করি। অন্য একদল পশু চরায়, সেই পশুর দুধ আর মাংস আমরা গোষ্ঠীর সকলে সমানভাবে ভাগ করে খাই। এই অস্ত্রগুলো যে ধাতু দিয়ে তৈরি, সেগুলো সংগ্রহ করে অস্ত্র বানিয়ে দেয় আর একদল লোক। এই হাতিয়ার আমরা নানা কাজে ব্যবহার করি। বুনো পশু মারতে, মাছ মারতে, কাঠ কাটতে এ অস্ত্রের জুড়ি নেই।

রুবাই-এর ভারী ইচ্ছে হল মানুষগুলোর সঙ্গে ওদের গোষ্ঠীতে গিয়ে কাজকর্ম সব দেখে আসে। সে মারুকে তার মনের কথা জানাল। মারু বলল, ঘুরতে যখন বেরিয়েছি তখন সব কিছু দেখে-শুনেই তো যেতে হবে। আমারও এদের সম্বন্ধে বড় কৌতূহল জন্মেছে।

রুবাই কাঠুরেদের সর্দারকে বলল, তোমরা যখন কাজের শেষে ঘরে ফিরবে, তখন তোমাদের সঙ্গে কি আমাদের নিয়ে যাবে? তোমাদের গোষ্ঠীর কাজকর্ম দেখতে আমাদের ভারী ইচ্ছা করছে।

একজন বলল, তোমরা গেলে আমাদের গোষ্ঠীপতি খুশী হবে। একটু পরেই দেখা হবে তার সঙ্গে। সে এখন লতাপাতা সংগ্রহ করতে ওই পাহাড়ের ধারের বনটাতে ঢুকেছে।

রুবাই বলল, লতাপাতা দিয়ে কি হবে?

বাঃ, লতাপাতার কত গুণ! ওপর থেকে পাথর গড়িয়ে পড়ে একটা পশুর পা ভেঙেছে, ওই লতাপাতার প্রলেপ দিয়ে তাকে সারাতে হবে না? তাছাড়া আমাদের রোগ-ব্যাধি হলে ওইসবের রস খাইয়ে তো আমাদের সারিয়ে তোলা হয়। এ কাজে আমাদের দলনেতা ভারী ওস্তাদ। তাই তাকে সকলে খুব মান্যি করে। রুবাই আর মারুকে ওই গোষ্ঠীর মানুষগুলো মহাসমাদরে নিজেদের ভেতর বেশ কয়েকদিন রেখে দিল। মেয়ে মহলে থাকত মারু। এখানে মেয়েদের দলের একজন নেত্রী ছিল। পুরুষদের দলে ছিল একজন দলনেতা। এরা দুজনে মিলে গোষ্ঠীর বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের সঙ্গে পরামর্শ করে সব কাজ চালাত।

মারুকে মেয়েদের ভারী পছন্দ হয়ে গিয়েছিল। এমন উজ্জ্বল রঙ আর এমন সুন্দর মুখ চোখের গড়ন তারা আগে কখনও কোথাও দেখেনি।

যে কোনও নারী পুরুষের মিলনে এখানে কোনও বাধা ছিল না। কিন্তু দু'পক্ষই প্রয়োজনে দু'পক্ষকে সম্মান দিত।

রুবাই বলল, তোমাদের এতবড় গোষ্ঠীর খাদ্যের অভাব হয় না কোনওদিন?

দলপতি বলল, আমি দলের ভার নেবার পর একবার মাত্র খাবারের অভাব ঘটেছিল। আমার আগে শুনেছি আরও কয়েকবার এমনি বিপদের মুখোমুখি হতে হয়েছিল।

রুবাই অনেক ভেবে বলল, পশুরা কি কমে গিয়েছিল?

হ্যাঁ, ওদের ভেতর একরকম মড়ক দেখা দিয়েছিল, আর তার ফলেই পশুদের প্রায় আদ্দেক মারা পড়ে।

একটু থেমে আবার দলপতি বলল, বহু কষ্টে আমি পশুদের লতাপাতার রস খাইয়ে বাঁচিয়েছি।

রুবাই এবার বলল, তোমারা চাষবাসের কাজ জান না বলে মনে হয়। ওই কাজটা জানলে খাদ্যের অভাব অনেক কমে যেত।

দলের অনেকেই কথাটা শুনে চাষবাস বস্তুটা কী তা জানতে চাইল। রুবাই বীজ থেকে ফসল ফলানো এবং দানা সংগ্রহ আর রক্ষার সব পদ্ধতিই বিশ্লেষণ করে বলল।

দলপতি বলল, বীজ পাওয়া যাবে কোথায়?

যদি কোনদিন সুযোগ হয়, আমি নিজে এসে তোমাদের বীজ দিয়ে যাব।

ওদের চলে যাবার সময় দলপতি লোহার ফলক-যুক্ত একটা বর্শা রুবাই-এর হাতে তুলে দিয়ে বলল, তুমি বলিষ্ঠ যুবাপুরুষ, এটা আমাদের বন্ধুত্বের চিহ্ন। আজ থেকে তোমার শত্রু আমাদেরও শত্রু, আর তোমার মিত্র আমাদেরও পরম বন্ধু।

মেয়েরা মারুকে ঝিনুক আর পাথরের তৈরি নানারকম অলংকার উপহার দিল। দলনেত্রী বলল, তোমাদের সন্তান-সন্ততি হলে এখানে আর একবার এসে দেখিয়ে নিয়ে যেও।

মারুর চোখের দৃষ্টি ভালবাসার ছোঁয়ায় ঝাপ্‌সা হয়ে উঠেছিল, সে ম্লান একটা হাসি হেসে বলল, তোমাদের কথা আমি কোনদিনও ভুলতে পারব না।

এরপর কয়েকবার সূর্যোদয় দেখল ওরা। এক সময় নতুন একটা দেশে এসে পৌঁছল তারা দুজনে। এখানেও বিরাট আকারের কর্মযজ্ঞ চলছে। রুবাই লক্ষ্য করল এরা বর্শা আর ধনুকের ব্যবহার জানে, কিন্তু লোহার মতো শক্ত ধাতুর ব্যবহার জানে না। একরকম উজ্জ্বল নরম ধাতু আর পাথর দিয়ে ওরা অস্ত্র তৈরি করে। পূর্বের দেশগুলোর চেয়ে এ অঞ্চলের মানুষের সংখ্যা অনেক বেশী। চারদিকে বড় বড় ঝিল, জল থৈ থৈ করছে। নানারকম জলজ উদ্ভিদ আর নানা রঙের জলজ ফুলে ভরে আছে ঝিলের জল। অজস্র হাঁস ঝিলের বুকে ঢেউ তুলে চলেছে। তাদের কলরবে ভরে আছে আকাশ বাতাস।

এ গোষ্ঠীর মানুযজন মাছ আর পাখির মাংসের ওপর বেশী নির্ভর করে। সারাদিন খাদ্যের সন্ধানে ওরা ঘুরে বেড়ায়। পূর্বে দেখা দেশটির মতো এখানকার মানুষের ভেতর কর্মের বিভাগ নেই। সারাদিন প্রত্যেকেই বিভিন্ন কাজে হাত লাগায়। তবে দলপতির প্রতি এরা বিশেষভাবে অনুগত। তার আদেশের নড়চড় হবার উপায় নেই।

এখানেও বিশেষভাবে সমাদর পেল রুবাই। এ গোষ্ঠীতে পুরুষই প্রধান। মেয়েরা নীরবে কাজ করে যায়। মেয়েরা বিশেষ সেবাযত্নের দ্বারা পুরুষদের তুষ্ট রাখার চেষ্টা করে। এখানে অদ্ভুত একটা জিনিস চোখে পড়ল রুবাই-এর। এরা পাথরের একরকম চাকা তৈরি করতে জানে। সেই চাকার ওপর কাঠের পাটাতনের মতো তৈরি করে তাতে অনেক ভারী পাথর চাপিয়ে লোকেরা টেনে নিয়ে যায়। ভারী বলে চাকাগুলো অনেক সময় বসে যায় মাটিতে। তখন তাদের মাটি থেকে তোলা বড়ই শক্ত কাজ। রুবাই এতকাল জানে, ভারী জিনিস বইতে গেলে পিঠ আর মাথার ব্যবহার করতে হয়, কিন্তু ভারী জিনিসকে এমন করে চাকার সাহায্যে গড়িয়ে নিয়ে যেতে পারা যায়, এ তার কল্পনারও বাইরে ছিল।

রুবাই-এর বর্শা-ফলকটি দলপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করল। শক্ত গাছে ছুঁড়ে মারলেও সেটি বেঁকে কিংবা ভেঙে যায় না, কঠিনভাবে গাছের কাণ্ডে গাঁথা হয়ে থাকে।

চলে যাবার দিন বন্ধুত্বের চিহ্ন হিসেবে রুবাইকে সেই অস্ত্রটি দলপতির হাতে তুলে দিয়ে যেতে হল। রুবাই দেখল এখানকার মানুষেরও ফসল ফলানোর পদ্ধতিটি জানা নেই। রুবাই-এর মুখে চায-বাসের কথা শুনে গোষ্ঠীর লোকেরা দারুণ আগ্রহ প্রকাশ করল। রুবাই পথে নামার আগে ওদের কথা দিয়ে এল, বীজ সংগ্রহ করতে পারলে ও চাষের কাজ শিখিয়ে দিয়ে যাবে।

রুবাই ফাঁকা প্রান্তরের ওপর দিয়ে যখন চলত, তখন অদ্ভুত একটা ছবি তার চোখের ওপর ফুটে উঠত। সমস্ত প্রান্তর সবুজ শস্যে ভরে উঠেছে। কোথাও বা দেখত, সোনার ফসলে পূর্ণ হয়ে আছে ক্ষেত। কখনও বা চমকে উঠত সে, পাকা ফসলের গোছা ধরে কেটে তুলছে তিলাই। কান পেতে শুনত, যেন একটা ডাক ভেসে আসছে — রুবাই, রুবাই, রুবাই।

একটা সাগরের তীর ধরে ওরা চলল, কতদিন তার লেখাজোখা নেই। বর্ষার জলে ভিজল, রোদের আগুনে পুড়ল, আবার রোমাঞ্চিত হল দক্ষিণদিক থেকে ভেসে আসা হাওয়ার স্পর্শে। এমনিভাবে পথ চলতে চলতে ওরা একদিন এসে দাঁড়াল একটা পাহাড়ের কোলে। ওই পাহাড়ের পেছনে কিছু দূরে দাঁড়িয়ে আছে বরফে ঢাকা একটা পর্বত। প্রাকৃতিক শোভায় পূর্ণ এই স্থানটিতে এসে মারু আর রুবাই পূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। স্থানটি বড়ই শীতল। মরুভূমির দেশের মেয়ে মারু। তুষার পাহাড় থেকে বয়ে আসা হাওয়া তার শরীরটা কাঁপিয়ে দিতে লাগল।

সে রুবাইকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে রইল। ঠিক সেই সময় পাহাড় থেকে নেমে এল একটা মানুষ। সে ঘোড়ার ওপর চড়েছিল। এ জাতীয় প্রাণীকে রুবাই তার জীবনে একবার মাত্র দেখেছে। কিন্তু মারু কোনওদিনই দেখেনি।

মানুষটা অতি দ্রুত সেই ঘোড়াটাকে ছুটিয়ে ওদের কাছে এসে দাঁড়াল।

মারু ওই জন্তুটার এ ধরনের গতি দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। সে শক্ত করে রুবাইকে ধরে রইল।

যে মানুষটা ঘোড়ায় চড়ে এসেছিল, সে ঘোড়া থেকে নামল। খর্বাকার কিন্তু বলিষ্ঠ গঠন। ওদের দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে জানতে চাইল, তোমরা কোথা থেকে এসেছ? বিদেশি বলে মনে হচ্ছে, যাবে কোথায়?

রুবাই বুঝিয়ে দিল, তারা দু'চোখের দৃষ্টি যেদিকে যায় সেদিকেই পা চালিয়ে চলেছে। তাদের নির্দিষ্ট কোনও জায়গা নেই যাবার।

মানুষটার চোখ দুটো আঠার মতো লেগেছিল মারুর সুন্দর শরীরটাতে। তার সারা মুখে ফুটে উঠেছিল লোভের একটা ছবি। মানুষটা বলল, পাহাড়ের ওপরে যে দুর্গ আছে, সেখান থেকে আমাদের সর্দার তোমাদের দেখেছে, চল আমার সঙ্গে সেখানে।

লোকটা আবার ঘোড়ায় না চড়ে তাকে টেনে টেনে নিয়ে চলল, আর তার পেছনে ভয়ে ভয়ে চলতে লাগল রুবাই আর মারু। পাহাড়ের ওপর চড়ার অভ্যেস নেই ওদের। মারু প্রায়ই পড়ে যাচ্ছিল, রুবাই সামলাতে পারছিল না তাকে। হঠাৎ লোকটা মারুকে ধরে অসম্ভব শক্তিতে তুলে বসিয়ে দিল ঘোড়ার ওপরে, তারপর ঘোড়া সমেত আরোহিণীকে টেনে নিয়ে চলল দুর্গের দিকে।

এক সময় ঘোড়ার থেকে নামানো হল মারুকে। ওরা তখন একটা বড় গুহার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। ঘোড়াটা বাইরে রেখে লোকটা ওদের দুজনকে নিয়ে গুহার ভেতরে ঢুকল।

একটু এগিয়ে ডাইনে ঘুরতেই এক ঝলক আলো চোখে এসে পড়ল। কোনও এক ছিদ্রপথে আলো ঢুকে গুহার ভেতরের অন্ধকারকে দূর করেছে। সেখানে একটা ঘষা পাথরের ওপর বসে ছিল সর্দার। তার পাশে দাঁড়িয়েছিল পাথরের ভল্ল হাতে দুটো রক্ষী। সর্দার যখন হাসছিল তখন তার চোখ দুটো ছোট হয়ে যাচ্ছিল। যে মানুষটা রুবাইদের ধরে নিয়ে গেল সর্দারের সামনে, সে সদার্রকে মোটামুটি ওদের একটা পরিচয় দিয়ে দিল। সর্দার আপাততঃ ওদের বিশ্রামের জন্য একটা স্থান নির্দেশ করল। যে লোকটা ওদের ভেতরে এনেছিল, সে আবার বাইরে নিয়ে গেল। তারপর আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথে পাহাড়টার পেছনে চলে এল ওরা। এখান থেকে ধক্ধকে বরফের পাহাড়টা খুব স্পষ্ট দেখা যায়। এই পেছনের দিকেই সারিসারি গুহা-ঘর নিচের ছোট একটা উপত্যকা অবধি নেমে গেছে। একটা আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথ সব ঘরগুলোকে ছুঁয়ে নেমে গেছে নিচে।

এই পেছনের দিকে ফুটে উঠেছিল চঞ্চল জীবনের একটা ছবি। দলে দলে ভেড়া চরছিল উপত্যকায়। একটা পাহাড়ী নদী থেকে জল তুলে আনছিল মেয়েরা, কোথাও বা রান্নার আয়োজন চলছিল, কোথাও বা কাঠ ঠোকার শব্দ।

লোকটা রুবাইকে খালি একটা গুহার ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, তুমি আমাদের অতিথি। এখানে কাজ ছাড়া খাবার উপায় নেই। তবে, তোমরা অতিথি তাই তোমাদের খাবার এই গুহাতে বসেই পাবে।

লোকটি রুবাইকে এ কথা বলে মারুর হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, রুবাই পেছন থেকে চিৎকার করে বলল, ওকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

লোকটার মুখে চোখ টেপা হাসি ফুটে উঠল। সে বলল, ওর যেখানে জায়গা ঠিক হয়েছে সেখানেই নিয়ে যাচ্ছি। তুমি চুপচাপ শুয়ে বসে আরাম কর।

বেশ কয়েকটা দিন কাটল, কিন্তু মারুকে একটি বারের জন্যেও রুবাই দেখতে পেল না। একটা লোক এসে তাকে খাবার দিয়ে যেত। তাকে জিজ্ঞেস করেও মারুর সন্ধান পেল না সে। শুধু লোকটা মাথা নেড়ে জানাল, নতুন মেয়েটা সর্দার মহলে ভালই আছে।

এ কথার সঠিক অর্থ বুঝতে পারল না সহজ সরল রুবাই। একদিন লোকটা খাবার দিয়ে বেরিয়ে

যাচ্ছিল, রুবাই নিঃশব্দে তার পেছনে পেছনে চলতে লাগল। কিছু পথ এগিয়েই লোকটা টের পেল. রুবাই তার পেছন ধরেছে। সে বলল, কোথায় যাবে?

যে মেয়েটি আমার সঙ্গে এসেছিল, তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

লোকটা অবাক হয়ে বলল, তুমি দেখা করতে চাইলেই তো আর দেখা হবে না। সর্দারের অনুমতি পেলে তবে দেখা হবে।

রুবাই ক্ষুব্ধ গলায় বলল, আমার সঙ্গীর সঙ্গে দেখা করতে আমাকে অনুমতি নিতে হবে! আমি ওকে নিয়ে আজই চলে যেতে চাই।

লোকটা হেসে বলল, তোমাকে সর্দারের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি। লোকটা কিন্তু সোজাসুজি রুবাইকে সর্দারের কাছে নিয়ে গেল না। অন্য একটা গুহার সামনে দাঁড়িয়ে কার নাম ধরে যেন ডাক দিল। একটা লোক বেরিয়ে এল। রুবাই দেখল, প্রথম দিনের দেখা সেই লোকটি, যে তাদের সর্দারের কাছে নিয়ে গিয়েছিল।

গুহার মুখে হাত রেখেই লোকটা খেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে কি?

যে লোকটা রুবাইকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল, সে বলল, এ তার মেয়েটাকে চায়।

গুহার মুখে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা একটা চোখ বন্ধ করে মুচকি হেসে বলল, এখন খেয়ে দেয়ে ঘুমোও, রাতে আমার লোক আবার তোমাকে এখানে নিয়ে আসবে। তখন তোমার মেয়েটার হদিস পেয়ে যাবে।

নিরুপায় রুবাই ফিরে এল তার ঘরে। বুকের ওপর কে যেন বড় একখানা পাথর চাপিয়ে দিয়েছে। ঝিম্ ঝিম্ করছে সমস্ত শরীর। কিছু ভাবতে গেলেই চোখের সামনে অন্ধকার ঘনিয়ে উঠছে।

রাতে খাবার নিয়ে সেই লোকটা এল।

রুবাই বলল, আমাকে ঐ লোকটার কাছে নিয়ে চল।

লোকটা বলল, তোমার খাওয়া শেষ হোক, তারপর নিয়ে যাব— বলেই লোকটা বেরিয়ে গেল।

খাবার কোনও ইচ্ছাই ছিল না রুবাই-এর। সে অন্ধকারে সমস্ত খাবার ছুঁড়ে ফেলে দিল উপত্যকার দিকে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে লোকটা সত্যিই ফিরে এল। অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় তাকে অনুসরণ করতে বলে চলতে লাগল। এবার লোকটা রুবাইকে এনে তুলল খোদ সর্দারের গুহায়। অন্ধকারের সঙ্গে অল্প আলো মিশে গুহার ভেতরটা ভারী ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল। এই গুহার ভেতর থেকে গম্ভীর একটা বাজখাঁই আওয়াজ ভেসে এল, যদি বাঁচতে চাস তো পালা, নইলে এ পাহাড়ের ওপর থেকে নীচে ফেলে দেব।

রুবাই-এর তখন মাথা ঘুরছিল, তবু সে বুকের মধ্যে সবটুকু বল সঞ্চয় করে বলল, আমার মারুকে এখানে এনে দাও, আমি তাকে নিয়ে এক্ষুনি চলে যাচ্ছি।

হা হা করে হাসিতে হাসিতে পাহাড় ফাটিয়ে সর্দার বলল, তোর ভাগ্যি ভাল এখনো আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছিস। তবে শোন বলি, তোর মেয়েটা আমার কাছে থাকতে রাজি হয়েছে। তার বদলে সে তোর মুক্তি চায়, নইলে কবেই তোকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হত নীচে। এখন একটুও দেরি না করে চটপট সরে পড়্।

এবার রুবাইকে আর কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়ে সঙ্গের লোকটা তাকে টানতে টানতে পাহাড়ের নীচে নামিয়ে নিয়ে চলল। তলায় নেমেই লোকটা বলল, প্রাণ নিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারিস পালিয়ে যা। মেয়েটার কথা ভাবতে হবে না। সে সর্দারের কাছে সুখেই থাকবে।

সেই রহস্যময় অন্ধকারের বুক চিরে 'মারু-মারু' ডাকতে ডাকতে দিক্ দিশাহীন প্রান্তর পেরিয়ে রুবাই ছুটে চলল!

।। পাঁচ ।।

উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় ঘুরতে ঘুরতে একদিন রুবাই আশ্চর্যভাবে একটা শস্যের ক্ষেত দেখতে পেল। অতি জীর্ণ কয়েকটি শস্য ছড়িয়ে পড়েছিল সে ক্ষেতে। নিশ্চয়ই তার গোষ্ঠীর কোনও লোক কাছাকাছি কোথাও রয়েছে এই ভেবে সে চীৎকার করে ডাকতে লাগল। কে আছ, কে আছ বেরিয়ে এসো, আমি তোমাদেরই লোক।

কেউ কোনও উত্তর দিল না। রুবাই বার বার ডাকল তবু কোনও সাড়া মিলল না। এক সময় পাগলের মত উঁচু নিচু জায়গাগুলো আর নদীর বাঁক ঢুঁড়তে ঢুঁড়তে ও একটা আস্তানার সন্ধান পেয়ে গেল। সেই কুটিরের ভেতর কিন্তু কেউ ছিল না। সে অনেকক্ষণ জেগে বসে রইল। শেষে রাত নামলে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল কুটিরের মেঝেতে। ভোর হলে আস্তানা ছেড়ে বেরিয়ে এল সে। ক্ষেতের একপ্রান্তে আর একটা চালা দেখা যাচ্ছিল। সে ছুটে গিয়ে দেখল, সেটা শস্য রাখবার একটা জায়গা। ও ভেতরটা নেড়েচেড়ে দেখল, কাঠের তৈরি শস্য রাখার একটা আধার রয়েছে। পাত্রটা ভাল করে পরীক্ষা করতে গিয়ে সে চম্‌কে চিৎকার করে উঠল, এ যে তিলাই-এর ফসল রাখার পাত্র। আমি নিজের হাতে কাঠ কুঁদে এটা তৈরি করে দিয়েছিলাম।

'তিলাই-তিলাই, বলে কতক্ষণ ডাকল রুবাই, কিন্তু কোনদিক থেকে কোনও সাড়া পেল না। কয়েকটা দিন অধীর প্রতীক্ষা করে যখন কেউ এল না, তখন ক্ষেতের শস্যে পাত্রটি ভরে নিয়ে সে পথে বেরিয়ে পড়ল।

অনেক পথ অতিক্রম করে সে তার পূর্ব পরিচিত গোষ্ঠীগুলোর কাছে পৌঁছল। রুবাইকে পেয়ে তাদের আনন্দের সীমা নেই। কিন্তু তার পাশে মারুকে না দেখে তারা ভারী দুঃখ পেতে লাগল। রুবাইকে বার বার জিজ্ঞেস করলেও সে মারুর বর্তমান পরিণতির কথা কাউকে বলতে পারল না।

রুবাই তার কথা রেখেছে। সে একে একে তার পরিচিত গোষ্ঠীগুলোর এলাকা সবুজ ফসলে ভরে তুলেছে। পৃথিবীকে শস্যে পূর্ণ করে দেবে, এই তার প্রতিজ্ঞা।

বন্ধু মানুষজনের বার বার জিজ্ঞাসার উত্তরে একদিন মারুর ইতিহাস তাকে খুলে বলতে হল। তখন সমবেত হল পরিচিত সব ক'টা গোষ্ঠীর মানুষ। তারা রুবাইকে সামনে রেখে একদিন হাতিয়ার উঁচিয়ে আকাশ-ফাটা গর্জন তুলে এগিয়ে চলল।

যাত্রাপথে নতুন নতুন দল জড় হতে লাগল। এগিয়ে এল পশুবালকেরা তাদের গবাদি পশুর দল সঙ্গে নিয়ে। বনচরেরা এল, আর এল মৎসজীবীর দল, শিকারীরা এল তাদের বর্শা উঁচিয়ে। নানা গোষ্ঠীর, নানা বৃত্তির মানুষ সমবেত হল এই জনস্রোতে। তারা সবাই চলেছে একটি মাত্র উদ্দেশ্য সামনে রেখে, অন্যায়ের প্রতিকার করতে হবে। একদিন এই বিশাল, বিপুল জনতা এসে পৌছল সেই পাহাড়ী দুর্গের তলদেশে। যেখানে রুবাই-এর মারুকে বন্দি করে রেখেছে ন্যায়-নীতিহীন দস্যু সর্দার।

দিন ফুরিয়ে পর্বতের আড়ালে সূর্যাস্ত হল। তীক্ষ্ণ শীতল তুষার হাওয়া বইতে লাগল অন্ধকারের বুক চিরে। প্রচণ্ড শৈত্যপ্রবাহে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল হাজারো মানুষ। সঙ্গে সঙ্গে জায়গায় জায়গায় জ্বলে উঠল আগুন। সেই আগুনের উত্তাপে ঠাণ্ডায় জমে ওঠা মানুষজন ফিরে পেল প্রাণ।

শেষরাতে শীতে জড়োসড়ো মানুষগুলো যখন ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন, তখন পাহাড়ের বিপরীত দিকে লুকিকে থাকা অশ্বারোহীর দল দুদিক থেকে ছুটে এসে রুবাই-এর মানুষজনের ওপর বর্ষণ করতে লাগল বৃষ্টিধারার মত তীর আর ভল্লের তীক্ষ্ণ আঘাত।

শুরু হয়ে গেল কোলাহল, সহস্র মানুষ তখন জেগে উঠেছে। কিছুক্ষণের ভেতরেই বিহ্বলতা কেটে গেল তাদের। রুবাই-এর সঙ্গে পরামর্শ হল অন্য গোষ্ঠীপতিদের। তারা স্থির করল, গবাদি পশুদের তারা সৈন্যদের আগে রেখে যুদ্ধ করবে।

সঙ্গে সঙ্গে পশুপালকের তুরী বাজিয়ে দিল। সেই তুরীর ধ্বনি শুনে সামনে ছুটতে লাগল শত শত গো-মহিযাদি প্রাণী। সেই তরঙ্গিত পশুপালের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল দস্যু-সর্দারের অশ্বারোহী বাহিনী। তাদের

অধিকাংশই নিহত হল রুবাই-এর যোদ্ধাদের হাতে। সঙ্গে সঙ্গে গুপ্ত পথ বেয়ে নেমে এল পদাতিক বাহিনী। কিন্তু তারাও স্রোতের মুখে ভেসে গেল আবর্জনার মতো।

সারাদিন প্রচণ্ড কোলাহল, মারমুখী জনতার চীৎকার, আহতের আর্তনাদে ভরে উঠল আকাশ বাতাস। তারই মধ্যে পশ্চিম আকাশে রক্তের ঢেউ তুলে সূর্যদেব অস্তাচলে চলে গেলেন। প্রান্তর জুড়ে ফুটে উঠল সে রক্তের ছবি।

সর্দারের পাঠানো অশ্বারোহী সৈন্যদের ভেতর থেকে ধরা পড়েছে একটি মানুষ। অন্য সবাই নিহত হয়েছে জনতার রোষে। কেবল এই মানুষটিই রুবাই-এর নাম উচ্চারণ করতে তাকে নিয়ে আসা হল অধিনায়ক রুবাই-এর কাছে।

মানুষটা তখন প্রাণভয়ে জীর্ণ হয়ে গেছে। সে রুবাই-এর সামনে দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করে কাঁপছিল। মুহূর্তে রুবাই লোকটাকে চিনতে পারল, সেই প্রথম দিন মারুকে ঘোড়ার ওপর চড়িয়ে এই লোকটাই পাহাড়ের ওপর নিয়ে গিয়েছিল। মারুর কথা জিজ্ঞেস করতে এই মানুষটাই গুহার দরজায় একটা হাত রেখে চোখ টিপে তার দিকে চেয়ে হেসেছিল।

রুবাই-এর মনে হল, তার হাতের কুঠারখানা চালিয়ে এ মানুষটার গর্দান ধড় থেকে নামিয়ে দেয়। কিন্তু পরক্ষণেই একটা বুদ্ধি খেলে গেল তার মগজে। সে অমনি বলল, যদি তুই আমাকে এই রাতের অন্ধকারে গুপ্ত পথ ধরে তোর সর্দারের কাছে নিয়ে যেতে পারিস, তাহলে আমার মানুষের হাত থেকে তোর প্রাণ রক্ষার দায়িত্ব আমি নেব।

সঙ্গে সঙ্গে লোকটা রাজি হয়ে গেল। অন্যান্য দলপতিরা এই দুঃসাহসিক কাজে বাধা দিতে লাগল রুবাইকে, কিন্তু রুবাই তাদের আশ্বস্ত করে বলল, আমার হাতে তীক্ষ্ণ অস্ত্র রইল, এতটুকু ছলনার গন্ধ পেলেই ওকে আমি হত্যা করব। নিশ্চিন্তে থেকো তোমরা।

আকাশে চাঁদ ছিল না। জমাট অন্ধকারের বুকে প্রান্তর জুড়ে স্থানে স্থানে জ্বলছিল আগুন। পাহাড়টা রাত্রির বুকে দাঁড়িয়েছিল ঘন জমাট অন্ধকারে গড়া একটা দৈত্যের মূর্তির মতো। সর্দারের অনুচরটা পাহাড়ের গুপ্ত পথ ধরে রুবাইকে নিয়ে অতি সন্তর্পণে এগোতে লাগল। তারা কালো কালো পাথরের স্তূপ ডিঙিয়ে উঠতে লাগল ওপরে। চতুর্দিকে অন্ধকার। প্রায় কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। লোকটা মৃত্যুপুরীর দূতের মতো কোন অন্ধকার গহ্বরের দিকে নিয়ে চলেছিল পৃথিবীর একটা মানুষকে।

এক সময় লোকটা এসে দাঁড়াল একটা ফাঁকা জায়গায়। পাহাড়টার চূড়ার কাছাকাছি এমন একটা ফাঁকা জায়গা থাকতে পারে, তা রুবাই কল্পনা করতে পারেনি। ওই জায়গাটার এক কোণায় তারা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল। এখানে থেকে দেখা যাচ্ছিল সামনের প্রান্তর। অগ্নিকুণ্ডের কাছাকাছি বসেছিল যেসব মানুষ, তাদের আকারগুলো এত উঁচু থেকেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

ওই ফাঁকা জায়গার সংলগ্ন দুটি পাশাপাশি গুহার অবস্থান অন্ধকারের ভেতরেও রুবাই-এর দৃষ্টি এড়াল না।

একটি গুহার ছিদ্রপথে সামান্য আলো দেখা যাচ্ছিল। লোকটি চুপি চুপি বলল, ওই গুহার ভেতর সর্দার বসে রয়েছে। এখান থেকেই সে ওই সামনের প্রান্তরের যুদ্ধ দেখতে পায়।

দুটি গুহার মাঝখান থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এল একটা লোক, হাতে উঁচিয়ে আছে বর্শা। সামান্য শব্দ সম্ভবত তার কানে গিয়েছিল। সে খোলা জায়গাটায় ছুটে এসে দাঁড়াল। পদপ্রদর্শক আর রুবাই এমনভাবে দাঁড়িয়েছিল যে তাদের সে দেখতেই পেল না। মানুষটাকে বেশ শক্তিশালী বলেই মনে হল রুবাই-এর। কোন কিছু চিন্তা না করেই সে ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটার ওপর।

অতর্কিত আক্রমণে প্রহরীর হাত থেকে খসে পড়ে গেল বর্শা।

তীক্ষ্ণ অস্ত্রের আঘাতে বেরিয়ে গেল তার প্রাণ।

সমস্ত ঘটনাটা মুহূর্তে ঘটে গেল। রুবাই উত্তেজনায় কাঁপছিল। সে চাপা গলায় পথ-প্রদর্শককে বলল,

এখুনি আমাকে সর্দারের সামনে নিয়ে চল।

লোকটা ফাঁকা জায়গাটা পেরিয়ে দুটি গুহার মাঝের সংকীর্ণ পথে ঢুকল। রুবাই তার পেছনে। ডান, বাম দুদিকেই গুহার মুখ। গুহামুখে মানুষটা প্রথমে গিয়ে দাঁড়াল,তার পেছনে ভয়ঙ্কর মূর্তিতে রুবাই।

মশাল জ্বলছিল গুহার ভেতর। বাইরে একটা ধ্বস্তাধ্বস্তির শব্দ সম্ভবত সর্দারের কানে এসে পৌঁছেছিল। হাতে ভল্ল নিয়ে সর্দার দাঁড়িয়ে আছে।

গুহামুখে অনুচর আর ঠিক তার পাশেই রুবাইকে দেখে সর্দার ক্রোধে আগুনের মত জ্বলে উঠল।

ও তোর এই কাজ। শত্রুটাকে তুই আমার ঘরে ঢুকিয়েছিস! বলার সঙ্গে সঙ্গেই হাতের ভল্ল সবেগে ছুঁড়ে মারল সর্দার। ভল্লের আঘাতে শুকনো পাতার মত খসে পড়ল সর্দারের অনুচরটা। ভল্লটা ছুঁড়ে দিয়েই সর্দার বেরিয়ে এল গুহামুখ দিয়ে। রুবাই তখন অন্ধকারে সরে দাঁড়িয়েছিল। মানুষটা বর্শার আঘাতে পড়ে যাবার সময় রুবাই-এর গা ঘেঁষে পড়েছিল, তাই ছিটকে অন্ধকারে পড়ে গিয়েছিল রুবাই-এর অস্ত্র। সে দ্রুত ওই সংকীর্ণ পথটা ধরে খোলা জায়গাটায় গিয়ে পড়ল। উদ্দেশ্য, কোনও রকমে মৃত প্রহরীটার বর্শাখানা কুড়িয়ে নিতে হবে। কিন্তু মাঝপথ পর্যন্ত পৌঁছতে না পৌঁছতেই প্রায় একই সঙ্গে দুটি ঘটনা ঘটল। মাঝপথেই রুবাইকে লাফিয়ে ধরে ফেলল সর্দার, আর ঠিক সেই সময়েই পাহাড়ের মাথার ওপর লাফিয়ে উঠল চাঁদ। এখন চাঁদের আলোয় পাহাড় এবং প্রান্তর দৃশ্যমান হয়েছে। নীচ থেকে মানুষজন দেখতে পেল পাহাড়ের চূড়ায় শুরু হয়েছে দুটি মানুষের দ্বন্দ্বযুদ্ধ।

হুঙ্কার, চীৎকার ছড়িয়ে পড়ছিল সারা আকাশ আর প্রান্তর জুড়ে। প্রতিধ্বনি উঠছিল পাহাড়ে পাহাড়ে। প্রান্তরের মানুষগুলো চীৎকার করে রুবাই-এর মনে শক্তি সঞ্চারের চেষ্টা করছিল।

কোথা থেকে রুবাই তার দেহে পেল এই অসুরের বল! তার হারানো নারীকে ফিরে পাবার জন্য সে আজ মরিয়া হয়ে উঠেছে। ভয়ঙ্কর আক্রোশে সে জাপ্‌টে ধরেছে তার শত্রুকে।

মহাবল·'লী এই পাহাড়ী সর্দার। কখনো বা মনে হচ্ছিল রুবাইকে শূন্যে তুলে সে ছুঁড়ে ফেলে দেবে নিচে। একবার সর্দারের ভীষণ একটা গর্জন শোনা গেল, ঠিক তার পর-মুহূর্তেই একটা মানুষ পাক খেল শূন্যে, তারপর মৃত একটা শকুনিব মতো ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল পাহাড়ের নিচে।

প্রান্তরের লোকেরা হায় হায় করতে করতে ছুটে গেল সেদিকে। একটু আগেই তারা সর্দারের ভয়ঙ্কর গর্জন শুনেছে। রুবাই-এর নিশ্চিত মৃত্যু তাদের বিহ্বল করে তুলল।

তারা হাহাকার করতে করতে মৃতদেহের কাছে পৌঁছে দেখল, চূর্ণ-বিচূর্ণ একটি খর্বাকার বলিষ্ঠ মানুষ পড়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে রুবাই-এর জয়ধ্বনিতে পূর্ণ হয়ে উঠল সমস্ত প্রান্তর।

ভয়ে গুহার মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিল অবশিষ্ট পাহাড়ী প্রহরীরা। তারা তাদের পরিণতির কথা ভেবে আতঙ্কে কাঁপছিল।

রুবাই পাহাড়চূড়ায় দাঁড়িয়ে 'মারু মারু' বলে চীৎকার করতে লাগল। চাঁদের আলোয় তখন স্পষ্ট হয়ে উঠছিল চরাচর। রুবাই দেখল, সর্দারের পাশের গুহা থেকে সংকীর্ণ পথ বেয়ে উঠে এল এক নারী, বুকে তার জড়িয়ে রয়েছে একটি শিশু। নারীর মুখ দারুণ আতঙ্কে পূর্ণ। সে রুবাই-এর সামনে এসে দাঁড়াল।

বিস্মিত রুবাই বলল, তুমি মারু!

অস্ফুট স্বরে নারী বলল, আমি তোমার সেই মারু, রুবাই।

কথা ক'টি বলেই মারু নতজানু হয়ে বসে পড়ল। করুণ চোখে রুবাই-এর দিকে তাকিয়ে বলল, একদিন মরুভূমিতে আমি তোমার প্রাণ রক্ষা করেছিলাম, আজ আমার বিনীত প্রার্থনা, তুমি আমার এই শিশুসন্তানটিকে রক্ষা কর।

রুবাই মারুকে বুকের কাছে টেনে তুলল, বলল, এ শিশুসন্তানটি হবে আমাদের গোষ্ঠীরই একজন। আর তুমি চিরদিনই আমার বুকের ভেতরে রয়েছ মারু, সেখান থেকে কেউ তোমাকে কেড়ে নিতে পারবে না।

❧

ভোগ

গাছের ডাল থেকে সবেগে ঝাঁপিয়ে পড়ল দিশা আর মুহূর্তে দুরন্ত গতিতে ভেসে চলে গেল দিগন্তের দিকে।

বনের কিনার ছুঁয়ে ঘাসের প্রান্তর। সবুজ তৃণভূমি গিয়ে মিশেছে উত্তরে ধূমল পাহাড়টার কোলে। সুড়ঙ্গ কেটে একটা ঝোরা উত্তর থেকে দক্ষিণ পাহাড় ঠেলে বেরিয়ে প্রান্তরের মাঝ বরাবর সাপের মত এঁকে বেঁকে চলে গেছে।

ঘোড়ার দঙ্গলটা এইমাত্র ঝোরা টপকে উধাও হয়ে গেল। দিশা মদ্দা ঘোড়াটার পিঠে সওয়ার হয়ে লেপটে আছে। তার কেশরগুলো শক্ত মুঠোয় ধরে রেখেছে সে।

কদিন ধরে গাছের ডালে বসে লক্ষ করেছে, এটাই পালের গোদা। এর পেছনে ঘুরে বেড়ায় সারা দলটা। মাদী-মদ্দা বাচ্চা-কাচ্চা মিলে বেশ বড় একটা দঙ্গল।

সুযোগ খুঁজছিল সে। এই গাছের তলা দিয়ে আসা-যাওয়া করছে কদিন। মুহূর্ত মাত্র থমকে দাঁড়িয়েছিল, আর সে সুযোগ হাতছাড়া করেনি দিশা। অব্যর্থ লক্ষে শিকারী বাজের মত ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আচমকা আক্রান্ত হয়ে আগুন-রঙা ঘোড়ার দলটা হাওয়ায় ঝড় তুলে ছুটে বেরিয়ে গেছে বন ছেড়ে। দিশা এঁটুলির মতো আটকে গেছে পিঠে।

তিনটে সূর্যকে উঠতে দেখেছে, তিনটে চাঁদকে ডুবতে দেখেছে। সুঁচলো হাড়ের মালা গাঁথা কোমর-বন্ধনীতে আটকানো পোড়া খরগোশের মাংস খেয়েছে সে। প্রবল উত্তেজনায় ঘুমকে তাড়িয়েছে, তেষ্টাকে চেপেছে। শেষটা পাহাড়ের তলায় জঙ্গলে ঘেরা ডেরায় এনে ফেলেছে দলের বেশ কয়েকটাকে।

জলের ধারা বয়ে চলেছে জায়গাটার ওপর দিয়ে। গোষ্ঠীর অনেকগুলো মেয়ে-পুরুষ কচি ঘাসপাতা কেটে জায়গায় জায়গায় ডাঁই করে রেখেছে।

ঘোড়াগুলোকে অনেক দৌড় করিয়েছে দিশা। গোদাটার পেটে গুঁতো মেরে ক্রমাগত চালিয়েছে তাকে। সঙ্গে সঙ্গে পুরো দলটাকে। এ তিনটে দিন দু'চার গ্রাস ঘাস আর দু'এক চুমুক জল ছাড়া কিছু জোটেনি তাদের কপালে।

এখন সামনে তৈরি ভোজ্য আর জলের সঞ্চয় দেখে জমে গেল ঘোড়ার দঙ্গল। এটা দিশারই আগাম ব্যবস্থা।

কদিন ও নতুন ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে ছুটবে। তারপর ঘোড়াগুলোকে ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত অবস্থায় এনে তুলবে এই আস্তানায়।

ক্লান্ত ঘোড়া খাবার পাবে, জল পাবে, আর কঠিন লতার বাঁধনে বাঁধা পড়বে।

এখনও পাঁচটা পোষমানা ঘোড়া চরে বেড়াচ্ছে দিশার আস্তানার আশেপাশে। এবার ওগুলোকে সঙ্গে নিয়ে দূর দূর অঞ্চলে বিনিময় সওদায় বেরুবে দিশা। ঘোড়ার বদলে নুন-পাথর, নয়তো ভেড়ার লোমওলা চামড়া। আর যা আনবে, তার তা একেবারে নিজস্ব ভোগের বস্তু। এতে কারু ভাগ বাঁটোয়ারা নেই। বিনিময়ের ব্যবসায় উপরি পাওনা। এর স্বাদই আলাদা। দিশার নেশা ধরিয়ে দেয়। আর এই নেশার টানেই তার দুঃসাহসী ঘোড়া ধরার প্রাণান্তকর চেষ্টা।

দিশা দুর্ধর্ষ। সে ইচ্ছে করলেই গোষ্ঠীপতি হতে পারে, কিন্তু এদিকে কানাকড়ি ইচ্ছে নেই তার। বুড়ো বেহু যতকাল বেঁচে আছে, ভোগ করুক সে সর্দারী। বেহুকে মানা করে দিশা। বুড়ো মানুষ বলে নয়,

ছেলেবেলা থেকে ওর সঙ্গে সঙ্গে থেকেছে বলে। মা মরেছিল পাহাড়ী নদীতে পড়ে. পাথরে মাথা ঠুকে। বাপ মরেছিল ভয়ঙ্কর এক ভালুকের আঁচড় খেয়ে। তখন দিশা একদম ছেলেমানুষ। সেই সময় থেকে বেহুর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরত সে। কাছে-পিঠে শিকারে বেরুলে বেহু সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যেত। ফাঁদ পেতে পাখি ধরা, বর্শা ছুঁড়ে খরগোশ মারার কলাকৌশলগুলো দেখত সে।

বেহুর আদেশে নির্দিষ্ট কোন লক্ষে, পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারতে হতো। ঠিক জায়গায় পাথরটা না লাগলেই ব্রহ্মতালু ফাটিয়ে চাঁটি পড়ত।

একবার একঝাঁক উড়ন্ত পাখির দিকে ঢিল ছুঁড়ে একটাকে নামিয়েছিল বেহু। সেটা ছিট্‌কে পড়েছিল পাহাড়ের ঢালে। দিশা তড়িঘড়ি পাখিটা আনতে গিয়ে চোট পেয়েছিল পায়ে। বেহু তাকে সারা পথ কাঁধে বয়ে এনেছিল। লতাপাতা বেটেবুটে থকথকে তালটা লেপে দেওয়া হতো তার পায়ে। বেহুর জবর তদারকিতে সে কদিনেই খাড়া হয়ে উঠেছিল।

বেহু তাকে কাঁধে তুলে নাচাত, আদর করত, আবার মনের মতো কাজ না করতে পারলে যেখানে সেখানে ছুঁড়ে ফেলে দিত।

বড় হয়ে দিশা মুখোমুখি লড়াই করে তিনটে ভালুক মেরেছে. বাপের হারের বদলা নিয়েছে সে। মা যে নদীতে ঠোকর খেয়ে মরেছিল, সেই নদী সে পারাপার করেছে বার কয়েক।

শেষ লড়াইটা তার হয়েছিল সাগার সঙ্গে। নখের মতো বাঁকা চাঁদটা পুরো গোল হতে যতগুলো দিন লেগেছিল, ততদিন ধরে ওদের যুদ্ধ চলেছিল।

দিশা নিজের পথের পাথর সরাবে বলে যুদ্ধ করেনি। বেহুকে সরিয়ে সাগা দলের দখল নিতে চেয়েছিল। তাই দিশা তার সঙ্গে লড়াই করে শেষমেষ পাহাড়ের উপর থেকে নীচে ছুঁড়ে ফেলে দিল তাকে।

বুনো মোষের মতো ভয়ঙ্কর শক্তিধর আর বদরাগী সাগা। কিন্তু দিশা সবসময় লক্ষে স্থির। আর লক্ষে স্থির থাকতে ছেলেবেলা থেকে তাকে শিখিয়েছিল বেহু।

সাগাকে এই মরণপণ যুদ্ধে হারানোর পর সবাই ভেবেছিল, এবার বেহুকে হটতে হবে। দিশা বসবে গোষ্ঠীপতি হয়ে। কিন্তু দিশা বুড়ো বেহুকে খাতির করে শূন্যে তুলে একটা পাথরের চাঁই-এর ওপর বসিয়ে দিয়ে নিজে তার পায়ের তলায় বসে পড়ল।

এ দৃশ্যটা দেখে সবার মনে একটা অদ্ভুত ভাব এসে গেল। সে ভাবটা এর আগে এ গোষ্ঠীর আর কেউ কোনদিন অনুভব করেনি।

বুড়ো বেহু দলপতি থেকে গেল। আর দিশা মনের খুশীতে ঘুরে বেড়াতে লাগল দেশান্তরে। ঐ তার এক রোগ, ঘোড়া ধরা আর সেই ঘোড়ায় চেপে দূর দূর মুল্লুক গিয়ে খেলা দেখানো। সেখানকার মানুষজনকে সম্মোহিত করে সে তাদের গোষ্ঠীর প্রয়োজনে অনেক কিছুই নিয়ে আসে।

একটি বস্তু সে কেবল নিয়ে আসে নিজের জন্য। অপহরণ করেও। নারী। ভিন্ন গোষ্ঠীর রমণী। সে তাদের ইচ্ছেমতো ভোগ করে, তারপরই পণ্যের মতো বিক্রি করে দিয়ে আসে অন্য কোনও গোষ্ঠীর দলপতির কাছে। আবার নতুনের খোঁজে যাত্রা, আবার দ্রুতগামী জীবনটার খেলা দেখিয়ে সম্মোহিত করা।

নতুন ধরা ঘোড়াটাকে শক্ত লতার লাগাম পরিয়ে দৌড় করাচ্ছিল দিশা। বশ মানানোর সব কটা কৌশলই সে প্রয়োগ করছিল ঘোড়াটার ওপর। ভারী তেজী ঘোড়া এবার ধরেছে সে।

বেলা পড়ে আসছিল। বেশ খানিকটা পথ ঘোড়াটাকে দৌড় করিয়ে একটা পাহাড়ের ধারে এনে ফেলেছিল দিশা। তাদের গোষ্ঠীর মানুষজন এই পাহাড়ে শিকার করতে আসে। সূর্য ডোবার দিকটায় পাহাড় একেবারে ন্যাড়া। সূর্য ওঠার দিকটা জুড়ে ঘন বন।

এবার ফেরার পালা। বন পেরিয়ে আসতে গিয়ে ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরল দিশা। ঘোড়াটা থেমে দাঁড়াল। সামনে একটা পাতাসমেত মস্ত ডাল টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছিল সারা।

দিশা চেঁচিয়ে বলল, সাঁঝবেলা বনে আসা না বারণ?

ডালপালার সরসরানি শব্দটা থেকে গেল। সারা পেছনে মুখ না ঘুরিয়েই বলল, আমার ভয় নেই।

জানোয়ার ধরলে কি করবি?

তোকে জানোয়ারের মুখ থেকে ছাড়াতে ডাকব না।

আবার পাথুরে পথে ডালপালার ঘষটানির শব্দ উঠতে লাগল। সারা চলছে আস্তানা লক্ষ করে। তার পেছনে ঘোড়ায় চড়ে চলেছে দিশা। দুরন্ত ঘোড়াটাকে অনেকখানি বশ মানিয়েছে সে।

দিশা পেছন থেকে বলল, ডালটা ফেলে দিয়ে তুই আমার ঘোড়ায় উঠে আয় সারা। কাল আমি নিজে এসে তোর ডালটা বয়ে নিয়ে যাব।

সারা এবার ঘুরে দাঁড়াল, কেন মিছে বকবক করছিস? তোর ঘোড়ায় চড়ার মেয়ে এ তল্লাটে নেই।

ঘোড়া থেকে নামল দিশা। অমনি চলতে লাগল সারা। দিশা জানে, শুধু সারা নয়, তার গোষ্ঠীর সব কটা যুবতী মেয়েরই ঐ এক ক্ষোভ। দিশা ঘোড়ায় করে অন্য গোষ্ঠীর মেয়েদের হরণ করে আনে। নিজের ডেরায় দিন কতক রেখে আবার বিদেয় করে দিয়ে আসে কোন মুল্লুকে!

দিশা বলল, শুধু গাছের ডাল এ্যাদ্দূর থেকে বয়ে নিয়ে যেতে তুই আসিসনি। মধু আছে তো একটু দে না খাই।

সারা হাত থেকে ডালটা ফেলে দিল। কোমরের একপাশে ঝোলানো মধুর পাত্রটা বের করল। বাঁশের পাব দিয়ে তৈরি পাত্র।

এখন সে পাত্রটা এগিয়ে ধরল দিশার দিকে। দিশা মুখ ঠেকিয়ে চুকচুক করে কিছুটা মধু খেয়ে নিল।

পাত্রটা সারার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, ভারী মিঠে মধু। মৌমাছি হুল ফুটিয়েছে?

সারা তার অনাবৃত হাতখানা মেলে ধরল। আবছা অন্ধকারেও মৌমাছির কামড়ের দাগ বোঝা যাচ্ছিল। তবু দিশা সারা হাতখানা ঘষে ঘষে অনুভব করতে লাগল।

গোষ্ঠীর ভেতর কোন একটি মেয়ে দিশার মন আজও ছুঁয়ে যেতে পারেনি, তবু কেউ যদি ক্ষণিকের দাগও কাটতে পারে সে সারা। দিশার পেছনে অন্য যুবতীদের মতো সে তাড়া করে ফেরে না। দিশাকে সে সারাক্ষণ বুকের ভেতর ভরে রেখেছে, কিন্তু বাইরে তার কানাকড়ি প্রকাশ নেই। সারার এই উপেক্ষাটুকুই দিশার আকর্ষণের কারণ। কিন্তু সে আকর্ষণও ক্ষণিকের। চোখের সামনে প্রতি মুহূর্তে দেখা জিনিসের ওপর কোনও মোহ তার নেই। দুর্বার আকর্ষণ তার ছিনিয়ে আনা জিনিসের ওপর।

সেই জ্যোৎস্নাফোটা সন্ধ্যায় সেদিন কিন্তু সারাকে দেহসঙ্গিনী হবার প্রস্তাব দিল দিশা। একটা রহস্যময় আলো সারার দেহে খেলা করতে দেখেছিল সে। সেই রহস্যের আলো নিয়ে সারা খুব কাছে সরে এল আর মধুর একটা প্রস্তাব দিয়ে বসল।

সারা, দিশার দীর্ঘ একটি নিঃশ্বাসে নিহত হয়েছিল। দিশা তার বলিষ্ঠ দুটো হাতে তাকে টেনে নেওয়া মাত্র সারার ভেতরের সমস্ত অভিমান, সকল প্রতিরোধ ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। সারা আদিম অরণ্যের পাশে, পর্বতের তলায় তার প্রথম মিলনের শয্যাটি পাতল।

একটি শিলাখণ্ডে বাঁধা ছিল দিশার বেগবান অশ্বটি। সে সেই জ্যোৎস্নার আলোয় দেখছিল মানুষী-লীলা। অদ্ভুত কোনও অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে সে শিলাখণ্ডে তার খুরের শব্দ তুলতে লাগল। শেষে হ্রেষাধ্বনিতে তার অতৃপ্ত ক্ষুধার কথা ঘোষণা করে চলল বারবার।

রাত নামল। উত্তাপ বিকীর্ণ হয়ে শীতলতা নেমে এল। ঘোড়ার পিঠে সারাকে নিয়ে সে রাতে ফিরে এল দিশা।

পরদিন ভোরের ঘুম ভেঙে সারা দেখল, অশ্বের পাল তাড়িয়ে নিয়ে একটি ক্ষুদ্রমূর্তি দিগন্তের দিকে ছুটে চলেছে। এই প্রথম সারা তার বুকের ভেতর একটি মানুষের জন্য যন্ত্রণা অনুভব করল।

ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে দিশা। চারটি বশমানা ঘোড়া সঙ্গে ছুটে চলেছে। দৃপ্ত মদ্দা ঘোড়াটার আকর্ষণে তাকে অনুসরণ করে চলেছে চারটে মাদী ঘোড়া। তারা সঙ্গসুখ চায়, দিশার গোষ্ঠীর মেয়েরা যেমন চায় দিশাকে।

দু' দু'বার চন্দ্রের কলাবৃদ্ধি, কলাক্ষয় হল। দিশা চলেছে তো চলেছেই। অরণ্য পেরিয়ে তৃণভূমি পেরিয়ে

সে চলতে লাগল। একেবারে আদিম অরণ্যবাসী মেয়ে-পুরুষ বনের ভেতর খাবারের খোঁজে ঘুরে ফিরছে।কেউ কোনও লতার মূল তুলছে, কেউ বা একখণ্ড পাথর নিয়ে খরগোশের পেছনে তাড়া করে ফিরছে। দিশা তার বশমানা জন্তুর পাল নিয়ে বন পার হবার সময়ে ওরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে তাকিয়ে দেখেছে ওদের!

তৃণভূমিতে চরে বেড়াচ্ছে ভেড়ার পাল। লাঠি হাতে মেষপালকেরা দৌড়ে দৌড়ে তাদের জড়ো করছে একঠাঁই।

ধুধু বালির প্রান্তরে পা ডুবিয়ে, মরুদ্যানের বালি চোঁয়ানো ঠাণ্ডা জল আর খেজুরের স্বাদ নিয়ে দিশা একদিন এসে পড়ল এক নদীর ধারে।

বেশ চওড়া নদী। জল সরে গেছে যেখানে, সেখানটায় ছোট ছোট ঢেউ খেলানো পলির স্তর। আশপাশে গজিয়ে উঠেছে সবুজ ঘাস। ঘোড়াগুলো কদিন ধরে ভাল করে খেতে পায়নি। এমন তরতাজা ঘাস দেখে তারা অনেকখানি মুখ ডুবিয়ে খেতে লাগল।

খানিকটা ঝোপঝাড়ের ভেতর একটা খেজুর গাছ দাঁড়িয়ে। গাছটার লম্বা ছায়া পড়েছে। বাতাস বয়ে আসছিল নদীর জল ছুঁয়ে। গায়ে এসে লাগামাত্রই ঘুমের আমেজ এসে যায়। দিশা আগেই ঘোড়াগুলোকে ছেড়ে দিয়েছিল, এখন সে ছায়ার তলায় শুয়ে পড়ল।

হঠাৎ ঘুম ভাঙল তার কয়েকটা মানুষের চেঁচামেচিতে।

ছিট্‌কে উঠে দাঁড়াল দিশা। মানুষগুলো ততক্ষণে তাকে ঘিরে ধরে দুর্বোধ্য ভাষায় কি সব বলছে।

দিশা তাকিয়ে দেখল, তার ঘোড়াগুলো ঘাস খেতে খেতে ভয়ের চোখে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে থাকা লোকগুলোকে দেখছে।

অপরিচিত মানুষগুলো উত্তেজিত হয়েছে বলে মনে হলো। তারা ঘোড়াগুলোর দিকে বারবার দিশার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লাগল।

দিশা ভাবল, এই আজব জীবগুলো সম্বন্ধে মানুষগুলো তার কাছে কিছু জানতে চাইছে। কিন্তু পরে জেনেছিল, এই অপরিচিত জীবগুলো সম্বন্ধে তাদের কৌতূহল থাকলেও তারা ঘোড়াগুলোর আচরণে বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ হয়েছিল। আসলে দিশা যেগুলোকে সবুজ ঘাস মনে করে ছেড়ে দিয়েছিল, সেগুলো ছিল শস্যের ক্ষেত। নদীর পলিতে বীজ ছড়িয়ে চারাগাছ তৈরি করা হয়েছিল। সেই চারা থেকে যে কালে শস্যের দানা পাওয়া যাবে তা দিশার ধারণাতেই ছিল না।

দিশা তার ঘোড়ার কাছে গিয়ে লাফিয়ে উঠে বসল। অন্য ঘোড়াগুলোকে তাড়া লাগিয়ে নিয়ে এল নদীর চরে।

এখন লোকগুলো সার বেঁধে অবাক হয়ে দেখতে লাগল দিশা আর তার জীবগুলোকে।

দিশা মদ্দা ঘোড়াটাকে দৌড় করাতে লাগল। লোকগুলো চোখ বড় বড় করে দেখতে লাগল দিশার কেরামতি। এ কেমন আজব জীব, যা কিনা অবিশ্বাস্য দুরন্ত বেগে দৌড়তে পারে! তা আবার আস্ত একটা মানুষকে পিঠে নিয়ে!

ঐ ঘোড়ার পিঠে চড়েই দিশা দুরন্ত গতিতে ছুটে গেল। হাতে উদ্যত বর্শা। হঠাৎ সে বর্শা ছুঁড়ে বিদ্ধ করল দ্রুত ধাবমান এক শৃগালকে।

খবরটা রটে গেল বিদ্যুৎ-গতিতে। পিলপিল করে চারদিক থেকে লোক এসে জড়ো হতে লাগল নদীর তীরে।

সেনা প্রধানের কানে খবরটা পৌঁছতে এক মুহূর্ত দেরি হলো না। আটদশজন বাহকের কাঁধে একটা লম্বা কাঠের আসনে বসে প্রধান পৌঁছল অকুস্থলে। মাথায় ধাতুর শিরস্ত্রাণ। গলায় মূল্যবান নানাবর্ণের পাথরে তৈরি মালা। প্রধানের হাতে একটি ধাতুনির্মিত অস্ত্র।

কাঠের আসনটি নীচে নামানো হলো। প্রধান উঠে দাঁড়াল।

দূর থেকে মানুষটির সাজসজ্জা দেখে দিশা ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল। সে এমন পোশাক তার এতখানি

বয়সে কোথাও দেখেনি। তাছাড়া এ অঞ্চলের মানুষগুলো আকারে প্রকারে কেমন একটু ভিন্ন ধরনের।

জমকালো পোশাক-পরা মানুষটি এগিয়ে এল দিশার দিকে। তার চোখেমুখে বিস্ময় ফুটে বেরুচ্ছে। সে দিশাকে যত না দেখছে, তার জীবগুলোর দিকে অবাক চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে।

ইতিমধ্যে নানারকম হাতিয়ারে সজ্জিত একদল মানুষ এসে গেল। তারা প্রধানের পাশে এসে দাঁড়াল।

এবার দর্শকেরা চেঁচিয়ে দিশাকে ঐ আজব জীবের পিঠে উঠে কসরৎ দেখাতে বলল।

দিশা ওদের ভাষা না বুঝলেও ইঙ্গিতে সবই বুঝল। সে লাফিয়ে উঠে পড়ল তার প্রিয় ঘোড়ার ওপর। অন্য ঘোড়াগুলো তখন খেজুর গাছের তলায় দাঁড়িয়ে মদ্দা ঘোড়াটার কেরামতি দেখছে।

দিশা ঘোড়ার পেটে কয়েকটা গুঁতো মারতেই সে বিদ্যুৎ-ঝলকে বেরিয়ে গেল। নদীর তীর ধরে ছুটছে তো ছুটছেই। প্রধান থেকে সবার মুখ তখন হাঁ হয়ে গেছে। বাঁক ঘুরে দিশা চোখের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিছু পরে আবার ফিরে এল সেই গতিতে।

এবার উল্টো দিকে ছুটল ঘোড়া। সামনে একটা চওড়া নালা দিয়ে জল বয়ে যাচ্ছিল। নদী থেকে চাষের জল নেবার জন্যে খোঁড়া হয়েছে এই নালা। দিশা তার লতার তৈরি লাগামখানা টানতেই ঘোড়াটা তীব্রবেগে লাফ দিয়ে নালাটা পার হয়ে গেল। আবার কিছুপথ দৌড়ে গিয়ে ফিরে দাঁড়াল। ঠিক আগের মতো তীব্রবেগে আবার ছুটে এল। এখন দর্শকরা ঘোড়াটাকে মুখোমুখি দেখতে পাচ্ছে। নালার কাছে এসে ঘোড়াটা লাফিয়ে উঠল। মনে হলো গনগনে লাল একটা আগুনের শিখা দপ করে জ্বলে উঠল। মুহূর্তে নালা পার হয়ে সওয়ার পিঠে ঘোড়াটা চলে এল এপারে। এবার ভল্ল হাতে তুলে দিশা ছুটে আসছে জনতার দিকে। ভয়ে অনেকেই এদিক ওদিক ছিটকে পড়ল। দুর্জয় যৌবনের শক্তিতে ফুটছে দিশা। একসময় ছুটন্ত অশ্বে বসেই ছুঁড়ল তার ভল্লখানা। বাতাস চিরে সে ভল্ল গিয়ে বিঁধল খেজুর গাছের কাণ্ডে।

সমাদরে দিশাকে নিয়ে যাওয়া হলো গোষ্ঠীপতির দরবারে। একটা পাথরে গড়া আসনে বসেছিলেন দলপতি। তাঁর দু'দিকে দু'দল অস্ত্রধারী দেহরক্ষী। ঝলমলে পোশাক, ঝকঝকে শিরস্ত্রাণে অদ্ভুত মানিয়েছিল গোষ্ঠীপতিকে।

দিশা দেখল, তারা যেমন পাথরের ওপর পাথর সাজিয়ে ঘর বানায়, এখানেও তাই, তবে আকারে ও তৈরির কৌশলে আলাদা। পাথর কেটে ভারী সুন্দর করে তৈরি হয়েছে প্রশস্ত ঘরগুলো। বহু কক্ষ, সামনে লম্বা দালান। এ ধরনের ঘরবাড়ি কখনও দেখেনি দিশা। বিশাল পাথরকে ঘষে মেজে ওপরে তোলা হয়েছে। চওড়া থামের মাথায় বসানো হয়েছে সেগুলো। তার ওপর আড়ে আড়ে চাপানো হয়েছে লম্বা সরু পাথর। সবার ওপর পাতলা চৌকো পাথরের ছাউনি।

গোষ্ঠীপতিকে নত হয়ে অভিবাদন করল সেনাপতি। এসব রীতি দিশাদের গোষ্ঠীতে নেই। কেবল ভিন্ন দলের সঙ্গে লড়াইতে জয়ী হলে দলপতিকে কাঁধে তুলে নৃত্যের রীতি আছে।

দিশা সেনাপতিকে অনুকরণ করে গোষ্ঠীপতিকে অভিবাদন জানাল।

সেনা-প্রধান দিশার অপরিচিত ভাষায় গোষ্ঠীপতিকে কি সব বলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দলপতি তার সভার লোকজনসহ বাইরে বেরিয়ে এলেন। তাঁর শিরস্ত্রাণে আলো পড়ে ঝলমল করে উঠল। দিশার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। সে কখনো এ ধরনের সাজসজ্জা দেখেনি।

সেনা-প্রধানের ইঙ্গিতে দিশাকে সব কটা ঘোড়ায় উঠে খেলা দেখাতে হলো। দিশা, এইসব উন্নত ধরনের ঘরবাড়ি, মানুষজন দেখে যত না মুগ্ধ হলো, নতুন মানুষগুলো এই আজব জীবগুলোর কেরামতি দেখে তার চেয়েও তাজ্জব বনে গেল।

গোষ্ঠীপতি এগিয়ে এসে দিশার কাঁধে হাত রেখে তারিফ করতে লাগলেন।

দিশাকে খাতির করে একটি ঘরে থাকতে দেওয়া হলো। এমন সব খাবার দেওয়া হলো যার এক কণা স্বাদও দিশার জিভ কোনওদিন পায়নি।

অনেকগুলো দিন পথচলার শ্রান্তিতে দিশার চোখে ঘুম নামল। সে ঘরের ভেতর একটি পাথরের বেদিতে শুয়ে পড়ল।

অপরাহ্ণের দিকে ঘুম ভেঙে গেল তার। মাথার দিকে একটা ঘুলঘুলি। সেই ঘুলঘুলির ছিদ্রপথে হু হু করে ঠাণ্ডা একটা হাওয়া ঢুকে আসছিল। দিশা তার বেদির ওপর উঠে বসে ঘুলঘুলির দিকে চোখ ফেলল। ঐ তো সেই নদী, তীর জুড়ে সবুজের ঢেউ। দিশা অবাক হয়ে দেখল, কাতারে কাতারে মানুষজন আসছে। ওরা গোষ্ঠীপতির বিরাট বাড়িখানার দিকেই আসছিল।

দিশা বাইরে বেরিয়ে এল। আশ্চর্য! এরই ভেতর মানুষে মানুষে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত প্রান্তর ভরে গেছে।

প্রান্তর থেকে কিছুটা উঁচুতে বড় বড় গাছের ভেতর গোষ্ঠীপতির বড় বাড়ি। ঐ গাছগুলোর সঙ্গে শক্ত লতার রজ্জুতে বাঁধা ছিল ঘোড়াগুলো। তারা ঘাস খাচ্ছিল।

সমবেত লোকেরা অবাক হয়ে দেখছিল আজব জীবগুলোকে।

দিশাকে তার জন্য নির্দিষ্ট কক্ষটিতে পাঠানোর আগে এক ধরনের পরিচ্ছদ পরতে দেওয়া হয়েছিল। সে নিজে এ ধরনের আচ্ছাদনের ব্যবহার জানত না। তাকে একটি লোক এসে পরিচ্ছদটি পরার কায়দা শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছিল।

এখন দিশা দেখতে পেল, সব কটি মানুষই তার মতো পরিচ্ছদ পরে এসেছে। কোমর থেকে হাঁটু অবধি সাদা নরম এক ধরনের আচ্ছাদন।

পুরুষের দল থেকে সম্পূর্ণ আলাদা একটি জায়গায় একদল মেয়ে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের পোশাক কাঁধ থেকে সারা শরীর ঢেকে নেমে এসেছে পায়ের গোছ অবধি। পরিপাটি মাথার চুল। কোনকিছু তন্তুতে ধাতুর পাত গেঁথে সেটি মাথার চারদিকে চুল ঘিরে সাজানো হয়েছে। ঐ তন্তু থেকে কপালের ওপর ঝুলছে একটি ফুল। ফোটা অথবা আধফোটা।

মেয়েদের এই অপরূপ শোভা দেখে বুকের ভেতরটা তোলপাড় করে উঠল দিশার। সঙ্গে সঙ্গে চোখের ওপর ফুটে উঠল নিজের গোষ্ঠীর মেয়েদের ছবি। কোমর অবধি নেমে এসেছে চুলের জটা। বুক অনাবৃত। কোমর ঘিরে পশুচর্মের সামান্য আচ্ছাদন।

পাশাপাশি দুটো ছবি দেখতে দেখতে নিজের গোষ্ঠীর মেয়েদের ওপর অদ্ভুত এক ধরনের বিরাগ জন্মাল তার।

দিশার চিন্তার জাল ছিঁড়ে দিয়ে তার পাশে এসে দাঁড়াল একটি মানুষ। গোষ্ঠীপতির এই দেহরক্ষীটিকে আগেই দেখেছিল দিশা। সে রক্ষীর ইঙ্গিতে তার সঙ্গে সঙ্গে গোষ্ঠীপতির সামনে এসে দাঁড়াল।

দলপতির ভাষা বুঝল না দিশা, তবে এটুকু বুঝল, তাকে সবার সামনে আর একবার ঘোড়ার খেলা দেখাতে হবে।

দিশা এ অঞ্চলটাকে যত দেখছে ততই অভিভূত হচ্ছে। সে এত সংখ্যায় এমন সুসজ্জিত পুরুষ ও নারী কখনও দেখেনি।

দুটো ঘোড়া একই সঙ্গে ছুটিয়ে নিয়ে চলল দিশা। মুখ শক্ত লতার বাঁধনে বাঁধা। আশ্চর্য দক্ষতায় সে একবার এ ঘোড়া, একবার ও ঘোড়া বদল করতে লাগল। মেয়েদের সামনে দিয়ে চলে যাবার সময় সে উঠে দাঁড়িয়ে দুটো ঘোড়ার পিঠে দুটো পা রাখল।

এ এক অদ্ভুত দৃশ্য। উল্লাসে হৈ হৈ করে উঠল জনতা। ফিরে আসার সময় ঘোড়ার ওপর বসে সে মেয়েদের মুখগুলো দেখতে দেখতে এল।

এখন দিশার দিকে মুখ করে ঘুরে দাঁড়িয়েছে মেয়েরা। তারা হাত নেড়ে নেড়ে উচ্ছ্বাসে কিছু বলছে। তাদের ভাষা বুঝছে না দিশা, কিন্তু তাদের চোখের চাহনি, মুখের হাসি তার বুকের ভেতর দাগ কেটে দিয়ে যাচ্ছে।

শেষ খেলাটা দেখাল দিশা তার সেরা ঘোড়ায় চড়ে। আশপাশে নদী বরাবর চলে গেছে ছোট-বড় টিলা পাহাড়। ভাঙাচোরা, বড়ছোট পাথরে ভর্তি তার গা। ঝোপ জাতীয় গাছে টিলাগুলো আকীর্ণ। মানুষ অনেক কষ্টে খানিক পথ উঠেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

দিশা সামনের উঁচু টিলায় উঠতে লাগল। ঘোড়া অনেক সাবধানী জীব। সে পাথরের চাঁইগুলোর ওপর

লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে আর কেশর ধরে তার ওপব সওয়ার হয়ে বসে আছে দিশা। যাবা সে দৃশ্য দেখছে তাদের যেন শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। যে কোন মুহূর্তে সওয়ার নিয়ে ঘোড়াটা নীচে পড়ে যেতে পারে। আর তার ফলে দুটো প্রাণীরই সারা শরীর থেঁতলে, গুঁড়িয়ে তাল পাকিয়ে যাবে।

খাড়াই পাহাড়টায় একসময় ঘোড়াটা উঠে গেল পিঠে সওয়ার নিয়ে। এখন দুটো প্রাণীকেই অনেক ছোট দেখাচ্ছে। কিন্তু পাহাড়ের একেবারে চূড়ার ওপর সওয়ার হয়ে বসে থাকা দিশাকে এ জগতের কোনও জীব বলে মনে হচ্ছিল না। অদ্ভুত শক্তিমান অলৌকিক কোনও জগতের অধিবাসী বলে মনে হচ্ছিল।

এত বড় জনতার মুখে কোনও কথা নেই। তখন শত সহস্র চোখের দৃষ্টি এক বিন্দুতে স্থির হয়ে আছে।

মেয়েদের বুকের ভেতর গুরু গুরু ধ্বনি। এত উঁচু পাহাড়টার ওপর থেকে ওরা নেমে আসবে কি করে!

নামতে লাগল দিশা। পাথরের স্তূপে পা রেখে রেখে অবলীলায় পাহাড় বেয়ে নেমে এল ঘোড়া আর ঘোড়সওয়ার।

শেষ পথটুকু ঘোড়াকে তীব্রবেগে ছুটিয়ে জনতার পাশ দিয়ে দিশা এসে দাঁড়াল গোষ্ঠীপতির সামনে।

ঘোড়া থেকে নেমে সে জনতার দিকে মুখ করে দাঁড়াতেই আকাশ ফাটিয়ে সমবেত জনতা তার জয়ধ্বনি দিতে লাগল। মেয়েরা উল্লাসে হাত নাড়তে নাড়তে তাদের মনের ভাব প্রকাশ করে চলল।

গোষ্ঠীপতি উঠে দাঁড়িয়ে দিশাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। জনতা আর একবার উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ল।

দলপতি তাঁর গলার মালাখানা খুলে পরিয়ে দিলেন দিশার গলায়। পাথরে গাঁথা মালার মাঝখানে একটা ধাতুর চাকতি। সেই চাকতিতে খোদাই করা শকুনি আর সাপের ছবি। এবার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সেনা-প্রধানের কাছ থেকে তীরধনু চেয়ে নিয়ে দলপতি দিশার হাতে তুলে দিলেন। জনতার দিকে তাকিয়ে কি সব বলে গেলেন। জনতা হাত নেড়ে মুখে শব্দ তুলে দলপতিকে সমর্থন জানাল। দিশা গোষ্ঠীপতির এই আচরণের অর্থ বুঝল না। তবে এটুকু অনুভব করল, তার সম্বন্ধে কিছু বলা হচ্ছে।

দলপতির হাত থেকে তীরধনু পেয়ে দিশা এক কাণ্ড করে বসল। সে তীর ছুঁড়ল খেজুর গাছটা লক্ষ করে, যার তলায় মেয়েরা দাঁড়িয়েছিল। খেজুরের কাঁদিতে তীর লেগে ঝর ঝর করে ঝরে পড়ল পাকা ফল। মেয়েরা আনন্দে হৈচৈ করে ফল কুড়োতে লাগল।

ঠিক সেই সময় দলপতি ইঙ্গিতে দিশাকে জিজ্ঞেস করলেন, কি চাই তোমার? তুমি আমার কাছ থেকে তোমার ইচ্ছে মতো কিচু চেয়ে নাও।

দিশা কথা না বুঝলেও দলপতির ইঙ্গিত বুঝল। সে অমনি খুশিতে উচ্ছল মেয়েদের দিকে হাত তুলে দেখাল। সে নারী চায়। অপরিচিতা নারীতেই তার তীব্র আসক্তি।

দলপতি মাথা নাড়লেন।

রাতে আহারের পর তার জন্য নির্দিষ্ট ঘরটিতে ঢুকল দিশা। ঘুলঘুলির ছিদ্রপথে চাঁদের আলো লুটিয়ে পড়েছিল মেঝের ওপর। সেই আলোতে সে দেখল, একটি মেয়ে মুখ নিচু কবে বসে আছে। সুন্দর পরিচ্ছদে গা ঢেকে, ফুলে আর পাথরের মালায় নিজেকে ভারী আকর্ষণীয় করে সাজিয়ে তুলেছে সে।

দিশার দেহের মধ্যে রক্ত দুরন্ত গতিতে ছুটতে লাগল। দিশা অনুভব করল, তার তেজী ঘোড়াটা তাকে নিয়ে মাঠঘাট ভেঙে ছুটেছে।

রাতে দু'জনে কিছু কথা বলল, কিন্তু কেউ কারুর ভাষা বুঝল না। তবে শরীরের ভাষা সব মানুষেরই সমান, সব দেশেই এক। সে ভাষা বুঝতে দুজনের কারুরই অসুবিধা হলো না। সারা রাত মেয়েটিকে বুকের মধ্যে ধরে রাখল দিশা। ভোর রাতে ঘুমন্ত বিদেশীকে একা শয্যায় বেখে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল মেয়েটি।

পরদিন রাতে দিশা ঘরে ঢুকে দেখল, মেয়েটি বসে আছে। সকালে ঘুম ভাঙার পর সে মেয়েটিকে দেখতে না পেয়ে ভারী মুষড়ে পড়েছিল। সারাদিন নানা কাজের ফাঁকে তার কথা ভেবেছে। শেষে রাতের বেলা তাকে দেখতে পেয়ে আনন্দে উদ্দাম হয়ে উঠল দিশা। সে ছুটে গিয়ে মেয়েটির নত মুখখানা তুলে ধরে বলল, সারাদিন কোথায় ছিলে আমাকে ফেলে?

চাঁদের আলো আজও এসে পড়েছে মেয়েটির মুখে। দিশা হঠাৎ চমকে উঠল, এ তো কালকের মেয়ে নয়! তেমনি সাজসজ্জা, তেমনি পরিচ্ছদ, কিন্তু মুখখানা আলাদা।

দিশা প্রথমে অবাক হল, কিছুটা কষ্টও পেল প্রথম রাতের মেয়েটির কথা ভেবে, কিন্তু দ্বিতীয় রাতের নতুন মেয়েটি ভরিয়ে দিল দিশার দেহমন।

যে কদিন গোষ্ঠীপতির মহলে রইল দিশা, সে কদিন নতুন এক একটি করে মেয়েকে লাভ করল সে।

গোষ্ঠীপতি একদিন দিশাকে ডেকে তাঁর মনের কথাটি জানালেন। তিনি যুদ্ধের জন্য একটি ঘোড়সওয়ার বাহিনী তৈরি করতে চান। এই দুরন্ত গতি জীবটির পিঠে বসে লড়াই চালালে জয় সহজেই হাতের মুঠোয় এসে যাবে।

এই পরিকল্পনায় চাই অনেকগুলো ঘোড়া। আর সেই ঘোড়ার পাল যোগাড় করে দেবার ভার নিতে হবে দিশাকে। শুধু তাই নয়, যে ঘোড়সওয়ার বাহিনীটি গড়ে উঠবে, তার পুরো দায়িত্ব নিতে হবে দিশাকেই।

দিশা দলপতির কথায় ও ইঙ্গিতে সব ব্যাপারটাই বুঝে নিল। সে মাথা নেড়ে তার সম্মতি জানাল। ঘোড়া ধরা এবং তাদের বশ মানানো যে সহজ কাজ নয়, তা জানিয়ে দিতে ভুলল না। তবে সে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এ কাজটি সম্পন্ন করবে বলে গোষ্ঠীপতিকে কথা দিল।

দুদিন পরে সেনা-প্রধানের সঙ্গে পরামর্শ হল গোষ্ঠীপতির।

সেনা-প্রধান বলল, ঘোড়া নিয়ে যুদ্ধের যে পরিকল্পনা আপনি করেছেন, তা যে অভিনব সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে এখুনি এই বিদেশীকে ঘোড়া সংগ্রহের কাজে না লাগিয়ে একবার একে পাঠান পুব দিকে মরু অঞ্চলে। ওখানে সিনাই পাহাড়ে আর মরু অঞ্চলে বেশ কিছু শক্তিশালী গোষ্ঠীর বাস। ওদের সঙ্গে মাঝে মাঝে আমাদের বিবাদ বাধে। ঐ লোকগুলোর সম্বন্ধে আগে খোঁজখবর নিয়ে আসুক। তারপর ঘোড়া আনতে পাঠাবেন।

গোষ্ঠীপতি বললেন, এ কাজের জন্য আমাদের চর রয়েছে।

সেনা-প্রধান বলল, সেবার ওরা একজন চরের মুণ্ডু কেটে গাধার পিঠে বেঁধে ছেড়ে দিয়ে গিয়েছিল নদীর ধারে।

এর ক্ষেত্রেও তাই হতে পারে।

হতে পারে, তবে সম্ভাবনা কম।

গোষ্ঠীপতি বললেন, কেন?

সেনা-প্রধান বলল, মরু অঞ্চলের মানুষগুলো আমাদের গোষ্ঠীর মানুষদের আকার-প্রকার চেনে। তাই বলছিলাম, এ বিদেশীকে ওদের ভেতর পাঠালে ওরা কোনরকম সন্দেহ করতে পারবে না। এর মুখ-চোখের গড়ন আমাদের থেকে একেবারেই আলাদা।

গোষ্ঠীপতি বললেন, বেশ, তাই হবে। ঘোড়সওয়ারদের ভার ওর ওপর দেবার আগে ওর শক্তি কিছুটা যাচাই হয়ে যাক।

সেনাপতি বলল, আমারও সেই ইচ্ছে, গোষ্ঠীপ্রধান।

দিশাকে সেদিনই ডেকে পঠিয়ে গোষ্ঠীপতি তাঁর পরিকল্পনার কথা জানিয়ে দিলেন। দিশা খুশী হয়ে বলল, নতুন দেশ নতুন মানুষকে দেখব, এর চেয়ে আনন্দ আমার আর কিছুতে নেই।

গোষ্ঠীপতি দিশার ভাষা বুঝলেন না, তবে এই পরিকল্পনায় তার যে সম্মতি আছে তা বুঝে নিলেন।

রাতে শয়নকক্ষে ঢুকে দিশা রোজকার মত নতমুখী একটি নারীকে দেখতে পেল। কাল প্রভাতেই মরুমুখে শুরু হবে তার পথচলা। সম্পূর্ণ অজানা পথ, অপরিচিত জায়গা। সে গোষ্ঠীর মানুষজনের চরিত্র সম্বন্ধে তার কোন ধারণাই নেই। তবু মনের ভেতর এতটুকু ভয় নেই তার। যৌবনের প্রবল এক শক্তি জোয়ারের মতো তাকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। অদ্ভুত অন্ধ এক আকর্ষণে সে ছুটে চলে। তার কামনা, নারী। অপরিচিত মুখের ওপর দুর্বার তার আকর্ষণ।

ঘরের ভেতর চাঁদের আলো আজ রাতে একটু বাঁকা হয়ে পড়েছে। মেয়েটি আজ চাঁদের সীমানায় বসে

নেই। আবছা আলো অন্ধকারে তাকে বেশ রহস্যময় বলে মনে হচ্ছে। দিশা হাঁটু গেড়ে বসে মেয়েটির হাত ধরে বলল, তোমাদের এ দেশ আমার খুব ভাল লেগেছে, আর তোমরাও আমাকে খুব আনন্দ দিলে। কালই আমি চলে যাচ্ছি তোমাদের দেশ ছেড়ে।

মেয়েটি বুঝল, দিশা তার চলে যাবার কথাই বলছে।

সে উঠে দাঁড়াল। দিশার হাত ধরে বলল, এসো আমার সঙ্গে, একটু বাইরে ঘুরে আসি।

দিশা বলল, কোথায় নিয়ে যেতে চাও, চল।

মেয়েটি আশ্চর্য দক্ষতায় ঘরের মেঝের একটি বড় পাথর সরিয়ে ফেলল। দিশার হাত ধরে বলল, ভয় নেই, নেমে এসো আমার সঙ্গে।

অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথ। কোথাও একবিন্দু আলোর চিহ্নমাত্র নেই। শক্ত হাতের বাঁধনে দিশাকে ধরে রেখেছে রহস্যময়ী মেয়েটি। একজনের টানে অন্ধের মতো চলেছে আর একজন। দুজনের নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

বুকে একটা চাপ অনুভব করছে দিশা। অন্ধকারের চাপ না ভয়ের! কে এই নারী? কি এর উদ্দেশ্য? কোথায় কোন গভীর গহ্বরে ফেলে দিতে নিয়ে চলেছে তাকে ?

মৃত্যুর ভয় ধীরে ধীরে সরে গিয়ে একটা শিহরণ জাগছে সারা শরীরে। মিষ্টি কোন ফুলের গন্ধ ভেসে এসে নাকের ভেতর দিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে সমস্ত চৈতন্যে। দিশা বুঝতে পারছে, এ গোষ্ঠীর মেয়েরা চুলে যে ফুল গেঁথে রাখে, তারই গন্ধ ভেসে আসছে ভারী বাতাসে। শুধু কি ফুলের গন্ধ? তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে মাদক একটা গন্ধ, যেটা নারীর শরীর থেকে উঠে আসে।

কুলকুল একটা শব্দ শোনা যাচ্ছিল। ক্রমে সে শব্দটা জোরে কানে এসে পৌঁছল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে অস্পষ্ট একটা আলোর আভা চোখে এসে লাগল। মেয়েটি উঁচু পাথরের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতে বলল, সাবধানে পা ফেলে ওপরে উঠে এসো।

দিশা মেয়েটির হাত ধরে ওপরে উঠল। কয়েকটা খেজুর গাছের জটলার মাঝে পাথরে গাঁথা সুড়ঙ্গটা শেষ হয়েছে।

দিশা উঠেই দেখল, তিনটি মেয়ে বসে আছে সেখানে। ওরা উঠে দাঁড়ানোর পরেই ভারী একটা চৌকোণা পাথর মেয়েগুলো সুড়ঙ্গের মুখে চাপিয়ে দিলে।

সামনেই নদী। নদী থেকে একটা খাল বয়ে এসে খেজুর কুঞ্জটির পাশ দিয়ে দূরে শস্যক্ষেত্রের দিকে চলে গেছে।

ঐ খালে একটা নৌকো বাঁধা। ওরা পাঁচজনে ঐ নৌকোয় উঠে পড়ল। দিশা অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছে। সে নদীতে নৌকো ভেসে যেতে দেখেছে। তবে কোনদিন নৌকোতে ওঠেনি। আজ নৌকোয় উঠে সারা শরীরে কেমন এক ধরনের রোমাঞ্চ অনুভব করল।

মেয়েগুলো এক এক খণ্ড কাঠের টুকরো দিয়ে জলে আঘাত করছে, আর নৌকোটা এগিয়ে চলেছে।

খাল পেরিয়ে নদীতে পড়ামাত্র নৌকোটা স্রোতের টানে তরতর করে এগিয়ে চলল।

বেশ খানিক দূর এসে নদীর ওপারে একটা ঝাঁকড়া গাছের তলায় নৌকোটা বাঁধা হলো। আবছা চাঁদের আলোয় গাছটার আড়ালে একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছিল। মেয়েগুলো পথ দেখিয়ে দিশাকে এনে তুলল সেই বাড়িতে।

এতক্ষণ দিশার সেই রাতের সঙ্গিনীর মুখখানা ঢাকা ছিল একটা পাতলা আবরণে। এখন চাঁদের আলোয় মুখের আবরণ সরিয়ে ফেলল মেয়েটি। দিশা অবাক হয়ে দেখল, প্রথম রাত্রিতে যে মেয়েকে সে আদরে সোহাগে ভরে দিয়েছিল, সেই মেয়েটিই তার সামনে দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু হাসছে।

গভীর রাত অব্দি মেয়েটি দিশার দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে রইল। তাদের ভেতর আকারে ইঙ্গিতে যে কথা হলো, তা বুঝল দুজনেই।

দিশা বলল, সেই প্রথম দিনটিতে তোমাকে দেখলাম, তারপর নিরুদ্দেশ। কি নাম তোমার?

রাহী। আমি গোষ্ঠীপতি আমনের প্রধান নারী।

দিশা বিস্ময়ে হতবাক হলো। একসময় বলল, একি সম্ভব! গোষ্ঠীপতির প্রধান রমণী আমাকে তৃপ্তি দেবার জন্য দুটো রাত আমার বুকের ভেতর ধরা দিল!

এ অসম্ভব নয়, বিদেশী যুবক। তুমি নারী চেয়েছিলে গোষ্ঠীপতির কাছে। তিনি আমার ওপর ভার দিয়েছিলেন তোমার জন্য প্রতি রাতে একটি করে নারী যোগান দেবার। তাঁর হারেমে বহু নারী। তাদের সেবার জন্য অগণিত দাসী। সেই দাসীর ভেতর থেকে একজন করে পাঠাতে হবে তোমার ভোগের জন্য, এই ছিল নির্দেশ। কিন্তু বিদেশী অতিথির সঙ্গে পরিচয়ের ইচ্ছা প্রবল হলো, তাই সবার চোখের আড়ালে নিজেই চলে এলাম প্রথম রাত্রিতে।

কিন্তু আজ রাতে আবার এলে কেন? কাল সূর্য ওঠার আগে তোমার দেশ ছেড়ে যাচ্ছি বলে?

রাহী হেসে উঠল। হাসি থামলে বলল, না, সেজন্যে এ রাতে তোমার কাছে আসিনি। তোমার সামনে ভয়ানক বিপদ। সেই বিপদ সম্বন্ধে তোমাকে সাবধান করে দেব বলে আজ আবার এতদূরে তোমাকে নিয়ে আসতে হলো।

আমার বিপদ! বিস্মিত হলো দিশা!

আবার বলল, তুমি কি গোষ্ঠীপতি আমনের শত্রুদের সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে যাচ্ছি বলে ভয় পাচ্ছ?

না, সেটা চিন্তার কারণ হলেও গভীর ভয়ের কারণ নয়।

তবে?

সেনা-প্রধান তিহার তোমাকে হত্যা করার পরিকল্পনা নিয়েছে।

সেনা-প্রধান আমাকে হত্যা করতে চায়, কিন্তু কেন?

তোমাকে গোষ্ঠীপতি ভালবাসেন বলে। তিনি জনতাকে ডেকে তাদের সামনে তোমার শক্তির পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। তাছাড়া তোমাকে তিনি ঘোড়সওয়ার বাহিনীর পরিচালনায় রাখতে চান। এতে সেনা-প্রধান বিচলিত হয়ে পড়েছে।

আমি তো তার পদ কেড়ে নিচ্ছি না। আর তাছাড়া সেনা-প্রধান হবার কোনও ইচ্ছাই আমার নেই।

তোমার ইচ্ছা থাক আর না থাক, সেনাপতি তিহার ভয় পাচ্ছে। তাই তোমাকে মরু অঞ্চলে পাঠাবার পরিকল্পনা তার, আবার মাঝপথে তার নিযুক্ত আততায়ীকে লাগিয়ে তোমাকে হত্যা করার পরিকল্পনাও তার।

আমাকে হত্যা করতে চায় সেনা-প্রধান, কিন্তু তুমি এ খবর পেলে কি করে? গোষ্ঠীপতি যা জানতে পারেননি, তুমিই বা তা জানলে কি করে?

গোষ্ঠীপতিকে হত্যা করে সেনা-প্রধান তাঁর পদটি অধিকার করতে চায়। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিশাল হারেমটিও। আমি তার মনোভাবটি আঁচ করতে পেরে তার সঙ্গে ভালবাসার অভিনয় করে যাচ্ছি।

এতে কার কি লাভ?

আমাকে সেনাপতি তিহার তার ভালবাসার পাত্রী ভেবে সব কথা খুলে বলে ফেলে। আর আমি আগেভাগে সাবধান হয়ে যাই। তোমাকেও তাই সাবধান করে দিতে পারলাম বিদেশী বন্ধু।

দিশা বলল, সেনা-প্রধানকে তুমি ছলনা করতে পার, কিন্তু আমাকে এতখানি ভালবাসা দেখাবার কারণ?

রাহী বলল, বিদেশী যুবক, প্রথম দেখাতেই তোমাকে ভাল লেগে গিয়েছিল। তোমার ঘোড়ার খেলা দেখে সবার মতো আমিও মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু তারপর আমার মনে হয়েছিল, গোষ্ঠীপতিকে শয়তান তিহারের হাত থেকে যদি কেউ বাঁচাতে পারে সে তুমি।

দিশা বলল, তুমি কি সত্যি গোষ্ঠীপতি আমনকে ভালবাস?

বুক চাপড়ে হাহাকার করে কাঁদতে লাগল রাহী। দিশার হাতখানা জড়িয়ে ধরে বলল, তাকে রক্ষা করব বলে তোমাদের কাছে আমার শরীরটা বিলিয়ে দিতেও কোনরকম সংকোচ বোধ করিনি।

দিশা বলল, এ বাড়ি কাব?

আমার বাবার। তিনি গত হয়েছেন। এই পোড়ো বাড়িটাতে মাঝে মাঝে আমি পালিয়ে আসি। এখানে এলে আমি বুকভরে নিঃশ্বাস নিতে পারি। চিৎকার করে কাঁদতে পারি।

আমি তোমার স্বামীকে কিভাবে রক্ষা করতে পারি?

তুমি মরু অঞ্চলে না গিয়ে ঘোড়া সংগ্রহের কাজে দেশে ফিরে যাও। ঐ ঘোড়া নিয়ে এসে ঘোড়সওয়ার বাহিনীর প্রধান হয়ে তিহারের মুখোমুখি দাঁড়াও।

দিশা বলল, আমি অতি সামান্য একটা মানুষ। যে গোষ্ঠীতে থাকি তারাও অতি সাধারণ। তোমাদের মতো এমন উন্নত ব্যবস্থা আমাদের নেই। আমরা সাধারণভাবে জীবনটা কাটিয়ে দি। ছেলেবেলা থেকে আমি একটু দুর্দান্ত প্রকৃতির। প্রচণ্ড গতিশীল এই জীবটাকে ধরব আর বশ মানাব, এই ছিল আমার প্রতিজ্ঞা। তাই করেছি আমি। ঘোড়ার খেলা দেখিয়ে বেড়ানোই আমার কাজ। তার বিনিময়ে কখনও চামড়া, কখনও লবণ, আবার কখনও বা নারী মিলে যায়। আমি তোমাদের মতো বড় মানুষের খেলায় জড়িয়ে পড়তে চাই না। তবে মরু অঞ্চলে যাবার একটা আগ্রহ আমার আছে।

রাহী বলল, বন্ধু হিসেবে কি আমি তোমার কাছ থেকে কিছু সাহায্য চাইতে পারি না?

দিশা বলল, মরু অঞ্চলে যাবার পথে তোমার কথা নিশ্চয়ই ভাবব। আমার সামান্য শক্তিতে তোমার যতটুকু উপকার করা সম্ভব তা আমি দেখব। তবে তুমি তিহারকে যে কোন রকমে পার কিছুদিন এই অবস্থায় আটকে রাখ।

রাহী বলল, তুমি যখন মরু অঞ্চলে যাবেই, তখন তোমার বিপদের কথাগুলো ভাল করে জেনে নাও।

একটু থেমে রাহী আবার বলল, তোমাকে পথে হত্যা করার জন্য তিহার যাকে নিযুক্ত করেছে, সে এখন পূব দিকে অনেকখানি পথ এগিয়ে গেছে। একটা গাধার পিঠে চড়ে চলেছে সে। বয়স হয়েছে লোকটার। তাকে দেখলে ভারী ভাল মানুষ বলে মনে হবে। কিন্তু সেই লোকটা ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর। সে তোমাকে আদর করে কাছে ডাকবে। সঙ্গে কিছু সময় বিশ্রাম করতে বলবে। গাধার পিঠ থেকে খাবার আর জল নামিয়ে তার সঙ্গে তোমাকে কিছু খেতেও অনুরোধ করবে। আর ঠিক সেই সময় তোমার চোখে ধুলো দিয়ে সে তোমাব খাবারে বিষ মিশিয়ে দেবে। এমন তীব্র সে বিষ যে তুমি জিভে ঠেকানো মাত্রই প্রাণ হারিয়ে মাটিতে ঢলে পড়বে।

রাহীর কথা আকার ইঙ্গিতে বুঝতে দিশার কোনও অসুবিধে হলো না।

পরের দিন ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই দিশা তার সেরা ঘোড়াটার পিঠে সওয়ার হয়ে বেরিয়ে গেল। বাকী কটা ঘোড়া রইল গোষ্ঠীপতির পরিচারকদের হেফাজতে।

পথ চলতে দিশার মনের মধ্যে বারবার রাহীর আনাগোনা চলল। এখনও সে যেন বুকের ভেতর রাহীর উত্তাপের ছোঁয়া পাচ্ছিল। নাকে লেগেছিল রাহীর দেহের অদ্ভুত গন্ধ।

সে সারাদিনে অনেকখানি পথ পেরিয়ে এল। ইচ্ছে করেই ঘোড়াকে দৌড় করাল না সে। কিন্তু দিশা পথে সেই হত্যাকারী মানুষটির সন্ধান পেল না।

দিনের সূর্য ডুবে যাবার আগে পশ্চিমের আকাশে রক্তের খানিকটা লাল রঙ ছড়িয়ে দিচ্ছিল। বাঁদিকে গাছপালাবিহীন একটা টিলা। রাতের মতো বিশ্রামের একটা আশ্রয় চাই। ঘোড়া নিয়ে দিশা টিলাটার দিকে এগিয়ে গেল। টিলার কাছে পৌঁছে সে ঘোড়া থেকে নেমে মাথা গোঁজার মতো একটা ঠাঁই খুঁজতে লাগল। একটা গুহা অথবা এগিয়ে আসা পাথরের আচ্ছাদন।

হঠাৎ দিশার কানে এসে বাজল একটা ক্ষীণ শব্দ। কে যেন তাকে ডাক দিচ্ছে। তার কাছে যাবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছে।

দিশা এগিয়ে গেল শব্দ লক্ষ করে। একটা বড় রকমের গুহা। সূর্যাস্তের সময়. তাই গুহার ভেতর ছায়া ঘনিয়ে উঠেছে। একটা গাধা দাঁড়িয়ে আছে গুহার মুখে।

দিশা গুহার সামনে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই হত্যাকারী একটা গিরগিটির মতো বুক আর হাতে পায়ে

ভব রেখে সড়সড় করে বেরিয়ে এল বাইরে।

দিশা দেখল রাহীর বর্ণনা মতো অবিকল সেই লোক।

এখানে একটা ছাড়া দ্বিতীয় গুহা নেই, বেশ বড় গুহা, অনায়াসে আমরা দুজনে এর ভেতর থাকতে পারি।

লোকটার কথা না বুঝলেও হাতের ইশারা আর মুখচোখের ভঙ্গিতে সবই বুঝল দিশা। সে তার নিজের ভাষায় বলল,থাকব বইকি। তোমার কবর তৈরির জন্য আমাকে থাকতেই হবে এখানে।

লোকটি দিশার ভাষা বুঝল না, কিন্তু খুশী হয়ে উঠল।

দিশা তার ঘোড়াটাকে সামনে একটা পাথরের সঙ্গে বেঁধে রেখে গুহার মুখে বসে পড়ল।

লোকটি দিশাকে বলল, কতদূর থেকে আসা হচ্ছে?

নীলনদের দেশ থেকে।

বয়স্ক লোকটি বলল, শুনেছি বটে জায়গাটার নাম, তবে চোখে কোনওদিন দেখিনি।

দিশা মনে মনে হাসল। মুখে বলল, যে দেশ তুমি চোখে দেখনি বলছ, সে দেশে তোমার আর ফিরে গিয়ে কাজ নেই।

লোকটা কি বুঝল সে-ই জানে। দিশার দিকে কতক্ষণ চেয়ে রইল। হঠাৎ সে দিশার একখানা হাত নিজের বুকের কাছে টেনে নিয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল।

দিশা অবাক! কোনও খুনী যে এভাবে তার শিকারকে কাছে পেয়ে কাঁদতে পারে তা কোনও রকমেই তার ধারণাতে আনতে পারল না।

দিশা মানুষটির পিঠে হাত রেখে বলল, কাঁদছ কেন? কি হয়েছে, খুলে বলো আমাকে !

লোকটি তখন অকপটে তার উদ্দেশ্যের কথা দিশাকে জানিয়ে বলল, তোমার মুখের দিকে চেয়ে আমার একটি মাত্র ছেলের মুখ মনে পড়ে গেল, তাই তোমাকে হত্যা করতে পারলাম না।

দিশা বলল, কি করে তোমার ছেলে?

লোকটি বলল, সে অনেক আগে মারা গেছে। আর তাকে মরুভূমির ভেতর একফোঁটা জল না দিয়ে মেরেছে ঐ শয়তান তিহার।

দিশা বিস্মিত হয়ে বলল, কি রকম?

ঐ তিহার আর আমার ছেলে অনেক ছোটবেলার বন্ধু ছিল। বড় হয়ে তিহার হল সেনাপতি আর আমার ছেলে নদী পারাপারের মাঝি।

একরাতে তিহার স্বপ্ন দেখল, সে পশ্চিমের মরুভূমির ভেতর উটের পিঠে চলেছে। সাত সাতটা বালির পাহাড় পেরিয়ে সে একটা মরুদ্যানে এসে পৌঁছল। সেই মরুদ্যানের জলে চোখ পড়তেই দেখল, একটা সোনার পাহাড় ছায়া ফেলেছে। সে মুখ তুলে একপাশে তাকিয়ে দেখল, সোনার তৈরি ছোট্ট একটা পাহাড় ঝকঝক করছে। সে পাগলের মতো পাহাড়টার দিকে ছুটে গেল। কিন্তু কি আশ্চর্য, পাহাড়টা ক্রমাগত সরে সরে যেতে লাগল।

ছুটতে ছুটতে একসময় আছাড় খেয়ে পড়ে গেল তিহার, অমনি ঘুম ভেঙে গেল তার।

এই স্বপ্নটা সত্য মনে করে সে আমার ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে উটের পিঠে চেপে বেরিয়েছিল। পাশাপাশি দুটো উট চলেছিল। আমার ছেলে নিজেই উট চালিয়ে নিয়ে চলেছিল, আর তিহারের উট চালাচ্ছিল তার চালক।

মরুভূমির অনেকখানি ভেতরে ওরা চলে গেল। মরুদ্যানের দেখা মিললে তিহার বলল, আরও এগিয়ে যাই চল, আমার স্বপ্ন মিথ্যে হবার নয়।

আমার ছেলে বাধা দিয়ে বলল, আর এগোলে খাবার, জল দুটোতেই টান পড়বে।

কে কার কথা শোনে! তিহার ওদের প্রায় তাড়িয়ে নিয়ে চলল। কিন্তু আর কয়েক দিন চলার পরও যখন কিছু পাওয়া গেল না, তখন ফিরতে বাধ্য হল তিহার।

ভয়ঙ্কর মরুর ঝড়ের ভেতর পড়ল ওরা। কোনওরকমে উদ্ধার পেয়ে ফেবার পথ খুঁজতে লাগল। আকাশে আগুনের কুণ্ডটা দাউ দাউ করে জ্বলছে। খাবারে টান পড়ল, জল ফুরিয়ে এল। ধূর্ত তিহার একদিন আমার ছেলের জলের পাত্রটা কেড়ে নিয়ে বলল, জল ছাড়া যদি ফিরতে পার তো ফের, নইলে বল তো এখানে তোমাকে কবর দিয়ে রেখে যাই।

আমার ছেলে মরুভূমির সেই অগ্নিকুণ্ডে একফোঁটা জল না পেয়ে বুক ফেটে মরল। চালককে ফোঁটা ফোঁটা জল দিয়ে বাঁচিয়ে রাখল তিহার। সে না থাকলে ফেরার পথ কে দেখাবে!

দিশা বলল, কিন্তু তুমি ঐ শয়তানের কথায় এসব নিষ্ঠুর কাজ করছ কেন?

এ যাতে আমার ওপর পুরোপুরি বিশ্বাস রাখতে পারে সেই চেষ্টা করছি।

তাতে তোমার লাভ ?

ওকেও আমি সুযোগ পেলে নিষ্ঠুরের মতো হত্যা করে আমার ছেলের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেব। সুযোগ পেতে গেলে ওর বিশ্বাসভাজন হতে হবে।

তোমার ছেলেকে যে মরুভূমিতে ওভাবে মারল তিহার, সেটা তুমি জানলে কি করে?

তিহারের চালকই গোপনে সে কথা আমাকে জানিয়েছে।

রাতে গুহামুখে আগুন জ্বলল। বৃদ্ধ খাবার তৈরি করে দিশাকে খেতে দিল। দিশার মনে আর কোন সংশয় ছিল না। সে গভীর তৃপ্তিতে বৃদ্ধের দেওয়া খাবারগুলো খেতে লাগল। বৃদ্ধ অপলক চোখে চেয়ে রইল দিশার মুখের দিকে।

এসব অঞ্চলে দিনে প্রচণ্ড উত্তাপ, আর রাতে ভয়ঙ্কর শীতলতা। দিশা পথশ্রমে ক্লান্ত ছিল, সে শোবার সঙ্গে সঙ্গেই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

মধ্যরাত্রে শয্যা ছেড়ে উঠল বৃদ্ধ। প্রবল শীতে গর্দভের কর্কশ কণ্ঠ বাইরের খোলা জায়গায় থাকার বিরুদ্ধে আপত্তি জানাচ্ছিল। অশ্বটিও তার মনোব্যথা ঐ কণ্ঠস্বরের সঙ্গে যুক্ত করল।

দুটি অবলা জীবের প্রবল প্রতিবাদে রাতের আকাশ তখন খান খান হতে লাগল।

বৃদ্ধ বড় একটি অগ্নিকুণ্ড তৈরি করে গর্দভের পিঠে বয়ে আনা কাঠগুলির সদ্ব্যবহারে লেগে গেল। দুটি অবলা জীবের সঙ্গে সঙ্গে দুটো বুদ্ধিমান জীবও ধীরে ধীরে উত্তপ্ত হয়ে উঠল। এত শব্দ আর ক্রিয়াকর্মের ভেতরেও দিশার গভীর ঘুমে কোনওরকমে চিড় ধরল না।

ভোরের সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে গেল দিশার। বৃদ্ধ মানুষটি তার আগেই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছিল। সে ফিরে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিল।

দিশা বলল, ফিরে গিয়ে কি বলবে তিহারকে ? আমাকে বিষ খাইয়ে মেরেছ, এ কথাটাই বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে বলবে তো?

বৃদ্ধ হেসে বলল, তুমি যখন ফিরে গিয়ে তার সামনে দাঁড়াবে, তখন তিহার আর আমাকে এক মুহূর্ত বাঁচিয়ে রাখবে না।

দিশা বলল, আমি যদি ফিরি, তাহলে ওখানে না গিয়ে সিধে আমার দেশেই ফিরে যাব। তোমার কোনও চিন্তা নেই।

বৃদ্ধ বলল, তোমার ওপর বড় মায়া পড়ে গেছে, তুমি ভাল থাক, তাড়াতাড়ি দেশে ফিরে যাও এই চাই।

সূর্য ওঠার আগেই দু'জনে দুদিকে চলে গেল।

কয়েকদিন পথ চলার পর দিশা এসে পৌঁছল একটা পাহাড়ের পাশে। উত্তরে তার তৃণভূমি, দক্ষিণ আর পুব জুড়ে বালির বিস্তার।

অপরাহ্নের আগেই সে এসে পড়েছিল। ঘোড়া থেকে নেমে পাহাড় ঘেঁষে দাঁড়াল।

এ কদিন দু'একজন পথচারী ছাড়া কারু সঙ্গে তার দেখা হয়নি। তাদের কাছ থেকে জেনেছিল, এদিকে একদল দুর্ধর্ষ মেষপালক রয়েছে। তারা তীর ছুঁড়তে ওস্তাদ।

দিশা বুঝল, এই মেষপালকদেব কোনও কোনও দল নীলনদের দেশে হামলা চালায়। সে পথে আসতে আসতে ভাবল, এইসব দলের সঙ্গে দেখা হলে সে তাদের উৎসাহ দেবে ঐ দেশ দখল করতে। সেনাপতি তিহার আর তার সেনারা ধ্বংস হলে গোষ্ঠীপতি আমন আর রাহী তিহারের হাত থেকে বেঁচে যাবে। রাহীর মুখে সে শুনেছিল, রাহী তিহারের হাত থেকে গোষ্ঠীপতি আমনকে বাঁচাতে চায়। সে তার মানুষটির হাত ধরে দূরে কোথাও চলে যেতে পারলে আর কিছুই চাইবে না। সে জানে, তিহার বেঁচে থাকতে তার এ সাধ পূর্ণ হবার নয়। ভয়ঙ্কর জন্তুর চেয়েও সে ভয়ঙ্কর।

দিশা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, সে রাহী আর আমনকে যে করেই হোক বাঁচাবার চেষ্টা করবে।

ঘোড়াটাকে এখন সে একটা পাথরের চাঙড়ের সঙ্গে বেঁধে ফেলল। নিজে বসল মসৃণ একটা পাথরের ওপর। আজ রাতে এখানেই সে বিশ্রাম করবে।

কিছু পরে পাহাড়ের বাঁকে সে নারীকণ্ঠের কলধ্বনি শুনতে পেল। নিজেকে গোপন করার জন্য একটা পাথরের ঢিবির আড়ালে ঘোড়াটাকে নিয়ে চলে গেল।

একদল মেয়ে একসঙ্গে হলে যেমন হাসি-ঠাট্টায় মেতে ওঠে, ঠিক তেমনি আড্ডায় মশগুল বলে মনে হলো তাদের।

বেলা পড়ে আসছিল। সূর্য পাহাড়টার আড়ালে নামতে শুরু করল। দিশা দেখল, একদল মেয়ে কাঁধে জলের পাত্র নিয়ে পাহাড়ের খাঁজ থেকে বেরিয়ে আসছে। তারা সার বেঁধে গলায় অদ্ভুত সুর তুলে পাহাড়ের পুব দিকে চলে গেল।

কোমরে জড়ানো চামড়ার পোশাক, দেহের আর সব অংশটাই নগ্ন। মাথায় একরাশ কালো চুল, ধবধবে ফর্সা রঙ। এ ধরনের নারীমূর্তি সে আগে কখনও দেখেনি।

দিশা ওদের দেখে অদ্ভুত রোমাঞ্চ অনুভব করল। নারীর প্রতি দুর্বার এক আকর্ষণ তাকে চঞ্চল করে তুলল।

এখন ওদের আবার দেখা যাচ্ছে। ওরা সার বেঁধে পাহাড়ে উঠছে। একটানা একটা মিঠে সুর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। ডুব-সূর্যের আলোয় লাল একটা আভা ফুটে বেরুচ্ছে ওদের প্রায় নগ্ন দেহ থেকে। এক রক্তাভ পার্বত্য নাগ যেন এঁকেবেঁকে উঠে চলেছে।

ওরা একসময় পাহাড়ের আড়ালে হারিয়ে গেল। দিশা মোহগ্রস্তের মতো দাঁড়িয়ে রইল পাহাড়ের তলায়।

সন্ধ্যায় চাঁদ উঠল। আলোর বন্যায় ভেসে গেল চরাচর। ঢেউ-খেলানো বালির প্রান্তরকে দেখে মনে হলো, সোনার তরঙ্গ বয়ে যাচ্ছে।

আকাশ গাঢ় নীল। দুধের মতো সাদা চাঁদটা নীলের সমুদ্রে ভাসছে।

জলের দরকার। কেউ কোথাও নেই। দিশা ঘোড়াটাকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে গেল। মেয়েরা যেখানে জল নিচ্ছিল, পাহাড়ের সেই খাঁজের কাছে গিয়ে দিশা দেখল, একটা জলকুণ্ড সৃষ্টি হয়েছে। সে ঘোড়াটাকে কুণ্ডের কাছে নিয়ে গেল। তৃষ্ণায় কাতর ঘোড়া যেন সমস্ত কুণ্ডটাকে শুষে নেবে।

ঘোড়ার পান শেষ হলে দিশা তার চর্মপাত্রটি ভরে নিল জলে। সে দেখল, পাহাড়ের একটা খাঁজ বেয়ে জল নেমে আসছে। ঐ জলধারা আছড়ে পড়ছে পাশের কোনও একটা শিলাখণ্ডে। একটা পাথরের স্তূপ সেই শিলাখণ্ড আর এ পারের জলকুণ্ডকে আড়াল করে রেখেছে। নিচে একটা ছিদ্রপথে জল এসে ভরে তুলছে কুণ্ড। কুণ্ডের জল আবার কোন ছিদ্রপথে কোথায় বেরিয়ে যাচ্ছে তার চিহ্ন ধরা পড়ছে না চোখে। হয়ত সে জলধারা অন্তঃসলিলা হয়ে লুপ্ত হচ্ছে মরুতে।

দিশা তার জলপাত্রটি নিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে গিয়ে পাথরের স্তূপটির গায়ে একটা ফাটল দেখতে পেল। কৌতূহল বশে সে ফাটলে চোখ রাখতেই তার দৃষ্টিতে এসে পড়ল অভাবনীয় এক নারীমূর্তি। আধো আলো, আধো ছায়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে সে স্নান করছে। ওপর থেকে চাঁদের আলো মেখে রুপোলি এক জলধারা ঝাঁপিয়ে পড়ছে নিচের পাষাণে। তারই ওপর দাঁড়িয়ে স্নানলীলায় মেতেছি মেয়েটি। সম্পূর্ণ নিরাবরণ। ওপব

থেকে নেমে আসা উজ্জ্বল জলধারাটির মতোই নগ্ন আর সুন্দর। পিঠে প্রপাতের মতো নামছে কালো চুলের রাশ। মেয়েটি ওপরের দিকে মুখ তুলে নিজেকে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত ভেবে স্নান করছিল। দিশা যে এপারে জল নিল, একটি জীব যে জলপান করল, সে শব্দ মেয়েটির কানে গিয়ে পৌঁছয়নি। সে জলপ্রপাতের শব্দেই বধির হয়েছিল।

হঠাৎ দিশাকে চমকে দিয়ে হ্রেষাধ্বনি হলো। চমকে উঠল ওপারের মেয়েটিও। সে ছুটে এল ফাটলের কাছে। দিশা মুহূর্তে ফাটল ছেড়ে সরে দাঁড়িয়ে নিজেকে গোপন করল।

কতক্ষণ আত্মগোপন করে দাঁড়িয়ে রইল দিশা, সে আর ফাটলে চোখ পাতল না। হঠাৎ একসময় তার সামনে এসে দাঁড়াল মেয়েটি। পরনে সেই আগের মেয়েদের মতো চর্মবাস।

মেয়েটি ফাটলে চোখ রেখে অদ্ভুত জীবটিকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। তারপর একসময় স্নানের জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে ঘোড়া আর তার আরোহী দু'জনকেই দেখতে পেল।

টানা বড় বড় চোখ দুটো থেকে বিস্ময় উপচে পড়ছিল। তার দৃষ্টিতে ভয়ের কোনও চিহ্ন ছিল না।

দিশা বেরিয়ে এসে মেয়েটির মুখোমুখি দাঁড়াল।

মেয়েটিই প্রথম কথা বলল, তুমি কে ? কোথা থেকে এসেছ?

দিশা তার কথা বুঝল না। কিন্তু সে অনুমান করে নিয়েই বলল, আমি দিশা, অনেকখানি দূর থেকে আসছি।

দিশা, দিশা, মেয়েটি দুবার উচ্চারণ করল।

আমি বাথাই। মেষপালক হিক্সস্‌দের মেয়ে। আমার বাবা দামান হিক্সস্‌ গোষ্ঠীর নেতা।

এবার ঘোড়ার দিকে ফিরে বলল, আজব জীব, একে তো আগে কখনও দেখিনি।।

দিশা, বাথাই নামের মেয়েটির কৌতূহল বুঝে নিয়ে বলল, দেখতে চাও এ জীবের কেরামতি, তবে দেখ।

মুহূর্তে ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে উঠল দিশা। বিদ্যুৎগতিতে ঘুরে এল এক চক্কর। মেয়েটির চোখ আঠার মতো লেগে রইল ঐ আজব জীব আর তার আরোহীর ওপর।

দিশা যখন তার বাহনের কেরামতি দেখিয়ে বাথাই-এর কাছে ফিরে এল, তখন মেয়েটির চোখে শুধু বিস্ময় নয়, বিদেশির প্রতি গভীর এক ভালবাসার ছবিও ফটে উঠেছিল।

বাথাই ঘোড়ার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, এমন তাজ্জব জীব জীবনে কখনও দেখিনি। তুমি এই প্রাণীটিকে নিয়ে কোথায় যেতে চাও?

বাথাই-এর ইঙ্গিত বুঝে দিশা বলল, আমি আমার এই জীবটির পিঠে চেপে যেদিকে দু'চোখ যায় সেদিকে যেতে চাই।

বাথাই কিছু বুঝল, কিছু বা বুঝল না। তবু বলল, তুমি আমাদের এখানে কিছুকাল থাক। আমার বাবা দলের কিছু লোক নিয়ে পাথরের খোঁজে গেছে। বাবা ফিরে এলে তার সঙ্গে তোমার দেখা করিয়ে দেব। তোমার আজব জীবটা দেখলে বাবা তাজ্জব বনে যাবে।

দিশা বুঝল, মেয়েটি তাকে এখানে থাকতে অনুরোধ করছে। এতে দিশার আপত্তির কোন কারণই নেই। সে খুশীই হলো। এই গোষ্ঠীর মানুষগুলো যদি সেনাপতি তিহারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চায়, তাহলে সে অবশ্যই এদের যুদ্ধের জন্য ঘোড়ার যোগান দিয়ে যাবে।

দিশা এবার মেয়েটিকে মাথা নেড়ে জানাল, সে এখানে অবশ্যই কিছুকাল থাকবে।

কিন্তু মেয়েটি দিশাকে তার সঙ্গে ওপরের পাহাড়ে তাদের আস্তানায় নিয়ে গেল না। সে দিশাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল পাহাড়ের আর একটা খাঁজে।সেই খাঁজের ভেতর একটা গুহা বেশ গভীরে ঢুকে গেছে। সেই অন্ধকার গুহাপথে আর একটা স্রোত বয়ে আসছিল।

গুহার ভেতর কিছুটা ঢুকে আসার পর এক চিলতে আলো দেখা গেল। পাহাড়ের কোন রন্ধ্রপথে আলোর টুকরোটা ছুটে এসে অন্ধকার গলিটাকে আলোব ছোঁয়া দিয়ে গেল।

বাথাই বলল, কটা দিন এখানেই তোমাকে আস্তানা করে থাকতে হবে। দিনে গুহার মুখে গিয়েও দাঁড়াবে না। রাতে দাঁড়াতে পার, তবে সজাগ থাকতে হবে, কেউ যেন না দেখে ফেলে। দেখতে পেলেই কিন্তু বিপদ ঘনিয়ে উঠবে।

দিশা বুঝল, দিনে বেরুলে বিপদ আছে।

বাথাই চলে যাবার আগে বলল, ভয় পাবে না, বাবা না ফেরা পর্যন্ত তোমাকে এমনি করে থাকতে হবে। নইলে দলের পুরুষগুলো কোন একটা অঘটন ঘটিয়ে দিতে পারে।

একটু থেমে আলোর রন্ধ্রপথের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, মাঝে মাঝে ঐদিকে চেয়ে দেখো, আলো দেখতে পাবে। ওটা আমার ওপরের আস্তানার সামনের জমিনের ফাটল।

দিশা আর তার আজব জীবটিকে ঐ অন্ধকার-পুরীতে রেখে বাথাই বেরিয়ে গেল বাইরে। একটি মসৃণ শিলার ওপর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রেখে রাতের মতো বিশ্রামের আয়োজন করল দিশা। কিন্তু শিলার আসনে দেহখানাকে এলিয়ে দিয়েও ঘুম এল না তার চোখে। দিশা চিরদিনই দুরন্ত আর দুঃসাহসী। তবু এই পাতালপুরীতে নিঃসঙ্গ অবস্থায় সে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। মাঝে মাঝে তার চোখ গিয়ে পড়ছিল সরু আলোর রেখাটার ওপর। আকাশ থেকে যেন একটা উজ্জ্বল সাপ নেমে এসেছে পাতালে। যেখানে তার আলোর চক্রাকার ফণাটা পাষাণ ছুঁয়েছে, সেখানে বয়ে চলেছে তরল গরল।

কত রাত সে এমনি আলোর ঐ রেখাটার দিকে চেয়ে জেগে রইল। হঠাৎ একসময় সে চমকে উঠে বসল। আলোর রেখাটা মুছে গেছে।

কি একটা বস্তু শব্দ করে জলের ধারার পাশে শিলাখণ্ডে আছড়ে পড়ল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেদিকে তাকাল দিশা। সামান্য একটুখানি আলো এখন এসে পড়েছে বস্তুটার ওপর। পাতায় জড়ানো কোনও কিছু দ্রব্য।

দিশা উঠে গিয়ে ঐ বস্তুটাতে হাত ঠেকাল। একটা দড়ির সঙ্গে বাঁধা। দড়িটা নেমে এসেছে পাহাড়ের ওপরের ফাটল থেকে। হাত বুলিয়ে দেখল, ভেড়ার লোম দিয়ে তৈরি হয়েছে দড়িটা।

দিশা পাতার ঢাকনা খুলে ফেলতেই এক তাল ঝলসানো মাংস পেল। তার বুঝতে বাকি রইল না, কে এই মাংসের খণ্ডটি তার কাছে খাবার জন্য পাঠিয়েছে।

দড়িটা ওপরে উঠে যেতেই আবার আলোর টুকরোটা এসে পড়ল।

দিশা মাংসের টুকরোটা খুব তৃপ্তি করে খেল। সে এমন সুস্বাদু মাংস এর আগে কখনও খায়নি।

খাওয়ার পাট চুকিয়ে দিশা ঘুমের আয়োজন করল। এখন চোখে ঘুম আসতে তার বেশি সময় লাগল না।

গভীর রাতে দিশার ঘুম ভেঙে গেল। একটা ক্ষীণ শব্দ যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসছে। সে সামনে তাকিয়ে দেখল, আলোর রেখাটা কখন মুছে গেছে। দিশা গুহার দেয়ালে হাত বুলোতে বুলোতে একসময় পৌঁছে গেল শেষ প্রান্তে। শব্দ এখন সঙ্গীতের সুর হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে।

দিশা একখণ্ড শিলাস্তূপের আড়ালে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত এক দৃশ্য দেখতে পেল।

চাঁদের আলোর জোয়ার বইছে বালির প্রান্তরে। অগণিত নারী-পুরুষ পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে নাচে-গানে মেতে উঠেছে। কটিতে অতি সামান্য এক খণ্ড পোশাক ছাড়া নারী-পুরুষ উভয়ের দেহই অনাবৃত।

তারা ঘুরে ফিরে নাচছিল। চাঁদের উজ্জ্বল জ্যোৎস্না পিছলে পড়ছিল তাদের শরীর থেকে।

দিশা দেখল, এরা প্রত্যেকেই যুবক-যুবতী।

কি একটা অদ্ভুত সুর ওরা সকলেই একসঙ্গে উচ্চারণ করছিল।

বাতাস বইছিল। রাতের বাতাসে ঠাণ্ডার আমেজ। ঐ ঠাণ্ডায় প্রান্তরের মানুষগুলোর রক্ত উত্তাল হয়ে উঠছিল। দিশার রক্তেও বান ডেকে উঠল। সে চোখের সামনে অদ্ভুত একটা ছবি দেখতে লাগল।

পাল পাল ঘোড়া ছুটে চলেছে। প্রান্তর জুড়ে তারা যেন নাচের ভঙ্গিতে ছুটছে। পুরুষের পেছনে নারী, নারীর পেছনে পুরুষ। দুর্বার এক আকর্ষণে তারা জড়িয়ে আছে পরস্পরকে।

যুবক-যুবতীর আলিঙ্গন নিবিড় হচ্ছে। চন্দ্র ম্লান হয়ে এল। ধীরে ধীরে নিভে এল তার দীপ্তি। এখন

বালির প্রান্তব জুড়ে তবল অন্ধকার ওদেব হরণ করে নিল।

পরদিনও পূর্ণ চন্দ্রে হল একই অভিনয়। তার পরদিন স্নান করতে নেমে সন্ধ্যার অন্ধকারে বাথাই ঢুকল গুহার ভেতর। আজ কিছু বিলম্বে চন্দ্রোদয় হবে। গুহার মুখেই দাঁড়িয়েছিল দিশা।

বলল, স্নান করতে এলে?

বাথাই দিশার বুকে আঙুল ঠেকিয়ে বলল, বিদেশিকে দেখতে এলাম।

দিশা বাথাইকে আকর্ষণ করে বলল, চল ভেতরে যাই।

আজ তোমাকে সঙ্গ দেব বলে এসেছি। তার আগে আমাকে সন্ধ্যার স্নান সেরে নিতে দাও।

বাথাই আবার বেরুল গুহার বাইরে। গুহা মুখে তার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল দিশা।

ঝর্ণার জলে স্নান সারল বাথাই। দিশার ঘোড়ার জন্য ঘাসের আঁটি বেঁধে এনেছিল। পাহাড়ের ওপারের সবুজ ঘাস। সেই ঘাসের আঁটি আর নিজেদের খাবার সঙ্গে নিয়ে বাথাই এল গুহামুখে। দিশা বাথাই-এর আনা জিনিসগুলো নিজের হাতে ধরে নিয়ে বলল, এসো ভেতরে।

ওরা ঘোড়াকে খাবার দিল। নিজেরা গুহার অন্ধকারে বাথাই-এর আনা খাবার ভাগ করে খেল।

খাওয়া শেষ হলে ওরা দেখল আকাশ থেকে রুপোলি সাপটা নেমে আসছে।

হঠাৎ দিশা বলল, আজ তুমি নাচে যোগ দেবে না বাথাই?

নেমে আসা আলোয় নাচের মুদ্রা করে সে তার মনোভাব বুঝিয়ে দিল গোষ্ঠীপতির মেয়েটিকে।

তুমি কি চন্দ্রালোকে আমাদের নাচের উৎসব দেখেছিলে?

দিশা অনুমানে বাথাই-এর প্রশ্নটি বুঝে নিয়ে বলল, হ্যাঁ। এমন নাচ কোনও গোষ্ঠীতে আমি আগে কখনও দেখিনি। লড়াই-এ যাবার সময় শুধু যুদ্ধের নাচ নাচতে দেখেছি।

বাথাই দিশার কথার কতক হয়ত বুঝল। সে আগের প্রশ্নটির উত্তর দিতে গিয়ে বলল, আজ তো নাচ নেই। আবার যেদিন চন্দ্রের কলা পূর্ণ হবে, সে রাত এবং তার আগের রাতটিতে আমরা আসর বসাব।

কথায় কথায় রাত ঘন হয়ে এল। বাথাই তার অতিথির জন্য নিজেকে সে রাতে উৎসর্গ করল।

চতুর্থ দিনে গর্দভের পিঠে করে গোষ্ঠীপতি দামান ও তার সঙ্গীরা বেশ কিছু পাথর নিয়ে এল। গোষ্ঠীর লোকেরা সে পাথর নামিয়ে রাখল দামানের আস্তানার সামনের উঠোনে। এর পর রাতের অন্ধকারে সবাই দেখল দামানের উঠোনে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। সেই গনগনে আগুনে পোড়ান হচ্ছে পাথরের টুকরো। তার থেকে গলে বেরিয়ে আসছে লাল হলুদ রঙের লোহা।

একমাত্র দামানই জানে পাথর থেকে লোহা বের করার কৌশল। সে শিখেছে তার বাবা দলপতি তুরাকের কাছ থেকে। তুরাকও শিখেছে তার বাবার কাছে। তাই দামানরা বংশানুক্রমে এই বিশাল হিক্‌সস্ গোষ্ঠীর দলপতি।

এক আশ্চর্য ধাতু এই লোহা। তামা পেতলের চেয়ে অনেক বেশি কঠিন। এই ধাতুতে গড়া অস্ত্রের ধার যেমন তীক্ষ্ম, তেমনি মজবুত। তাই লোহার ফলকযুক্ত তীর অথবা বর্শা শত্রুকে আঘাত হানতে অদ্বিতীয়।

দামান যখন লড়াইতে নামে, তখন শত্রুপক্ষ এই মারাত্মক অস্ত্রের ভয়ে পালাতে পথ পায় না।

মেষচারণই দামানের গোষ্ঠীর একমাত্র বৃত্তি হলেও উত্তেজনার আগুনে সারাক্ষণ ফুটছে তাদের রক্ত। নতুন চারণভূমির খোঁজে গিয়ে যখন তারা ভিন্ন কোন গোষ্ঠীর কাছে বাধা পায় তখন লেগে যায় তুমুল লড়াই। আর ঐ লড়াইতে ব্যবহার করে লোহার তৈরি অস্ত্র। কিছু সময়ের ভেতরেই উভয় পক্ষের লড়াই-এর ফয়সালা হয়ে যায়।

দামান যে বিদ্যা বংশানুক্রমে আয়ত্ত করেছে, তা বুঝি আর নিজের বংশধরের কাছে রেখে দেওয়া সম্ভব হবে না। দামানের স্ত্রী মারা যাবার পর সে আর কোনও নারীকে সম্ভোগ করেনি। গোষ্ঠীতে এ ঘটনা বিরল। এদিকে দামানের কোনও পুত্র নেই। একমাত্র কন্যা বাথাই। তাই তার বংশানুক্রমিক বিদ্যাটি কার হাতে তুলে দিয়ে যাবে, এই চিন্তা তাকে প্রায়ই পীড়িত করে তোলে।

রাতে উঠোনে বসে লোহা বের করছিল দামান। পাশে এসে দাঁড়াল বাথাই।

বাবা, বাতের খাবাব তৈবি হয়ে গেছে।

দামান বলল, কাজ ফেলে এখন উঠে যাওয়া সম্ভব হবে না, এখানেই আমার হাতের কাছে দিয়ে যাও।

বাথাই তাই করল। সে খাবারটা বাবার কাজের কাছে এনে রাখল।

কাজ করতে করতে দামান তার এবারের অভিযানের গল্প করে যাচ্ছিল মেয়ের কাছে। আর বাথাই তা শুনছিল গভীর ঔৎসুক্য নিয়ে।

হঠাৎ বাথাই বলল, এই ধাতুটার ব্যবহার তুমি জান বলে কেউ তোমাকে লড়াইতে হারাতে পারে না, কিন্তু শুধু পায়ে হেঁটে কত দূরেই বা তুমি যেতে পার? কত দেশ এখনও তোমার নাগালের বাইরে পড়ে রইল।

মেয়ের কথা শুনে দামান বলল, আক্ষেপ করে কি করব বল? আকাশে প পাখির মতো আমার তো দুটো ডানা নেই যে উড়ে চলে যাব।

বাথাই বলল, হাঁ, ডানা ছাড়াই তুমি ঐ পাখির মতো উড়ে যেতে পারবে।

কাজ করতে করতেই দামান বলল, সে আবার কি রকম?

বাথাই বলল, এক আজব জীবে চড়ে দূর দেশ থেকে এক বিদেশি এসেছে। সেই জীবটা মানুষকে পিঠে নিয়ে দুরন্ত বেগে দৌড়তে পারে।

বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল দামানের মুখ। সে কাজ ফেলে মেয়ের দিকে চেয়ে বলল, সত্যি! কোথায় সে মানুষ আর তার সেই আজব জীব?

তাকে সবার সামনে বের করিনি বাবা। তুমি নেই, কে কখন ওকে বিদেশিচর ভেবে শেষ করে ফেলত।

উত্তেজনায় উঠে দাঁড়াল দামান। বলল, আমাকে মানুষটার কাছে এক্ষুণি নিয়ে চল। আমি সেই জীবটাকে দেখব।

বাথাই বাপকে সঙ্গে করে নিয়ে এল পাহাড়ের তলায়। বলল, মরুভূমির দিকে ফিরে দাঁড়াও, আমি আসছি। একটু পরেই তোমার সামনে তুমি তাকে দেখতে পাবে।

খটাখট খটাখট কি একটা শব্দ পেছনের পাহাড় থেকে শোনা যেতে লাগল। শব্দটা ক্রমেই এগিয়ে আসছে। চাঁদের আলো সবে ফুটে উঠেছে।

একটা মানুষ আজব এক জীবের ওপর চেপে দামানের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল। মানুষটার হাতে উদ্যত বর্শা। চোখের পলকে সে পাহড়ের এক প্রান্তে চলে গেল। আবার ফিরে আসছে সে। জীবটা দুরন্ত গতিতে এগিয়ে আসছে।

দামান স্তম্ভিত। মনে হল মরুর ঘূর্ণির মত হাওয়ায় ঝড় তুলে জীবটা বেরিয়ে আসছে।

দামানের সামনে এসে সওয়ারের নির্দেশে দুটো পা শূন্যে তুলে একটা শব্দ করে থেমে গেল জীবটা।

সাবাস।

ততক্ষণে দামানের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে বাথাই। দিশা ঘোড়া থেকে নেমে তাদের মুখোমুখি দাঁড়াল।

আবার উচ্ছ্বাসে বলে উঠল দামান, সাবাস। কোথা থেকে আসছ তুমি?

বন আর পাহাড়ে ঘেরা একটা দেশ থেকে। নীলনদ ছাড়িয়ে।

এ জীবটা কোথায় পেলে?

আমার ঐ দেশ থেকে ধরে এনেছি। এ জীব সবাই ধরতে পারে না। একে বশ মানাতে সবাই পারে না।

দামান বলল, আরও আছে?

অনেক।

এ জীব তুমি আমাকে যোগান দিতে পারবে?

পারব। কিন্তু কি জন্যে তুমি চাইছ?

আমি ঐ জীব পেলে দুনিয়ার যে কোন জায়গা জয় করতে পারি। এমনকি নীলনদের দেশটাও।

আমি যতটা পারি, তোমাকে এই জীব যুগিয়ে যাব। নীলনদের দেশটা প্রথমেই তোমাকে দখল করতে

হবে।

দামান বলল, তোমাকেও এজন্যে পুরস্কার দেব বিদেশি। নীলনদের দেশের একটা অংশই তোমাকে শাসনের জন্য ছেড়ে দেব।

দিশা বলল, আমি তোমাদের মতো গোষ্ঠীপতি হতে চাই না। দেশ নিয়ে আমি কি করব!

তবে ঐ জীবের বদলে তুমি কি চাও বল? আমার অসংখ্য ভেড়া আছে, তুমি যত খুশি নিতে পার।

দিশা মাথা নেড়ে জানাল, সে ভেড়া চায় না।

তবে কি চাও তুমি? কিছু তোমাকে নিতে হবে।

দিশা বলল, তোমার ভেড়াগুলো আমার ভেতর এমন শক্তি এনে দিতে পারবে না, যাতে আমি ঐ দুর্দান্ত জীবটাকে ধরে এনে দিতে পারি।

আবার বলল দামান, আমার ঐ জীবটা চাই-ই-চাই। সেজন্যে তুমি যা চাইবে তাই দেবার চেষ্টা করব!

দিশা এবার বাথাই-এর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, আমি আমার ভোগের জন্য কেবল নারী চাই। নারী দেবে তুমি, আমি দেব ঘোড়া।

সেই জ্যোৎস্নাভরা রাতে দিশার সঙ্গে অনেক আলোচনা হল দামানের। নীলনদের দেশের অনেক খবরই দিশা হিক্‌সস্‌দের অধিপতি দামানকে দিয়ে দিল। শুধু একটি অনুরোধ জানাল দামানকে, লড়াই-এ জয়ী হয়ে সে যেন ঐ রাজ্যের একটি অংশ বর্তমান গোষ্ঠীপতি আমনকে ফিরিয়ে দেয়। আর এ কথাও জানাতে ভুলল না, সেনা-প্রধান তিহার যেন তার লোভের উপযুক্ত শাস্তি পায়।

দিশার সব দাবিই মেনে নিল দামান। চুক্তি হল, এক একটি ঘোড়ার পরিবর্তে দিশা বেছে নেবে একটি করে সুন্দরী নারী। আর তার সঙ্গে দামানের উপঢৌকন পাঁচটি করে দুধালো মেষ। দিশা আস্তানা গেড়ে থাকবে না কোথাও। সে এমনি করে তার ঘোড়ার ওপর চেপে ঘুরে বেড়াবে দেশে দেশে। ইচ্ছেমতো চলে আসবে তার নারীদের কাছে। ভোগ করবে যৌবনের সমস্ত শক্তি দিয়ে। তারপর আবার চলে যাবে অন্য কোনও সম্ভোগের ক্ষেত্রে। এমনি চলবে তার আসা-যাওয়া। বুকের মধ্যে জ্বলবে কামনার আগুন। তাই তাকে দুরন্ত গতিতে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াবে। দিশা যেন পথে ছুটে চলা একটি বেগবান অশ্ব। কামনার কশাঘাতে সে ছুটে চলেছে, থেমে যাবার উপায় নেই তার।

।। দুই ।।

সারা বলল, তোর চলে যাবার পর, এই দেখ্‌, তোব ফেলে যাওয়া ঘোড়াগুলোর কত অংশ বৃদ্ধি হয়েছে।

দিশা প্রত্যেকটা ঘোড়াকে গভীর দৃষ্টিতে দেখতে লাগল। তার মনে হল এক একটা ঘোড়া এক একটা সুন্দরীর রূপ ধরেছে।

সে একসময় সম্বিত ফিরে পেয়ে বলল, আমার অনেক অনেক ঘোড়া চাই সারা। আমি তোব কাছে যে কটা ঘোড়া গচ্ছিত রেখে যাব, ফিরে এসে যেন দেখি তারা আমার এ এলাকাটা ভরে তুলেছে।

সারা বলল, এত ঘোড়া নিয়ে তুই কি করবি দিশা?

জীবজগতে এমন প্রাণী আর নেই সারা। এমন তেজ, এমন গতি, এমন সুন্দর! তোতে আমাতে আর ঐ তেজী ঘোড়াগুলোতে কোন তফাৎ নেই জানবি। আমি সারা দুনিয়ায় এই আগুনের হলকার মত প্রাণীগুলোকে বিলিয়ে বেড়াব। এদের সঙ্গে থাকলে আমরা কোনদিন আমাদের গোষ্ঠীপতির মতো বুড়ো হয়ে যাব না রে।

দিশাকে যেন কি এক নেশায় পেয়ে বসেছে। দিনের পর দিন সেই এক ঘোড়া ধরার খেলা। গাছের ডাল থেকে সেই দুঃসাহসী ঝাঁপ। তারপর ঝড়ের গতিতে বুনো ঘোড়ার পিঠে ছুটে চলা। একসময় সদলবলে ওদের নিয়ে এসে ঘেরা আস্তানায় ঢোকানো। বশ মানানোর নানা কৌশল প্রয়োগ। তারপর একদিন বিরাট একটা ঘোড়ার দল নিয়ে উধাও হয়ে যাওয়া।

এমনিভাবে কয়েকবার ঘোড়ার পাল তাড়িয়ে নিয়ে দিশা গেল হিক্সস্দের দেশে। সত্যিই দিশার শিক্ষায় সেখানে গড়ে উঠল দুর্ধর্ষ এক অশ্বারোহীর দল। একদিন হাজার হাজার ভেড়ার পাল সামনে রেখে হিক্সস্ অশ্বারোহীরা ঢুকে পড়ল নীলনদের দেশে। বিদ্যুৎগতিতে তারা ঘিরে ফেলল সেনা-নিবাসসহ সেনা-প্রধানের আস্তানা।

গোষ্ঠীপতি বন্দি হলেন। বন্দি হলো তাঁর সঙ্গে রাহী। কিন্তু সেনা-প্রধান তিহারকে খুঁজে পাওয়া গেল না। গোষ্ঠীপতি আমন আর তাঁর পত্নী রাহীকে যুদ্ধ থেকে সরিয়ে রাখার জন্যই দিশার পরামর্শে বন্দি করা হয়েছিল।

যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ল কৃষিক্ষেত্র, জনপদ থেকে মরু প্রান্তরে। বিচরণশীল ভেড়ার ব্যূহ ভেদ করে নীলনদের দেশের যোদ্ধারা সহজে এগিয়ে আসতে পারল না। তীক্ষ্ণ লৌহনির্মিত তীর নিক্ষেপ করে হিক্সস্রা তাদের ধরাশায়ী করতে লাগল।

মরু প্রান্তরের যুদ্ধে হিক্সস্দের স্বাভাবিক দক্ষতা। তারা প্রতিপক্ষের সৈন্যদের আকর্ষণ করে নিয়ে চলে গেল মরুভূমির গভীরে। সেখানে রাত্রিকালে ক্লান্ত, তৃষ্ণার্ত শত্রুবাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল অতর্কিতে। রাত্রির মরুতে চলাচলে অভ্যস্ত হিক্সস্রা সহজেই শত্রুদের বন্দি করে ফেলল।

যুদ্ধের সপ্তম দিবসে জয় পরাজয় স্থির হয়ে গেল। নীলনদের দেশের যোদ্ধারা মাথা নিচু করে তাদের অস্ত্র হিক্সস্দের হাতে সমর্পণ করল।

দুর্বার গতিতে হিক্সস্ অশ্বারোহী বাহিনী রাজধানীতে প্রবেশ করে সেনানিবাস ঘিরে ফেলেছিল, তাই নিশ্চিত হয়েছিল তাদের জয়।

কিন্তু বিজয়লাভের মুহূর্তে শত্রু সেনাপতি তিহারকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। মৃত ও জীবিত সবার ভেতরেই খোঁজা হল তন্ন তন্ন করে, কিন্তু সবই বৃথা।

বন্দিশালায় রাহীর সঙ্গে দেখা করতে গেল দিশা। আশ্চর্য! রাহীর মুখে শঙ্কার কোনও চিহ্ন নেই। দুটো চোখে তার কৌতুকের হাসি খেলা করছে।

প্রথমে রাহী কথা বলল, তাহলে তুমি সত্যিই এলে?

দিশা বলল, ঘোড়সওয়ারদের তৈরি করে তুলতে কয়েকটা বছর কেটে গেল রাহী।

রাহী এবার দীর্ঘ একটা শ্বাস ফেলে বলল, এ কটা বছর কি করে যে তিহারের হাত থেকে গোষ্ঠীপতি আমনকে আমি বাঁচিয়ে রেখেছি, তা তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না।

দিশা বলল, তিহারকে আমরা তন্নতন্ন করে খুঁজছি কিন্তু কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। এদিকে তার সমস্ত সৈন্য হিক্সস্দের নেতা দামানের কাছে অস্ত্র সমর্পণ করে বসে আছে।

রাহী বলল, বন্দি হবার আগের রাতে আমার সঙ্গে তিহারের শেষ দেখা। তুমি যে ঘরে রাতের অতিথি হয়ে ছিলে, সে ঘরেই আমি ওকে শেষ সঙ্গ দিয়েছি। ওকে খুবই উত্তেজিত, আবার উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল। সে রাতে ও গোষ্ঠীপতি আমনকে হত্যা করতে চেয়েছিল। প্রজাদের কাছে পরে মিথ্যা রটনা করত, শত্রু যোদ্ধাদের হাতেই গোষ্ঠীপতি নিহত হয়েছে। কিন্তু যুদ্ধের ফল যে এমন হবে, তা বুঝতে পারেনি তিহার।

দিশা বলল, লোকটা অতি ধূর্ত। নানারকম দুষ্টবুদ্ধিতে ওর মাথা ভরে আছে। আচ্ছা রাহী, আমাকে পথে হত্যা করার জন্য তিহার যে লোকটিকে পাঠিয়েছিল, সে কি ফিরে এসে দেখা করেছিল তোমার সঙ্গে?

হ্যাঁ, তার কাছে আমি তোমার নিরাপদে এগিয়ে যাবার কথা জানতে পারি। লোকটিকে তিহারের চর আর অত্যন্ত নিষ্ঠুর বলে জানতাম। কিন্তু তার জীবনের সব কথা শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। সেদিন মনে হয়েছিল তিহারের মতো ঘৃণ্য জীব এ দুনিয়ায় কোথাও নেই।

দিশা বলল, এখন যুদ্ধ শেষ। হিক্সস্দের দলপতি দামান এ রাজ্য দখল করে নিয়েছে।

রাহী বলল, নিজের পরিণতির কথা ভাবি না। গোষ্ঠীপতি আমনকে নিয়ে হিক্সস্রা কি করবে, সেই ভাবনায় অস্থির হয়ে আছি।

দিশা বলল, তুমি আমাকে সঙ্গ দিয়েছ, সুখও দিয়েছ, তাই এখান থেকে বহুদিন চলে গেলেও তোমাকে

আমি ভুলিনি। দলনেতা দামান আর আমার ইচ্ছাতেই তোমাদেব বন্দি করে রাখা হয়েছে, যাতে যুদ্ধের আঁচ তোমাদের গায়ে না লাগে।

রাহী বলল, বিদেশি রক্ষীরা আমাদের ওপর অত্যন্ত সদয় আচরণ করছে।

তাদের ওপর সেইরকমই নির্দেশ আছে দলপতি দামানের। তাছাড়া যুদ্ধের পরে এ রাজ্যের একটা বড় অংশ শাসনের ভার দেওয়া হবে গোষ্ঠীপতি আমনকে। তিনি স্বাধীনভাবেই তাঁর রাজ্যটি শাসন করতে পারবেন। দরকার হলে হিক্‌সস্ দলপতি সৈন্য দিয়ে তাঁকে সাহায্য করবে।

রাহীর চোখ উপচে জল গড়িয়ে পড়ল। সে ভাঙা গলায় বলল, তোমার এ ঋণ কোনদিন শোধ করতে পারব না বন্ধু।

নিজেকে সামলে নিয়ে রাহী আবার বলল, তোমাকে কি আমাদের সেই রাজ্যে চিরদিনের করে ধরে রাখতে পারব?

আমি ভবঘুরে, রাহী। আমার বাহনের ওপর চেপে বসে তাকে যেখানে খুশি চালিয়ে নিয়ে যাই। দুরন্ত গতিতে সে যখন ছোটে, আমার সারা শরীরে তখন উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। আমি এই উত্তেজনায় জ্বলতে থাকি। তখনই আমি খুঁজে বেড়াই সারা, রাহী কিংবা বাথাইকে। তারাই কেবল আমাকে ঐ আগুনের হাত থেকে বাঁচাতে পারে।

রাহী বলল, সারা আর বাথাই কে, দিশা? তাদের পরিচয় কি ?

তারা তোমার মতোই নারী। তারা আমাকে তোমার মতোই সুখ দিয়েছে রাহী।

রাহী চুপ করে কতক্ষণ বসে রইল। একসময় মুখ তুলে বলল, তোমাকে ধরে রাখা যাবে না বন্ধু, তবু যদি কোনদিন তোমার ঘোড়ায় ঝড় তুলে তুমি এদেশে এসে পৌঁছোও, তাহলে একবার দেখা দিয়ে যেও রাহীকে। সে তোমার পথ চেয়ে বসে থাকবে।

হিক্‌সস্‌দের নেতা দামান নীলনদের দেশের অধিবাসীদের ডাক দিয়ে জড়ো করল। তারা বিজয়ী রাজার আদেশ শোনার জন্য কান পেতে রইল।

দামান ঘোষণা করল, নীলনদের পশ্চিম তীর বরাবর আজ থেকে তোমাদের গোষ্ঠীপতি আমনের রাজ্যের সীমা স্থির করে দেওয়া হল। তোমবা তোমাদের খুশিমত যে কোন একটি স্থান বেছে নিতে পার। তোমরা কৃষিজীবী, আমরা মেষপালক। আমাদের চারণভূমি চাই, তোমাদের কৃষিকর্মের জমি। আমাদের ভেতর আজ থেকে কোনও বিরোধ থাকবে না।

দামানের আদেশে গোষ্ঠীপতি আমন আর তার প্রধানা রমণী রাহীকে নিয়ে আসা হল বন্দিশালা থেকে। দামান তাঁদের সমাদরে নিজের পাশের আসনে বসাল।

গোষ্ঠীপতি আমনের হাত ধরে হিক্‌সস্‌রাজ দামান বলল, আজ থেকে আপনি আমার বন্ধু। এই নীলনদের দু'পারে দু'জন থাকব। আমাদের ভেতর কোনও বিরোধ থাকবে না। এই উপকারী নদীটিই হবে আমাদের বন্ধুত্বের বন্ধন।

দিশাকে কাছে ডেকে দামান বলল, তোমার জন্যই আজ আমরা এত বড় একটা যুদ্ধ জয় করলাম। আমাদের মেষপালকরা পেল মনের মত চারণভূমি। বল বন্ধু, তোমাকে এই আনন্দেব দিনে আমি কি দেব?

দিশা বলল, আমাকে তো তুমি কথামত সবই দিয়েছ। প্রতিটি ঘোড়ার জন্য আমি পেয়েছি একটি করে হিক্‌সস্ রমণী আর পাঁচটি করে ভেড়া।

দামান বলল, আজ আনন্দের দিনে আরও কিছু চেয়ে নাও, বন্ধু। তোমাকে কিছু দিলে আমি বড় তৃপ্তি পাব।

দিশা বলল, আমার নিজের জন্য আর কিছুই চাই না। তবে তোমার খুশীর জন্য একটা জিনিস চেয়ে নিচ্ছি। আমাকে ভোগের জন্য যে সব হিক্‌সস্ রমণী দিয়েছ, তাদের বসবাসের জন্য এদেশে একটা আস্তানা করে দিও। তারা আমার ভেড়াগুলো চরাবে. তাতেই তাদের দিন গুজরান হয়ে যাবে।

দামান বলল, ওরা তো আমাদেরই মেয়ে. ওদের সুখ-সুবিধের সব ব্যবস্থাই হয়ে যাবে।

হিক্‌সস্‌দের বিজয়ের তৃতীয় দিন। রাত গভীর হলেও চাঁদের আলোয় দেখা যাচ্ছিল চরাচর। সুপ্তি নেমে এসেছিল জনপদের মানুষদের চোখে। আতঙ্ক আর উত্তেজনার চিহ্নমাত্র ছিল না কোথাও।

দিশা নিশি পাওয়ার মত ঘুরে বেড়াচ্ছিল নদীতীরে। ঠাণ্ডা একটা হাওয়া বয়ে আসছিল নদীর জল ছুঁয়ে। প্রভুর আদেশ না পেয়ে দিশার ঘোড়াটি যদৃচ্ছ বিচরণ করছিল। সহসা একটা মানুষ দিশার দৃষ্টিতে ধরা পড়ল। অদূরে কটা খেজুরের গাছ জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়েছিল। সেই খেজুর গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে লোকটা যেন কিছু একটা করছিল।

দিশা পেছন থেকে ঘোড়া নিয়ে লোকটার একেবারে কাছাকাছি এসে গেল।

আরে, এ যে একেবারে দিশার পরিচিত জায়গা। রাজবাড়ির সুড়ঙ্গ পথটা তো এখানে এসেই শেষ হয়েছে। রাহী তাকে এই পথেই তো একদিন নিয়ে এসেছিল। ঐ তো সেই খালটা, সুড়ঙ্গের গা ঘেঁষে চলে গেছে।

লোকটা কি করছে কি ? এত রাতে একা এখানে?

হঠাৎ কলকল শব্দে জলের আছড়ে পড়ার আওয়াজ শোনা গেল। যেন কোন গভীরে বিপুল জল তোড়ে ঢুকে চলেছে।

কি করছ ওখানে?

লোকটা ভয় পেল না, পেছন ফিরল না। জলের গভীর গর্জনের সঙ্গে চেঁচিয়ে বলল, জল খাওয়াচ্ছি।

দারুণ কৌতূহলে ঘোড়া থেকে নেমে দিশা এগিয়ে গেল।

আরে, লোকটা যে চেনা চেনা মনে হচ্ছে। সেনাপতি তিহার এই লোকটাকেই তো মরুভূমিতে পাঠিয়েছিল তাকে হত্যা করার জন্য।

দিশা একেবারে কাছে গিয়ে তাকে নাড়া দিয়ে বলল, আমাকে তুমি চিনতে পার?

লোকটা এতক্ষণে যেন সম্বিত ফিরে পেল। ভাল করে দিশাকে একবার দেখে নিয়েই বুকে জড়িয়ে ধরল।

দিশা বলল, কিন্তু এত রাতে তুমি এ কি করছ! সুড়ঙ্গের মুখ দিয়ে খালের জল যে হু হু করে ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে।

লোকটি এবার অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল দিশার মুখের দিকে। বলল, জ্বলন্ত মরুভূমির মাঝখানে দাঁড়িয়ে বুকের ভেতর কখনও কি অনুভব করেছ তৃষ্ণা? ধূ ধূ করছে চারদিক, আকাশের জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড থেকে ঝরে পড়ছে আগুন। একবিন্দু জল কোথাও নেই।

দিশা বলল, ভাবতে পারছি না সে পরিস্থিতি। আমাকে কখনও সেই দুর্ভাগ্যের মুখোমুখি হতে হয়নি।

আমিও সে পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়াইনি কোনদিন। তবে সেই ছবিটা আমার রাত্রের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। এক অসহায় যুবকের বুক ফেটে যাচ্ছে একবিন্দু জলের জন্য। আমি সে ছবিটা ভুলি কি করে বাবা!

তুমি কি তোমার ছেলের কথা বলতে চাইছ?

তার হাত থেকেই তো শয়তান তিহার জলের পাত্রটা ছিনিয়ে এনেছিল।

দিশা বলল, তা আমার অজানা নয়। কিন্তু তার সঙ্গে এই সুড়ঙ্গের ভেতর তোমার জল ঢুকিয়ে দেবার সম্পর্কটা কি?

লোকটি যেন বিরাট একটা হিংস্র জানোয়ারকে বন্দি করে ফেলেছে, এমনি ভাব নিয়ে বলল, শয়তান তিহার এখন ঐ সুড়ঙ্গের ভেতর আত্মগোপন করে আছে। সে খবরটা কেবল আমারই জানা। তাই ও যাতে আকণ্ঠ জলপান করতে পারে, সেই ব্যবস্থাই আমি করেছি। ওদিকের গুহামুখটিও বন্ধ।

কথাটা শেষ করেই পাগলের মতো রাতের আকাশটা ফাটিয়ে হা হা করে হাসতে লাগল মানুষটা।

লড়াই থেমে গেলে ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এল জীবন। কিন্তু চারিদিকের এই প্রশান্তির ভেতর অশান্ত হয়ে উঠল একটা মানুষ। নিরুদ্বিগ্ন জীবন সে চায় না। দুর্দান্ত গতিতে অপরিচিত জীবনের ভেতর ঝাঁপ দিয়ে সে কুড়িয়ে নিতে চায় রত্ন। সে রত্ন নারী, তার একমাত্র কামনার বস্তু।

আবার তার ঘোড়ার ওপর লাফিয়ে উঠল ঘোড়সওয়ার। অন্ধকার ফিকে হয়ে এল। নীলনদ পেছনে ফেলে পূর্ব দিগন্তের দিকে ছুটে চলল ঘোড়া। একসময় দিগন্ত রাঙিয়ে উঠল লাল সূর্য। সেই অগ্নিবর্ণ গোলকের ভেতরে আর একটি লাল বিন্দু ধীরে ধীরে মিশে গেল।

দক্ষিণে করাল মরু। মধ্যাহ্নে জ্বলন্ত পিশাচীর মূর্তি ধরে সে নাচতে থাকে। শুরু হয়ে যায় মরুঝঞ্ঝা। আবার রাতের জ্যোৎস্নায় সে মায়াবিনী। দিগন্ত জুড়ে বিছিয়ে রাখে মায়ার ফাঁদ। একবার সে কুহকে পড়লে হতভাগ্য পথিককে হতে হবে দিগভ্রষ্ট।

বহু যুগ ধরে যাযাবর মরুচর আর মেষপালকেরা যে পথ চিহ্নিত করে এসেছে, সেই পথ ধরে ছুটল দিশার ঘোড়া। কখনও মরুচরদের কাছে সে পেল উষ্ণ আতিথ্য। তাদের রমণীরা পাত্রভরে তাকে উপহার দিল মোহময় শাণিত দৃষ্টি।

দিশার সারা শরীরে শক্তির সঙ্গে মিশে আছে এক অদ্ভুত সারল্য। দুটো চোখে জ্বলছে ক্ষুধা। আদিম মানুষের অনাবৃত ক্ষুধা।

একদিন দিশার ঘোড়া এসে পৌঁছল ববেরুর (ব্যাবিলন) পথে। নদীর তীরে গড়ে ওঠা নতুন সাম্রাজ্য। জনপদবাসীরা বহুদূর পর্যন্ত গড়ে তুলেছে তাদের বাসস্থান।

তারা দ্রুতগামী একটা জীবের ওপর একটি মানুষকে বসে থাকতে দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। দিশা যতই নগরের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল, ততই ভিড় বেড়ে উঠল পথে পথে।

হঠাৎ দিশা পথ পরিবর্তন করল। সে নদীতীর ধরে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দিল দক্ষিণে। লরসা, লগশ, উম্‌মা, উরুক আর সুরুম্পক পেরিয়ে অবশেষে সে এসে পৌছল নদীতীরের বাণিজ্য নগরী উরে।

উর নগরী স্পর্শ করা মাত্র সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হল। নারী, পুরুষ, যুবা, বৃদ্ধ, বালক ছুটে চলেছে নগর-প্রধানের গৃহ লক্ষ করে। আশ্চর্য! এই প্রথম দিশা দেখল, তার দিকে জনতা ফিরেও তাকাল না। এই বিশেষ জীবটিকে দেখার কৌতূহলের থেকে আরও বড় কোনও কৌতূহল তাদের ভেতর রয়েছে ভেবে দিশা ঘোড়া থেকে নামল। সে পথের কিনার ধরে জনতার সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়াটাকে টানতে টানতে নিয়ে চলল।

নগর-প্রধানের বিশাল মহলটির পেছনে বিস্তীর্ণ এক প্রান্তর। সেই প্রান্তরের চারিদিক অজস্র বৃক্ষে সমাকীর্ণ। নগরীর মানুষজন প্রতিটি বৃক্ষের তলায় নিজেদের স্থান নির্বাচন করে দাঁড়িয়ে গেছে। দিশা দেখল, একটি মানুষও প্রান্তরে নেমে দাঁড়াচ্ছে না। সেও তার ঘোড়ার লাগাম ধরে একটি গাছের তলায় গিয়ে দাঁড়াল। সে এমন একটি স্থান নির্বাচন করল, যার তিনটি দিক লতাগুল্মে নিবিড়। কেবলমাত্র সামনের দিকটি উন্মুক্ত। এই সংকীর্ণ স্থানটিতে দ্বিতীয় আর কোনও ব্যক্তিকে আসতে দেখা গেল না।

প্রান্তরের মাঝখানে ভূগর্ভস্থ একটি গৃহ আছে বলে মনে হচ্ছিল। নীলনদের দেশে সেই সুড়ঙ্গ গৃহটির মত। কারণ, মাঝে মাঝে নগর-প্রধানের প্রাসাদের উন্মুক্ত পশ্চাদভাগ দিয়ে আনুষ্ঠানিক পোশাক-পরা কতকগুলো লোক বেরিয়ে এসে প্রান্তর পার হয়ে ভূগর্ভস্থ গৃহে প্রবেশ করছিল। আবার কিছু পরে ঠিক সেইভাবে বেরিয়ে এসে ফিরে যাচ্ছিল প্রাসাদে। তারা প্রাসাদ থেকে নানা ধরনের সামগ্রী বয়ে এনে গর্ভ-গৃহটি পূর্ণ করছিল। দিশা লক্ষ করল, ঐ ভূগর্ভস্থ গৃহের দুই পার্শ্বের প্রান্তরে স্তূপীকৃত বড় বড় প্রস্তরখণ্ড।

দ্বিপ্রহর পার হয়ে গেল নানা অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে। প্রখর সূর্যালোক। প্রাসাদের দিকে কাষ্ঠাসনে বসেছিল বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। তারা নানা প্রকার নির্দেশ দিচ্ছিল হস্ত সঞ্চালন করে।

মূল অনুষ্ঠানটি শুরু হতে অপরাহ্ন বেলা নেমে এল। কিন্তু আকাশের একটি কোণে এরই মধ্যে ঘনিয়ে উঠেছিল ঘনকালো একখণ্ড মেঘ। মাঝে মাঝে বয়ে আসছিল দমকা বাতাস।

মূল অনুষ্ঠানটি শুরু করার জন্য সম্ভবত জনতা চিৎকার করে কিছু বলছিল।

প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এল একটি দল। অদ্ভুত সব বাদ্যধ্বনি সহযোগে সামনে এগিয়ে এল দলটি।

দিশা বুঝল, এটি প্রাসাদের কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির শবযাত্রা। ভূগর্ভস্থ গৃহে সেই শবদেহ কবরস্থ করা হবে।

সেই শববাহকদের পাশে পাশে নানা ধরনের পাত্র বহন করে নিয়ে চলেছিল সম্ভবত প্রাসাদ পরিচারক,

পরিচারিকার দল। সেই সব পাত্রে চূড়াকৃত খাদ্যবস্তু দেখা যাচ্ছিল।

উপযুক্ত পোশাকে সুসজ্জিতা মহিলার দল ঐ শবদেহটিকে অনুগমন করছিল। সমস্ত দলটি ভূগর্ভস্থ গৃহে প্রবেশ করা মাত্র একই সঙ্গে দুটি ঘটনা ঘটতে দেখা গেল।

বড় বড় পাথরের চাঁই বয়ে নিয়ে গিয়ে দরজার মুখ বন্ধ করতে লাগল প্রাসাদের নিযুক্ত লোকেরা। শবদেহের সঙ্গে জীবন্ত মানুষদেরও সমাধিস্থ করা হবে ঐ ভূগর্ভস্থ গৃহের দ্বার চিরকালের মতো বন্ধ করে দিয়ে।

চতুর্দিকের মানুষ নানা রকমের ধ্বনি করছিল।

ঠিক সেই মুহূর্তে দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটল। আকাশ থেকে বাজপাখি‘’ মত ছোঁ মেরে নেমে এল ঝড়। মুহূর্তে কালো হয়ে উঠল আকাশ। অন্ধকারে ছেয়ে গেল চরাচর।

মানুষজন ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে লাগল। সমস্ত প্রান্তরে মানুষ, মানুষ আর মানুষ। সবাই আশ্রয়ের খোঁজে পালাচ্ছে। মুষলধারে শুরু হয়ে গেল বৃষ্টি। পাথর বয়ে নিয়ে গিয়ে যারা দরজা বন্ধ করার কাজে লেগে গিয়েছিল, তারা পাথরের আড়ালে গা ঢাকা দেবার চেষ্টা করতে লাগল।

দিশা এ অঞ্চলে সম্পূর্ণ নবাগত। তার কোনও আশ্রয় ছিল না, তাই ঐ গাছতলাতেই সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। জীবন্ত মানুষগুলোকে ঐ মরা মানুষটার সঙ্গে কবর দেবে, এ যেন ভাবতেই পারছিল না সে।

ঝড় ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। হঠাৎ এসে হঠাৎ চলে যাওয়া নয়, বেশ ঘনঘটায় নামল। ভীষণ শব্দে বাজ পড়ল। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল একটা গাছের মাথা। দিশার ঘোড়াটা হ্রেষাধ্বনি করে পা ঠুকতে লাগল।

চোখের সামনে আর কেউ নেই। প্রান্তরে যেন প্লাবন বয়ে যাচ্ছে।

ও কে ? আছাড় খেতে খেতে এগিয়ে আসছে! ঘোলাটে আলোয় দিশার মনে হলো, একটি নারী।

মেয়েটি তারই দিকে ছুটে এল। লতা জড়ানো গাছতলায় সে যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

দিশার হাঁটু জড়িয়ে ধরেছে মেয়েটা। দিশা অবাক হয়ে গেল। সব মানুষই যখন এই প্রান্তর ছেড়ে যে যার আশ্রয়ের দিকে ছুটল, তখন এই মেয়েটিই বা এখানে চলে এল কেন!

দিশা মেয়েটির হাত ধরে তুলল। সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে।

বলল, তুমি তোমার ঘরে ফিরলে না যে?

মেয়েটি কি বুঝল সেই জানে! সে আঙুল তুলে ভূগর্ভস্থ ঐ ঘরটিকে দেখিয়ে দিল।

মুহূর্তে দিশার মনে পড়ে গেল মেয়েটির মুখ। শবাধারের পেছন পেছন মেয়েদের দলের একটি পাশে চলছিল সে। বড় করুণ আর বিষণ্ণ লাগছিল তাকে।

দিশা বলল, বেশ করেছ কবর থেকে পালিয়েছ। এখন কোথায় যেতে চাও?

মেয়েটি দিশার ইঙ্গিত মোটামুটি বুঝল। সে একটা দিকে হাত দেখিয়ে বলল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তুমি আমাকে নদীর ধারে নিয়ে চল। একটু পরে বৃষ্টি থামলে ওরা আমাকে ধরে ফেলবে। আবার পুরে দেবে ঐ কবরে।

দিশা মেয়েটিকে ঘোড়ার ওপর তুলে বসাল। নিজে লাফিয়ে উঠে ঘোড়া চালিয়ে দিল। মেয়েটি পথ দেখিয়ে লোকালয় থেকে দূরে নদীর ধারে নিয়ে চলল দিশাকে।

নদীর তীরে কাঠের তৈরি বিশাল বাড়ি। চারদিকে বড় বড় গাছ। বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল। মেয়েটি ঘোড়া থেকে নেমে ছুটে গেল ঘরের ভেতর। দিশা ঘোড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল বাইরে!

বেশ কিছু সময় পার হয়ে যাবার পর গৃহস্বামী ধীবন দিশার কাছে এসে বলল, তুমি যে মেয়েটিকে বিপদের হাত থেকে বাঁচতে সাহায্য করেছ, এ জন্য আমি কৃতজ্ঞ। তুমি আমার অতিথি। ঘরের ভেতর এসো।

দিশা মানুষটির সঙ্গে সঙ্গে তার ঘরের ভেতর ঢুকল।

কিছু খাদ্য আর পানীয় দিয়ে অভ্যর্থনা করার পর শুরু হলো উভয়ের আকার ইঙ্গিত সহযোগে

কথোপকথন।

মহেঞ্জোদড়ো থেকে ব্যবসা উপলক্ষে উর নগরীতে একসময় এসেছিল বণিক ধীবন। সমুদ্রপথে এসেছিল পণ্য-সম্ভার নিয়ে। উর নগরীতে বিপুল লাভের মুখ দেখে বণিক আর স্বদেশে ফিরতে পারেনি। প্রতি বছর তার নির্দেশ মতো পণ্যসামগ্রী নিয়ে নৌকো এসে উরের ঘাটে ভেড়ে। এই ভাবে তিরিশটা বছর ধরে ব্যবসা করে সে বহু সম্পদের অধিকারী হয়েছে। উরের নগর-প্রধানের সঙ্গে একসময় তার বিশেষ খাতির জমে ওঠে। সেই সূত্রে নগর-প্রধান কখনও কখনও নিমন্ত্রিত হয়ে আসতেন তার গৃহে।

এই গৃহেই একদিন তূর্ণার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়।

তূর্ণা সেদিন খাদ্য পরিবেশন করছিল সম্মানীয় অতিথিকে।

নগর-প্রধান, তূর্ণার আচার-আচরণে মুগ্ধ হয়ে তাকে নিজের প্রাসাদে নিয়ে যাবার প্রস্তাব দিলেন। সেই প্রস্তাব মতো তূর্ণাকে পাঠাতে হয়েছিল তাঁর অন্তঃপুরে।

দিশা জানতে চাইল তূর্ণার পরিচয়।

বণিক ধীবন বলল, তূর্ণা আমারই দেশের মেয়ে। মহেঞ্জোদড়ো নগরীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নর্তকী। ষোড়শ বর্ষেই তার প্রতিভার বিকাশ লক্ষ করে অবাক হয়ে যেতে হত।

দিশা বলল, আপনি ঐ নর্তকীকে দেশ থেকে এখানে আনলেন কোন্ উদ্দেশ্যে?

বণিক বলল, আমার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। ববেরু নগরীর নাম শুনেছ?

আমি তো সেই নগরী পেছনে ফেলে উড়ে এসেছি।

ঐ নগরীতে নতুন রাজার রাজত্ব শুরু হয়েছে কিছুদিন। খবর পেয়েছিলাম, নতুন রাজা নাচ ভালবাসেন। তাই তূর্ণাকে আনিয়েছিলাম দেশ থেকে। কিন্তু উরের প্রধান আগেই ওকে চেয়ে নিলেন। আমার কিছু করার ছিল না।

দিশা বলল, এ দেখছি এক অদ্ভুত দেশ! রাজার কবরে জ্যান্তদেরও ঢুকতে হয়!

বণিক বলল, এখানে এই নিয়ম চলে আসছে। রাজার প্রিয় দাসদাসী আর রানীদের মৃত রাজার কবরে যেতে হয় তাঁকে সঙ্গ দেবার জন্য।

দিশা বলল, ভাগ্যিস ঝড়বৃষ্টি ঠিক সময়ে এসে পড়েছিল, তাই দুর্যোগের ভেতর ও গা ঢাকা দিয়ে পালাতে পারল।

বণিক বলল, তুমি না থাকলে ও কিন্তু আজ রক্ষে পেত না। পথেই বৃষ্টি থেমে যেত। লোকেরা ওকে দেখেছিল, তারাই আবার ওকে ধরে নিয়ে যেত রাজবাড়িতে।

দিশা বলল, আমার বাহন খুব তাড়াতাড়ি আমাদের বয়ে এনেছে। ওর জন্যেই আমরা কারু কাছে ধরা পড়ে যাইনি।

এই বিশেষ জীবটি সম্বন্ধে বণিক সাগ্রহে খোঁজখবর নিল। দিশা তার বাসস্থান এবং কর্মক্ষমতা সম্বন্ধে সবিস্তারে বর্ণনা দিয়ে বলল, আমি দেশ দেখতে বেরিয়েছি। এই বাহনটিই আমার একমাত্র সম্বল।

বণিক ধীবন বলল, বিদেশী, তোমাকে আমার খুবই ভাল লেগেছে। তুমি যতদিন খুশি আমার এখানে থেকে যেতে পার! তবে অনুরোধ, বাইরের কেউ যেন তূর্ণার ফিরে আসার খবর না জানতে পারে।

দিশা বলল, আপনি নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন। আমি ওকে বাঁচিয়েছি, আমি কি করে ওকে মারতে পারি।

বণিক বলল, খুব বেশিদিন ওকে আমি উরে গোপন করে রাখব না। ববেরুর প্রাসাদে ওকে আমি আমার অন্যান্য উপহারের সামগ্রীর সঙ্গে পাঠিয়ে দেব।

দিশা বলল, কিন্তু আপনি তূর্ণাকে ববেরুর রাজার কাছে উপহার হিসেবে পাঠাতে চাইছেন কেন?

ববেরুতে নতুন প্রাসাদ গড়ে উঠছে। আমি সেই প্রাসাদের যত কাঠ, দেশ থেকে এনে যোগান দিতে চাই। এবার নিশ্চয়ই বুঝেছ, আমি কেন রাজাকে তুষ্ট করতে চাইছি।

একটু থেমে বণিক আবার বলল, নতুন রাজার রাজ্যে ব্যবসা করার জন্য ইতিমধ্যে সার্থবাহের দল

ভিড় জমিয়েছে। এদিকে উম্‌মা, উরুক, সুরুস্পকের বণিকরা তো ববেরুর ভেতর নিত্য যাতায়াত শুরু করেছে।

দিশা কোন উত্তর দিল না। তার কেবলই মনে হতে লাগল, ঐ মেয়েটার ওপর তারও একটা দাবি আছে। সে তাকে বণিকের কাছে না এনে রাজপ্রাসাদেই তো দিয়ে আসতে পারত।

তিন তিনটে দিন অধীর আগ্রহে কেটে গেল, কিন্তু তূর্ণাকে সে একটি বারের জন্যেও চোখের দেখা দেখতে পেল না। তার কেবলই মনে হতে লাগল, সেই দুর্যোগের রাত্রিতে তূর্ণাকে নিয়ে সে উর ছেড়ে তার নিজের দেশের দিকেই পালিয়ে যেতে পারত।

দিশা শয্যায়, স্বপ্নে কেবলই একটি মেয়েকে দেখতে লাগল, বৃষ্টিতে ভিজে গেছে তার সর্বাঙ্গ। সে তাকে ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে দু'হাতে আগলে ধরে বৃষ্টির ভেতর ছুটে চলেছে। তার হাতে এসে লাগছে মেয়েটির গরম নিঃশ্বাস, বুকে এসে লাগছে ভেজা চুলের ছোঁয়া।

চতুর্থ দিনে ববেরুর রাজপ্রাসাদে চলল ধীবনের উপঢৌকন। চন্দন কাঠের পেটিকায় মূল্যবান প্রস্তরনির্মিত মালা আর গজদন্ত নির্মিত এক নর্তকী মূর্তি। তার সঙ্গে চলল সর্বশ্রেষ্ঠ এক উপহার, জীবন্ত নর্তকী। আবরণযুক্ত দোলায় তোলা হলো উদ্ভিন্নযৌবনা এক নারীরত্ন।

চকিতে তূর্ণার দৃষ্টি এসে মিলল দিশার সতৃষ্ণ দৃষ্টির সঙ্গে। তূর্ণার দৃষ্টিতে ছিল সকরুণ বেদনা আর কৃতজ্ঞতার স্পর্শ। সে দৃষ্টি বিহ্বল করে তুলল দিশার মন আর চঞ্চল করে তুলল তার রক্ত।

তূর্ণার প্রস্থানের পরে সে অধিক কাল থাকতে পারল না বণিক ধীবনের ঘরে। ববেরুর পথ তার সারা মনকে তীব্রবেগে আকর্ষণ করতে লাগল।

এক রজনীতে সে স্বপ্নে তূর্ণাকে কাছে পেল, রজনী প্রভাত হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে তার অশ্বকে ছুটিয়ে নিয়ে চলল ববেরুর পথে।

বিশাল নগরী। পথ জুড়ে সারি সারি বিপণি। মানুষ যাতায়াত করছে সারা দিনমান। পণ্য নিয়ে চলেছে গর্দভের সারি। উটের ওপর সওয়ার হয়ে চলেছে মানুষজন।

পুরাতন প্রাসাদের কাছে এসে পৌছল দিশা। পথে কৌতূহলী জনতার ভিড় এড়িয়ে সে তার ঘোড়াকে চালিয়ে নিয়ে এল একেবারে প্রাসাদ-সংলগ্ন একটি বৃহদাকার পুষ্করিণীর ধারে।

ঘোড়া থেকে নামল দিশা। তৃষ্ণার্ত ঘোড়া পুষ্করিণী থেকে জলপান করল।

দিশা নির্নিমেষ চেয়ে রইল রাজপ্রাসাদের দিকে। এই প্রাসাদের কোন নিভৃত অন্তঃপুরে তূর্ণা তার দিনগুলো কাটিয়ে যাচ্ছে কে জানে! রাজাকে আনন্দ দিতে গিয়ে তার কি একটি বারের জন্যেও মনে পড়ছে না দিশার কথা! মনে পড়ছে না, সেই দুর্যোগের দিনে একই ঘোড়ায় দু'জনের রোমাঞ্চকর যাত্রার কথা!

দিশা এবার ঘোড়ার ওপর চড়ে সারা প্রাসাদ প্রদক্ষিণ করল। যদি কোন অলিন্দ থেকে তূর্ণার দৃষ্টি তার ওপর এসে পড়ে।

হঠাৎ আর একটা চিন্তা তার মনের মধ্যে জেগে উঠল। ববেরুর রাজা গত হলেও কি তূর্ণাকে তাঁর কবরে দাসদাসী, রানী মহারানীর সঙ্গে চলে যেতে হবে?

এই চিন্তা দিশাকে অস্থির করে তুলল। সে তীব্রবেগে ঘোড়াটাকে ছোটাতে লাগল।

প্রাসাদের রক্ষী একসময় তাকে হাত নেড়ে কিছু ইঙ্গিত করা মাত্র ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়াল দিশা। রক্ষীর চোখে-মুখে তিরস্কারের বদলে সেই একই কৌতূহল।

রক্ষীটি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হলেও তাকে দেখে ভয় পাবার কিছু ছিল না। দিশা রক্ষীর কৌতূহল মিটিয়ে তার সব প্রশ্নের জবাব দিতে লাগল।

শেষে রক্ষীকে প্রশ্ন করে সেও জানতে পারল, উর রাজ্যের মতো এখানে জ্যান্তদের কবরে ঢোকাবার কোন ব্যবস্থাই নেই।

দিশার মন থেকে একটা দুর্ভাবনা চলে যাওয়া মাত্র সে আনন্দে রক্ষীটিকে তার ঘোড়ার ওপর চড়িয়ে এক পাক ঘুরিয়ে আনল।

রক্ষীর মুখ থেকে দিশা জানতে পারল, সম্রাট তাঁর নতুন প্রাসাদের নির্মাণকার্য পবিদর্শনের জন্য সপারিষদ বহির্গত হয়েছেন।

দিশা আর রক্ষীর কাছে কালবিলম্ব করল না। সে নতুন প্রাসাদের অবস্থান সম্বন্ধে জেনে নিয়ে সেই দিকেই ছুটিয়ে দিল তার ঘোড়া।

নতুন প্রাসাদটির নির্মাণকার্য সবে মাত্র শুরু হয়েছে। প্রান্তরে দাঁড়িয়ে সম্রাট পারিষদদের কিছু নির্দেশ দিচ্ছিলেন, সহসা থেমে গেল তাঁর মুখের কথা।

দূর থেকে ধুলোর ঝড় তুলে কি একটা অদ্ভুত বস্তু যেন এগিয়ে আসছে। কাছাকাছি হতে বোঝা গেল, গর্দভের মতো একটা প্রাণীর ওপর চেপে একটা মানুষ তাকে চালিয়ে আনছে।

কিন্তু গর্দভ কি এমন দ্রুত দৌড়ে আসতে পারে?

নতুন প্রাসাদের কাছে এসে পৌঁছতেই থেমে গেল ধূলোর ঝড়।

দিশা ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে নেমে মাটি ছুঁয়ে সম্রাটকে অভিবাদন জানাল।

কৌতূহলী সম্রাট এগিয়ে গেলেন দিশার দিকে। নতুন ধরনের জীবটার দিক থেকে তিনি চোখ ফেরাতে পারছিলেন না।

দিশাকে প্রশ্ন করে সবিস্তারে সবকিছু জেনে নিলেন সম্রাট। ঐ জীবটি সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহল অদম্য হয়ে উঠল।

দিশা সম্রাটের কৌতূহল নিরসনের জন্য ঘোড়া নিয়ে খেলা দেখাতে শুরু করল। সেই সব খেলা, যা সে একদিন দেখিয়েছিল নীলনদের দেশে।

স্তম্ভিত সম্রাট। উচ্ছ্বসিত পারিষদেরা।

শেষ খেলা দেখাল দিশা, প্রশস্ত একটি খাল লাফ দিয়ে অতিক্রম করে। দিশার হাতে উদ্যত বর্শা। জীবটি প্রবল শক্তিতে আরোহীকে পিঠে নিয়ে যেন হাওয়া চিরে লাফ দিয়ে পেরিয়ে গেল।

সম্রাটের আদেশে মহাসমাদরে রাজগৃহে থাকার ব্যবস্থা হয়ে গেল দিশার।

বেশ কিছুদিন আনন্দে কাটল রাজপ্রাসাদে, কিন্তু রাজঅন্তঃপুরে প্রবেশের কোনও সুযোগই পেল না। তূর্ণার জন্য মন ভারাক্রান্ত হলেও সে এই ভেবে সান্ত্বনা পেল যে একই প্রাসাদে তারা দুজনে রয়েছে।

একদিন নগর ভ্রমণের সময় দিশা এক দুঃসংবাদ শুনতে পেল। উত্তর আর উত্তর-পূর্ব দিকের রাজ্যগুলিতে বিশেষ গোলযোগের সৃষ্টি হয়েছে। ইলম্, মিত্তানী আর হিটাইটদের রাজার সঙ্গে অসুরদের রাজার বিবাদ ক্রমশ যুদ্ধের দিকে এগিয়ে চলেছে। নিষ্ঠুরতায় নাকি অসুরদের জুড়ি মেলা ভার। সামান্য অবস্থা থেকে তারা নাকি অসামান্য শক্তিধর জাতিতে পরিণত হয়েছে। তাদের যুদ্ধের দেবী ইসতার। তাঁর পূজা করে রণক্ষেত্রে প্রবেশ করলেই জয় অনিবার্য। অসুর সৈন্যেরা নাকি যুদ্ধ চলাকালে তাদের পাশে পাশে দেবী ইসতারকে দেখতে পায়।

শোনা গেল, আপাততঃ অসুরদের দৃষ্টি ববেরুর দিকে নেই। তারা ইলমের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগ খুঁজছে।

দিশা রাজপ্রাসাদে ফিরে এল। সন্ধ্যার পূর্বে প্রায় প্রতিদিনই সম্রাটের সঙ্গে দিশার একবার সাক্ষাৎকার ঘটে থাকে। সে সময় সম্রাট দিশার কাছ থেকে অশ্বারোহণের কলাকৌশল শিখে নেন।

আজ সম্রাটের ডাক পেয়েই ঘোড়া নিয়ে দিশা তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল।

সম্রাট অশ্বে আরোহণ করলেন। দিশা সম্রাটের পাশে পাশে চলল। আজ কিন্তু দিশা সম্রাটের ভেতর বিশেষ উৎসাহের লক্ষণ দেখতে পেল না।

সরল আদিমতা দিশার চরিত্রে, অবয়বে। সে সহজভাবে সম্রাটকে প্রশ্ন করল, আজ আপনাকে অন্যমনস্ক দেখছি সম্রাট, অশ্ব চালনায় মন নেই।

অন্য কেউ সাহস করত না সম্রাটকে এ ধরনের প্রশ্ন করতে।

সম্রাট কিন্তু দিশার প্রশ্নে কোনরূপ অসন্তোষ প্রকাশ করলেন না। তিনি অশ্ব থেকে অবতরণ করলেন।

পদব্রজে যেতে যেতে বললেন, তুমি ঠিকই অনুমান করেছ বিদেশি। সম্প্রতি কোন কোন ঘটনা আমার চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কি সে ঘটনা সম্রাট ? যুদ্ধের জন্য অসুরদের আয়োজন?

বিস্মিত সম্রাট বললেন, তোমার অনুমান যথার্থ। ওরা প্রবল পরাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। ওদের মতি স্থির নেই। কখন কি করে বসে, সেই চিন্তায় রয়েছি।

দিশা সহসা বলে উঠল, একটি অশ্বারোহী বাহিনী যদি আপনার সৈন্যদের মধ্যে থাকত, তাহলে তাদের কেউ সহজে পরাস্ত করতে পারত না।

সম্রাট ঔৎসুক্য প্রকাশ করে বললেন, কি রকম?

দিশা বলল, অশ্বারোহী সৈন্যেরা তীরবেগে শত্রুসৈন্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের ক্ষতবিক্ষত করে দেবে। তাদের সঙ্গে কেউ এঁটে উঠতে পারবে না। আমি হিক্সস্‌দের ঘোড়ার যোগান দিয়েছিলাম। ঐ ঘোড়া নিয়ে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল নীলনদের দেশের ওপর। ওতেই যুদ্ধজয়।

সম্রাটের দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

পারবে তুমি বিদেশি আমাকে ঘোড়ার যোগান দিতে ?

কতগুলো ঘোড়ার দরকার হবে আপনার?

অন্ততঃ দুই শত অশ্বারোহীকে প্রস্তুত রাখতে হবে।

দিশা বলল, এত দূরের পথ, এতগুলো ঘোড়া একসঙ্গে নিয়ে আসা সম্ভব নয়। তাছাড়া বন থেকে ঘোড়া ধরা, তাদের বশ মানানো, তাদের বাচ্চাদের বড় করে তোলা বড় হাঙ্গামার কাজ।

সম্রাট বললেন, কিছু কিছু করে নিয়ে এসো। এই মুহূর্তে অসুরসৈন্যরা ববেরু আক্রমণ করবে না। মাঝে আরও দেশ আছে। তাদের যুদ্ধে হারিয়ে তবে এ রাজ্যে আসতে পারবে।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে সম্রাট বললেন, তুমি এ জন্যে পুরস্কার পাবে বিদেশী। যা চাইবে, ববেরুর সম্রাট মুক্ত হস্তে তাই তোমাকে দেবে।

দিশা বলল, আগে কাজ শুরু করি, তারপর আমার পুরস্কার চেয়ে নেব।

একটা ঘোরের ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়ল দিশা। প্রাণ বাজি রেখে সে ক্রমাগত ঘোড়া ধরতে লাগল। তারপর বারে বারে অরণ্য, পর্বত, নদী, মরু অতিক্রম করে সে ঘোড়া নিয়ে হাজির হতে লাগল ববেরুতে।

এমনি করে কখন নিঃশব্দে তার জীবন থেকে ঝরে গেল বারটা বসন্ত তা সে জানতেও পারল না।

একদিন শেষ দলটাকে নিয়ে সে এসে দাঁড়াল সম্রাটের সামনে।

ববেরুর বাহিনী আজ অজেয় অশ্বারোহী সৈন্যে সমৃদ্ধ। সম্রাটের মুখে নির্ভয় পরিতৃপ্তির ছাপ।

চেয়ে নাও তোমার পুরস্কার। আমি আমার সমস্ত রাজকোষ খুলে দেব তোমার জন্য, যত খুশি সংগ্রহ করে নাও। ভূমি, গৃহ সবই পাবে। রাজসভার যে কোন শ্রেষ্ঠপদ উন্মুক্ত থাকবে তোমার নির্বাচনের জন্য।

দিশা বলল, এসবের কিছুই চাই না সম্রাট।

সবিস্ময়ে সম্রাট বললেন, তবে!

দিশা বলল, আমাকে ইচ্ছে মতো পুরস্কার চেয়ে নিতে দিন।

অবশ্যই, বল কি তুমি চাও?

তূর্ণা। নর্তকী তূর্ণাকে।

সম্রাট বিস্মিত, স্তম্ভিত। কথা বলতে পারলেন না বহুক্ষণ।

একসময় নিজেকে সংযত করে নিয়ে বললেন, তূর্ণা এ প্রাসাদের একমাত্র আনন্দের উৎস। ও আমার অত্যন্ত প্রিয় নর্তকী। তবু আমি যখন তোমাকে চেয়ে নেবার অধিকার দিয়েছি আর তুমি তূর্ণাকেই চেয়েছ, তখন অবশ্যই তুমি তাকে পাবে। তবে....

তবে কি সম্রাট ?

সম্রাট হেসে বললেন, এখনও তোমার দুই শত অশ্ব পূর্ণ হয়নি। তোমার ব্যবহারের অশ্বটি পেলে তা

পূর্ণ হয়ে যাবে। আর তখনই তুমি পাবে তূর্ণার অধিকাব।

দিশা চিন্তিত মুখে দাঁড়িয়ে রইল। বহু দুঃখ, বিপর্যয়, বহু সুখ আর আনন্দের সঙ্গী তার এই অশ্ব। একে কি করেই বা সে তুলে দেবে সম্রাটের হাতে।

তাকে নীরব দেখে সম্রাট বললেন, এত কাল যে অশ্বটি ছায়ার মতো তোমার সঙ্গী হয়েছিল, তাকে ছেড়ে দেওয়া যে কত কষ্টকর, তা তুমি বুঝতে পেরেছ! বেশ, ওটিকে তুমি তোমার কাছেই রেখে দাও। আমার ব্যবহারের জন্য আর একটি অশ্ব নিয়ে এসো, তাহলেই তুমি তোমার কামনার নারীটিকে পেয়ে যাবে।

দিশা যেন কূল খুঁজে পেল। সে উচ্ছ্বাসে মাথা নেড়ে জানাল, আপনাকে এমন একটি ঘোড়া এনে দেব সম্রাট, যা কোনদিন কেউ দেখেনি। আমিই কেবল তাকে চোখের সামনে দিয়ে বিদ্যুতের চমকের মতো চলে যেতে দেখেছি। ওকে আমি ধরার চেষ্টাও করিনি। ও কেবল আপনারই উপযুক্ত। আমি ওকে যেমন করেই পারি ধরে এনে দেব।

দিশা ফিরে চলেছে চিরপরিচিত অরণ্যে। বামে জ্বলছে মরুভূমি। দক্ষিণে স্থানে স্থানে রুক্ষ পার্বত্য প্রান্তর। দীর্ঘ বারটি বছরের অক্লান্ত পরিশ্রম, এতদিনে তার দেহে ক্লান্তির একটা ঘন কালো ছাপ ফেলে দিয়েছে। ভোগের একটা আগুন জ্বলছে ওর মনে, সেই আগুনের কালো শিখায় ম্লান হয়ে যাচ্ছে ওর শরীর।

দ্বিপ্রহরের তীব্র দাবদাহে পাহাড়ের ছায়ার আড়াল অথবা পথিপার্শ্বস্থ লতাগুল্মের স্বল্প ছায়ারও আড়াল খোঁজে দিশা। কখনও ক্লান্ত ঘোড়ার ছায়ার আড়ালে আত্মগোপন করে সে। এ সময়ে ঘোড়াটার বুকের হাড়ের দ্রুত ওঠানামার ছবিটা সে দেখতে পায়। শ্রান্ত ঘোড়াটা পথশ্রমে মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে দিশাও। বুকের গভীর থেকে কখনও কখনও সে শ্বাস উঠে আসে।

চন্দ্র-সূর্যের উদয়াস্তের পথ ধরে কতদিন চলল সে। মধ্যাহ্ন সূর্যের প্রজ্বলিত অগ্নি-প্রান্তরে ধেয়ে এল মরুঝঞ্ঝা। তীব্র ঘূর্ণিপাকে সে সারা প্রান্তর জুড়ে দেখতে লাগল তার নৃত্যলীলা। সম্মোহিত দিশা দেখল, ঘূর্ণির লীলায় নেচে চলেছে একটি মেয়ে। সে তার মুখখানা দেখার চেষ্টা করল, কিন্তু চেনার আগেই মেয়েটি ঘূর্ণির ঢেউ তুলে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সেই কুহকিনী আবার এসে দাঁড়াল জ্যোৎস্নার মায়াময় রাতে। সাদা আবরণে মুখখানি ঢেকে, হাতছানি দিয়ে সে দিশাকে কাছে ডাকতে লাগল।

দিশা তার রাতের তন্দ্রা ভুলে ঐ মোহময়ীর কাছে এগিয়ে গেল। কিন্তু কোথায় সে! সমান দূরত্বে দাঁড়িয়ে আবার তাকে হাতছানি দিচ্ছে।

এ কি মরুমায়া! তাকে এমনি করে দুস্তর মরুভূমির প্রান্তরে ডাক দিয়ে নিয়ে যাবে! ঘুরিয়ে মারবে তৃষ্ণায় আকুল ধূ ধূ বালুরাশির মধ্যে!

সেই মায়াবিনীর পেছনে অদৃশ্য হয়ে যাবার আগে সঙ্গী ঘোড়াটা তীব্রবেগে হ্রেষাধ্বনি করে উঠল। সম্বিত ফিরে এল দিশার। মায়ার কুহক থেকে মুক্তি পেয়ে সে ফিরে এল তার বৃদ্ধ, অভিজ্ঞ বাহনটির পাশে।

সিনাই-এর পর্বত, মরু পার হবার সময়ে সে এসে দাঁড়াল সেই ঝর্ণাধারাটির পাশে যেখানে সন্ধ্যায় হিক্‌সস্ মেয়েরা জল নিতে এসে কলধ্বনিতে মেতে উঠেছিল। সে রাতে জ্যোৎস্নার আবছা আলোয় সে দেখেছিল আদিম নারীর পূর্ণ সৌন্দর্য নিয়ে বাথাইকে স্নান করতে।

নীলনদের দেশ অতিক্রম করল দিশা রাতের অন্ধকারে। রাহী, বাথাই, আরও শতাধিক হিক্‌সস্ রমণী শয্যায় শুয়ে হয়ত সে রাতে স্মরণ করছিল তাকে। হয়ত ভাবছিল, কোথায় অদৃশ্য হল সেই দুরন্ত ভবঘুরে মানুষটা।

অবশেষে দিশা এসে পৌঁছল তার বহু পরিচিত অরণ্যভূমিতে। সামনে তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তর। প্রান্তরের উত্তরে নাতিউচ্চ পর্বতমালা। ঐ পর্বতের সন্নিকটে তাদের গোষ্ঠীর বাস।

সারা এখন কি করছে? সে হয়ত দিশার রেখে যাওয়া অতিরিক্ত ঘোড়াগুলির পরিচর্যায় ব্যস্ত।

এখন কারু কথা ভাববার সময় নেই দিশার। তার চোখের সামনে কেবল দুটো ছবি স্পষ্ট হয়ে ফুটে

আছে. একটি অশ্ব আর একটি নারী।

দিশা নিজেকে প্রস্তুত করে নিল। অশ্বত্থের প্রসারিত ডালটির প্রান্তে গিয়ে সে দাঁড়াল। যৌবনের প্রথম লগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত সে ঐ বৃক্ষশাখাটিকে অবলম্বন করেই দুরন্ত অশ্বের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

আজ তার জীবনে একটা মহাপরীক্ষার দিন উপস্থিত। সে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্য তার সমস্ত শক্তি আর একাগ্রতাকে যোগ করে দাঁড়িয়ে আছে। আসছে সেই বিদ্যুৎগতি অশ্ব। সঙ্গে সুন্দরী সঙ্গিনীর দল। অগ্নিবর্ণ। কেশর ঝলকাচ্ছে কম্পমান শিখার মতো।

এই অশ্বত্থের তোরণ পার হয়েই যেতে হবে সামনের তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরে।

নির্ভুল হিসাব। সময়ের অণু-পরমাণু চিরে ঝাঁপিয়ে পড়ল দিশা।

ভেসে যেতে যেতে শুধু এটুকু অনুভব করল সে, স্রোতের টান বড় তীব্র। আঁকাবাঁকা গতিতে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে দিগন্ত কাঁপিয়ে ছুটেছে।

কোথায় পড়ে রইল সঙ্গিনীরা। তারা দাঁড়িয়ে গেছে প্রান্তরের মাঝখানে। বিস্ময়ভরা দৃষ্টি মেলে দেখছে যৌবনের দৃপ্ত জয়যাত্রা।

দিশার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল। তারই ভেতর দিয়ে সে দেখছে, সামনের পাহাড়টা বড় দ্রুত এগিয়ে আসছে। মনে হচ্ছে, পাহাড় বিদীর্ণ করে প্রাণীটা এই মুহূর্তে ওপারে বেরিয়ে যাবে।

শিথিল হয়ে এল দিশার সমস্ত শরীর। কেশর থেকে পিছলে এল মুষ্টিবদ্ধ হাত। দিশা পক্ক, পরিণত একটা ফলের মতো খসে পড়ল মাটিতে। অব্যাহত গতিতে ছুটে চলে গেল দুরন্ত যৌবন।

দিশা অর্ধচেতন দৃষ্টি মেলে দেখল, আগুনের একটা ঊর্ধ্বমুখী শিখা পাহাড়ের কোল ঘেঁষে দিগন্তের দিকে ছুটে চলেছে। তার পেছনে ধেয়ে চলেছে সোনালি আবরণে ঢাকা একটা মরু-ঘুর্ণি। হঠাৎ খসে পড়ল মুখের আঁচল। দিশা দেখল, ঘূর্ণির নাচ নাচতে নাচতে ঐ দুরন্ত অশ্বের সঙ্গে দিগন্তে মিলিয়ে গেল নর্তকী তূর্ণা।

কতক্ষণ অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকার পর জ্ঞান ফিরে এলে দিশা দেখল, তার ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত দেহের ওপর বনৌষধির প্রলেপ পড়েছে। হাতের শিথিল মুঠোয় তখনও লেগে আছে রক্তে ভেজা একগোছা লাল কেশর।

দিশার মনে হলো, কেউ তার মাথাটাকে কোলের উপরে তুলে নিয়েছে।

ক্ষীণ কণ্ঠে দিশা বলল, কে ? কে তুমি?

উত্তর দিল না কেউ। দিশার মুখের কাছে শুধু একটা মুখ নত হয়ে এল। অস্ত-সূর্যের আভায় উদ্ভাসিত সে মুখ। দিশা দেখল, চুলে পাক ধরেছে, মুখে পড়েছে সময়ের চিহ্ন।

পরম নিশ্চিন্তে চোখ দুটো বন্ধ করার আগে সে একবার উচ্চারণ করল, সারা।

সেই মুহূর্তে তার মনে হল, এ জগতে ঐ অতিপরিচিত মুখখানিই তার একমাত্র আশ্রয়।

কালের কল্লোল

আকাশটা পিয়ল হয়ে গেল। আগুনের যে গোলাকার পিণ্ডটা অনেক ওপরের আকাশ থেকে বলকে বলকে তাপ ওগরাচ্ছিল সেটা এখন দূরের টিলার মাথায় স্থির হয়ে আছে। কেমন যেন ঘোলাটে রহস্যময় চোখ মেলে তাকিয়ে দেখছে চারদিকে। হঠাৎ দেখতে দেখতে পীত রঙটা পাংশু হয়ে উঠল। আর ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই দিগ্‌বিদিক কাঁপিয়ে যেন কোটি কোটি বৃহদাকার অদৃশ্য পাখির পাখা বেজে উঠল।

থমকে দাঁড়িয়েছে সার্থবাহের পুরো দলটা। মিহি বালির আঁধি পাকখাওয়া নর্তকীর ঘাঘরার মত ঘুরতে ঘুরতে এগিয়ে এল। সামনের দৃশ্যপট মুছে গেছে। যেন সীমাহীন সমুদ্রের উত্তাল ঘোলাটে ঢেউ ডুবিয়ে দিল সবকিছু।

সেই প্রচণ্ড আঁধির ধাক্কায় কে কোথায় ছিটকে পড়ল। ওদের অসহায় আর্ত চীৎকার ভেসে এল ঝড়ের গর্জনে।

তুর্বাণ উড়ে চলেছে। পা দুটো তার মালভূমির মাটি ছুঁয়ে দেহের ভারসাম্যটুকু কোনওরকমে ঠেকিয়ে রেখেছে। দুটো হাত ছড়িয়ে আছে ডানার মত শূন্যে। কত পথ পার হয়ে এসেছে সে, দিকচিহ্নহীন কোনও প্রান্তরে অসহায়ের মত ভেসে এল এতক্ষণ, তা সে জানে না। হঠাৎ একটা শক্ত পাথরে আছড়ে পড়ল সে। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারাল তুর্বাণ।

কখন ঝড় থেমে গেছে। আকাশ থেকে সাদা ফেনার মত ফিনকি দিয়ে ঝরে পড়ছে চাঁদের আলো। দূরে কাছে টিলাগুলো প্রাগৈতিহাসিক অদ্ভুতদর্শন অতিকায় প্রাণীর মত মাথা উঁচু করে উঁকি দিচ্ছে। একটা আবছা অন্ধকার গুহায় শুয়ে মনে হল তুর্বাণের কে যেন ভারী একটা পাথর চাপিয়ে রেখেছে তার ওপর। সে ওঠার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। সারা গায়ে কতকগুলো ছুঁচ এই মুহূর্তে যেন বিঁধে গেল তার। তুর্বাণ কাতরাতে লাগল। কিছুক্ষণের ভেতর সে আবার আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতেই সে অনুভব করল হাঁটু গেড়ে বসে কে যেন তার মুখে একটা তরল কিছু পদার্থ ঢেলে দিচ্ছে। তুর্বাণ চুক চুক করে সবটুকু নিঃশেষে খেয়ে ফেলল। খাওয়া শেষ হলে কিছুটা সুস্থ মনে হল তার। এখন সে বুঝতে পারল দুধের সঙ্গে কিছু একটা মিশিয়ে খেতে দেওয়া হয়েছে তাকে। কিন্তু কে তাকে খেতে দিচ্ছে। গুহার আবছা আলোয় তাকে চেনা যাচ্ছে না। এই মুহূর্তে তার মনে হল সমস্ত বল সে ফিরে পেয়েছে। সে ঝাঁকি দিয়ে উঠে বসল। ততক্ষণে ছায়ামূর্তি বাইরে সরে দাঁড়িয়েছে। সাদা কাপড়ের মত আলোয় সে এখন আর একটুও অস্পষ্ট নয়। তুর্বাণ অবাক হয়ে দেখতে লাগল মেয়েটিকে। চাঁদের আলোর সঙ্গে যেন মিশে গেছে মেয়েটি। শুধু চামড়ার ঘনরঙের পোশাকে ঢাকা পড়েছে তার বুক থেকে হাঁটু অবধি। মাথা ভরা পিঙ্গল রঙের চুলে কেমন যেন ঘানিয়ে উঠছে রহস্য। মেয়েটি তারই দিকে তাকিয়েছিল অবাক দুটো চোখ মেলে।

তুর্বাণ সার্থবাহের সঙ্গে পেরিয়ে এসেছে অনেক পথ। সিন্ধুতীরের জন্মভূমি পেছনে ফেলে অনেকগুলো সকাল আর সন্ধ্যা কাটিয়ে দিয়েছে সে পথে। নদীতীর ধরে উত্তরে এসে সে গিরিপথ পেরিয়ে তার হাঁটা শুরু করেছে পশ্চিমমুখে। পথে পড়েছে পাহাড় মরুপ্রান্তর মালভূমি আর প্রাচীন জনপদ। স্বদেশের বণিকদের সঙ্গে এই তার প্রথম বিদেশযাত্রা। সে পথ চলতে চলতে দেখেছে অনেক নতুন জাতের মানুষ, কিন্তু এই

মেয়েটি তার এতকালের দেখা সব মানুষের থেকেই আলাদা। গড়নে যেমন দীর্ঘ, তেমনি অবাক করে দেবার মত গায়ের রঙ।

তুর্বাণ মেয়েটিকে ডাকল। মেয়েটি সাড়া দিল না। সে এবার অনেক জোরে ডাকল। পাশের পাহাড়গুলো তার ঐ ডাকটা নিয়ে লুফোলুফি খেলা খেলতে লাগল।

মেয়েটি দ্রুতপায়ে ঢুকে এল গুহার ভেতর। মুখের ওপর তর্জনী চেপে বুঝিয়ে দিল তুর্বানের পক্ষে যে-কোনওরকম আওয়াজ তোলাই বিপজ্জনক।

কে তুমি? জিজ্ঞেস করল তুর্বাণ।

মেয়েটি ওর ভাষা বুঝতে পারল না। সে চাপাগলায় বলল, এই পাহাড়ের ওপারে আমাদের দলের লোকেরা রয়েছে। তোমার গলার আওয়াজ পেলেই ওরা এখানে চলে আসবে।

তুর্বাণ কিছুই বুঝল না। সে শুধু বুঝল, মেয়েটি ওর প্রাণরক্ষা করেছে, আর মুখে আঙুল রেখে তাকে কথা বলতে বারণ করছে।

তুর্বাণ, মেয়েটি শুনতে পায় এমনভাবে কয়েকটা কথা বলে গেল, আমি এখন আমার বল ফিরে পেয়েছি। আমার লোকেরা আঁধির ভেতর পড়ে কে কোথায় ছিটকে পড়েছে আমি জানি না। তুমি আমাকে ববেরুর (ব্যাবিলন) রাস্তাটা বাতলে দেবে?

মেয়েটি ঘাড় কাৎ করে কান পেতে ওর কথাগুলো শুনল, কিন্তু একটি শব্দ ছাড়া আর কিছুই উদ্ধার করতে পারল না।

সে তুর্বাণের কথা শেষ হলে শুধু উচ্চারণ করল, ববেরু।

মেয়েটি কপালের ওপর হাত রেখে কি যেন ভাবল খানিকক্ষণ। তারপর ঐ একটি পরিচিত শব্দের সূত্র ধরে খানিকটা আন্দাজ করল। তরুণটি সম্ভবতঃ ববেরুর যাত্রী। আঁধিতে দলছাড়া হয়ে এখানে এসে পড়েছে।

মেয়েটি তুর্বাণের হাত ধরে গুহার বাইরে নিয়ে এল। তুর্বাণ দূরে তাকিয়ে দেখল একটা মসৃণ মালভূমি ক্রমশঃ উঁচু হয়ে অনেক দূরে দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেছে। আর সে যেখানটাতে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে কয়েকটা অদ্ভুত আকৃতির পাহাড় ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে। পাহাড়গুলোর মাথার দিকটা ক্ষয়ে ক্ষয়ে সূচলো আকার নিয়েছে। এক একটা পাহাড়ে এমনি অনেকগুলো করে সরু খাঁজ। তুর্বাণের মনে হল ঐ সামনের বিরাট মালভূমিটা সে ঝড়ের ঝাপটায় পেরিয়ে এসেছে। ক্রমশ ঢালু আর মসৃণ হয়ে নেমে আসার জন্য সে প্রায় ঝড়ের বেগেই এখানে এসে পৌঁছেছে। তারপর একেবারে আঘাত পেয়েছে এই গুহার পাশে পাহাড়ের দেওয়ালে।

এবার তুর্বাণ মেয়েটির দিকে তাকাল। কোথায় ছিল এ মেয়েটি। সে যখন পাথরের দেওয়ালে আঘাত পেয়ে জ্ঞান হারিয়েছিল তখন নিশ্চয়ই এই মেয়েটি কাছে-পিঠে কোথাও ছিল। সে-ই তাকে এই গুহাটার ভেতরেই আশ্রয় দিয়েছে। বাইরে তার আঘাত পাবার শব্দে বেরিয়ে এসে তাকে টেনে ঢুকিয়েছিল গুহার ভেতরে।

মেয়েটি এবার ঐ মালভূমির নৈঋত কোণের দিকে তার সুন্দর সাদা হাতখানা তুলে বলল, ববেরু, ববেরু।

তুর্বাণ হাত তুলে মেয়েটিকে অভিবাদন জানিয়ে মালভূমির দিকে পা বাড়াল।

দু-এক পা ফেলতেই মেয়েটি ছুটে এসে তার হাত ধরল। তার চোখে মুখে গভীর বিস্ময়চিহ্ন! তরুণটি কি ক্ষেপেছে নাকি! সে এই রাতে পথ চলবে !

মেয়েটি ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে এল একটা উঁচু পাহাড়ের কাছে। নিজে ঐ পাহাড়ের খাঁজ বেয়ে উঠতে লাগল। ওকে অনুসরণ করতে ইঙ্গিত করল।

তুর্বাণ ওর পা ফেলার জায়গাগুলো লক্ষ করছে আর সাবধানে সেখানে পা রেখে ওপরে উঠছে। খাঁজগুলোতে রহস্যময় আলোছায়ার খেলা। ওরা অনেকখানি ওপরে উঠে এল। এখন পাহাড়টা বিরাট একটা খাঁজ সৃষ্টি করে দুদিকে বর্শার ফলার মত উঠে গেছে। ঐ খাঁজে চওড়া একখানা পাথর অনেকটা

মসৃণ, ঠিক যেন দু-তিনজন বসার একটা আসন।

মেয়েটি ওখানে পৌঁছেই নীচের দিকে তাকিয়ে তুর্বাণের হাত ধরে ওপরে টেনে তুলে নিল। সে নিজে ঐ পাথরটার ওপরে বসল, আর ইঙ্গিতে তুর্বাণকে পাশে বসতে বলল। তুর্বাণ ওর পাশে বসলে মেয়েটি আঙুল তুলে উত্তর দিকে নির্দেশ করল। তুর্বাণ দেখল মালভূমির নীচেই একটা সমতল জায়গা। তার পাশে আলো-আঁধারে দাঁড়িয়ে আছে ছোট একটি বনস্থলী। ঐ সমতলভূমির এক জায়গায় একটা আগুনকে মাঝে মাঝে জ্বলে উঠতে দেখে তুর্বাণ সেদিকে হাত তুলল।

মেয়েটি ওদিকে আঙুল দেখিয়ে পরক্ষণেই নিজের বুকখানা দেখিয়ে দিল। তুর্বাণ বুঝল, ঐ সমতলের মানুষগুলোর সঙ্গে মেয়েটির নিকট সম্পর্ক আছে। কিন্তু সে বুঝতে পারল না, কি কারণে মেয়েটি এত রাত অবধি এখানে রয়েছে। কেনই বা সে তার নিজের মানুষদের কাছে নেমে যাচ্ছে না। ঝড় তো অনেক আগে থেমে গেছে। মেয়েটির লোকেরা কি তার জন্যে ভাবছে না। আবার তুর্বাণ ভাবল, যে মেয়ে অবলীলায় এমন কঠিন পাহাড়ের খাঁজ বেয়ে উঠে আসতে পারে সে নিশ্চয় সাধারণ মেয়ে নয়। চলাফেরার নিয়মকানুন সে নিজেই তৈরি করতে পারে।

মেয়েটি বলল, আমরা তুরানী আইরণ। মেষ চরিয়ে বেড়াই, অশ্ব বেচি ববেরুতে। ইলাম দেশে আমাদের একটা দল গিয়ে ঠাঁই গেড়েছে, কাশ্‌সু তারা।

কাশ্‌সু নামটা শুনেছিল তুর্বাণ পথে চলতে চলতে। সুমের দোয়াবের কাছ বরাবর ইলাম দেশে বহুকাল ঘাঁটি গেড়ে বসেছে ওরা। অশ্ব নামের একটা জন্তু ববেরুর রাজা-রাজড়াদের কাছে বেচে ফলাও ব্যবসা জমিয়েছে। সে জন্তুটা নাকি কতকটা গাধার মত দেখতে, তবে আকারে বড় আর চোখের পলকে লাফিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। কাশ্‌সুরা নাকি ওর পিঠে চড়ে আকাশে বিজলীচমকের মত ঘুরে বেড়ায়।

তুর্বাণের অবাক লেগেছিল কথাটা শুনে।

মেয়েটির মুখে অশ্ব শব্দটি শুনে সে কৌতূহলী হয়ে উঠল।

বলল, অশ্ব, অশ্ব কি?

দু'বার শব্দটি উচ্চারণ করে সে চোখে-মুখে জিজ্ঞাসা-চিহ্ন এঁকে তাকিয়ে রইল মেয়েটির দিকে।

মেয়েটি বুঝল তুর্বাণের মনের কথা। সে জানে আইরণ জাতটি ছাড়া এই আকাশের তলায় আর কেউ জানে না অশ্বের খবর, অশ্বপালন আর তার ব্যবহারবিধি।

মেয়েটি হাত নেড়ে মুখ কাৎ করে জানাল, অশ্ব জীবটাকে সে যথাসময়ে তরুণ ববেরু-যাত্রীকে দেখাবে।

এবার মেয়েটি তুর্বাণকে দক্ষিণে তাকাতে ইঙ্গিত করল। তুর্বাণ দেখল, মালভূমি শেষ হয়ে দিগন্তের কোল পর্যন্ত আছড়ে পড়েছে মরুবালুকার তরঙ্গ। তার পক্ষে এ রাতে পথ চিনে সঙ্গীদের সন্ধান করে ফেরা অসম্ভব। তুর্বাণ ভাবল, মেয়েটি বিচক্ষণ আর অতিথিসেবায় তৎপর।

খাঁজ বেয়ে নেমে আসার সময় তুর্বাণের চোখে পড়ল বনের ওপারে একটা নদীরেখা। এতক্ষণ চাঁদের আলোয় নদীর স্রোতপ্রবাহ তার নজরে আসেনি। তুর্বাণ সেদিকে ইঙ্গিত করতেই মেয়েটি বলল, হারিরুদ নদী। আমরা ঐ নদীর তীর ধরে সবুজ তৃণভূমি ছুঁয়ে পথ চলি। যতদিন না একটা তৃণভূমি আমাদের পশুদের খাদ্য দিয়ে শূন্য হয়ে যায় ততদিন আমরা ঠাঁই বদল করার কথা ভাবি না।

সব কথা শোনার পর তুর্বাণ বুঝল নদীটার নাম হারিরুদ, আর তার তীরে বসবাস করছে এই মেয়েটির দলের মানুষগুলো।

ওরা নেমে আবার এল গুহার কাছে। আঁধিতে আঘাত পাওয়ার পর থেকে এই পাহাড়ে ওঠা নামা পর্যন্ত দীর্ঘ সময় কেটে গেছে। অসীম মনোবল আর দেহের যৌবনশক্তির জন্য এতক্ষণ শয্যাশায়ী হয়ে পড়েনি তুর্বাণ। কিন্তু এবার গুহার কাছে এসে ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ল সে।

আমি ঘুমোব, বলতে বলতে তুর্বাণ নত হয়ে ঢুকল গুহার ভেতর। সে প্রশস্ত গুহায় পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার চোখ জড়িয়ে এল ঘুমে।

রাত বাড়ছে। দিনের উত্তাপ বিলিয়ে দিয়ে ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হচ্ছে পাথুরে প্রকৃতি। গভীর রাতে প্রবল শীতে

ঘুম ভেঙে গেল তুর্বাণের। দিনের বেলা গরমে পথ চলার জন্য যে হালকা পোশাক ছিল তার গায়ে সেটুকু পোশাক এই পাহাড়ী রাতের শীতের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। সে উঠে বসে হাঁটুর ভেতর মুখ গুঁজে কাঁপতে লাগল।

একটু দূরে গুহার এক কোণায় বসে বসে ঘুমোচ্ছিল মেয়েটি। তুর্বাণের সাড়া পেয়ে তার ঘুম ভেঙে গেল। সে গুহার বাইরে বেরিয়ে গেল। শুক্লপক্ষের চাঁদ ডুবে গেছে তখন। চারদিক শীতল অন্ধকারের অতলে তলিয়ে গেছে।

বসে থাকতে থাকতে মনে হল তুর্বাণের, সারা শরীরটা তার অসাড় হয়ে আসছে। দাঁতে দাঁত চেপে বসে রইল সে।

হঠাৎ আগুন জ্বলে উঠল গুহার সামনে। প্রবল শীতের কুকুরটা যে মরণ কামড় কামড়ে ধরেছিল সেটা গুহা ছেড়ে পালিয়ে গেল। বাইরে কাঠ পুড়ছে আর ভেতরটা গরম হয়ে উঠছে।

এখন তুর্বাণ সিধে হয়ে বসে দেখছে মেয়েটিকে। এক এক টুকরো কাঠ মেয়েটি ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে আগুনের ভেতর, আর নরম অস্থিচর্বণের মত একরকমের শব্দ উঠছে তার থেকে। আগুনের লকলকে আলোটা নেচে বেড়াচ্ছে খানিকটা জায়গা জুড়ে। মেয়েটির মুখ ভাবলেশহীন। সে যেন নিষ্ঠার সঙ্গে তার নিত্য কর্তব্যগুলো করে যাচ্ছে। এ কাজের জন্য যেন তার অতিরিক্ত কোন চেষ্টাই নেই।

তুর্বাণের একবার মনে হল সে যেন স্বপ্ন দেখছে. একটা দুঃস্বপ্নের ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এখানে এসে পড়েছে সে। যে-কোনও মুহূর্তে এ স্বপ্নটা ভেঙে যেতে পারে আর তখন দেখবে নিজের ঘরের উত্তপ্ত বিছানায় সে শুয়ে আছে।

কিন্তু একথা ভাবতে গিয়ে কেমন-যেন মোচড় দিয়ে উঠল তার বুকখানা। তার মনে হল, হোক দুঃস্বপ্ন, তবু এই মুহূর্তে সে ছাড়তে পারবে না এই রহস্যময়ী মেয়েটির সঙ্গ।

কিছু পরে মেয়েটি ঢুকে এল গুহার ভেতর। আগুনের শিখা নিভে গেলেও জ্বল জ্বল করছিল অঙ্গার। তুর্বাণের মনে হল, লাল আগুনের টুকরোগুলো ঠিক যেন কয়েকখণ্ড রক্ত পাথরের মত ছড়িয়ে পড়ে আছে। তার মনে পড়ল সার্থবাহের দলের সঙ্গে শীলমোহর দেওয়া পেটিকায় বিক্রির জন্য যে অলঙ্কারগুলি আছে তার ভেতর রয়েছে, স্ফটিক, লাপীস লাজুলী, আকীক আর রক্তপাথরের মূল্যবান মালা। হঠাৎ তার মনে পড়তেই পোশাকের তলায় বুকের ভেতর হাত চলে গেল। একটি মূল্যবান পাথরের মালা রয়েছে তার গলায়। মালার মাঝখানে বুকের কাছে ঝুলছে একটি ধাতুর চাকতি। তার ওপর খোদাই করা রয়েছে তার নাম।

সেই মুহূর্তে একটা আবেগ উঠে এল তার বুক ঠেলে। সে গলার মালাটা অন্ধকার গুহার ভেতর খুলে ফেলল। মেয়েটি গুহার ঠিক কোন জায়গায় আশ্রয় নিয়েছে বুঝতে পারল না তুর্বাণ। সে মোলায়েম গলায়, কোথায় রয়েছ তুমি, কোথায়? বলে ডাকতে লাগল। অল্পক্ষণ পরেই তুর্বাণের গায়ে এসে লাগল মৃদু তপ্ত নিঃশ্বাস। তুর্বাণ বুঝল মেয়েটি কথা না বললেও অনেক কাছে সরে এসেছে।

সে হাত বাড়াতেই মেয়েটির গায়ের ছোঁয়া পেল। সে অনুভবে মেয়েটির হাতখানা ধরে বলল, ভয় নেই, কোনও ভয় নেই।

মেয়েটি ওর কথা বুঝতে পারল না ঠিক, কিন্তু খুব বেশী ভয়ের কারণ আছে বলে মনে করল না। সে জ্যোৎস্নার আলোয় দেখেছে তরুণটিকে। বলিষ্ঠ বিদেশী, কিন্তু মুখের কোথাও ধর্ষণকারীর চিহ্ন নেই।

তুর্বাণ মেয়েটির হাতে হারখানা দিয়ে বলল, তুমি বারবার আমাকে প্রতিকূল প্রকৃতির হাত থেকে রক্ষা করছ, এই মুহূর্তে আমার তোমাকে কিছু দিতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু এই হারখানা ছাড়া আমার কাছে আর কিছু নেই। তুমি এই হারটি নিলে আমার আনন্দের শেষ থাকবে না।

তুর্বাণের হারখানা হাতে নিয়ে মেয়েটি বাইরে বেরিয়ে গেল। ফিরল যখন তখন গুহার বাইরে ভোরের আয়োজন চলছে।

সে এসে দেখল তুর্বাণ আবার কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। গুহার ভেতরের দেওয়ালে হেলান দিয়ে অকাতরে

বসে বসে ঘুমোচ্ছে। দেওয়ালের ওপরের দিকে একটি ছিদ্রপথে আলো আসছিল। সেই নরম পরাগ ওড়ানো আলোয় মেয়েটি দেখল তরুণ তুর্বাণকে। সে হাঁটু গেড়ে বসে কতক্ষণ দেখতে লাগল। কোথা থেকে এল এই ঈশ্বরপ্রেরিত পথিক! শক্তি আর সৌন্দর্যে গড়া আশ্চর্য এক মূর্তি। এর দেহবর্ণ অনুজ্জ্বল, কিন্তু যৌবনের লাবণ্যে ভরা। আপন গোষ্ঠীর বাইরের এই আগন্তুকটি তার চোখদুটিকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করতে লাগল।

আলোর রশ্মি ছিদ্রপথে এখন এসে পড়েছে তুর্বাণের চোখে-মুখে। তার ঘুম ভেঙে গেল। ততক্ষণে মেয়েটি উঠে দাঁড়িয়েছে। তুর্বাণ গুহার ভেতর থেকে মেয়েটিকে দেখল। সিন্ধু নদীর জলে যেমন করে মধ্যাহ্নসূর্যের আলো একটা অতি শুভ্র দেহধারী নারীর মত সাঁতার কাটতে থাকে ঠিক তেমনি উজ্জ্বল আলোর মত মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। ভোরের সোনালি সূর্য তার শুভ্র দেহটাকে স্নান করিয়ে দিচ্ছে। তুর্বাণ অনিমেষে মেয়েটির চোখের দিকে তাকিয়ে ছিল, তার মূল্যবান পাথরে গাঁথা হারখানা দুলছিল মেয়েটির গলায়। তার মুখে একটা বিস্ময়মাখা হাসি লেগে ছিল।

তুর্বাণ বাইরে বেরিয়ে এসে মেয়েটির মুখোমুখি দাঁড়াল।

কে তুমি? কি নাম তোমার?

মেয়েটি কিছু না বুঝে শুধু হাসল।

তুর্বাণ নিজের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, আমি তুর্বাণ, তুর্বাণ। তুমি কে?

মেয়েটি বুঝতে পেরেছে তুর্বাণের ইঙ্গিত। সে বলল, উর্বী , আমি উর্বী।

তুর্বাণ বলল, তুমি উর্বী, সুন্দর তুমি!

উর্বী উচ্চারণ করল, তুর্বাণ, তুর্বাণ!

এক পরিত্যক্ত জনহীন প্রান্তরে সম্পূর্ণ অভাবিত এক সাক্ষাৎ ঘটল আর্যকন্যা উর্বীর সঙ্গে সিন্ধুতীরের মহেঞ্জোদাড়োর শ্রেষ্ঠীপুত্র তুর্বাণের।

প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে বিপুল এক অভিজ্ঞতা অপেক্ষা করছিল তুর্বাণের জন্য।

মনের খুশীতে তুর্বাণ ঘুরে বেড়ানোর চেষ্টা করলে তাকে বাধা দিল উর্বী। ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল ওর দলের লোকেরা জানতে পারলে তুর্বাণের আর রক্ষে থাকবে না। তারপর উর্বী তাকে প্রায় জোর করে টেনে আনল গুহার ভেতর। ওপরের ছিদ্রপথ দিয়ে তাকিয়ে দেখতে ইঙ্গিত করল।

তুর্বাণ ছিদ্রপথে চোখ রাখতেই ভেসে উঠল একটা বিস্তীর্ণ ভূভাগ। গতরাতে জ্যোৎস্নায় দেখা অস্পষ্ট বনভূমি যেন প্রাণ পেয়ে জেগে উঠেছে। সবুজের সমারোহের ফাঁকে ফাঁকে হারিরুদ নদীর জল ঝিকিয়ে উঠছে ধারাল অসির মত। আর বনভূমির সামনে বিরাট যে পশুচারণ ক্ষেত্র, তা ঘন সবুজে ঝলমল করছে, তাতে ভোরবেলাতেই চরে বেড়াচ্ছে গাভীরা!

দূরে কাছে বড় ছোট অনেকগুলি ছাউনি। অতি সাধারণ গঠনের এসব বাসগৃহ। তার নিজের নগরে যে ধরণের ইঁটের তৈরি বাসগৃহ, আর যেভাবে পরিকল্পিত, এগুলি সে তুলনায় নিতান্তই নগণ্য।

কয়েকটি মেয়েকে সে দলবদ্ধ হয়ে বনের দিকে এগিয়ে যেতে দেখল। অল্প উঁচু একটি টিলার ওপর দিয়ে ওরা যখন ঢেউ খেলানো রাস্তায় ওঠা-নামা করতে করতে চলছিল তখন তুর্বাণের মনে হল একঝাঁক প্রজাপতি নাচতে নাচতে বনের পথে এগিয়ে চলেছে। ওদের হাতে ছিল জলভরণের পাত্র। এত দূর থেকে ওদের কথাগুলো স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল না, কিন্তু ওদের মুখ আর হাতের সঞ্চালন থেকে অনুমান করা যাচ্ছিল ওরা সম্মেলক কোনও গান গাইতে গাইতে চলেছে।

সবকিছু একটি সুন্দর ছবির মত মনে হচ্ছিল তুর্বাণের। বনের সবুজ গাছপালার ভেতর ওরা নাচতে নাচতে হারিয়ে গেল একসময়।

তুর্বাণ গুহা থেকে বেরিয়ে এসে মালভূমির এক চত্তরে দাঁড়াল, যেখানে সমতলের ঐ মানুষগুলির নজর এসে পড়ে না। সে দেখল, গত রাতে যে খাঁজকাটা পাহাড়টায় ওরা উঠেছিল তারই গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে উর্বী বনের দিকে তাকিয়ে আছে। বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছিল তাকে।

তুর্বাণ কিছুতেই ভেবে কিনারা করতে পারল না, উর্বী এই পাহাড়ে কেন ভোগ করছে নিঃসঙ্গ নির্বাসন-যন্ত্রণা। দাঁড়িয়ে আরও কত কথা ভাবল তুর্বাণ। কি করে এই পতিত প্রান্তর আর পর্বতে আহার সংগ্রহ করে উর্বী? কাল যখন অজ্ঞান অবস্থা থেকে জেগে উঠেছিল সে, তখন উর্বী তার মুখে ঢেলে দিয়েছিল দুধ আর কি যেন এক উত্তেজক পানীয়, যা তার ক্লান্ত দেহটাকে তাজা করে তুলেছিল। জিহ্বা স্পর্শ করা মাত্র সেই বিশেষ পানীয় বিদ্যুতের মত মুহূর্তে একটা উত্তাপ ছড়িয়ে দিয়েছিল তার শিরা-উপশিরা বাহিত রক্তে। তার স্নায়ুতন্ত্রী সাধতে শুরু করেছিল অশ্রুতপূর্ব এক সঙ্গীতের সুর।

কোথায় পেল সে পানীয় উর্বী? ঐ সমতলের মানুষগুলির সঙ্গে যোগাযোগ না থাকলে তার পক্ষে কোনও কিছু পাওয়া যে অসম্ভব!

চাপা গলায় উর্বীকে ডাকল তুর্বাণ। ওর ডাক শুনে যেন স্বপ্ন থেকে চমকে উঠল উর্বী। সে তুর্বাণের কাছে এসে জিজ্ঞাসু চোখ মেলে তাকাল।

তুর্বাণ দেখল উর্বীর নীল তারা দুটি যেন সদ্য শিশির-স্নান করে উঠেছে। তুর্বাণ ভাবল, কোনও সুখ অথবা দুঃখের দিনের স্মৃতি আজ তাকে আহত করেছে।

সমতল বনের দিকে ইঙ্গিত করে তুর্বাণ বলল, কারা বনের ভেতর গান গাইতে গাইতে ঢুকে গেল উর্বী?

উর্বী অনুমানে বুঝল বনের পথে হারিয়ে যাওয়া ঐ মেয়েগুলির কথাই বলছে।

সে দুটি হাতে অঞ্জলি রচনা করে যেন নদী থেকে জল তুলে নিজের মাথায় ঢালল। তারপর বলল, ওরা আমাদের গোষ্ঠীর মেয়েরা, ভোরের নদীতে চলেছে স্নানের জন্য।

তুর্বাণের মনে হল, সুন্দর একটা ছন্দ আছে মেয়েটির অঙ্গ-সঞ্চালনে।

কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা ছবি ভেসে উঠল তার চোখের ওপর।

।। দুই ।।

নাচছে আন্দ্রা। বাম বাহুমূল থেকে মণিবন্ধ পর্যন্ত ধাতু-বলয়ের শোভা। মহেঞ্জোদাড়োর অষ্টাদশী নগরনটী আন্দ্রা। দক্ষিণ বাহু প্রায় নিরাভরণ। সেই মুক্ত বাহুতে ফুটে উঠেছে অজস্র মুদ্রা। পশ্চাতে লম্বমান বেণীবদ্ধ শিথিল কেশ। ললাটে মণিময় স্বর্ণবেষ্টনী। কটিতট থেকে লম্বমান মালার লহরে গাঁথা মেখলা। সীমান্তের মুখসাজে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বর্ণগোলক।

আন্দ্রা নাচছে। স্বর্ণ ও রক্তপাথরে গাঁথা দন্তুর চক্রাকার কণ্ঠহার নৃত্যের তালে তালে লাফিয়ে উঠে স্পর্শ করচে স্তনাগ্রচূড়া।

বিহ্বল ক'টি যৌবনমদির চোখ লগ্ন হয়ে আছে আন্দ্রার প্রস্ফুটিত প্রায় নগ্ন দেহে।

বিদেশে যাত্রার আগে এ হল মঙ্গল-মহোৎসব। যুবা বন্ধুদের সান্নিধ্যে নগরনটীর গৃহে তুর্বাণের নিশিযাপন।

নাচের শেষ অঙ্কে সম্মানীয় অতিথিকে আন্দ্রা করল আরতি। ফুলের মালা পরিয়ে বরণ করল, আর হাতে পরিয়ে দিল বন্ধন-সূত্র। তুর্বাণ বিদেশে গেলেও বাঁধা রইল আন্দ্রার কাছে। এর অর্থ, নগরনটীর আকর্ষণে সমস্ত বিপদ মুক্ত হয়ে বাণিজ্যে প্রভূত লাভ করে তুর্বাণ ফিরে আসবে নিজ নগরে। ফিরে আসার পর একমাত্র নগরনটীই ছিন্ন করে দেবে বন্ধন-সূত্র। তাই যতকাল বিদেশবাস চলবে ততকাল অত্যন্ত সাবধানে রক্ষা করতে হবে বন্ধন-সূত্র।

নিশিথের শেষ যামে বন্ধুরা চলে গেল যে যার ঘরে। আন্দ্রার নগর-ভবনে একাকী শুয়ে আছে তুর্বাণ। পরদিন বিদেশযাত্রার রোমাঞ্চ-উত্তেজনায় ঘুম আসেনি চোখের পাতায়। নিমিলিত চোখে শয্যায় শুয়ে সে কল্পনায় দেখছে দূর দুর্গম বিদেশের ছবি। আশৈশব নগরপ্রধান পিতা গুর্বাকের কাছে সে শুনে এসেছে নানা দেশের রীতি আচরণের কথাকাহিনী। পথরেখাগুলি যেন স্পষ্ট খোদিত চিত্রের মত আঁকা হয়ে আছে তার চোখের সামনে। সে অনেক ভাষা শিখেছে বহুদর্শী পিতা ও পিতৃবন্ধুদের কাছ থেকে। যাত্রার কয়েক দিনের মধ্যে গিরিপথ পার হবার আগে তারা পাবে তাদের পূর্বজ্ঞাতি ব্রাহুইদের। তাদের ভাষা কিছু পরিবর্তিত

হলেও দুর্বোধ্য ঠেকবে না তাদের কাছে। সেখানে তারা স্বীকৃতি আর সম্মান পাবে। তারপর কয়েকটি পার্বত্য জাতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বসতি পেরিয়ে একটি মালভূমিতে গিয়ে পড়বে তারা। সেখান থেকে যাবে দুই নদীর মাঝে দোয়াব অঞ্চলে। অসুবিধে হবে না ঐ অঞ্চলের মানুষদের সঙ্গে বাক্যের বিনিময়ে। সে আরও শিখেছে বহু দূর দেশের একটি ভাষা। নীলনদের দেশ সেটি। সেখানকার বণিকেরা জলপথে এসে বাণিজ্য-সংযোগ স্থাপন করে গেছে তাদের সঙ্গে। স্থলপথে পিতার আমলেই তাদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে একবার। তুর্বাণ ভাবল, এ যাত্রায় অবশ্য তাকে যেতে হচ্ছে না সেই নীল নদীর দেশে। তবে আরও অভিজ্ঞ হলে বাবা তাকে নিশ্চয়ই যেতে দেবেন সেইসব দূরের দেশগুলিতে।

ভাবতে ভাবতে তুর্বাণ অনেক অনেক দূরে চলে গিয়েছিল, হঠাৎ কার পায়ের সাড়ায় চোখ মেলে তাকাল।

আন্দ্রা খোলা দরজার কপাটে বলয়পরা বাম হাতখানা রেখে দাঁড়িয়ে আছে তার দিকে চেয়ে। ওকে তাকাতে দেখেই এক ঝলক হাসি মুখে ফুটিয়ে আন্দ্রা বলল, রাতটা যে জেগেই কাটল। চোখ বুজে কার স্বপ্ন দেখছিলে এতক্ষণ? নিশ্চয়ই কোন বিদেশিনীর?

তুর্বাণের গলায়ও রসিকতার সুর বাজল, কল্পনায় বিদেশে বসে আন্দ্রার মুখখানাই ভেসে উঠেছিল বার বার।

আন্দ্রার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। তার গলাটা কেঁপে উঠল, নগরনটীর মুখ দূর বিদেশে কেউ মনে করে না তুর্বাণ। আর মনে রাখতেও নেই। আমরা শুধু ঘরে ফিরিয়ে আনার মন্ত্র পড়তে জানি, মনে বাসা বাঁধার মন্ত্র জানি না। তাই আমাদের কেউ কোনওদিন মনে রাখে না। নগদ পাওনা হাতে-হাতেই চুকিয়ে দেয় সবাই, ঋণের দায় রাখে না কেউ।

তুর্বাণের তাজা প্রাণটা সেই মুহূর্তে টগবগিয়ে উঠেছিল। সে অমনি বলেছিল, তোমার বন্ধন-সূত্র যদি আমাকে বিপদের মুখ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারে , তা হলে জেনো আন্দ্রা আমাদের মনের বাঁধন চিরদিন অটুট থাকবে।

ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছিল আন্দ্রা, তুর্বাণ তীব্র স্রোতের গতিতে এগিয়ে গিয়ে ধরল তার আঁচল। কুমোরের চাকের মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল নগরনটী আন্দ্রা। জোরে জোরে শ্বাস টানতে টানতে বলল, আমরা নটী, তুর্বাণ। ভালবাসার অভিনয় ক'রা আমাদের ধর্ম, কিন্তু ভালবাসা পাপ। তাই আমরা অভিনয় করে আনন্দ পাই, ভালবাসার দুঃখ পাই না কোনদিন। তুমি আমাকে চিরদিনের বাঁধনের কথা বলে ভালবাসার কান্না কাঁদিও না। আর আমরা অন্যকে বেঁধে রাখলেও কারো বাঁধনে বাঁধা পড়ি না কখনো।

তুর্বাণ মোহগ্রস্তের মত তাকিয়ে রইল আন্দ্রার মুখের দিকে। তার হাত থেকে কখন খসে পড়ে গেল আন্দ্রার আঁচলখানা।

আন্দ্রা কিন্তু সে আঁচল বুকে তুলে নিল না। সে বলল, তুর্বাণ রাগ কোর না আমার ওপর। আজ রাত পোহালেই তুমি ছেড়ে যাচ্ছ এ নগরী, এ সময় মন হারাতে নেই। একদিন যখন তুমি হবে এ নগরীর প্রধান সেদিন আমি তোমার জন্য রাতের প্রদীপ জ্বেলে বসে থাকব। তুমি সেদিন আমার ঘরে এলে নতুন নতুন গানে তোমাকে আহ্বান জানাব, নতুন নতুন নাচের মুদ্রায় আমার সব আকুতি তোমার পায়ে ঢেলে দেব।

ভোরের এক ঝাঁক পাখি কলরব করতে করতে উড়ে গেল। সিন্ধুনদ থেকে বয়ে এল ঠাণ্ডা স্নিগ্ধ একটা হাওয়া।

আন্দ্রা আঁচল বুকে টেনে নিয়ে নত হয়ে দুটি হাত জোড় করে নমস্কার করল তুর্বাণকে। তুর্বাণ ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল রাজপথে।

।। তিন ।।

তুর্বাণকে অন্যমনস্ক হয়ে ভাবতে দেখে উর্বী অবাক চোখে তার দিকে তাকিয়েছিল। হঠাৎ কুয়াশার একটা প্রান্তর পেরিয়ে এসে তুর্বাণ যেন সামনের স্পষ্ট পৃথিবীটাকে দেখতে পেল। উর্বী তার দিকে স্থিরচোখ মেলে চেয়ে আছে দেখে লজ্জিত হল তুর্বাণ। বিদেশী তরুণটির এ সংকুচিত ভাবটুকু ভারী ভাল লাগল উর্বীর।

তুর্বাণ বলল, অনেক দূরের ছেড়ে আসা দেশের কথা মনে পড়ে গেল উর্বী, তাই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম।

উর্বী বিষয়টা ঠিক উপলব্ধি করতে পারল না। সে শুধু তুর্বাণের সকরু া মুখখানা দেখে সহানুভূতিসূচক মাথা নাড়ল।

তুর্বাণ এসো আমার সঙ্গে, বলে উর্বী ডাক দিল তুর্বাণকে। উর্বীর পেছন পেছন তুর্বাণ এল পাশের একটা পাহাড়ে।

এখানে পাহাড়টার কোল জুড়ে অর্ধচন্দ্রাকার একখণ্ড চাতাল। ওপর থেকে ঝুঁকে পড়া পাহাড়ের মাথাটা চন্দ্রাতপের মত চাতালটাকে রোদের হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে। ভোরের আলো ওপরে উঠলেই রোদের আঁচলটা সরে যায়। পাতলা ছায়ার একটা ওড়না বিছিয়ে পড়ে থাকে সেখানে।

এ জায়গাটা বড় নিভৃত। এখান থেকে বাইরের পৃথিবীর কোন ছবি দেখা যায় না। শুধু নীল আকাশে আলো আর মেঘের খেলা দেখা যায়। কখনো বা ধরা পড়ে পাখিদের উড়ে চলার দৃশ্য।

উর্বী তুর্বাণকে নিয়ে এল তার সেই একান্ত নিভৃত জায়গাটিতে। সে ইঙ্গিতে তুর্বাণকে বসতে বলল। তুর্বাণ বসলে তার একটু দূরে পাহাড়ের গা ঘেঁষে বসল সে। পাহাড়ের একটা ফাটল থেকে উর্বী বের করল কয়েকটা পাত্র। একটি পাত্রে পনীর, অন্য পাত্রে খানিকটা ক্ষীর, আর একটি পাত্রে এক ধরণের তরল পদার্থ।

পাত্র তিনটি নিয়ে এবার সরে এল সে তুর্বাণের কাছে। তুর্বাণের সামনে সেগুলো বসিয়ে রেখে বলল, কাল রাত থেকে তুমি অভুক্ত রয়েছ। সামান্য দুধ আর সোমসুরা ছাড়া কিছুই খাওনি। এখন এটুকু খেয়ে নাও। মধ্যাহ্নে অলুপ করণ্ড আর মধু আসবে, তখন দুজনে ভাগ করে খাওয়া যাবে।

তুর্বাণ বুঝল তাকে কিছু খাবার কথা বলছে উর্বী। সে আচমনের জন্য জলের সন্ধান করতেই উর্বী তাকে নিয়ে এল পাহাড়ের পশ্চিম প্রান্তে। সেখানে পাহাড়ের খাঁজে একটি গোলাকার গহ্বর সৃষ্টি হয়েছে। তার ভেতর পূর্ণ হয়ে আছে জল। একটি চর্মনির্মিত জলপাত্র পড়ে আছে গহ্বরের পাশে। তুর্বাণ বুঝল অনেক নীচের ঐ হারিরুদ নদী থেকে চর্মপাত্রে জল এনে পূর্ণ করা হয় গহ্বরটি। এই জল নিত্যকর্মে ব্যবহারের জন্য লাগে।

উর্বী জলের জায়গাটি দেখিয়ে দিয়ে ফিরে গেল পূর্বস্থানে। তুর্বাণ চোখেমুখ জল ছিটিয়ে আচমন করল। সে দেখল স্থানটি জল-সংরক্ষণের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত। সারাদিন সূর্যের প্রখর তেজ থেকে কয়েকটি ভাঙা ভাঙা পাহাড়ের চূড়া এই জলকুণ্ডটিকে রক্ষা করে। পশ্চিমের শেষ সূর্যের কোমল ক্লান্ত দু'এক টুকরো রশ্মি পাহাড়ের ফাঁকে এই কুণ্ডটিকে ছুঁয়ে যেতে পারে মাত্র।

তুর্বাণ পূর্বস্থানে ফিরে এল। ইতিমধ্যে কয়েকটি শুষ্কপ্রায় বৃক্ষপত্রে খাবার সাজিয়ে রেখেছে উর্বী। তুর্বাণ পনীর আর ক্ষীরটুকু খেয়ে নিল। এবার তার দিকে উর্বী পানীয়ের পাত্রটা এগিয়ে ধরল। সে তরল পদার্থটুকু জল মনে করে যেই গলায় ঢেলেছে অমনি একটা তীব্র জ্বালায় জ্বলে উঠল তার গলা আর বুকটা।

সে পানপাত্রটা সামনে রেখে দিয়ে এমন মুখভঙ্গী করল যা দেখে উর্বী অবাক না হয়ে পারল না।

পরে বুদ্ধিমতী উর্বী বুঝতে পারল এ ধরণের সুরা পানে অভ্যস্ত নয় তুর্বাণ।

সে একটু দূরে সোমসুরার পাত্রখানা সরিয়ে রেখে তুর্বাণকে বুঝিয়ে দিল, সে তার অনভ্যস্ত অসুবিধের কথাটুকু বুঝতে পেরেছে।

এরপর তুর্বাণ ফিরে এল গুহায়। উর্বী থেকে গেল বাইরে। উর্বীর পক্ষে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়ানোর বাধা নেই, কিন্তু তুর্বান এখানে একেবারে অনভিপ্রেত। তাই অতি সাবধানতার আশ্রয় নিতে হয়েছে তাকে। উর্বী

ইঙ্গিতে তুর্বাণকে বলে দিল ছিদ্রপথে যেন সে এখন চোখ রেখে তাকায়।

গুহার ভেতর ফিরে এসে আবার সেই ছিদ্রপথে চোখ রাখল তুর্বাণ। এবার তাকে প্রায় হতবাক করে দিল একটা দৃশ্য। অশ্ব নামের যে জীবটির কথা সে শুনেছিল, তাদের কয়েকটিকে মুক্ত প্রান্তরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। বেশ তেজী আর বলিষ্ঠ সে জীবগুলো। গর্দভের চেয়ে আকৃতিতে বেশ বড়। লাল সাদা আর কালো রঙের জীবগুলো মুখ উঁচু করে দাঁড়িয়ে পা ঠুকছিল। অশ্বের ওপরে আরোহণ করেছিল কয়েকজন বলিষ্ঠ দেহধারী পুরুষ। উর্বীর মত শুভ্র তাদের দেহের রঙ। হাতে তাদের আকাশমুখী বর্শা।

হঠাৎ কোথা থেকে দুন্দুভি বেজে উঠল। অমনি ঝড়ের বেগে ছুটে আসতে লাগল সেই অশ্বারোহী মানুষগুলো। একে অন্যকে অতিক্রম করার চেষ্টা করছে। বাম হাতে ধরে রেখেছে রজ্জু ডান হাতে বর্শা। এখন বর্শার মুখ সামনের দিকে নিবদ্ধ। ক্ষিপ্রবেগে ডান হাতখানা একবার পেছনের দিকে টেনে মাটির সঙ্গে সমান্তরাল বর্শাখানা ছুঁড়ে মারল ওরা। যেন হাওয়ায় ভেসে চলে গেল কয়েকটা লম্বমান সরীসৃপ।

তুর্বাণ দেখল পাহাড়ের সানুতে সারিবদ্ধ যে গাছগুলি দাঁড়িয়ে আছে, তাতে বিদ্ধ হয়ে গেছে সব কটি বর্শা। এত বেগে সেগুলিকে নিক্ষেপ করা হয়েছে যে তাদের দণ্ডগুলি মাটির সঙ্গে তেমনি সমান্তরাল থেকে গেছে, ফলকগুলি বৃক্ষকাণ্ডের গভীরে প্রবেশ করেছে।

তুর্বাণের মাথায় এল না, কিভাবে এ কাজ সম্ভব। তাদের সিন্ধুনগরীতে যে তাম্রফলকযুক্ত বর্শা তারা ব্যবহার করে, সেগুলোতে গাছের কঠিন কাণ্ড বিদ্ধ হবে সে কথা তারা ভাবতেই পারে না। কোনও তস্কর বা মৃগজাতীয় জীবের ওপরই সাধারণতঃ তারা তাদের বর্শাগুলি নিক্ষেপ করে থাকে। এ ধরনের বর্শার ফলকগুলি কোন শক্ত ধাতুতে গড়া তা বুঝতে পারল না তুর্বাণ।

পরমুহূর্তে পরিবর্তিত হয়ে গেল রণকৌশল। হাতের রজ্জুতে টান দিতেই বিদ্যুৎবেগে তীক্ষ্ণ চীৎকারের সঙ্গে সামনের দুটো পা শূন্যে তুলে দাঁড়াল অশ্বগুলো। তারপর পশ্চাৎদিকে ক্ষিপ্রবেগে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলিষ্ঠ দেহগুলোকে যেন ঝড়ের হাওয়ায় ভাসিয়ে দিলে। অশ্বারোহীরা এখন কটিদেশ থেকে টেন বার করেছে কুঠার। তারা অদৃশ্য শত্রুদের বধ করার জন্য যেন ছুটে চলেছে। কতকগুলো পত্র আর কাষ্ঠ নির্মিত ঘরের সারি। তার পেছনে বড় বড় কতকগুলো গাছের জটলা। হঠাৎ সেই ঘরের সারির আড়াল থেকে হুঙ্কার শব্দ তুলে বেরিয়ে এল কতকগুলি পদাতিক সৈন্য। হাতে অসি, দেহ ও মস্তক বর্মে আঁটা। তারা অসি সঞ্চালন করতে করতে এগিয়ে আসতে লাগল। সূর্য-কিরণে ঝলসে উঠল তাদের তরবারির শাণিত অংশগুলি। পেছনে এসে দাঁড়াল একটি সজ্জিত অশ্ববাহিত রথ। খদির কাষ্ঠ নির্মিত চক্রগুলি পথের ওপর আর্তনাদ তুলে এগিয়ে আসতে লাগল। রথারূঢ় ব্যক্তির হাতে ধনুঃশব। সামনে জ্যা আকর্ষণ করে পক্ষযুক্ত শরনিক্ষেপ করে চলেছে রথারোহী যোদ্ধা। নিক্ষিপ্ত শবগুলো বিদ্ধ হতে লাগল গাছের কাণ্ডগুলিতে। কখনো বা কুঠারধারীদের উষ্ণীষগুলো বাণের ঘায়ে শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়ে পড়তে লাগল ভূতলে। অশ্বগুলি মধ্যে মধ্যে সামনের পা উর্ধ্বে তুলে চীৎকার করতে লাগল। কোলাহলে, অসি ও কুঠার সঞ্চালনে সামনের বিস্তীর্ণ প্রান্তর রণক্ষেত্র বলে মনে হতে লাগল তুর্বাণের। যোদ্ধারা নানাবিধ রণকৌশল প্রদর্শন করে এক সময় অন্তর্হিত হল।

তুর্বাণ মোহগ্রস্তের মত দেখছিল এইসব দৃশ্য, পিছনে হঠাৎ নিঃশ্বাসের শব্দ শুনে ফিরে তাকাল। উর্বী তার দিকে তাকিয়ে আছে।

মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে উর্বী বলল, অশ্বারোহীদের দেখলে তো? রথারোহী, অশ্বারোহী পদাতিক এরা সব যুদ্ধের মহড়া দিচ্ছিল। এখন প্রতিদিন চলছে যুদ্ধের মহড়া। দলে দলে ওরা চলে যাচ্ছে ইলামে। একটা বড় যুদ্ধের জন্য তৈরি হচ্ছে ওরা।

তুর্বাণ বিশেষ কিছু না বুঝেও মাথা নাড়ল। উর্বী যে আজকের যুদ্ধকৌশল সম্বন্ধে কিছু বলছে তা সে অনুমানে বুঝতে পারল.

গতরাতে ক্লান্তিতে কাটিয়েছে তুর্বাণ, আজও তার দেহ থেকে আঘাতের ব্যথা সম্পূর্ণ দূর হয়ে যায়নি। সে ক্লান্ত চোখে তাকিয়ে আছে দেখে উর্বী তাকে বিশ্রাম করতে বলে বেরিয়ে গেল বাইরে।

।। চার ।।

গুহার ভেতর তুর্বাণ বসে বসে ভাবতে লাগল তার সঙ্গী মানুষগুলির কথা। কাল বেলা শেষের আঁধিতে তারা কে কোথায় ছিটকে পড়েছে। তাদের সবার কাছ থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে এসেছে। এমন এক জায়গায় প্রকৃতির তাড়নে এসে পড়েছে সে, যেখান থেকে নিজের ক্ষমতায় পথ চিনে যাওয়া তার পক্ষে খুবই কষ্টকর।

তুর্বাণ ভাবতে লাগল, ওরা কি তার জন্য কোথাও অপেক্ষা করছে, না যাত্রাপথে বিরতি না দিয়ে গন্তব্যস্থানের অভিমুখে চলে গেছে? দূর পথযাত্রায় শুধু চলাই বণিকের ·াছে মন্ত্র, থেমে থাকা তাদের ধর্ম নয়। একথা সে শুনে এসেছে বণিকদের মুখে দীর্ঘকাল। তার বাবা নগরপ্র·ান গুর্বাক যৌবনে নাকি এমনি একবার বহর-ছাড়া হয়ে পড়েছিলেন। সেবার ছিল তরুণ গুর্বাকের নৌ-যাত্রা। বজরার বহর চলেছিল নীল সমুদ্রের বুক মন্থন করে। সাদা আর গৈরিক পাল বাতাসের স্পর্শসুখে স্ফীত হয়ে উঠেছিল। বহু দাঁড়যুক্ত নৌকার বহর তালে তালে চলছিল আশ্চর্য সব শব্দতরঙ্গ সৃষ্টি করতে করতে। সাদা সাদা সমুদ্রপাখিরা সৈকত ছেড়ে কতদূর উড়ে এসেছিল বহরের সঙ্গে। এক সময় কূল অতি দূরে ফেলে এসেছে অনুমান করে তারা পাখা টেনে ফিরে গেল।

ওরা চলছিল সুসানগরে ব্যবসায়ের পণ্য নিয়ে। তখন ভারতীয় বণিকদের ঘাঁটি উর, উম্‌মা বা সুরুম্পক নগরের অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু বণিকদের কারবার উঠে যায়নি। উপসাগর থেকে ইলাম বা বরেরুতে মাল লেনদেনের সুবিধে ছিল। ববেরুর বণিকরা এসে অনেক মূল্য দিয়ে তুলে নিয়ে যেত সিন্ধু নগরীর পণ্য। ইলামেও বণিকদের যাত্রা ছিল অব্যাহত।

সেবার মহেঞ্জোদড়োর বণিকদের নৌকায় চলেছিল সেগুনের মূল্যবান কাঠ, হিমালয়-জাত দেওদার, পাথরের রঙীন মালা, গজদন্তের সুদৃশ্য খেলনা, রৌপ্যপাত্র, নিপুণ কারুকার্য খচিত সোনার অলঙ্কার, সূক্ষ্ম কার্পাসবস্ত্র আরও অজস্র সম্ভার। বণিকদের মুখে ফুটে উঠেছিল ব্যবসায়িক লাভের একটা উজ্জ্বল ছবি। তারা গান গাইছিল। গল্প করছিল নানাদেশের বাণিজ্যের কথা নিয়ে।

বুড়ো মাঝি লারকুন গল্প করছিল। বহুযুগের প্রচলিত গল্প। সুমের দেশের আদি মানুষদের সঙ্গে নাকি তাদের সিন্ধুনগরীর মানুষের যোগ ছিল।

সুমেরে প্রবাদ আছে, 'ইয়া' নামে মৎস্য-নর আথাল-পাথাল সাগরের ঢেউতে দোল খেতে খেতে একদিন এসে পৌঁছেছিল সুমের দোয়াবের মুখে জলাভূমিতে। জায়গাটা তার ভারী পছন্দ হয়ে যায়। এখানেই সে মনের খুশীতে বসবাস করতে থাকে। সুমেরুয়রা হল তারই বংশধর।

বুড়ো লারকুন বলছিল, সিন্ধুনগরীর আদি বাসিন্দারা নৌকা করে উত্তাল সাগর পার হয়ে একদিন এই সুমের দোয়াবে বাসা বেঁধেছিল। তারা নৌকা করে এসেছিল সমুদ্দুরে ভাসতে ভাসতে, তাই তারা সুমেরুয়দের কাছে আদি পুরুষ উয়া বা মৎস্য-নর।

তরুণ গুর্বাক শুনছিলেন সে কাহিনী। তিনি আগেই শুনেছিলেন, তাঁদেরই কোনও পূর্বপুরুষে তৈরি করেছিল উর, উম্‌মা, উরুক, সুরুম্পক নগরগুলো। তাঁরা ঐসব নগরীতেই বসবাস করতেন। সে সময় তাঁদের মনের যোগ ছিল সিন্ধুপারের আদি জ্ঞাতিদের সঙ্গে। তারাও বছরে বছরে নৌকাতে পণ্য নিয়ে আসত এইসব নগবীতে। সে সময় যোগাযোগ ছিল অনেক ঘনিষ্ঠ।

এমনি সব ভাবনা নিয়ে চলেছিলেন তরুণ গুর্বাক। বহরের প্রথমে ছিল মূল্যবান কাঠ বোঝাই নৌকা। তারপর মনোহারী কাঠের বাক্স আর খেলনার নৌকা। তৃতীয় নৌকাতে ছিল মহেঞ্জোদড়োতে তৈরি বিশেষ ধরণের সব পোড়ামাটির পাত্র। লাল আর কালোরঙের বিচিত্র নক্সাকাটা, উজ্জ্বল চকচকে পালিশ দেওয়া! পরের নৌকাটি বোঝাই ছিল সূক্ষ্ম বস্ত্রে। তার সঙ্গে ছিল ত্রিপত্রের কাজ করা উত্তরীয়। সিন্ধুনগরীর মেয়েদের নরম হাতে কাটা কার্পাসের সুতোয় তৈরি সব কাপড়। এসব কাপড়ের বিপুল চাহিদা। সুমের থেকে নীলনদের দেশগুলি পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগের মানুষেরা সিন্ধুনগরীর এইসব সূক্ষ্ম বস্ত্রের বিশেষ

অনুরাগ। শণজাতীয় সুতোর তৈরি কাপড়ের চেয়ে এইসব কুয়াশার মত পাতলা কার্পাসবস্ত্র ছিল তাদের কাছে বিশেষ প্রিয়।

সবশেষের নৌকাতে ছিলেন সিন্ধুনগরীর সবচেয়ে সমৃদ্ধ সুবর্ণ বণিকের ছেলে গুর্বাক। তাঁর নৌকা আগের নৌকাগুলোর মত পণ্যসম্ভারে বোঝাই ছিল না। তবে মূল্যবান রত্নখচিত অলঙ্কারের কয়েকটি পেটিকা ছিল তাঁর নৌকায়।

অনুকূল বাতাসে পশ্চিমমুখে চলছিল পুরো বহরটি। শীতের নীল সমুদ্র শান্তিতে সোনালী রোদ্দুর পোহাচ্ছিল। বেলাশেষের সূর্য একসময় ডুবে গেল পশ্চিম সমুদ্রে। কতক্ষণ চলল নীল, সাদা আর লালের খেলা। তারপর শুধু কালো কালো ঢেউয়ের ছোট ছোট ওঠা-নামা, মাঝে মাঝে সাদা সাদা ফেনার ঝিলিক দিয়ে জেগে ওঠা।

মাঝিরা রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। কেউ বা গান ধরেছিল চড়া সুরে। জোর গলায় কথা হচ্ছিল নৌকা থেকে নৌকায়। ঠিক যেমন পাশাপাশি বাড়িগুলোতে হাঁক-ডাক করে কথা হয়।

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে ওরা ঘুমিয়ে পড়ল। শুধু জেগে রইল কয়েকটি মাঝি আর দাঁড়ি। আকাশে সেদিন চাঁদ ছিল না। অন্ধকারে প্রায় সবক'টা নৌকাই অদৃশ্য। কিন্তু অন্ধকার যত ঘনিয়ে ওঠে, মাঝিদের পক্ষে পথ চলা ততই সুবিধে।

আকাশের নক্ষত্র তখন তাদের পথ চেনায়। উত্তরের স্থির নক্ষত্রটা থাকে তাদের লক্ষ্যের ভেতর। তার দিকে চোখ রেখে মাঝিরা হাল ধরে বসে থাকে।

বাতাস ছিল না সে-রাতে। মাস্তুলটা দাঁড়িয়েছিল ঠিক যেন একটা কালো স্তম্ভ। পালের সাজ পরিত্যক্ত কাপড়ের মত পড়েছিল পাটাতনের ওপর। নৌকার গতি ছিল মন্থর। হঠাৎ শেষরাতে পেঁজা তুলোর রাশ যেন হাওয়ায় ভেসে এল। মাঝিরা চোখে না দেখেও গায়ের ওপর অনুভব করল তাল তাল কুয়াশার তুলো।

ওদের ভেতর তখন একটা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। কুয়াশায় পথ চিনে ভেসে চলা অসম্ভব। পাতলা কুয়াশা হলে আশপাশের নৌকার সঙ্গে যোগাযোগ রাখা সম্ভব, কিন্তু কুয়াশা ঘনঘটায় ঘিরে ধরলে সমূহ বিপদ। তখন কেউ কাউকে দেখতে পাবে না। নিজেরাও হদিশ পাবে না দিকদিশাহীন সমুদ্রে কোথায় তারা ভেসে চলেছে।

দিনের সূর্য উঠতেই রাতের আঁধার কেটে গেল। কিন্তু দেখা গেল না সূর্যের মুখ। ঘন কুয়াশায় জল আর আকাশ একাকার। শুধু নৌকার দোলানি থেকে বোঝা যাচ্ছিল তারা জলের ওপর রয়েছে। প্রথমে ওরা পরস্পরের কাছাকাছি থাকার জন্য ডাকহাঁক শুরু করে দিল, কিন্তু ধীরে ধীরে গলার আওয়াজ কাছে দূরে বাজতে বাজতে মিলিয়ে যেতে লাগল। মধ্যাহ্নের কাছাকাছি যখন কুয়াশা কেটে গিয়ে রোদ্দুর দেখা দিল তখন গুর্বাকদের নৌকাটাকে দেখা গেল নিঃসঙ্গ জলের ওপর ভাসছে। মৌসুমী হাওয়ার বেগ কমে যাওয়ায় মাঝির পক্ষেও দিক চেনার তুকগুলো আর কাজে লাগছিল না। যতদূর দেখা যায় দিগন্তে নীল আকাশ ছুঁয়ে শুধু জল আর জল। স্থলরেখার চিহ্নমাত্র নেই।

ওরা দাঁড় না টেনে নৌকাটাকে শুধু স্রোতের মুখে ছেড়ে দিল। নৌকা ভাসতে ভাসতে এগিয়ে চলল। মাঝি আর দাঁড়িরা স্রোতের গতি থেকে এটুকু ঠাওর করতে পারল যে তাদের নৌকা আর যেদিকে খুশি যাক, বাহার দরিয়ার দিকে যাচ্ছে না।

ঘটনাটা ঘটল প্রায় শেষ বেলায়। স্রোতের খর টানে নৌকাটা তর্ তর্ করে এগিয়ে চলেছে দেখে মাঝিরা পাল তুলে দিয়েছিল। পালে হাওয়া লেগে নৌকা লাফিয়ে চলেছিল কুলের দিকে। ক্ষীণ আশা ছিল মনে, যদি পাল দেখে দূর থেকে বহরের আর সব নৌকা তাদের অবস্থান বুঝতে পারে।

কিছু পরেই দূর থেকে ওরা কালো বিন্দুর মত কতকগুলো বস্তুকে ভেসে আসতে দেখল। বিন্দুগুলো মাঝে মাঝে স্পষ্ট হয়ে জলের ওপর জেগে উঠছে, আবার হারিয়ে যাচ্ছে চোখের আড়ালে। গুর্বাকের সঙ্গের লোকেরা পাটাতনের ওপর দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ নজরে তাকিয়ে বস্তুগুলো কি তা বোঝার চেষ্টা করছিল।

অভিজ্ঞ মাঝি হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে বলল, সর্বনাশ! ওগুলো আমাদের বহরের নৌকা নয়, লুঠেরাদের

নৌকা আসছে মাল লুঠ করতে।

কথাটা শুনে একটা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল শীতের হাওয়ার মত। এমন কিছু হাতিয়ার তাদের কাছে নেই যা দিয়ে তারা লড়াই চালাতে পারে, আর তাছাড়া তারা বাণিজ্য করতে চলেছে, যুদ্ধ করতে নয়।

তরুণ গুর্বাক সঙ্গে সঙ্গে লোকজনদের হুকুম করল, যতগুলো মাটির কলস আছে নিয়ে এসো তোমরা পাটাতনের ওপর। নিজে নেমে গেল নৌকার খোলের ভেতর। গুর্বাকের বাবা একবার বলেছিলেন, বণিককে কখনও বুদ্ধি হারাতে নেই। স্থিরবুদ্ধি আর বিনয় বণিকজাতির সবচেয়ে বড় মূলধন। ঠিক বিপদের সময় বাবার কথা মনে পড়ল গুর্বাকের। নৌকার নীচে নেমে সে সিন্দুকের ডালা খুলে অতি মূল্যবান সোনার গহনাগুলি বের করে আনল। হাতির দাঁতের সূক্ষ্ম কাজকরা জি'নিসগুলোও টেনে তুলল ওপরে। তারপর ভাল করে সিন্দুকগুলোর ডালা বন্ধ করে দিয়ে এল। সিন্দুকের ভেত.' পাথরের মালা, রূপোর কাজ করা পাত্র, কিছু সোনার গহনা রেখে এল সাজিয়ে। সিন্দুক খুলে লুঠেরার দল যেন বুঝতে না পারে ওরা ইতিমধ্যেই কিছু সরিয়ে নিয়েছে।

ওপরে এসে গুর্বাক কলসীগুলোতে ভরে ফেলল মূল্যবান সব গহনা। জল ঢেলে মুখে শক্ত করে কাপড় জড়িয়ে নিল। তারপর লম্বা দড়িতে কলসীগুলো বেঁধে ডুবিয়ে দিল জলের ভেতর। দড়ির মাথা বাঁধা রইল হালের তলায় জল ছুঁয়ে।

কাজ শেষ করে সবাই দাঁড়িয়ে রইল পাটাতনের ওপর। হাতে কারো অস্ত্র তো দূরের কথা একখানা লাঠিও নেই। ওরা যেন আত্মসমর্পনের জন্য তৈরি, এমনি একটা ভাব।

দূরের নৌকাগুলো তখন অনেক কাছে এসে গেছে। নৌকার ওপর তলোয়ার, বর্শা, কুঠার প্রভৃতি অস্ত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অদ্ভুত পোশাক পরা মানুষগুলো। ছোট ছোট নৌকা যেন লাফাতে লাফাতে এসে লাগল বজরার গায়ে। টিয়ে পাখির মুখওয়ালা গলুইতে দড়ির ফাঁদ পরিয়ে ওরা উঠে এল ওপরে। তলোয়ার উঁচিয়ে আস্ফালন করতে লাগল। কিন্তু বোবা মানুষের শত্রু নেই। তারা যখন বুঝল এরা নিরস্ত্র তখন নেমে গেল নৌকার খোলের ভেতর। টেনে তুলল বড় বড় ক'টা সিন্দুক। ডালা খুলে দেখল, গহনা সব সাজানো রয়েছে। আনন্দের একটা চীৎকার দিল দলপতি। তারপর সিন্দুকগুলো ধরাধরি করে নামিয়ে নিল নিজেদের নৌকায়। গুর্বাক ওদের বজরা ছেড়ে যাবার সময় মাথা নত করে অভিবাদন জানাল।

কি মনে হল দলপতির, এক কলস খেজুর ওদের নৌকা থেকে তুলে এনে দিয়ে গেল গুর্বাকের নৌকায়। তোমাদের এত সব নিলাম, তোমরা বাধা দিলে না, তাই এই খেজুরটুকু পুরস্কার দিয়ে গেলাম— ভাবখানা এই।

মুখে মিষ্টি হাসি এনে গুর্বাক সেই খেজুরের কলস তুলে নিল।

ওরা চলে যাচ্ছিল, গুর্বাক ওদের কাছ থেকে সুমের দোয়াবের নিশানাটা জেনে নিলেন ভাল করে। ওরা গুর্বাকের দলকে কিছু পথ এগিয়ে দিয়ে গেল।

দোয়াবে পৌঁছতে ওদের কিছু বিলম্ব হয়েছিল, কিন্তু সেখানে পৌঁছে দেখা গেল, অন্য বণিকেরা আগে-ভাগে এসে বিকিকিনি শুরু করে দিয়েছে। ওদের দেখে তারা খুশী হল ঠিক, কিন্তু ওদের কি হল ভাবতে গিয়ে তাদের কাজ আটকে থাকেনি।

।। পাঁচ ।।

তুর্বাণ গুহার ভেতর বসে ভাবছিল এসব কথা। কতদিনের শোনা কথাগুলো ছবির মত ভেসে উঠছিল চোখের ওপর। তার মনে পড়ল বাবার মুখখানা। এতবড় নগরের আজ প্রধান হয়েছেন তিনি। বুদ্ধিমান, বিবেচক আর সাহসী বলে সারা নগর জুড়ে তাঁর সুখ্যাতি। তিনি চান তাঁর সন্তান হবে তাঁরই মত সাহসী, স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন।

তুর্বাণ মনে খানিক শক্তি পেল। সে নিশ্চিত ভেবে নিল, তার সঙ্গী বণিকদের কেউ তার জন্য আর বসে নেই। এখন তার ভাগ্য সঙ্গীদের সঙ্গে জড়ানো নয়, নিজের ভাগ্য নিজেকেই বয়ে নিয়ে বেড়াতে হবে।

এলোমেলো ভাবতে গিয়ে ক্লান্তি এসে গেল তুর্বাণের। সে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

একটা চীৎকার শুনে তন্দ্রা ছুটে গেল তার। বাইরে প্রখর রোদ্দুর। কতক্ষণ ঘুমিয়ে কাটিয়েছে সে তা বুঝতে পারল না। হঠাৎ শুনল, উর্বী গুহার বাইরে থেকে ঠিক তেমনি একটা চীৎকার করে উঠল। আগের চীৎকার শব্দটা নীচ থেকে ওপরে উঠে আসছিল, এখন উর্বী ওপর থেকে যেন সে ডাকে সাড়া দিয়ে উঠল।

উভয় পক্ষ একবার করেই জোর আওয়াজ তুলে স্থির হয়ে গেল।

তুর্বাণ বাইরে বেরিয়ে উঁকি দিয়ে দেখল, পাহাড়ের ঘোরানো পথে উর্বী নীচে নেমে চলেছে। এক সময় পাহাড়ের আড়ালে তার চোখের বাইরে চলে গেল। তুর্বাণ বাইরের ফাঁকা প্রান্তরে বেরিয়ে এলে নিশ্চয়ই উর্বীকে দেখতে পেত, কিন্তু সেখানে যাওয়া তার বারণ। নীচের মানুষগুলো তাকে দেখে ফেলবে, আর দেখে ফেললেই ঘনিয়ে উঠবে বিপদের ঝোড়ো মেঘ।

কি মনে করে গুহার ভেতর উঠে দাঁড়াল তুর্বাণ। ছিদ্রপথে চোখ ফেলতেই দেখতে পেল, উর্বী পাহাড়ী খাঁজ বেয়ে অনেকটা নীচে নেমে গেছে। প্রায় সমতলের কাছাকাছি নেমে গিয়ে একটা জায়গায় দাঁড়িয়েছে সে। সমতল প্রান্তর থেকে আর একটি মেয়ে কিছু কথা বলছে উর্বীর সঙ্গে তুর্বাণ ওদের কথা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল না, শুধু অঙ্গ সঞ্চালনগুলো লক্ষ করছিল।

একটু দূরে চোখ পড়তেই ও দেখল, দুটি গাছের মাঝে একটি জায়গায় আগুন জ্বলছে। অনেকগুলি মেয়েপুরুষ জড়ো হয়ে কি যেন করছে সেখানে। একটি বৃদ্ধ বসে আছেন খালিগায়ে। দূর থেকে তাঁর মাথার শুভ্র কেশ আর শ্মশ্রু দেখা যাচ্ছে। তিনি মাঝে মাঝে ডান হাতখানা তুলে আগুনে কি সব ফেলে দিচ্ছেন, অমনি প্রদীপ্ত হয়ে জ্বলে উঠছে আগুন।

তুর্বাণের চোখ ঘুরে ঘুরে আবার এসে স্থির হল উর্বীর ওপর।

যে মেয়েটি কথা বলছিল এতক্ষণ সে বসতির দিকে ফিরে যাচ্ছে আর উর্বী উঠে আসছে ওপরে। উর্বীর দুটো হাত জোড়া নানারকম সামগ্রী। সে ওপরে উঠছে খুব সাবধানে পা ফেলে ফেলে। তুর্বাণ দেখল কিছুটা উঠেই উর্বী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দম নিচ্ছে। এতখানি খাড়াই পাহাড়ে এতগুলো বোঝা নিয়ে ওঠা একটি মেয়ের পক্ষে কেন, কারো পক্ষেই খুব সহজসাধ্য নয়।

উর্বী উঠে এল ওপরে। গুহার পাশ দিয়ে ও যখন ওপারের পাহাড়ের খাঁজে জিনিসগুলো রাখতে যাচ্ছিল তখন তুর্বাণ এগিয়ে গিয়ে হেসে ওর হাত থেকে কেড়ে নিল জিনিসগুলো। উর্বী হেসে তাকাল ওর দিকে। তখনও প্রচণ্ড শ্রমের ফলে উর্বী জোরে জোরে শ্বাস টানছিল। কিন্তু তার শ্রান্ত মুখের হাসিটুকু বৃষ্টিধোয়া আকাশের বুকে কোমল রোদ্দুরের মত ফুটে উঠছিল।

তুর্বাণ ওর সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ে গিয়ে জিনিসগুলো চাতালের ওপর রাখল। উর্বী বসে বসে পাহাড়ের খাঁজে সেগুলো একটি একটি করে গুছিয়ে তুলল।

উর্বী এবার চাতালের ওপর তাদের দুজনের মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা করল। ওরা খাচ্ছিল আর নিজেদের ভাষায় টুকরো টুকরো কথা বলে যাচ্ছিল।

অলুপ করণ্ডের তালটির দিকে ইঙ্গিত করে তুর্বাণ বলল, এ বস্তুটি কি উর্বী?

উর্বী তুর্বাণের ইঙ্গিত বুঝে বলল, এটি অলুপ করণ্ড। যবের ছাতু আর ঘি মিশিয়ে এটিকে তৈরি করা হয়েছে। এটি যজ্ঞে নিবেদন করা খাবার।

কথা বলতে বলতে উর্বী হাত নেড়ে যব, ঘৃত ইত্যাদির ব্যাপারগুলো বোঝাবার চেষ্টা করল, কিন্তু তুর্বাণ ব্যাপারটা সঠিক কি তা বুঝে উঠতে পারল না।

তুর্বাণের জিভে এসব স্বাদ প্রায় অপরিচিত। গম আর যব সম্বন্ধে তার কিছু ধারণা থাকলেও এই করণ্ড বস্তুটির প্রস্তুত-প্রণালী তার জানবার কথা নয়। তাছাড়া তারা সিন্ধুনগরীর মানুষ, আমিষেই তাদের জিভ অভ্যস্ত। এ রকম নিরামিষ আহার তাদের কাছে কোনওরকমেই রুচিকর নয়।

যেন তার মনের কথাটি বুঝতে পেরেছে উর্বী। সে বলল, আমি অসুস্থ কিনা, তাই খাবারের সঙ্গে ওরা

আমাকে আব মাংস দেয় না। তোমার খাওয়াতে নিশ্চয়ই অসুবিধে হচ্ছে তুর্বাণ?

তুর্বাণ কিছু বা অনুমানে বুঝল। সে মাথা নেড়ে জানাল, তার খেতে কোনও অসুবিধে হচ্ছে না, আর এই খাবারটুকু পাবার জন্য সে উর্বীর কাছে কৃতজ্ঞ।

খাওয়া শেষ হলে ওরা ফিরে এল গুহায়। বাইরে রোদ্দুরের তীব্রতা বেড়েছে। নীল আকাশের ঠিক মাঝখানটিতে যেন নিস্পন্দ হয়ে আছে একটি জ্বলন্ত অগ্নিগোলক। তার আগুনে জিভটা লক্ লক্ করছে বাতাসে। মাটি মানুষ গাছপালা যাকে সে ছুঁয়ে দিচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে তীব্র দাহ শুরু হয়ে যাচ্ছে তার দেহে। নদী সমুদ্র থেকে সে শুষে নিচ্ছে রস। মরুভূমির বুকে শুরু হয়ে গেছে তার অগ্নিঝড়ের খেলা।

গুহার ভেতরটা অস্বাভাবিক রকমের শীতল হয়ে আছে। পাহাড়ের দুর্ভে দ্য দেহটা যেন আগলে রেখেছে গুহাটিকে শীত গ্রীষ্ম বর্ষার আক্রমণের হাত থেকে। তুর্বাণ গুহার ভেতর ঢুকে অনেক সুস্থ বোধ করছে। বাইরে সে যতক্ষণ ছিল একটা জ্বালা তার দেহচর্ম ভেদ করে ভেতরের মাংসমজ্জাকে তপ্ত করে তুলছিল, এখন গুহার শীতলতায় সে জ্বালা দূর হয়ে গেছে।

তুর্বাণ দেখল, গুহামুখে আশ্রয় নিয়েছে উর্বী, আর তার একখানা পা বেরিয়ে বাইরের তীব্র সূর্যালোক স্পর্শ করে আছে।

তুর্বাণ দেখল, উর্বীর প্রসারিত পায়ের গুলফ-সন্ধিতে একটি ক্ষুদ্র ক্ষতচিহ্ন। তার চোখ অভিজ্ঞ না হলেও সে বুঝল , উর্বীর পায়ের এই ক্ষত সাধারণ শ্রেণীর নয়। এ দুষ্ট ক্ষতটির নিরাময় সহজসাধ্য বলে তার মনে হল না।

আর একটা চিন্তা সেই মুহূর্তে তার মনে এল। উর্বী কি এই দুরারোগ্য ক্ষতের জন্যই তার স্বজনদের কাছ থেকে দূরে রয়েছে? তার এই পর্বতগুহায় নির্জন নির্বাসনের পেছনে কি তাহলে কাজ করছে ঐ নিষ্ঠুর ক্ষতটুকু?

উর্বী দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে, সে দেখতে পাচ্ছে না তুর্বাণকে। তুর্বাণ কিন্তু আড়চোখে দেখছে উর্বীকে। জানু পর্যন্ত খোলা পা দুখানা যেন সাদা পাথরে গড়া বলে মনে হল তুর্বাণের। খোলা বাহু শিথিল হয়ে পড়ে আছে সুগোল উরুদুটির ওপর। বাদামী মালভূমির রঙে যেন উর্বীর চুলগুলো রাঙানো। আজ সে পিঠের ওপর ছড়িয়ে দিয়েছে তার চুলের রাশ। ডান কপোলের পাশ দিয়ে একরাশ রেশমী চুল কাঁধের ওপর প্রপাতের মত আছড়ে পড়েছে। উর্বীর ডান দিকটাই শুধু চোখে এসে পড়েছে তুর্বাণের। তার বন্ধ চোখের ভেতর নীল দুটো তারার ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠছে তুর্বাণের কল্পনায়। উন্নত নাকটি পাতলা দুটি ঠোঁটের কাছাকাছি এসে থমকে থেমে আছে।

তুর্বাণ দেখল, উর্বীর মুখে এক ধরনের করুণ বিষণ্ণতা মাখানো। যৌবন যখন জোয়ার নিয়ে এসেছে দেহে, তখন ব্যথার বাঁধ দিয়ে তাকে বেঁধে রাখার কি করুণ চেষ্টা।

তুর্বাণের সেই মুহূর্তে মনে হল, উর্বীকে ছেড়ে সে এখন কোথাও যেতে পারবে না। তার মুখ থেকে করুণ নিঃসঙ্গতার ছবি যেদিন মুছে যাবে, শুধু সেদিন সে ছুটি নিয়ে যেতে পারবে উর্বীর কাছ থেকে। তার আগে নয়।

হঠাৎ উর্বী কি ভেবে চোখ মেলে ফিরে তাকাল তুর্বাণের দিকে। চোখাচোখি হয়ে যেতেই সে বিহ্বলের মত তাকিয়ে রইল তুর্বাণের মুখের দিকে। তুর্বাণ লক্ষ্য করল উর্বী ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ইতিমধ্যেই রোদ্দুর থেকে টেনে নিয়েছে তার পা-খানা। কিন্তু সামান্য সময় মাত্র। উর্বী নিজের দুর্বলতাটকু বুঝতে পেরেছে। সে হঠাৎ দুটো হাতে চোখ ঢেকে পাথুরে ভূমির ওপর মাথা গুঁজে পড়ে রইল। তুর্বাণ দেখল উর্বীর সারা শরীরটা কান্নার বেগে ফুলে ফুলে উঠছে। তুর্বাণ বুঝল, নারী সব হার মেনে নিতে পারে কিন্তু তার যৌবনের পরাভবকে কিছুতেই মেনে নিতে পারবে না। উর্বী সেই পরাজয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অসহায়ের মত বুকের রক্ত ঝরাতে লাগল। একটি যৌবনদীপ্ত পুরুষের কাছে সে আজ এগিয়ে গিয়ে নারীর সকল সম্মোহিনী শক্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে বলতে পারবে না, এসো আমার সঙ্গে, তোমার সমস্ত ইচ্ছাশক্তিকে আমি কেড়ে নিয়েছি। উর্বীব উন্নত পুষ্ট দেহ আর মনের সন্ধান পেয়ে ভালবাসার যে পাখিগুলো একদিন উড়ে এসে গান শুরু

করে দিয়েছিল, তারা বিষফলের সন্ধান পেয়ে মুহূর্তে সরে গেছে সেখান থেকে। বলিষ্ঠ সুন্দর একটি যুবকের কণ্ঠলগ্ন হয়ে 'তুমি আমার', এ কথাটুকু উচ্চারণের সাধ যৌবনের শুরুতেই শেষ হয়ে গেল তার। একটা অক্ষম আক্ষেপ মাথা খুঁড়ে মরতে লাগল চারদিকের পাহাড়ে পাহাড়ে। হারিরুদ নদীর উচ্ছল জলধারার মত ভেসে ভেসে যেতে চেয়েছিল সে, কিন্তু হঠাৎ তাকে আছড়ে পড়তে হল কঠিন পাথরের বুকে।

উর্বীর মাথায় হাত রাখল তুর্বাণ। একটা গভীর সান্ত্বনার ভাষা ছিল সে হাতের ছোঁয়ায়।

তুর্বাণের ছোঁয়া পেয়ে উর্বীর চোখের জল নীল চোখের তারা উপচে গড়িয়ে পড়তে লাগল। তুর্বাণ ওর সোনালী চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, দুঃখ কোর না উর্বী, তোমার এ যন্ত্রণার একদিন শেষ হবে। সেদিন হয়তো আমি থাকব না তোমার কাছে, কিন্তু যতদূরে থাকি তুমি একবার মনে কোর আমাকে। তোমার মুক্তির আনন্দের ভাগ আমিও পাব।

উর্বী চোখের জল মুছে উঠে বসল। সে তুর্বাণের কথা বুঝল না, তবে এটুকু জানল, এই মুহূর্তে তুর্বাণই একমাত্র তার আপনজন। তার নিঃসঙ্গ জীবনের ক্ষণিক অতিথি। তুর্বাণ তার পায়ের ক্ষতটুকু কৌতূহলী চোখ মেলে দেখেছে, কিন্তু সবার মত তাকে পরিত্যাগ করে সরে যায় নি। ওর হাতের ছোঁয়ায় ভুলিয়ে দিয়েছে তার মনের জমে-ওঠা দুঃখগুলো।

উর্বী তুর্বাণের হাতখানা তার দুটি হাতের ভেতর নিয়ে বলল, তুমি আমার অন্তরের একমাত্র পুরুষ। আমি জানি না তুমি কে। কোন দেশে, কোন পর্বত সমুদ্র নদীতীরে তোমার বাস! তবে আজ আমার মন তোমাকেই শুধু কাছে পেতে চাইছে। তুমি কোনদিন আমাকে ছেড়ে চলে গেলেও আমার মনের থেকে দূরে সরে যেতে পারবে না।

ওরা কারো ভাষা কেউ না বুঝেও পরস্পরের মনের একেবারে কাছাকাছি এসে দাঁড়াল।

তুর্বাণ ভাবল, বরেরু যাত্রার কাল যদি বিলম্বিত হয়, ঘরে ফেরার সময় যদি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়, তাহলেও সে এই জনহীন প্রান্তরে স্বজন পরিত্যক্তা মেয়েটিকে একা ফেলে রেখে যেতে পারবে না। আর তাছাড়া তার জীবন যখন বিপন্ন হয়ে পড়েছিল তখন এই মেয়েটির করুণাই তাকে রক্ষা করেছে। এখন বিপদমুক্ত হয়ে চলে গেলে চলবে না। কিছু কৃতজ্ঞতার পরিচয় রেখে যেতে হবে।

দিন চলে যেতে লাগল। ছোট্ট পাহাড়ঘেরা প্রান্তর আর গুহায় কাটতে লাগল দুটি জীবন। চলার অবাধ আনন্দ ভুলে গেল তরুণ বণিক। একটি প্রাণের আকর্ষণে থেমে থাকার তৃপ্তি সে সারা অন্তর দিয়ে অনুভব করতে লাগল।

ওরা আকারে ইঙ্গিতে আভাসে অতি দ্রুত শিখে নিতে লাগল পরস্পরের ভাষা। দীর্ঘ কর্মহীন দিনগুলো ওরা ভরিয়ে তুলল ভাষা শেখার কাজে।

আকাশ মাটিকে দগ্ধ করে বিদায় নিল গ্রীষ্মের জ্বালাধরা দিনগুলো। আকাশ থেকে আগুনের ঝরে পড়া শেষ হল, আর শুরু হল বর্ষার দাপট। মেঘ ভেঙে নামল অঝোর বৃষ্টি। পাহাড়ের চূড়া বেয়ে নেমে আসতে লাগল জলের ধারা। তীব্র তপ্ত দিনের পরে যেন ন্যাড়া পাহাড়গুলো করল শীতল স্নান।

হু হু করে জল, প্রপাতের মত নেমে আসে মালভূমির ঢালু পথে। খল খল আওয়াজ তুলে গুহার গা ঘেঁষে তীব্র বেগে ছুটে চলে যায়। লাট খেয়ে আছড়েপড়ে একেবারে নীচের পাহাড়ী সমতলভূমিতে। তারপর সেই জলধারা চলে যায় বিশাল অজগরের মত এঁকে-বেঁকে হারিরুদ নদীতে। বর্ষায় স্রোতস্বিনী হারিরুদ পূর্ণযৌবনা।

আকাশে চোখ ঝলসানো বিদ্যুতের চমক দিয়ে একদিন কান ফাটানো আওয়াজ তুলে মেঘ ডেকে উঠল, অমনি তুর্বাণের হাত ধরে উর্বী আকাশের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, ঐ বৃত্রঘ্ন পথ খুলে দিচ্ছেন। শুনতে পাচ্ছ না, বজ্র হেনে অসুর বৃত্রকে হত্যা করছেন বৃত্রঘ্ন?

তুর্বাণ প্রশ্ন করে, অসুর বৃত্র কে? উর্বী বলে, ঐ বৃত্রই তো জলের পথ আটকে রাখে। মেঘের কালো ঢাকনায় ঢেকে রাখে সব। আমার বাবা যজ্ঞ করে বৃত্রঘ্নের। তিনি তুষ্ট হয়ে বজ্র ছুঁড়ে মারেন বৃত্রের দিকে। অমনি মেঘ থেকে ঝরে পড়ে বৃষ্টি।

তুর্বাণ বলল, তোমার বাবা কি দেবতার পূজারী?

উর্বী বলল, রোজ ঐ গুহার ছিদ্রপথে যাঁকে যজ্ঞে বসতে দেখ, তিনিই আমার বাবা।

তুর্বাণ অমনি বলল, তাহলে তোমার বাবা নিশ্চয়ই খুব সম্মানীয় তোমাদের গোষ্ঠীর ভেতর?

আমাদের আইরণ গোষ্ঠীর প্রধান যিনি, তিনিও আমার বাবাকে সম্মান জানান।

তাহলে তোমাকে যে তোমার দলের লোকেরা এখানে পরিত্যাগ করে গেছে, তাতে তোমার বাবা তো দলপতিকে কিছু বলতে পারেন?

এ রোগে রোগীকে দূরে রাখাই বিধান। বাবা সমাজে এত বড় সম্মানীয় হয়ে সে বিধান ভাঙবেন কি করে?

এরপর তুর্বাণ কিছু বলতে পারল না। তাদের নগরীতেও এই দুষ্ট ক্ষতে আক্রান্ত স্ত্রী-পুরুষকে সামাজিক মেলামেশার সুযোগ দেওয়া হয় না।

তুর্বাণ কিছুসময় নীরবে থেকে একসময় বলল, তোমাকে রোজ যে মেয়েটি পাহাড়ের তলায় খাবার এনে দিয়ে যায়, সে কে?

উর্বী বলল, আমার বোন, ধীতি।

ধীতি কি তোমার মত সুন্দর?

উর্বীর সমস্ত মুখ অভাবিত এক পুলকে লাল হয়ে উঠল। সে বলল, অনেক সুন্দর সে।

কথাটা বলেই মুখ নীচু করল।

তুর্বাণ হঠাৎ উর্বীর মুখখানা অঞ্জলিবদ্ধ হাতে তুলে ধরে বলল, ঠিক এমনি রঙ , এমনি নাক এমনি সুন্দর নীল দুটো চোখের তারা?

কি এক রোমাঞ্চ সারা দেহ-মন জুড়ে জেগে উঠল উর্বীর। তার চোখ দুটো আধ-বোজা হয়ে এল, মুখে ফুটে উঠল অনেক সুখের সুন্দর একটুখানি হাসি।

হাতটা সরিয়ে নিয়ে তুর্বাণ বলল, তুমি কি আমাকে ভালবাস উর্বী?

প্রবল আবেগে উর্বী দুদিকে তার শির সঞ্চালন করতে লাগল।

তুর্বাণ বলল, তুমি তাহলে আমাকে ভালবাস না?

উর্বী অমনি তুর্বাণের হাতখানা তুলে নিয়ে পাগলের মত নিজের মুখে মাথায় ঘষতে লাগল।

এমনি করে উর্বী জানাতে লাগল তার ভালবাসা।

রাতে বৃষ্টি ঝরছে অঝোরে। গুহার বাইরে একটানা শব্দ তুলে বয়ে যাচ্ছে জলের ধারা। মাঝে মাঝে চমকে উঠছে বিদ্যুৎ। ওরা বসে আছে গুহার ভেতর। উর্বীর মাথাটা রয়েছে তুর্বাণের বুকের ওপর। বামবাহুতে উর্বীর কণ্ঠ বেষ্টন করে ডান হাত ওর কপালে দিয়ে ওকে বুকে চেপে ধরেছে তুর্বাণ।

অন্ধকারে মিষ্টি হাসির রেখা ফুটে উঠল উর্বীর মুখে। সে বলল, আমি তো তোমার একেবারে বুকের কাছটিতে রয়েছি তুর্বাণ।

তবু তোমাকে বার বার দেখতে ইচ্ছে করে উর্বী।

বিদ্যুৎ চমকাল। তুর্বাণ দেখল উর্বী তার দিকে ফিরে তাকিয়েছে। মুখে লেগে আছে তৃপ্তির একটা হাসি।

উর্বী হঠাৎ বলল, ঋভু ভায়েরা আমার চিকিৎসার জন্যে আসবে তুর্বাণ।

ঋভু ভায়েরা কে উর্বী ?

ওরা সুধন্বার তিন ছেলে, ঋভু বিভু আর বাজ, বলল উর্বী।

ওঁদের বুঝি খুব বেশী রকম ক্ষমতা?

উর্বী বলল, ওঁরা তপস্যাসিদ্ধ পুরুষ। বৃদ্ধ মা-বাবার যৌবন ফিরিয়ে দিয়েছেন। সূর্যের অয়নমণ্ডলকে চারবিন্দুতে ভাগ করে আকাশলোকের জ্ঞানকে সহজে বোঝার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। ওঁদের আরও অনেক গুণ। রথের চাকা তৈরিতে ওঁরা সিদ্ধহস্ত। তাছাড়া নানা ধরনের অশ্বের মিশ্রণে ওঁরা নতুন জাতের শক্তিশালী অশ্ব তৈরি করতে জানেন।

তুর্বাণ বলল, অসম্ভব গুণী মানুষ ওঁরা। আমার মনে হচ্ছে ওঁদের সাহায্যে তুমি রোগমুক্ত হতে পারবে।

হঠাৎ কি ভেবে উর্বী বলল, আমার রোগ যদি না সারে তাহলেও কি তুমি আমাকে ভালবাসতে পারবে তুর্বাণ?

উর্বীর মাথাটা আরও নিবিড় করে নিজের বুকে চেপে ধরে তুর্বাণ বলল, ঋভু ভায়েদের অলৌকিক ক্ষমতার কথা শোনার আগেই কি আমি তোমাকে ভালবাসিনি? তুমি রোগগ্রস্ত বলে তোমার ওপর আকর্ষণ একটুও কম নয় উর্বী।

সেই গভীর বর্ষাঝরা রাতে গুহার অন্ধকারে কয়েকটি কথা উচ্চারিত হল।

দোহাই তোমার তুর্বাণ, আমার নিবিড় বাঁধন শিথিল করে দিও না। আমি রোগগ্রস্ত।

তুর্বাণ বলল, তোমার দেহ-মন সবকিছু আজ থেকে আমার উর্বী। তোমার রোগ, রোগমুক্তি, সব।

না না না, — উর্বীর কণ্ঠস্বর ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে এল।

বাইরের উত্তাল প্রকৃতি ছোট গুহার ভেতর যেন আছড়ে পড়ল। তরুণ তুর্বাণের যৌবনশক্তির কাছে সব সমাজ-শাসন, সব নিষেধের বাধা ভেসে চলে গেল।

ঝড়ের শেষে মালভূমির ওপারের আকাশে একটা নিষ্প্রভ বিদ্যুৎ খেলা করছিল। গুহার ভেতর হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসেছিল উর্বী। তার বাঁধন খসা এলোচুলে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল মুখখানা। উর্বী কাঁদছিল। আনন্দের ভার সইতে পারছিল না, তাই। তার কুমারীত্বকে যে এই মুহূর্তে দস্যুর মত ভেঙে দিল, তার কথা ভেবে সে নিজেকে স্থির রাখতে পারছিল না, তাই কাঁদছিল। একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনায় ওঠা-পড়া করছিল তার বুকখানা।

উর্বী ভাবছিল তুর্বাণের কথা। যদি তার রোগ সংক্রামিত হয় তুর্বাণের দেহে। যদি সে রোগের যন্ত্রণা তুর্বাণের কাছে অসহনীয় বলে মনে হয়, তাহলে মৃত্যুর পরেও তার ক্ষোভের শান্তি হবে না।

উর্বী ভাবল, তুর্বাণই তাকে কাছে টেনেছে, সব জেনেও সে হরণ করেছে তার নীবি, তার লজ্জাবস্ত্র। তুর্বাণের কাছ থেকে কোনওকিছু সে গোপন করেনি। তাই যদি কোনও অঘটন ঘটে থাকে তাহলে দায়িত্ব তার নয়। সে দায় পুরোপুরি তুর্বাণের।

কিন্তু যুক্তি দিয়ে নিজেকে মুক্ত করে নিলেও নারীর অনাগত পরিণতির কথা ভেবে সে আবার আকুল হয়ে উঠল। তাই চোখের জল তার বাধা মানল না।

তুর্বাণ পুরুষ। সে তৃপ্ত, তার ভাবনা এত গভীর খাদ বেয়ে চলে না। মনের উত্তেজনায় সে যা করে তাকেই সত্য বলে স্বীকার করে নেয়। ভবিষ্যতের ভাবনাকে সে উড়িয়ে দেয় চলতি পথের খুশীর হাওয়ায়।

তুর্বাণ আবার উর্বীকে বুকের কাছে টেনে নিল। দশখানা আঙুল তার মাথার চুলের ভেতরে চালিয়ে দিয়ে মুখখানা তুলে ধরে বলল, তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না উর্বী, বড় জানতে ইচ্ছে করছে তুমি কি ভাবছ, কেমন দেখতে হয়েছে এই মুহূর্তে তোমার মুখখানা।

উর্বী জোর করে ওর হাতের ভেতর থেকে মুখ সরিয়ে নিয়ে ওর বুকের ভেতর মুখ গুঁজে শুধু বলতে লাগল, তুমি কেন এলে, কেন এলে তুর্বাণ এই অভিশপ্ত গুহায়? তোমার সুন্দর বলিষ্ঠ জীবনটাকে আমি নষ্ট করে দিলাম।

তুর্বাণ ওর মুখখানাকে আরও নিবিড় করে ওর বুকের ভেতর চেপে ধরে বলল, কোন কথা তোমাকে আজ বলতে দেব না উর্বী, আজ সব কথা আমার। বাণিজ্য করতে বেরিয়ে আমি যে রত্ন পেলাম, সে আমার বণিক-জীবনের সব সেরা ধন।

বৃত্রঘ্ন বাণ নিক্ষেপ করে মেঘের ভেতর লুকানো সব জল পৃথিবীতে নামিয়ে দিলেন। এখন আকাশ নীল। টুকরো টুকরো নিশ্চল সাদা মেঘ। গুহার ছিদ্রপথে তুর্বাণ দেখে বনস্থলী সবুজে ঝলমল। হারিরুদ নদী খোলা তলোয়ারের মত ঝক্ ঝক্ করছে।

আজ নীচের থেকে খাবার তুলে আনতে গিয়ে উর্বী ঘন ঘন শ্বাস টানতে লাগল। গুহার মুখে এসে সে

প্রায় মূর্ছাহতের মত বসে পড়ল।

তুর্বাণ তাড়াতাড়ি তাকে ধরে এনে শুইয়ে দিল গুহার ভেতরে। নিজের কোলের ওপর উর্বীর মাথাটা তুলে নিয়ে চর্মাধারে রাখা জল ছিটিয়ে দিল তার চোখে-মুখে।

বেশ কিছু সময় পরে যখন ক্লান্তি দূর হল তখন চোখ মেলে তাকিয়ে উর্বী দেখল তুর্বাণের মুখ। সে কোন কথা না বলে একটা হাত বাড়িয়ে তুর্বাণের গলা জড়িয়ে ধরল। তার মুখখানা নিজের মুখের কাছে টেনে আনল। আস্তে আস্তে বলল, তুমি পিতা হতে চলেছ তুর্বাণ।

তুর্বাণের রক্তের ভেতর দিয়ে এক অনাস্বাদিত আনন্দের প্রবাহ বয়ে গেল। তার দেহ রোমাঞ্চিত হল নতুন এক অনুভূতির সৃষ্টিতে। সে পিতা হতে চলেছে! এই মুহূর্তে তার মনে হল পিতা গুর্বাক যেমন করে তার দিকে তাকিয়ে থাকেন, সে-ও যেন ঠিক তেমনি করে তাকিয়ে আছে তার অনাগত শিশুটির দিকে। সে শিশু ঐ মালভূমি পেরিয়ে তার টলমল পা ফেলে ছুটে আসছে এই গুহা লক্ষ করে। এসেই ঝাঁপিয়ে পড়ল মায়ের বুকে।

উর্বীকে অজস্র আদর করল তুর্বাণ। বলল, তোমাকে আমার নগরীতে নিয়ে যাব উর্বী।

উর্বীর মুখে ম্লান হাসির রেখাটুকু ফুটেই মিলিয়ে গেল। সে বলল, এই ক্ষত নিয়ে আমি কোথাও যাব না তুর্বাণ। যতদিন না রোগমুক্ত হই ততদিন এই গুহাই হবে আমার আশ্রয়।

তুর্বাণ বলল, তুমি কি আমার দেশে যাবে না উর্বী?

আমাকে ভুল বুঝো না তুর্বাণ, এখন তোমার আর আমার দেশ এক হয়ে গেছে। তোমার স্বজন বন্ধু হয়ে গেছে আমারও আত্মীয়। তবে আমি এই পঙ্গু পা-খানাকে টেনে নিয়ে এত দূর দুর্গম পথ কি করে পার হয়ে যেতে পারি বল? যদি কোনওদিন ঔষধির দেবতা আমাকে কৃপা করে রোগমুক্ত করে দেন তাহলে যাব তোমার দেশে।

একটু থেমে আবার তুর্বাণের কণ্ঠ দুটি হাত জড়িয়ে ধরে বলল, আমি যদি কোনদিন না যেতে পারি তুর্বাণ, তাহলে আমাদের সন্তান যাবে তার পিতৃভূমিতে।

তুর্বাণ বলল, তোমাকে ছাড়া আমি আমার সন্তানকে আমার সিন্ধুনগরীতে চাই না উর্বী। আমি তোমাকেই শুধু জানি।

উর্বী হেসে বলল, এমন কথা বোলোনা তুর্বাণ। শুনেছি, সন্তানের মায়ার কাছে সব কিছুই হার মেনে যায়। একদিন দেখো সন্তানের মায়ায় তুমি সব কিছু ভুলে যাবে।

তুর্বাণ বলল, সেদিনের কথা আমি ভাবছি না উর্বী, তুমি শুধু সুস্থ হয়ে ওঠ এই আমার কামনা।

দেখতে দেখতে স্বাস্থ্যে পূর্ণ হয়ে উঠল উর্বী! চলার ছন্দে এল মন্থরতা। তার দিকে চেয়ে চেয়ে আশ মিটল না তুর্বাণের।

উর্বী ধীরে-সুস্থে সব কাজ করে। সে যখন তাকে কিছু খেতে দেয় তখন তার আচরণে, তার মুখে কেমন এক ধরনের মাতৃত্বের ছবি দেখতে পায় তুর্বাণ। ভারী ভাল লাগে উর্বীর এই নতুন রূপ, নতুন ভাবান্তর। তারই মত তরুণ জীবনের উত্তেজনায় ভরা উর্বী আজ কত স্থির। তার চোখের তারায় কিসের স্বপ্ন ছায়া ফেলে তাকে অন্যমন করে তোলে মাঝে মাঝে। উর্বী দিনে দিনে যেন অসাধারণ হয়ে উঠছে। ঐ সবুজ বনভূমির মত লাবণ্য গড়িয়ে পড়ছে তার গা বেয়ে। তুর্বাণ যখন উর্বীকে আদরে ভরে দেয় তখন শরৎকালের ঐ মালভূমির মত অজস্র রোদ্দুর গায়ে মেখে তৃপ্তিতে লুটিয়ে পড়ে থাকে সে। একটা মধুর আলস্য তাকে মূক করে রেখে দেয়। শুধু তার দুটো চোখে সুখ আর তৃপ্তি উপচে পড়ে।

সেদিন মধ্যাহ্নে প্রতিদিনের মত খাবার নিয়ে ওপরে উঠে এল উর্বী। তুর্বাণকে খাবার সাজিয়ে খেতে দিল, নিজে কিন্তু কিছু খেল না।

তুর্বাণ খাওয়া শেষ করে চলে গেল গুহায়। খানিক পরেই এল উর্বী।

সে এসে বসল তুর্বাণের গা ঘেঁষে। কতক্ষণ তার দিকে চেয়ে থেকে বলল, তোমাকে ভালবাসি বলেই তোমাকে আজ আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে চাই তুর্বাণ।

অবাক বিস্ময়ে তুর্বাণ চেয়ে রইল উর্বীর মুখের দিকে।

উর্বী বলল, সময় খুবই সংক্ষিপ্ত, আজই তোমাকে চলে যেতে হবে এ গুহা ছেড়ে।

তুর্বাণ আকস্মিক আঘাতে যেন বিমূঢ় হয়ে গেল। সে অস্ফুটে বলল, গুহা ছেড়ে চলে যেতে হবে কেন উর্বী?

উর্বী বলল, আজ ধীতির কাছে শুনতে পেলাম ঋভু ফিরে আসছেন ইলাম থেকে। অবিলম্বেই হয়ত এখানে পৌঁছে যাবেন। অশ্বারোহী এসেছে খবর নিয়ে। তিনি এসেই শুরু করবেন আমার চিকিৎসা।

তুর্বাণ বলল, এ অবস্থায় আমি তোমাকে কিছুতেই একা ফেলে যেতে পারব না উর্বী। চল আমরা দুজনেই আজ রাতে চলে যাই এ আস্তানা ছেড়ে। তোমাকে ছাড়া আমি একটি মুহূর্তও থাকতে পারব না কোথাও!

উর্বীর চোখে জল, মুখে হাসি। সে বলল, পুরুষের দেহের মত মনটাও হবে বলিষ্ঠ। তুমি একটি পঙ্গু মেয়ের কথা ভেবে কেন ভুলে যাবে পৃথিবীর ওপর নিজের প্রতিষ্ঠার পথ খুঁজে নিতে। আমি ভাবব, আমার ভালবাসার জন অলসের মত তার সংসারটুকুকে আগলে বসে নেই। বাতেধরা পাখির মত তুমি একদিন ওড়ার শক্তি হারাবে, এ আমি চাই না তুর্বাণ।

তুর্বাণ মাথা নীচু করে বসে রইল।

উর্বী তার কোলে হাত রেখে বলল, তোমার সঙ্গে আমি যে-কোন মুহূর্তে এখান থেকে চলে যেতে পারি তুর্বাণ, কিন্তু ওরা যখন এসে দেখবে আমি নেই, তখন চষে ফেলবে সারা দেশটা। ওদের দ্রুতগামী অশ্ব আমাদের ধরে ফেলবে অতি সহজে। তখন আমি পুরোহিতের কন্যা বলে ক্ষমা পেলেও তোমাকে ওরা ক্ষমা করবে না।

তুর্বাণ বলল, তখন তোমার সামনে দাঁড়িয়ে লড়াই করে মরতে পারব।

উর্বী বলল, তাতে ফল হবে এই, তোমার সঙ্গে সঙ্গে আর দুটো জীবনেরও শেষ হয়ে যাবে। আমার আর তোমার ভাবী সন্তানের।

তুর্বাণ থেমে গেল। একদৃষ্টে চেয়ে রইল কতক্ষণ উর্বীর মুখের দিকে। তারপর একসময় অসহায় কাতর কণ্ঠ দিয়ে বেরিয়ে এল কয়েকটা শব্দ, আর কি কোনদিন আমাদের দেখা হবে না উর্বী?

উর্বীর দুটি চোখ দূর ভবিষ্যতের অনেক গভীরে চলে গেল! তারপর এক সময় সে চোখের দৃষ্টি স্থির হল তুর্বাণের মুখের ওপর এসে।

সে বলল, একটি দিন একটি রাত্রিও তোমার চিন্তা ছাড়া আমার কাটবে না তুর্বাণ। যদি হিরণ্যবাহু সবিতা কৃপা করে কোনওদিন আমাদের অন্ধকার পথে আলো ফেলেন তাহলে আবার দেখা হবে।

তুর্বাণ বলল, আমার সন্তান রইল তোমার কাছে, তাকে রক্ষা কোর তুমি।

যতক্ষণ আমার দেহে প্রাণ থাকবে ততক্ষণ কেউ তোমার সন্তানের কোনও ক্ষতি করতে পারবে না তুর্বাণ।

শরতের আকাশে পূর্ণচাঁদের আলো পৃথিবীর পাত্রে ঝরে পড়ছে দুগ্ধধারার মত। অদ্ভুত আকৃতির পাহাড়গুলো দাঁড়িয়ে আছে প্রান্তরে অতিকায় জন্তুর ছায়া ফেলে। গুহার বাইরে দুটি মূর্তি উঠে দাঁড়াল। তারা পরস্পর গভীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ হল। প্রতিটি পল অনুপল যেন থেমে গেল সেখানে এসে। আকাশের চাঁদ আর অগুনতি নক্ষত্র তাকিয়ে রইল তাদের দিকে। ওদের মিলিত ছায়া একটিমাত্র অবয়ব রচনা করে লুটিয়ে রইল পাহাড়ঘেরা প্রান্তরের বুকে।

কতক্ষণ পরে দেখা গেল ছায়া পৃথক হয়ে গেল। একটি মূর্তি মালভূমিতে হাঁটছে বুকে ভর রেখে, অন্য মূর্তি উঠছে পাহাড়ের খাঁজে পা ফেলে ফেলে। আজ পা দুটো মাঝে মাঝে কেঁপে কেঁপে উঠছে তার। শক্ত

করে দুটো হাতে জড়িয়ে ধরছে খাঁজ-কাটা পাথরেব স্তূপগুলো। শেষ অবধি সে এসে বসল দুটো খাঁজেব মাঝে তৈরি বসার স্থানটিতে। প্রথম বিস্ময়কর এক রাতে ওখানেই বসেছিল তারা দুজনে।

উর্বী দেখল তুর্বাণ মালভূমির ও প্রান্তে গিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল, তারপর একবার ফিরে তাকাল পেছনের দিকে। অতি অল্প সময় মাত্র। এবার চলতে শুরু করল সে মরুভূমি বাঁয়ে রেখে খাড়া পশ্চিমে।

দেখতে দেখতে কত ছোট হয়ে এল তুর্বাণের দেহ। শেষে জ্যোৎস্নার দিগন্তে একটা বিন্দুকে ইতস্তত নড়তে দেখা গেল। উর্বী দুটো হাতে চোখ মুছে আবার দিগন্তে দৃষ্টি ফেলল। কিন্তু আর সে চোখের তারায় ধু ধু দিগন্ত ছাড়া কোন ছায়া এসে পড়ল না।

।। ছয়।।

সারা রাত পিতা গুর্বাকের শেখানো পথরেখা অনুমানে চোখের সামনে রেখে মরুভূমির প্রান্ত ছুঁয়ে তুর্বাণ পেরিয়ে এল দীর্ঘপথ। উর্বীর কথা রেখেছিল সে। উর্বী তাকে বলেছিল, রাতে পথ চলতে সে যেন একটি বারও না ভাবে উর্বীর কথা। তাহলে আনমনা পথিকের পদে পদে ভুল হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকবে।

তুর্বাণ উর্বীর শেষ কথাটুকু মেনে নিয়ে প্রমাণ করল যে সে উর্বীকে ভালবাসে। তার নিষেধটুকুও। ভোরের আলো ফুটলে তুর্বাণ দেখল ইতস্তত নুড়ি পাথর ছড়িয়ে পড়ে আছে! দুএকটা নিষ্ফলা খর্জুরবৃক্ষ মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে আছে কন্টকাকীর্ণ পাতার ছাতা মাথায় ধরে। নিশি-জাগরণ আর পথশ্রমের ক্লান্তিতে তার দেহ অবশ হয়ে আসছিল। এখন শুধু একটু বিশ্রামের জায়গা সে খুঁজতে লাগল, যেখানে চোখ দুটো বন্ধ করে সে পড়ে থাকবে কিছু সময়। পথের জন্যে পর্যাপ্ত খাবার দিয়ে দিয়েছিল উর্বী। রাতে সে খাবার সে খোলেনি। উর্বীর অভাব যদি খাবার মুখে তোলার সময় মনে পড়ে যায়। আরও দিয়েছিল উর্বী রাতের শীত দূর করার জন্যে ভেড়ার লোমে তৈরি একখানা গাত্রবস্ত্র। সেটি এখনও বন্ধনদশায় রয়েছে, খোলা হাওয়ায় মেলেনি তার মুক্তি। রাতে যত শীত ঘনিয়ে উঠেছে, তুর্বাণের পথ-চলা ততই বেড়ে গেছে। সে দ্রুতগতির থেকে সঞ্চয় করে নিয়েছে অনেকখানি তাপ। যার ফলে সে অসহনীয় ঠাণ্ডা থেকে পথ করে নিয়েছে নিজের পরিত্রাণের।

ভোরে তার পা দুটো অস্বাভাবিক রকমের ভারী বোধ হল। সে যেন নিজের পা দুখানাকে আর চালিয়ে নিয়ে যেতে পারছিল না। একটা বড় পাথরের স্তূপ দেখে তার ছায়ার আড়ালে সে পিঠের বোঝাটা নামাল। উর্বীর দেওয়া খানিকটা খাবার খেয়ে চর্মাধার থেকে জলপান করল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মাটিতে শুয়ে পড়ল সে। রাজ্যের ঘুম জড়িয়ে এল তার চোখে।

ঘুমে অচেতন তুর্বাণ স্বপ্ন দেখছিল। উর্বী খাবার আনতে সেই যে নীচে নেমেছে আর ওপরে উঠে আসার নাম নেই। তুর্বাণ গুহার ছিদ্রপথে উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করল, কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না। সে চেঁচিয়ে ডাকতে পারছিল না। সে গুহার বাইরে প্রকাশ্য জায়গাটুকুতে গিয়ে দাঁড়াতেও পারছিল না। এমন সময় অনেক নীচের থেকে, ঠিক যেন মনে হচ্ছিল পৃথিবীর অনেক নীচের গহ্বর থেকে, একটা চাপা আর্ত গোঙানির আওয়াজ ওপরে উঠে এল। অমনি পাগলের মত গুহা থেকে প্রকাশ্য প্রান্তরে বেরিয়ে এসে ডাক দিয়ে উঠল তুর্বাণ, কোন ভয় নেই উর্বী, যাচ্ছি আমি যাচ্ছি।

সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে গেল তুর্বাণের। সে উঠে বসতে গিয়ে দেখল একটি বছর দশেকের ছেলে আর সাত-আট বছরের একটি মেয়ে তাব দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে। তাদের পোশাকে অতি সাধারণ ঘরের চিহ্ন। ছেলেটির হাতে সম্ভবতঃ ভেড়া তাড়াবার ছোট একটা লাঠি। ভাল করে তুর্বাণ তাকিয়ে দেখল, তার অনুমানে ভুল হয়নি। একটা শিংওলা ভেড়া ইতিমধ্যেই কখন চড়ে দাঁড়িয়েছে তার পাশের ঐ পাহাড়ের স্তূপটার মাথায়।

তুর্বাণ চোখ মুছে মাথা নাড়া দিয়ে বসল। সে একটু হেসে হাতছানি দিয়ে ডাকল ছেলে-মেয়ে দুটিকে। ছেলেটি পায়ে পায়ে এগিয়ে এল, কিন্তু মেয়েটি ঠায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইল তুর্বাণের দিকে।

ছেলেটি কাছে এলে তুর্বাণ চর্মপেটিকা থেকে খানিকটা শক্ত ''রুগু বের করে তার হাতে দিয়ে বলল,

খাও, খেতে খুব ভাল।

ইলামী ভাষাতেই কথা বলছিল তুর্বাণ।

ছেলেটি করগুর টুকরো হাতে নিয়ে ফিরে গেল মেয়েটির পাশে। চুপি চুপি কি বলল, কিন্তু মেয়েটি প্রথমে নিতে চাইল না। তুর্বাণ চেঁচিয়ে নেবার জন্য অনুরোধ জানাতে লাগল। শেষ পর্যন্ত ছেলেটির হাত থেকে করগুর ভাঙা একটুখানি টুকরো সে হাতে নিয়ে মুঠোর ভেতর ধরে রাখল। ঠিক সেই মুহূর্তে ভেড়াটা কি ভেবে বীরবিক্রমে পাহাড়ী টিলার ওপর থেকে লাফিয়ে নেমে দৌড় লাগাল। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটা তীক্ষ্ণ আওয়াজ তুলে ছুটল তার পেছনে। ওরা দুটিতে টিলার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ছেলেটি তুর্বাণের দিকে পেছন ফিরে মেয়েটির চলে যাওয়া পথের দিকে চেয়ে রইল। হাতে ধরা করগু মুখে পুরে চিবুতে লাগল।

ছেলেটিকে কাছে ডাকল তুর্বাণ। বলল, ও কি তোমার বোন?

ছেলেটি মাথা নাড়ল।

কি নাম ওর? — জিজ্ঞেস করল তুর্বাণ।

মারু।

তোমার নাম কি?

পুহগ।

তুর্বাণ আবার বলল, কোথায় থাক তোমরা?

ছেলেটি বলল, ঐ যে একটুখানি দূরে খেজুর গাছের মাথা দেখা যাচ্ছে, ওর পাশেই আমাদের ঝোপড়িতে।

কে আছে তোমাদের ঝোপড়িতে?

ছেলেটি বলল, মারু আমি আর মা থাকি।

তুর্বাণ আবার প্রশ্ন করল, কি করেন তোমার বাবা?

পুহগ বলল, বাবা মারা গেছে। লড়াইয়ের কাজে বাবাকে নিয়ে যায়। বাবা আর ফেরে নি।

তুর্বাণ পুহগের কাছ থেকে তার ঘরের খবরটুকু জেনে নিল। এবার ছেলেটিকে সে বলল, বরেরুর পথটা কি তুমি জান?

ছেলেটি কি ভাবল। তারপর বলল, তুমি একটু বোস, আমি মার কাছ থেকে জেনে আসছি।

তুর্বাণ দেখল ছেলেটিকে অনেকটা পথ গিয়ে আবার ফিরে আসতে হবে। তাই সে বলল, চল আমি তোমার সঙ্গে যাই। তোমার ঝোপড়ি থেকে কিছুটা জল ভরে নেব।

মনে হল কথাটা শুনে পুহগ মহা খুশী হয়েছে। সে তুর্বাণের পোঁটলাটা হাতে তুলে নিয়ে হাঁটতে লাগল। তুর্বাণ তার হাত থেকে পোঁটলাটা নিজের হাতে ফিরিয়ে নিয়ে বলল, তোমাকে বইতে হবে না, তুমি শুধু পথ দেখিয়ে নিয়ে চল।

ওরা টিলার ওপারে গিয়ে দেখল মারু পাহাড়ে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে কুট কুট করে করগু ভেঙে ভেঙে খাচ্ছে। আর তার সামনে একটা ছোট সোঁতার ধারে ঘাস চিবোচ্ছে গোটা পাঁচ-সাত ভেড়া। সংসারের গিন্নীর মত তাদের চোখে চোখে আগলে রেখেছে মারু।

তুর্বাণ পেছন দিক থেকে একেবারে মারুর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, মারু তুমি দৌড়ে চলে এলে যে?

মারু চমকে ফিরে দাঁড়াল তুর্বাণের মুখোমুখি। তার উত্তর দেবার আগেই পুহগ বলল, ঐ যে ভেড়াটা দেখছ, ওটা ওর দুটো বড় বড় শিং দিয়ে ঢুঁ মারে বাচ্চাগুলোকে। তাই ওকে সামলে রাখতে হয়।

পুহগ এবার হেঁটে চলল ঝোপড়ির দিকে। তুর্বাণ চলল তার পেছনে। কিছু পথ এগিয়েছে অমনি পেছন থেকে মারু চেঁচিয়ে উঠল, কোথায় যাচ্ছিস?

পুহগ পেছনে না ফিরে বলল, চাচাকে নিয়ে যাচ্ছি ঝোপড়িতে।

আর বলতে হল না। ভেড়া তাড়ানোর আওয়াজ উঠতে লাগল ঘন ঘন। তুর্বাণ পেছনে ফিরে দেখল,

ভেড়া তাড়িয়ে নিয়ে আসছে মারু. আর টুং টাং শব্দে ভেড়াদের গলায় বাঁধা ঘন্টাগুলো বেজে চলেছে।

মারু আর পুহগের ভেতর যেন প্রতিযোগিতা লেগে গেল, কে আগে ঝোপড়িতে যাবে আর মাকে খবর দেবে নতুন পাওয়া চাচার! চাচা যে বেশ ভাল লোক তা তারা আগে-ভাগেই বুঝে নিয়েছে। চাচার দেওয়া খাবারের স্বাদ এখনও লেগে আছে তাদের মুখে।

সে এক দৃশ্য! পুহগ আর মারু লাফাতে লাফাতে ছুটেছে, আর তাদের পেছন পেছন ছুটেছে ভেড়ার পাল ডাক দিতে দিতে। পুহগ লাঠিটা মাটিতে ঠেকিয়ে দু'চার লাফে অনেকখানি এগিয়ে একটা উঁচু জায়গার আড়ালে চলে গেল। মারু মুখ গুঁজে ছুটছিল। দুটো কনুই মাকুর মত হাওয়ায় চালাতে চালাতে ছুটে চলেছিল সে।

উঁচু জায়গাটা পেরিয়ে এসে তুর্বাণ দেখল, খেজুরগাছের তলায় ডাল পাতা দিয়ে তৈরি একটা অতি সাধারণ ঝোপড়ি। তার ভেতর পুহগ আর মারু দুটিতেই অদৃশ্য হয়ে গেছে।

ঝোপড়ির সামনে এসে দাঁড়াল তুর্বাণ। এই পরিত্যক্ত প্রান্তরে এমন একখানা ঝোপড়ির ভেতর স্বামীহারা মহিলা দুটি ছোট ছেলে-মেয়ে নিয়ে কি করে থাকে তা সে ভেবে পেল না। এদের দিনগুলো কাটেই বা কি করে? প্রায় জনমানবহীন জায়গায় কে এদের সাহায্য করে! ক্ষেতি আর জলসেচের কোনও সুবিধে কাছে-পিঠে আছে বলে তো মনে হল না তুর্বাণের।

বাইরে বেরিয়ে এল একটি মহিলা। বছর তিরিশের ভেতর বয়স। বেশ আঁটসাঁট গড়নের জন্য পাঁচ-সাত বছর কম বলেই বরং মনে হয়। মারু মায়ের হাত ধরে আছে আর পুহগ তার আগে আগে।

পুহগ বলল, চাচা কি জানতে চাও বল মায়ের কাছে।

মহিলাটি একটু হেসে ছেলেটিকে তিরস্কারের সুরে বলল, চাচাকে তো আগে বসতে দাও, তারপর কথা হবে।

মহিলা ঘরের ভেতর ঢুকে একটা খেজুরপাতার চাটাই এনে পেতে দিল দাওয়ায়। ইঙ্গিতে তুর্বাণকে বসতে বলল তার ওপর।

তুর্বাণ বসলে মেয়েটি আবার ভেতরে ঢুকে গেল। এখন পুহগ আর মারু, কে তুর্বাণের গা ঘেঁষে বসবে তাই নিয়ে হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে গেছে। ভয় ভেঙে গেছে মারুর। সে দাদার আগেই তুর্বাণের একটা হাত টেনে নিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে নিজের অধিকার কায়েম করে নিল।

ভেতর থেকে মহিলাটি পাতায় করে কিছুটা খেজুর এনে রেখে দিল তুর্বাণের সামনে। একটা মাটির পাত্রে জল রাখল।

তুর্বাণের একটু অবাক লাগল। গরীব পরিবারটির আতিথেয়তা করার সামর্থ্য নেই, নিজেদের ভাগ থেকেই হয়তো কিছু অংশ দিয়ে দিয়েছে তাকে। সে ভাবল, এমন নিঃস্ব হয়ে না পড়লে সে এদের আতিথেয়তার উপযুক্ত প্রতিদান দিয়ে যেতে পারত।

কিছু না বলে তুর্বাণ খানিকটা খেজুর তুলে নিয়ে ওদের ভাইবোন দুটিকে দিতে গেল, কিন্তু ওরা দুজনেই কিছু না নিয়ে দ্রুত সরে গেল তুর্বাণের কাছ থেকে। তুর্বাণ অনেক সাধ্যসাধনা করেও পুহগ আর মারুকে কাছে আনতে পারল না।

মহিলাটি বিনীতভাবে বলল, আপনি ওদের আদর করে খেতে দিয়েছেন, এখন এই সামান্য জিনিসটুকু আপনি নিজে গ্রহণ করলে আমরা সকলেই খুশী হব।

তুর্বাণ হাত বাড়িয়ে খাবারটুকু মুখে তুলেই বলল, ভারী মিষ্টি খেজুর আপনার। আমি অনেক পথ পেরিয়ে এসেছি, অনেক খাবার খেয়েছি, কিন্তু আপনার এ খেজুরের স্বাদ ভোলার নয়।

খাওয়া শেষ করে সে মাটির পাত্র থেকে জল খেল। এই মুহূর্তে মনে হল তুর্বাণের, সারা শরীরটা তার স্নিগ্ধ হয়ে গেল। দীর্ঘ রাত পথ চলার ক্লান্তি তাকে যেভাবে ঘিরে ধরেছিল এখন এই ছোট্ট দুঃখী পরিবারটির আন্তরিকতার ভেতর এসে তা প্রায় দূর হয়ে গেল।

তুর্বাণ বলল, আপনাদের কাছে এসে আমি আজ অনেক শান্তি পেলাম। এ দুটি ছেলেমেয়ের মুখের

দিকে তাকালেই আনন্দ হয়।

মহিলাটি বলল, আপনি কোথা থেকে আসছেন?

তুর্বাণ বলল, অনেক দূরের দেশ থেকে আসছি, চিনবেন না আপনি। মহেঞ্জোদাড়োর নাম শুনেছেন?

মহিলাটি কি ভাবল, তারপর ভেতরে ঢুকে গিয়ে বেশ খানিক সময় পরে আবার ফিরে এল। তুর্বাণের সামনে একটা খেলনা বসিয়ে রেখে বলল, পুহগ তখন ছোট, মারুর জন্ম হয়নি, ওর বাবা গিয়েছিল খাল কাটার কাজে দোয়াবে। ফেরার সময় ছেলের জন্য কিনে এনেছিল এই খেলনাটা ইলামের বাজার থেকে। বলেছিল, মহেঞ্জোদাড়োর খেলনা।

তুর্বাণ দেখল পোড়ামাটির ওপর লাল রঙের চকচকে পালিশ দেওয়া বৃষমূর্তি। তাদের সিন্ধুনগরীর তৈরি এ খেলনা তাতে সন্দেহ নেই। সে খেলনাটি নেড়েচেড়ে বলল, আমার দেশের খেলনা এটি। অনেকদিন পরে আপনি আমার দেশের কথা মনে করিয়ে দিলেন।

একথা সেকথার পর তুর্বাণ বলল, আমার দলের লোকদের আমি আঁধিতে হারিয়েছি। তারপর এক জায়গায় আটকে পড়েছিলাম বেশ কিছুকাল। এখন আমার সঙ্গী বণিকদের আর খুঁজে পাব না আমি। তবু একাই যাব ববেরুতে। পথটা একটু জেনে নিতে পারলে ভাল হয়, তাই এসেছি আপনার কাছে।

মহিলাটি বলল, এখান থেকে ববেরু অনেক দূর। আপনাকে খাড়া পশ্চিম থেকে একটুখানি দক্ষিণ ঘেঁষে চলতে হবে। মিত্তানিদের রাজ্যের দক্ষিণে পড়বে ববেরু।

তুর্বাণ বলল, অনেক উপকার হল আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে। এখন দয়া করে যদি আমার একটু উপকার করেন। আমার চর্মপাত্রটিতে যদি জল ভরে দেন তাহলে কিছু পথ অন্ততঃ জলকষ্টটা দূর হয়।

মহিলাটি বলল, আমাদের সৌভাগ্য আপনাকে পথ থেকে অতিথি হিসেবে পেয়েছি। দয়া করে কটা দিন এখানে থেকে গেলে আমার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আমি আপনার সেবা করে আনন্দ পাব।

তুর্বাণ বলল, আমারও তো কিছু দিতে ইচ্ছে করবে ওদের, কিন্তু আমি এখন একেবারেই নিঃস্ব। বেশিদিন থেকে গেলে মায়া পড়ে যাবে, তখন ওদের কিছু না দিয়ে গেলে খারাপ লাগবে আমার।

মহিলাটি বলল, তার চেয়ে খারাপ লাগবে যদি এখুনি আপনি আমাদের ছেড়ে চলে যান।

মারু আর পুহগ এবার প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল তুর্বাণের ওপর। তারা তাকে কিছুতেই ছেড়ে দেবে না।

ওদের শান্ত করার জন্য বলল তুর্বাণ, আচ্ছা ঠিক আছে, আজ তোমাদের চাচা তোমাদের কাছেই থাকবে।

ওরা তখন নিশ্চিত হবার জন্য তুর্বাণের পোঁটলা-পুঁটলি যা ছিল সব কুড়িয়ে বাড়িয়ে নিয়ে ঘরে ঢুকে গেল।

সারাটা দিন কাটল ছেলেদের সঙ্গে গল্পগুজবে। পুহগ আব মরু কতরকম প্রশ্ন করতে লাগল।

পুহগ বলল, তোমাদের দেশ কি রকম চাচা?

তুর্বাণ বুঝিয়ে বলল, একটা নদীর ধারে আমাদের নগর। সেখানে সব বাড়িঘরই প্রায় পোড়া ইঁটের তৈরি। মস্ত বড় বড় সব বাড়ি।

তুর্বাণের কথা শুনে হাঁ করে তাকিয়ে রইল ছেলেমেয়ে দুটি। তারা জন্মে অবধি দেখে আসছে ডাল-পাতার ছাউনি দেওয়া এই ঘর। তারা কল্পনায় আনতে পারল না বিরাট বাড়ি-ঘর কি করে হতে পারে।

মারু বলল, তোমরা জল পাও কোথা থেকে?

তুর্বাণ হেসে বলল, আমরা বছরে অন্ততঃ একটিবার জলের ওপর ভেসে থাকি।

পুহগ অবাক হয়ে বলল, কি রকম?

তুর্বাণ বলল, আমাদের নদীর নাম সিন্ধু। সেই নদীতে যখন ওপর থেকে প্রবল জলের তোড় নেমে আসে তখন কূল ছাপিয়ে আমাদের পথঘাট ঘরবাড়ি ভাসিয়ে ডুবিয়ে দিয়ে যায়।

মারু বলল, তোমরা তখন কোথায় থাক?

তুর্বাণ বলল, অনেক সময় উঁচু ডাঙার দিকে চলে যাই। আবার যদি বুঝি জলের জোর তত বেশী নয়

তখন উঁচু ভিতের ওপর তৈরি ঘরের ভেতর থেকে যাই।

পুহগ বলল, আচ্ছা চাচা আমাদের মত তোমাদের এমন খোলামেলা জায়গা আছে?

তুর্বাণ বলল, বন আছে দূরে দূরে। ফাঁকা মাঠও আছে, সেখানে তোমাদের মত ছেলেমেয়েরা খেলা করে সারাদিন। নদীর তীরে নৌকা তৈরির কারখানা আছে। সেখানে গিয়ে তারা নৌকা তৈরির কারিগরি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। কেউ বা বঁড়শি ফেলে নদী থেকে মাছ ধরে।

তোমরা কি খাও চাচা?

আমরা গম আর যবের ছাতু খাই। মাছ-মাংস রোজ খেতে ভালবাসি আমরা। তবে তোমাদের মত এমন মিষ্টি স্বাদের খেজুর খেতে পাই না।

কথাটা শুনে পুহগের মনে একটু গর্ব হল। সে এবার বলল, আমরা যেমন রাস্তা ধরে হাঁটি, তোমাদের সে রকম রাস্তা আছে?

তুর্বাণ হেসে বলল, আমাদের দুদিকে সারি সারি বাড়ি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, আর তার মাঝখান দিয়ে সোজা বাঁধানো সব রাস্তা চলে গেছে। রাস্তার ধারে ধারে ঢাকা দেওয়া নালা রয়েছে।

মারু বলল, নালা আছে কেন চাচা?

তুর্বাণ বলল, ঘরের ভেতর থেকে স্নানের জল, ময়লা জল, সব ঐ নালা দিয়ে বেরিয়ে চলে যায়।

তোমরা রোজ স্নান কর?

তুর্বাণ বলল, রোজ ঘরের ভেতর স্নানঘরে স্নান সেরেনি, আবার কোনও কোনওদিন বারোয়ারী স্নানের জায়গায় স্নান করি সবাই মিলে।

মারু বলল, কি রকম সেই বারোয়ারী স্নানের জায়গাটা চাচা?

পাঁচিল ঘেরা বেশ বড় পুকুর। ওতে নামবার সিঁড়ি আছে। চারদিক বেশ পরিপাটি করে বাঁধানো। পুকুরের ধারে পোশাক বদলাবার ঘর আছে। পুজোর ঘরও আছে। স্নান সেরে পূজো দেয় অনেকে।

পুহগ কৌতূহলী হয়ে উঠল, আচ্ছা চাচা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা কেন তোমাদের ঐ স্নানের জায়গাটা?

তুর্বাণ বলল, দুটো কারণে। বাইরের লোকে যাতে স্নানের সময় উঁকিঝুঁকি দিতে না পারে। ঐ পাঁচিলের স্যাঁৎসেঁতে ভাবটা দূর করার জন্য পুরু শিলাজতুর প্রলেপ দেওয়া আছে। জলও সহজে ঢুকতে পারে না তার ভেতর দিয়ে।

পুহগ বলল, ভারী মজার জায়গা তো! আচ্ছা চাচা, ওখানে খুব বড় বড় লোক থাকে, তাই না?

তুর্বাণ বলল, বড়, গরীব সব রকম লোকই থাকে। তবে সবাই কাজ করে, তাই খাওয়া-পরার ভাবনা নেই কারো। বড়লোকেরা সব ব্যবসা করে। কারবারে তাদের খুব ডাকহাঁক।

পুহগ আবার জানতে চাইল, কিসের কারবার চাচা?

সোনা, রূপো, হাতির দাঁত আর পোড়ামাটির কতরকম জিনিস তৈরি করে তারা দেশ-বিদেশে বিক্রি করে আসে।

মারু বলল, আমরা ওসব জিনিস কোনদিন দেখিনি।

ভোরবেলা তোমার মা যে খেলনাটা বের করেছিলেন, ওটা আমাদের দেশের তৈরী।

ওটা খুব সুন্দর। আমি ওটা নিয়ে কত খেলা করেছি।

পুহগ বলল, ও ভেঙে ফেলবে বলে মা ওটাকে তুলে রেখেছে।

মারুর আত্মসম্মানে ঘা লাগতেই সে এক ঘা বসিয়ে দিলে পুহগের পিঠে। অমনি ধস্তাধস্তি লেগে গেল দুটি ভাইবোনে।

তুর্বাণ ওদের তফাৎ করে বিবাদ মিটিয়ে দিলে।

বেলা পড়ে এলে দুটি ভাইবোনকে নিয়ে কাছে-পিঠে বেড়াতে বেরোল তুর্বাণ। উঁচু-নীচু মালভূমি। বেশ খানিক দূরে একটা পাহাড়ী জঙ্গল মত দেখা যাচ্ছিল। তুর্বাণ বলল, চল পুহগ আমরা ঐ জঙ্গলের ধার থেকে ঘুরে আসি।

পুহগ ওর হাত টেনে ধরে বলল, খবরদার চাচা ওদিকে যেও না, মা বারণ করে দিয়েছে যেতে। আমরা কোনদিন যাই না, তবে কখনো সখনো মা একা ওদিকে যায়।

মারু অমনি বলল, মার খুব সাহস আছে চাচা।

তুর্বাণ বলল, কেন, বনের ভেতর কি মানুষখেকো জানোয়ার আছে নাকি?

পুহগ বলল, না, তবে মা বারণ করেছে তাই ওদিকে আমরা ভেড়াদের নিয়ে যাই না।

তুর্বাণ বনের দিকে আর গেল না।

রাতে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল।

বাইরের দাওয়ায় ঝাঁপ ফেলে শুতে দেওয়া হয়েছিল তুর্বাণকে। পাশেই ভেড়ার খোঁয়াড়। খোঁয়াড়ের ভাঙা বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখা যায় উঁচু-নীচু প্রান্তর।

গতরাতের পথচলার ক্লান্তির পর সে অঘোরে ঘুমোচ্ছিল। একসময় ভেড়াগুলোর নড়াচড়াতে তার ঘুম ভেঙে গেল। নতুন জায়গায় একবার ঘুম ভাঙলে বড় একটা আর ঘুম আসতে চায় না। সে বিছানায় শুয়ে তাকিয়েছিল সামনের উঁচু-নীচু প্রান্তরের দিকে। কতক্ষণ পরে তুর্বাণের মনে হল কেউ যেন কাউকে কোথাও যেতে বলছে, অন্যজন যেতে চাইছে না। কিছু পরে একটা ধস্তাধস্তির শব্দ শোনা গেল। তুর্বাণ বিছানার ওপর উঠে বসল। একটি বলিষ্ঠ লোক এ বাড়ির মহিলাটিকে টেনে নিয়ে চলেছে। মহিলাটির পরনের বাস শিথিল হয়ে গেছে। খোলা একরাশ চুল লুটিয়ে পড়ে আছে পিঠের ওপর। সে ক্রমাগত অসম্মতি জানিয়ে মাথা নেড়ে চলেছে, আর লোকটা তার কোন বারণ না শুনে টানতে টানতে তাকে নিয়ে চলেছে, উঁচু-নীচু প্রান্তরের ওপর দিয়ে। জ্যোৎস্নার আলো কিছুটা ঘোলাটে, তাহলেও সবকিছু দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। তুর্বাণের একবার মনে হল সে ছুটে গিয়ে ঐ বদ লোকটার কবল থেকে তার আশ্রয়দাত্রীকে উদ্ধার করে আনে। সে দেখল এখন মহিলাটাই তেমন জোরের সঙ্গে আর বাধা দিচ্ছে না। উঁচু-নীচু পথের দিকে চেয়ে সে চলেছে লোকটির পেছন পেছন।

তুর্বাণ দেখল, ওরা ঢেউ খেলান প্রান্তর পেরিয়ে দূরের অস্পষ্ট বনরেখার দিকে চলে গেল।

বিছানায় শুয়ে ভাবতে লাগল তুর্বাণ, মেয়েটির যদি প্রথম অভিজ্ঞতা হত তাহলে আতঙ্কে সে চেঁচিয়ে উঠত। সাহায্যের জন্য তুর্বাণকে অবশ্যই ডাকত। কিন্তু এসবের কোনটাই সে করেনি। তাই তুর্বাণ চুপচাপ বিছানায় পড়ে রইল। তার একসময় মনে হল পুহগের কথা, মা তাদের বনের দিকে যেতে বারণ করে দিয়েছে।

এই বারণের সঙ্গে একটা কার্যকারণ সম্পর্ক আছে বলে তার মনে হল।

অনেক সময় এমনি উত্তেজনার ভেতর কাটল তুর্বাণের। একসময় বাইরে আবার শিথিল পায়ের সাড়া বেজে উঠল! তুর্বাণ সতর্ক দৃষ্টি ফেলে দেখতে পেল মহিলাটি ফিরে আসছে। হাতে তার কি যেন একটা বস্তু রয়েছে। সামনের দিক দিয়ে এবার সে অতি সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে ঢুকল। তুর্বাণের বিছানার কাছে এসে কিছু সময় দাঁড়াল। তুর্বাণ ঘুমের ভান করতেই সে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে গিয়ে ঢুকল। তুর্বাণের সন্দেহ ছিল না কিছু। মেয়েটি যে ব্যভিচারিণী তা তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল।

ভোরবেলা বেশ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বিছানা ছাড়ল তুর্বাণ। পুহগ আর মারু কলবল শব্দে খোঁয়াড়ের মুখ খুলে ভেড়াগুলোকে বের করছিল।

মহিলাটি তুর্বাণের সামনে এসে বলল, রাতে ভাল ঘুম হয়েছিল তো আপনার?

তুর্বাণ মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে গত রাতের কোন ছবিই দেখতে পেল না। যেন কিছুই হয়নি এমনি একটা ভাব।

সে বলল, নতুন জায়গায় সহজে ঘুম আসতে চায় না, কিন্তু আপনার এখানে বিছানা নেবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম এসে গেল।

মহিলাটি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরের কাজে মন দিল।

তুর্বাণ বিছানা তুলছে দেখে মেয়েটি বলল, আপনাকে বিছানা তুলতে হবে না, আমাকে ঐটুকু সামান্য

কাজ করতে দিন।

বলতে বলতে মেয়েটি তুর্বাণের হাত থেকে হরিণের চামড়ার শয্যাটি নিজের হাতে টেনে নিল।

তুর্বাণ দাওয়ার নীচে নেমে পুহগ আর মারুর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ওরা তখন খোঁয়াড় খুলে দিয়েছে। ভেড়াগুলো লাফাতে লাফাতে চলেছে কালকের সেই টিলার দিকে।

পুহগ আর মারু ওকে ঘিরে ধরল, চল চাচা টিলার কাছে যাই। ওখানে বসে তোমার মুখে গল্প শুনব।

তুর্বাণের একা একা ঘরে বসে থাকতে ভাল লাগছিল না। সে মারু আর পুহগের সঙ্গে চারণভূমির দিকে বেরিয়ে পড়ল।

মহিলাটি পেছন থেকে ডেকে বলল, খাবার আপনার তৈরি থাকবে, চটপট চলে আসবেন। ওদের সঙ্গে হুড়োহুড়িতে মাতলে দেরী হয়ে যাবে।

তুর্বাণ মাথা নেড়ে জানাল, সে তাড়াতাড়িই চলে আসবে।

টিলার এপারে চরছিল ভেড়াগুলো। শিংওলা ভেড়াটা যাতে বাচ্চাগুলোর ওপর চড়াও হতে না পারে সেজন্যে শ্যেনদৃষ্টি ফেলে দাঁড়িয়েছিল মারু। ভারী ভাল লাগছিল তুর্বাণের এই ছোট মারুর দৃপ্ত ভঙ্গীতে দাঁড়ানোর দৃশ্যটা। সে কিন্তু কোন দিকে আর তাকাচ্ছিল না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে শুধু চেয়েছিল দুষ্টু ভেড়াটার দিকে।

অশ্বখুরের আওয়াজ বেজে উঠতেই তুর্বাণ চমকে উঠে দাঁড়াল। টিলার ওপারে কেউ যাচ্ছে বলে মনে হল। পুহগ তুর্বাণের হাত ধরে টানতে টানতে এমন একটা জায়গায় এনে দাঁড় করাল যেখান থেকে পাহাড়ের একটা ফাঁকের ভেতর দিয়ে ওপারটা দেখা যায়। তুর্বাণ উঁকি দিয়ে দেখল একটা লোক অশ্বারোহণে চলেছে, কিন্তু মুখখানা তার প্রায় ঝুঁকে রয়েছে অশ্বের পিঠের ওপর। মনে হল অতিকষ্টে অশ্বারোহীটি পথ চলছে।

তুর্বাণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বুঝল লোকটি উর্বীদের গোষ্ঠীর। তেমনি রঙ, চেহারা তেমনি দীর্ঘ।

তুর্বাণের কি মনে হল সে অমনি টিলা বেষ্টন করে ওপারে গিয়ে হাঁক দিয়ে বলল, আপনি কি হারিরুদ নদীর দিকে চলেছেন? আপনি কি তুরানী আইরণ?

অশ্বারোহী অশ্বের রাশ টেনে ধরল। সোজা হয়ে বসে ফিরে তাকাল তুর্বাণের দিকে। তুর্বাণ দেখল, লোকটির গাল বেয়ে নেমে এসেছে রক্তের ধারা।

এখন লোকটি অশ্বের মুখ ফিরিয়েছে তুর্বাণের দিকে। সে কাছে আসতেই তুর্বাণ দেখল, লোকটির মাথায় আঘাত লেগেছে, রক্তের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে বাদামী রঙের চুলগুলো। রক্তের একটি ধারা গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়েছে গলায়।

লোকটি তুর্বাণের কাছে এসে ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়াল।

আহত হয়েছি, একটু জল খাওয়াতে পারেন?

তুর্বাণ পুহগকে তার চর্মাধারটিতে জল ভরে আনতে বলল। পুহগ তীরবেগে ছুটল ঘরের দিকে।

লোকটি বলল, আপনাকে দেখে আমাদের গোষ্ঠীর লোক বলে মনে হচ্ছে না, অথচ আপনি আমাদের ভাষায় কথা বলছেন, আমার বড় অবাক লাগছে।

তুর্বাণ বলল, ঠিকই অনুমান করেছেন, আমি আপনাদের গোষ্ঠীর লোক নই, তবে বণিক বলে আমাকে নানা জাতির ভাষা শিখতে হয়।

লোকটি খুব বেশী রকম ক্লান্ত আর অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। সে আর কোনও কথা না বলে অশ্বে হেলান দিয়ে দাঁড়াল।

তুর্বাণ আবার বলল, পথে কি আপনি অশ্ব থেকে তীক্ষ্ণাগ্র পাথরের ওপর পড়ে গিয়েছিলেন?

লোকটি বলল, না আমরা তিনজন রাতে পথ চলছিলাম। একটা পাহাড়ের ধার দিয়ে আসার সময় চাঁদের আলোয় আমার মনে হল, অতি দরকারী এক ধরণের লতাগাছ রয়েছে ঐ পাহাড়ে। আমি আমার

সঙ্গীদের এগিয়ে যেতে বলে সেখানে নেমে পড়লাম। ওরা চলে গেল। আমি একা পাহাড়ের তলায় অশ্বটিকে বেঁধে রেখে পাহাড়ের ওপর উঠে গেলাম। আমার অনুমান ভুল হয়নি। গাছের ডাল থেকে ঝুলছিল লতাগুলো। আমি গাছে উঠে অনেক লতা সংগ্রহ করলাম। সেগুলোকে কাঁধে ফেলে পাহাড় বেয়ে নামছি, এমন সময় তীব্রবেগে একটি পাথর আমার মাথায় এসে লাগল। আমি নীচে গড়িয়ে পড়লাম।

অল্প নীচে এসে পড়েছিলাম তাই রক্ষা পেয়ে গেলাম। শ্বাস রোধ করে ফেলেছিলাম বলে জ্ঞান হারাইনি।

আমাকে নীচে গড়িয়ে পড়তে দেখে শত্রুরা পাহাড়ের ওপর থেকে হৈ হৈ করে ছুটে আসছিল। আমার শিক্ষিত অশ্বটি ব্যাপার বুঝে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ততক্ষণে। আমি একটা চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না। মাথা থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ে ঢেকে ফেলেছিল চোখটা। কোন রকমে অশ্বের পিঠে উঠে বসেছিলাম। ও বিদ্যুৎবেগে আমাকে বিপদের ভেতর থেকে বের করে আনল।

পুহগ জল নিয়ে এল ছুটতে ছুটতে। তুর্বাণ চর্মাধার থেকে জল ঢেলে দিল লোকটির হাতে। প্রাণভরে জলপান করে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে।

বলল, প্রাণ পেলাম। আপনার কথা কোনওদিন ভুলব না। কি নাম আপনার ভাই?

তুর্বাণ নামে আমি পরিচিত।

হঠাৎ তুর্বাণের কি যেন মনে পড়ে গেল। ওষুধ সংগ্রহের চেষ্টা, হারিরুদ নদীর তীরে গোষ্ঠীতে ফিরে যাওয়া, সবকিছুর ভেতর একটা কার্যকারণ সম্পর্কের স্পষ্ট ছায়া দেখতে পেল সে।

অমনি পাল্টা প্রশ্ন করে বসল তুর্বাণ, আপনি কী ঋভু ভায়েদের কেউ?

এমন বিস্ময় বোধকরি কখনো অনুভব করেনি অশ্বারোহীটি। সে শুধু মাথা নেড়ে জানাল, আমি ঋভু।

তুর্বাণ তাঁকে নমস্কার করে বলল, আপনার কীর্তির কথা আমার অজানা নয়।

ঋভু বললেন, আপনি আমার অপরিচিত, কিন্তু আপনি মহানুভব। বলুন আমি আপনার কি উপকার করতে পারি?

তুর্বাণ বলল, একটি কথা আপনাকে বলব যদি একান্ত গোপনে রাখেন।

ঋভু বললেন, আপনি আমার ওপর সম্পূর্ণ আস্থা রেখে বলুন, আমি সাধ্যমত আপনার উপকারের চেষ্টা করব।

তুর্বাণ বলল, আমার উপকারের কথা ভাবছি না, ভাবছি একটি মেয়ের উপকারের কথা।

ঋভু বললেন, কে তিনি?

উর্বী— বলল তুর্বাণ।

ঋভু বলল, আপনি বিস্ময়ের ওপর বিস্ময় সৃষ্টি করছেন। এখন আর আপনার কাছে জানতে চাইব না ঋত্বিক সোমভবের কন্যা উর্বীকে আপনি জানলেন কি করে। আমি তারই অসুখ নিরাময়ের জন্য চলেছি ওখানে।

আর একটি কথা— বলল তুর্বাণ, আপনি কথা দিন, যে-কোনরকম বিপদ থেকে উর্বীকে আপনার সাধ্য হলে রক্ষা করবেন।

ঋভু বললেন, কথা দিলাম বন্ধু। আপনি আমার অনেক ছোট, আমি আপনাকে কোনও প্রশ্ন করব না। তবে উর্বী যে আপনার ভালবাসা পেয়েছে সেটা অনুমানে বুঝতে কষ্ট হয় না।

তুর্বাণ বলল, আপনার গোষ্ঠীর কেউ কিন্তু আমার আর উর্বীর সম্পর্কের কথা জানে না, শুধু আপনিই জানলেন। উর্বীকে আপনি সব দিক থেকে রক্ষা করুন, আজ এই আমার প্রার্থনা।

ঋভু অশ্বারোহণ করলেন। সামনে এগিয়ে যেতে যেতে বললেন, আপনার মত তরুণ সুন্দর একটি হৃদয়কে আমাদের গোষ্ঠীতে পেলে আমরা খুশীই হতাম।

অশ্ব চালিয়ে ঋভু দ্রুত চলে গেলেন দৃষ্টি সীমার বাইরে। তুর্বাণের বুক থেকে উর্বী সম্বন্ধে দুর্ভাবনার পাষাণভারটা এই মুহূর্তে যেন নামিয়ে দিয়ে গেলেন অসামান্য শক্তিধর ঋভু।

আবাব বাতে সেই একই ঘটনার পুনবাবৃত্তি ঘটল। এ বাতে একাই গেল মহিলাটি। ফিরে এল সেই শেষরাতে। হাতে আগের রাতের মত সম্ভবতঃ কোন খাদ্যদ্রব্য ছিল।

তৃতীয় রাতে তখনও চাঁদ ওঠেনি। রাতের খাবার শেষে সবাই বিছানায় আশ্রয় নিয়েছে। শীতের খর উত্তুরে বাতাস বইছে হাড় কাঁপিয়ে। মহিলাটি বেরিয়ে গেল। তুর্বাণ মনে মনে প্রস্তুত হয়েই ছিল। সে অন্ধকারে অনুসরণ করল মহিলাকে। উঁচু-নীচু পথে আত্মগোপন করে যাচ্ছিল তুর্বাণ। অনেক পথ পেরিয়ে ওরা বনের ধারে এসে পৌঁছল। এতক্ষণ অন্ধকারে চলার দরুণ পথ চিনতে কোনরকম আর অসুবিধে হচ্ছিল না। বনের পথে পাহাড়ে উঠতে লাগল মহিলাটি। তুর্বাণও কিছু পথ অনভ্যস্ত পায়ে উঠল তাকে অনুসরণ করে। পাহাড়ের ওপর গাছের জটলা। পথ চিনে চলা দুষ্কর হয়ে উঠল। পাশেই একটা গাছ দেখে তুর্বাণের মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। সে সাবধানে ডালে ডালে পা রাখতে রাখতে অনেক ওপরে উঠে এল। এখন একটা শক্ত ডালের ওপর বসে সে চারদিকে চেয়ে দেখতে লাগল।

পাহাড়টা পশ্চিমে অনেক দূর অবধি প্রসারিত হয়ে আছে। সকালে যে টিলার কাছে অশ্বারোহী ঋভুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল সেটাও চিনতে কষ্ট হল না তুর্বাণের। এত ওপর থেকে সে বুঝতে পারল, এই পাহাড়ের কোল ঘেঁষেই দোয়াবের দিকে যাবার পথ। আর এই পাহাড়ের কোনও একটা জায়গা থেকে লতা সংগ্রহ করতে গিয়ে শত্রুর হাতে আহত হতে হয়েছিল ঋভুকে।

তুর্বাণ চমকে উত্তরে ফিরে দেখল একটা গাছের তলায় আগুন জ্বলে উঠল। গাছটা তার কাছ থেকে খুব বেশি দূরে ছিল না। সে স্পষ্ট দেখতে পেল একটা লম্বা মইয়ের মত বস্তু গাছের গায়ে লাগানো। গাছের মাথায় মইটা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে ছোট্ট একটা ঘরের মত দেখা যাচ্ছিল।

এবার নীচে তাকাতেই অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেল তুর্বাণ। মহিলাটি তার বেশবাস প্রায় খুলে আগুনে দেহটিকে উত্তপ্ত করে নিচ্ছে। বেশ খানিক সময় এইভাবে কাটার পর গাছের ওপর তৈরি ঘরের ভেতর থেকে একটা আওয়াজ বেজে উঠল, এবার উঠে এস সারিণা।

তুর্বাণ বুঝল, মহিলাটির নাম সারিণা। সে মই বেয়ে অবলীলায় উঠে গেল গাছের ওপরে। ঘরের ভেতর থেকে একটি ঘন কালো হাত বেরিয়ে এসে তাকে মই থেকে টেনে নিল ভেতরে।

ধিক ধিক করে খানিক সময় জ্বলতে জ্বলতে নিভে এল নীচের আগুন। তুর্বাণ উর্বীর দেওয়া একখানা ছোরা এনেছিল কোমরে বেঁধে। এখন সে সেটাকে কাজে লাগাতে চাইল। একবার হাত দিয়ে ছোরাখানা স্পর্শ করল সে। তারপর সাবধানে গাছ বেয়ে নেমে এল। সে এখন পায়ে পায়ে এগিয়ে এল ঐ গাছে লাগানো মইয়ের পাশে। মইটাতে টান দিয়েই সে দ্রুত সরে গেল পাশের একটা ঝোপের আড়ালে। মইটা গাছের আশ্রয় ছেড়ে পড়ে গেল নীচে। তুর্বাণ আড়াল থেকে ওপরে তাকিয়ে দেখল দুটো মুখই বেরিয়ে এসেছে বাইরে।

মহিলাটির গলা শোনা গেল, এখন উপায়?

লোকটা বাজখাঁই গলায় একটা কুৎসিত গালাগাল করে বলল, উল্টোপাল্টা পা ফেলে উঠেছিস তাই পড়ে গেল মইটা; মন তো পড়ে আছে তোর অন্য জায়গায়। খালি খাবার পার করার লোভে আসা।

মেয়েলি গলায় একটা ক্ষীণ প্রতিবাদের আওয়াজ উঠতেই লোকটা ভীষণ রেগে মনে হল গলা চেপে ধরল মহিলাটির। একটা আর্ত চীৎকার ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসতে লাগল। কিছু পরে একটা কালো অবয়ব নেমে আসতে লাগল গাছ বেয়ে। গাছ থেকে নেমেই সিঁড়িটাকে তুলে সিধে করে রাখার জন্য যেই নীচু হয়েছে, অমনি তার পিঠে তুর্বাণ আমূল বসিয়ে দিল ছোরাখানা।

লোকটা মুখ থুবড়ে পড়ে গেল মাটিতে। সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েক জায়গায় ছোরা চালাল তুর্বাণ ক্ষিপ্র হাতে। লোকটা বেঁকে চুরে কেঁপে স্থির হয়ে গেল।

তুর্বাণ মইটা তুলে লাগিয়ে দিল গাছে। বলল, নেমে এসো নীচে।

সারিণা প্রথমে মুখ বাড়াল। কিন্তু মইতে পা রাখতে সাহস পেল না। তখন তুর্বাণ ধমকের সুরে গম্ভীর গলায় বলল, শিগগির নেমে এসো।

সারিণা ধীরে ধীরে মই বেয়ে নীচে নামল। বনের ফাঁকে তখন চাঁদের আলো দেখা যাচ্ছে। সারিণা নেমেই মুখোমুখি দাঁড়াল তুর্বাণের। বিস্ময়ের শেষ নেই তার। বলল, তুমি এখানে!

তুর্বাণ বলল, কথা না বলে বাঁচতে চাও তো এই মুহূর্তে পালাও এখান থেকে।

লোকটি কোথায়? সারিণা খোঁজ করল।

তুর্বাণ বলল, চিরদিনের মত তার ব্যভিচারের স্বাদ আমি ঘুচিয়ে দিয়েছি। ঐ দেখ , সামনে তার লাশটা পড়ে আছে।

সারিণা বলল, সর্বনাশ! এখুনি একে সরিয়ে ফেলতে হবে এখান থেকে। শত্রুর ওপর নজর রাখার জন্য এখানে এ নিযুক্ত ছিল। ও সারা পাহাড়টা জুড়ে মরুচররা রয়েছে শত্রুদের জন্যে ওঁৎ পেতে। ওরা যখন ভোরবেলা দেখবে ওদের লোককে হত্যা করা হয়েছে তখন কাউকে আর আস্ত রাখবে না।

তুর্বাণ বলল, কোথায় সরানো যায় ওকে এখন?

সারিণা বলল, এই গাছের পশ্চিম গা ঘেঁষে একটা গভীর খাদ আছে, সেখানেই লাশটাকে ফেলে দিই এস। ওপর থেকে সবাই দেখবে ও অনেক নীচে পড়ে আছে। ওরা ভাববে গাছ থেকে ও নিজেই পড়ে গেছে অসাবধানে।

কথাটা মনে ধরল তুর্বাণের। তারা তখন ধরাধরি করে লাশটাকে নিয়ে এল নির্দিষ্ট জায়গায়। ফেলার আগে পাগলের মত কয়েকবার মৃতদেহটাকে চুম্বন আর আলিঙ্গন করল সারিণা।

তুর্বাণ অবাক হয়ে দেখতে লাগল সারিণার কাণ্ডখানা।

কয়েক মুহূর্ত পরেই কিন্তু সারিণা ধাক্কা দিয়ে গভীর খাদে ঠেলে ফেলে দিল মৃতদেহটা।

তারপর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না সেখানে। তূর্বাণের হাত ধরে প্রায় টানতে টানতে নিয়ে চলল নীচে। বলল, চল পালাই, এ বনে যতক্ষণ থাকব ততক্ষণ ও আমাদের অনুসরণ করবে।

ওরা পাহাড়ের উৎরাইতে ওঠা-নামা করতে করতে একসময় নেমে এল মালভূমিতে। চাঁদের আবছা আলোয় তখন পেছনের বন রহস্যময় প্রেতরাজ্য বলে মনে হচ্ছিল।

ঝোপড়িতে পৌঁছে সারিণা বলল, এখুনি এ তল্লাট ছেড়ে তোমাকে চলে যেতে হবে। ভোরবেলা যদি ওরা কেউ তদন্তে আসে তাহলে তোমাকে এখানে দেখলেই সন্দেহ করবে। ভাববে, আমি নতুন মানুষ পেয়ে ওকে হয়তো গাছের ওপর থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছি।

তুর্বাণ বলল, ওরা কি জানে যে তুমি ঐ লোকটার সঙ্গে রাত কাটাও?

সারিণা অসঙ্কোচে বলল, সবাই জানে।

তুর্বাণ তার সামান্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো কাঁধে তুলে নিয়ে রওনা দিল। যাবার সময় বলল, পুহগ আর মারুর সঙ্গে দেখা হল না, ওদের জন্য আমার অনেক আদর রইল।

কিছুপথ এগিয়ে তুর্বাণ দেখল সারিণা তার সঙ্গে আসছে' সে থমকে দাঁড়াতেই সারিণা বলল, চল, তোমাকে টিলাটা পার করে দিয়ে আসি। সামনের পাহাড়ের গা ঘেঁষে যদিও তোমাকে অনেক পশ্চিমে যেতে হবে তাহলেও রাতে পাহাড়টাকে বেশ খানিকটা দুরে রেখে চলবে।

তুর্বাণ বলল, পাহাড়ে যারা পথচারীদের আক্রমণ করে বেড়াচ্ছে, তারা কারা?

সারিণা বলল, এখন ওরা মরুচর। ওরা আগে ছিল দোয়াবে, ববেরুতে। কাশ্‌সুরা ওদেব হটিয়ে সব জায়গা দখল করে নিয়েছে। এখন পালিয়ে বেড়াচ্ছে ওরা। ওদের দেখলেই কাশ্‌সুরা তাড়া করে ।

তুর্বাণ বলল, ওরা এ পাহাড়ে কেন।

সারিণা বলল, কাশ্‌সুরা এ পথেই যাতায়াত করে। সুযোগ পেলেই তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওরা।

সারিণা একটু থেমে বলল, বড় হিংস্র এরা। অসুর রাজাদের কাছে এদের অনেকেই সৈন্যের কাজ নিয়ে ছিল। অসুর রাজারা বন্দীদের চামড়া তুলে, চোখ উপড়ে নিয়ে সাজা দিত। এরা সেই কাজে অভ্যস্ত।

তুর্বাণ বলল, সাংঘাতিক! কিন্তু তুমি এদের দলে গেলে কি করে?

সারিণা বলল, সেই অতি সামান্য কথাটুকু বলার জন্যই আমি তোমার সঙ্গে এখানে এসেছি।

ততক্ষণে ওরা টিলার কাছে এসে পড়েছিল।

সারিণা বলল, যদিও তোমাকে অনেক দূরের পথ যেতে হবে তাহলেও তুমি দুদণ্ড এখানে বসবে কি?

তুর্বাণ বোঝা রেখে বসল। সারিণা একটু দূরে বসে বলল, চলে যাবার সময় আমার ওপর খুব একটা খারাপ ধারণা নিয়ে যাবে, এ আমি চাই না।

তুর্বাণ তার দিকে চেয়ে আছে দেখে সারিণা বলল, আমি আমার স্বামী আর দুটি শিশু নিয়ে বেশ শান্তিতেই ছিলাম এখানে। সামান্য ক্ষেতি করত আমার স্বামী। গাছের খেজুর আর ভেড়ার পালের আয়ে আমাদের সংসার চলে যেত। মাঝে মাঝে পাহাড় থেকে কাঠ কেটে এনে গাধার পিঠে বোঝাই দিয়ে নিয়ে যেত দূর দেশে। বিক্রি করে আসত চড়া দামে। ওর খুব সুন্দর একটা শিল্পী মন ছিল। ফেরার পথে ভাল জিনিস পেলেই কিনে আনত।

একটু থেমে বলল সারিণা, যে লোকটাকে রাতে তুমি হত্যা করলে সে লোকটার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল আমার স্বামীর কাঠ কাঠতে গিয়ে। এরপর ও মাঝে মাঝে আসত আমাদের ঝোপড়িতে। আমার সরল মানুষ স্বামীটি যখন বিদেশে যেত তখন ও আমার সংসার তদারকীর অছিলায় আসত। যা কিছু প্রয়োজন দিয়ে যেত। আমি তখন ওর মতলব বুঝতে পারিনি।

পরে একসময় আমার স্বামী বিদেশ থেকে ফিরে এলে তাকে কি মতলব দিল জানি না, সে কাশ্‌সুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাবার জন্য ক্ষেপে উঠল। অনেক সোনাদানার লোভে পড়ে গিয়েছিল বোধহয় আমার সরল স্বামীটি। আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম, কাজ নেই আমাদের বড়লোক হয়ে, বেশ আছি আমরা। ও কিন্তু আমার কোন কথাই কানে নিল না। সৈন্যদের পোশাক পরে একদিন লড়াইয়ে চলে গেল। আর ফিরে এল না তার ঝোপড়িতে।

গলাটা কান্নায় ভেঙে গেল সারিণার। একসময়ে গলা ঝেড়ে নিয়ে বলল, তখন পুহগ আর মারু অনেক ছোট। আমি অকূল মরুতে পথ হারালাম। কি করে খাবার যোগাড় করব, কি করেই বা বড় করে তুলব আমার বাচ্চাদের, সে ভাবনায় আমার রাতের ঘুম গেল। স্বামী যুদ্ধে যাবার আগে যে খাবার সঞ্চয় করে রেখে গিয়েছিল, তা ফুরিয়ে গেছে। তখন বড় দুঃখে আমার দিন কাটতে লাগল।

একদিন ক্ষুধার জ্বালা অসহ্য হতে আমি বনে গিয়ে স্বামীর ঐ বন্ধুটির সঙ্গে দেখা করি। সে তখন স্পষ্টই বলে, প্রতিদিন তুমি আমার কাছে এসে খাবার নিয়ে যেও। কিন্তু রোজ আমাকে সঙ্গ দিয়ে যেতে হবে।

অনেক কেঁদেকেটেও পাষণ্ডটার মন ভেজাতে পারিনি। সে কিন্তু এতদিন তার কথা রেখেছিল। তাই তুমি দেখেছ আমি ওকে খাদে ঠেলে ফেলে দেবার আগে চুম্বন করেছিলাম। ওকে আমার শেষ কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলাম আলিঙ্গন করে। যদিও আমি ওকে একটা শকুনির চেয়ে বেশি কিছু ভাবতাম না।

তুর্বাণ বলল, আমাকে অসহায় অবস্থায় আশ্রয় দিয়ে তুমি আমার অনেক উপকার করেছ, কিন্তু আমি চলে যাবার সময় তোমার ক্ষতিই করে গেলাম।

সারিণা বাধা দিয়ে বলল, কোন ক্ষতি তুমি করনি, বন্ধুর মত উপকার করে গেলে। প্রতিদিন ভোর হলে ভাবতাম, এ জীবন শেষ হয়ে যাক, নতুন করে জীবন শুরু করি, কিন্তু আবার রাতের আঁধার নামলে ছুটে চলে যেতে হত মোহের ঘোরে। সামান্য খাবারের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেবার যে কি কষ্ট তা তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না।

তুর্বাণ বলল, এখন কি করবে তুমি?

সারিণা বলল, কুক্কুট আর ভেড়ার পাল বাড়াব। ক্ষেতি করব। আমার কাজে এখন সাহায্য করবে পুহগ আর মারু। আমি আবার নতুন করে বাঁচব, তুমি আমার বাঁচার পথ করে দিয়ে গেলে।

তুর্বাণ উঠে পোঁটলাটা কাঁধে ফেলল, তারপর সারিণাকে অভিবাদন জানিয়ে চলে গেল।

।। সাত।।

এ দুনিয়াটা যেন পথ দিয়েই বাঁধা। তাই পথে একবার নামলে পথ যেন আর ফুরোতেই চায় না।

তুর্বাণের দোয়াবে ঢোকা আর হল না। সেখানে তখন তুমুল লড়াই চলেছে। মানুষগুলো মশামাছির মত উড়ে পালাচ্ছে এদিক ওদিক।

মানুষের ধাক্কায় ধাক্কায় একসময় তুর্বাণ ছিটকে এসে পড়ল এমন একটা জায়গায় যেখানে নীলনদের দেশের অজেয় বাহিনীর মুখোমুখি হতে হল তাকে।

কয়েকশ বছর আগে হিক্‌সস্‌দের কাছে হেরে গিয়ে জন্মের মত জিতে গিয়েছিল নীলনদের দেশের ফারায়োরা। মহেঞ্জোদাড়ো, বরেরুর অধিবাসীদের মত এরাও জানত শুধু তামা আর ব্রোঞ্জের অস্ত্র গড়তে। সেসব অস্ত্র হিক্‌সস্‌দের লোহার অস্ত্রের কাছে একেবারে অকেজো হয়ে গেল। তাই একশোটি বছর মুখ বুজে সয়ে গেল হিক্‌সস্‌দের শাসন। তারপর একদিন বিজয়ীদের কাছ থেকে শিখল লোহার অস্ত্র তৈরির কৌশল, আর শিখল অশ্বের ব্যবহার। তখন কুকুরের মত তাড়িয়ে দিল হিক্‌সস্‌দের। ফারায়োরা বীরের বেশে নতুন বিদ্যুৎগতিসম্পন্ন অশ্বে চেপে এগিয়ে চলল সিনাই উপত্যকা পেরিয়ে পূর্বদিকে। জয়লক্ষ্মী তাদের বরণ করে নিল। নতুন যুদ্ধসজ্জায়, যুদ্ধকৌশলে তারা হল অজেয়।

থিবসে ফিরে যাবার সময় অগুণতি মানুষকে ফারায়োর বাহিনী ধরে নিয়ে চলেছিল দাস হিসেবে। মহেঞ্জোদড়োর বণিক-পুত্র তুর্বাণও হল নীলনদের দেশের সৈন্যদের হাতে বন্দি।

পিতা গুর্বাকের মুখে শোনা নীলনদের দেশের আশ্চর্য স্তূপগুলো দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল। ফারায়ো বা বড়বাড়ির লোকদের সমাধি-গৃহ ওগুলো। ফারায়োরা মরবার আগে ঐ বিরাট স্তূপগুলো তৈরি করাতেন। তারপর একদিন তাঁদের মৃত্যু হলে ঐ স্তূপের সুড়ঙ্গপথে নিয়ে যাওয়া হত গর্ভগৃহে। সেখানে আগে থেকেই সাজানো থাকত ঘর। সোনাদানা খাবার-দাবার আসবাবপত্রে পূর্ণ হয়ে থাকত প্রকোষ্ঠগুলি। পরলোকে গিয়েও যাতে অসুবিধেয় না পড়তে হয় তারই ব্যবস্থা থাকত সেখানে।

সন্ধ্যায় নীলনদের তীরে বালুর জমিনে পড়েছে শিবির। বন্দি দাসেরা সারাদিন পথ চলার পর শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। তাদের ভেতর পাহারাদার সৈন্যরা বিলিয়ে দিয়েছে রাতের খাবার। কেউ বা খাচ্ছে, কেউ বা ক্লান্তিতে লুটিয়ে পড়ে আছে বালির বিছানায়। ওদের ভেতর একটি যুবক হাঁটুর ভেতর মুখ গুঁজে বসে কি যেন ভাবছে। তুর্বাণ তার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। যুবকটি কোন দেশের মানুষ তা সে জানে না। তবু নির্বাক বসে না থেকে মিশরের ভাষাতেই কথা বলে উঠল তুর্বাণ, কি ভাবছ বসে বসে?

যুবকটি চমকে ফিরে তাকাল তুর্বাণের দিকে। সে-ও মিশরীয় ভাষায় উত্তর দিল, ভাগ্যের কথাই ভাবছি।

তুর্বাণ বলল, যা বলেছ ভাই, কোথায় ছিলাম কোথায় এলাম।

যুবক তুর্বাণের কাছে উঠে এসে বসল। এতক্ষণ মনের ভারটা মনেই চেপে রেখেছিল। এখন কথা বলার একটি সঙ্গী পেয়ে সে যেন বর্তে গেল।

যুবকটি বলল, কি নাম ভাই তোমার? কোন্ দেশে বাস?

তুর্বাণ বলল, অনেক দূর আমার দেশ। সিন্ধু বলে একটা নদী আছে, তার তীরে মহেঞ্জোদাড়ো নগরে আমার বাড়ি। নাম, তুর্বাণ।

যুবকটি বলল, আমার নাম সিলিউ। লিউ বলেই সবাই ডাকে। ঈজান সাগরের দক্ষিণে ক্রীট বলে একটা দ্বীপ আছে, সেখানে আমার বাড়ি। সমুদ্দুর থেকে মুক্তো তোলা আমার কাজ, তাই নিয়ে সিরিয়ায় গিয়েছিলাম ব্যবসা করতে। সেখান থেকে যুদ্ধের কথা শুনে ঘরের ছেলে ঘরে পালিয়ে আসতে গিয়ে ধরা পড়ে গেলাম।

তুর্বাণ বলল, আমিও ববেরু আসছিলাম ব্যবসার জিনিসপত্র নিয়ে, পথে আঁধিতে দলছাড়া হয়ে পড়ি। তারপর চলতে গিয়ে দেখি লড়াই বেধেছে চারদিকে। লড়াইয়ের ধাক্কায় এখানে এসে পড়েছি।

লিউ বলল, দুজনেই তাহলে কারবারী, ভাগ্যের ফেরে পড়লাম এক জায়গায়। এখন থেকে আমরা বন্ধু।

তুর্বাণ বলল, বয়সেও প্রায় আমার সমান।

উঠতে বসতে চলতে ফিরতে এখন থেকে লিউ আর তুর্বাণ একসঙ্গেই রইল।

ওরা থিব্‌সে পৌঁছল বেশ কয়েকদিন পথ চলার পর।

থিব্‌সে এসেই কিন্তু ওদের আলাদা হতে হল। রাজবাড়ির কর্মচারীরা দাসদের পরীক্ষা নিয়ে যে যার কাজের ভাগ করে দিল।

লিউয়ের চেয়ে মিশরীয় ভাষাটা ভাল আয়ত্ত করেছিল তুর্বাণ, তাই ফারায়োদের খাস কামরায় চাকরীতে বহাল হয়ে গেল সে। লিউ রইল পাথর বইবার কঠিন কাজ নিয়ে।

তুর্বাণের কাজটা মোটেও কঠিন ছিল না, প্রায় সারাক্ষণই বাইরে বেড়িয়ে বেড়ানোর কাজ। হারেম থেকে পনেরো নম্বরের রানী তাঁর দাসীকে দিয়ে ফরমাশ করে পাঠাতেন বাইরে থেকে টুকিটাকি জিনিস এনে দেবার জন্যে।

দাসী কিনো হয়তো এসে বলল, মহারানীর জলপাই খেতে ইচ্ছে করছে। অমনি দুনিয়ার যেখান থেকে হোক তাঁকে সেই মুহূর্তে জলপাই এনে দিতে হবে। রাজ-ভাঁড়ারের জলপাই, সে যত ভালই হোক, তা চলবে না।

আবার কখনো ইচ্ছে গেল, কাঠের পাটার ওপর অথবা পেপাইরাস কাগজের ওপর ছবি আঁকিয়ে আনতে হবে।

ছোট শিল্পীর খোঁজে। শিল্পীকে বুঝিয়ে দিতে হবে মহারানীর ঠিক ঠিক ইচ্ছেটা কি। দাসীর কাছ থেকে বুঝে নিতে হবে ছবির বিষয়বস্তু নিখুঁতভাবে। হয়তো নাচছে দুটি দাসী, দেখছেন স্বয়ং মহারানী।

কখনো আদেশ হল ফারায়োর পাশে বসে আছেন মহারানী, সে ছবি এঁকে দিতে হবে। মহারাজ আর মহারানীর চুণা পাথরের গড়া ছোট্ট মূর্তি দেওয়া হল, আঁকতে হবে তাই দেখে। ছবিতে যেন মহারাজার চোখে ফুটে ওঠে ভালবাসার দৃষ্টি। তুর্বাণ ফারায়োকে দেখেছে বিজয় শোভাযাত্রার উৎসবে কিন্তু মহারানীকে দেখা হয় নি। ফারায়োর যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। বার্ধক্যের রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে মুখে। কিন্তু চোখে না দেখলেও তুর্বাণ বুঝেছে মহারানী বয়সের দিক থেকে মহামান্য ফারায়োর চেয়ে অনেক ছোট। তাঁর ছেলেমানুষী খেয়াল-খুশিতেই ধরা পড়েছে তাঁর বয়স।

তুর্বাণ বাইরে বেরোলেই দেখা করে আসে লিউয়ের সঙ্গে। হারেমের ছাড়পত্র দেখলে ফারায়োর লোকেরা কোন প্রশ্ন করে না তুর্বাণকে। বরং সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখে সবাই।

সন্ধ্যা হলে কাজে ছুটি। তখন তুর্বাণ আর লিউ গিয়ে বসে নীল নদের তীরে। চাঁদের আলো জলে পড়ে ঢেউতে ভাঙতে থাকে। উজ্জ্বল পালিশ করা রূপোর মত মাছেরা যেন ঝিলিক দিয়ে ওঠে জলে। বালি চিক্‌চিক্ করে। তুর্বাণের মনে পড়ে যায় সিন্ধু নদীটির কথা। কত প্রভাত সন্ধ্যা তার কেটেছে সিন্ধুর বয়ে চলা জলের দিকে তাকিয়ে। তার মনে পড়ে যায় আন্দ্রার কথা। অমনি হাতে বাঁধা বন্ধন-সূত্রটির ওপর চোখ পড়ে যায়। কত বিপর্যয় ঝড়ের বেগে বয়ে গেছে তার ওপর দিয়ে, তবু বন্ধন-সূত্রটিকে সে ছিন্ন হয়ে যেতে দেয় নি। উর্বী এখন কি করছে! গুহার প্রাঙ্গণে বসে সে কি দুটি চোখ পেতে রেখেছে আকাশের ঐ চাঁদের ওপর? সে কি তারই মত ভাবছে ক্ষণিকের অতিথি তুর্বাণের কথা! ঋভু কি তাঁর অলৌকিক চিকিৎসায় উর্বীর দুরারোগ্য ব্যাধির উপশমে সক্ষম হয়েছেন?

আর একটি ছবি ভেসে ওঠে তুর্বাণের চোখের ওপর। একটি আশ্চর্য সুন্দর শিশুকে বুকে চেপে ধরে দাঁড়িয়ে আছে উর্বী। স্বর্গীয় মহিমার ছবি ফুটে উঠেছে মমতা-মাখানো মুখে।

লিউ কথা বলে ওঠে, অমনি ছিঁড়ে যায় স্বপ্ন-সূত্র।

কি ভাবছ তুর্বাণ?

তুর্বাণ বলে, ভালবাসার মানুষের কথা।

লিউ বলে, ভালবাসা কি মুক্তোর চেয়ে দামী তুর্বাণ?

তুর্বাণ হেসে ওঠে। বলে , যতক্ষণ ভালবাসার ছোঁয়া থেকে হৃদয় বঞ্চিত থাকে ততক্ষণ মুক্তোর চেয়ে দামী কিছু নেই বন্ধু।

লিউ বলে, সমুদ্রকে ভালবেসেছি চিরদিন, সে-ও আমাকে গভীর ভালবাসায় ডুবিয়ে রেখেছে। সে আমাকে ভালবাসায় প্রতিদান দিয়েছে হাত ভরে মুঠো মুঠো মুক্তো দিয়ে।

তুর্বাণ হেসে বলে, তুমি সত্যিকারের ব্যবসায়ী লিউ। কারবারী হতে গেলে এমনি করে ভালবাসতে হয় কারবারকে।

লিউ তুর্বাণের হাসিতে যোগ দিয়ে বলল, শুনেছি ভালবাসা আগুনের মত হৃদয়কে পোড়ায়। মৃত্যুর বেদীতে ভালবাসার ফুল ফোটে।

তুর্বাণ বলল, কে বলে তুমি ব্যবসায়ী লিউ, তুমি কবি।

এমনি করে একটি বছর কেটে গেল। ফারায়ো কঠিন রোগে অনেকদিন শয্যাশায়ী। ফারায়ো-উপত্যকায় পাথর কেটে সুড়ঙ্গ তৈরি হচ্ছে। সেই সুড়ঙ্গের ধারে ধারে তৈরি হচ্ছে প্রকোষ্ঠ। শয্যাশায়ী ফারায়োর শেষকৃত্য এখানেই সম্পন্ন হবে। পাথর বয়ে আনছে শত শত দাস। শ্রান্ত দেহে পড়ছে শাসনের চাবুক। স্বেদে রক্তে ওদের যন্ত্রণা-বিকৃত মুখগুলোকে মানুষের মুখ বলে মনে হয় না। এক বছরের কাজ যেন একটি মাসে তৈরি করার কঠিন দায়িত্ব নিয়েছে রাজ কর্মচারীর দল। ফারায়োর আকস্মিক মৃত্যু হলেই বিপদ। তার আগে সাজানো চাই গর্ভগৃহ সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভার দিয়ে।

রাতে প্রাসাদের ভৃত্যদের জন্য নির্দিষ্ট গৃহে শয়ন করে না তুর্বাণ। সে চলে যায় লিউয়ের কাছে। এ জন্যে দাসী কিনো রসিকতা আর মন্তব্য করতে ছাড়ে না। বলে, নিশাচর তুমি, তাই মন বসে না প্রাসাদে। কার বাহুর বাঁধনে ধরা দাও তুর্বাণ?

তুর্বাণ হেসে বলে, সে আমার পুরুষ বন্ধু কিনো। তার বলিষ্ঠ পেশী বহুল হাত আর চওড়া বুকের দিকে তাকালে যে-কোন সুন্দরী তরুণীর ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে করবে।

কিনো অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে বলে, তোমার চেয়ে সুন্দর, তোমার চেয়ে বলিষ্ঠ?

তুর্বাণ বলে, একদিন এসো আমার বন্ধুর কাছে, প্রাসাদে আর ফিরে যেতে ইচ্ছে করবে না।

কিনো হাসির লহর তুলে দৌড়ে পালাতে গিয়ে বলে, তাহলে আর তোমার বন্ধুকে দেখা হল না।

তুর্বাণ এক রাতে প্রাসাদ থেকে এসে দেখে লিউ জ্বরে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে বালুর জমিনে। তারা সারা দেহ, মুখ চাবুকের ঘায়ে বিক্ষত।

তুর্বাণ সারা রাত সেবা করে তাকে সুস্থ করে তুলল।

ভোরের আলো ফুটলে সে লিউকে কিছুটা সুস্থ দেখে জিজ্ঞেস করল, তোমাকে এমন শাস্তি পেতে হল কেন বন্ধু?

লিউ বলল, হাসির পুরস্কার।

তুর্বাণের মুখে বিস্ময়, কি রকম?

লিউ বলল, একটা ভারী ওজনের পাথর টানছিলাম, একটু দম নেবার জন্যে থামলেই চাবুক পড়ছিল পিঠে। দু'তিনটে লোক জ্ঞান হারিয়ে পড়ে রইল পথের পাশে। হঠাৎ ফারায়ো-উপত্যকার পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে একটা পাগল চেঁচিয়ে উঠল, ওরে মূর্খ, পাথরের তলায় শুয়ে পড়। হাজার প্রাণের বিনিময়ে তবেই না এক মহামান্য ফারায়োর কবর তৈরী হয়।

ওর কথা শুনে আমি হা হা করে হেসে উঠেছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, পিঠের চামড়াটা চিরে গেল চাবুকের ঘায়ে।

তুর্বাণ প্রাসাদে গিয়ে কিনোর সাহায্য ভিক্ষে করে বলল, তুমি বাঁচাও আমার বন্ধুকে। এমনি আর ক'টা দিন চললে মারা পড়বে বেচারা।

কিনো দৌড়ল রানীর মহলে। লিউ-এর মুক্তির পরোয়ানা বের করে আনতে তার দেরী হল না। কিন্তু তুর্বাণ যখন লিউয়ের কাছে গিয়ে দেখাল সে আদেশ, তখন বেঁকে বসল লিউ। এতগুলো মানুষ রোজ চাবুক খাবে, আর সে একটা জোয়ান মানুষ হয়ে পালিয়ে বাঁচবে কাজের ভয়ে? সে রাজপ্রাসাদের আদেশটা নিজের কাছে রেখে দিয়ে বলল, ধন্যবাদ বন্ধু, দরকার হলে এটাকে কাজে লাগাব।

দরকার এসে পড়ল শীঘ্রই। কিনোর সাহায্যে গোপনে দেখা করলেন রানী তুর্বাণের সঙ্গে। বললেন, একটি গোপনীয় কাজ যদি করে দিতে পার তাহলে এ দেশ থেকে স্বদেশে ফিরে যাবার আদেশপত্র আমি যোগাড় করে দেব।

তুর্বাণ মাথা নীচু করে বলল, বলুন, সাধ্যের অতীত না হলে অবশ্যই করব।

রানী বললেন, আমার এই গোপনীয় পত্র নিয়ে তুমি আর তোমার বন্ধু চলে যাও নীল নদ বরাবর উত্তর মুখে। প্রতিটি নগরে খোঁজ করে জেনে নেবে প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ হাফিজাদ কোথায় আছেন। তাঁর হাতে আমার এ পত্র পৌঁছে দিও। আর সঙ্গে করে তাঁর উত্তর আনতে ভুলোনা যেন।

রানীর আদেশ শিরোধার্য করে বেরিয়ে পড়ল দুবন্ধুতে। নীল নদ ধরে ও'রা দ্রুত এগোতে লাগল। প্রথম দুটি শহর ছেড়ে তৃতীয়টিতে পাওয়া গেল সৈন্যাধ্যক্ষের সন্ধান।

রানীর পত্র পেয়ে সমাদরে হাফিজাদ সে রাতে রাখলেন দুবন্ধুকে। রাজপ্রাসাদ আর ফারায়োর অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞেস করলেন। কবর গৃহ নির্মাণের বিলম্ব কত তাও জেনে নিতে ভুললেন না।

প্রভাতে পত্রের উত্তর দিয়ে বললেন, গোপনীয়তা রক্ষার কথা নিশ্চয়ই দ্বিতীয়বার তোমাদের বলে দিতে হবে না। আর এ কাজের উপযুক্ত পুরস্কার সময় হলে তোমরা অবশ্যই পাবে।

ওরা দ্রুত ফিরে এল থিব্‌সে। রানীর সঙ্গে কিনোর কথামত দেখা করল নদীর ওপারে কর্ণাকের মন্দিরে। ফারায়োর মঙ্গলের জন্যে ফারায়োর সবচেয়ে প্রিয় রানী, কিনোকে সঙ্গে করে এসেছেন 'আমোন-রা'র কাছে পূজো দেবেন বলে। সেখানেই তুর্বাণ হাফিজাদের উত্তরপত্র রানীর হাতে তুলে দিল। রানী পরিস্থিতির কথা ভুলে গেলেন। তিনি পাগলের মত পত্রে ওষ্ঠস্পর্শ করে চুম্বন করতে লাগলেন। তারপর রাজপ্রাসাদে ফিরে আসবার পথে বললেন, মহামান্য হাফিজাদ অশ্ববাহিত রথে দু'এক দিনের ভেতরেই রাজধানীতে এসে পৌঁছবেন। তিনি প্রতি সন্ধ্যায় ছদ্মবেশে আসবেন কর্ণাকের মন্দিরে। আমি আসব দেবাদিদেব 'আমোন-রা'র পুজোর ছলে কিনোকে নিয়ে। তোমরা আমার দেহরক্ষীর সাজ পরে সঙ্গে আসবে। তাহলে কারো মনে সন্দেহের সামান্য মেঘও ঘনাবে না।

তুর্বাণ দেখে, রানী যেন রূপের আগুনে জ্বলছেন। যে-কোন পুরুষ এই আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে দ্বিধা করবে না ক্ষণমাত্র।

এক সন্ধ্যায় কিনোর সঙ্গে তুর্বাণের দেখা। তুর্বাণ বলল, আমার বন্ধুটিকে কেমন দেখলে?

কিনো বলল, গোঁয়ার। নইলে প্রথম দিন রানীর ছাড়পত্র পেয়েও ঐ পাথর বইবার কাজ স্বেচ্ছায় কেউ করতে চায়?

তুর্বাণ বলল, লিউ-এর প্রাণটা আমাদের চেয়ে অনেক বড়।

কিনো কৌতুকের হাসি হেসে বলল, মরুর মত বড়। যত জলই ঢাল, ভিজবে না।

তুর্বাণ বলল, এ কথা কেন?

কিনো বলল, এরা নির্ভরযোগ্য, কিন্তু ভালবাসার জল ঢেলে এদের ভেজানো যায় না।

তুর্বাণ বলল, নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিটির ওপর ভর দেওয়া যায় কিনা সেকথা পরে ভেবো, কিন্তু আমাকে বল তো দেখি মহারানীর ব্যাপারখানা কি?

কিনো বলল, অতি গোপনীয়। ব্যাপারটা আমি জানি, কিন্তু বলব না।

তুর্বাণ বলল, বলা না বলা তোমার ইচ্ছে। পীড়াপীড়িতে আর যাই হোক গোপন কথা ফাঁস হয় না।

কিনো বলল, রাগ করলে তুর্বাণ?

তুর্বাণ বলল, লিউ হলে এতক্ষণ দ্বিতীয় কথাটি না বলে বুকের ভেতর থেকে সব কথাগুলো উজাড় করে দিতে।

কিনো বলল, লিউকে আরো বলতাম না। এসব ব্যভিচারের কথা তার না শোনাই ভাল।

ব্যভিচার!

কিনো বলল, আমাদের দাসদাসীদের বেলা কথাটার অর্থ ব্যভিচার আর রাজবাড়িতে ওটাকেই বলে

চক্রান্ত।

কিসের চক্রান্ত?

কিনো বলল, সিংহাসনের। ফারায়োর মৃত্যুর পরে তাঁর প্রথমা রানীর বড়ছেলেই ফারায়ো হবেন। কিন্তু ফারায়োর পেয়ারের পঞ্চদশ রানীটির ইচ্ছে একেবারে উল্টো। তিনি চান স্বামীর মৃত্যুর পরে নতুন ফারায়ো হয়ে বসবেন সৈন্যাধ্যক্ষ হাফিজাদ, আর তিনি হবেন প্রধানা মহিষী।

তুর্বাণ বলল, তুমি এত কথা জানলে কি করে?

কিনো বলল, আর যাই হোক আমার কর্ত্রী আমার মত কথা গোপন করে রাখতে পারেন না।

তুর্বাণ হেসে বলল, এই বুঝি তোমার কথা গোপন করা?

কিনো কপট ক্রোধের মুষ্ঠি তুলে বলল, এই জন্যেই তো তোমাদের কোনও কথা বলতে নেই।

থিবসের মন্দিরে সন্ধ্যার চন্দ্রালোকে দেখা হল হাফিজাদের সঙ্গে রানী সেনুই-এর। প্রাকারের অন্তরালে উভয়ে আলিঙ্গনে আবদ্ধ হলেন। মন্দির স্তম্ভের রন্ধ্রপথে সে দৃশ্য দেখে এসে তুর্বাণের কানে কানে সরস সমাচারটি দিয়ে গেল কিনো।

লিউ তুর্বাণের কাছে ব্যাপারটা জানতে চাইলে কিনো বাধা দিয়ে বলল, পুরুষ মানুষের এসব ব্যাপারে কৌতূহল ভাল নয়।

কিন্তু ঘটনার গতি ঘুরে গেল আশ্চর্যভাবে। কিনোই অন্তঃপুর থেকে এনে দিলে সমাচার। রানী সেনুই কেমন যেন অপ্রকৃতিস্থ হয়ে গেছেন। সারারাত ঘুম নেই চোখে। কখনও আপন মনে কিছু বলছেন, কখনও মৃদু মৃদু হাসছেন। রানীর কাছে বসে রাত জেগেছে কিনো, সেবা করেছে সাধ্যমত। কিছু রানীর কথা থেকে, কিছু বা জিজ্ঞেস করে, রহস্যের চাবিকাঠির সন্ধান পেয়েছে সে।

রানী সেনুই কুমারী অবস্থায় ভালবাসতেন হাফিজাদকে। একই অঞ্চলে ছিল ওঁদের বাড়ি। হাফিজাদ চিরদিন অত্যন্ত সাহসী আর দুর্ধর্ষ ছিলেন। তিনি কাজ করতেন ফারায়োর সৈন্যবাহিনীতে। যেখানে বিপদ, সেখানেই ঝুঁকি নিতেন হাফিজাদ। তার ফলে নজরে পড়ে গেলেন স্বয়ং ফারায়োর। উন্নতির পথ আর কেউ রুখতে পারল না। এবারের পূর্বদেশ অভিযানে তিনিই ফারায়োর বাহিনী পরিচালনার ভার পেয়েছিলেন। নতুন অস্ত্র ব্যবহার, নতুন অশ্বারোহী বাহিনী সংগঠন, সবই তাঁর ব্যবস্থাপনায় হয়েছিল। তাই অভিযান-শেষে ফারায়ো হাফিজাদকে নিজের পাশে বসিয়েছিলেন বিজয় মহোৎসবের দিনে। ঘোষণা করেছিলেন, হাফিজাদই বিশাল ফারায়ো সাম্রাজ্যের প্রধান সেনাপতি।

সেই হাফিজাদের প্রেমিকা সেনুইকে বিয়ে করে পূর্ণ রানীব মর্যাদা দিয়ে এনেছিলেন ফারায়ো। সেনুই-এর রূপের খ্যাতি ঝড়ের মুখে আগুনের মত ছড়িয়ে পড়েছিল সারা থিব্‌সে। তাই সাধারণ বণিকের মেয়ে সেনুইএর পক্ষে ফারায়োর প্রাসাদে উঠে আসতে এতটুকুও অসুবিধে হয়নি সেদিন। কিন্তু বিয়েতে সুখী হয়নি সেনুই। মনের আগুনে পুড়েছেন তিনি প্রতিদিন। বৃদ্ধ ফারায়ো সোনার আগুন জ্বালাতে পারেন তাঁর দেহে, কিন্তু তরুণী মনে কামনার আগুন জ্বালাতে পারেন না।

ওদিকে হাফিজাদের অন্তর সেনুইকে না পেয়ে ভেঙে গিয়েছিল ঠিক, কিন্তু জোড়া লাগতে বেশী সময়ও লাগেনি। পর পর ক্ষমতার শিখরে উঠে যাবার সাধনায় তিনি নিজেকে এমনভাবে ডুবিয়ে রেখেছিলেন যে তাঁর ঐ প্রথম জীবনের ক্ষতিটুকুর জন্য পরবর্তীকালে বিশেষ ক্ষোভ ছিল না মনে। কিন্তু রানী সেনুইএর পত্র পাওয়ার পর অতীতের ভালবাসার আঘাত চিহ্নটা বড় বেশী হয়ে দেখা দিল। এখন ক্ষমতার শিখরে উঠে এসে ফেলে আসা ভালবাসার সমতলটার দিকে তাকিয়ে তাঁর প্রাণটা হু হু করে উঠল।

কিনো বলল, রানীর প্রস্তাব মত হাফিজাদ ফারায়োর সিংহাসন নেবার জন্য তৈরি হয়েই ছিলেন, কিন্তু বাদ সাধলেন ফারায়ো স্বয়ং। তিনি তাঁর রোগশয্যার পাশে হাফিজাদকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। হাফিজাদ গেলে তাঁর হাতটি নিজের হাতের ভেতর টেনে নিয়ে বললেন, তোমার জীবনে প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কিছু সাহায্য যদি আমি করে থাকি, তাহলে অন্তিম সময়ে একটা ভিক্ষা আছে।

হাফিজাদ মাথা নত করে বললেন, ভিক্ষা নয় মহামান্য ফারায়ো, বলুন আদেশ।

ফারায়ো নিজের জ্যেষ্ঠাপুত্রকে কাছে ডেকে তার হাত হাফিজাদের হাতের জিম্মায় দিয়ে বললেন, এই নতুন ফারায়োর সিংহাসন রক্ষার সম্পূর্ণ ভার তুমি আজ থেকে গ্রহণ করবে, এই কথা দাও হাফিজাদ।

বলতে বলতে দুটি বিন্দু অশ্রু গড়িয়ে পড়েছিল মহামান্য ফারায়োর চোখ থেকে।

যে হাফিজাদের আদেশে শত্রুপুরী অগ্নিদগ্ধ হয়েছে, নিরীহ মানুষের রক্তে ভিজে গেছে পথপ্রান্তর, স্বামীসন্তানহারা নারীর হাহাকারে বাতাস হয়েছে তরঙ্গিত, অথচ এতটুকু বিচলিত হয়নি হাফিজাদের অন্তর, সেই হাফিজাদ ফারায়োর দুফোঁটা চোখের জলে বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনি নতজানু হয়ে বললেন, আমি অকৃতজ্ঞ নই মহামান্য সম্রাট। প্রাণ দিয়ে রক্ষা করব নতুন ফারায়োর সিংহাসন।

কিনো বলল, সেই থেকে রানী অপ্রকৃতিস্থ।

কিনো আরও বলল, আমি যতটুকু জেনেছি, রানীর সাম্রাজ্যের ওপরে কিন্তু কোনও লোভ নেই। তিনি তাঁর বঞ্চিত জীবনের পূর্ণতার জন্যেই শুধু চান হাফিজাদকে। সব ক্ষমতার মোহ ঝেড়ে ফেলে হাফিজাদ যদি তাঁকে নিয়ে লোকালয় থেকে বহুদূরে নির্জন কোনও মরুদ্যানে থাকেন তাহলেও তিনি সুখী বলে ভাববেন নিজেকে।

কিন্তু হাফিজাদের পক্ষে আর তা সম্ভব নয়। তিনি কথা দিয়েছেন সাম্রাজ্য রক্ষার। প্রেমের চেয়ে একজন নিষ্ঠাবান সৈনিকের আনুগত্যের দাম বোধকরি অনেক বেশী।

।। আট ।।

এক রাতে থিব্‌সের কর্ণাক মন্দিরে রানী এলেন তূর্বাণ, কিনো আর লিউ-এর সঙ্গে। তিনি কিনোকে দিয়ে বয়ে নিয়ে এসেছিলেন তাঁর রত্নপেটিকা। মন্দিরে বসে সেই পেটিকার মহামূল্য রত্নগুলি বের করে ওদের মাঝে বিলিয়ে দিয়ে বললেন, তোমরা আমার সেবা করেছ, তোমাদের এই অলঙ্কারগুলি দিয়ে আমি তৃপ্তি পেতে চাই।

তূর্বাণ বলল, মহারানী, আপনার মহামূল্য অলঙ্কার কেন এমন করে বিলিয়ে দিচ্ছেন?

মৃদু হাসি খেলে গেল রানী সেনুইএর মুখে। তিনি শুধু বললেন, জীবনে এর চেয়ে অনেক অমূল্য জিনিস আমাকে হারাতে হয়েছে তূর্বাণ, এগুলো পাছে হারায় তাই তোমাদের কাছে গচ্ছিত রেখে দিলাম।

পরদিন ফারায়ো চোখ বুজলেন! রাজ-চিকিৎসকেরা তাঁর মস্তিষ্কে অতি নিপুণ অস্ত্রোপচার করে বের করে নিলেন ভেতরের বস্তু। তারপর বিশ্বের দুর্জ্ঞেয় জারক রসায়নে জর্জরিত করে তুললেন সমস্ত দেহ। পরে বস্ত্রখণ্ডে মৃতদেহটি আবৃত করে পূর্বে প্রস্তুত সুচিত্রিত শবাধারে তাঁকে শোয়ানো হল। এ এক সমারোহপূর্ণ রাজকীয় অনুষ্ঠান। কারণ এরপর দেহধারী শবাধার থেকে উঠে বিশ্বদেবতার কাছে যাবেন বিচারের জন্য। সেখান থেকে ফিরে এসে বিচরণ করবেন তাঁর জন্য বিশেষভাবে নির্মিত, পার্থিব প্রাচুর্যপূর্ণ কবরগৃহের মধ্যে।

দ্বিতীয় অনুষ্ঠান শুরু হল মহা সমারোহে। কবরগৃহে বাহকেরা নিয়ে চলল শবাধার। দুইপার্শ্বে অগণিত নরনারী শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে। কবরের সুড়ঙ্গমুখে একদিকে দাঁড়িয়ে সম্রাটপুত্র নব-নির্বাচিত ফারায়ো, অন্যদিকে প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ।

শবাধারের পেছনে ফারায়োর হারেমবাসিনীরা অনুগমণ করে চলেছেন। তাঁদের পেছনে প্রাসাদের অগণিত দাসদাসী। থিব্‌সের মানুষ যেন ভেঙে পড়েছে। হারেমবাসিনী রানীরা এবং ভৃত্যের দল শবাধারের সঙ্গে প্রবেশ করবে সুড়ঙ্গপথে কবরের গর্ভগৃহে। সেখানে দীপাধারে দীপ জ্বেলে, শবাধারটিকে রত্নখচিত শয্যার উপর শায়িত অবস্থায় রেখে তারা ফিরে আসবে বাইরের আলোয়।

সুড়ঙ্গের কাছাকাছি জনতার ভেতর দাঁড়িয়ে আছে তূর্বাণ আর লিউ। তারা দেখছে সমারোহপূর্ণ শোভাযাত্রা। ওরা শোকযাত্রীদের ভেতর কিনোকে দেখতে পেল।

শোকযাত্রা সুড়ঙ্গের কাছে আসতেই অভিবাদন জানালেন নতুন ফারায়ো আর সৈন্যাধ্যক্ষ। শবাধার

ভেতরে প্রবেশ করল। রানীরা একে একে আলো থেকে ঢুকলেন অন্ধকার সুড়ঙ্গপথে। হাতে এক একটি প্রজ্বলিত দীপ।

রানী সেনুই সুড়ঙ্গে প্রবেশের আগে একটুখানি থমকে দাঁড়ালেন।

তুর্বাণ দেখল রানীর দুটো চোখ ক্ষণকালের জন্য নিবদ্ধ হল হাফিজাদের মুখের ওপর। মুহূর্তে রানীর মুখে ফুটে উঠল মৃদু হাসির রেখা। পরমুহূর্তে চোখ নামিয়ে তিনি যেন অদৃশ্য হয়ে গেলেন সুড়ঙ্গের মধ্যে।

বাইরে জনতা উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করছে শোকযাত্রার মানুষগুলির আলোয় প্রত্যাবর্তনের ।

ওরা ফিরে এল একসময়। কিন্তু কেমন যেন একটা গভীর শোক আর আতঙ্কের চিহ্ন ওদের মুখে। সবশেষে আসছিল দাসদাসীরা। কিনো আর কয়েকজন বহন করে আনছিল সংজ্ঞাহীন একটি দেহ। কিনো কাঁদছিল। অবাক হয়ে তুর্বাণ আর লিউ লক্ষ করছিল সে দৃশ্য।

শোক-পোশাক পরা রানী সেনুই অচৈতন্য হয়ে পড়েছেন। চঞ্চল হয়ে উঠলেন সৈন্যাধ্যক্ষ হাফিজাদ। কিন্তু তাঁর পক্ষে অনুষ্ঠান শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্থান ত্যাগ করা নিয়ম-বিরুদ্ধ। তাঁর সামনেই বিশালাকার পাথর গেঁথে বন্ধ করে দেওয়া হল সুড়ঙ্গ পথ।

ইতিমধ্যে মর্মান্তিক খবর উড়ে এসেছে তপ্ত হাওয়ায়। ফারায়োর প্রিয়তমা রানী সেনুই শোক সহ্য করতে না পেরে বিষপানে আত্মঘাতী হয়েছেন।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তুর্বাণ আর লিউ। মৃত্যু-সংবাদটি যে রটনামাত্র নয়, তা তাদের মন নিশ্চিতভাবে মেনে নিল। তারা বুঝল, গত রাতে রানীর সঞ্চিত অলঙ্কার বিলিয়ে দেবার ভেতরেই ছিল এ মৃত্যুর ইঙ্গিতটুকু লুকিয়ে।

পরদিন রানীদের জন্য নির্দিষ্ট উপত্যকায় কবর দেওয়া হল রানী সেনুইকে । সেখানেও উপস্থিত রইলেন হাফিজাদ। রানীকে কবরে শোয়ানোর সময় তিনি মাথা নত করে রইলেন সারাক্ষণ। তুর্বাণ দেখল, সৈন্যাধ্যক্ষ হাফিজাদের চোখে জল। যে ভালবাসার কোন প্রতিদান তিনি দিতে পারলেন না, সেই অপূর্ণ ভালবাসার জন্য হাফিজাদের সমস্ত হৃদয় হাহাকার করে উঠল। তিনি থিব্‌সের দেবতা ' আমোন-রা'র কাছে নতজানু হয়ে কি প্রার্থনা জানালেন তা অবশ্য জানা গেল না।

রাজ্যব্যাপী মহাশোক স্তিমিত হলে একদিন হাফিজাদ নিজ শিবিরে ডাক দিলেন, তুর্বাণ, লিউ আর কিনোকে।

তিনি ওদের সঙ্গে ভৃত্যের মত আচরণ না করে সমাদরের সঙ্গে বসালেন।

একসময় বললেন, সেনুই তোমাদের গভীরভাবে ভালবাসতেন। তিনি তোমাদের মুক্তি দেবার কথা আমাকে বারবার করে বলে গিয়েছিলেন। এই নাও তোমাদের মুক্তিপত্র।

হাফিজাদ ওদের প্রত্যেকের হাতে আলাদা আলাদা একখণ্ড তাম্রপত্র দিলেন।

বললেন, যেখানে যেখানে মহামান্য ফারায়োর সাম্রাজ্য আছে, আর যেখানে যেখানে তাঁর মিত্ররাজ্য আছে, সেখানকার সর্বত্র ঐ তাম্রপত্র দেখালে তোমরা পাবে বিপুল সমাদর।

ওরা অভিবাদন জানাল সৈন্যাধ্যক্ষ হাফিজাদকে।

তিনি তুর্বাণকে বললেন, কোন অঞ্চলে তুমি যেতে চাও?

তুর্বাণ বলল, মহেঞ্জোদড়োর অধিবাসী আমি।

হাফিজাদ বললেন, অতি দূর তোমার যাত্রাপথ। যদি স্থলপথে যাও তাহলে রানী সেনুই-এর নির্দেশমত আমি গর্দভের পৃষ্ঠে বোঝাই করে দেব মূল্যবান পণ্য ও বৎসরকালের উপযোগী খাদ্যসম্ভার।

তুর্বাণ মাথা নত করে বলল, অশেষ করুণা আপনার।

হাফিজাদ লিউএর দিকে ফিরে বললেন, তোমার দেশ?

লিউ বলল, ক্রীট।

হাফিজাদ সামান্য সময় কি যেন চিন্তা করে নিলেন। তারপব বললেন, ক্রীটে আমাদের দিনের বাণিজ্য-জাহাজ দু-চারদিনের ভেতরেই রওনা দেবে। আমি সেই জাহাজে তোমার দেশে ফেরার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

এখন তোমার খুশি মত পণ্য নিয়ে তুমি যেতে পারবে দেশে।

হাফিজাদ এবার বললেন, কিনো তুমি দীর্ঘদিন সেনুইএর সেবা করেছ, এখন বল তুমি কি চাও? কোথায় যেতে পারলে তুমি সুখী হবে?

কিনো লিউএর দিকে তাকাতেই লিউ বলল, ওর আপত্তি না থাকলে ওকে আমি আমাদের দেশে নিয়ে যেতে চাই।

হাফিজাদ কিনোর দিকে তাকাতেই কিনো মুখ নীচু করল। হাফিজাদ বললেন, তোমাদের মিলন আনন্দের হোক।

যাত্রাকালে তিনি কিনোকে প্রচুর যৌতুক দিলেন। হয়তো সেনুইএর কথা সে-সময় তাঁর মনে পড়ে গিয়ে থাকবে।

ওরা সিনাই উপত্যকার কাছাকাছি এসে পৃথক হয়ে গেল। লিউ আর কিনোকে জাহাজে ওঠার জন্যে যেতে হবে আরও উত্তরে।

তুর্বাণ পূর্ব দিকে পা বাড়াবার আগে গভীর আলিঙ্গন করল লিউকে। তারপর রানী সেনুইএর দেওয়া তার অংশের মহামূল্য অলঙ্কারগুলি কিনোর হাতে তুলে দিয়ে বলল, তোমার হাতেই এগুলো মানাবে কিনো। এ তোমার দাদার উপহার বলে গ্রহণ করলে আমি অনেক তৃপ্তি পাব।

কিনো নতজানু হয়ে তুর্বাণের অঙ্গবস্ত্র চুম্বন করে বলল, তোমার দান ফিরিয়ে দিই এমন ক্ষমতা আমার নেই, তবে সারা জীবন দাদার কাছে বাঁধা রইল আমার মন। প্রতিদানে তোমাকে আজ এইটুকুই আমি দিলাম।

ওরা শেষ সূর্যের দিকে তাকিয়ে যে যার গন্তব্যপথের দিকে পা বাড়াল। নীল নদের ওপর থেকে বয়ে আসা একটা হাওয়া ওদের দেহকে বোধহয় শেষবারের মত শীতল স্পর্শ দিয়ে গেল।

।। নয়।।

পাতলা কুয়াশার একখানা চাদর যেন কেউ পেতে দিয়েছে চরাচরে। রহস্যময় চাঁদের আলোয় দূরের অস্পষ্ট পাহাড়গুলো মিশরে দেখা পিরামিডের মত মনে হচ্ছে। দোয়াবের দিকে গান গাইতে গাইতে ছুটে চলা পুরাট্রু নদীটাকে বন আড়াল করে রেখেছে। কেবল তার মিষ্টি ধারাধ্বনিটা শোনা যাচ্ছে।

ধিক ধিক করে আগুন জ্বলছে বনের ভেতর। গাছের ঋজু ঋজু কাণ্ড, শাখা প্রশাখার ছায়া কাঁপছে। বাতাস প্রবল নয়। দূর পাহাড়ের মাথায় বরফ পড়ছে। গর্দভগুলো বিশ্রামের মধ্যে শীতের তাড়ায় এক একবার ডেকে উঠছে। নদীর ওপারের টিলায় উঠছে অদ্ভুত প্রতিধ্বনি।

তুর্বাণ পালকে ছাওয়া একটি চর্মাবরণী গায়ে জড়িয়ে বসে আছে আগুনের ধারে। ঘুম আসছে না তার। দু'একবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। ঘুমে ঢলে পড়লেই একসময় নিভে আসছে আগুন, তখন শীতের কামড়ে ঘুম যাচ্ছে ভেঙে। দীর্ঘপথ সে পেরিয়ে এসেছে। কয়েক মাস পথ চলে সে মিশর থেকে এখন এসে ঢুকেছে মিত্তানিদের এলাকায়। রাজধানী এখনও কদিনের পথ। সে শুনেছে মিত্তানিরা মিত্র বা সূর্যের [illegible]। এদের সঙ্গে মিশরের ফারায়োদের এখন খুব সখ্যতা চলেছে। তুর্বাণের মনে পড়ল, মিত্তানি রাজ[illegible] সীমানার আরও কিছু পশ্চিমে সে ধরা পড়েছিল ফারায়োর দিগ্বিজয়ী সেনাবাহিনীর হাতে। বন্দি হয়ে [illegible] মানুষের সঙ্গে তাকে যেতে হয়েছিল মিশর। সে সময় মিশর-বাহিনীর সঙ্গে খণ্ড খণ্ড যুদ্ধে মেতে উঠে[illegible] আটটি নগরীর দুর্ধর্য নেসীয়া সম্প্রদায়। আনতোলিয়ার দুর্গকে ভেদ করার শক্তি ছিল না ফারায়ো[illegible]। তাই নেসীয়ারা প্রবল জলপ্রপাতের মত নিম্নভূমিতে নেমে এলে ফারায়ো বাহিনীর সঙ্গে তাদের স[illegible]ম হত। সেই সংগ্রামের মুখে পড়ে একদিন স্রোতের টানে ভেসে যেতে হয়েছিল তাকে।

[illegible]নের ধারে বসে বসে পুরোনো দিনের কথা ভেবে চলেছিল তুর্বাণ। হঠাৎ মনে হল তার পেছনে [illegible]জন এসে দাঁড়িয়েছে। কাঠ পোড়ার চড়্চড়্ শব্দে সে প্রথমে আগন্তুকদের সাড়া পায়নি। এখন এ[illegible]রে পেছনে এসে দাঁড়াতেই সে বুঝতে পারল কয়েকটি মানুষের উপস্থিতি।

তুর্বাণ ভয় পেল, কিন্তু বিচলিত হয়ে সহসা পেছনে ফিরে তাকাল না। ওরা সামনে আসুক। তারপর মুখোমুখি হলে পরিস্থিতির মোকাবিলা করা যাবে।

কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। একসময় ঘোড়ার একখানা মুখ এগিয়ে এল। সামনে এসে ঘোড়ার মুখখানা ফিরিয়ে নিয়ে মুখোমুখি দাঁড়াল ঘোড়সওয়ার।

কে তুমি?— প্রশ্ন করল অশ্বারোহী।

অসুর দেশের মানুষের ভাষা।

তুর্বাণ কোনও কিছু গোপন করার চেষ্টা করল না। বলল, আমি বণিক। ব্যবসায়ের পণ্য নিয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াই।

লোকটি ঘোড়া থেকে নামল। সঙ্গে সঙ্গে অন্যেরাও। এবার সকলে আগুনের চারদিকে ভীড় করে এল।

তুর্বাণ বেশ কিছু কাঠ আগুনে ফেলে দিতেই আগুনটা ছড়িয়ে তেজে জ্বলে উঠল।

এবার তুর্বাণ ওদের দিকে চেয়ে আপ্যায়নের ভঙ্গীতে বলল, আপনারা আগুনের কাছে এগিয়ে বসুন।

আগন্তুকেরা বিনা দ্বিধায় বসে পড়ল।

আগন্তুকদের একজন প্রশ্ন করল, তুমি কোন দেশীয়?

অন্যজন সঙ্গে সঙ্গে বলল, তোমাকে তো মিত্তানি দেশের মানুষ বলে মনে হচ্ছে না।

তুর্বাণ বলল, আমার দেশ এখান থেকে বহু দূরে। পূর্বদিকে অনেক পাহাড় ডিঙিয়ে মরুভূমির পাশ কাটিয়ে , নদী পেরিয়ে তবে আমার দেশে পৌঁছানো যায়। মহেঞ্জোদাড়োর নাম শুনেছেন কি কখনো? সিন্ধু নদীর তীরে। ওখানেই আমার দেশ।

আগন্তুকেরা পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করল।

একজন বলল, বরেরুতে যখন ছিলাম তখন মহেঞ্জোদাড়োর বণিকরা রাজবাড়িতে নানা ধরনের জিনিস নিয়ে আসত।

আর একজন অমনি বলে উঠল, তোমার জিনিসপত্র সব কই? দেখাও না তোমাদের দেশের জিনিস। ভয় নেই, দাম না দিয়ে ছিনিয়ে নেব, ভেবো না।

তুর্বাণ বলল, বনের ভেতর রয়েছে আমার মালবাহী গাধাগুলো। কিন্তু ওদের কাছে অনেক রকমের জিনিস থাকলেও মহেঞ্জোদাড়োর কোন জিনিসই নেই।

সে কি রকম!

তুর্বাণ বলল, আমি আসছি নীল নদীর দেশ থেকে। বহুদিন ওখানে আটকা পড়েছিলাম। ছাড়া পেয়ে মালপত্র নিয়ে দেশে ফিরছি!

ওরা সঙ্গে সঙ্গে হৈ হৈ করে উঠল। তুর্বাণ ওদের এই উচ্ছ্বাসের কারণটা বুঝতে পারল না। সে উঠে দাঁড়িয়ে খানিকদূরে তার মালপত্রের স্তূপের দিকে এগিয়ে গেল। থলি হাতড়ে কিছুক্ষণের ভেতরেই নিয়ে এল একতাল খেজুর। ওদের হাতে হাতে খানিকটা করে খেজুর দিয়ে বলল, তোমরা আজ রাতে আমার অতিথি। সামান্য এই নীলনদের দেশের খেজুরটুকু খেয়ে দেখ। হয়ত ভাল লাগবে তোমাদের।

আগুন্তুকেরা খেজুর খেতে খেতেই একটি একটি করে প্রশ্ন করতে লাগল।

একজন বলল, তুমি মিশর থেকে আসছ জেনে খুশী হলাম। ওখানকার খবর কিছু শোনাও।

অন্যজন বলল, তুমি ওখানে ছিলে কোথায়?

তুর্বাণ বলল, আমি ওখানে ফারায়োর প্রাসাদেই সামান্য কিছু কাজ করতাম।

ওদের ভেতর যে লোকটিকে দলের সর্দার বলে মনে হচ্ছিল, সে এবার প্রশ্ন করতে লাগল তুর্বাণকে।

ফারায়োর প্রাসাদের রক্ষীসংখ্যা কত?

তুর্বাণ একটুখানি ভেবে বলল, পাঁচ শতের ভেতর। প্রাসাদের চারদিক বেষ্টন করে থাকে চারশত অশ্বারোহী। বাকী বর্মপরিহিত ভল্লধারী প্রায় এক শত দেহরক্ষী প্রাসাদের অভ্যন্তরে নির্দিষ্ট জায়গায় প্রহরায় দাঁড়িয়ে থাকে।

ফারায়োর মোট সৈন্যসংখ্যা কত?

তুর্বাণ বলল, আমি কোনওদিন গণনা করে দেখিনি। তাছাড়া বিভিন্ন ঘাঁটিতে সৈন্যরা ছড়িয়ে থাকে। কেবল ফারায়োর সমাধি দেবার সময়ে সাম্রাজ্যের সমস্ত সৈন্যকে এক সঙ্গে জমায়েত হতে দেখেছি। থিব্সের রাজধানী থেকে কর্ণাক মন্দির পর্যন্ত বিস্তৃত জায়গা জুড়ে শুধু সূর্যালোকে ভল্লের ধাতব শীর্ষগুলোকে জ্বলতে দেখা গিয়েছিল।

মহাদেবী ইস্তারের নাম শুনেছ তুমি?

তুর্বাণ একটুখানি ভেবে বলল, হ্যাঁ, একবার দেবী ইস্তারের পুজো হয়েছিল ফারায়োর প্রাসাদের ভেতরেই। ফারায়োর রোগমুক্তির জন্যে নাকি দেবী ইস্তারের পুজো হয়েছিল।

আবার প্রশ্ন , তুমি জান, মহাদেবী ইস্তারের পরিচয়?

তুর্বাণ বলল, শুধু শুনেছি , তিনি নাকি খুবই জাগ্রত দেবী।

ঠিকই শুনেছ। আমাদের অসুর ভূমির দেবী তিনি। আমাদের জাতীয় দেবতা আসুর। আর ইস্তার হচ্ছেন রণচণ্ডী মহাদেবী। তিনি যুদ্ধের কালে ঝড়ের মত নেমে আসেন আকাশ থেকে। অসুরদের শত্রুর ওপর ছুঁড়ে মারেন বজ্র। মুহুর্মুহু আকাশ কাঁপিয়ে ওঠে তাঁর হুঙ্কার।

মহাদেবী ইস্তার কি অসুরভূমির দেবী? আমি যেন শুনেছিলাম, মিত্তানিদের রাজা দেবী ইস্তারকে মহামান্য ফারায়োর রোগ শান্তির জন্য পাঠিয়েছিলেন এবং সেজন্য ফারায়ো নাকি মিত্তানির রাজাকে একবার বহু স্বর্ণ উপহার দিয়েছিলেন।

আগন্তুকেরা পরস্পরের দিকে তাকাল। একসময় প্রধান সৈনিকটি বলল, মিত্তানিদের রাজা আমাদের দেশ থেকে দেবীকে একসময় হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল। আমরা তাই আমাদের দেবীকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি।

অন্যজন বলল, তুমি কি শোননি, মহাদেবী ইস্তারকে মিশর থেকে মিত্তানি দেশে ফেরৎ পাঠান হচ্ছে?

তুর্বাণ বলল, আমি সেখানে অতি সাধারণ কাজে নিযুক্ত ছিলাম। যা দেখেছি, যা কানে এসেছে তাই বললাম। দেবী ইস্তারকে ফেরৎ পাঠানোর কথা আমি কিছুই শুনে আসিনি।

দু'তিনজন একসঙ্গে বলে উঠল, তিনি আসছেন।

সৈনিক-প্রধান বলল, অশ্ববাহিত রথে চেপে তিনি ফিরে আসছেন। আমরা খবর সংগ্রহ করে এনেছি। আর তাই দুর্গম নদীতীরের অরণ্যে অপেক্ষা করে আছি।

আপনারা কি দেবী দর্শনের জন্য এখানে এসেছেন?

আর বেশী প্রশ্ন কর না। নিজের চোখেই কাল সব দেখতে পাবে।

একটু থেমে বলল, হ্যাঁ আর এক কথা, তুমি কাল সারাদিন এ বনেই থাকবে। তোমাকে আমাদের প্রয়োজন হতে পারে।

তুর্বাণ আগুনের দিকে চেয়ে চুপচাপ বসে ভাবতে লাগল, এ কি বিপত্তিতে পড়তে হল তাকে।

তুর্বাণকে আনমনে বসে থাকতে দেখে ওদের একজন বলল, তুমি দেখছি অনেক দূরের বণিক হয়েও আমাদের ভাষা জান। ভারী বুদ্ধিমান যুবক তুমি।

তুর্বাণ কথাটা শুনে খুশী হল মনে মনে। বলল, বণিকদের অনেক ভাষাই শিখে রাখতে হয়। আমি ববেরুবাসীদের ভাষাও জানি। অসুরদের ভাষা যে জানি তা তো আপনারা বুঝতেই পারছেন। মিত্তানিদের ভাষা তেমন ভাল জানতাম না, এখন কিছুটা শিখে নিয়েছি। আইরণ গোষ্ঠীর লোক ওরা।

তুমি নীল নদীর দেশের ভাষাও তো শিখেছ?

তুর্বাণ বলল, তা জানি। আর ইলাম দেশের ভাষাও আমার অপরিচিত নয়।

সৈনিকদের প্রধান তুর্বাণের পিঠে একটা সোহাগের চাপড় মেরে বলল, তোমাকে আমাদের চাই। আমাদের মহামান্য সম্রাট এসার তোমাকে পেলে খুবই খুশী হবেন। তুমি একটি রত্ন।

তুর্বাণ গন্তব্যস্থলে যাবার পথে বিঘ্ন ঘটল দেখে শঙ্কিত হয়ে পড়ল।

রাত তখনও শেষ হয়নি, ঘোড়সওয়ারা উঠে দাঁড়াল। ঘোড়ার পিঠে চেপে বসে দলের সর্দার বলল, সারাদিন তুমি এই বনের ভেতর কাটিয়ে দাও। বাইরে বেরোবার চেষ্টা কর না। বিপদে পড়তে পার। আমরা সময় হলে তোমার কাছে ফিরে আসব। তৈরি থেকো, আমাদের সঙ্গে তোমাকে যেতে হবে।

তুর্বাণ উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নাড়ল। সে বুঝল, এদের সামনে অনুনয় বিনয়, বাক্যব্যয় বৃথা।

ওরা অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে বনের বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল। ওদের অশ্বখুরধ্বনি পাহাড়ি প্রান্তরের বহুদূর থেকে ভেসে আসতে লাগল। এক সময় ক্ষীণ হয়ে এল সে আওয়াজ।

সূর্য উঠল। দূর পাহাড়ের মাথায় তুষারের স্তূপ ঝলমল করে উঠল সূর্যের সোনালি আলোয়। এখানে নদীর ধারে বন অনেকখানি পাতলা। বড় বড় গাছপালার ফাঁকে পাহাড় আর নদীর ছবি চোখে পড়ে। ওপরের মালভূমির দিকে নিবিড় হয়ে গেছে বন। রাত শেষে সেই মালভূমির উঁচু দিকটাতেই ঘোড়া নিয়ে উঠে গেছে লোকগুলো।

তুর্বাণ সঙ্গের গর্দভগুলোকে নদীতে নিয়ে গিয়ে জল খাইয়ে আনল। বনের ভেতর এক রকমের ছোট ছোট গাছ হয়ে আছে। গর্দভেরা নির্বিচারে তার পাতা মুড়িয়ে খেতে লাগল। কোনও কাজ নেই তুর্বাণের হাতে। পথ-যাত্রায় হঠাৎ পড়েছে বাধা। সে বসে বসে ভাবতে লাগল তার বিচিত্র ভাগ্যের কথা। উর্বীর মুখখানা মনে পড়ল তার। সেই মরু ঝঞ্ঝার রাতে যখন সে প্রায় অচৈতন্য তখন পাহাড়ের গুহায় উর্বীই তো তাকে টেনে নিয়ে গিয়ে আশ্রয় দিয়েছিল। কত সংগোপনে নিজের গোষ্ঠীর মানুষের দৃষ্টি থেকে তাকে লুকিয়ে রেখেছিল। তারপর কত বর্ষা ঝরা সন্ধ্যা, কত চাঁদনী রাত কেটেছে তাদের একই গুহায় বসে। একই শয্যায় কেটেছে তাদের বিনিদ্র রাত।

তুর্বাণ ভাবতে লাগল, ভাগ্যিস দূরারোগ্য ক্ষত হয়েছিল উর্বীর পায়ে, তাই স্বজন-পরিত্যক্তা উর্বীকে সে পেয়েছিল পর্বত গুহায়। কিন্তু এখন কি করছে উর্বী? চিকিৎসক ঋভুর আগমনের খবর পাওয়া মাত্র উর্বী তাকে সরিয়ে দিয়েছে নির্জন গুহা-নিবাস থেকে। কিন্তু গর্ভে তুর্বাণের সন্তান ধারণ করে সে কি করে রক্ষা করেছে সকল পরিস্থিতি ! এখন উর্বীর সন্তান কত বড় হয়েছে? হায়, সে কি ফিরতে পারবে তার সিন্ধু তীরের জন্মভূমিতে!

বেলা বাড়ল। তুর্বাণ তার সঙ্গের পেটিকা থেকে শুকনো খাবার নিয়ে মধ্যাহ্ন ভোজ সমাধা করল। আর ঠিক সেই সময়ে একটি ঘটনা ঘটল।

ঘোড়া ছুটিয়ে বনের ভেতর এসে ঢুকল একটি ঘোড়সওয়ার। তুর্বাণ দেখল, দ্রুত ঘোড়া থেকে নেমে সে দিশেহারার মত ছুটে চলল বনের গভীরে। লোকটি তুর্বাণের একটুখানি দূর দিয়ে চলে গেল, কিন্তু ওকে লক্ষ করল না। সম্ভবত কোনওদিকে লক্ষ করার মত অবস্থা ছিল না তার। একটা শঙ্কা যেন তাকে তাড়া করছে, আর তার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য সে ছুটে চলেছে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে।

লোকটি বেশী দূর যেতে পারল না। অদূরে বনের ভেতর রাখা তুর্বাণের বাণিজ্য দ্রব্যগুলির সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল। একটা চাপা আর্ত শব্দ উঠল শুধু। তুর্বাণ ছুটে গেল আহত লোকটির দিকে।

রক্ত ঝরছিল তার চোখের কোণ বেয়ে। মনে হয় তীক্ষ্ণ কোনও শিলাখণ্ডের ওপর পড়ে চোখের কোণে আঘাত পেয়েছে। তুর্বাণ কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই লোকটি হাতের ওপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু পারল না। তুর্বাণ তার হাত ধরে বলল, ভয় নেই, আমি তোমার বন্ধু। তোমার চেহারা দেখে বুঝেছি তুমি আইরণ।

তুর্বাণ বলল, পরিচয় পরে হবে, এখন তুমি আমার হাত ধরে নদীর দিকে চল। তোমার চোখের কোণায় রক্ত ঝরছে। ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে ফেলতে হবে।

লোকটি একটা হাতে চোখ চেপে ধরেছিল। অন্য হাতখানা ছিল তুর্বাণের হাতের মুঠোয়।

ওরা নদীর কাছে এল। তুর্বাণ আজলা ভরে জল তুলে লোকটির ক্ষতস্থান ধুয়ে দিল। পোশাকের একটা অংশ ছিঁড়ে নিয়ে তা জলে ধুয়ে চাপিয়ে দিল ক্ষতস্থানে। বলল, তুমি এমনি করে ধরে রাখ, আমি আসছি। দেখি, যদি আমার মালপত্রের ভেতরে আঘাতের কোনও ওষুধ পাই।

লোকটি বলল, বনের একটু ভেতরেই আমার ঘোড়াটা রয়েছে। ওকে দেখতে পেলে শত্রুরা আমার সন্ধান পেয়ে যাবে।

তুর্বাণ বলল, এখানে নদীর একটা খাঁড়ি আমি দেখেছি। মালভূমিটা ছাদের মত নদীর দিকে অনেকখানি এগিয়ে আছে। শীতে কষ্ট হলেও ঘোড়া নিয়ে তোমাকে ওখানেই লুকিয়ে থাকতে হবে। তোমার শত্রুদের আমি চিনি। ওদের সঙ্গে অসুরদের রাজ্যে আমাকে যেতেই হবে। না হলে নিস্তার নেই। তুমি আড়ালে থেকে দেখার চেষ্টা করবে বনের ভেতর আগুন জ্বলছে কিনা। আমি যতক্ষণ থাকব ততক্ষণ আগুন জ্বালাব, আর আগুন যখন জ্বলবে না তখন বুঝবে, আমি ওদের সঙ্গে চলে গেছি। তুমিও তখন ঘোড়া নিয়ে নিজের জায়গায় চলে যেও। এখুনি তোমার সেবার দরকার, তবু এতগুলো কথা বললাম, তার কারণ আমাদের হাতে আর সময় নেই। যে কোনও মুহূর্তে ওরা এই বনে ফিরে আসতে পারে।

তুর্বাণ কথাগুলো বলেই দৌড়ে গেল তার বনের আস্তানায়। ওষুধ আর কিছু খাবার নিয়ে ঘোড়ার লাগাম ধরে ফিরে এল নদীর ধারে।

লোকটির চোখের কোণায় ওষুধ লাগিয়ে খাঁড়ির গোপন স্থানে পৌঁছে দিয়ে যখন ও ত্রস্ত পায়ে উদ্বিগ্ন মনে ফিরে এল তখন কিন্তু বনের ভেতর গর্দভগুলোই পাতাপত্র চিবুচ্ছিল। শান্ত বন। মাথার ওপর সূর্যের ঝকঝকে তীরগুলো বনস্থলীর পত্রবর্ম ভেদ করে এখানে ওখানে এসে পড়েছিল। তুর্বাণ বনের প্রান্তে এগিয়ে গিয়ে দূর মালভূমির দিকে চেয়ে রইল।

কিছুক্ষণ পরে একটা শব্দ ওর কানে এসে পৌঁছল। শব্দটা ক্ষীণ থেকে ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। তুর্বাণ অনুমান করল, অশ্ববাহিত কোনও শকট এগিয়ে আসছে। শকটটা তখনও অদৃশ্য ছিল, কারণ মালভূমির কোল ঘেঁষে যে পথ তা বনের এ প্রান্ত থেকে স্পষ্ট দেখা যায় না। একটু উঁচুতে উঠলে তবে পথ দেখা যায়। একেবারে বনের পাশে এলে তবে পথের যানবাহন চেনা যায়।

এখন তুর্বাণ বেশ কয়েকটি ঘোড়ার ক্ষুরের ধ্বনি আর রথের চাকার ঘর্ঘর আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে। মানুষের কোন আস্ফালন বা আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে না। চেয়ে থাকতে থাকতে চোখে এসে পড়ল রথের চূড়া। তুর্বাণের অভিজ্ঞ চোখ বুঝতে পারল, এ রথ নীল নদীর দেশের। রথটা এসে থামল তার সামনের পথটার ওপর। ততক্ষণে তুর্বাণ সরে গেছে বনের ভেতর তার নিজের জায়গায়।

ঘোড়া নিয়ে ঢুকে এল এক ঘোড়সওয়ার। তুর্বাণকে বলল, এসো আমার সঙ্গে বাইরে।

ওর সঙ্গে বনের বাইরে যাবার সময় অসুর যোদ্ধাটি আবার বলল, মিশরের দুটো লোককে বেঁধে আনা হয়েছে। ওদের সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বলতে হবে। তুমি তো মিশরের ভাষা জান, তাই না?

তুর্বাণ বলল, সে তো আগেই তোমাদের বলেছি। কিন্তু মিশরের এ মানুষগুলোকে পেলে কি করে?

ওরাই তো আসছিল আমাদের মহাদেবী ইস্‌তারকে নিয়ে। যাচ্ছিল মিত্তানিদের রাজধানীতে । দুটো মিত্তানি সঙ্গে ছিল। একটা মারা পড়েছে লড়াই করতে এসে। অন্যটা সেই ফাঁকে পালিয়েছে ঘোড়া নিয়ে। আমি তীর ছুঁড়েছিলাম, মনে হয় তীরের আঘাত নিয়েই ও পালিয়েছে।

তুর্বাণ বলল, আমি অনেক আগে একটা ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ পেয়েছিলাম। মনে হয় মিত্তানিদের রাজধানীর পথ ধরে ও পালিয়েছে। ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনে মনে হচ্ছিল, অতি দ্রুত ও পথ পার হয়ে যাচ্ছে।

ওরা এসে পৌঁছল রথের সামনে। সাদা বলবান দুটো ঘোড়া রথে জোড়া রয়েছে। অসুর যোদ্ধাদের প্রধান বলল, আমাদের সময় বেশী নেই। তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে যেতে হবে। একটা মিত্তানি ঘোড়া ছুটিয়ে পালিয়েছে। সে যদি কাছে পিঠে তার দলবলকে খবর দেয় তাহলে আমাদের অনেক ঝামেলায় পড়তে হবে। মহাদেবীকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছিলাম, কাজ হয়ে গেছে, এখন অতি সত্বর সরে যেতে হবে। তার আগে মিশর সম্বন্ধে দু'চার কথা জেনে নিতে চাই। আমি যা জানতে চাইছি তুমি ওদের বুঝিয়ে দাও আর ওদের উত্তরগুলো আমাকে আমাদের ভাষায় বুঝিয়ে বল।

একটু থামল অসুরদের প্রধান। দুটো মিশরীয়কে ততক্ষণে নামান হয়েছে রথ থেকে পথের ওপর।

হাতগুলো ওদের পিঠমোড়া করে বাঁধা।

দলপতি বলল, মিশরের সৈন্যসংখ্যা কত?

তুর্বাণ অমনি দলপতির প্রশ্নটা বুঝিয়ে বলল বন্দিদের। আর সঙ্গে সঙ্গে মিশরীয় ভাষায় বলল, আমি তোমাদের বন্ধু।

জনৈক বন্দি একটা সংখ্যা নির্দেশ করল। তুর্বাণ কিন্তু অসুরদের ভাষায় ব্যাখ্যা করার সময় বলল, আকাশে যত নক্ষত্র, মিশরের তত সৈন্য।

দলপতি আবার বলল, শুনেছি, ফারায়োদের কবর তৈরি করতে হাজার হাজার লোকের দরকার হয়। তাদের ওপর নাকি দারুণ অত্যাচার চালায় মিশরের সৈন্যরা। এতে শ্রমিক প্রজারা ক্ষেপে ওঠে না?

বন্দি কথাটা বুঝে নিয়ে উত্তর দিল, যারা যুদ্ধে দাস হয়ে আসে তাদেরই ওসব কাজে লাগান হয়. প্রজারাও অবশ্য কাজে নিযুক্ত থাকে। তবে এসব কাজ প্রাণের তাগিদে বড় একটা কেউ করে না। তাই সৈন্যেরা সাজা দেয়।

তুর্বাণ ব্যাখ্যা করার সময় বলল, মিশরের প্রায় সব মানুষই এ কাজে যোগ দেয়। তারা দলবদ্ধ হয়ে যে কোনও একটা কাজ করার সুযোগ পেলেই মনে মনে খুব খুশী। সৈন্যেরা ওদের ওপর কোন অত্যাচারই করে না, মাঝে মাঝে শুধু ওদের কষ্টসহিষ্ণু হবার মন্ত্র দেয়। তাই যুদ্ধে যাবার সময় মিশরীয় যুবকরা সৈন্যদের পাশে স্বেচ্ছায় এসে দাঁড়ায়।

অসুরদের দলপতি তার প্রশ্নের জবাবে একটুও খুশী হতে পারল না। সে চেয়েছিল, মিশরবাসীদের ভেতর অশান্তির আগুন জ্বললে অসুরদের রাজা এসারের পক্ষে মিশরে অভিযান চালানো সহজ হবে। কিন্তু দলপতি যখন দেখল, রাজা এসারকে খুশী করার মত কোন সংবাদ সংগ্রহ করতে পারা গেল না তখন দুটো বন্দীকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করার আদেশ হল।

তুর্বাণ ভেবেছিল, মিশরের সৈন্যসংখ্যা অগণিত নক্ষত্রের মত বললে অসুর দেশবাসীরা ভয় পেয়ে যাবে। তখন সহসা আক্রমণ করতে চাইবে না। তাছাড়া প্রজারা রাজার পাশে রয়েছে সব সময়, এ কথা প্রচার করলে অনেক বড় শক্তিও যে কোন একটি দেশকে আক্রমণ করতে সাহস পাবে না। কিন্তু এ যে হিতে বিপরীত হল। গোঁয়ার অসুর দলপতি মনের মত উত্তর না পেয়ে একেবারে হত্যারই আদেশ দিয়ে বসল।

তুর্বাণ বিনয়ের সঙ্গে দলপতিকে বলল, মহাশয়, একটা কথা ভেবে দেখতে আপনাকে অনুরোধ করি। এ দুটো মানুষকে বধ করতে আপনাব এক মুহূর্ত সময়ও লাগবে না, কিন্তু ভেবে দেখুন, ওদের হত্যার বিনিময়ে আপনি মিশরের মত প্রবল শক্তির শত্রুতাটুকু কুড়িয়ে নিলেন।

দলপতি বলল, ওরা যদি বেঁচে না থাকে তাহলে মিশরে গিয়ে কেই বা খবর দেবে যে মহাদেবী ইস্তারকে আমরা স্বদেশে ফিরিয়ে নিয়ে চলেছি, অথবা মিশরের দুটি রথরক্ষককে আমরা হত্যা করেছি?

তুর্বাণ সঙ্গে সঙ্গে বলল, মিত্তানিদের আহত ঘোড়সওয়ার এখন কিন্তু অনেক পথ অতিক্রম করে গেছে। তার কাছ থেকে মিত্তানিরাজ খবর পাবেন আর সে খবর যথাসময়ে মিশরে পৌঁছে যাবে। তখন মিত্তানি আর মিশর এক হয়ে লড়বে অসুরদের বিরুদ্ধে।

অসুর যোদ্ধাদের দলপতি তুর্বাণের কথাটা অকিঞ্চিৎকর ভেবে উড়িয়ে দিল না। একটু ভেবে বলল, তুমি যা বলছ তার ভেতর যুক্তি রয়েছে, কিন্তু এই যে মহাদেবী ইস্তারকে আমরা পথ থেকে জোব করে ছিনিয়ে নিয়ে গেছি, সে খবর তো মিশরে পৌঁছে যাবে, তখন মিশরের সঙ্গে অসুর-রাজ্যের সম্প্রীতিতে নিশ্চয়ই একটা ফাটল ধরবে।

তুর্বাণ বলল, ঠিক কথা, কিন্তু আপনারা যদি এদের ছেড়ে দেন আর মহারাজ এসারকে দিয়ে মিশরের ফারায়োর কাছে মহাদেবী ইস্তারের অধিকার সম্বন্ধে একখানা চিঠি লিখে দূত পাঠান তাহলে আপনাদের দু'দেশের সম্প্রীতি অটুট থাকতে পারে।

কথাটা যুক্তিযুক্ত বলে মনে হল দলপতির। সে লোক দুটির বাঁধন খুলে দিয়ে মক্তি দেবার আদেশ দিলে।

তুর্বাণ বলল, আপনি দেখছি অত্যন্ত বিবেচক। সাধারণ সৈনিকের মত উত্তেজনায় আপনি কাজ করেন না। এখন আমার একটি নিবেদন আছে।

তুর্বাণের কথা বলার ধরনে বেশ খানিকটা তুষ্ট হয়েছিল দলপতি। সঙ্গে সঙ্গে বলল, বল, তোমার আর কি পরামর্শ আছে?

তুর্বাণ বলল, যখন এদের ছেড়েই দেবেন, তখন এদের এমন সম্মান দেখান যাতে এরা মনে কোনও গ্লানি না নিয়ে ফিরে যায়। ভবিষ্যতে তাতে আপনাদের অনেক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে।

দলপতি উল্লসিত হয়ে বলল, সাবাস। বয়সে দেখছি তুমি আমাদের চেয়ে অনেক ছোট কিন্তু বুদ্ধি তোমাব তীক্ষ্ণ। মহারাজ এসার তোমার মত রত্ন পেলে খুশীই হবেন। এখন বল, ওদের কিভাবে সম্মান দেখান যায়?

তুর্বাণ বলল, আমার কাছে যে গর্দভগুলো আছে তাদের পিঠে অনেক খাবার আছে। ঐ খাবারের দুটো বস্তা আর দুটো ভাল ঘোড়া ওদের দিয়ে দিন। তারপর আপনাদের হয়ে অনেক মিষ্টি কথা আমি ওদের শুনিয়ে দেব। আর এও বলব, আপনাদের রাজার দূত অচিরে মিশরের মহামান্য ফারায়োর কাছে যাচ্ছে মহাদেবী ইস্‌তারের সব খবর নিয়ে।

তুর্বাণের কথা মতই কাজ হল। মিশরের রক্ষী দুটি মুক্তি পেয়ে অনেক সাধুবাদ জানাল তুর্বাণকে। তুর্বাণ কিন্তু ভাষান্তরের সময় সব সাধুবাদ অসুর দলপতির ওপর বর্ষিত হচ্ছে বলে জানিয়ে দিলে।

লোকদুটি খাদ্য আর অশ্ব নিয়ে চলে গেলে ওরা তুর্বাণকে বলল, গর্দভ নিয়ে আমাদের সঙ্গে যাওয়া তোমার চলবে না। এখন তোমার মূল্যবান মালপত্র যা আছে তা এই রথের ওপর তোল। বাকী সব ফেলে দাও। গর্দভগুলোকে ছেড়ে দাও জঙ্গলে।

তাই হল। রাতটা ওরা অনেক বিবেচনার পর জঙ্গলের ভেতর কাটানোই স্থির করল। ভোর হতে না হতেই শেষ রাতের চন্দ্রালোকে মিত্তানিদের রাজ্যের সীমানা ছেড়ে ওদের পালাতে হবে।

আগুন জ্বাললো তুর্বাণ। ওরা গোল হয়ে বসল আগুনের চারধারে। অনেক শুকনো খাবারের সঞ্চয় ছিল ওর কাছে। সেগুলো নিয়ে এসে ওদের ভেতর বিতরণ করে দিয়ে বলল, এসব জমিয়ে রেখে আর লাভ কি। প্রয়োজনমত সঙ্গে নিয়ে বাকী সব ফেলে যেতে হবে। এখন তোমরা এর থেকে ইচ্ছেমত খেতে পার।

ওরা শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। খাবারগুলো খেতে খেতে আগুনে গা সেঁকতে লাগল।

তুর্বাণ বলল, বস তোমরা আগুনের ধারে আরাম করে, ততক্ষণে আমি গর্দভগুলোকে নদী থেকে একটু জল খাইয়ে আনি। কাল তো ওদের মুক্তি দিয়ে ছেড়ে চলে যেতে হবে।

ওরা সকলেই তুর্বাণের কথা সমর্থন করল। তুর্বাণ বেরিয়ে গেল গর্দভগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে বনের বাইরে। সঙ্গে নিয়ে গেল চর্ম নির্মিত শীতরোধক অঙ্গাবরণটি।

গর্দভেরা নদীতে নেমে জল খেতে লাগল আর তাদের আড়ালে খাঁড়িতে নেমে গেল তুর্বাণ।

আহত মিত্তানিটির কাছে গিয়ে শীতরোধক আবরণটি তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, উপায় নেই বন্ধু এখানে আগুন জ্বালাবার। রাতে নদীর জলের ঠাণ্ডা আর বরফের পাহাড়ের ঠাণ্ডার কামড়ে পড়লে প্রাণ বাঁচানো তোমার পক্ষে শক্ত হয়ে উঠবে। এটা আমাকে সারা পথ শীতের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। চামড়ার ভেতর রয়েছে সারি সারি নরম আর গরম পালকের আস্তরণ। তুমি আরাম পাবে এটা গায়ে জড়িয়ে।

মিত্তানি আইরণ তুর্বাণের হাতখানা ধরে ফেলে বলল, তুমি শুধু আমার বন্ধু নও, তুমি আমার ভাই। আমি ভাবতেও পারিনি, এমন করে মৃত্যুর হাত থেকে তুমি আমাকে রক্ষা করবে। সংসারে আমার মা ছাড়া কেউ নেই। রাজা দুশরত্তের লোকেরা যখন আমাকে মিশরে যাবার জন্যে নির্বাচন করলে তখন মায়ের সে কি কান্না। বুড়ো মা আর আমাকে হয়ত দেখতে পাবেন না। তাই ভেবে তাঁর চোখ বেয়ে অঝোরে জল ঝরছিল। আমি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলাম, আমি আইরণ। দুর্গম পাহাড় পর্বত, নদী নালা পার হয়ে যেতে আমার কোন ভয় নেই। তোমার আশীর্বাদ রইল আমার ওপর, দেবাদিদেব মিত্র রইলেন আমার মাথার ওপর। নিশ্চিত জেনো আমি তোমার কাছে ফিরে আসব।

তুর্বাণ বলল, কাল ভোরের আগেই আমাদের চলে যেতে হবে অসুর দেশের রাজধানীর দিকে। তুমি সূর্যোদয়ের পরে তোমার গন্তব্য স্থানে যাত্রা কর। তোমার মা তোমাকে দেখে খুশী হলে আমিও তাঁর আশীর্বাদ পাব।

মিত্তানি আইরণ তুর্বাণের হাতখানা জড়িয়ে ধরে বলল, মায়ের আশীর্বাদ তুমি নিশ্চয়ই পাবে ভাই। হয়ত আর কোনওদিন তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে না, তবু তুমি চিরদিন আমার হৃদয়ের মাঝখানে থাকবে।

তুর্বাণ বলল, অনেক সময় আমি নদীতীরে এসেছি, ওরা আমার খোঁজে এখানে এসে পড়তে পারে। আমি চললাম।

হাত ছেড়ে দিয়ে মিত্তানি আইরণ বলল, যাবার সময় তোমার নামটা বলে যাবে না ভাই? দেশই বা তোমার কোথায়?

তুর্বাণ বলল, বহু দূরদেশের বণিক আমি। ভাগ্যচক্রে এসে পড়েছি এখানে। সিন্ধু নদীর তীরে মহেঞ্জোদড়োর নগর প্রধান গুর্বাকের একমাত্র ছেলে আমি। নাম তুর্বাণ।

মিত্তানি বলল, আমার পরিচয় আগেই তুমি পেয়েছ। নাম আমার সুতর্ণ।

ওরা পরস্পরের বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ফিরে আসার সময় তুর্বাণের চোখের ওপর ভাসতে লাগল আর্যকন্যা উর্বীর মুখ। সুতর্ণ আর উর্বী দুজনেই আর্য। শুধু গোষ্ঠীতেই পৃথক। উর্বীর কথা ভেবে সুতর্ণের ওপর গভীর একটা আকর্ষণ অনুভব করল তুর্বাণ।

।। দশ ।।

মহোৎসব শুরু হয়েছে অসুরদের রাজধানী 'কালা' তে । মহাদেবী ইস্‌তার ফিরে এসেছেন রাজ্যে। শক্তির দেবীকে শক্তিমান অসুর যোদ্ধারা ছিনিয়ে এনেছে। সারা দেশ জুড়ে তাই বয়ে চলেছে আনন্দের প্লাবন। মহাদেবী ইস্‌তারের মূর্তি গড়িয়ে পূজা হচ্ছে অসুর ভূমির সকল প্রান্তে। যুবক যুবতীরা বসে রণদেবী ইস্‌তারের কাছে প্রার্থনা করছে অমিত শক্তির।

মূল উৎসব চলেছে রাজধানীতে, কারণ সেখানেই রয়েছে মহাদেবী ইস্‌তারের আসল প্রস্তর মূর্তি।

রাজধানী কালা সেজেছে রক্তবর্ণ সজ্জায়। নগরীর প্রস্তর নির্মিত প্রতিটি হর্মশীর্ষে উড়ছে রক্ত পতাকা। স্তম্ভগুলি রক্তাম্বরে সজ্জিত হয়েছে।

রাজপ্রাসাদের শিলাদেহে উৎকীর্ণ হয়ে আছে বিশাল বিশাল চিত্র। রাজা অশ্বারোহণে তীব্র গতিতে ছুটে চলেছেন হিংস্র পশুর পশ্চাদধাবন করে। হাতে সুতীক্ষ্ণ ভল্ল। কোথাও বা বিশাল পক্ষবিশিষ্ট তীক্ষ্ণচঞ্চু বিহঙ্গ কে তীরবিদ্ধ করছেন নৃপতি। রাজাকে মধ্যে রেখে সুসজ্জিত অশ্বারোহীরা বর্শাবিদ্ধ করবার জন্য ছুটে চলেছে পলায়মান সিংহের পশ্চাতে। কোথাও বা রাজা আসছেন রথে, পথিপার্শ্বে সাধারণ প্রজারা নতমস্তকে দাঁড়িয়ে রাজাকে অভিবাদন জানাচ্ছে। প্রতিটি পুরুষ শ্মশ্রুগুম্ফধারী। পরিধেয় বসনের ওপর চর্মনির্মিত একটি লম্বমান উত্তরীয়। জানু পর্যন্ত আবৃত চর্মনির্মিত পাদুকা।

প্রাচীরবেষ্টিত প্রাসাদ। পটেশী বা পুরোহিতকূল প্রাসাদ সংলগ্ন বিস্তৃত অঙ্গনে সারিবদ্ধ হয়ে বসেছেন। সামনে রণদেবী ইস্‌তারের সুসজ্জিত মূর্তি। পটেশীরা দেবীর শক্তি-মাহাত্ম্য সমস্বরে উচ্চারণ করছেন।

রাজা এসার পরেছেন রক্তাম্বর। হাতে ধরে আছেন একখানি শাণিত কুঠার। সূর্যালোকে ঝক ঝক করছে কুঠারের তীক্ষ্ণ ফলা। সিংহাসন প্রস্তর নির্মিত। আসনেব দুই বাহুর প্রান্তদেশে দুটি সিংহমুখ খোদিত রয়েছে। সিংহের কেশরে সজ্জিত মুখখানা একেবারে জীবন্ত।

রাজার পাশে নিম্নাসনে বসে রয়েছে পারিষদরা। তাদের প্রত্যেকের পরণে বিচিত্র বর্ণাঢ্য পোশাক। অর্ধবৃত্তাকার প্রাচীরে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিভিন্ন আয়ুধ হাতে অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী। তাদের প্রত্যেকের পরিধেয় বস্ত্র রক্তবর্ণে রঞ্জিত।

সপ্রশংস চোখে সমস্ত অনুষ্ঠান ও পরিবেশ লক্ষ করছিল তুর্বাণ। বেশ কয়েকদিন আগে সে এসে পৌঁছেছে। সঙ্গী দলপতির সহযোগিতায় সে প্রথমে রাজার অন্যতম সভাসদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে।

তারপর ঐ সভাসদের চেষ্টায় রাজ-দর্শন তার ঘটেছে। রাজা এসার তার ভাষাজ্ঞানের পরিচয় পেয়ে খুবই খুশী হয়ে তাকে নিভৃত বিশ্রামকক্ষে ডেকে নিয়ে গেছেন। সেখানে নানা দেশ সম্বন্ধে তার অভিজ্ঞতার কথা শুনেছেন। মহেঞ্জোদড়োর কথা বলতে গিয়ে আবেগে রুদ্ধ হয়ে এসেছিল তুর্বাণের গলা। রাজা এসার মহেঞ্জোদড়োর পৌর ব্যবস্থার কথা শুনে বিশেষ কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলনে। তিনি সব শুনে মন্তব্য করে বলেছিলনে, যে নগরী ব্যবসা-বাণিজ্য আর পৌর পরিকল্পনায় এতখানি উন্নত তার কোন সুসজ্জিত সৈন্য-বাহিনী নেই, এ বড় বিস্ময়।

তুর্বাণের যাতে কোন প্রকার অসুবিধে না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখার জন্য তিনি প্রাসাদের কর্ম পরিদর্শককে আদেশ দিয়েছেন। তুর্বাণ এখন রাজঅতিথির মর্যাদা পাচ্ছে।

তুর্বাণ বসে আছে বিশিষ্ট নাগরিকদের সারিতে। কৌতূহলী নাগরিকেরা মাঝে মাঝে তাকে লক্ষ করছে। সে পরেছে তার স্বদেশীয় পোশাক। মিহি বস্ত্রের উপর একখানি ত্রিপত্রের পাড়যুক্ত পশমী উত্তরীয় জড়িয়েছে। বাঁ কাঁধের ওপর দিয়ে বুক আবৃত করে ডান কাঁধের নিম্নভাগ দিয়ে পশমী উত্তরীয়খানা জড়ান রয়েছে গায়ে। তুর্বাণের দীর্ঘ কেশগুচ্ছ পেছনে খোঁপার আকারে বিন্যস্ত। সামনের কেশ একটি রৌপ্যনির্মিত পাত দ্বারা আবদ্ধ। গলায় লম্বিত একটি সোনার হার। মিশরে অবস্থানকালে এই পরিচ্ছদ আর অলঙ্কার সে তৈরি করিয়ে নিয়েছিল।

পূজা শেষ হল মধ্যাহ্নে। মহারাজ এসার উঠে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন, জাগ্রত দেবী ইস্‌তারকে উদ্ধার করতে পেরে আজ আমি অমিত বিক্রমের অধিকারী হয়েছি। ঝড়ের মত আমাদের সৈন্যরা এখন ঝাঁপিয়ে পড়বে শত্রু দেশগুলোর ওপর। আমরা মহাদেবী ইস্‌তারের কৃপায় যুদ্ধজয়ী হবই।

মহারাজ এসারের ঘোষণা শেষ হওয়া মাত্র চতুর্দিকে কাঁপিয়ে সিংহনাদ উঠল। প্রাসাদের বাইরে অসংখ্য জনতার ভেতর সেই সিংহ গর্জনের প্রতিধ্বনি উঠতে লাগল।

।। এগারো ।।

উৎসবের শেষে কয়েকদিন নগরী শান্তভাব ধারণ করেছে। বাজার অঞ্চলে চলেছে কেনাবেচা। সাধারণ নাগরিকেরা নিরুদ্বিগ্ন মনে সংসারযাত্রার উপাদান সংগ্রহ করে চলেছে। ডিকলাট নদীর প্লাবিত জলে অসুরভূমির নিম্নাঞ্চলে চলেছে চাষের কাজ। তুর্বাণ ঘুরে ঘুরে দেখছে নতুন দেশের জীবনযাত্রা। কৃষকপল্লীর পাশ দিয়ে যেতে যেতে তুর্বাণ সেদিন শুনতে পেল পরিচিত সুরের একটি গান। সে অমনি থমকে দাঁড়াল। তাদের দেশের কৃষকদের গানের সঙ্গে এর সুরের যেন কোথায় একটা মিল রয়েছে। তুর্বাণ চলতে চলতে ভাবতে লাগল, নীল নদের দেশেও সে এমনি ধরনের একটা সুরের মিল আবিষ্কার করেছিল। নীল আর সিন্ধুনদের জলে যারা নৌকো চালায়, তাদের সুরেও এমনি মিল, কেবল ভাষার তফাৎ। একটা অনুভূতি তুর্বাণের মনের মধ্যে সেই মুহূর্তে আশ্চর্য এক ভাবের জন্ম দিল। সাধারণ মানুষের মন থেকে যে সুর ওঠে, এই বিরাট বিশ্বের যেখানেই তারা থাক না কেন, তা সর্বত্রই এক। এদের প্রাণে প্রাণে কোথায় যেন অদৃশ্য এক যোগ আছে।

ঘুরতে ঘুরতে সেদিন অনেক দূরে চলে গিয়েছিল তুর্বাণ। সন্ধ্যার ছায়া ঘনিয়ে এল পাশের বনে। পথের ওপর দীর্ঘ গাছগুলোর লম্বা লম্বা ছায়া এসে পড়ল। হঠাৎ তুর্বাণের মনে হল, ঝোঁকের মাথায় পথের পর পথ পার হয়ে এসেছে সে । এখন ফিরতে হবে তাকে, কিন্তু জনবিরল জায়গায় ছায়ার গোলকধাঁধায় সে পথ হারাল।

সে অভিজ্ঞ বণিকদের কাছ থেকে শুনেছিল, পথ হারালে বিচলিত হয়ে এদিক ওদিক দিশেহারার মত ছুটে বেড়াতে নেই। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রাতের আকাশের দিকে তাকাতে হয়। নক্ষত্রের সংস্থান দেখে চিনতে হয় দিক। চাঁদ থাকলে তার আলোতে পথ হয় উজ্জ্বল।

বনের ধারে স্থির হয়ে দাঁড়াল তুর্বাণ। অপেক্ষা করতে লাগল রাত্রি সমাগমের। রাত ঘনিয়ে ওঠার কতক্ষণ পরে চাঁদ উঠল বনের আড়ালে। তুর্বাণ বুঝল, চাঁদের দিকে পেছন করে হাঁটলে রাজপ্রাসাদে

পৌঁছান সম্ভব হবে। কারণ রাজপ্রাসাদের সিং-দরজার সামনের দিগন্তে সে গতদিন সন্ধ্যায় চন্দ্রের উদয় দেখেছে।

বনের দিকে পেছন ঘুরে পা বাড়াতে গিয়েও থমকে দাঁড়াতে হল তুর্বাণকে।

আপনি কি বিদেশী? রাজধানীতে ফিরে যাবার পথ খুঁজছেন?

তুর্বাণ বেশ খানিক বিস্মিত হল। এখানে কোন জনবসতি তার চোখে পড়ে নি। শুধু পথের ধারে দেখেছে একটানা অরণ্যভূমি।

পেছন ফিরতেই চাঁদের আবছা আলোয় দেখল, পথপ্রান্তে বনের অন্তরাল থেকে মুখ বাড়িয়ে একটি মেয়ে তাকে প্রশ্ন করছে।

তুর্বাণ বলল, আপনার অনুমান ঠিক, আমি বিদেশী বণিক। কিন্তু আমি যে প্রাসাদে ফিরে যাবার পথ খুঁজছি, এ অনুমান আপনার হল কি করে? যদিও আপনার অনুমান নির্ভুল।

মেয়েটি বেরিয়ে এল বনের অন্তরাল থেকে। বুক আর হাত পা অব্দি আবৃত করে নেমেছে হালকা সবুজের একটি ঢিলে পোশাক। কালো উর্ধ্ব অঙ্গের ওড়নায় মুখের অর্ধেক অংশ ঢাকা।

মেয়েটি বলল, আমি আপনাকে প্রথম দিন অসুর সৈন্যদের সঙ্গে বিচিত্র এক ধরনের রথে চেপে প্রাসাদের দিকে যেতে দেখেছিলাম। তারপর বাজারে আপনাকে নিয়ে অনেক জল্পনাকল্পনা হতে শুনেছি। রাজা এসার যে আপনাকে খুবই পছন্দ করছেন তাও আমার কানে এসেছে। আপনি হয়তো জানেন না, এই বনের আড়ালে একটি অপ্রশস্থ খাল বনের ভেতর দিয়ে ডিকলাট নদী অব্দি চলে গেছে। এই জঙ্গল আর খাল অসুরবাসীরা ব্যবহার করে না। এটি পরিত্যক্ত অঞ্চল। সবার ধারণা এখানে অশরীরী আত্মারা বাস করে। আমি এই বনের ভেতর থাকি। নৌকো চালিয়ে আসার সময় গাছের ফাঁকে ফাঁকে আপনাকে পথ দিয়ে হেঁটে চলতে দেখেছি।

অনেকখানি কথা বলে থামল মেয়েটি।

তুর্বাণ বলল, নতুন জায়গায় একা একা বেড়াতে বেরিয়েছিলাম, কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকারে পথ হারালাম।

মেয়েটি বলল, যদি সোজা ফাঁকা প্রান্তর পেরিয়ে যান তাহলে প্রাসাদে পৌঁছতে পারবেন। কিন্তু ঐ প্রান্তর বড় উঁচু নীচু। তাছাড়া প্রাসাদের একটু দূরেই এরকম একটি খাল রয়েছে। লোকে প্রয়োজনে খাল পারাপার করে। মাঝি থাকে নৌকোয়। কিন্তু এখন সন্ধ্যায় আপনি মাঝিকে তো পাবেন না।

তুর্বাণ বলল, তাহলে যে পথে এসেছি সে পথেই ফেরার চেষ্টা করব।

হাসল মেয়েটি। বলল, আসার সময় খেয়াল করেননি, পথ কিন্তু সোজা নয়, অনেক আঁকবাঁক আছে।

আমারও এখন তাই মনে হচ্ছে।

মেয়েটি আর কোনও কথা না বলে বনের মধ্যে চলল। ইসারায় তাকে অনুসরণ করতে বলল।

বন খুব গভীর নয়। বড় বড় গাছ আর লতাপাতায় সমাচ্ছন্ন হলেও পথ করে যাবার অসুবিধে নেই। মেয়েটি তার অতি পরিচিত পথে তুর্বাণকে নিয়ে চলল। ডালপালা আর পত্রের আচ্ছাদন ভেদ করে চন্দ্রালোক এসে পড়ছিল বনের কোলে। কোথাও অনেকখানি জায়গা জুড়ে জ্যোৎস্নার সমারোহ, কোথাও বা অন্ধকার কিছু গাঢ়।

অল্প সময়ের ভেতরেই ওরা এসে পৌঁছল খালের ধারে।

মেয়েটি সাবধান করে দিয়ে বলল, এ জায়গাটা অনেকখানি ঢালু, আপনি সাবধানে পা ফেলে আসুন।

তুর্বাণ মেয়েটিকে অনুসরণ করে নামছিল, হঠাৎ অন্ধকার দেখে এক জায়গায় থমকে দাঁড়াল। সেখানে খালের ধারে বড় একটা গাছ ডালপালায় আঁধার সৃষ্টি করে দাঁড়িয়েছিল। সম্ভবত তারই কাণ্ডে বাঁধা ছিল মেয়েটির নৌকা। মেয়েটি নেমে গিয়ে যখন বুঝল যে তুর্বাণ নামতে পারেনি তখন সে আবার উঠে এসে বলল, আমি কি আপনাকে নামতে সাহায্য করব?

তুর্বাণ বলল, এই অন্ধকার ঢালু জায়গাতে কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

মেয়েটি তর্বাণের আরও কাছে এগিয়ে এসে অসংকোচে তার হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, হাত ধরে

নেমে আসুন। ঢালু হলেও জায়গাটা উঁচু নীচু নয়।

তুর্বাণ মেয়েটির হাত ধরে ধীরে ধীরে নেমে গিয়ে নৌকায় উঠল। মেয়েটি নৌকা ঠেলে দিয়ে উঠে বসে দাঁড় টেনে এগিয়ে চলল। সরু ছোট্ট নৌকা। ছপাছপ দু'পাশে দাঁড়ের ঘা পড়ছে। তর্ তর্ করে এগিয়ে চলেছে ডিঙি নৌকাখানা।

তুর্বাণ লক্ষ্য করল, মেয়েটির মুখের নিম্নাংশ কালো রেশমী কাপড়ে ঢাকা। সে ইতিমধ্যেই গলার সঙ্গে কাপড়খানা পাক দিয়ে নিয়েছে। এই আলো এসে পড়ছে ওদের ওপর, এই নিবিড় গাছাপালার ছায়া।

তুর্বাণ কথা বলল। তার গলায় কৃতজ্ঞতার সুর, আপনাকে মহাদেব গা আসুর যেন একটি দিকভ্রষ্ট মানুষকে উদ্ধারের জন্যই পাঠিয়েছেন।

মেয়েটি ঐ পাতলা কাপড়ের আড়াল থেকেই বলল, সবই প্রভু আসুরের ইচ্ছা। আমাকে এই জনহীন বিদেহীদের মাঝে বাঁচিয়ে রাখাও তাঁরই অভিপ্রায়।

তুর্বাণ বলল, কিছু যদি মনে না করেন তাহলে আপনাকে একটি প্রশ্ন করতে চাই।

মেয়েটি বলল, অসংকোচে আপনার খুশি মত প্রশ্ন করুন। কেবল আমার সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎকারের কথাটুকু কারো কাছে প্রকাশ করবেন না, তাতে উভয়েরই ক্ষতি ছাড়া লাভ নেই।

আমার কৌতূহল আপনাকে নিয়ে। আপনি এই মনুষ্য পরিত্যক্ত জায়গায় কি করেই বা এলেন আর কেনই বা এখানে রয়েছেন?

মেয়েটি প্রথমে কোনও কথা বলল না। ছপ্ছপ্ দাঁড়ের আওয়াজ চলতে লাগল। একসময় বলল, আপনি যদি আমার কথা জানতে চান তাহলে এই নৌকায় বসে তা হবে না। একদিন যদি গোপনে সুযোগ মতো আবার এখানে আসেন তা হলে শোনাব আমার কথা। আপনার আপত্তি না থাকলে আমি আমার আস্তানায় আপনাকে নিয়ে যেতে পারি।

তুর্বাণ বলল, রাজা এসার আমাকে তাঁর রাজ্যের সব জায়গায় ঘুরে বেড়াবার অধিকার দিয়েছেন। শুধু নিষেধ জারি করে বলেছেন, আমি যেন পালাবার চেষ্টা না করি। তিনি তাঁর রাজ্যের সব কটি ঘাঁটিতেই পাহারাদারদের সাবধান করে দিয়েছেন।

আপনি তা হলে নজরবন্দি বলুন?

তুর্বাণ বলল, এ রাজ্যের ভেতর নয়, তার বাইরে ডিঙোবার চেষ্টা করতে গেলেই। আচ্ছা, আপনার আস্তানাটা এখানে কোথায়?

খুব কাছেই। সামনের বাঁকের মুখে।

তুর্বাণ খানিক ইতস্তত করল। তারপর বলল, কাছেই যদি হয় তা হলে আপনার অসুবিধে না থাকলে আজই আপনার আস্তানায় যাওয়া যেতে পারে।

মেয়েটি বলল, আমার অসুবিধের আর কি কারণ থাকতে পারে। শুধু আপনার কথাই ভাবছিলাম।

তুর্বাণ বলল, আগেই তো বলেছি রাজ্যের ভেতর ইচ্ছামতো ঘোরাফেরাতে আমার ওপর কোনও বিধিনিষেধ নেই।

ওরা এসে পৌঁছল একটা বাঁকের মুখে। এখানেও জঙ্গল নিবিড়। আলোর প্রবেশের সহজ পথ নেই। নৌকা থেকে নেমে মেয়েটি বেশ তৎপরতার সঙ্গে নৌকাটাকে একটা গাছের গুঁড়িতে বেঁধে ফেলল। তারপর তুর্বাণের হাত ধরে সাবধানে নামতে সাহায্য করে বলল, কোনও ভয় নেই, চলে আসুন আমার সঙ্গে। এ জায়গাটা সমতল। ধরুন আমার হাত।

ওরা বনের ভেতর দিয়ে কখনও আলো কখনও অন্ধকারে পথ চলছিল। মেয়েটি কিন্তু একবারও তুর্বাণের হাত ছাড়েনি।

এক সময় ওরা এসে পৌঁছল এমন একটা জায়গায় যেখানে চারিদিকে নিবিড় বনের মাঝে বেশ খানিকটা অংশ ফাঁকা। আর সেই জায়গার একদিকে একটা উঁচু পাথরের ঢিবি। তুর্বাণ ভাল করে নজর ফেলতেই দেখল, ঢিবির ওপরে একটা বহু প্রাচীন গাছ আকাশের দিকে ডালপালা মেলে দাঁড়িয়ে আছে।

তার মোটা মোটা শেকড় নীচের মাটিতে নেমে এসেছে। ওই ঢিবির ঠিক মাঝ বরাবর দুটো মোটা শেকড়ের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছিল একটা গুহা।

তুর্বাণকে গুহার কাছে নিয়ে এসে মেয়েটি বলল, এই আমার আস্তানা। আপনি এখানে একটুখানি অপেক্ষা করুন, আমি আসছি।

মেয়েটি সোজা ওই মোটা দুটো শেকড়ের ফাঁক দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে এল হাতে একখানা হরিণের চামড়ার আসন নিয়ে। গুহার একপাশে পেতে দিতে বলল, বসুন এর ওপর।

তুর্বাণ বসতে গিয়ে বলল, আপনি?

মেয়েটি একটু হেসে বলল, আপনি অতিথি, বসুন আসনে। এখানে আমার বসার জায়গার অভাব নেই। আর এই গোটা বনটাই তো আমার সাম্রাজ্য।

একটু থেমে হঠাৎ হেসে উঠে বলল, জায়গাটাকে আপনার বিদেহী আত্মাদের চমৎকার একটা আস্তানা বলে মনে হচ্ছে না?

তুর্বাণ বলল, যে কোনও আগন্তুকের কাছে তাই মনে হবে।

পাহাড়ি ঝিঁঝির একটানা ডাক শোনা যাচ্ছিল। ঝম্ ঝম্ একটা আওয়াজ।

মেয়েটি বলল, এই অল্পদিনে আপনি আমাদের ভাষা শিখলেন কী করে?

আমরা বণিক, নানা দেশের সঙ্গে আমাদের যোগ, তাই সব অঞ্চলের ভাষাই আমাদের কিছু কিছু শিখতে হয়। আমাদের পিতা পিতামহেরা এসব রাজ্যের সঙ্গে এককালে বাণিজ্য করে গেছেন, তাঁদের কাছ থেকেই আমাদের সব কিছু শেখা।

এবার মেয়েটি বলল, আপনি কোন দেশের মানুষ তা যদি অনুগ্রহ করে বলেন তা হলে আমার কৌতূহল মেটে। আর আপনার নাম?

আমার নাম তুর্বাণ। বহু পর্বত মরু নদনদী পেরিয়ে আমার দেশে যেতে হয়। সিন্ধু বলে এক নদী আছে, তার তীরে মহেঞ্জোদড়ো নগরীতে আমার বাস।

মেয়েটি বলল, আমার পরিচয় আপনাকে দিই। আমার নাম, উন্নানী। আমি রাজ পরিবারের মেয়ে।

বিস্মিত তুর্বাণ প্রশ্ন করল, আপনি রাজ পরিবারের মেয়ে হয়ে এখানে!

সেই কাহিনী শোনাতেই তো আপনাকে এখানে নিয়ে এলাম।

তুর্বাণ চেয়ে আছে উন্নানীর দিকে। ঢিবির ওপরের গাছ থেকে ডালপালার ছায়া পড়েছে জ্যোৎস্না ঝরা প্রাঙ্গণের ওপর। উন্নানী বসেছে ছায়ার মধ্যে। তার আর তুর্বাণের মাঝখানে ডালপাতা আর চাঁদের আলোর বিচিত্র আঁকিবুকি। এখন আর উন্নানীর মুখে সেই কালো কাপড়ের আবরণ নেই। মেয়েটিকে আশ্চর্য রহস্যময় বলে মনে হচ্ছে। তুর্বাণের হঠাৎ মনে হল, উর্বীর সঙ্গেও তার এমনি এক নির্জন পরিবেশে দেখা হয়েছিল।

উন্নানী আবার নীরবতা ভাঙল, আমি রাজ পরিবারেরই মেয়ে। তবে আমার মা রানী ছিলেন না, তিনি মহারানীর প্রধান সেবিকা ছিলেন।

একটু থেমে যেন কিসের একটা সংকোচ পার হয়ে এসে বলল, মহারাজ এসার আমার মায়ের ওপর অনুরক্ত ছিলেন, যার ফলে আমার জন্ম। পাছে মহারানী বিরূপ হন সেজন্য মহারাজ আমার আবির্ভাবের সম্ভাবনা জানতে পেরেই কৌশলে মাকে তাঁর এক বিশ্বস্ত অনুচরের সঙ্গে বিয়ে দেন। এসব কথা মায়ের মুখে তাঁর মৃত্যুর আগে শুনেছিলাম।

তুর্বাণ বলল, কিন্তু আমার ধারণা রাজারা একাধিক পত্নীতে আসক্ত। তাতে রানীদেরও মনে করার কিছু থাকে না। কারণ এতে তাঁরা অভ্যস্ত।

উন্নানী বলল, কথাটা আপনি ঠিকই বলেছেন, কিন্তু বিশিষ্ট পরিবারের কন্যারাই রাজপ্রাসাদে বধূ হয়ে আসার অধিকার পায়। সেক্ষেত্রে আমার মা প্রধান পরিচারিকার অতিরিক্ত কিছু ছিলেন না। আর তা ছাড়া মাকে পত্নী বলে গ্রহণ করলে আত্মীয়তায় ভাঙন ধরার সম্ভাবনা। আর যেমন তেমন আত্মীয়তা তো নয়।

প্রবল পরাক্রান্ত উরারতু রাজ্যের কন্যা ছিলেন মহারানী। উত্তর অঞ্চলের পার্বত্য জাতিরা যাতে অসুরভূমিতে ঢুকে পড়তে না পারে সেজন্য উরারতুর রাজা সবসময় সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। তাই উরারতু-রাজাকে চটিয়ে অবিবেচকের মতো কোন কাজ করতে চান নি মহারাজ এসার।

তূর্বাণ বলল, এতক্ষণে সমস্ত পরিস্থিতিটা পরিষ্কার হল। এখন আপনার কথা বলুন।

উন্নানী বলতে লাগল, আমি সামান্য বড় হবার পর রাজপ্রাসাদে মায়ের সঙ্গে চলে আসতাম। মহারানী কিছু না জেনে তাঁর প্রধান পরিচারিকার কন্যাকে আদর করতেন। মহারাজ ঘরে ঢুকে এমনভাবে আমার দিকে তাকাতেন যে আমি ভয় পেয়ে ঘরের বাইরে ছুটে পালিয়ে আসতাম। মহারানীকে কখনও কখনও বলতে শুনতাম, আহা কেমন ফুলের মতো সুন্দর মেয়ে, ওকে এমন করে ভয় পাইয়ে দাও।

মহারাজ উত্তরে বলতেন, পরিচারিকার মেয়েকে এতখানি কাছে টেনে নেওয়া মহারানীর মর্যাদাহানিকর বলে আমি মনে করি।

কিন্তু এক সময় আমি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম মহারাজের ব্যবহারে। সে সময় মহারানী পিতৃদর্শনে গিয়েছিলেন উরারতু রাজ্যে। আমি তখন সবে কৈশোর পেরিয়েছি। মায়ের সঙ্গে একদিন এলাম রাজ-অন্তঃপুরে। এক ফাঁকে দেখলাম মহারাজ নিভৃতে মায়ের সঙ্গে আলাপ করছেন। মা মহারানীর ঘরের ভেতরই রয়ে গেলেন কাজে, আর মহাবাজ এক সময় বাইরে বেরিয়ে এলেন। আমি সরে যাচ্ছিলাম, মহারাজ আমাকে কাছে ডাকলেন। তাঁর গলার স্বর আমি যেন চিনতে পারলাম না। এত মিষ্টি আর এত স্নেহমাখা যে আমি অবাক হয়ে মহারাজের দিকে চেয়ে রইলাম। ভুলে গেলাম ওঁর কাছে যেতে। উনি এবার নিজেই এগিয়ে এলেন। আমি প্রাসাদের রীতি অনুযায়ী ওঁকে আভূমি নত হয়ে অভিবাদন জানালাম। মহারাজ এসার আমার মাথাটা দু'হাতে চেপে ধরে আমার মাথায় চুম্বন করলেন। তারপর ধীরে ধীরে চলে গেলেন।

মহারাজের অযাচিত স্নেহের ছোঁয়ায় তখন আমি আনন্দে আত্মহারা। আমি ছুটে চললাম মহারানীর কক্ষের দিকে, যেখানে আমার মায়ের সঙ্গে মহারাজ কথা বলছিলেন।

আমি দেখলাম, মা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। মনে হল তিনি মহারাজকে আদর করতে দেখেছেন। আমি কাছে গিয়ে দেখলাম, মায়ের চোখে জল।

পরে মহারানী ফিরে এলে আমি কেমন করে জানি না একদিন মায়ের পরিবর্তে তাঁর সেবার কাজে নিযুক্ত হলাম।

রাজপ্রাসাদ সেদিন থেকে হল আমার বাড়ি। আমি মনের খুশিতে অন্তঃপুরের সব জায়গায় বেড়াতে লাগলাম।

কিছুকাল পরে আমার মা দুরারোগ্য রোগে প্রাণ হারালেন। আর ঠিক মৃত্যুর আগে আমাকে কাছে ডেকে সব কথা বলে গেলেন।

বুঝতেই পারছেন তখন আমার কী অবস্থা। এতকাল যাঁকে পিতা বলে জেনে এসেছি , যিনি আমাকে স্নেহে পূর্ণ করে দিয়েছেন, তিনি আমার জন্মদাতা পিতা নন, শুধু পালক পিতা। আর আমি যাঁকে মহারাজ বলে এতকাল দূরে দূরে থেকে সমীহ করে এসেছি, তিনি আমার যথার্থ পিতা।

আমি অভিমানে প্রাসাদে যাওয়া বন্ধ করলাম। যাঁকে আমি পিতা বলে জেনেছি তাঁকেই আমার সমস্ত শ্রদ্ধা ভক্তি সেবা উজাড় করে দিলাম। আমি ভুলে যেতে চেষ্টা করলাম মায়ের মৃত্যুকালীন স্বীকৃতি। কিন্তু ভুলে যেতে চাইলেই কী ভোলা যায়? মাঝে মাঝে চোখের ওপর ফুটে উঠত মহারাজের ছবি। আমাকে ধরে সস্নেহে মাথায় চুম্বন করছেন। কখনও বা তাকিয়ে আছেন আমার দিকে অসীম মমতায়।

আমার অনুপস্থিতির ইচ্ছা বেশি দিন টিকল না। প্রাসাদ থেকে মহারানীর ডাক এল। আমি গেলে তিনি আমার শরীরের খোঁজখবর নিলেন। যখন শুনলেন আমি ভালই আছি অথচ তাঁর কাছে আসিনি তখন ক্রোধের চিহ্ন ফুটে উঠল তাঁর চোখে মুখে। তিনি কঠোর ভাষায় আমাকে তিরস্কার করে বললেন, প্রাসাদের মহারানীর প্রধান সেবিকার পদ পাওয়াকে সকলেই মহা সৌভাগ্যের ব্যাপার বলে জানে, কিন্তু এমন কী

সৌভাগ্যের দেখা পেয়েছ যেজন্যে মহারানীকে অমর্যাদা করার সাহস রাখ।

মনে মনে বললাম, তুমি সন্তানহীনা, কিন্তু মহারাজ এসার সন্তানহীন নন। সেদিক থেকে রাজপ্রাসাদের অধিকার তোমার চেয়ে আমার কম নয়।

মুখে মিথ্যে করে বললাম, মাপ করবেন মহারানী। আমার বাবা অসুস্থ, তাই এই বিপর্যয় ঘটেছে।

মহারানী বললেন, প্রাসাদের কাজে যে নিযুক্ত থাকবে তার সংসার বলে কিছু নেই। মহারাজের বিশেষ অনুরোধেই আমি তোমার মাকে বিয়ের অনুমতি দিয়েছিলাম।

আমি মহারানীর ক্রোধের মুখে আর কোনও কথা বললাম না। নীরবে সব সহ্য করে কাজে যোগ দিলাম। কয়েক দিনেই আমার সেবায় মহারানী প্রসন্ন হয়ে উঠলেন। কিন্তু কাল হল আমার প্রাসাদে থেকে।

এইখানে এসে হঠাৎ থেমে গেল উন্নানী। কিছুক্ষণ নীরবতার ভেতর কাটল।

তুর্বাণ এক সময় বলল, যদি কোনও বাধা থাকে আপনার বলতে তা হলে নিশ্চয়ই আমি আপনাকে অনুরোধ জানাব না।

একটুখানি হাসির রেখা ফুটল উন্নানীর মুখে। বলল, যাঁর কাছে জন্মরহস্য বলতে বাধল না তাঁর কাছে আমার আর না বলার কী থাকতে পারে। আপনি একটুখানি অপেক্ষা করুন, আমি গুহার ভেতর থেকে আসছি।

উন্নানী গুহার মধ্যে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে গুহামুখী পদধ্বনি শুনে তুর্বাণ ফিরে তাকাল। আবছায়ার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে যেন দুটি অশরীরী ছায়া। একটি দীর্ঘকায় পুরুষ মূর্তি। ডান হাত সামনে প্রসারিত, এগিয়ে আসছে স্খলিত পদক্ষেপে। তার পেছনে সেই পরিচিত নারী, কিন্তু এ যেন উন্নানী নয়, অন্য কেউ।

ওরা দুজনে এসে দাঁড়াল তুর্বাণের সামনে স্পষ্ট চন্দ্রালোকে।

একি! তুর্বাণ দেখল বলিষ্ঠ সুন্দর পুরুষ মূর্তিটি একেবারে অন্ধ। শুধু অন্ধ নয়, অক্ষিকোটর থেকে যেন দুটি চোখকেই তুলে নেওয়া হয়েছে। আর উন্নানী! তার মুখ এখন অনাবৃত। তুর্বাণ দেখল, উন্নানীর নিম্ন ওষ্ঠটি বিকৃত। যেন কোন আঘাতে বিক্ষত হয়ে গেছে।

উন্নানী প্রশ্ন করল, আমাদের এ অবস্থায় দেখে অবাক হলেন তো? মনে হচ্ছে নাকি, সত্যিই আমরা বিদেহী জগতের অধিবাসী? পৃথিবীর কোনও মানুষকে দেখে তার কাছে অতীত জীবনের গল্প বলতে একটা দেহ ধারণ করেছি।

উত্তেজনায় উঠে দাঁড়াল তুর্বাণ। উন্নানী এগিয়ে গিয়ে তার হাত ধরে বলল, বসুন। আপনি বিদেশি বণিক হলেও মনে হয় আপনার ভেতরে একটা হৃদয় আছে। আর তারই ছায়া আপনার চোখেমুখে দেখেছি।

তারপর সঙ্গের মানুষটিকে দেখিয়ে উন্নানী বলল, ইীন এই অসুরভূমির অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাস্কর, আমার স্বামী চেরিব।

তুর্বাণের বিস্ময়ের সীমা রইল না। ওরা তিনজনেই বসল পাশাপাশি।

উন্নানী বলল, আমার পরের কাহিনীর প্রধান পুরুষটিকে নিয়ে এলাম আপনার সামনে। এখন আপনি শুনতে পাবেন, প্রাসাদ ছেড়ে কেন আমাদের আসতে হল এই বিদেহী আত্মার দেশে।

তুর্বাণ বলল, মাপ করবেন, উনি কী জন্মান্ধ?

উন্নানী বলতে লাগল, অসুরভূমির ভাস্কররা ববেরুব শিল্পীদেরও হার মানায়। রাজপ্রাসাদের চারিধার ঘিরে পাথরের কাজগুলো আপনি নিশ্চয়ই দেখে থাকবেন।

তুর্বাণ বলল, অসাধারণ নৈপুণ্য সে কাজের ভেতর। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে হয়। ছোট বড় প্রতিটি কাজে শিল্পীর দক্ষতাকে প্রশংসা না করে পারা যায় না। কিন্তু একটি প্রশ্ন জেগেছে আমার মনে।

বলুন।

তুর্বাণ বলল, আমি যত ভাস্কর্য দেখেছি তার প্রায় সব কটিই রাজার যুদ্ধযাত্রা অথবা মৃগয়ার ছবি। আর সবকটি মুখই প্রায় একই রকম দৃঢ়তাব্যঞ্জক। এর কারণ কী?

শিল্পী কথা বলল, আপনি যথার্থ সমজদার। তাই নৈপুণ্যের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীর ত্রুটিটাও ধরা পড়েছে আপনার চোখে।

তুর্বাণ সঙ্গে সঙ্গে বলল, আমি একে ত্রুটি বলছি না, শুধু এর কারণটুকু জানতে চাইছি।

শিল্পী বলল, ওটা ত্রুটিই আর ঐ ত্রুটির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গিয়ে আজ আমার এই পরিণতি।

শিল্পী চেরিবকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে উন্নানী ব্যাখ্যা করে বলল, যুদ্ধ আর মৃগয়া ছাড়া অসুরবাসীরা অন্য কিছু জানে না। অবশ্য শিল্পী বা ভাস্কর সম্প্রদায় এর কিছু ব্যতিক্রম। একেবারে ছেলেবেলা থেকেই অসুর দেশের পুরুষরা যুদ্ধবিগ্রহ শেখে। তাই লক্ষ করে থাকবেন কিশোর, যুবক, সকলের মুখেই একই রকমের একটা দৃঢ়তার ছাপ।

তুর্বাণ বলল, তা আমার নজরে পড়েছে। তাই শিল্পীদের কাজ নিখুঁত হলেও মুখগুলো কেমন যেন সব একই ছাঁচে ঢালা হয়ে গেছে।

উন্নানী বলল, এর ব্যতিক্রম ঘটাতে গিয়েছিল চেরিব তার কাজের ভেতর দিয়ে। তার ফলে তার পরিণতিটা কী হল তা তার নিজের মুখেই শুনুন।

অন্ধ শিল্পী অনুভবে তুর্বাণের মুখোমুখি বসল।

ধীরে ধীরে চেরিব শুরু করল তার কথা।

আমি গুরুর সঙ্গে নতুন প্রাসাদ চিত্রিত করবার জন্য এসেছিলাম। তখন আমার বয়েস খুবই কম। দলে ছিল অনেকগুলি মানুষ। তারা শিল্পী হিসেবে সকলেই দক্ষ। কিন্তু গুরুর অকৃপণ কৃপা ছিল আমার ওপর। তিনি কাজে আমার নিষ্ঠা আর দক্ষতা দেখে আমাকে এককভাবে কাজ করার সুযোগ দিলেন।

তুর্বাণ জানতে চাইল, এককভাবে কাজের পরিষ্কার অর্থটা কী?

চেরিব বলল, এক একটি বিশেষ অংশে চিহ্নিত ছিল সমস্ত প্রাসাদগাত্র। গুরুর পরিকল্পনা ও নির্দেশে শিল্পীরা সেই অংশগুলিতে কাজ করত। কিন্তু গুরু যোগ্য মনে করলে নিজস্ব পরিকল্পনায় কোনও ভাস্করকে কাজ করার সুযোগ দিতেন। আমি তেমনি একটি অংশ নিজের ভাবনায় চিত্রিত করার সুযোগ পেলাম।

তুর্বাণ বলল, এখন আপনি বলে যান আপনার কাহিনী।

চেরিব বলল, আমি এক বিজয়যাত্রার চিত্র-পরিকল্পনা করলাম। সকলেই শিকার অথবা যুদ্ধযাত্রার ছবিতে মহারাজের শর-সন্ধান, কাতর মৃগের করুণ দৃষ্টিক্ষেপের মধ্যে ঘনায়মাণ মৃত্যুর ছায়া আঁকা। এতে রাজার ক্ষিপ্রতা ও শক্তি প্রমাণিত হয়। আবার যুদ্ধের চিত্রেও রাজাই প্রধান। তাঁর পদতলে নতজানু হয়ে বসে প্রাণভিক্ষা করছে প্রতিপক্ষের সেনাপতি। ব্যাঘ্রের বিক্রম নিয়ে রথে অথবা অশ্বে বসে আছেন রাজা। আহত এবং সম্পূর্ণ কবলিত মৃগ যেন চেয়ে আছে সকরুণ দৃষ্টিতে। এ অন্য আর এক মৃগয়ার চিত্র।

আমি পরিকল্পনা করলাম, বিজয়যাত্রার। তিনটি ভাগে ভাগ করলাম আমার চিত্র বস্তু। প্রথম অংশে রইল বর্শা, ঢাল, কুঠার ও তরবারিধারী সৈন্যের মিছিল। সবাই চলেছে দৃপ্ত তেজে অশ্বপৃষ্ঠে। মাঝে কেতনশোভিত অশ্ব-বাহিত রাজপথ।

দ্বিতীয় পর্যায়ে নৃপতির বলিষ্ঠ বাহুতে জ্যা আকর্ষণ করে শর-সন্ধান। এই অংশে রইল প্রতিপক্ষের আত্মসমর্পণের দৃশ্যটিও।

তৃতীয় বা শেষ পর্যায়ের পরিকল্পনাতে রইল আমার নিজস্ব ভাবনায় বৈশিষ্ট্য। পরাভূত নৃপতির নগরীতে চলেছে বিজয়ী রাজার বিজয় মহোৎসব।

চলেছে বিজয়ী সৈন্যরা বীরদর্পে নগরের পথের ওপর দিয়ে। পথিপার্শ্বে নত মস্তকে দাঁড়িয়ে আছে বিজিত রাজ্যের জনতা। রাজ-পথের সামনে আসছে উপঢৌকন। রত্ন-পেটিকা, অশ্ব দাসদাসী। সবশেষে এসে দাঁড়াল এক অপরূপা কন্যা, রত্ন আভরণে সারা অঙ্গ আবৃত করে। হাতে একটি কবুতর। বিজয়ী রাজা পরাভূত হলেন সে রূপের কাছে। তিনি সিংহাসন থেকে নেমে নতজানু হয়ে বসে দু'হাত প্রসারিত করে সেই কন্যাকে প্রার্থনা করলেন।

চেরিব বলে চলল, আমার এই পরিকল্পিত রাজার অবয়বের সঙ্গে কোনও মিলই রাখলাম না মহারাজ

এসারের। সেখানে আশ্চর্যভাবে ভাস্কর চেরিবের আকৃতি খোদিত হল। আর ওই বিজিত রাজ্যের অপরূপা কন্যাটি পরিকল্পিত হল উন্নানীর প্রতিরূপে।

তুর্বাণ বলল, শিল্পী চেরিবের সঙ্গে কী উন্নানীর পূর্ব পরিচয় ছিল?

সে পরিচয়ের কথা আপনি উন্নানীর মুখ থেকেই শুনুন।

উন্নানীর মুখ সামান্য নত হল। জ্যোৎস্নালোকে উন্নানীর মুখের সলজ্জ ছবিটি তুর্বাণের দৃষ্টি এড়াল না।

ধীরে ধীরে উন্নানী বলতে লাগল, প্রাসাদ অলিন্দ থেকে প্রথম যেদিন তরুণ ভাস্কর চেরিবকে দেখি সেদিন আমার মনে হয়েছিল ও অপার্থিব কোনও জগতের অধিবাসী। কাষ্ঠনির্মিত অনেক উঁচু বেদির ওপর দাঁড়িয়ে প্রাসাদের পশ্চিম দেয়ালে ও কাজ করছিল একা। ওর হাতের বাটালি আর হাতুড়ি পাথরের বুকে ফুটিয়ে তুলছিল ওর পরিকল্পিত মূর্তি। অস্ত সূর্যের আভায় ওর বলিষ্ঠ দেহ আর তন্ময় ভাবের ছবি আঁকা হয়ে গেল আমার বুকের গভীরে। পশ্চিম অলিন্দটি ছিল আমার অধিকারে। কারণ প্রাসাদের পশ্চিম প্রকোষ্ঠ আমার থাকবার জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিল। চেরিব কাজ করছিল ঠিক আমার অলিন্দের নীচেই। আর প্রাসাদের পশ্চিম দিকে ছিল পার্বত্য খরস্রোতা নদী। তার পরেই দিগন্ত ছোঁয়া বনভূমি। তাই প্রাসাদের পশ্চিম পার্শ্ব ছিল লোকচক্ষুর আড়ালে। প্রাসাদের অন্তঃপুর ছিল এই পশ্চিম প্রান্তেই।

আমার প্রকোষ্ঠের ঠিক নীচেই কাজ করার জন্য পশ্চিমের অন্য কোনও অলিন্দ থেকে তাকে দেখা যাচ্ছিল না। আর তাই অসুরভূমির মহান দেবতা আসুর আমাদের পরিচয় আর নিভৃত মিলনের সুযোগ করে দিলেন।

আমি কাজের ফাঁকে ফাঁকে এসে ওকে দেখে যেতাম। ও কিন্তু ওর চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখত শুধুমাত্র ওর চিত্রেরই ওপর।

একদিন ও কাজ করছিল তন্ময় হয়ে, আমি ওকে দেখছিলাম, এমন সময় প্রাসাদ শীর্ষ থেকে সম্ভবতঃ বাজের তাড়া খেয়ে ওর কোলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এক কবুতর। হাত থেকে বাটালিটা ওর ছিটকে নীচে পড়ে গেল। ও চমকে উঠল, আর আমি সঙ্গে সঙ্গে হেসে উঠলাম।

আমার হাসির শব্দ পেয়ে ও অবাক হয়ে ওপরের দিকে তাকাল। আমার সঙ্গে ওর চোখাচোখি হয়ে গেল। ততক্ষণে আমার হাসি থেমে গেছে।

আমি হঠাৎ এক কাণ্ড করে বসলাম। অলিন্দ পথে বাড়িয়ে দিলাম আমার দুটো হাত। যেন ওর কাছে দান চাইছি। ও হেসে কবুতরটাকে দু'হাতের অঞ্জলিতে ভরে তুলে ধরল আমার দিকে। আমি ওর হাত থেকে ভীরু পাখিটাকে নিয়ে নিলাম। ওর হাতে আমার হাতের ছোঁয়া লাগল। সেদিনের রোমাঞ্চ আজও আমি মাঝে মাঝে অনুভব করি।

চেরিব বলল, আজ আমি চোখের দৃষ্টি হারিয়েছি, আর সামান্য কয়েকটি দিনমাত্র উন্নানীকে চোখের দেখা দেখেছি, কিন্তু সেই কবুতর হাতে প্রথম দিনের ছবিখানা ওর আজও অন্ধ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। এমন কান্তি কমনীয় সর্বজয়ী মূর্তি আমি আর কখনও দেখিনি।

তুর্বাণ বলল, আপনার প্রাসাদ-ভাস্কর্যে আপনি যে কন্যাটিকে কবুতর হাতে নিয়ে রাজার সামনে উপস্থিত করেছেন, সে নিশ্চয়ই আপনার প্রথমদিনের দেখা সেই প্রেমিকা?

চেরিব বলল, সে কি আর বলে দেবার অপেক্ষা রাখে বন্ধু।

উন্নানী বলল, এরপর চলল আমাদের নিভৃত আলাপের পালা। মহারানীর কাজের ব্যাঘাত ঘটতে লাগল মাঝে মাঝে। আমি তখন চেরিবকে নিয়ে উন্মত্ত। কোথায় কি প্রমাদ ঘটাচ্ছি তা ভেবে দেখার মতো মনের অবস্থা আমার ছিল না। চেরিব একদিন বলল, আমার শেষ পরিকল্পনায় নায়িকা তুমি; আমি তোমাকে এমনভাবে চিত্রিত করব যাতে ভুবনবিজয়ী সম্রাটও তোমার কাছে নতজানু হয়ে পড়েন।

চেরিব বলল, আমি আমার সর্বশক্তি দিয়ে তাই করতে চেয়েছিলাম। তখন ওই কাজ শুধু আমার দক্ষ হাতের বাটালি চালনায় তৈরি হচ্ছিল না, একটা আশ্চর্য প্রেরণা আমাকে দিয়ে ওই কাজ করিয়ে নিচ্ছিল।

উন্নানী বলল, অনেক সময় আমি ভেবেছি, কাজ যখন ফুরোবে তখন ওকে না দেখতে পেয়ে আমি কী

করব। শেষে ওর সঙ্গে মিলনের জন্যে এমন অধীর হয়ে উঠলাম যে গভীর রাত্রে অনেক কৌশলে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে গিয়ে ওর সঙ্গে মিলিত হতাম।

উন্নানীকে থামিয়ে দিয়ে চেরিব বলল, বন্ধু, সে যে কী উন্মাদনা তা আমি আপনাকে ভাষা দিয়ে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারব না। আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ পাওয়া ছিল সেদিনের সেই দুর্লভ মুহূর্তগুলি। কিন্তু নিবিড় করে দুজনকে পেতে না পেতেই বিচ্ছেদ ঘনিয়ে উঠল।

উন্নানী চেরিবের কথার মাঝেই বলে উঠল, অপরাধটা ছিল আমারই। আমি ভালবাসায় উন্মত্ত হয়ে সব ভুলে গিয়েছিলাম। মহারানী যে আমার ভাবান্তর লক্ষ করেছেন তা আমি বুঝতে পারিনি। তিনি আমার গতিবিধি লক্ষ করবার জন্য প্রাসাদরক্ষীকে নির্দেশ দিলেন।

ভালবাসায় মত্ত হয়ে আমরা জগৎ সংসারকে ভুলে গিয়েছিলাম, কিন্তু সারা জগৎ তখন আমাদের দিকে চোখ বুজে ছিল না।

আমরা এক রাত্রে পশ্চিমের নদীতীরে গাছের অন্তরালে বসে গল্প করিছিলাম, এমন সময় প্রাসাদরক্ষীর হাতে ধরা পড়লাম। দুজনকে বিচ্ছিন্ন করে রেখে দেওয়া হল বন্দিশালায়।

পরদিন মহারাজ চেরিবের গুরু ও সহযোগী শিল্পীদের নিয়ে ওর কাজ দেখতে গেলেন। সেখানেই উনি চিনলেন আমার আর চেরিবের খোদিত মূর্তি। অলিন্দের অবস্থানও দেখলেন তিনি। ক্রোধে অন্ধ হলেন। বিচারে তিনি চেরিবের দুটি চক্ষু উৎপাটনের আদেশ দিলেন, যাতে ও কোনরকমে যদি বেঁচেও ওঠে তবু ভাস্কর্যের কাজ যেন আর না করতে পারে।

আমার বিচারের ভার স্বয়ং মহারানী নিজের হাতে তুলে নিলেন। তিনি দয়া করে আমার কাছে দুটি প্রস্তাব রাখলেন। প্রেমের জ্বালা জুড়োবার জন্যে বিষধর সাপের দংশনে মৃত্যু, নয়তো পাহাড়ের ওপর থেকে ডিকলাট নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে মৃত্যু।

আমি শেষেরটিই বেছে নিলাম। কতদিন বনের প্রান্তে মায়ের সঙ্গে গেছি টিলার ধারে। টিলা বেষ্টন করে নদী ডিকলাট বনরেখা ছুঁয়ে বয়ে গেছে। মা ওখানে টিলার কোলে গাছের ঘন ছায়ায় বসে আমাকে একের পর এক গল্প শুনিয়ে যেতেন। নদীর হাওয়া বন ছুঁয়ে বয়ে আসত। প্রখর গরমের দিনে সে হাওয়ার ছোঁয়ায় আমি অনেক সময় মায়ের কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়তাম।

কতদিন নদীর নরম বালুর ওপর পায়ের ছাপ ফেলে ফেলে আমি আর মা ঘুরে বেড়াতাম। টিলার ওপারে যেখানে খাড়া পাহাড় একেবারে নেমে এসে নদী ছুঁয়েছে সেখানে নদীর ঠাণ্ডা জলে পা ডুবিয়ে আমি মায়ের হাত ধরে অনেক দূর অবধি হেঁটেছি।

মহারানীর প্রস্তাব শুনে আমি টিলা থেকে নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে আমার সব জ্বালা জুড়োতে চাইলাম।

মৃত্যুর আগে আমি মহারানীর কাছে আর একটি প্রার্থনা জানালাম। আমাকে অন্তত কয়েকটি দিনের জন্যে আমার বাবার কাছে থাকতে দেওয়া হোক।

মঞ্জুর হল আমার প্রার্থনা। কিন্তু মহারানী আমার বাবাকে ডেকে বললেন, উন্নানী, তোমার কাছে কয়েকদিন থাকতে চাইছে। একটি শর্তে তাকে এই কটি দিন জীবিত থাকার অনুমতি দিতে পারি। ও যদি পালায় তাহলে তোমাকে তার পরিবর্তে শাস্তি ভোগ করতে হবে। ওই একই শাস্তি। আর তোমাকে নিজের হাতে মেয়েকে টেনে নিয়ে টিলার ওপর। নদীতে ঝাঁপ না দেওয়া পর্যন্ত তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে সেখানে।

বাবা আমার কাতর কান্নায় মহারানীর প্রস্তাবে রাজি হলেন। আমি বাবার হাত ধরে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে চলে গেলাম।

আমার পালক পিতার কাছে এক সময় আমি আমার জন্মরহস্যের কথা বললাম। তিনি আমাকে অনেক আদর করে বললেন, এ ঘটনা আমার কাছে গোপন নেই। মহারাজ বিবাহের আগেই অকপটে তোমার মাতৃগর্ভে অবস্থানের কথা আমাকে বলেছেন। কিন্তু আমি যে সব জেনেও তোমার মাকে গ্রহণ করেছি, সে

কথা মৃত্যু পর্যন্ত তোমার মাকে জানতে দিইনি। । আব তোমার মা আমাকে বাজা এসারের সঙ্গে তাব ঘনিষ্ঠতার কথা না বললেও আমাকে স্বামী হিসেবে তার প্রাণঢালা সেবা দিয়ে গেছে। আমাকে ঘটনাটা বলতে তার প্রাণে আটকাত আর সেজন্যে সে যে মাঝে মাঝে অনুতাপে ভুগত তা আমি জানতাম। তুমি যে আমার মেয়ে নও, সে কথা আমার আচরণে কোনওদিনই তাকে বুঝতে দিতাম না। হয়ত একদিকে সে এজন্যে শান্তি পেত আবার বঞ্চনার কথা ভেবে দুঃখও পেত মনে মনে।

বাবা থামলে আমি তাঁকে বললাম, জন্মদাতা না হয়েও আপনি আমাকে শিশুকাল থেকে এত স্নেহ দিয়েছেন, তাই আপনি আমার যথার্থ পিতা। আমার অন্য কোনও পিতা নেই। মৃত্যুর আগে আপনাকে এই কথা বলে যাব বলেই মহারানীর কাছ থেকে এই কটি দিন ভিক্ষা করে নিয়েছি।

নির্দিষ্ট দিনে আমি রাজপ্রাসাদে ফিরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলাম। বাবা আমাকে নিভৃতে ডেকে বললেন, টিলার ওপর আমি একটি স্থান চিহ্নিত করে এসেছি, তুমি সেখানে পৌছলেই সে চিহ্ন দেখতে পাবে। ওই চিহ্নের ওপরে দাঁড়িয়ে চোখ বন্ধ করে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়বে। মনে কোন ভয় রেখ না। প্রভু আসুর দেবের ইচ্ছা হলে তুমি উদ্ধার পেলেও পেতে পার।

আমি ম্লান হেসে বললাম, একজন আমাকে ভালবেসে প্রাণ হারাবে আর আমি তাকে হারিয়েও বেঁচে থাকব এ পৃথিবীতে, সে হয় না বাবা। মৃত্যু আমার কাছে অনেক শান্তির।

বাবা বললেন, চেরিব চোখ হারিয়েও বেঁচে রয়েছে বেটি।

আমি বাবার দুটো হাত জড়িয়ে ধরে বললাম, ওই অন্ধ মানুষকে তুমি আমার মতো স্নেহের চোখে দেখ বাবা, তা হলে মরেও আমি শান্তি পাব।

বাবা বললেন, সেজন্য তুমি ভাবনা কর না। ওর প্রতিপালনের ভার তোমার বলার আগেই আমি নিয়েছি। কিন্তু তোমাকে যা বললাম তুমি সেইমতো কাজ করো।

বনের ধারে দাঁড়িয়ে রাজধানীর সমস্ত লোক চেয়ে আছে টিলার দিকে। বাবা আমার হাত ধরে টেনে তুলছেন টিলার ওপর। আমি জানি প্রাসাদ অলিন্দ থেকে মহারানী দেখছেন এ দৃশ্য। মহারাজও সপারিষদ প্রাসাদশীর্ষ থেকে এ দৃশ্য দেখছেন। আমি এও জানি তাঁর হৃদয় না চাইলেও দেশের বহু প্রচলিত আইন তিনি অমান্য করতে পারবেন না। আর আশ্চর্য! মহারানীই নাকি সপারিষদ মহারাজকে প্রাসাদশীর্ষ থেকে এ দৃশ্য দেখতে বিশেষভাবে অনুরোধ জানিয়েছেন। বাবার কাছে এ কথা শুনে আমার কেন জানি না মনে হল, মহারানী যে কোনও সূত্র থেকেই হোক আমার জন্ম সম্বন্ধে হয়ত কিছু আভাস পেয়েছেন, যে কারণে তিনি রাজাকে আমার মৃত্যু দৃশ্য দেখিয়ে তাঁর অন্তরটাকে যাচাই করে নিতে চান।

আমি একটুও ক্লান্ত না হয়ে টিলার ওপরে উঠে দাঁড়ালাম। দেখলাম টিলার প্রান্তে একটা সাদা চিহ্ন দেওয়া আছে। ধীরে ধীরে সেখানে গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে জনতার দিকে ফিরে তাকালাম। ওরা নীচ থেকে চিৎকার করে উত্তেজনায় ফেটে পড়ছিল। আমি মৃদু হাসলাম। মানুষের মৃত্যু দৃশ্য কী এতই আকর্ষণীয়! সারা অসুর রাজ্যে কী একটি হৃদয়ও নেই যে প্রেমের অমর্যাদায় আহত হয়!

আমি জন্মভূমির উদ্দেশ্যে শেষ নমস্কার জানিয়ে নদীর দিকে ফিরে চেরিবের মুখখানা স্মরণ করে চোখ বুজে ঝাঁপ দিলাম।

মনে আছে শূন্য থেকে জলের গভীরে তলিয়ে গিয়ে আবার ভেসে উঠলাম। আমার নীচের ঠোঁটে আঘাতের অসহ্য যন্ত্রণায় আমি এক সময় চেতনা হারালাম। জ্ঞান ফিরলে প্রথম অনুভব করলাম আমি কারো কোলে শুয়ে আছি। আকাশের চাঁদ দুধের মতো আলো ঝরাচ্ছে চরাচরে। নদীর স্রোত বেয়ে একটা নৌকা এগিয়ে চলেছে। আমি সেই নৌকায় শুয়ে নিরুদ্দেশের পথে চলেছি। ধীরে ধীরে যখন পূর্ণ সম্বিত ফিরে এল, তখন আমি বুঝতে পারলাম, চেরিবের কোলেই আমি মাথা রেখে শুয়ে আছি। চেরিবের চোখদুটো তখনও ওষুধের প্রলেপের ওপর বস্ত্রখণ্ড দিয়ে বাঁধা।

আমি ভুলে গেলাম আমার ক্ষতস্থানের যন্ত্রণার কথা। উঠে বসে চেরিবকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়লাম। আমার সীমাহারা আনন্দ যেন কূল ছাপিয়ে উঠল।

প্রথম উচ্ছ্বাস থামলে আমি সচেতন হয়ে তাকালাম নৌকার চালকের দিকে। এ কী! এ যে ভাস্কর চেরিবের গুরু স্বয়ং নৌকা চালিয়ে নিয়ে চলেছেন। আমি নত হয়ে তাঁকে অভিবাদন জানালাম। তিনি হেসে তাঁর প্রীতি প্রকাশ করলেন।

আমরা কোথায় চলেছি তা আমি জানি না, আর সে প্রশ্ন করার মতো মনের অবস্থা তখন ছিল না।

আমরা বনের গভীরে মূল নদী থেকে একটা খালের ভেতরে এসে ঢুকলাম। সেই খালে আলো আঁধারির ভেতর চলার পর কতক্ষণ পরে এসে পৌঁছলাম, আজকের ঠিক এই জায়গাটিতে।

আমাদের এই গুহার মুখে নামিয়ে দিয়ে চেরিবের গুরু বললেন, তোমাদের এই নিভৃত আস্তানায় কেউ কোনওদিন বিরক্ত করতে বা খোঁজ নিতে আসবে না উন্নানী। তুমি শুনেছ বিদেহী আত্মার নিবাস এই বনভূমির কথা। এখানে তোমাদের নবজন্ম, নতুন সংসার।

নৌকা থেকে বহু দরকারি জিনিস গুহায় এনে তুললেন তিনি। যাবার সময় বললেন, আমি বিশ্বাস করি না বিদেহী আত্মায়, তাই বলছি নির্ভয়ে থাক এখানে। আমি সময় সুযোগমতো এসে তোমাদের দেখে যাব। নৌকাটা রেখে গেলাম তোমাদের ব্যবহারের জন্য।

গুরু চলে গেলেন। পরে চেরিবের কাছ থেকে জানলাম, আমার বাবা আর চেরিবের গুরু পরিকল্পনা করে আমাদের উদ্ধার করেছেন। আমার পতনের স্থানে চেরিবের গুরু নৌকা নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। আর আমার বাবা পূর্বাহ্নেই নদীর ওই নির্দিষ্ট পতন স্থানটিকে খুঁড়ে গভীর জলপূর্ণ করে রেখেছিলেন। যে কারণে আহত হয়েও আমার পক্ষে বেঁচে ওঠা সম্ভব হয়েছিল।

থামল উন্নানী। আবার চরাচরব্যাপ্ত সেই নীরবতা। ঝিঁঝির ঝঙ্কার। চাঁদের স্থির, উজ্জ্বল চোখে চেয়ে থাকা।

তূর্বাণ যেন একটা স্বপ্নের দেশে বসে অলৌকিক গল্প শুনছিল, হঠাৎ গল্প শেষ হল আর সে চমকে সচেতন হয়ে উঠল।

চেরির এবার নীরবতা ভেঙে বলল, সেই থেকে আমি আর উন্নানী রয়েছি এখানে। আমার কোনও কষ্টই নেই কারণ চোখদুটো যেদিন থেকে খুইয়েছি, মানুষ দেখার প্রয়োজনও সেদিন থেকে ঘুচে গেছে। কিন্তু কষ্ট হয় উন্নানীর জন্যে। আমাকে ছাড়া দেখবার মানুষ আর তার কেউ নেই।

উন্নানী বলল, মানুষজন দেখতে না পেয়ে প্রথম প্রথম সত্যিই খুব কষ্ট হত। এখন নির্জনতায় আমি অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। বিভিন্ন কালে গাছে গাছে সাজ-বদল হয়, আমি বনের ভেতর ঘুরে ঘুরে দেখি। কত যে পাখি কত দূর দেশ থেকে উড়ে আসে তার লেখাজোকা নেই। তারা কলরবে সারাদিন বন মাতিয়ে রাখে, আমরা বসে বসে শুনি। তারা গান গায়, আমাদের প্রাণ জুড়িয়ে যায় সে গান শুনে। আবার তারা হাওয়া বদলের সঙ্গে সঙ্গে উড়ে যায়। আমাদের মন ওদের জন্যে কতদিন বিষণ্ণ হয়ে থাকে।

চেরিব বলল, উন্নানী নিজের হাতে ক্ষেত করেছে, তাতে ফসল ফলে, তাই খাবার অভাব হয় না। নদীতে প্রচুর মাছ। উন্নানী মাছ ধরে আনে। আমরা ইচ্ছে হলে বনের ভেতরে ভেতরে বহুদূর নৌকা করে বেড়িয়ে আসি। তাছাড়া অন্ধ হয়েও আমি আমার কাজ ছাড়িনি। গুরু যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন আমার কাছে গোপনে পাথর এনে দিয়েছেন। হাতে হাতুড়ি আর বাটালি ধরিয়ে দিয়ে বলেছেন, বাইরের চোখে দেখে এতকাল ছবি এঁকেছ এখন মনের ভেতরে যে চোখ আছে সেই চোখে দেখে ছবি আঁকার চেষ্টা কর। তোমার এ সৃষ্টি আজকের দিনের মানুষ বুঝবে না কিন্তু পাথরের বুকে খোদাই করা ছবি কোনওদিনই হারাবে না। একটা দিন আসবে যেদিন তুমি, আমি, এই অসুরদেশের রাজারাজড়া কেউ থাকবে না সেদিন নতুন মানুষের দল তোমার এই পাষাণ মূর্তির ভেতরে প্রাণের খেলা দেখে অবাক হয়ে যাবে।

আমি গুরুকে প্রণাম করে আমার কাজ শুরু করলাম। এখনও আমি সেই কাজই করে চলেছি এই নির্জন বনে বসে।

তুর্বাণ বলল, পাথরে খোদাই করতে আপনার অসুবিধে হয় না?

প্রথম প্রথম হত, এখন অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে। তা ছাড়া উন্নানী অনেক বিষয়ে আমাকে সাহায্য করে।

তুর্বাণ বলল, আপনার গুরুর বাক্য মিথ্যে হবে না, একদিন আপনি অমর শিল্পীর খ্যাতি পাবেন।

উন্নানী সেই জ্যোৎস্নালোকে গুহার ভেতর থেকে কতকগুলো মূর্তি বয়ে আনল। পর পর সাজিয়ে রাখল সেগুলি। একজন অন্ধ এমন নিখুঁত ভাস্কর্যের স্রষ্টা হতে পারে এ যেন ভাবনার বাইরে। তুর্বাণ দেখল, উন্নানী আকাশের বুকে কবুতর উড়িয়ে দিচ্ছে। কোনও ছবিতে উন্নানী হাঁটু ভেঙে বসে হরিণ শিশুকে আদর করছে। মায়ের একটি মূর্তি দেখা গেল। চিনতে কষ্ট হয় না উন্নানীর মুখ। শিশুকে বুকে চেপে ধরে চেয়ে আছে তার মুখের দিকে। কী অসীম মমতা মাখান রয়েছে তার মুখে। আরও কত খোদিত মূর্তি। সারাদিন যারা কাজ করে তাদের কর্মময় জীবনের ছবি।

তুর্বাণ কোথাও অসুরভূমির সেই চিরাচরিত ছবি দেখতে পেল না, যেখানে সম্রাটের গর্বিত পদক্ষেপ চারদিকের সকল বস্তুকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

উন্নানী বলল, কেমন লাগছে আপনার চেরিবের ছবিগুলো?

তুর্বাণ এতক্ষণে কথা বলল, উনি যে অন্ধ সে সত্য পৃথিবীর লোক মেনে নিলেও আমি অন্ততঃ স্বীকার করব না। ছবিকে যিনি এমন জীবন্ত করে তুলতে পারেন তিনি আমাদের চেয়েও চক্ষুষ্মান।

এরপর আরও কত নির্জন দ্বিপ্রহর আর জ্যোৎস্না ঝরা রাত কেটে গেল উন্নানী আর চেরিবের সঙ্গে গল্প করে দূরদেশের বণিক তুর্বাণের। এখন তারা অনেক নিবিড় হয়ে সরে এসেছে পরস্পরের কাছে।

এই বিদেহী আত্মার বিচরণভূমিতে গড়ে উঠল তাদের বন্ধুত্ব। তুর্বাণ পেল তার দীর্ঘশ্বাস ফেলার একটি নিভৃত স্থান আর চরম দুঃখে পরম সান্ত্বনার একটি আশ্রয়।

এদিকে রাজগৃহে তুর্বাণের সমান সমাদর। রাজার ইচ্ছায় আর রাজ পারিষদের পরিকল্পনায় তুর্বাণকে নিতে হয়েছে ভাষা শিক্ষকের ভূমিকা। রাজদূত যাবে বিভিন্ন দেশে, তাদের সেইসব দেশের ভাষা শিখিয়ে দিতে হবে।

তুর্বাণ তার কাজ করে যায়। কিন্তু প্রাণ নেই সে কাজে। মুক্তির স্বপ্ন দেখে কিন্তু সফল হওয়ার কোনও পথই সে খুঁজে পায় না।

এমনি অসুরভূমিতে বন্দি থেকে একদিন যখন তার মুক্তির সকল আশা ক্ষীণ হয়ে এল তখনই ঘটল এক ঘটনা। সে ঘটনার স্রোতে এক তরঙ্গ আবর্ত থেকে ভেসে চলল তার তরণী অন্য এক আবর্তের মুখে।

।। বারো ।।

থমথম করছে সারা প্রাসাদ। সভাসদরা চেয়ে আছে মহারাজ এসারের আরক্তিম মুখের দিকে। দূত দাঁড়িয়ে আছে খানিক দূরে মাথা নত করে।

এক সময় এসার কথা বললেন, ববেরুর সঙ্গে আমার শক্তি পরীক্ষার সময় আসন্ন। তার আগে আমি ইলামভূমি আক্রমণ করতে চাই।

প্রধান পারিষদ বললেন, কিন্তু মহারাজ ইলাম তো আপনার প্রতি কোনওরকম অসম্মান প্রকাশ করেনি। ঔদ্ধত্য প্রকাশ তো দূরের কথা।

এসার বললেন, সে কথা আমার অজানা নয়। কিন্তু যুদ্ধের রীতি সোজা পথে চলে না।

আবার অমাত্য বললেন, অপরাধ নেবেন না মহারাজ, আপনি ইলাম আক্রমণের কী অজুহাত দেবেন? ববেরুর সম্রাট আপনার দূতের কাছে আপনার দেশ সম্বন্ধে অসম্মানজনক উক্তি করেছে। আপনি ইচ্ছে করলে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করুন।

এসার বললেন, অজুহাত একটা তৈরি করে নিতে হবে। আপনারা জানেন, ইলামের গৃহবিবাদের সময় আমার পরলোকগত মহামান্য পিতা, তামারলের পক্ষ নিয়ে তাকে সিংহাসনে বসতে সাহায্য করেছিলেন। তার প্রতিদানে তামারল অসুরভূমিতে উপঢৌকন পাঠাতেন। ব্যাপারটা কোনও প্রাপ্য নয়, তা হলেও ইলাম

যে অসুরভূমিকে শক্তিশালী বলে ভাবে তার প্রমাণ ওই উপঢৌকনে। আমি জানি, তারা প্রকাশ্যে একটি কথাও উচ্চারণ করে না অসুরভূমির বিরুদ্ধে, কিন্তু যে উপঢৌকন আমাদের দিত আজ তাই দিচ্ছে ববেরুর রাজাকে। এটাকে পরোক্ষ অপমান বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

অমাত্য আবার বললেন, তা হলে মহারাজ আমাদের দূতকে আগে পাঠাতে হবে ইলাম-রাজ তামারলের কাছে। কৌশলে দাবি করতে হবে সম্মান উপঢৌকন। সামান্যতম অস্বীকৃতি জানালে আপনি তার রাজ্য আক্রমণ করতে পারেন।

এসার বললেন, তাই হবে।

অমাত্য এবার সবিনয়ে বললেন, একটি জিজ্ঞাসা মহারাজ, অপরাধ ে বেন না। ববেরু সোজাসুজি আক্রমণ না করে আপনি প্রথমে ইলাম আক্রমণ করতে যাচ্ছেন কেন?

এসার বললেন, কারণ খুব সোজা। ববেরু ইলামের চেয়ে শক্তিশালী। আমি ইলামকে শায়েস্তা করলে ববেরুরাজের মনে অসুরদের সম্বন্ধে কিছুটা ত্রাসের সঞ্চার হতে পারে। তখন ববেরু আক্রমণ করা আমাদের পক্ষে সহজ হয়ে যাবে।

ইলামরাজ তামারল মহারাজ এসারের দূতের প্রস্তাব হেসে উড়িয়ে দিয়ে বললেন, এসারের পিতা আমার উপকার করেছিলেন, তাই তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে উপঢৌকন পাঠাতাম। এসারের সঙ্গে আমার ঠিক সে সম্পর্ক নয়। এসারকে বলবেন, আমরা সমানে সমানে বন্ধুত্বে রাজি আছি, তার বেশি এক চুলও নয়।

মহারাজ এসারের বাহিনী দু ভাগে বিভক্ত হয়ে অমনি যাত্রা শুরু করল। একদল চলল ডিকলাট নদীর পথে রাজধানী অভিমুখে , অন্যদল পূর্ব-দক্ষিণের জাগ্রোস পর্যন্ত এলাকার পাশ দিয়ে। অশ্বারোহী, পদাতিক আর নৌ সৈন্যে সে এক বিপুল সমারোহ। ডিকলাট থেকে নৌ সৈন্যেরা যখন কারুণ নদীতে প্রবেশ করল তখন সন্ধ্যার আকাশ রাঙা হয়ে উঠেছে। সৈন্যেরা নদীতীরে নোঙর ফেলে রাতের বিশ্রামের আয়োজন করতে লাগল।

রাত ঘনিয়ে এল দোয়াব অঞ্চলে। চারিদিক নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে আবৃত।

হঠাৎ অন্ধকারের পর্দায় যেন ঝলকে ঝলকে আগুন এগিয়ে আসতে লাগল ধাবমান দুরন্ত অশ্বের মতো।

কারুণ নদীতে নেমে আসছে পাহাড়ি স্রোত। সেই স্রোতের মুখে ইলামবাসীরা ছেড়ে দিয়েছে ছোট ছোট নৌকা। তার ভেতর দাহ্য পদার্থে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্রোতের বেগে চালকহীন নৌকা পাক খেতে খেতে যত এগিয়ে আসতে লাগল, আগুন তত জ্বলতে লাগল দাউ দাউ করে। এক সময় নৌকায় ঘুমন্ত অসুর সৈন্যেরা পাহারাদারদের হাঁকডাকে যখন উঠে বসে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করতে লাগল তখন অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। ইলামবাসীদের জ্বলন্ত নৌকাগুলো ততক্ষণে ঢুকে পড়েছে অসুরদের বিরাট নৌবহরের ভেতর।

অন্ধকারে জলের কলরোল, আতঙ্ক-বিহ্বল মানুষের চিৎকার আর সর্বগ্রাসী আগুনের ধ্বংসলীলায় কারুণ নদীর বুকে এক নারকীয় দৃশ্যের অবতারণা হল। ভোর হলে দেখা গেল অগ্নিদগ্ধ বহু নৌকা ভেসে গেছে। কূলের কর্দমে ছড়িয়ে পড়ে আছে দগ্ধ কাষ্ঠখণ্ড আর অগণিত মানুষের মৃতদেহ।

এদিকে নৌবাহিনী পর্যুদস্ত হয়ে গেলেও স্থলপথে অশ্বারোহী বাহিনী দুর্বার গতিতে এগিয়ে আসতে লাগল ইলামের দিকে। মহারাজ এসার যখন নৌ-বাহিনীর বিপর্যয়ের কথা শুনলেন তখন রাজ্যরক্ষার জন্য সামান্যমাত্র সৈন্য রেখে স্থলপথে বাকি সৈন্যদের পাঠিয়ে দিলেন ইলামে।

তীব্র সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়ল ইলামের পাহাড় প্রান্তর নদী নালায়। এসারের দুর্ধর্ষবাহিনী মৃগয়ায় পশুবধের মতো পলায়মান ইলামবাসীদের পেছনে ধাওয়া করে তাদের নৃশংসভাবে হত্যা করতে লাগল।

কয়েক দিনের ভেতরেই ইলামের রাজধানী পরিণত হল মহাশ্মশানে। পথে প্রান্তরে শুধু দেখা গেল

শবের স্তূপ। কৃষিভূমিতে ছড়িয়ে দেওয়া হল ক্ষার। বপন করা হল কন্টকবৃক্ষ। তারপর সৈন্যেরা যখন ফিরে চলল তখন তাদের সঙ্গে গেল ইলামের রাজপরিবারের অনেকেই। অগণিত দাসদাসী, অশ্ব, গর্দভ, সর্বশ্রেণীর কারিগর।

মহারাজ এসার প্রাসাদ থেকে নগরীর পথে বিজয় মহোৎসবে যাত্রার জন্য রথে আরোহণ করতে যাচ্ছেন এমন সময় সেখানে অশ্বপৃষ্ঠে এসে দাঁড়াল ইলামের বন্দী দুই রাজকুমার। পিতা তামারল যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন। তাঁর দুই পুত্র টিউতাকি আর সূত্রক এল বন্দী হয়ে। ধীরে ধীরে তাদের পাশে এসে জড়ো হল রাজপরিবারের আরও অনেকে।

মহারাজ এসার আদেশ করলেন, এই উৎসবে রণদেবী ইস্‌তারের উদ্দেশ্যে ইলামের রাজপরিবারের রক্ত নিবেদন করা হোক।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ইঙ্গিতে জহ্লাদেরা ইলামের রাজপরিবারের মানুষদের ধরে নিয়ে গেল দেবী ইস্‌তারের সামনে। জীবন্ত ছাড়িয়ে নিল গাত্রচর্ম। তারপর টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে দিল তাদের মাংস পথ-কুক্কুরদের ভোজনের জন্য।

দয়ালু রাজা এসার কিন্তু দুজন রাজকুমারকে হত্যার আদেশ দিলেন না। তিনি তাদের হাতের বাঁধন খুলে দিতে বললেন। রথের চালককে ইংগিত করলেন, রথ থেকে অশ্ব খুলে নিয়ে দুজনকে জুড়ে দিতে। এবার চালক তাঁর নির্দেশে ঘন ঘন করতে লাগল কশাঘাত। মনুষ্যবাহিত রথ গড়িয়ে চলল রাজপথে অগণিত উৎসবমুখর জনতার মাঝ দিয়ে। নতনেত্র ঘর্মাক্ত কলেবরে ইলামের রাজকুমারের স্কন্ধ আর কটিদেশে আবদ্ধ রথরজ্জু আকর্ষণ করতে করতে নিয়ে চলল এসারের রথ।

স্তম্ভিত তুর্বাণ। এই অভাবিত দৃশ্যে তার সম্বিত লুপ্ত হবার উপক্রম হল। সে অতি কষ্টে নিজেকে জনতার দৃষ্টির অগোচরে সরিয়ে নিয়ে গেল।

তুর্বাণ ছুটে চলল উন্নানী আর চেরিবের কাছে। এই মুহূর্তে একটু শান্তি চাই তার। মুক্ত হাওয়া বুক ভরে টেনে নেবার একটা স্থান।

চেরিব আর উন্নানী তুর্বাণের মুখে শুনল রাজ্য জুড়ে নারকীয় বিজয় উৎসবের বর্ণনা।

চেরিব বলল, অসুরভূমির পাপের ভার পূর্ণ হয়েছে। এবার তার পতন আসন্ন হয়ে উঠবে। দেশের পর দেশ জয় করে অসুরভূমির যোদ্ধারা যত অত্যাচার চালাবে, পরাজিত মানুষেরা তত সংঘবদ্ধ হবার সুযোগ পাবে। তারপর একদিন তাদের সম্মিলিত ক্রোধ আগুন হয়ে জ্বালিয়ে দেবে অসুরভূমিকে। ধ্বংস হবে নগরী, ছারখার হয়ে যাবে সমস্ত দেশ। আমার মন বলছে তুর্বাণ, তার আর বেশি দেরি নেই।

তুর্বাণ বলল, আমার ভাগ্য জড়িয়ে পড়ল তোমাদের দেশের সঙ্গে চেরিব। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে আমার নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছে। যত মুক্তির আশা দূরে চলে যাচ্ছে ততই যেন আমি অসুস্থ হয়ে পড়ছি। বিশ্বাস কর উন্নানী, অসুরভূমিতে সকালে চোখ মেলে যখন সূর্যের দিকে তাকাই তখন মনে হয় একটা দগদগে ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরছে।

হঠাৎ উন্নানী বলল, তোমাকে যদি অসুরভূমি থেকে ববেরুর কাছ পর্যন্ত এগিয়ে দিই তাহলে তুমি কী সেখান থেকে দেশে ফিরে যাবার কোনও পথ করতে পারবে?

তুর্বাণ বলল, আমাদের দেশ থেকে সমুদ্রপথে বণিকেরা অনেক সময় বাণিজ্য দ্রব্য নিয়ে আসে সুসা অথবা ববেরুতে। যদি তাদের দেখা পাই তা হলে দেশে ফেরা আমার সহজ হয়ে যাবে।

হঠাৎ তুর্বাণ ভাবনার গভীরে ডুবে গেল। কতক্ষণ পরে মুখ তুলল যখন, তখন অন্য এক ভাবনার ছবি ফুটে উঠেছে তার মুখে।

উন্নানী বলল, কী ভাবছিলে তুর্বাণ?

তুর্বাণ মাথা নেড়ে বলল, ববেরুতে গেলেও সমুদ্রপথে ফেরা আর হয়ে উঠবে না।

চেরিব বলল, কেন? এই যে বললে তোমাদের দেশ থেকে বণিকেরা ববেরুতে যাওয়া আসা করে পণ্য নিয়ে।

তুর্বাণ বলল, আমি স্থলপথেই এসেছি, আমাকে যেতেও হবে স্থলপথে।

উন্নানীর প্রশ্ন, তুমি তো আর পণ্য নিয়ে ব্যবসা করতে করতে যাবে না। তা হলে এত দূর দুর্গম, বিপদসঙ্কুল স্থলপথে ফেরার কী দরকার?

হাসল তুর্বাণ। বেলা শেষের বিষণ্ণ আলোর মতো সে হাসি। বলল, বণিকের কাছে সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু তার পণ্য, আর প্রেমিকের কাছে তার প্রেম। আমি বৃত্তিতে বণিক, কিন্তু ভালবাসার ছোঁয়ায় আমার হৃদয় সোনা হয়ে গেছে। একটু থেমে বলল, পথে এক পাহাড়ের গুহায় আমার প্রেমের সোনাকে ফেলে রেখে আসতে হয়েছে, তারই সন্ধানে আমাকে সমস্ত বিপদ মাথায় নিয়েও স্থলপথে ফিরে যেতে হবে।

উন্নানীর কণ্ঠে বিস্ময়, তোমার জীবনের সেই পরম অধ্যায়ের কথা তো কোনওদিন বলনি বন্ধু!

তুর্বাণ বলল, সে এক আকস্মিক পাওয়া আর হঠাৎ হারানোর কাহিনী। সেই হারানো রত্নের খোঁজেই আমাকে ফিরে যেতে হবে।

চেরিব বলল, প্রেমের কাহিনী শোনাতে কোনও বাধা থাকলে নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে পীড়াপীড়ি করব না তুর্বাণ।

এ কথা কেন বন্ধু? গাঢ় হল তুর্বাণের কণ্ঠস্বর, সম্পূর্ণ অপরিচিত এক বিদেশীর কাছে উন্নানী মেয়ে হয়েও যদি বলতে পারে তার ভালবাসার কথা, তাহলে আমারই বা বলতে বাধা কোথায়?

সামান্য সময় বিরতির পর শুরু করল তুর্বাণ তার ভালবাসার কাহিনী। বিস্তৃত নয়, সংক্ষেপে বলে গেল হারিরুদ নদীতীরে পর্বতের গুহায় তার আর উর্বীর গোপন মিলনের কথা।

মহেঞ্জোদড়ো থেকে সার্থবাহ দলের সঙ্গে আসছিলাম ববেরুর দিকে। ইরাণভূমির কাছে পড়লাম মরু ঝঞ্ঝার মাঝে। একটা প্রবল বায়ুর তাড়নায় দলভ্রষ্ট হয়ে প্রায় উড়ে এসে পড়লাম এক পাহাড়ের গায়ে। চেতনা হারিয়েছিলাম। কিন্তু যখন চেতনা ফিরল তখন দেখি, আমি একা নই, আমার দিকে চেয়ে বসে আছে, এক রহস্যময়ী নারী। চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছিল চরাচর, কিন্তু আমি শুয়েছিলাম একটা গুহার ভেতর। আর সেই মেয়েটি নীরবে তার সেবায় আমাকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করে চলেছিল।

পরদিন প্রভাত হল। গুহার এক ছিদ্রপথে দেখা গেল, পাহাড়ের অনেক নীচে নদীতীরে জন-বসতি। মেয়েরা দল বেঁধে জল নিতে চলেছে নদী তীরের অরণ্য-পথ দিয়ে। পুরুষেরা কর্মরত। এ এক সম্পূর্ণ অন্য জগৎ, ভিন্ন মানুষ।

ধীরে ধীরে পরিচয় হল মেয়েটির সঙ্গে। ভাষার বাধা দূর হল এক সময়। জানতে পারলাম স্বজনদের কাছ থেকে দুরে পাহাড়ের এই গুহায় তার অবস্থানের কারণ।

কৌতূহলী চেরিব বলল, কী কারণ বন্ধু?

তুর্বাণ বলল, মেয়েটির নাম উর্বী। সে আর্য সম্প্রদায়ের মেয়ে। কিন্তু দুর্ভাগ্য তার, পায়ে দুরারোগ্য এক ক্ষত নিয়ে সে স্বজনদের দ্বারা পরিত্যক্ত। তার বাবা আর্য সম্প্রদায়ের এক যাজ্ঞিক। তাকে নিঃসঙ্গ রাখা হয়েছিল এই গুহায়। প্রতিদিন সে পাহাড় বেয়ে কিছু নীচে নেমে গিয়ে তার জন্যে রক্ষিত খাবার বয়ে আনত।

সেখানে সম্পূর্ণ নির্জনে লোকদৃষ্টির আড়ালে আমাদের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হল, আর তার ফলে একদিন জানতে পারলাম, উর্বী সন্তানসম্ভবা। কিন্তু সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার আগেই আমাকে চলে আসতে হল সেখান থেকে।

উন্নানী বলল, কেন বন্ধু?

উর্বীর ওই ব্যাধির চিকিৎসক ঋভু ছিলেন কর্মব্যপদেশে বাইরে। হঠাৎ তাঁর ফিরে আসার খবর পেয়েই উর্বী সচেতন হয়ে উঠল। তার চিকিৎসা শুরু হলে সবই তো জানাজানি হয়ে যাবে, তখন বিদেশী তুর্বাণকে স্বজনদের হাত থেকে রক্ষা করা উর্বীর পক্ষে দায় হয়ে উঠবে। তাই উর্বী নিজেই বিদায় জানালে তার প্রিয় সহচর তুর্বাণকে। কিন্তু তুর্বাণ কী ভুলতে পারে তার উর্বীকে? তাই সব বিপদকে তুচ্ছ করে আজ আমাকে ফিরে যেতে হবে তার কাছে। উর্বী আজ একা নয় উন্নানী, আমাদের দুজনের ভালবাসার সৃষ্টিকে সে লালন

করছে আমারই কথা স্মরণ করে।

থামল তুর্বাণ। এক সময়ে উন্নানীর দিকে চেয়ে বলল, দেখ পৃথিবী জুড়ে মানুষের আচার ব্যবহার রীতি নীতি আর স্বভাবের মধ্যে কত ভেদ, কিন্তু এক জায়গায় তাদের আশ্চর্য মিল। ভালবাসার ক্ষেত্রে সারা দুনিয়ায় কোন ভেদ নেই। পাহাড়ের গুহায় আমার আর উর্বীর ভালবাসা, অসুরভূমির এই অরণ্যে চেরিব আর উন্নানীর ভালবাসা একাকার হয়ে গেছে। ভাগ্য বিচ্ছিন্ন না করলে আমরা কেউ কাউকে ফেলে দূরে সরে থাকতে পারব না।

চেরিব বলল, তোমার কথা চন্দ্র সূর্যের মতো সত্য বন্ধু।

তুর্বাণের কণ্ঠে আবেগ, তাই আমি সব বিপদের বোঝা মাথায় নিয়ে ফিরে যেতে চাই আমার উর্বীর কাছে। সমস্ত কাজের মাঝে আমার মন পড়ে আছে সেখানে, যে পাহাড়ের গুহায় আমি আমার উর্বীকে ফেলে রেখে এসেছি।

উন্নানী বলল, তা হলে ববেরুর দিকে নেমে গিয়ে তোমার কোনও লাভই হবে না। তুমি তো চলবে উত্তর-পূর্বে, ডানদিকে লবণ-মরুকে এড়িয়ে। কিন্তু এখন ওদিকে স্থলপথে যাত্রা করতে গেলেই তুমি ধরা পড়বে বন্ধু। অসুরভূমির চারিদিকে যুদ্ধের সময় খুব হুঁশিয়ার পাহারা।

তুর্বাণ বলল, তাই আমি এখন সুযোগ থাকলে ববেরুতেই চলে যেতে চাই। মোট কথা অসুরভূমি আমার বুকের ওপর যেন পাষাণ ভারের মতো চেপে আছে।

উন্নানী বলল, সুযোগ থাকলে আমিও চলে যেতাম কোথাও, কিন্তু আমার অন্ধ চেরিবকে নিয়ে সম্পূর্ণ অপরিচিত জায়গায় শুধু ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়া জীবন-ধারণের আর কোনও উপায়ই থাকবে না। তার চেয়ে লোকালয়ের বাইরে এই অরণ্যে বাস আমার কাছে অনেক শান্তি আর সুখের।

চেরিব একেবারে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বলল, উন্নানী, তুমি তুর্বাণের ববেরু যাবার ব্যাপারে কীভাবে সাহায্য করতে পারবে?

উন্নানী একটুখানি ভেবে নিয়ে বলল, আমার ভাবনা তোমাকে নিয়ে। নৌকায় তুমি থাকলে অসুরভূমির লোকেরা তোমাকে চিনে ফেলবে, তখন ভেঙে যাবে আমাদের সমস্ত গোপন পরিকল্পনা। প্রাণ নিয়ে পালান দায় হয়ে উঠবে।

চেবির বলল, কিন্তু তুমি এই বন থেকে যখন ডিকলাট নদীর স্রোতে গিয়ে পড়বে তখন আর এই বনের আড়াল থাকবে না। সেখানে তোমাদের মুখোমুখি হতে হবে অসুর দেশের মানুষের সঙ্গে। তোমাকে তারা না চিনতে পারে কিন্তু বিদেশী বলে তুর্বাণ তাদের চোখে ধুলো দিতে পারবে না।

উন্নানী বলল, কথাটা ঠিক, কিন্তু আমি এখান থেকে বেরোব এক সন্ধ্যার আবছায়ায়। পরিচিত খাল পেরিয়ে যেতে আমার অসুবিধে হবে না। এমন হিসেব করে বেরোতে হবে যখন ডিকলাট নদীতে পড়ে আমি চন্দ্রোদয় দেখতে পাব। তারপর অনুকূল স্রোতে তীর বেগে ছুটে চলবে আমার নৌকা। ভোরের আগেই আমি পেরিয়ে যেতে পারব অসুর ভূমির সীমারেখা। ফেরার পথে অবগুণ্ঠন তুলে কেউ আমাকে প্রশ্ন করবে না, আমি কে? কিন্তু ববেরুর কাছাকাছি দোয়াবে পৌঁছতে আমার পুরো সাতটি দিন লাগবে, আর স্রোত ঠেলে ফিরতে কম করে আরও পাঁচ দিন বেশি লাগবে। তোমাকে এতগুলো দিন একা ফেলে যাই কী করে, এটাই আমার একমাত্র সমস্যা।

চেরিব বলল, এটা এমন কোনও সমস্যা নয়। ধর একদিন তুমি যদি আমার আগে এ দুনিয়া ছেড়ে চলে যাও তখন যে কটি দিন পাবি এই অন্ধকারের জগতে আমাকে একাই তো চলতে হবে। আমি অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি অন্ধকারের ভেতর চলতে। তুমি নিশ্চিন্তে যাও, আমি এ কয়েকটা দিন ঠিক কাটিয়ে দিতে পারব। হিংস্র জন্তু নেই এ বনে। আর তা ছাড়া জন্তুর চেয়েও হিংস্র মানুষদের কাছ থেকে যখন দূরে রয়েছি তখন এর চেয়ে নিশ্চিন্ত আশ্রয় আর কী হতে পারে।

অনেক গণনার পর স্থির হল সামনের পাঁচটি দিন বাদ দিয়ে ষষ্ঠ দিন সন্ধ্যায় যাত্রার শুভলগ্ন।

এদিকে প্রাসাদে ফিরে এসে তুর্বাণ জানতে পারল, মহারাজ এসারের লোক তার খোঁজ করে ফিরে

গেছে। তুর্বাণ চিন্তিত হল, কিছু পরিমাণে শঙ্কিতও। সে কালবিলম্ব না করে মহারাজের বিশ্রামকক্ষের দিকে যাত্রা করল।

অপরাহ্নে বিজয় মহোৎসব থেকে ফিরে মহারাজ এসার বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। রক্ষী ভেতরে গিয়ে তুর্বাণের আগমন-সংবাদ ঘোষণা করল।

কিছুক্ষণের ভেতর তুর্বাণকে নিয়ে যাওয়া হল কক্ষের অভ্যন্তরে। রক্ষী তুর্বাণকে পৌঁছে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল।

মহারাজ এসার অর্ধশায়িত অবস্থায় বসেছিলেন ধাতুনির্মিত আসনে. হাতলে কেশরযুক্ত দুটি সিংহের মুখ। রক্তবর্ণের পাথর বসান আছে ধাতুনির্মিত সিংহের অক্ষিকোটরে। মনে হচ্ছে ও দুটি মহারাজ এসারের পোষা সিংহ। সামান্য ইঙ্গিতেই ঝাঁপিয়ে পড়ে অবাঞ্ছিত ব্যাক্তির কণ্ঠনালী বিদীর্ণ করে দেবে।

মহারাজের দেহ যেমন ছিল তেমনি স্থির হয়ে রইল। শুধু চোখদুটো নিবদ্ধ হল তুর্বাণের মুখের ওপর।

কোথায় ছিলে তুমি?

তুর্বাণ চমকে উঠল। কী জানতে চান এসার ? নিষিদ্ধ স্থানে আত্মগোপনের কোন সংবাদ কী পেয়েছেন তিনি!

ভাবনার সময় ছিল না তুর্বাণের। সে বলল, জনতার ভেতর থেকে বিজয় মহোৎসব দেখছিলাম মহারাজ।

তেমনি স্থির অনুত্তেজিত গলায় এসার বললেন, কেমন লাগল উৎসবের পরিকল্পনা?

তুর্বাণ একটি বিষয়ে আশ্বস্ত হল, তার অরণ্যে আত্মগোপনের ব্যাপারে মহারাজ কোনওরূপ সন্দেহ পোষণ করেননি। সে চোখে মুখে উদ্দীপনার ছবি ফুটিয়ে বলল, অসাধারণ মহারাজ। আমাদের সমস্ত কল্পনাকে ছাড়িয়ে গেছে মহারাজের পরিকল্পনা।

একজন বিদেশীর মুখে এ ধরনের প্রশংসাবাক্য শুনে মহারাজ এসার সোজা হয়ে বসলেন। আবার বললেন, ইলামের দ্বি-পদ দুটো ঘোড়াকে আমার রথ টেনে নিয়ে যেতে দেখেছ?

তেমনি উৎসাহে তুর্বাণ বলল, দেখেছি মহারাজ। পথের দু'ধারের জনতা আপনার রথ আর ওই দ্বিপদ অশ্বদুটিকে দেখে উল্লাসে ফেটে পড়ছিল।

মহারাজ বললেন, ফেরার পথে ওই দুটি নর-অশ্বের একটি মারা পড়ল।

বুকে তীব্র যন্ত্রণা নিয়ে তুর্বাণ বলল, মহারাজ প্রত্যাবর্তন -দৃশ্যটি দেখার সৌভাগ্য আমার আর হয়নি। আমি তৃষ্ণার্ত হয়ে জলপানের জন্য প্রাসাদে আমার কক্ষে চলে এসেছিলাম।

হ্যাঁ, তাই যখন তোমাকে খোঁজা হয় তখন পাওয়া যায়নি।

তুর্বাণ বিনীতভাবে বলল, কি আদেশ মহারাজ?

এসার বললেন, দু'ভায়ের একজন রথ টানতে না পেরে পথের ওপর লুটিয়ে পড়ল। চালক চাবুক চালিয়েও তাকে ওঠাতে পারল না। ততক্ষণে তার আত্মা আমাদের অসুরভূমি ছেড়ে চলে গেছে। মরার সময় সে নিজের জিভটা নিজের দাঁতের চাপেই কেটে ফেলেছিল। আমি অন্য ভাইটাকে রথ থেকে মুক্ত করে দিলাম। আর ঠিক সে সময়েই তোমাকে আমার দরকার পড়ছিল।

কী দরকার মহারাজ?

মহারাজ এসার যেন কেউ না শোনে, এমন এক ভঙ্গি করে বললেন, আমি চাই না, ইলামের দ্বিতীয় অশ্বটা মারা পড়ুক। তাকে বাঁচিয়ে রেখে তার মুখ থেকে বের করে নিতে হবে ববেরু সম্বন্ধে কিছু তথ্য। কারণ ইলামের সঙ্গে কিছুকাল ধরে ববেরু বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। সাধারণ চরের মুখে যে খবর পাওয়া যাবে তার চেয়ে অনেক দামি খবর মিলবে ইলামের রাজপরিবারের লোকের মুখ থেকে।

এই প্রথম এসার অশ্ব নামে অভিহিত না করে রাজপরিবারের লোক বলে মুখ দিয়ে উচ্চারণ করলেন। একটু থেমে আবার বললেন, ওই জীবিত ঘোড়াটাকে দানাপানি খাওয়ানোর ভার তোমার ওপর দিতে চাই। তুমি ওর সঙ্গে থাকবে। রাতে দরকার হলে ওর পাশের শয্যাতেই শোবে। আসল কথা, বন্ধুত্বের অভিনয়

করে যাবে। তোমাকে যেন ও একমাত্র বিশ্বস্ত বন্ধু বলে মনে করে, এমন অভিনয় করবে। তবেই সম্ভব হবে ওর কাছ থেকে ববেরু সম্বন্ধে গোপন তথ্য সংগ্রহ করা।

একটা আলোর ঝিলিক যেন তুর্বাণের চোখের ওপর খেলে গেল। সে মাথা নত করে বলল, মহারাজ অসাধারণ আপনার রাজনীতিজ্ঞান। আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করব।

মহারাজ এসার আপন মনে বলে উঠলেন, ববেরু, ববেরু। তারপর একেবারে মিশর পর্যন্ত চলবে এসারের বিজয়রথ। সারা দুনিয়া হবে অসুর সম্রাটের পদানত।

কে কে?

অন্ধকারে আর্ত চীৎকারের মত শোনাল।

আমি তোমার বন্ধু রাজকুমার। আমার থেকে তোমার কোনও ভয় নেই।

অন্ধকারে এবার প্রার্থনা, তুমি যে-ই হও, দয়া কর। একটু জল দাও।

তুর্বাণ ঘরের একমাত্র গবাক্ষের ওপর রাখা ভৃঙ্গারটি নিয়ে এল। ইলামের রাজকুমার নিঃশেষ করে ফেলল ভৃঙ্গারের সবটুকু জল। তুর্বাণ বড় মমতায় গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

একটা বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এসে অন্ধকার কক্ষের হাওয়াকে ভারী করে তুলল।

তুর্বাণ হাত সরিয়ে নিয়ে বলল, তোমার সারা শরীরে আগুনের দাহ। আমি তোমার পাশে জেগে রইলাম বন্ধু, তুমি যে কোনও প্রয়োজনেই আমাকে পাবে।

রাজকুমারের ভাঙা ভাঙা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, এক ঝাঁক তীর আমার শরীরে কে যেন গেঁথে দিয়ে গেছে। যন্ত্রণায় আমি কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলছি।

তুর্বাণ কোমল গলায় সান্ত্বনা দিয়ে বলল, শ্রান্তিতে তুমি অসুস্থ হয়ে পড়েছ। কোন ভয় নেই, নিরুদ্বেগে নিদ্রা যাও। বিশ্রামে তোমার জ্বরের উপশম হবে।

সারা রাত জেগে ইলামের অসুস্থ রাজকুমারের সেবা করে গেল তুর্বাণ। অত্যাচার, অপমান আর আতঙ্কে বিহ্বল রাজকুমার অসংলগ্ন বাক্য উচ্চারণ করতে লাগল। শেষ রাতে তুর্বাণের নিরন্তর সেবায় তন্দ্রা নামল রাজকুমারের চোখে। পরদিন অপরাহ্নের আগে চোখ মেলে তাকাল না।

তুর্বাণ দেখল নিদ্রার পর রাজকুমারের দেহের উত্তাপ অনেক কমে গেছে। উঠে বসল ইলামের রাজপুত্র। তুর্বাণকে সে এই প্রথম দিনের আলোয় দেখল। তুর্বাণের মুখের দিকে চেয়ে রইল কতক্ষণ। যেন একটা পরম সান্ত্বনার আশ্রয় খুঁজে পেল সে তুর্বাণের চোখের দৃষ্টিতে।

তুর্বাণ প্রস্তুত রেখেছিল খাবার। যত্ন করে খাওয়াল আহত রাজকুমারকে।

ধীরে ধীরে অনুকূল হাওয়ার ছোঁয়া পেয়ে সুস্থ হয়ে উঠল রাজপুত্র।

গভীর রাতে যখন প্রাসাদ মৃত্যুপুরীর মতো স্তব্ধ তখন চাপা গলায় তুর্বাণ বলল, কি নাম তোমার বন্ধু?

সূত্রক।

আমাকে তুমি তুর্বাণ বলে ডেকো।

সূত্রক বলল, তোমাকে দেখে আমার সাগর পারের বণিকদের কথা বার বার মনে হচ্ছিল।

তোমার অনুমান মিথ্যে নয়। তুমি আমাদেরই সম্প্রদায়ের লোকজনদের দেখে থাকবে সুসা নগরীতে। আমি স্থলপথে বাণিজ্য করতে এসেছিলাম, এখন জড়িয়ে পড়েছি ভাগ্যের ঘূর্ণাবর্তে।

সূত্রক জানতে চাইল, তোমাকে আমার পরিচর্যায় নিযুক্ত করার কারণ কী রাজা এসারের?

আমি তোমার দেশের ভাষা জানি বলে। তা ছাড়া আরও একটা উদ্দেশ্য আছে।

কি উদ্দেশ্য? অবশ্য যদি কোনওরকম বাধা না থাকে বলতে।

কোনও বাধা নেই। এসার চান আমার মাধ্যমে তোমার কাছ থেকে ববেরুর কিছু খবর পেতে। যাতে তাঁর পরবর্তী অভিযানের পথটা কিছু পরিমাণে প্রশস্ত হয়।

হাসল সূত্রক। বলল, নির্বোধ। প্রাণ গেলেও বন্ধু রাষ্ট্রের গোপন সংবাদ কেউ কি কখনও শত্রুর হাতে

তুলে দিতে পারে?

তুর্বাণ বলল, আমাকে ভুল বুঝে বোসো না বন্ধু! আমি তোমার কাছ থেকে কোনও খবরই পেতে চাই না। কেবল এসারের নির্মমতা থেকে তোমাকে যদি কোনও রকমে নিষ্কৃতি দিতে পারি সেই ইচ্ছা মনে রেখে তোমার কাছে এসেছি।

সূত্রকের গলা ভারী হয়ে উঠল, আমি মৃত্যুর পথে পা বাড়িয়ে রয়েছি। আজ হোক্ কাল হোক্ শয়তান এসার আমাকে হত্যা করবেই। আর সে হত্যা হবে অতি নিষ্ঠুর পদ্ধতিতে। আমার অগ্রজ সহ্য করতে পারেননি অপমানের জ্বালা। তাই নিজের জিহ্বা দংশন করে বিদীর্ণ বক্ষে চিরশান্তি লাভ করেছেন। আমি প্রস্তুত হয়েই ছিলাম, কিন্তু তোমার মুখ দেখে আবার এ পৃথিবীকে ভালবাসতে ইচ্ছে করছে। মনে হচ্ছে আরও কিছুকাল বুক ভরে এ দুনিয়ার হাওয়া টেনে নিই।

তুর্বাণ বলল, মুক্তির একটা পরিকল্পনা আমি ছকে রেখেছি। যদি তা সফল হয় তা হলে কেবল আমি বাঁচব না, তুমিও বাঁচবে।

সূত্রক কোন কিছু বুঝতে না পেরে চেয়ে আছে দেখে তুর্বাণ বলল, প্রস্তুত থেকো, সময় হলে দুজনেই পালাব।

অবাক হল সূত্রক। বলল, নরখাদকের হিংস্র নখর এড়িয়ে মুক্তি পাবে, এ আশা তুমি কী করে করতে পারলে তুর্বাণ!

মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত জীবনের আশা রাখতে ক্ষতি কী বন্ধু। আমাদের বুদ্ধি আর অভিজ্ঞতার বাইরেও এমন ঘটনা ঘটে যায় যার ব্যাখ্যা কোনও রকমেই দেওয়া যায় না।

এদিকে প্রতিদিন মহারাজ এসারকে নানারকম মিথ্যা তথ্য দিয়ে তার বিশেষ বিশ্বাসভাজন হয়ে উঠল তুর্বাণ।

ওদিকে উন্নানী আর চেরিবের কাছে গিয়ে সূত্রককে নিয়ে একইসঙ্গে যাত্রার ব্যবস্থা পাকা করে এল।

অন্ধকার পথে পালাচ্ছে দুজনে। অনভ্যস্ত পথে বার বার পড়ে যাচ্ছে সূত্রক। তার হাত ধরে তুলে ধরছে তুর্বাণ, আবার ছুটে চলেছে বন লক্ষ করে। নিজেদের পায়ের শব্দে নিজেরা মাঝে মাঝে ভীত হয়ে পেছনে তাকাচ্ছে। কেউ পেছু নিল নাকি!

ওরা এসে পৌঁছল বনের ভেতর। হাঁপাচ্ছিল দুজনে। উন্নানী বলল, অনেক দেরি হয়ে গেছে বন্ধু, নৌকাতেই বিশ্রাম নিও।

তুর্বাণ একবার শুধু জড়িয়ে ধরল চেরিবকে। বলল, তোমাকে নিঃসঙ্গ ফেলে যাচ্ছি চেরিব। শুধু সকলের যিনি রক্ষক, তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাই, তিনি তোমাকে রক্ষা করুন।

চেরিব বলল, আমি আজ বড় গর্বিত তুর্বাণ। আমার উন্নানী মানুষের মুক্তির জন্য সমস্ত বিপদের ঝুঁকি নিয়েও এগিয়ে চলেছে।

ওরা চেরিবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নৌকায় উঠল। অন্ধকারে দেখা গেল একটি ছায়ামূর্তি গুহার মুখে হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে। উন্নানীর দাঁড়ের ঘায়ে বন চিরে নৌকা তরতর্ করে এগিয়ে চলল।

ডিকলাট নদীর বুকে গিয়ে একসময় যেন আছড়ে পড়ল ছোট নৌকাখানা। বনের সীমারেখা শেষ হয়ে গেল। চাঁদ উঠল দূর পাহাড়ের মাথায়।

নিপুণ হাতে দাঁড় টানতে লাগল উন্নানী আর হাল ধরে বসে রইল তুর্বাণ। যৌবনের ভরা স্রোতে উল্কার মতো ছুটে চলল উন্নানীর নৌকা।

রাতে হাত বদল করল তুর্বাণ আর উন্নানী। তুর্বাণকে দাঁড় টানতে দেখে সূত্রক এগিয়ে গেল। বলল, আমাকে দাও, আমিও কিছুক্ষণ টানি।

তুর্বাণ বলল, রাজবাড়ির ছেলে, পারবে কেন দাঁড় টানতে?

সূত্রক বলল, ঘোড়ার বদলে যদি রথ টেনে নিয়ে যেতে পারি তা হলে দাঁড় টানতেই বা পারব না কেন?

উন্নানী বলল, অসুরভূমির হয়ে ইলামের যুবরাজের কাছে আমি মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি। যে পাপ মহারাজ এসার করেছেন তার প্রায়শ্চিত্ত করতে দিন। আপনাকে নির্বিঘ্নে পৌঁছে দিতে পারলে আমি মনের দিকে থেকে কিছুটা শান্তি পাব।

সূত্রক বলল, এ অপরাধ কারো নয় বোন, এ আমাদের ভাগ্য। রাজপরিবারে জন্ম নেওয়াই একটা অভিশাপ। পথের ভিক্ষাজীবী পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সম্রাটের চেয়েও সুখী। কারো ধন সে কেড়ে নেয় না। নিজের ভাঙা পাত্র ছেঁড়া পোশাকটুকু খোয়াবার ভয়ও তার নেই। উদার আকাশ, অজস্র আলোহাওয়া, গাছের ছায়া, নদীর জল, পথপ্রান্তর তার সাম্রাজ্য। সেখানে তার অধিকারকে কেড়ে নিতে শাণিত অস্ত্র উঁচিয়ে কেউ ছুটে আসে না।

তুর্বাণ উন্নানীর দিকে চেয়ে বলল, কিছু মনে কর না উন্নানী, আজ সূত্রকের কাছে আমি একটি সত্য প্রকাশ করতে চাই।

উন্নানী বলল, স্বচ্ছন্দে। তুমি আমাদের বন্ধু, তোমার যে কোন কথা বলারই অধিকার আছে।

তুর্বাণ সূত্রকের দিকে তাকিয়ে বলল, আশ্চর্য ভাগ্যের খেলা। আমি মহেঞ্জোদড়ো নগরীর প্রধান শ্রেষ্ঠীর পুত্র হয়েও ভাগ্যবিড়ম্বিত পথচারী। তুমি ইলামের রাজকুমার হয়েও ভাগ্যচক্রে রাজ্যহারা। আর ওই যে হাল ধরে বসে আছে উন্নানী, ওর জীবনের ইতিহাস আরও জটিল। পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী সম্রাটের কন্যা হয়েও সে আজ অরণ্যবাসী।

সূত্রক বলল, আশ্চর্য, আমাদের তিনজনের ভাগ্যই দেখছি একই সূত্রে বাঁধা। কিন্তু উন্নানী সম্বন্ধে যা বললে তাতে আমার কৌতূহল বেড়ে গেল তুর্বাণ। উন্নানী যদি কিছু মনে না করেন তা হলে তাঁর সম্বন্ধে আরও কিছু আমি জানতে চাই।

তুর্বাণ তখন উন্নানীর জীবনের সকল কাহিনী বলে গেল।

সব শোনা শেষ হলে সূত্রক বলল, যে আকাশে অন্ধকার ঘনায়, সে আকাশের বুকেই দেখা যায় আলোর খেলা। উন্নানীর কাহিনী শুনে আমার তাই মনে হচ্ছে আজ। অসুরভূমির ওপর যে ক্ষোভ আর ঘৃণা জমে উঠেছিল তা এই মুহূর্তে মুছে দিলেন উন্নানী।

রাতে বিশ্রাম হল না কারও। জ্যোৎস্নায় দোয়াব প্লাবিত। মাঝে মাঝে নদীতীরে অস্পষ্ট জনবসতির চিহ্ন। কোথাও বা ছোট ছোট খাল আর নালা থেকে গর্জন করে জলস্রোত এসে পড়ছে ডিকলাটের বুকে। জ্যোৎস্নার আলোয় রাতের নদীতে মাছ ধরছে ধীবর। তাদের নৌকাগুলি এখন নোঙর করে আছে তীরে। জলস্রোতে নৌকাগুলো দুলছে, আর তার থেকে শব্দ উঠছে ছলাৎ ছলাৎ।

ভোরের আগেই ওরা পেরিয়ে গেল অসুর রাজ্যের সীমা। ভোর হলে দেখা গেল এক ঝাঁক পাখি উড়ে আসছে জনবসতির দিক থেকে। তারা ওদের নৌকার ওপর দিয়ে উড়ে নদী পেরিয়ে চলে গেল। সবুজ সবুজ সবুজ। দোয়াবে দিগন্তজোড়া সবুজের ঢেউ। লোকালয়ে ডুমুরের গাছ, আঙুরের ক্ষেত দেখা যাচ্ছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে কোমরে হাত দিয়ে চেয়ে আছে নৌকার দিকে। ক্ষেতিকার ফসলের ক্ষেতে কাজ শুরু করে দিয়েছে।

তুর্বাণ বলল, কী শান্ত আর নিশ্চিন্ত জীবন এই সাধারণ মানুষগুলির। এরা রাজ্যের ভাঙাগড়া নিয়ে কোনও দিনই মাথা ঘামায় না।

সূত্রক বলল, অভিশপ্ত না হলে রাজগৃহের সন্তান হয়ে কেউ জন্মায় না তুর্বাণ।

উন্নানী হালের চালনায় নৌকার মাথাটা একটুখানি ঘুরিয়ে দিয়ে বলল, এখন আমাদের নৌকা চলবে নদীর বাঁ দিকে ঘেঁষে। কারণ ডানদিকে ঘন হয়ে উঠেছে জনবসতি। মনে হয় কোনও একটি নগরের কাছাকাছি আমরা এসে পড়েছি। আমি চাই না, কৌতূহলী মানুষের দৃষ্টি আমাদের দিকে আকৃষ্ট হোক। মহারাজ এসারের চর শত্রুমিত্র সকল রাজ্যেই ছড়িয়ে আছে। তারা সংবাদটা রাজার কানে তুলে দিলে আমার ঘরে ফেরার পথ একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে।

তুর্বাণ বলল, তোমার কথাগুলো যুক্তিযুক্ত। আত্মরক্ষার জন্য সর্বদিক থেকে সাবধানতা অবলম্বন করাই

বুদ্ধিমানের কাজ।

একটু থেমে বলল, এখন চারদিকে মহারাজ এসারের অশ্বারোহীরা আমাদের দুজনকে খুঁজে ফিরছে। তারা অবাক হয়ে ভাবছে, তাদের প্রখর দৃষ্টি আর রাত্রিদিন পাহারার আড়ালে পালাবার পথ কোথায়।

উন্নানীর অনুমান সঠিক ছিল। প্রবল স্রোতের টানে ওরা সপ্তম দিনে পৌঁছে গেল ববেরুর সোজাসুজি ডিকলাটের একটা শাখা নদীতে। ওই শাখা নদী থেকে নেমে দোয়াবের তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তর পার হয়ে গেলেই পাওয়া যাবে পরাট্রু নদী। তার তীরে সমৃদ্ধ নগর ববেরু।

সন্ধ্যায় ওরা এসে পৌঁছল ওদের নির্দিষ্ট জায়গায়। এখান থেকে ফিরে হ'বে উন্নানী। স্রোত ঠেলে যেতে একা উন্নানীকে অনেক যুদ্ধ করতে হবে। তুর্বাণ আর সূত্রকের মুখে কথা নেই। তারা ভাবছে উন্নানীর নিরাপদে চেরিবের কাছে ফিরে যাবার কথা। উন্নানী কিন্তু সমান ক্ষিপ্র। এত পথ নৌ চালনা করেও যেন তার ক্লান্তি নেই। কৌতুকে, কথায়, গানে সে ভরিয়ে রেখেছিল সারা পথ। এখন রাতের খাবার আয়োজনে ব্যস্ত। রাতে অন্ধকার নদীর স্রোত ঠেলে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই ভোর রাতের অপেক্ষায় থাকতে হবে সবাইকে। উন্নানী যাবে নদীপথে, আর ওরা ধরবে স্থলপথ। এখন এই রাতটুকুর নিবিড় সান্নিধ্য।

এ রাতে আর কারো চোখে ঘুম নেই। আসন্ন বিদায়ের কথা ভেবে ভারী হয়ে উঠেছে তিনটি হৃদয়।

উন্নানী বলল, তুর্বাণ, তোমার হাতে বাঁধা মনোরম একটি সূত্র আমার চোখে পড়েছে, ওটার বিষয়ে প্রশ্ন করব বলে আর করা হয়নি। এ রকম একটি সূত্র হাতে বেঁধে রাখা কী তোমাদের দেশের রীতি?

তুর্বাণ একবার সূত্রটি হাত দিয়ে স্পর্শ করে বলল, এটি মঙ্গল-সূত্র। বাণিজ্য যাত্রার পূর্বে দলপতির হাতে এই মঙ্গল-সূত্র পরিয়ে দেওয়া হয়। যাত্রার পূর্বরাত্রে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় নগর নটীর গৃহে। সেখানে সারারাত চলে নৃত্য, গীত আর ভোজন। শেষ রাতে নির্জন এক ঘরে নিয়ে গিয়ে নগরনটী হাতে বেঁধে দেয় এই সূত্র। বলে, যেখানেই থাক এই বাঁধন শিথিল হবে না। আমারই টানে সব বিপদ বাধা কাটিয়ে তুমি সুস্থ দেহমন নিয়ে ফিরে আসবে নগরীতে।

উন্নানী বলল, হয়তো এই মঙ্গল সূত্রের অলৌকিক ক্ষমতার বলেই এত বিপর্যয়ের মাঝেও তুমি অক্ষত রয়ে গেছ। চমৎকার পরিকল্পনা।

তুর্বাণ বলল, আমরা মনে প্রাণে তাই বিশ্বাস করি উন্নানী।

তুর্বাণের চোখের ওপর মুহূর্তে ভেসে উঠল তরুণী নগরনটী আন্দ্রার ছবি। সে রাতে আন্দ্রা তাকে নাচে গানে বিহুল করে তুলেছিল। গভীর রাতে বন্ধুরা চলে গেলে নিয়ম রক্ষার জন্য তাকে থেকে যেতে হয়েছিল আন্দ্রার ঘরে। লীলাবতী আন্দ্রার নীরব আমন্ত্রণে সিন্ধুর বান ডেকে উঠেছিল তার রক্তে। সে পলাতকা আন্দ্রার আঁচল ধরে টেনেছিল। কিন্তু ধরা দেযনি আন্দ্রা। ফিরে দাঁড়িয়ে একটা ব্যথার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল, নগরী ছেড়ে চলে যাবার সময়ে মন হারাতে নেই তুর্বাণ। ফিরে এসে একদিন তুমি যখন এ নগরীর প্রধান হবে তখন তোমার জন্যে রাতের প্রদীপ জ্বেলে প্রতীক্ষায় বসে থাকবে আন্দ্রা। সেদিন আমার সব আকুতি তোমার পায়ে ঢেলে দেব।

উন্নানীর কথায় ধ্যান ভাঙল তুর্বাণের। উন্নানী প্রশ্ন করছিল সূত্রককে, আপনি অন্ধকারের মতো নীরবে বসে কী ভাবছেন সূত্রক?

ম্লান একটা হাসির রেখা ফুটে উঠল সূত্রকের মুখে। বলল, ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবছি উন্নানী। ভাবছি তুর্বাণের সঙ্গে ববেরুতে গিয়ে কোনও লাভ নেই।

তুর্বাণ বলল, তোমার তো তেমনি পরিকল্পনাই ছিল সূত্রক। তুমি তো ববেরুতে তোমার বন্ধু রাজকুমারের কাছেই যেতে চেয়েছিলে?

সূত্রক বলল, প্রথমে সে রকম একটা ইচ্ছা মনের মধ্যে ছিল তুর্বাণ, কিন্তু এখন নানারকম চিন্তা এসে মাথায় ভিড় করছে। আমার বন্ধু আর ববেরুর রাজকুমার নয়, পিতার মৃত্যুর পর সেই এখন ববেরুর সিংহাসনে বসেছে।

তুর্বাণ বলল, তাহলে তো তোমার অবশ্যই বন্ধুর সঙ্গে দেখা করা উচিত। বন্ধুর পিতা তোমাকে যতটুকু সাহায্য করতেন এখন তার চেয়ে অনেক বেশি সাহায্য তুমি বন্ধুর কাছ থেকে পাবে।

আবার ম্লান হাসি ফুটে উঠল সূত্রকের মুখে। সে হাসি কেউ দেখতে পেল না। সূত্রক বলল, সমানে সমানে বন্ধুত্ব হয় তুর্বাণ। ইলামের রাজকুমারের সঙ্গে ববেরুতে যুবরাজের বন্ধুত্ব হয়েছিল এক সময়, কিন্তু নিঃস্ব গৃহহীন এক পথচারী তা বলে ববেরুর সম্রাটের মিত্রতা কামনা করতে পারে না।

তুর্বাণ বলল, বন্ধুকে আমরা বন্ধু বলেই জানি। তার সুখ দুঃখের সমান অংশভাগী বলেই নিজেদের মনে করি।

রাজায় রাজায় বন্ধুত্ব অতি সূক্ষ্ম সুতোয় বাঁধা তুর্বাণ। স্বার্থে সামান্য টান পড়লেই সেই সুতো ছিঁড়ে যায়।

একটু থেমে সূত্রক আবার বলতে লাগল, প্রথমে নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে বন্ধুর সাহায্য চাইব ভেবেছিলাম কিন্তু এখন ভাবছি, কেনই বা ও আমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে। অসুর সম্রাটের শক্তির কথা ওর অজানা নয়, আর ইলামের পরাভবের খবর ও অনেক আগেই জেনেছে। এ অবস্থায় সম্পূর্ণ নিজের শক্তির ওপর নির্ভর করে শুধু বন্ধুত্বের খাতিরে ববেরুর রাজা যুদ্ধে নামবে এটা একমাত্র মূর্খ ছাড়া কেউ কল্পনা করবে না।

উন্নানী বলল, সূত্রক ঠিকই অনুমান করেছেন। সাহায্য করা তো দূরের কথা, এসময় বন্ধুত্ব স্বীকার করতেও ববেরুরাজ কুণ্ঠিত হবেন।

সূত্রক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তাই আমি ববেরু যাবার পরিকল্পনা ত্যাগ করেছি তুর্বাণ।

কিন্তু বন্ধু তুমি তা হলে এখন কোথায় যেতে চাও?

নিজের দেশে তুর্বাণ। যে দেশকে অসুর সৈন্যরা শ্মশান করে দিয়ে গেছে, সেই দেশের হতভাগ্য মানুষগুলোর পাশে আমি দাঁড়াতে চাই। তাদের সঙ্ঘবদ্ধ করে আমি ভবিষ্যতে কোনওদিন সম্রাট এসারের মুখোমুখি দাঁড়াবার চেষ্টা করব।

উন্নানী উদ্দীপ্ত হয়ে বলল, বন্ধু সূত্রক, আপনার এ পরিকল্পনায় আমার আন্তরিক সমর্থন রইল জানবেন।

সূত্রক বলল, শুধু একটি প্রার্থনা আছে তোমার কাছে তুর্বাণ।

প্রার্থনা কেন বন্ধু, বল, দাবি আছে বন্ধুর কাছে।

সূত্রক অন্ধকারের ভেতর হাত ধরল তুর্বাণের। বলল, তোমাদের মতো আমাব জীবনেও একটি কথা আছে, সেই কথা আগে আমাকে বলতে দাও। তাবপর আমাকে সাহায্য করার কথা ভেবে দেখ।

তুর্বাণ বলল, তোমার কথা শোনার আগেই আমি আমার ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে তোমাকে সাহায্য করার জন্যে আমার হাত বাড়িয়ে দিলাম।

সূত্রক বলল, ববেরুতে আমার না যাবার আরও একটি কারণ আছে। ববেরুতে বর্তমান মহারাজের ভগ্নীর সঙ্গে এক সময় আমার কিছু ঘনিষ্ঠতার সুযোগ ঘটেছিল। ইলাম আর ববেরু দীর্ঘ দিন ধরে পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করে এক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তখন উভয় পক্ষই মিত্রতার কথা চিন্তা করতে থাকে। আমার পিতা সেই মিত্রতার পথ প্রশস্ত করেছিলেন। সেই থেকে ববেরু আর ইলামের রাজ পরিবারের ভেতর যাতায়াত শুরু হল। এতকালের বৈরীভাব কেটে গিয়ে অন্তরঙ্গতা দ্রুত বৃদ্ধি পেল। আমি পিতার সঙ্গে ববেরুর এক উৎসবে যোগ দিতে গিয়ে বর্তমান মহারাজের সঙ্গে বন্ধুত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হই। সে সময়ে বর্তমান মহারাজ দুক্সিমের ভগ্নী বেলদিনা আমার পিতৃদেবের খুব সেবাযত্ন করেছিল। সেইসূত্রে বেলদিনার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। পরে ইলামের এক উৎসবে পিতৃদেব ভাইবোন দুজনকেই আমন্ত্রণ করে আনেন। আমাদের রাজ পরিবারের মেয়েদের সঙ্গে বেলদিনা প্রাসাদ-অলিন্দে দাঁড়িয়ে আমার দিকে চেয়ে হাত নাড়তো। আমি ওর অনুরাগের ছোঁয়ায় উদ্দীপ্ত হতাম।

এক সময় শিকার করতে গিয়ে দুক্সিম দ্রুত ধাবমান একটা হরিণকে তীর বিদ্ধ করে। সেই তীরসহ

হরিণটা খানিক দূরে ছুটে গিয়ে কয়েকটি গাছের আড়ালে গা ঢাকা দেয়। আমার ঘোড়া ছুটিয়ে ওই জায়গার কাছে গিয়ে দেখি বিহ্বল হয়ে চেয়ে আছে একটা বাচ্চা হরিণ। লোকজন এসে হরিণটাকে লতাগুল্ম দিয়ে বেঁধে ফেলল। ততক্ষণে হরিণটা মারা গেছে। আমি বাচ্চাটাকে একা ওই হিংস্র জন্তুভরা বনে রাখতে চাইলাম না। আমার মনে হয়েছিল বাণ খেয়েও মা হরিণটা তার বাচ্চাকে একবার দেখার জন্যে ছুটেছিল। শিকারের শেষে বাচ্চাটাকে রথে করে প্রাসাদে নিয়ে এলাম।

সব ঘটনা শুনে বেলদিনার চোখে জল গড়াল। সে হরিণ শিশুটিকে চুমু খেয়ে আদর করতে লাগল।

সেই রাতেই ঘটনাটা ঘটল। বাইরে জ্যোৎস্না, প্রাসাদ নিঝুম। মাঝ রাতে সবাই ঘুমে অচেতন। আমার শয়নকক্ষের দ্বারে মৃদু করাঘাত শোনা গেল। আমি উঠে গিয়ে দ্বার খুলে দি ই দেখি, আমার বোনের হাত ধরে মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে বেলদিনা।

একটু বিস্মিত হয়েই বললাম, এত রাতে— ঘুম নেই, কী ব্যাপার?

আমার বোন বেলদিনাকে ঘরের ভেতর ঠেলে দিয়ে বলল, ব্যাপারটা শোন ওর মুখ থেকে। একটু পরে এসে ওকে নিয়ে যাব।

বলেই বাইরের থেকে দরজা বন্ধ করে দিলে। আমি তার চলে যাবার আওয়াজ পেলাম।

বেলদিনা তেমনি মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি বললাম, অবাক করলে বেলদিনা। রাতের ঘুম ফেলে আমার ঘরে এলে!

বেলদিনা মুখ তুলল। কক্ষ বাতায়ন পথে যেটুকু চাঁদের আলো এসে পড়েছিল তাতে দেখলাম, বেলদিনার চোখে মুখে করুণ বিষণ্ণতার ছায়া। সে বলল, বিশ্বাস করুন, আমি ঘুমোতে পারিনি।

মৃদু হেসে বললাম, মনে হচ্ছে তোমার ঘুম না হওয়ার জন্যে আমিই দায়ী। তাই প্রতিবাদ জানাতে এসেছ।

বেলদিনা একটা কিছু উত্তর দেবার জন্যে তৈরি হচ্ছিল, আমি হঠাৎ বেলদিনার হাত ধরে ওকে আমার শয্যায় ওপর নিয়ে এসে বসালাম।

বেলদিনা এবার আমার মুখের দিকে চেয়ে বলল, কথাটা মিথ্যে নয়। আপনিই আমার ঘুম কেড়ে নিয়েছেন।

একটু বুঝিয়ে বল বেলদিনা। দোহাই তোমার, হেঁয়ালি কর না।

বেলদিনা কান্নাভেজা গলায় অনুযোগের সুর তুলে বলল, কেন আপনি ওই হরিণ শিশুটিকে নিয়ে এলেন প্রাসাদে? ও ওর মাকে হারিয়ে কী রকম যেন অসহায় হয়ে পড়েছে। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকা যায় না। ও কেবল ওর মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমি ওর কষ্টের কথা ভেবে ঘুমোতে পারছি না। ববেরু ফিরে গেলেও ওর কথা ভেবে আমার ঘুম আসবে না।

বললাম, অসহায় জীবটিকে তা হলে সঙ্গে নিয়ে যাও।

ওর মুখখানা উল্লসিত হয়ে উঠল। বলল, দেবেন আমাকে?

হেসে বললাম, দেব, তবে কেবল দান নয়, প্রতিদান চাই।

বেলদিনা সাগ্রহে বলল, কী দেব বলুন?

বললাম, ওই হরিণ শিশু ভাগ্যবান, সে তোমার পুরো হৃদয় কেড়ে নিয়েছে। ওকে হিংসে করতে ইচ্ছে হয়। যদি ওর ভাগের থেকে সামান্য একটুখানি কেড়ে নিয়ে এই অভাজনকে দাও তাহলে হরিণের অধিকারটা ছেড়ে দিই।

বেলদিনা বলল, আপনি যা চাইছেন তা এমন কিছু মূল্যবান বস্তু নয়। তবুও যদি সেই সামান্য জিনিস নিতে চান তা হলে বলি, হৃদয় দিয়ে তো দূরে সরে থাকা যায় না।

বললাম, দূরে থাকবে কেন বেলদিনা, এ রাজগৃহের দৈন্য যদি তোমাকে পীড়িত না করে তাহলে এর দ্বার তোমার জন্য সব সময় খোলা থাকবে। আর তোমাকে উত্তপ্ত অভ্যর্থনা জানাবার জন্য প্রস্তুত থাকবে আমার এ দুটি বাহু।

সে রাতে আমার বাহুর বাঁধনে ধরা দিয়েছিল ববেরু রাজকন্যা বেলদিনা। আর ঠিক সেই সমর্পণের মুহূর্তে বাইরে করাঘাত করে আমাদের বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল আমার বোন।

ববেরুতে ফিরে যাবার আগে আমাদের গোপন সাক্ষাৎকার হয়েছে কয়েকবার। কিন্তু আমি এমন কোনও কাজ করিনি যাতে আমার প্রিয় অতিথির অসম্মান হয়। এক রাতে আমরা নিবিড় সান্নিধ্যে বসে গল্প করেছিলাম, বেলাদিনা বলল, তোমার সংযম দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি সূত্রক।

হেসে বললাম, আমাকে কী খুব সংযমী বলে মনে হচ্ছে তোমার? বরং বলতে পার আমি হিসেবি। ভবিষ্যতের সঞ্চয়ের কথা ভেবে আমি বুঝে সুঝে ভোগ করার পক্ষপাতী। কোন কিছুকে এত সহজে ফুরিয়ে যেতে দিতে নেই।

বেলদিনা আমার হাতখানা ওর দুটো হাতের ভেতর চেপে ধরে বলল, আমি আজ নিশ্চিন্ত হলাম সূত্রক। কোনওদিন তোমাকে হারানোর দুঃখ আমায় সইতে হবে না।

বললাম, এতখানি ভরসা কী করে পেলে বেলদিনা?

ও বলল, এতখানি সংযমের ছবি আর যে কোথাও দেখিনি।

বললাম, এত অভিজ্ঞতা হল তোমার কী করে?

বেলদিনা বলল, আমাদের ববেরুর প্রাসাদের যে সব সুন্দরী মেয়েকে বিভিন্ন দেশ থেকে সংগ্রহ করে আনা হয় তাদের নির্বিচারে প্রতিদিনের ভোজ্যবস্তুর মতো ভোগ করে রাজপুরুষেরা। জীবনে সংযমের যে একটা শ্রী আছে তা তারা কোনওদিনই ভেবে দেখার প্রয়োজন বোধ করে না। তাই তোমার এ সংযম আমার চোখে অনেক বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। তোমার কাছে আসা মানে এমন একটি পুরুষের কাছে আসা যে জীবনে প্রথম একটি নারীকে গ্রহণ করার জন্যে তার দুটো বলিষ্ঠ বাহু বাড়িয়ে দিয়েছে। বিশ্বাস কর সূত্রক এমন একটি পুরুষ কোন রাজপরিবারে রয়েছে, এ আমরা যেন ভাবতেও পারি না।

বললাম, তোমার ও দুটো চোখের ভেতর দিয়ে আমি আজ নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করলাম বেলদিনা।

ও বলল, আমি তোমার জন্যে প্রতীক্ষা করে থাকব সূত্রক। তুমি আমার একমাত্র পুরুষ, যাকে আমি আমার হৃদয় দিয়েছি। যত দীর্ঘ দিনই প্রতীক্ষা করে থাকতে হোক না কেন, এ হৃদয় আর কাউকে আমি দিতে পারব না।

বললাম, ইলাম থেকে ববেরুর রাজকুমারীর পাণিপ্রার্থনা করে অবিলম্বেই দূত যাবে।

কিন্তু উন্নানী, আমি আমার কথা রাখতে পারিনি। বেলদিনা চলে যাবার পর আমার প্রায় প্রতিটি রাত্রি বিনিদ্র কেটেছে। তার স্পর্শ, তার হাসি, তার লজ্জা, আবার বাক্যালাপের মোহিনী চাতুর্য আমি প্রতি মুহূর্তে স্মরণ করতে লাগলাম। মনে মনে শঙ্কা দেখা দিল, যদি ইলামের রাজ পরিবারের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন ববেরুরাজ! দুই পরিবারে বন্ধুত্ব বজায় রেখেও নানান অজুহাত দেখিয়ে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা অসম্ভব নয়। তখন কী মহারাজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বেলদিনা তার মনের কথা মুখ ফুটে বলতে পারবে?

কিছুদিনের ভেতরেই একটা দুঃসংবাদ এল। ববেরুর মহারাজ অকস্মাৎ পরলোক গমন করেছেন। আর ববেরুর নিয়ম অনুযায়ী প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যুবরাজ দুক্‌সিম ববেরুর আরাধ্য দেবতা 'বেল-মারদুকের' হাত ধরে সিংহাসনে আরোহণ করেছেন। মহারাজের মৃত্যু আর দুক্‌সিমের সিংহাসন লাভ এত দ্রুত হল যে, রাজ্যাভিষেকের নিমন্ত্রণ যথাসময়ে বন্ধু রাষ্ট্রে পৌঁছল না। পরে দূত মারফৎ সব খবর পাওয়া গেল।

এদিকে ববেরুতে নিযুক্ত ইলামের দূতের মুখে একটি মর্মান্তিক সংবাদ পেলাম। নতুন রাজা দুক্‌সিম দূত পাঠিয়েছেন মিশরে। তিনি মিশরের মিত্রতা প্রার্থনা করেন।

এতে আমার আঘাত পাবার অথবা বিচলিত হবার কোনও কারণ ছিল না। কিন্তু ওর সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি খবর ছিল। দুক্‌সিম নাকি মিশরের ফারায়োকে জানিয়েছেন. তিনি মিশরের একটি কন্যাকে দু দেশের মৈত্রীর নিদর্শনস্বরূপ বধূরূপে পেতে চান, আর তার পরিবর্তে ফারায়োর হাতে সমর্পণ করতে চান

আপন ভগ্নী বেলদিনাকে।

আমি খবরটা শুনে একেবারে ভেঙে পড়লাম। আমার ভগ্ন হৃদয়ের খবর একমাত্র বোন ছাড়া কেউ জানল না। আমি দূতকে নিভৃতে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, মিশরের ফারায়ো কী রাজি হবেন দুক্সিমের প্রস্তাবে? আমি তো যতদূর জানি মিশরের ফারায়োরা অন্য রাজ্যের মেয়েদের গ্রহণ করলেও মিশরের রাজপরিবারের মেয়েদের বাইরের কোনও রাজ্যে পাঠান না। সেদিক থেকে দুক্সিমের আবেদন নামঞ্জুর হবার সম্ভাবনা বেশি। আর দুক্সিম যেমন একরোখা, তাতে তার প্রস্তাব মঞ্জুর না হলে নিশ্চয়ই অপমান মাথায় বয়ে সে তার বোনকে উপহারস্বরূপ পাঠাবে না মিশর রাজের কাছে।

দূতকে কথাগুলো বলে নিজের মনে বেশ খানিক সান্ত্বনা পেলাম। কিন্তু পরক্ষণেই দূত আর একটি সংবাদ দিলে।

সে বলল, আপনার কথা ঠিক, কিন্তু ইতিমধ্যে পরিস্থিতির কিছু বদল হয়েছে।

বললাম, কী রকম?

দূত বলল, আপনি জানেন, নেসিয়রা মিশরের ফারায়োদের সঙ্গে বহুদিন ধরে যুদ্ধে লিপ্ত আছে। সমতলে ফারায়োদের সঙ্গে যেমন যুদ্ধে এঁটে ওঠা ভার, তেমনি দুর্গম পাহাড় ডিঙিয়ে নেসিয়দের দুর্ভেদ্য দুর্গগুলি অধিকার করাও অসম্ভব। তাই মাঝে মাঝে খণ্ডযুদ্ধ চলে দুপক্ষের। হারজিতের কোন স্থির থাকে না। ইতিমধ্যে নেসিয়রা একটি কৌশল অবলম্বন করেছে। বলতে পারেন এই কৌশলে তারা কিছু পরিমাণে লাভবানও হয়েছে।

বললাম কী রকম?

দূত বলল, মিশর থেকে মিত্তানিদের দেশ পর্যন্ত যতগুলো রাজ্য আছে, তাদের অস্ত্রশস্ত্র আর দামি ঘোড়ার যোগান দিয়ে মিশরের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছে নেসিয়রা।

বললাম, এ ব্যাপারের-সঙ্গে মিশরের মেয়েদের বিবাহসূত্রে বাইরে পাঠবার সম্পর্ক কী?

দূত বলল, মিত্তানিদের রাজা নেসিয়দের কথা না শুনে ফারায়োর সঙ্গে খাতির জমাতে গিয়েছিলেন, তার ফল ফলেছে উল্টো। মিত্তানি-রাজার বিরুদ্ধে নেসিয়রা তাঁর প্রজাদের ক্ষেপিয়ে তুলল। আমি শুনে এসেছি রাজার রাজ্য গেছে। প্রজাদের মনোনীত সুতর্ণ নামে এক ব্যক্তি নতুন রাজা নির্বাচিত হয়ে সিংহাসনে বসেছেন। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার , নেসিয়দের সম্রাট সুবিলুইলু তাঁর মেয়েকে নতুন রাজার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে সম্পর্কটা পাকাপাকি করে নিয়েছেন। তাই বলছিলাম যুবরাজ, ফারায়ো হয়তো এসব দেখে শুনে মহারাজ দুক্সিমের প্রস্তাবে রাজি হয়ে যেতে পারেন। এ সময় তিনি ববেরুর মিত্রতার প্রস্তাব নিশ্চয়ই প্রত্যাখ্যান করবেন না।

দূতের কথা শুনে আমি গভীর হতাশার ভেতর পড়লাম কিন্তু তখন আমার দিক থেকে কোনও কিছু করবার ছিল না। আমি দুক্সিমের কাছে বেলদিনার পাণি প্রার্থনা করে দূত পাঠাতে পারতাম, কিন্তু তাতে অপমান ছাড়া আমার ভাগ্যে আর কিছু জুটত না।

আমি যখন জীবনের এমনি এক অভাবিত পরিস্থিতির ভেতর পড়ে নিজের মন্দ ভাগ্যের কথা চিন্তা করছি, তখনই আমার সমস্ত ভাবনার মেঘকে ছিঁড়ে খুঁড়ে উড়িয়ে দিয়ে নেমে এল প্রবল এক ঝড়। সে ঝড়ের ঘূর্ণিতে ঘুরতে ঘুরতে আমার কী পরিণতি হল তা তোমরা জান। কারুণ নদীর বুকে আমি মহারাজ এসারের নৌবাহিনীর সলিল সমাধি ঘটিয়েছিলাম। কিন্তু জলযুদ্ধের পরে রাজধানীতে ফিরে গিয়ে দেখি অসুর রাজের দুর্জয় অশ্বারোহীরা নগর ঘিরে ফেলেছে। যুদ্ধ করেছিলাম প্রাণের মায়া ত্যাগ করে কিন্তু সব খুইয়ে এখন শুধু প্রাণে বেঁচে রয়েছি। বিশ্বাস কর বন্ধু, রাজ্য হারিয়ে আমি যত না দুঃখ পেয়েছি, আমার ভালবাসার জনকে হারিয়ে মনে প্রাণে তার চেয়ে অনেক বেশি বিধ্বস্ত হয়ে গেছি। তোমার সঙ্গ পেয়ে ভাবছিলাম, একটিবার ববেরুতে যাব। যদি বেলদিনা এখনও মিশরে না গিয়ে থাকে তা হলে একবার তাকে চোখের দেখা দেখে আসব। কিন্তু এখন ভাবছি, কী হবে গিয়ে। ভাগ্যহীন মানুষ সবার চোখেই বড় ছোট হয়ে যায়। বেলদিনা যদি কোনওদিন আমাকে সে দৃষ্টিতে দেখে তা হলে আমার দাঁড়াবার আর কোনও

আশ্রয় থাকবে না। তার চেয়ে আমার ভালবাসার পাত্রী বেলদিনার স্বপ্ন দেখে যাব। রাজ্য হারিয়েও সেই হবে আমার একমাত্র সান্ত্বনা।

থামল সূত্রক। উন্নানী বলল, আপনার মতো পুরুষকে পেলে বেলদিনা ধন্য হয়ে যেত।

অন্ধকারে ম্লান একটা হাসির রেখা ফুটে উঠল সূত্রকের মুখে। সে বলল, উন্নানী, সকল পুরুষ যদি চেরিবের মতো ভাগ্যবান হত তাহলে পৃথিবী প্রেমের রাজ্য হয়ে যেত। আজ অন্ধ, সমাজ সংসার বিচ্যুত চেরিবও তোমাকে কাছে পেয়ে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট, উন্নানী।

তুর্বাণ বলল, তোমার অভিমান আমি বুঝেছি বন্ধু। নিজের মর্যাদায় পুনরায় প্রতিষ্ঠিত না হয়ে তুমি ভিখারীর মতো ববেরুতে বেলদিনার প্রেমের প্রার্থী হয়ে যেতে চাও না।

ঠিক তাই তুর্বাণ। তুমি শুধু আমাকে একটুখানি দয়া কর। যদি সামান্য কোন সুযোগ পাও তা হলে বেলদিনাকে বল, মৃত্যুর আগে পর্যন্ত সূত্রক তার প্রেমের প্রথম ও শেষ নারী বেলদিনাকে ভুলবে না।

তুর্বাণ সূত্রকের হাত জড়িয়ে ধরে বলল, একেবারে অসম্ভব না হলে তোমার কথা আমি রক্ষা করব বন্ধু।

পূব আকাশে জ্বল জ্বল করছে একটি তারা। নদীর বুক ছুঁয়ে বয়ে আসছে বাতাস। একটা হিমশীতল স্পর্শ গায়ে এসে লাগছে। কারো মুখে কথা নেই। তিনজনে নিজের ভাবনার জগতে ডুবে আছে।

নিস্তব্ধতা প্রথম ভঙ্গ করল উন্নানী, আপনাকে আমি আরও দক্ষিণে কিছু পথ এগিয়ে দিয়ে আসতে পারি।

সূত্রক বলল, তার আর দরকার হবে না বোন। এ সব পথ আমার অচেনা নয়। আপনার সাহায্যের কথা আমাদের হৃদয়ে গাঁথা হয়ে রইল। যদি কোনওদিন আবার মুখোমুখি হই তা হলে সেদিনটিকে ভাবব আমার জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ দিন। কারণ আপনি আমার সবচেয়ে দুঃখের দিনের সান্ত্বনা।

তুর্বাণ বলল, আজ এই মুহূর্তে আমার চেরিবের মহত্ত্বের কথা মনে হচ্ছে। সে তার একমাত্র অবলম্বনকেও মানুষের উপকারের জন্য নিঃস্বার্থভাবে ছেড়ে দিতে দ্বিধা করেনি। তাকে বোলো, চক্ষুষ্মান যে আলোর সন্ধান পায় না, চেরিব তার অন্তরে সে আলোর স্পর্শ পেয়েছে।

উন্নানী বলল, সূত্রক, আমার দেশের মানুষ আপনার যে ক্ষতি করেছে তা কোনওদিনই পূরণ হবে না। আমি যদি আপনাকে সামান্য কিছু সাহায্য করে থাকি তা হলে সেটা হবে অসুরভূমির পাপের যৎকিঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত।

সূত্রক এই প্রথম উন্নানীর দুখানা হাত নিজের হাতের ভেতর ধরে নিয়ে বলল, আমি আমার রাজ্য, পিতা, ভ্রাতা, আত্মীয়, বন্ধু সকলকে হারিয়েছি। কিন্তু সবচেয়ে আঘাত পেয়েছিলাম আমার বড় আদরের বোনকে হারিয়ে। তুমি আজ আমার সেই বোনকে হারানোর দুঃখ ভুলিয়ে দিলে।

উন্নানী বলল, যেখানেই থাকি, আমি আপনার জীবনের শান্তি আর প্রতিষ্ঠার জন্য দেবাদিদেব আসুরের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে যাব।

তুর্বাণের হাত ধরে উন্নানী বলল, বন্ধু কত দেশের কত বিচিত্র গল্প তুমি আমাদের শুনিয়েছ। আমাদের নির্জন অরণ্যবাসকে তুমি ভরিয়ে তুলেছিলে তোমার উত্তপ্ত ভালবাসা দিয়ে। সারা জীবন তোমার স্মৃতি আমাদের দুজনের কাছে সম্পদ হয়ে থাকবে।

ফিরে যাবার সময় সূত্রক আর তুর্বাণ উন্নানীর নৌকাটাকে তীর থেকে জলের দিকে ঠেলে দিলে। উন্নানী দাঁড় হাতে নিয়ে বলল, আমরা এই মুহূর্তে দুঃখ করব না। ভাবব, যা পেয়েছি তার তুলনা নেই। বিদায় বন্ধু বিদায়।

দূর থেকে মনে হচ্ছে নীল একটা মেঘের পাহাড় রোদ্দুরের সোনালি জলে স্নান করে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। আরও কাছে গেলে দেখা গেল, বিচ্ছিন্ন মেঘের স্তূপ। গা থেকে পিছলে পড়ছে মধ্যাহ্নের আলো।

তুর্বাণ একেবারে কাছে এসে দেখল, ববেরু স্বপ্নের নগরী। সারা প্রাসাদের দেওয়াল জুড়ে পোড়া ইঁটের ওপর চিক্কণ পালিশ। সম্পূর্ণ প্রাসাদ নীল রঙের পালিশে উজ্জ্বল। মাঝে মাঝে সাদা কালো হলুদ আর বাদামী রঙের বিচিত্র নক্সায় সমৃদ্ধ। দেওয়ালের গায়ে গতিশীল অশ্ব, হরিণ আর সিংহের ভাস্কর্য। এমন বৈভব যে মনের মধ্যে অদ্ভুত এক বিস্ময় জাগিয়ে তোলে।

তুর্বাণ দেখল, ববেরুর প্রশস্ত পথের ওপর দিয়ে একদল অশ্বারোহী চলে গেল। তাদের কাঁধে ধনু, তূণীরে পক্ষযুক্ত তীর। মাথায় শিরস্ত্রাণ আর সর্বদেহ চিত্রিত পোশাকে নিবিড় ভাবে আবৃত।

রাজপ্রাসাদে জনসমাগম। কর্মব্যপদেশে যাতায়াত চলেছে। একদিকে জলাশয়। সারি সারি খর্জুর বৃক্ষ। পথিকেরা চলেছে নগরীর পথে। উজ্জ্বল পোশাক। মনে হল নগরবাসীরা সমৃদ্ধির মধ্যে দিনযাপন করে।

প্রাসাদের সামনে প্রান্তর। তার দুদিকে দুটি দুর্গ-গৃহ। অদূরে নদী প্রাসাদকে সুরক্ষিত করে বয়ে চলে গেছে। পারাপারের নৌকা আছে। প্রাসাদরক্ষীরাই যাত্রী পারাপার করে। সন্দেহজনক ব্যক্তি ওই নদী তীরেই রক্ষীদের দ্বারা ধৃত হয়। তুর্বাণকেও পেরিয়ে আসতে হয়েছে পুরাট্টুর ওই শাখা নদীটি। সে বিদেশী বণিক। তার কোমরে বাঁধা থলেতে মূল্যবান সব পাথর। তাকে প্রাসাদে যেতে তাই বাধা দেওয়া হয়নি।

তুর্বাণ দেখল, সামনে প্রাসাদ, প্রান্তর, দুর্গ আর জলাশয়। কিন্তু রাজপথ এই স্থানগুলিকে স্পর্শ করে প্রাসাদের পশ্চাৎ দিকে চলে গেছে। তুর্বাণ প্রাসাদের পশ্চাদ্ভাগে গিয়ে দেখল, দুটি খাল সমান্তরালভাবে বয়ে চলেছে পশ্চিমে। মানুষের তৈরি এই খাল দুটির তীরে সারি সারি খর্জুর বৃক্ষ। দুটি খালের মধ্যবর্তী জমিতে নগরীর সুসজ্জিত বিপণি। খালের ওপর পারাপারের জন্য স্থানে স্থানে কাষ্ঠনির্মিত সেতু।

তুর্বাণ একটি সেতু পেরিয়ে জনবহুল বাজার অঞ্চলে প্রবেশ করল। পণ্য বিনিময় চলেছে। শস্য আর সবজির বিনিময়। মেষ আর অশ্বের বিনিময়। মূল্যবান ও স্বল্প মূল্যের পরিচ্ছদের লেনদেন।

তুর্বাণকে ফিরে ফিরে দেখল ববেরুবাসীরা। তুর্বাণ জানে এ সময় সমুদ্র উত্তাল। সমুদ্রপথে কোনও বণিক এখন বাণিজ্যসামগ্রী নিয়ে আসবে না ববেরুতে। তা ছাড়া স্থলপথের বণিকেরাও এ সময়টাকে এড়িয়ে চলতে চায়। পশ্চিম ভূখণ্ডের মরু অঞ্চলে এখন আগুন ঝরছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বহু দূরদেশাগত বণিকেরাও লবণ-মরুর ঝঞ্ঝা-প্রবাহকে এড়িয়ে চলে এ সময়। তবে পাশাপাশি রাজ্যগুলির পণ্য চলাচল আর ক্রয় বিক্রয় চলে সারা বছর। ববেরুর বাজার বহুকালের। এর খ্যাতি সারা পৃথিবী জুড়ে।

তুর্বাণ এ বাজার অঞ্চলের সব কথাই জানে। সে শিশুকাল থেকে শুনে এসেছে বাণিজ্য-কেন্দ্র ববেরুর কথা। তার বাজার অঞ্চল, তার পথঘাট সবই ছবির মতো আঁকা হয়ে আছে তার চোখের ওপর। মহেঞ্জোদড়োর বণিকেরা যখন গল্প করত তখন খুঁটিনাটি বিষয়গুলি এমনভাবে বলত যার পর আর অদেখা অজানা বলে কিছু থাকত না।

তুর্বাণ তার কল্পনায় দেখা ববেরুর সঙ্গে বাস্তবের ছবিটা মিলিয়ে দেখছিল।

একটি বৃদ্ধ মানুষ বসেছিল বিশাল এক গাছের তলায়। জায়গাটা এরই ভেতর একটুখানি নির্জন। তুর্বাণ তাকিয়ে দেখল, বৃদ্ধটিকে ঘিরে বসেছে দুটি রমণী। পাশে দুটো ভেড়া চরছে। তুর্বাণ কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল। বৃদ্ধটি মাটির ওপর আঁকিবুকি কেটে কী যেন করছিল।

একটু পরে মুখ তুলে তাকাল মেয়ে দুটির দিকে। গম্ভীর গলায় ঘোষণা করল, নিলিবের ভর হয়েছে তোমার ওপর। সময়টা ভাল কাটবে বলে মনে হচ্ছে না।

কথাগুলো বলেই পাশে রাখা একটা থলের ভেতর থেকে বের করল একটা তাগা। মেয়েটি হাত বাড়ালেই তার হাতে বেঁধে দিল সেই তাগাটি। বলল, আর কোনও ভাবনা নেই। গ্রহ শান্তি হয়ে গেল।

মেয়েটির মুখে হাসি ফুটে উঠতে দেখল তুর্বাণ।

অন্যজন ততক্ষণে এগিয়ে বসেছে পটেশীর কাছে। তুর্বাণ শুনেছিল, এই পটেশীরাই দেবতার পূজক। আবার পটেশীরাই বসে রাজতক্তে।

বৃদ্ধ পটেশী বলল, জ্বর হয়েছে তোমার? পরশু ছিল গ্রহণের দিন। ধূলো উড়ে দুচার ফোঁটা বৃষ্টিও পড়েছিল। তুমি নিশ্চয় ঘরের বাইরে বেরিয়েছিলে। আর দেখতে হবে না। বৃষ্টি ভূতে পেয়েছে, তাই জ্বর ছাড়ছে না তোমার।

তুর্বাণ দেখল, এবার থলে থেকে বেরোল একটি আস্ত পেঁয়াজ। পাশে পড়ে থাকা কিছু শুকনো পাতা আর ডালে চকমকি ঠুকে আগুন ধরানো হল। সেই আগুনে ফেলা হল পেঁয়াজ। পেঁয়াজ পুড়ে গন্ধ ছড়াচ্ছে আর বৃদ্ধটি চেঁচিয়ে বলছে,

পেঁয়াজ পোড়ে পটর পটর
ভূত করে তাই ছটর ফটর
পেঁয়াজ পুড়ে হল ছাই
ভূত ছেড়েছে , জ্বর আর নাই।

দুটি মেয়ে উঠে চলে গেল। যাবার সময় ভেড়া দুটোকে দিয়ে গেল দক্ষিণা হিসেবে।

বৃদ্ধটি পাশে পুঁতে রাখা একটা কাঠির দিকে তাকাল। কাঠির তলায় ছায়া পড়েছে। আঙুল দিয়ে মাটির ওপর মাপজোক করল। তারপর চোখের ওপর হাত ঠেকিয়ে সূর্যের দিকে চেয়ে কিছু দেখার চেষ্টা করল।

আকাশ থেকে চোখ নামাবার সময় তুর্বাণের সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়ে গেল। বৃদ্ধের চোখে যেন যাদু আছে। সেই যাদুর টানে তুর্বাণ পায়ে পায়ে গিয়ে দাঁড়াল বৃদ্ধের কাছে।

বৃদ্ধ বলল, বিদেশী বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু এ সময়!

তুর্বাণ বলল, মরুঝঞ্ঝায় পড়ে আমি আমার সঙ্গীদের হারিয়েছিলাম। তারপর বহু দেশ ঘুরে বহু পথ পেরিয়ে এখানে এসে পড়েছি।

বৃদ্ধ বলল, এখন তো বণিকদের আসার সময় নয়।

তা আমি জানি। অসময়ে ভাগ্য আমাকে তাড়িয়ে এনেছে।

বৃদ্ধ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তুর্বাণের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলল, পূর্ব দেশের বণিক বলে মনে হচ্ছে?

আপনার অনুমান মিথ্যে নয়।

বৃদ্ধ মাটিতে আঁকিবুকি কাটতে লাগল। মুখে বিড় বিড় করে বলতে লাগল,

নিলিব, নাবু,
নের্গলি, মার্দুক,
শামাশ, ইশতার , সিন।

একসময় তুর্বাণের দিকে তাকিয়ে বলল, সাত দিনের অধিপতি সাতগ্রহ। নের্গলি তোমাকে আশ্রয় করেছে। যুদ্ধের দেবতা ঘুরছেন তোমার সঙ্গে সঙ্গে।

তুর্বাণ আশ্চর্য হল। গণক পটেশীর কথা মিথ্যে নয়। যুদ্ধের হাওয়ার ভেতর দিয়েই সে তার দীর্ঘ বাণিজ্য-পথ অতিক্রম করেছে। তারপর সদ্য অসুর আর ইলামভূমির যুদ্ধের পরিণতি সে দেখে এসেছে।

তুর্বাণ মুখে হাঁ, না, কিছু উচ্চারণ করল না। শুধু মাথা নাড়ল।

বৃদ্ধ বলল, মাটির ভাঁড় একটা উপুড় করে দাও, পৃথিবীটা ঠিক তাই। ওপরে গাছপালা, মানুষ পশুপক্ষী, আর তার তলার গর্তে সাতটা ভূতের বাস। তারা পাতাল ফুঁড়ে বেরিয়ে এসে যত সব তুলকালাম বাধায়। রোগ শোক, মহামারি, ঝড় বৃষ্টি তুফান, সবই ঘটায় এরা। এদের জব্দ করার জন্য চাই কড়া মন্ত্র।

তুর্বাণ বলল, আপনার আশ্চর্য সব ক্ষমতা আছে বলে মনে হচ্ছে।

বৃদ্ধটি উপযুক্ত বিদেশী শ্রোতা পেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

ববেরুর রাজবাড়িতে আমার খাতিরখানা যদি দেখতে। একবার প্রাসাদে পা দিলেই হল। অমনি রাজার অন্দর মহলে ডাক পড়বে। রাজা, রাজবাড়ির মেয়েরা, কেউ বাদ যাবে না। সবাই বসে যাবে ভাগ্য গুণতে

আমার কাছে।

তুর্বাণ বলল, আপনার এত গুণ, রাজা আপনাকে রাজবাড়িতে রাখতে পারতেন। এমন রোদ্দুরে বাজারের ভেতর আপনাকে বসতে হত না।

বৃদ্ধ যেন একটু ক্ষেপে উঠল, কী বললে, রাজা আমাকে অনুগ্রহ করবে। আমি সকলকে অনুগ্রহ বিতরণ করে বেড়াই তাই আমার রাজবাড়িতে এত খাতির। রাজার দান নেব কেন, তাহলে তো তার কেনা হয়ে থাকতে হবে। মন জুগিয়ে চললে কি মান পাওয়া যায়?

তুর্বাণ বিনয়ের সঙ্গে বলল, আপনার কাছে অনেক কিছু শেখার আছে। রাজা হাতে দান নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেও যিনি উপেক্ষা করতে পারেন তিনি সাধারণ মানুষের দলে পড়েন না। আমি বাণিজ্যে বেরিয়ে বহুদেশে ঘুরলাম, বহু মানুষ দেখলাম, কিন্তু আপনার মতো মানুষ দেখিনি।

খুশী হয়ে উঠল বৃদ্ধ। হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে তুর্বাণের একখানা হাত ধরে বলল, তোমাকে দেখে আমার খুব ভাল লেগেছে। বয়সে তরুণ, মুখের ভেতর ব্যবসাদারের ছাপ নেই। কিন্তু বাবা, কী বেচবে তুমি? এখন তো কেনার মানুষ বড় একটা পাবে না। মরশুমে নানা দেশ থেকে বণিকেরা এসে জড়ো হয় এখানে। তখন বণিকে বণিকে জিনিস বিনিময় হয়। যে দেশে যে জিনিসের চাহিদা, বেশি দাম দিয়ে সেই জিনিস কিনে নেয়।

তুর্বাণ বলল, ব্যবসা করতে বেরিয়ে ঝড়ের মুখে সব খুইয়েছিলাম। আবার মিশর থেকে ফেরার পথে যা এনেছিলাম তারও তিনভাগ খুইয়ে বসে আছি। এখন আমার থলেতে কয়েকটা দামি পাথর ছাড়া আর কিছু নেই।

বৃদ্ধ বলল, ওগুলো অবশ্য ভাল দামেই বেচতে পারবে এখানে। যদি প্রাসাদে একবার পৌঁছতে পার আর রাজবাড়ির মেয়েদের পছন্দ হয় ওই পাথর তাহলে যে কোনও দামই তুমি পেয়ে যাবে।

তুর্বাণ বলল, বিদেশী বণিককে অন্দরমহলে ঢুকতে দেবেই বা কেন?

বৃদ্ধ ও কথার উত্তর না দিয়ে বলল, কোথায় উঠেছ তুমি? এখন তো বাজারের বণিক-মহল বন্ধ রয়েছে।

তুর্বাণ বলল, ববেরু নগরে ঢুকে এই প্রথম আপনার সাক্ষাৎ পেলাম।

বৃদ্ধ কী যেন ভাবল মনে মনে। তুর্বাণের দিকে চেয়ে এক সময় বলল, তুমি যদি থাকার আর কোনও ব্যবস্থা না করতে পার তাহলে আসতে পার আমার সঙ্গে। নগরের সরাইখানার জাঁকজমক আমার বাড়িতে নেই, তবে মানিয়ে নিয়ে থাকতে পারলে বড় একটা অসুবিধেয় পড়বে বলে মনে হয় না।

তুর্বাণ বৃদ্ধকে অভিবাদন জানিয়ে বলল, আমি আপনার ঋণ কীভাবে পরিশোধ করব, আমার তো তেমন সংগতি নেই।

বৃদ্ধ আবার ক্ষেপে উঠল, সংগতি থাকলেই কী তোমাকে অমনি খাতির করে বাড়িতে নিয়ে যেতাম। তোমাকে ভাল লেগেছে বলেই প্রস্তাবটা দিচ্ছি। এক তাল সোনা পায়ের কাছে এনে ফেলে দিলেও আমার বাড়িতে কাউকে এনে তুলতাম না। যদি ইচ্ছে থাকে তা হলে চল, বেলা বাড়ছে।

বৃদ্ধটি উঠল। তুর্বাণ সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। দুটো মেষ তাড়াতে তাড়াতে বৃদ্ধ মানুষটি এগিয়ে চলল। ভাগ্যের কথা ভাবতে ভাবতে তার পাশে পাশে চলতে লাগল তুর্বাণ।

বৃদ্ধ পটেশীর ঘরে একটিমাত্র কন্যা ছাড়া কেউ নেই। মেয়েটি বৃদ্ধ পিতার পরিচর্যা করে। সামান্য এক চিলতে জমি, ছোট্ট একটি কোঠা ঘর। অসংকোচে অতিথি আপ্যায়ন করল মেয়েটি। তুর্বাণ দেখল, সারা মুখে শুদ্ধতার একটা ছাপ রয়েছে।

বৃদ্ধ বলল, যে কদিন এখানে থাকবে, মনের খুশীতে থেকো। নিজের বাড়িতে না থাকার দুঃখ কিছুটা অন্তত ভুলে থাকতে পারবে। আমার মেয়ে নাসিন অতিথির সেবা করতে ভালবাসে। তোমার কোনও কিছু দরকার থাকলে ওকে বোলো, সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টা করবে তোমার চাহিদা মেটাতে। হ্যাঁ, কি যেন নামটা তোমার?

তুর্বাণ আমার নাম। মহেঞ্জোদড়োর বণিক আমি।

জানি, জানি, তোমার দেশের বণিকরা দুচার বছর অন্তর অন্তর আসে। মানুষ হিসেবে দেখেছি ওরা খুবই ভাল। অন্য দুচারটে দেশের বণিকদের দেখেছি, বড় চতুর হয়। ব্যবসায়ে দুটো জিনিস ভাল, বুদ্ধি আর বিনয়। কিন্তু চতুর হলে ঠকতে হয় শেষমেশ।

শেষ বেলায় ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল পটেশী। রাজবাড়ির কাছে পিঠে কোথায় যেন কার সঙ্গে দেখা করতে হবে। ফিরতে ফিরতে সেই রাত।

তুর্বাণ বলল, চলুন, অমি আপনার সঙ্গে যাই। সামনে চাঁদ নেই। ফিরতে আপনার কষ্ট হবে।

পটেশী বলল, তুমি বড় ভাল ছেলে বাবা। আমার ছেলেটা বেঁচে থাকলে তোমার থেকে দু'এক বছরের বড়ই হত। তোমাকে দেখে, তোমার কথা শুনে, কেবল তার মুখটা মনে পড়ছে।

একটু থেমে নিজের আবেগটুকু চাপা দিয়ে বলল, একাই তো বেরোই বাবা, সঙ্গীসাথী কেউ নেই আমার। একবার কারোর সাহায্য নিলে তখন আর একা একা চলার ক্ষমতা থাকবে না। যতদিন পারা যায় ততদিন নিজের ওপর ভরসা রাখাই ভাল। তুমি এই যে আমাকে সাহায্য করতে চাইলে এতেই আমি খুশী। আজ সবে এসেছ, আরাম কর, তাড়াতাড়ি ফিরে আসার চেষ্টা করব।

বৃদ্ধ পটেশী বেরিয়ে গেল। সামনের সবজিবাগানে নাসিন জল দিচ্ছিল। বাবা চলে গেলে সে উঠে এল ঘরের দাওয়ায়। তুর্বাণকে বলল, আপনি বকুনির হাত থেকে বেঁচে গেছেন।

কী রকম?

নাসিন বলল, বাবা যদি অসাবধানে পথের ওপর পড়ে যান, আর কেউ তাঁকে সাহায্য করতে ছুটে আসে, তখন বাবা তাকে বারণ করে বলেন, সারাদিন আমি অনেকবার পড়ে যাই, তুমি কী আমাকে প্রতিবার এমনি করে সাহায্য করবার জন্যে ছুটে আসবে? তা যখন পারবে না তখন আমাকে নিজের চেষ্টাতেই উঠতে দাও।

তুর্বাণ বলল, আশ্চর্য মানুষ!

নাসিন অমনি বলল, এই আমি প্রথম দেখলাম, বাবা আপনার সাহায্যের প্রস্তাবে কোনওরকম রূঢ় মন্তব্য করলেন না।

তুর্বাণ একটুখানি হেসে বলল, আপনার সব রকম সাহায্যই নিশ্চয় ওঁকে নিতে হয়।

না নিতে পারলেই বাবা ভাল থাকেন। তবে আমি বাবার মনমেজাজ বুঝে কাজ করি, তাই ওঁর ধমক ধামক সইতে হয় না।

তুর্বাণ বলল, আপনি যখন এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবেন, ওঁকে দেখবে কে?

নাসিন সঙ্কোচের হাসি হেসে বলল, তাই তো আমার যাওয়া হচ্ছে না।

উনি আপনার নতুন সংসার জীবনের কথা কিছু বলেন না?

নাসিন বলল, বলেন না আবার? আমাকে এ ঘর থেকে বিদেয় দিতে পারলেই ওঁর শান্তি। তবে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে কোনও লোক এলেই আড়ালে ডেকে আমি বুঝিয়ে সুঝিয়ে বিদেয় করে দিই। কখনও বাবার কাছে বর পছন্দ হয়নি বলে কান্নাকাটি করি। বাবা আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আর যাই করুন, কখনও জোর করে নিজের মত চাপিয়ে দেন না।

তুর্বাণ বলল, জায়গাটা দেখছি লোকালয় থেকে বেশ খানিকটা দূরে। বাবা কাজে চলে গেলে একা একা আপনি কাটান কী করে?

নিজের মনের সঙ্গে কথা বলে।

তুর্বাণ বলল, আশ্চর্য, আপনার কোনও বন্ধু বান্ধব কিংবা পরিচিত জন নেই?

নাসিন বলল, থাকলেও এত দূরে কে আর আসবে বলুন।

আপনি তাঁদের কাছে অবসর সময়ে যান না?

খুব কম। আমার একটিমাত্র বান্ধবী আছে, কখনও সে আসে, কখনও বা আমি তার কাছে যাই

তুর্বাণ বলল, তবু ভাল। অন্তত : একজনের সঙ্গে কথা বলেও আপনি আপনার মনের ভার লাঘব করতে পারেন।

নাসিন হেসে বলল, সে আমার এমন বান্ধবী যার কাছে গেলে সারাক্ষণ তারই সুখদুঃখের কথা শুনতে হয়। আবার সে এখানে এলে তার মনের হাজার কথা শুনিয়ে যায়।

চমৎকার! তাহলে তো আপনার এমন বান্ধবী থাকা না থাকা দুইই সমান।

নাসিন অমনি বলল, বেলদিনা সম্বন্ধে ও কথা বলবেন না। ওর জুড়ি আর একটি মেয়ে ববেরুতে নেই। ও আমার বন্ধু বলে আমি গর্বিত।

তুর্বাণের গলার স্বরে বিস্ময় ভেঙে পড়ল, বেলদিনা! রাজা দুক্‌সিমের ভগ্নী বেলদিনা!

আপনি কী করে চিনলেন বেলদিনাকে!— নাসিনের গলায়ও বিস্ময়ের সু.'।

ওঁর সম্বন্ধে অনেক কথাই আমি শুনেছি।

সত্যি, আপনি আমাকে অবাক করলেন! একজন বিদেশী বণিক, তার ওপর আজই মাত্র এসেছেন ববেরুতে, কী করে বেলদিনার খবর আপনি জানলেন।

হাসল তুর্বাণ। বলল, আপনার সঙ্গে পরিচয় আমার সামান্যই, এখুনি আমার সব কথা আপনাকে জানাই কী করে।

নাসিন লজ্জিত হল । মুখখানা নত হল তার। বলল, বড় বেশি কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলাম, ক্ষমা করবেন।

নাসিনের সলজ্জ মুখের ভাবটুকু বেলাশেষের আলোর ছোঁয়ায় অপার্থিব বলে মনে হচ্ছিল।

তুর্বাণ সঙ্গে সঙ্গে বলল, আমি আপনার সাহায্যপ্রার্থী। এত তাড়াতাড়ি সাহায্যের প্রস্তাবটা পেশ করতে পারব তা ভাবতে পারিনি।

নাসিন বলল, দাঁড়ান, দাঁড়ান। সব কিছু কেমন যেন আমার হেঁয়ালি ঠেকছে। আমি আসছি।

নাসিন ঘরের ভেতর চলে গেল। সম্ভবত বিস্ময়ের ঘোরটুকু কাটাবার জন্যে। তুর্বাণ ভাবতে লাগল, ভাগ্যের কী আশ্চর্য খেলা! কোথায় পটেশীর গণনা, কী করেই বা তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা, তারপর একেবারে গৃহে আমন্ত্রণ আর সবশেষে দুর্লভ একটা সুযোগের আবির্ভাব।

ফিরে এল নাসিন। বলল, একটি অনুরোধ জানাব আপনাকে।

তুর্বাণ বলল, বলুন। আপনারা আমাকে অযাচিতভাবে আশ্রয় দিয়েছেন। আমি আপনাদের জন্য কিছু করতে পারলে তৃপ্তি পাব!

নাসিন বলল, এখুনি কিছু করার নেই, শুধু অনুরোধ, বেলদিনা সম্বন্ধে আপনি যে কিছু জানেন তা কোনও প্রসঙ্গেই বাবার কাছে উল্লেখ করবেন না।

কথা দিলাম।

নাসিন একটু দূরে দাওয়ার এক প্রান্তে বসে বলল, বলুন, বেলদিনা সম্বন্ধে আপনি কী জানেন? আর কী ধরনের সাহায্য আমি আপনাকে করতে পারি?

তুর্বাণ বলল, সব বলব, কিন্তু আমার একটি অনুরোধ আছে।

বলুন।

আপনিও আপনার বাবা কিংবা আর কোনও পরিচিত জনের কাছে আমাদের আলোচনার বিষয়গুলো প্রকাশ করবেন না।

নাসিন বলল, কথা দিলাম। আপনি নিজের কাছে গচ্ছিত রত্নের মতো আমার কাছে আপনার গোপনীয় কথা নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে জমা রাখতে পারেন।

তুর্বাণ কোন ভণিতা না করেই বলল, আমি রাজকুমারী বেলদিনার সঙ্গে দেখা করার জন্যই ববেরুতে এসেছি। আর ইলামের যুবরাজ সূত্রক আমাকে তাঁর কাছে পাঠিয়েছেন।

নাসিন সহসা বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠল। আকাশের দিকে তাকিয়ে কোনও দেবতাকে অভিবাদন

জানিয়ে তুর্বাণের দিকে ফিরে বলল, আপনি ঈশ্বর প্রেরিত। ববেরুর দেবতা বেল-মারদুক আপনাকে আমার বন্ধু বেলদিনার প্রাণ রক্ষার জন্য পাঠিয়েছেন।

তুর্বাণ বলল, আমি সামান্য বণিক। জানি না ঈশ্বর আমাকে পাঠিয়েছেন কিনা। তবে ইলামের যুবরাজ সূত্রক আমার বন্ধু। তাঁর কোনও উপকার করতে পারলে আমি বন্ধু হিসেবে নিজেকে ধন্য মনে করব।

নাসিন বলল, মাসাধিককাল বেলদিনা জীবন্মৃত হয়ে আছে। অসুর-রাজ ইলাম জয় করে রাজপরিবারের সকলকে বন্দি করে নিয়ে গেছেন জানতে পেরে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল বেলদিনা। সে যুবরাজ সূত্রকের কোনও খবর জানতে পারেনি। এদিকে মহারাজ দুক্‌সিম মিশরের মিত্রতা কামনা করে একটি বিবাহ প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। সব মিলিয়ে যন্ত্রণার কাঁটায় বিদ্ধ হয়ে কাল কাটাচ্ছে আমার বান্ধবী।

তুর্বাণ বলল, রাজপরিবারের সকলকেই নির্মমভাবে হত্যা করেছেন অসুর রাজ এসার। কেবল ভাগ্যক্রমে সূত্রক অসুরপুরী থেকে আমার সঙ্গে পলায়ন করে আত্মরক্ষায় সমর্থ হয়েছেন!

নাসিন উৎসুক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, এখন যুবরাজ সূত্রক কোথায় রয়েছেন? তিনি কী ছদ্মবেশে ববেরুতে এসেছেন?

না। রাজ্য হারিয়ে তিনি মহারাজ দুক্‌সিমের ভগ্নীর পাণিপ্রার্থী হতে চান না। তাঁর সমস্ত হৃদয় বেলদিনার ভালবাসায় পূর্ণ। কিন্তু তিনি আগে দাঁড়াতে চান তাঁর মৃতপ্রায়, ভগ্নহৃদয় প্রজাদের পাশে। যদি কোনওদিন ভাগ্যদেবতা তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয় তা হলে তিনি রাজা হিসেবে দূত পাঠাবেন মহারাজের ভগ্নী বেলদিনার পাণিপ্রার্থনা করে।

নাসিন বলল, যদি মিশরের ফারায়ো ইতিমধ্যে আমাদের মহারাজের প্রস্তাব গ্রহণ করেন, তা হলে বিপদ ঘনিয়ে উঠবে। বেলদিনার দুর্বল প্রতিরোধ ভেঙে যেতে বিলম্ব হবে না।

তুর্বাণ বলল, এর সমাধানের পথ আমার জানা নেই। আমি কেবল সংবাদ বাহক। সূত্রক শুধু বলেছেন, তিনি বেলদিনাকে ভোলেননি। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি তাঁকে ভুলতে পারবেন না, এই সংবাদটুকু পৌঁছে দিতে আমার বরেরুতে আসা।

নাসিন যথার্থই বেলদিনাকে ভালবাসে। সে সামান্য পরিচিত তুর্বাণের কাছে নতজানু হয়ে বসল। তুর্বাণের দুটো হাত নিজের অঞ্জলির ভেতর রেখে বলল, আপনি ঈশ্বর প্রেরিত। আপনি আমার বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করে সকল কথা বলুন। আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারলে সে মৃত্যু-যন্ত্রণার হাত থেকে রক্ষা পেতে পারবে।

তুর্বাণ নাসিনের হাত ধরে ওঠাল। বলল, আপনিই শুধু পারেন ভগ্নী বেলদিনার সঙ্গে আমার যোগাযোগ করে দিতে।

নাসিন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে খানিক চিন্তা করল। পরে বলল, আমি আপনার দেওয়া খবরটুকু বেলদিনার কাছে এখুনি পৌঁছে দিয়ে আসছি। তারপর ওর সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করব কীভাবে আপনাদের নিভৃতে দেখা হতে পারে। বেলদিনা ইচ্ছে করলে আমার এ ঘরে এসেও আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারে। কিন্তু মহারাজ দুক্‌সিম তাঁর প্রিয় বোনকে দেহরক্ষী আর অশ্ববাহিত শকট ছাড়া একাকী পাঠান না। যদি কোনও সূত্রে আমার ঘরে আপনার অবস্থানের কথা প্রকাশ পায়, তাহলে যে কোনও রকম অঘটন ঘটতে পারে। অন্যদিকে আর এক পথের কথা ভাবছি। পশ্চিমে ববেরুর শেষ সীমা মরুভূমি ছুঁয়ে আছে। ওখানকার একটি মরুদ্যান বর্তমান মহারাজের পিতা, তার কন্যা বেলদিনাকে দান করে গেছেন। সেখানে কোনও পুরুষের গমণ নিষেধ। বেলদিনা তার বিশ্বস্ত নারীবাহিনী নিয়ে সেখানে কয়েকদিন অবসর যাপন করে আসে। শিবিকায় বাহক, রক্ষী তীরন্দাজ সকলেই নারী। যদি বেলদিনা সেখানে আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের কোনও সুযোগ করতে পারে তা হলে সবচেয়ে নিভৃত সাক্ষাৎকারের সুযোগ আপনি পাবেন।

তুর্বাণ বলল, সব কিছুর সিদ্ধান্ত তাঁকেই নিতে হবে। আমি আপনার এখানে শুধু প্রতীক্ষা করে থাকব।

সাক্ষাতের সুযোগ এসে গেল। পুরো দুটি সপ্তাহ অবস্থানের পর সে সুযোগ এল। বেলদিনাকে পটেশীর ঘরে তুর্বাণের সঙ্গে দেখা করতে আসতে হল না। মরুদ্যানে অবসর যাপনের ভেতরেও নিভৃত সাক্ষাৎ হল না। এক সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ শঙ্কাসঙ্কুল সন্ধ্যায় নাসিনের সঙ্গে রাজঅন্তঃপুরে এসে দাঁড়াল তুর্বাণ।

ইলামের রাজকুমারের পলায়নের পর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন সমাট এসার। একটা বিজয়ের পর সৈন্যদলে উৎসাহের উত্তাপ থাকতে থাকতে নতুন দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে পড়ার পরিকল্পনা নিলেন তিনি। ববেরু ছিল তাঁর বহুদিনের আক্রমণের লক্ষ্য। ইলামের রাজকুমারের পলায়নের পর তাঁর মনে হল পলাতক নিশ্চয়ই বন্ধু রাষ্ট্র ববেরুতে আশ্রয় নেবে। আর এই সুযোগে বিদ্যুৎগতিতে শত্রু নগরীতে প্রবেশ করে একই সঙ্গে দুই রাষ্ট্রের প্রধানকে নিপাত করতে পারলে তিনি হবেন একেবারে নিষ্কণ্টক।

আকস্মিক ঘূর্ণির আবর্ত তুলে এগিয়ে আসতে লাগলেন স্বয়ং এসার । সহস্র সহস্র সৈন্যের আকাশমুখী ভল্লের ফলকে সূর্যালোক পড়ে অগ্নিশিখার মতো জ্বলতে লাগল। অশ্বের পদপাতে কর্ষিত হতে লাগল দোয়াবের মৃত্তিকা। সম্রাট এসার এবার যুদ্ধে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন রণচণ্ডী ইস্তারকে। চতুর্ভূজা ইস্তার সিংহবাহিনী। দুর্বার ঝড়ের বেগে তিনি শত্রু সংহার করে চলেন। দেবীকে সঙ্গে নিয়ে চতুর্গুণ উৎসাহে প্রধাবিত হলেন এসার ববেরু লক্ষ্য করে।

চরের মুখে খবর এল ঝড়ের আগে উড়ন্ত শুকনো পাতার মতো। মহারাজ দুক্সিম প্রমাদ গুণলেন। ইলামের পরাভবে তিনি কিছুটা সচকিত হয়ে ছিলেন! কিন্তু তাঁর এ রকম একটা ধারণা ছিল যে, বৃহৎ যুদ্ধের পর যে কোনও রাষ্ট্রেরই কিছুটা শ্বাস নেবার প্রায়োজন হয়। অসুরদেশও এর ব্যতিক্রম নয়।

কিন্তু সব ধারণা উল্টে দিয়ে উল্কার বেগে ছুটে আসতে লাগল এসারের দুর্জয় বাহিনী।

মহারাজ দুক্সিমের যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কোনও অভিজ্ঞতা না থাকলেও তরুণ রক্তের তেজ ছিল। তিনি ববেরুর অসতর্ক সৈন্যবাহিনীকে তৎপরতার সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধ করলেন। তারপর প্রিয় ভগ্নী বেলদিনাকে ডেকে বললেন, আমি যুদ্ধে চললাম। সমস্ত প্রাসাদ রইল তোমার অধিকারে। একে সাধ্যমত রক্ষার চেষ্টা করবে। যুদ্ধের ফলাফল ভাগ্যের হাতে। সংগ্রাম বীরের ধর্ম। আমি সেই ধর্ম পালন করে দেশের শত্রুকে প্রতিহত করব।

দুক্সিম যুদ্ধে চলে যাওয়ার পর নগর রক্ষার জন্য রইল নামমাত্র রক্ষী। দোকানি দোকানপাট বন্ধ করে আরও দক্ষিণে আশ্রয়ের আশায় ছুটল। বিত্তবানদের অশ্ববাহিত রথ পরিবারের লোকজনদের নিয়ে রাজপথ কাঁপিয়ে ছুটল নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে। প্রতিদিন যুদ্ধের সত্যমিথ্যা নানা খবর ভেসে আসতে লাগল বাতাসে। একটা ত্রাসের তরঙ্গ বয়ে চলল নগরীর ওপর দিয়ে। নগরী প্রায় জনশূন্য হয়ে এল।

এদিকে প্রাসাদের ভীত ত্রস্ত পরিচারক পরিচারিকাদের স্বেচ্ছায় নিরাপদ স্থানে চলে যাবার অনুমতি দিল বেলদিনা। কেবল অন্তরঙ্গ সখিস্থানীয় দুচারজন সেবিকা ছায়ার মতো রয়ে গেল বেলদিনার পাশে।

নগর জুড়ে যখন এমনি ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তখন বেলদিনার ডাকে নাসিনের সঙ্গে প্রাসাদ-অন্তঃপুরে এসে দাঁড়াল তুর্বাণ।

প্রথম দর্শনে আশ্চর্য হল সে। দেশ জুড়ে এমন এক অস্থির অবস্থার মধ্যে কেউ যে এমন শান্ত, সমাহিত, নিরুদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে আমন্ত্রিত অতিথির দিকে তাকাতে পারে তা ছিল প্রায় তার কল্পনার বাইরে।

বেলদিনার দেহ ঘিরে ছিল সাদা একটি পোশাক। গলায় মূল্যবান পাথরের মালা। তাকে দেখে তুর্বাণের মনে হল, সাদা পাথরে খোদিত একটি মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে।

বেলদিনা পাশে রাখা সোনার পাত্র থেকে একটি রক্ত পুষ্প তুলে নিয়ে অতিথির হাতে দিয়ে অভ্যর্থনা জানাল। তারপর মাথা ঈষৎ নত করে হাতের ইশারায় সামনের আসনে বসতে বলল। পাশে টেনে নিল নাসিনকে।

তুর্বাণ উপবেশনের আগে একটি সুবর্ণনির্মিত পাতার ওপর কয়েকটি দুর্মূল্য প্রস্তরখণ্ড রেখে অঞ্জলিকৃত হাত এগিয়ে দিল বেলদিনার দিকে। বেলদিনা কৃতজ্ঞতাসূচক মাথা নেড়ে সেগুলি হাতে ধরে নিল। উৎসুক দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বলল, অপূর্ব! এ পাথর ববেরুর রত্নকোষে নেই।

এখন মুখোমুখি বসল তুর্বাণ আর বেলদিনা। নাসিন বসেছে বান্ধবীর পাশে।

বেলদিনা কিছুক্ষণ মুখ নিচু করে চিত্রিত মেঝের দিকে চেয়ে রইল। তুর্বাণ দেখল একটা ভাবনার ছায়া পড়েছে সে মুখে। কিন্তু মুখের ভাবের প্রশান্তিটুকু কেড়ে নিতে পারেনি সে ছায়া।

এক সময় মুখ তুলে বলল, আপনার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা করার জন্য আমি উৎসুক আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিলাম, কিন্তু এমন পরিস্থিতির ভেতর দেখা করতে হবে তা ভাবতে পারিনি।

তুর্বাণ বলল, শুধু সূত্রকের কথাটুকু আপনার কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্যই ববেরুতে আমার এতদিনের অবস্থান। অবশ্য আমার বন্ধুর সব কথাই নাসিনের মুখে আপনি আগেই শুনেছেন।

একটা সুস্পষ্ট ব্যথার ছাপ পড়ল বেলদিনার অভিজাত মুখে। বলল, আমাদের বিপর্যয়ের দিনে আপনাকে এভাবে বিপদের ভেতর আটকে পড়তে হল, সেজন্য লজ্জা আর অপরাধের শেষ নেই।

আমি বন্ধু হিসেবে এসেছি রাজকুমারী। বণিক হয়ে এলে লাভালাভের হিসেব কষে অনেক আগেই চলে যেতাম।

বেলদিনা বলল, আপনি সূত্রকের বন্ধু, আপনি আমার নাম ধরেই ডাকবেন। ববেরু-প্রাসাদের কোনও মেয়ের বাইরের পুরুষকে ফুল উপহার দেবার রীতি নেই। আপনি আমার একান্ত প্রিয়জনের প্রিয় বন্ধু, তাই আমি ফুল দিয়ে আপনাকে অভ্যর্থনা করে মনে মনে তৃপ্তি পেলাম।

তুর্বাণ বলল, আমি আপনার ফুল উপহার পেয়ে সম্মানিত হলাম বেলদিনা। এই মুহূর্তে বন্ধু সূত্রকের কথাই আমার মনে পড়ছে। তিনি আজ এখানে থাকলে আমাদের আনন্দের আর সীমা থাকত না। কিন্তু ভাগ্য তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে।

একটু থেমে তুর্বাণ বলে গেল, সূত্রক আর তার প্রথম সাক্ষাতের কথা, উন্নানী আর চেরিবের বিড়ম্বিত জীবনের কথা, তাদের আশাতীত মহত্ত্বের কথা। উন্নানী যে অন্ধ স্বামীকে অরণ্যে একা রেখে শুধুমাত্র মানুষের উপকারের জন্য এত দীর্ঘ পথ নৌকা চালনা করে এল, সে কথা বলতে গিয়ে তুর্বাণের বাকরুদ্ধ হয়ে গেল।

বেলদিনা বলল, সেই মহীয়সী নারীর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পেলে যে কোনও মেয়ের জীবন ধন্য হয়ে যেত।

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে তুর্বাণ বলল, আপনাকে দেখার জন্য বন্ধু সূত্রক প্রথমে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন, পরে নিজের অবস্থার কথা ভেবে মত পরিবর্তন করেন। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, ভাগ্যহীন মানুষ সবার চোখেই বড় ছোট হয়ে যায়। আমি সব সইতে পারব, ভালবাসার অমর্যাদা সইতে পারব না। যদি কোনওদিন নিজের ভাগ্যকে প্রতিষ্ঠিত করতেপারি, সেদিন যদি আমার বেলদিনা অন্যের হাতে সমর্পিতা না হয়, তাহলে যথার্থ প্রার্থীর মতো তার কাছে গিয়ে দাঁড়াব, তার আগে নয়। বেলদিনাকে বোলো, যেখানেই থাকি, সেই আমার জীবনের প্রথম ও শেষ নারী। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাকে আমি ভুলব না।

করপত্রে অধর স্থাপন করে স্থির হয়ে বসে আছে বেলদিনা। সে যেন নিশ্চল নির্বাক একটি মূর্তি। তুর্বাণের কথা শেষ হলে দেখা গেল বেলদিনার দুটি গাল বেয়ে দুফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ল।

নিজের হাতে জল মুছে নিয়ে বেলদিনা স্থির হয়ে বসে বলল, সূত্রক যে আমার হৃদয়ের কতখানি অধিকার করে আছে তা আজ বলে বোঝাতে পারব না। আমি তার অভিমানের ছবিটা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। আজ তাকে এখানে পেলে আমি আনন্দে অধীর হতাম ঠিক কিন্তু তার মর্যাদার কথা ভেবে মনে হচ্ছে, না এসে সে উপযুক্ত কাজই করেছে। তার পৌরুষ সামান্য একজন নারীর কাছে নিঃশেষ হয়ে যাক্, এ আমি চাই না। সে আমার ভালবাসা কেড়ে নিয়েছিল, এখন আমার সবটুকু শ্রদ্ধা কেড়ে নিল।

থামল বেলদিনা। পাশে সুবর্ণনির্মিত দীপাধারে দীপ জ্বলছিল। তুর্বাণের মনে হল, কথাগুলো বলে উত্তেজনায় থর থর করে কেঁপে উঠল বেলদিনার সারা দেহ। নাসিন পাশে বসেছিল রাজকুমারীর একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে ধরে নিয়ে। তুর্বাণ লক্ষ করল, নাসিন বান্ধবীর হাতখানা জোরে চেপে ধরেছে।

কিছুক্ষণের ভেতরেই স্বাভাবিক হল বেলদিনা। উত্তেজনা প্রকাশের পরে সঙ্কোচের একটা সলজ্জ হাসি

খেলা করে গেল তার মুখের ওপব।

বেলদিনা নাসিনের দিকে তাকিয়ে বলল, আজ প্রাসাদের অবশিষ্ট ভৃত্যদের খুশিমতো চলে যাবার নির্দেশ দিয়েছি। আর অন্তঃপুরে বিশ্বস্ত যে ক'জন পরিচারিকা ছিল তাদের পাঠিয়ে দিয়েছি আমার নিভৃত মরুদ্যানে।

তুর্বাণ বলল, যুদ্ধের ফলাফল না জেনেই আপনি প্রাসাদ শূন্য করে দিলেন?

আজ একজন অশ্বারোহী খবর দিয়ে গেছে, ববেরুর তিনটি শক্ত প্রতিরোধের মধ্যে প্রথমটি ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে।

তুর্বাণ অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, কী আশ্চর্য সংযম বেলদিনার। এতক্ষণ কথার ভেতর এই দুঃসংবাদের কোনও প্রতিক্রিয়া তার মধ্যে দেখা যায় নি।

তুর্বাণ বলল, পরিস্থিতি যদি সত্যিই জটিল হয়ে পড়ে তাহলে আত্মরক্ষার কোনও উপায় ভেবেছেন কী?

বেলদিনা বলল, নগরী প্রায় শূন্য হয়ে গেছে। প্রাসাদের আশ্রিত যারা তাদেরও নিরাপদ-যাত্রার ব্যবস্থা করে দিয়েছি। প্রাসাদরক্ষীদের অশ্ব রয়েছে। দ্বিতীয় প্রতিরোধ ভেঙে শত্রু সৈন্য শেষ প্রতিরোধের মুখোমুখি হলেই ওদের চলে যাবার আদেশ দেব।

কিন্তু আপনি নিজের জন্য কী ব্যবস্থা রেখেছেন?

মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠল বেলদিনার মুখে। বলল, ভেবে উঠতে পারিনি। তাছাড়া নগরের একটি মানুষও যতক্ষণ অসহায় অবস্থায় থাকবে ততক্ষণ নিজের কথা ভাববার সময় কোথা?

তুর্বাণ জানতে চাইল, আপনি তো সকলের জন্যেই পুরোপুরি ব্যবস্থা করে ফেলেছেন, তা হলে আর বাকি রইল কে?

বেলদিনা তুর্বাণের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, এখনও আমাদের সম্মানীয় অতিথি নগরে রয়েছেন। তাছাড়া আমার বান্ধবী আর তার বৃদ্ধ পিতা।

তুর্বাণ বলল, আমার জন্য ভাববেন না রাজকুমারী। চতুর্দিকে যে বিপর্যয় তাতে মনে হয় যেখানে রয়েছি সে স্থান অনেক বেশি নিরাপদ।

বেলদিনা বলল, আপনি দুর্দিনের অতিথি। আপনার নিরাপত্তার ভার দয়া করে আমার ওপর ছেড়ে দিন। রাজ্য থেকে নিরাপদে নিষ্ক্রমণের ব্যবস্থা আমিই করে দেব।

সে রাতে নাসিনের সঙ্গে ফিরে এল তুর্বাণ।

যেদিকে তাকান যায় একটা মহাশ্মশানের শূন্যতা। পটেশী পাথরের মত নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে এক একবার করে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন আর বলেন, নিজের ভাবনা নেই আমার, কিন্তু কী করে উদ্ধার পাবে আমার নাসিন!

পরদিন অপরাহ্নে রাজ-শকট এসে দাঁড়াল নাসিনের কুটিরের সামনে। শকট থেকে নেমে ঘরে এসে ঢুকল বেলদিনা। বলল, সংকট আরও ঘনিয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় প্রতিরোধও ভাঙনের মুখে।

আতঙ্কে আর্তনাদ করে উঠল বৃদ্ধ পটেশী।

বেলদিনার গলায় সেই আশ্চর্য সংযম। সে পটেশীর দিকে তাকিয়ে বলল, বিচলিত হবেন না, বিশেষ একটি পরামর্শের জন্য আমি আপনার কাছে এসেছি।

পটেশী তাকিয়ে রইল বেলদিনার দিকে।

বেলদিনা ধীরে ধীরে বলে গেল, আমাদের দুর্ভাগ্যের খবর পাওয়ার একটু আগেই মিশরের ফারায়োর কাছ থেকে দূত এসেছে। মহারাজ দুকসিম উভয় দেশের ভেতর বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য একটি প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। মাননীয় ফারায়ো সানন্দে সে প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছেন।

পটেশী অমনি বলল, এতে এই দরিদ্র জ্যোতিষীর কী উপকার?

বেলদিনা বলল, যদি নাসিনের অমত না থাকে আর আপনি আন্তরিক সম্মতি দেন তা হলে আপনার

কন্যার মিশরের অন্তঃপুরে বধূ হয়ে প্রবেশের কোনও বাধা থাকেবে না।

পটেশী কন্যার এতবড় সৌভাগ্যের কথা ভাবতে না পেরে বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে রইল।

নাসিন বলল, এ কী অদ্ভুত পরিকল্পনা তোমার বেলদিনা! ফারায়োর অন্তঃপুরে যাবার যোগ্যতা একমাত্র রাজপরিবারের রয়েছে। আমার নয়।

বেলদিনা নাসিনের দুটো হাত জড়িয়ে ধরে বলল, আমার কোনও কথাই তো তোমার অজানা নয় নাসিন। তবে কেন তুমি আমাকে এর ভেতর টানতে চাইছ! তুমি দয়া কর আমার ওপর। তুমি আমার বন্ধু। তোমার চেয়ে অন্তরঙ্গ সহচরী কেউ নেই আমার। তুমি আমার বোনের পদ নিয়ে প্রবেশ করবে ফারায়োর অন্তঃপুরে।

নাসিন কান্না ভেজা গলায় বলল, এ কী দুরূহ দায়িত্ব দিতে যাচ্ছ আমার ওপর। তোমাকে এই বিপদের মাঝে নিঃসঙ্গ ফেলে, বৃদ্ধ বাবাকে পরিত্যাগ করে, আমি কী করে সম্রাটের অন্তঃপুরচারিনী হতে পারি?

তোমার পিতার প্রতিপালনের ভার আমার ওপর ছেড়ে দাও। আমি তাঁর কাছে না থাকলেও যাতে তাঁর পরিচর্যার কোনও অভাব না হয় সে ব্যবস্থা করে যাব।

পটেশীর দিকে তাকিয়ে বেলদিনা বলল, আমি নগরের বাইরে সাধারণ ববেরুবাসীদের মধ্যে আপনার থাকার ব্যবস্থা করেছি। সেখানে অতি বৃদ্ধ অবস্থায় আপনার পরিচর্যার কোনও অসুবিধে হবে না। আমি জানি, আপনি কোনও দান গ্রহণ করেন না, কিন্তু আমার এ ব্যবস্থাকে আপনার কন্যার সেবা বলে গ্রহণ করলে আমি কৃতার্থ হব।

রুদ্ধবাক বৃদ্ধ পটেশী বেলদিনার হাত দুখানি জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল।

সময় দ্রুত গড়িয়ে চলেছে। রথ প্রস্তুত। তেজি চারটি অশ্ব জোড়া হয়েছে রথে। নাসিন ফারায়োর অন্তঃপুরের উপযুক্ত সজ্জায় সজ্জিত হয়ে বসেছে সেই রথের মধ্যে। বেলদিনা নিজের সঞ্চিত মূল্যবান রত্নাভরণে সাজিয়ে দিয়েছে নাসিনকে। দুটি শিশিরের ফোঁটা নাসিনের চোখের পাতায় টলটল করছে গড়িয়ে পড়ার জন্য। বেলদিনা যত্ন করে মুছে নিল সেই জল। বলল, ভুলে যেও না তুমি আমার বোন। ফারায়োর কাছে এই পরিচয়ই থাকবে তোমার চিরদিন। যদি সুযোগ হয় তা হলে অচিরে ফারায়ো যেন অসুর-রাজ এসারকে দমনের জন্য শক্তি প্রয়োগ করেন। না হলে যেভাবে অসুররা বেড়ে উঠেছে তাতে তাদের মিশর পর্যন্ত রণক্ষেত্র প্রসারিত করা বিচিত্র নয়। মহামান্য ফারায়ো অনেক বিজ্ঞ এবং দূরদর্শী। তিনি নিশ্চয়ই এর গুরুত্ব উপলব্ধি করবেন। আমি এসব কাদাপাটায় লিখে দূতের হাতে দিয়ে দিয়েছি। সুযোগ আর অবসর বুঝে তুমিও তাঁকে পরিস্থিতির গুরুত্ব বোঝাবার চেষ্টা করবে।

ঝড়ের বেগে উড়ে চলে গেল নাসিনের রথ। পটেশীর মুখে হাসি, চোখে জল। বেলদিনার সকল ব্যবস্থাই প্রস্তুত ছিল। শকটে করে পাঠান হল পটেশীকে তাঁর নির্দিষ্ট বাসস্থানের উদ্দেশ্যে।

এখন সীমাহীন শূন্যতা। ববেরুর জগৎবিখ্যাত প্রাসাদকে জনমানুষহীন একটা অলৌকিক মায়াপুরী বলে মনে হচ্ছে।

মুখোমুখি একটি সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে বসে অনুচ্চ কণ্ঠে কথা বলছিল বেলদিনা আর তুর্বাণ।

বেলদিনা তেমনি শান্ত কণ্ঠে বলল, আজ যুদ্ধের দশম দিবস পার হয়ে গেল কিন্তু প্রথম পাঁচটি দিনের সংবাদ ছাড়া অন্য সংবাদ না পেয়ে শুধু অস্থিরতাই বেড়ে চলেছে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

তুর্বাণ বলল, সব কিছু সময়ের হাতে ছেড়ে দিতে হল বেলদিনা। তুমি, আমি, আমাদের মত জগতের আরও হাজার হাজার মানুষ কেবল পরিকল্পনাই নিতে পারি কিন্তু তার পরিণতি আমাদের হাতে নেই। যেদিন দেশ ছেড়ে বেরোই সেদিন বাণিজ্যপথের সব ছকই আঁকা হয়েছিল, কিন্তু কে জানত সেই হিসেব করা ছক ধরে আমরা বেশিদূর এগোতে পারব না। এখন যা আসবে শুধু তার পথ চেয়ে প্রতীক্ষা করে বসে থাকা ছাড়া আমাদের আর কোনও উপায় নেই।

বেলদিনা বলল, সূত্রক একদিন আমাকে বলেছিল, ভালবাসা যদি গভীর হয় তাহলে পৃথিবীর যে

প্রান্তেই আমরা থাকি না কেন, মিলন আমাদের হবেই। সেদিন কী বিশ্বাস নিয়ে সূত্রক এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তা আমার জানা নেই তুর্বাণ। তবে তার চোখে মুখে সেই মুহূর্তে যে ছবি দেখেছিলাম, তাকে অবিশ্বাস করতে পারিনি।

তুর্বাণ বলল, আমাদের পরিকল্পনার ছক বদলে দেবার ক্ষমতা যেমন অদৃশ্য এক শক্তির রয়েছে, তেমনি বিশ্বাসে অটল থাকার অধিকারও রয়েছে আমাদের হাতে। আশা, আশাভঙ্গ আর আশা পূরণ, এই নিয়েই সারা জগৎ জুড়ে সুখ দুঃখের খেলা।

কথায় কথায় বেলা পড়ে এল। প্রাসাদের বাতায়নপথে দেখা গেল গোলাকার রক্তবর্ণের সূর্য অস্তে নামছে। দিগন্তের আকাশে বিচ্ছিন্ন মেঘগুলিকে ছিন্নভিন্ন রক্তলিপ্ত মাংসখণ্ড বলে মনে হচ্ছিল।

বেলদিনা অন্যমনস্ক হয়েছে বলে মনে হল তুর্বাণের। সে উৎকর্ণ হয়ে কিছু যেন শোনার চেষ্টা করছিল। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ক্ষিপ্র পায়ে ছুটে গেল উত্তর-পূর্ব কোণের বাতায়নের দিকে।

তুর্বাণ, ওই যে রাজপথে ছুটে আসছে অশ্বারোহী। জানি না কী সংবাদ বয়ে আনছে সে।

এই প্রথম তুর্বাণ বেলদিনার কণ্ঠ থেকে উদ্বেগের বাণী উচ্চারিত হতে শুনল।

ছুটে গেল তুর্বাণ বাতায়নের পাশে।

এগিয়ে আসছিল ঘোড়সওয়ার। দূর থেকে নির্জন পথের ওপর ঘোড়ার খুরের শব্দ দ্রুত লয়ে বেজে উঠছিল। ওই শব্দ দিয়ে তৈরি হচ্ছিল ভাষা। সেই অজ্ঞাত পরিচয় ভাষা দিয়ে হয়তো রচিত হচ্ছিল যুদ্ধের সংবাদ।

একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার তুলে প্রাসাদ থেকে তীরবিদ্ধ পাখির মত নীচে নেমে গেল বেলদিনা। তুর্বাণ ছুটল তার পেছনে পেছনে।

প্রাসাদের তোরণ দ্বারে তখন অশ্ব থেকে অবতরণ করছে অশ্বারোহী। উদ্‌ভ্রান্ত ছিন্নভিন্ন রক্তলিপ্ত পরিচ্ছদ। স্থির হয়ে মাটির ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছিল তার। বেলদিনাকে সে যেন সম্পূর্ণ চিনে উঠতে পারছিল না।

হঠাৎ নিভু নিভু দীপশিখা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সৈনিক তার শেষ শক্তি সঞ্চয় করে বেলদিনাকে অভিবাদন জানিয়ে বলল, প্রিয় রাজকুমারী, যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। ববেরুর প্রাসাদের দিকে পঙ্গপালের মত উড়ে আসছে সসৈন্যে রাজা এসার।

বেলদিনার আর্তকণ্ঠ বেজে উঠল, মহারাজ দুক্‌সিম?

নিহত।

বলার সঙ্গে সঙ্গে বুঝি সৈনিকের শেষ শক্তিটুকু ফুরিয়ে গেল। সে মাটিতে পড়ে পৃথিবীর শেষ শ্বাসটুকু টেনে নেবার বৃথা চেষ্টা করে নিঃশেষ হয়ে গেল।

এখন আবার স্থির হয়ে দাঁড়াল বেলদিনা। দুটি চোখ বন্ধ করে ববেরুর দেবতা বেল-মারদুকের কাছে কর্তব্যনিষ্ঠ সৈনিকের জন্য প্রার্থনা জানাল।

বেলদিনার ইঙ্গিতে পাশে এসে দাঁড়াল অবশিষ্ট প্রাসাদরক্ষীরা। তারা রাজকুমারীর নির্দেশে সৈনিকের শেষকৃত্য সমাধা করল।

চাঁদ উঠেছে সন্ধ্যার আকাশে। রহস্যময় পাষাণপুরী বলে মনে হচ্ছে প্রাসাদকে। বেলদিনা শেষ কজন রক্ষীকে অশ্বারোহণে প্রাসাদ ত্যাগ করে যাওয়ার নির্দেশ দিলে তারা রাজকুমারীকে অভিবাদন করে চলে গেল। তারা জানে, রাজকুমারী বেলদিনার আদেশ শুধু পালন করতে হয়, কথা বলার কোন অধিকার তাদের নেই।

কেবল চিত্রার্পিতের মত প্রাসাদের অদূরে দাঁড়িয়ে একজন। সামনে তার চারটি শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণের অশ্বযোজিত শকট। সে যেন ববেরুর শ্রেষ্ঠ ভাস্করের দ্বারা খোদিত অনন্য এক মূর্তি। শেষ আদেশের সঙ্গে সঙ্গে সে মূর্তি প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে। আর এই অশ্ববাহিত রথটিকে চালনা করে নিয়ে যাবে দূর দিগন্ত লক্ষ

করে।

বেলদিনা হাত ধরে নিয়ে এল তুর্বাণকে অন্ধকার প্রাসাদের ওপরে। প্রাসাদ শীর্ষে দাঁড়িয়ে জ্যোৎস্নালোকে তাকাল ববেরুর নিস্তব্ধ সীমাহীন রহস্যে ভরা রূপের দিকে। কতক্ষণ পরে যেন আপন মনে বলে উঠল, আজ অনেক কাছে সরে এসেছে সূত্রক। আমি আমার বুকের ধ্বনির ভেতর তার বুকের ধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। আমার প্রতিটি শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে তার শ্বাস প্রশ্বাস। তার থেকে আমি আর নিজেকে পৃথক করে নিতে পারছি না।

একটু থেমে কাতর কণ্ঠে বলল, তুর্বাণ, এই মুহূর্তে ববেরু প্রাসাদে তুমি আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়। একটি অনুরোধ আমি প্রিয়জনের কাছে করব, রাখবে?

বিহ্বল তুর্বাণ বেলদিনার হাত ধরে বলল, রাখব বেলদিনা। তোমার যে কোনও অনুরোধই রাখবার জন্যে আমি তৈরি।

বেলদিনার কণ্ঠে আবেগ, বন্ধু ছাড়া কেই বা রাখে বন্ধুর অনুরোধ। শোন তুর্বাণ, এই প্রাসাদ রক্ষার গুরু দায়িত্ব ছিল আমার ওপর, তাই প্রাণ থাকতে আমার পূর্ব পিতামহের এই প্রাসাদ পরিত্যাগ করে আমি যেতে পারব না। আমি এই প্রাসাদে অগ্নিসংযোগ করতে চাই। দাহ্য বস্তুতে পূর্ণ হয়ে আছে এ প্রাসাদ। তুমি আমাদের দুজনের প্রিয় বন্ধু, তাই তোমাকে দিয়েই প্রথম আমি এই প্রাসাদে অগ্নি-সংযোগ করাতে চাই।

তুর্বাণের কণ্ঠে আর্তস্বর, কী বলছ বেলদিনা! তুমি কী প্রকৃতিস্থ?

হাসল বেলদিনা। হাসি থামলে বলল, কথা রাখবে না বন্ধু! রাজকুমারী হয়ে পথে পথে প্রাণ ভিক্ষা করে বেড়াতে পারব না। অসুর-রাজ এসারের কাছে আত্মসমর্পণ করে তার অন্তঃপুরে পরিচারিকা বৃত্তিও গ্রহণ করতে পারব না। তার চেয়ে আমার উজ্জ্বল ভালবাসা, কলঙ্কহীন দেহ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে মিশে যাক। এর চেয়ে বড় কামনা এই মুহূর্তে আমার কিছু নেই।

বেলদিনা মিনতির ভঙ্গিতে দুটি বাহু প্রসারিত করল। আবিষ্টের মত তুর্বাণ চেয়ে রইল রাজকুমারী বেলদিনার দিকে।

চাঁদ অস্ত যাচ্ছে। দুরন্ত তুরঙ্গবাহিত শকট তুর্বাণকে নিয়ে চলেছে ববেরুর সীমানার বাইরে। তুর্বাণ তাকিয়ে আছে নিভন্ত জ্যোৎস্নার পটভূমির দিকে। সেখানে মহাকাশের বুকে জ্বলছে ববেরুর প্রাসাদ। বহু বহু পথ অতিক্রম করে তুর্বাণ শেষবারের মত পেছনে তাকিয়ে দেখল। বহু দূরে ববেরুর প্রজ্জ্বলিত প্রাসাদ তখন ক্ষুদ্রকায়া ধারণ করে এক আশ্চর্য আলোকময়ী রমণীমূর্তিতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

।। চোদ্দ ।।

কতকাল পরে ভাগ্যের কত পথ ঘুরে তুর্বাণ এসে দাঁড়াল তার পরিচিত মালভূমির প্রান্তে। এক ঝড়ের দিনে সে হাওয়ার বেগে পেরিয়ে গিয়েছিল এই মালভূমি। আবার এক রাতের জ্যোৎস্নায় তাকে ফিরে আসতে হল ঠিক এই জায়গাটিতে। মাঝখানে তার জীবন স্পর্শ করেছিল অভাবিত এক রোমাঞ্চ। তুর্বাণ আজ চাঁদের আলোয় এসে দাঁড়াল মালভূমির ওপর। এতকাল পরে কেমন আছে উর্বী। সে কী এখনও তার ক্ষতের দুঃখ নিয়ে কাল কাটাচ্ছে পাহাড়ের গুহায়, না সুস্থ হয়ে ফিরে গেছে সমতলে তার স্বাভাবিক জীবনে? তুর্বাণ হাঁটতে লাগল। সে ঢালু মালভূমি বেয়ে নেমে চলেছে , তার মনে হাজার প্রশ্ন ভিড় করে আসছে। উর্বী মা হয়েছে। কত বড় হয়েছে তার সন্তান? ভাবতে ভাবতে তুর্বাণ কখন যে মালভূমির পথটুকু পার হয়ে এল তা সে জানতেই পারল না। একসময় চোখ তুলে দেখল তার সামনে সেই খাঁজকাটা পাহাড়গুলো অতীতেব সাক্ষি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সে উত্তেজনায় কাঁপছে আর গুহার মুখে উঁকি দিয়ে চাপা গলায় ডাকছে, উর্বী, উর্বী, উর্বী, আমি এসেছি।

কোন সাড়া ফিরে এল না গুহার ভেতর থেকে।

এবার তুর্বাণ ঢুকে পড়ল গুহার ভেতর। পাগলের মত হাতড়াতে লাগল এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত। শুধু পাষাণের কঠিন দেওয়াল ছাড়া হাতে লাগল না উর্বীর নিত্য-ব্যবহার্য পোশাকের কোন চিহ্ন।

গুহা থেকে বেরিয়ে এল তুর্বাণ। পাশের পাহাড়ে, যেখানে উর্বীর খাদ্যবস্তুর সঞ্চয় থাকত, সেখানে এসে দাঁড়ায় সে। সদ্য পরিত্যক্ত কোন ভোজ্যবস্তুর চিহ্নমাত্র নেই।

তুর্বাণ ছুটে এসে দাঁড়াল সেই পাহাড়ের তলায় যার ওপর সন্তপর্ণে উর্বী তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। সে পাহাড়ের খাঁজে পা রেখে দ্রুত উঠে এল ওপরে। দুজনে যে পাথরটার ওপর উঠে বসেছিল সেখানে এসে পৌঁছল সে।

এবার উত্তরে ফেলল তার সন্ধানী দৃষ্টি। ওই তো চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে হারিরূদ নদী। অন্ধকারে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অরণ্যভূমি। কিন্তু কোথায় সেই সারি সারি কুটির। চোখ মুছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে দেখতে লাগল তুর্বাণ। শূন্য প্রান্তর খাঁ খাঁ করছে। চাঁদের আলোয় মেলে দেওয়া শুকনো বস্ত্রের মত পড়ে আছে সমতল ভূমি। লোকবসতির সামান্যতম চিহ্ন নেই কোথাও।

তুর্বাণের কণ্ঠ দিয়ে প্রবল আর্তনাদের মত বার বার উচ্চারিত হতে লাগল একটি নাম, উর্বী, উর্বী, উর্বী!

পাহাড়ে পাহাড়ে আশ্চর্য প্রতিধ্বনি উঠল সে নামের। অরণ্য, নদী, পর্বত, মালভূমি ছুঁয়ে সেই আর্তধ্বনি জ্যোৎস্নার অনন্ত আকাশে হারিয়ে গেল।

।। পনেরো ।।

এ রাত নগরনটী আন্দ্রার। সারাদিন মহেঞ্জোদাড়োর পথ প্রান্তর গৃহ বিপণি জুড়ে এক ছেদহীন উৎসবের ঢেউ বয়ে গেছে। নগরে ফিরে এসেছে নগরপ্রধানের একমাত্র সন্তান তুর্বাণ। কিন্তু এ আনন্দে যোগ দিতে পারেননি গুর্বাক। পুত্রশোকের কাতরতার অবসান ঘটিয়েছেন নগরের দেবতা পশুপতি মহাদেব। শেষদিকে গুর্বাক অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। নগরের পথে পথে ঘুরতেন রাতের অন্ধকারে। নগরবাসীরা তাঁকে দেখলেই সসম্ভ্রমে এগিয়ে এসে তাঁর হাত ধরত। গুর্বাক হয়তো বলতেন, আমাকে নিয়ে চল নদীর ধারে।

সিন্ধুর তীরে বসে তিনি বলতেন, স্রোতের বেগ কমে এসেছে, বর্ষা নামতে এখনও বিলম্ব আছে, এবার আমাদের সওদাগরেরা ফিরে আসবে সমুদ্রপথে ইলাম, ববেরু থেকে। আমার তুর্বাণ নিশ্চয়ই ফিরবে ওদের সঙ্গে, কী বল?

ওরা আশ্বাস দিত গুর্বাককে। বৃদ্ধ আশ্বস্ত হয়ে ঘরের পথে পা বাড়াতেন। থেমে গিয়ে পেছন ফিরে আবার বলতেন, দাঁড় টানার শব্দ উঠছে না?

ওরা এবার বৃদ্ধ গুর্বাককে আশ্বাস দিতে পারত না।

সব আশা আশ্বাসের পারে এখন গুর্বাক। তাঁর তীব্র প্রতীক্ষার পথ ধরে একদিন এসে পৌঁছল তুর্বাণ, কিন্তু সেই আনন্দের লগ্নটির জন্য আর অপেক্ষা করে থাকতে পারলেন না তিনি।

তুর্বাণ এসে পিতাকে না দেখতে পেয়ে ভেঙে পড়েছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে শোকের প্রথম প্রবাহ স্তিমিত হয়ে এল। এখন তাকে ঘিরে শুরু হল মঙ্গল মহোৎসব। নগরপ্রধান গুর্বাকের বিপুল বিত্তের অধিকারী সে। সম্মানে তার পরিবার নগরের শীর্ষস্থানে অবস্থান করছে। তাই পৌরপ্রধানরা নগরের সাধারণ সভায় তরুণ তুর্বাণকেই দিলেন নগরপ্রধানের দায়িত্বভার।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে বন্ধন-সূত্র ছিন্ন করে ফেলতে হবে নগরনটীর ভবনে গিয়ে। তাই আজ তুর্বাণ এসেছে আন্দ্রার গৃহে। এ রাত আন্দ্রার। সে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের শেষে প্রদীপ নিয়ে প্রদক্ষিণ করছে তুর্বাণকে। সীমাহীন আনন্দকে বুকের ভেতর চেপে রাখতে গিয়ে তার হাতের দীপ কেঁপে কেঁপে উঠছে।

তুর্বাণ আজ সব কথা হারিয়ে ফেলেছে। তার দুটো চোখ বন্ধ হয়ে আছে আন্দ্রার মুখে। সে দীর্ঘ দশটি ব্যর্থ বসন্তের পর ফিরে এসেছে আন্দ্রার কলাভবনে।

আন্দ্রা আরতি শেষ করে প্রদীপটি নামিয়ে রাখল তুর্বাণের সামনে। এবার তুর্বাণের হাতখানা দুটি হাত

দিয়ে ধরে বন্ধন-সূত্রটি ছিন্ন করে দিল। হেসে বলল, শুধু তোমার বন্ধন-সূত্রই অটুট রেখেছ তুর্বাণ, মনটা রাখতে পারনি, তাই না?

তুর্বাণ বলল, বণিকের মন সবসময় পড়ে থাকে লেনদেনের ওপর আন্দ্রা।

এখন আন্দ্রা হাঁটু ভেঙে পায়ের পাতার ওপর বসে গ্রীবা বেঁকিয়ে দেখছে তুর্বাণকে। এবার তুর্বাণের কথার জবাব দিল সে, লেনদেন কী নিয়ে করলে তুর্বাণ? শুনেছি পথেই তুমি দলছাড়া হয়ে পড়েছিলে। তাহলে লেনদেনটা কী মন নিয়েই হল?

তুর্বাণ হেসে বলল, দেখছি এখনও এ নগরে একজন রয়েছে যে আমার মনের মূল্য আছে বলে মনে করে।

আন্দ্রা কপট অভিযোগে ঝাঁঝিয়ে উঠল, মিছে কথা রাখ। এ দশ বছর পৃথিবী ঘুরে একটি বলিষ্ঠ যুবাপুরুষ তার মন হারায়নি কোথাও, এ কথা আন্দ্রাকে বিশ্বাস করতে বল?

তুর্বাণ বলল, এখন উল্টো প্রশ্নটা আমায় করতে দাও, নগরনটী আন্দ্রাও কি এই দীর্ঘ দশটি বছর দেহ-মনে উপবাসী থেকেছে?

বিদ্যুতের ছোঁয়ায় যেন ঝলকে উঠল আন্দ্রা। তার ঠোঁট দুটো থর থর করে কাঁপছে। বিদ্রুপের সুর লাগল তার গলায়, আমরা যে নটী তুর্বাণ। আমাদের জীবন রক্ষার পথ তো ওই একটি। তোমরা যেমন নানা বস্তু নিয়ে কারবার কর, আমরাও করি তেমনি আমাদের দেহ নিয়ে কারবার। তোমরা সোনার অলঙ্কার তৈরি করে ক্রেতার মন ভোলাও, আমরা নানা ছলাকলায় দেহকে সাজিয়ে ক্রেতার কাছে তুলে ধরি।

একটু থেমে হাসির রেখা ঠোঁটের কোণে টেনে বলল আন্দ্রা, কারবারে তুমি লাভ করতে পারনি বলে কি আমিও শুধু লোকসানের বোঝাই বইব?

তুর্বাণ বলল, তুমি আজও ঠিক তেমনি রয়েছ আন্দ্রা, একটুও বদলাওনি।

তুর্বাণের কাছ ঘেঁষে এখন বসে পড়ল আন্দ্রা। সে তুর্বাণের মুখের ওপর চোখ পেতে রেখে বলল, ভাল করে চেয়ে দেখ, অনেক পরিবর্তন হয়েছে। একটা মানুষের জন্যে কেঁদে কেঁদে আমার এমন সাধের চোখ দুটো অকালে শুকিয়ে গেছে। আর দশ বছরের পরে এসে আগের সেই অষ্টাদশী আন্দ্রার মুখে নতুন যৌবনের ছাপ দেখার আশা কোরো না তুর্বাণ।

তুর্বাণ আন্দ্রার মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে বলল, একটুও না, একটুও না। তুমি সেই আন্দ্রাই রয়েছ। সেই চোখ, সেই মুখ, আর সেই আশ্চর্য মন, যাকে ছুঁয়ে দিলে সোনার অলঙ্কার হয়ে যায়।

আন্দ্রা বলল, তোমার কিন্তু বেশ পরিবর্তন হয়েছে।

তুর্বাণ বলল, কী রকম?

আন্দ্রা বলল, তোমার চেহারায় গাম্ভীর্যের ছবি ফটেছে আর তোমার কথায় ভাবুকের ভাবনার রং।

তুর্বাণ এখন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। সত্যিই কী তার পরিবর্তন আন্দ্রার চোখে ধরা পড়েছে? উর্বীর স্বপ্নের ছবি কী ছায়া ফেলে গেছে তার চোখে মুখে?

এই মুহূর্তে উর্বীর সমস্ত অবয়ব তার চোখের সামনে এসে দাঁড়াল। সে অবাক হয়ে দেখতে লাগল তাকে। এখন উর্বী বসে তার মুখের দিকেই তাকাতে লাগল। তুর্বাণ দেখল, যেখানে কিছুক্ষণ আগে আন্দ্রা বসেছিল সেখানে বসে আছে উর্বী।

তুর্বাণ তার হাতখানা নিজের হাতের ভেতর শক্ত করে ধরে বলল, কতদিন পরে তোমাকে এমন করে কাছে পেলাম।

আন্দ্রা তুর্বাণের হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিল না। সে বলল, প্রতিটি রাত আমার তোমার চিন্তায়, তোমার স্বপ্নে কেটেছে তুর্বাণ।

তুর্বাণ উর্বীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি জানি, দীর্ঘ বিচ্ছেদের দিনে আমিই ছিলাম তোমার সঙ্গী। তোমার স্বপ্নের পথে নিত্য আমি এসে তোমাকে দেখা দিয়ে যেতাম।

আন্দ্রা বলল, অসুস্থ বলে এই দীর্ঘ ক'টি বছর সকল প্রার্থীকে আমি দূরে সরিয়ে দিয়েছি। কোন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে আমি গ্রহণ করিনি সবার আনন্দের অংশ। শুধু তুমি কবে আসবে সেই প্রতীক্ষায় কাতর হয়েছে আমার দিন, আমার রাত্রি।

তুর্বাণ বিহ্বল আবেগে তার উর্বীকে কাছে টেনে নিল। নিবিড় আলিঙ্গনে বেঁধে নিয়ে বলল, এই তো আমি এসেছি তোমার কাছে। কোনদিন, আর কোনদিন আমি ছেড়ে যাব না তোমাকে।

একটা কোমল পাখির মত চোখ বুজে তুর্বাণের বুকের বাঁধনের ভেতর তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে রইল আন্দ্রা।

বুঝি বাইরে ঝড় শুরু হয়েছে বর্ষা দিনের। ঝড়ো হাওয়ার ঝাপটায় কখন নিভে গেল ঘরের দীপ। অন্ধকার সমুদ্রে উর্বীর স্বপ্নে বিভোর তুর্বাণ আন্দ্রাকে বুকে নিয়ে ভেসে চলল

কন্যা এসেছে আন্দ্রার কোলে। নগর-বিলাসিনীর ঘরে কন্যার আগমন কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। কিন্তু আন্দ্রা জানে একটি ঝড়ের রাতের অক্ষয় দান এ কন্যা। সে এই সংবাদটুকু সভয়ে গোপন করেছে তুর্বাণের কাছ থেকে। যদি খবরের সত্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলে তুর্বাণ, যদি সে ভাবে নগর প্রধানের পক্ষে এ সংবাদ হানিকর, যদি আন্দ্রার গৃহে আর সে না আসে, তাহলে আন্দ্রা হারাবে অনেক কিছু। তার চেয়ে নটীর কন্যা নটী হয়েই বেঁচে থাক। সে শুধু জানবে কোন সম্ভ্রান্ত রক্তের স্রোত তার কন্যার দেহে নিরন্তর বয়ে চলেছে।

পুরো দুটি বছর নগরনটী আন্দ্রার ঘরে নিশিযাপন করতে আসেনি তুর্বাণ। নগরের প্রাচীন পৌর-ব্যবস্থার দিকে নজর দিতে হয়েছিল তাকে। তাছাড়া শিল্পীরা মনোযোগ দিচ্ছে না তাদের কাজে। বিদেশে বাজার তাই সঙ্কুচিত হয়ে এসেছে। অলঙ্কার নির্মাণে স্বর্ণকারদের নেই পূর্বের নৈপুণ্য। তার গৃহে রৌপ্যাধারে রক্ষিত তার পূর্বপুরুষদের প্রস্তুত একখানি মূল্যবান পাথর-খচিত স্বর্ণহার রয়েছে। মাঝে মাঝে সে খুলে দেখে সেই কণ্ঠহারখানা। কী নিপুণ নিষ্ঠায় সেদিনের স্বর্ণকারেরা সৃষ্টি করেছে এই শিল্পবস্তুটি । কোথায় গেল সেদিনের সে সকল একনিষ্ঠ শিল্পীরা। আজ শুধু শিথিলতার সমবেত প্রতীক হয়ে যেন দাঁড়িয়ে আছে মহেঞ্জোদড়োর সকল শ্রেণীর শিল্পীগোষ্ঠী।

বিশাল পৌরকক্ষে নগরের পৌরপিতা আর সম্ভ্রান্ত বণিকদের কাছে এ বিপর্যয়ের ছবিটি তুলে ধরে বলেছিল তুর্বাণ, এখন থেকে যদি আমরা এর প্রতিকারে উদ্যোগী না হই, তাহলে বিশ্বের এই শ্রেষ্ঠ সভ্যতার আয়ু ফুরিয়ে আসতে বেশিদিন সময় লাগবে না। শুধু একটা জাতি যে উন্নত পৌরব্যবস্থার কল্যাণে বেঁচে থাকতে পারে না তা সেদিন তুর্বাণ বুঝিয়ে বলেছিল সম্ভ্রান্ত নাগরিকদের।

ক্লান্ত তুর্বাণ সেদিন সন্ধ্যায় এসেছিল আন্দ্রার ঘরে। এসে সীমাহীন বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিল একটি ছবির দিকে। আন্দ্রার কলাভবনে একটি শিশুকন্যা স্খলিত চরণে ঘুরে বেড়াচ্ছে সারা ঘর। আর আন্দ্রা করতালি দিয়ে গান গাইতে গাইতে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার পেছন পেছন।

তুর্বাণকে সহসা ঘরে এসে দাঁড়াতে দেখে থেমে গেল আন্দ্রার করতালি। সে অবাক চোখ মেলে তাকাল তুর্বাণের দিকে। ঠিক সেই মুহূর্তে মায়ের গলার গান আর করতালি ধ্বনি থেমে যাওয়ায় শিশুটিও হঠাৎ কেঁদে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে তার দিকে ছুটে এল আন্দ্রা। বুকে তুলে নিয়ে দ্রুতপায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, পেছন থেকে ডাক দিল তুর্বাণ, যেও না, দাঁড়াও।

শিশুকন্যাটিকে বুকে নিয়ে ফিরে দাঁড়াল আন্দ্রা। তার মুখে-চোখে যেন সহসা ধরা পড়ে যাওয়ার একটা শঙ্কা খেলা করছিল।

তুর্বাণ কাছে এগিয়ে এসে শিশুটিকে দেখল। হঠাৎ একটা উচ্ছ্বসিত আবেগ উঠে এল তার বুক ঠেলে। তার মনে হল উর্বীর বুকে জড়িয়ে রয়েছে সন্তান। সে আন্দ্রার কোল থেকে শিশুটিকে তুলে নিল নিজের বুকে। পাগলের মত চুম্বনে ভরে দিল তার মুখ।

আন্দ্রার চোখ ভরে তখন জল নেমেছে। সে দুহাতে ঢেকে ফেলেছে তার মুখ। তুর্বাণ একহাতে বুকের কাছে টেনে নিল আন্দ্রাকে। বলল, বল আন্দ্রা এ কার সন্তান? হঠাৎ আমার মন এমন আকুল হয়ে উঠল কেন?

আন্দ্রা তখন তুর্বাণের বুকে মুখ লুকিয়েছে।

তুর্বাণ বলল, আমার মন বলছে আন্দ্রা এ শিশু আর কারো নয়, এ গুর্বাকের ছেলে তুর্বাণের। এ খবর এতদিন আমার কাছ থেকে কেন গোপন রেখেছিলে আন্দ্রা?

চোখে জল মুখে হাসি আন্দ্রার। বলল, এ মহানগরের সবচেয়ে সম্মানীয় মানুষ তুমি। তোমার সম্মানে কলঙ্কের ছোঁয়া লাগলে তা বাজবে আমার বুকে। তাই এতকাল নিজের মনের গোপনে রেখেছি এ খবরটুকু। এ তো বাইরে প্রকাশের নয় তুর্বাণ। তাছাড়া নটীর কন্যা চিরদিনই নটী, যে ব্যক্তির রক্তের ধারা প্রবাহিত হোক না কেন তার দেহে।

এ কথার কোন স্পষ্ট উত্তর জোগাল না তুর্বাণের মুখে। সে শুধু শিশু কন্যার নরম মুখখানা চেপে ধরল নিজের মুখে। একটি সুন্দর শিশুদেহের ঘ্রাণ তাকে আবিষ্ট করে তুলল। শিশুটিও তুর্বাণের বুকে এসে অদ্ভুত এক তৃপ্তিতে তার কান্না ভুলে গেল। কচি হাতের আঙুলগুলো খেলা করতে লাগল তুর্বাণের মুখের ওপর।

তুর্বাণ বলল, জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছি আন্দ্রা, শুধু তোমার কাছে এলে আমি সব দুঃখ ভুলে যাই।

আন্দ্রা বলল, তুমি আমার দুঃখ ভুলিয়েছ তুর্বাণ। এই শিশুটি তোমার উপহার, আর এ আমার সব দুঃখ ভুলিয়ে দেয়। নগরের কোনও শ্রেষ্ঠী, কোনও বিদেশি বণিক আর আসে না আমার কাছে। তারা জানে আর চাইলেও পাওয়া যাবে না নগর-নটীর যৌবন। আজ তুর্বাণ আমি শুধু দেবমন্দিরের নর্তকী। সেই আমার গ্রাসাচ্ছাদনের একমাত্র পথ। আমি সুখী। দেবতা আমাকে কৃপা করে যে দান দিয়েছেন তার চেয়ে বড় সম্পদ আমার কিছু নেই।

তুর্বাণ বলল, সারাদিন নগরের কাজ করে গভীর রাতে যখন শয্যায় আশ্রয় নিই, তখন আমি অচেতনে ঘুমোই আন্দ্রা। দুঃখ ভোলার জন্যে নিজেকে বেঁধে রাখি কাজের বাঁধনে।

আন্দ্রা তুর্বাণের বুকে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, যেদিন কোন দুঃখ তোমার বুকটাকে ভারী করে তুলবে সেদিন সুযোগ করে একবারটি চলে এসো আমার এখানে। কিছু না পারি, শুধু আমার এই হাতখানা বুলিয়ে দেব তোমার বুকের ওপর। হয়তো মেয়ের মুখ দেখে কিছু সময়ের জন্য হলেও ভুলে থাকতে পারবে তোমার দুঃখ।

তুর্বাণ এখন মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, কী নাম রেখেছ মেয়ের?

আন্দ্রা এখন সহজ হল। সে বলল, জানি না তোমার পছন্দ হবে কি না। তুমি তো নাম রেখে যাওনি।

তুর্বাণ বলল, তোমার মেয়ের নাম তুমি রেখেছ, এখানে পছন্দ-অপছন্দের কথাই ওঠে না।

আন্দ্রার গলা গভীর হল। সে বলল, কোনদিন তোমার স্ত্রী বলে কারো কাছে আমি পরিচয় দিতে যাব না তুর্বাণ। আমার মেয়েও কোনদিন জানবে না তার বাবার পরিচয়। কিন্তু তুমি তো মনে মনে জান তোমার রক্ত তার দেহে বইছে! সে কী তোমার মেয়ে নয় তুর্বাণ? আমার মেয়ে বলে তুমি কেন এড়িয়ে চলেছ তোমার বাবার অধিকারটুকু?

তুর্বাণ বলল, আমার মেয়ে বলে তোমাকে চিনিয়ে দিতে হয়নি আন্দ্রা। আমি নিজেই তাকে বুকে তুলে নিয়েছি। এখন বল, কী নাম রাখলে আমার মেয়ের?

আন্দ্রা বলল, সিহলী।

তুর্বাণ শিশুটিকে চেপে ধরে বলল, ভারী সুন্দর নাম দিয়েছে তোমার মা, সিহলী। সিহলী আমার ছোট্ট সোনামণি, এর চেয়ে মিষ্টি নাম আকাশ, নদী, বন কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আন্দ্রার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে বলল, সত্যি পছন্দ হয়েছে তোমার?

তুর্বাণ বলল, তোমার নামের চেয়ে এ নাম আরও সুন্দর। তোমার মুখের চেয়ে আমার মেয়ের মুখ আরও সুন্দর।

আন্দ্রা বলল, সুন্দর তো হবেই। মেয়ের মুখে রয়েছে বাবার মুখের ছায়া।

তুর্বাণ মেয়ের মুখে চুমু খেয়ে তাকে মায়ের কোলে দিয়ে বলল, আবার কিছুদিন আসতে পারব না

আন্দ্রা। সময়ের বড় অভাব। শত শত নগরবাসীর শুভাশুভের দায়িত্ব আমার ওপর। একে এড়িয়ে যাই সে শক্তি আমার নেই।

আন্দ্রা বলল, আমার জন্যে না হোক, অন্ততঃ মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে সময় হলে একবার করে এসে দেখে যেও।

আসব। নগরের পূর্ব-দক্ষিণ সীমায় তৈরি হচ্ছে বিরাট এক প্রাকার। বড় ব্যস্ত সেই কাজ নিয়ে।

আন্দ্রা বলল, দেখেছি, কিন্তু কেন?

তুর্বাণ বলল, প্রতি বছর বর্ষার পর বন্যা ভাসিয়ে দিয়ে যাচ্ছে পথঘাট, ঘর বাড়ি সবকিছু। তখন মনে হয় মহেঞ্জোদাড়ো এক ভাসমান নগরী। তাই বন্যার প্রথম ধাক্কা রোধ করার জন্য এই প্রাকারের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

আন্দ্রা বলল, এখন নদীর বন্যা যেন নিয়মিত ঘটনা হয়ে উঠেছে। আগে কিন্তু কয়েক বছর অন্তর বন্যা আসত।

প্রকৃতির খেলাঘরে আমরা আজও অসহায় খেলনা ছাড়া কিছু নই। আমরা তার খেয়ালখুশির খেলার পুতুল।

আন্দ্রা বলল, আজকাল বন্যা এলে বড় ভয় করে। ঘরের ওপরে উঠে দাঁড়িয়ে তবে কিছুটা নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। আবার দু'একদিনেই জল নেমে যায় না। অন্ততঃ তিন চার দিন ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে তবে জল নামতে থাকে।

তুর্বাণ বলল, তোমার বাড়ি তো অনেক উঁচু ভিতের ওপর তৈরি আন্দ্রা, কিন্তু আমার সমস্যা কর্মীদের আস্তানাগুলোর জন্যে। ওগুলোর ছাদ ছাপিয়ে জল উঠে আসছে আজকাল।

আন্দ্রা বলল, গত বছর দেখলে তো, রাতের বেলা কত উঁচু হয়ে বন্যার জল ঢুকে এল। কত মানুষ অসহায়ের মত ভেসে গেল স্রোতে।

তুর্বাণ বলল, আগেই তো বলেছি, বাঁচার চেষ্টা করা যেতে পারে, কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করা যায় না। তাই চেষ্টাটুকুই করছি মাত্র।

আন্দ্রা এবার অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করল, তুমি একবার করে আমাকে দেখা দিয়ে যাও, এ আমি আমার অন্তর দিয়ে চাই তুর্বাণ, কিন্তু বার বার এক নটীর বাড়িতে এসে তুমি সবার চোখে ছোট হয়ে যাও, সে আমি চাই না। তুমি হয়তো জান না তুর্বাণ, এ নগরীর প্রতিটি মানুষ তোমাকে কতখানি ভালবাসে।

তুর্বাণ বলল, জানি আন্দ্রা, আর ঐ ভালবাসাই আমার কাজের শক্তি। কিন্তু ওরা যদি আমাকে সত্যিই ভালবাসতে চায় তা হলে আমার জীবনের এ দিকটাকেও মেনে নিতে হবে ওদের। আমার ব্যক্তিগত জীবনের ভাললাগা আর ভালবাসাকে ওদের অবহেলা বা ঘৃণা করলে চলবে না।

আন্দ্রা বলল, আমি ছোট, অতশত বুঝি না, তবে কোনদিন তোমার আমার সম্পর্ক নিয়ে নগরীতে কথা উঠলে আমি সইতে পারব না।

তুর্বাণ হেসে বলল, আকাশের নীচে জায়গার তো অভাব নেই আন্দ্রা। ওরা যেদিন আমাকে চাইবে না, সেদিন আমি ওদের কাছ থেকে সরে আসব।

তুর্বাণ শিশুকন্যা সিহলীর মুখে আদরের চুমু এঁকে দিয়ে নগরের প্রায়ান্ধকার পথে পা বাড়াল।

।। ষোল ।।

বন্যায় ডুবে রোদ্দুরে বুক ফাটিয়ে আরও সতেরোটি বছর আকাশের তলায় জেগে রইল সিন্ধুনগরী মহেঞ্জোদাড়ো। শেষসূর্যের সোনায় তখন ঝলমল করছে সারা নগরীর দেহ। বিদেশ থেকে বণিকেরা জলে-স্থলে লুটে আনছে সোনা। চরম উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে পৌর-ব্যবস্থায়।

শুধু একটি পরিবর্তন ঘটেছে নগরে। নগরতটী পদ থেকে সভা করে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে আন্দ্রাকে। সে এখন পৌরসভার দেওয়া কলাভবন ছেড়ে চলে গেছে নগরসীমার বাইরে এক কুটিরে।

বিদেশি বণিকেরা নগরীতে আসে দু'দিনের জন্যে। তারা স্ফূর্তি করে কাটাতে চায় ক'টা রাত। সিন্ধুনগরীর নর্তকীর পায়ের নূপুর তাদের রক্তে নাকি তুফান তোলে। কিন্তু বহুদিন তারা বঞ্চিত হচ্ছে সে রসের আস্বাদনে। ফিরে যাবার সময় মুখে আশাভঙ্গের হাসি টেনে বলছে, স্ফূর্তির ফোয়ারার মুখ বন্ধ হয়ে গেছে মহেঞ্জোদাড়ো নগরীতে।

পৌরসভায় ডেকে পাঠানো হয়েছিল আন্দ্রাকে। বিদেশি বণিকদের মনোরঞ্জনের যে খ্যাতি একদিন অর্জন করেছিল মহেঞ্জোদাড়ো তাতে আন্দ্রার মৃত্যু জননীর দান কিছু কম ছিল না। সে পেয়েছিল নগরের কলাভবনে থাকার মর্যাদা। দেবানুষ্ঠানে কর্মের অফুরন্ত সুযোগ। সবাই জানত নটী এরাহি অভিজাত দেহ-বিলাসিনী। তারপর বহু সঙ্গ লাভের ফলে একদিন নটী এরাহির কোলে এল পিতৃপরিচয়হীন আন্দ্রা। প্রথম থেকেই তাকে নটী এরাহি তালিম দিতে লাগল নাচ আর গানে। কন্যা আন্দ্রা যখন ওই দুটি বিদ্যায় দক্ষতা লাভ করল, তখন শেষ শিক্ষা তাকে দিল নটী এরাহি। বলল, আঁখি আর বাক্য, এই দুটি নটীর সব সেরা অস্ত্র। নৃত্য আর গীত শিখিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু ও দুটি অস্ত্র নিজেকে সাধনার দ্বারা অর্জন করে নিতে হয়।

আন্দ্রা মায়ের কথা বুঝেছিল। সে চোখের চাহনি আর কথার ব্যবহারে হয়ে উঠেছিল সুনিপুণা।

পৌরসভায় আন্দ্রা এসে দাঁড়াতেই নগরপিতারা চঞ্চল হয়ে উঠলেন। চাঞ্চল্য পড়ে গেল সমবেত সভ্রান্ত দর্শকদের আসনে উপবিষ্ট শ্রেষ্ঠীদের মধ্যেও।

নগরপ্রধান তুর্বাণকেই প্রশ্ন করতে হবে। কী কী প্রশ্ন করা হবে তাও পৌরসভায় পূর্বাহ্নে আলোচিত।

তুর্বাণ অনেকগুলি বছরের ব্যবধানে দেখল আন্দ্রাকে। দেহে নেই ভরা জোয়ারের পূর্ণতা, চোখে নেই দাহিকা শক্তি। একটি শান্ত প্রতিমার মত এসে দাঁড়াল আন্দ্রা।

তুর্বাণ কথা বলছে। একটি পাথরের মূর্তির মুখ দিয়ে যেন কথাগুলো বেরিয়ে আসছে।

তুমি জান, যে ঘরে তুমি বাস করছ সে ঘর পৌরসভার অধিকারে?

আন্দ্রা শুধু মাথা নেড়ে জানাল সে তা জানে।

তুর্বাণ বলল, তুমি জান মহেঞ্জোদাড়ো বণিক-নগরী, আর বাণিজ্যের প্রয়োজনে এখানে আসেন বিশিষ্ট বিদেশি বণিকেরা।

এবারও মাথা নাড়ল আন্দ্রা।

তুর্বাণ আবার বলল, তাঁরা আমাদের নগরীর প্রশংসা শতমুখে প্রচার করে থাকেন, কেন জানো?

এবার নেতিবাচক মাথা নেড়ে চোখে প্রশ্ন-চিহ্ন এঁকে তাকিয়ে রইল আন্দ্রা।

নগরের কলাভবনের নৃত্যগীত আর নগরনটীর আতিথেয়তার বিশেষ অনুরাগী তাঁরা— বলল তুর্বাণ।

আন্দ্রা এবার মাথা নিচু করে দাঁড়াল।

এবার তুর্বাণ বলল, কিছুদিন ধরে কলাভবনে কোন নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান হচ্ছে না, আর নগরনটীর আন্তরিক আমন্ত্রণের সুযোগও বিদেশি বণিকেরা পাচ্ছে না। সিন্ধুনগরীর পূর্ব সম্মান তাতে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। আর এজন্যে পুরো দায়িত্ব নগরনটীর বলেই পৌরসভা মনে করছে।

আন্দ্রা বলল, আপনাদের অভিযোগ মিথ্যা নয়। আপনাদের শাস্তি নেওয়ার জন্যে তাই আমি প্রস্তুত।

তুর্বাণ একটু ভেবে বলল, পৌরপিতারা তোমাকে আর একবার সুযোগ দিতে চাইছেন। নগরী, তোমার মা এবং তোমার কাছ থেকে সে সেবা পেয়েছে, সে কথা মনে রেখেই তাঁরা এ সিদ্ধান্ত করেছেন।

আন্দ্রা বলল, আমি দেহে-মনে অক্ষম হয়ে পড়েছি, আমাকে নগরনটীর কাজ থেকে অব্যহতি দিন।

অন্যতম পৌরপিতা শঙ্খবলয়-ব্যবসায়ী সিসোনক হঠাৎ বলে উঠলেন, শুনেছি তোমার কন্যা তোমার কলাবতী হয়ে উঠেছে। তোমার জায়গায় তাকে তুমি প্রতিষ্ঠিত করতে পার, তাতে পৌরসভার সম্মতি পাওয়া যেতে পারে।

একটা আগুনের ঝলক যেন বেরিয়ে এল আন্দ্রার ভেতর থেকে। সে তীক্ষ্ণকণ্ঠে উচ্চারণ করল, না।

তার 'না' ধ্বনিটা পৌরসভার বৃহদায়তন কক্ষে প্রতিধ্বনি তুলল।

সিসোনকের গলায়ও দৃঢ়তার সুর বাজল, জানতে পারি কী নগরনটী, কেন নয়?

আন্দ্রা তখন একটা চাপা ক্ষোভে ফুলে উঠছে। সে তেমনি তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন তুলল, আমি মহামান্য পৌরপিতাদের জিজ্ঞেস করি, তাঁরা কী সাধারণ নাগরিকের মত সামাজিক অধিকার দেবেন নগরনটীকে?

সকলে স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

আবার প্রশ্ন তুলল আন্দ্রা, পারবেন আপনারা আমার কলাকুশলী মেয়েটিকে ঘরের বধূরূপে বরণ করে নিতে?

গভীর নীরবতা।

আন্দ্রার কণ্ঠ আবার বেজে উঠল, আপনাদের সমাজ আমাদের কাছ থেকে আনন্দ কুড়িয়ে নেয়, আর পরিবর্তে আপনাদের সমাজের কাছ থেকে আমরা পাই ঘৃণা। চমৎকার প্রতিদান! আমরা আনন্দের বাতি হয়ে আলো ছড়াব, আর পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে গেলে আপনারা আমাদের আবর্জনার স্তূপে ফেলে দেবেন, এ ব্যবস্থা মানতে রাজি নই।

পৌরপিতা কারিমান বললেন, সে তোমার অভিরুচি। আমরা প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় ফাটল ধরাতে চাই না। বহু যুগের অভিজ্ঞতার ওপর সমাজের এক একটা নীতি গড়ে ওঠে।

সিসোনক বললেন, তুমি অক্ষম হলে আমাদের অন্য নটীর ব্যবস্থা করতে হবে। আর সেক্ষেত্রে পৌর কলাভবনের এলাকায় অবস্থিত বাসগৃহটি অচিরে তোমাকে ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র চলে যেতে হবে।

আন্দ্রা তুর্বাণের দিকে তাকিয়ে বলল, নগরসভার যদি এই সিদ্ধান্ত হয় তাহলে আমার কিছুমাত্র বলার নেই। আমি যত শীঘ্র পারি পৌরসভার দেওয়া ঘরখানি ছেড়ে দিয়ে চলে যাব। যাবার আগে বলে যাই, আপনারা আমাকে আজ গভীর যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি দিলেন, সেজন্য কৃতজ্ঞ।

রাতে আন্দ্রার গৃহে এসে তুর্বাণ দেখল, বৃষভ-শকট একখানি পথে দাঁড়িয়ে আছে। সে ঘরের ভেতর এসে দাঁড়াল অনেকগুলি বছরের পরে। আন্দ্রার মেয়ে সিহলীর জ্ঞান-বুদ্ধি হবার সঙ্গে সঙ্গেই আন্দ্রা তুর্বাণকে বারণ করে দিয়েছিল তার ঘরে আসতে। মেয়ে যদি জানতে পারে নগরপ্রধান তার পিতা, অথচ সে পাচ্ছে না তার কন্যার অধিকার, তাহলে তার বুকখানা ভেঙে যাবে গভীর অভিমানে। তার চেয়ে অপরিচিত থাকা অনেক ভাল।

তুর্বাণ শুধু নগরীর কোন মঙ্গল-অনুষ্ঠানে দেখতে পেত আন্দ্রাকে।

আজ প্রায় একযুগ পরে নগরনটী আন্দ্রার ঘরে এসে দাঁড়াল তুর্বাণ।

সেই ঘর। বাণিজ্যযাত্রার আগের রাত্রে এই ঘরে প্রথম সে কথা বলেছিল আন্দ্রার সঙ্গে। কী আশ্চর্য উন্মাদনা সেদিন আন্দ্রা ছড়িয়ে দিয়েছিল তার দেহমনে। আবার বিপর্যস্ত বণিক দেশে ফিরে এসে হাতের বন্ধন-সূত্র ছিন্ন করেছিল এই ঘরে। সে রাত একান্তভাবে ছিল তার আর আন্দ্রার। সেই বিহ্বল রাত আন্দ্রাকে দিয়েছিল মাতৃত্বের অধিকার।

ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে সিহলী। তুর্বাণ বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে গেল। ঠিক যেন তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে অষ্টাদশী আন্দ্রা।

নগরপ্রধান তুর্বাণকে নানা অনুষ্ঠানে দেখেছে সিহলী। তুর্বাণ তার কাছে অপরিচিত নয়। কিন্তু তাদের এই ঘরে তুর্বাণকে দেখে তার বিস্ময়ের সীমা রইল না। বিহ্বলতা কাটলে সে এগিয়ে গিয়ে নত হয়ে নমস্কার করল তুর্বাণকে।

তুর্বাণ তার চিবুক স্পর্শ করে বলল, তুমি সিহলী?

সিহলী অবাক হল। নগরপ্রধানের ন্যায় বিশিষ্ট ব্যক্তির তার মত একটি নগন্য মেয়ের নাম জানার কথা নয়। সে মাথা নেড়ে জানাল, তুর্বাণের অনুমান ঠিক।

তুর্বাণ বলল, কল্যাণ হোক মা তোমার। মায়ের আশীর্বাদ তোমাকে রক্ষা করুক সমস্ত বঞ্চনা আর বিপদ থেকে।

সিহলী বলল, আপনি অপেক্ষা করুন, মাকে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

আন্দ্রা ঘরে এসে অনুচ্চ গলায় বলল, মেয়েকে দেখার ইচ্ছে এমন প্রবল হল যে না এসে থাকতে পারলে না?

তুর্বাণ বলল, তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি আন্দ্রা।

আন্দ্রা বলল, স্বামী তুর্বাণ এসেছে আমার ঘরে, নিশ্চয়ই নগরপ্রধান আসেননি? তাই ক্ষমা চাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না এখানে।

তুর্বাণ বলল, চল আন্দ্রা, আমিও চলে যাই তোমাদের সঙ্গে এ নগর ছেড়ে। অনেক দূরের কোন পর্বতের পাদমূলে অরণ্যের কোলে ঘর বাঁধি। তুমি, আমি আর আমাদের অনেক আদরের সিহলী।

আন্দ্রা বলল, তা হয় না তুর্বাণ। তুমি এতগুলি মানুষের শুভাশুভের ভার তুলে নিয়েছ নিজের হাতে। তাদের সকলের অতি প্রিয় তুর্বাণ তুমি। আমি কেমন করে স্বার্থপরের মত সবার কাছ থেকে তোমাকে ছিনিয়ে নিই? আমি যেখানেই থাকি তুমি আমার। শুধু নগরনটীর ঘৃণ্য দেহ-ব্যবসার জগৎ থেকে তোমার মেয়েকে আমি মুক্ত করে নিয়ে যেতে চাই। তুর্বাণ, এ ঘর আমার জীবনের সেরা স্মৃতির গন্ধে ভরা, তবু তোমার মেয়ের মঙ্গলের জন্য এ ঘর ছেড়ে আমাকে চলে যেতেই হবে। শুধু যাবার আগে আশীর্বাদ কর, তোমার মেয়েকে যেন তোমার মনের মত করে গড়ে তুলতে পারি।

মহেঞ্জোদড়োর উত্তর-পশ্চিমে একটি অরণ্যভূমি বহু দূর ক্ষীরথর পর্বতমালার দিকে চলে গেছে। সেই বনের ধারে বসে দিগন্তের দিকে তাকিয়েছিল সিহলী। পেছনে বনের ভেতর চরছিল তার আদরের ছাগলগুলো। গলায় বাজছিল ঘণ্টা। মায়ের কাজ যাওয়ার পরে সিহলী নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল সংসারের ভার। আন্দ্রা নগর থেকে চলে আসার পর আর কোনদিন পা দেয়নি নগরের পথে। তাই সিহলী নগরের বিপণিতে যায় প্রয়োজনের জিনিস নিয়ে আসতে। সে অনেকগুলি ছাগল প্রতিপালন করে। তাদের দুধ বিক্রি করে আসে নগরে।

সিহলীর কানে এসে বাজছিল ঘণ্টাধ্বনি। ধীরে ধীরে সে ধ্বনি তার কান থেকে মিলিয়ে গেল। তার চোখের ওপর এখন এসে পড়েছে দিগন্তের কোলে একটা বিন্দু। সে বিন্দু নড়ছে, আর ধীরে ধীরে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে।

কিছুদূর থেকে সিহলী দেখল একটা জন্তুর মত কিছু তীরবেগে লাফাতে লাফাতে ছুটে আসছে। সিহলী ভয় কাকে বলে জানে না। সে গভীর রাতে নগরের পথে একা একা চলতে ভয় পায় না, কিন্তু এই অদৃষ্টপূর্ব বস্তুটি তাকে বিচলিত করে তুলল। সে বিদ্যুৎগতিতে নিজেকে সরিয়ে ফেলল অরণ্যবৃক্ষের আড়ালে।

পাতার ফাঁক দিয়ে সে দেখল একটি তরুণ গর্দভের চেয়ে বেশ খানিক বড় আকারের এক ধরনের জানোয়ারের পিঠে বসে আছে, আর সে জন্তুটা অতি দ্রুত তালে লাফাতে লাফাতে বনের এদিকে ছুটে আসছে। সিহলী দেখল, সে যেখানটায় বসেছিল সেখানে এসে জন্তুটা থেমে গেল।

তরুণটি চারদিকে চেয়ে কাকে যেন খুঁজছিল। সিহলী অবাক হয়ে দেখছিল তরুণটিকে। বনের মাথায় প্রকাণ্ড পাহাড়ের আকারে একটা মেঘ জমে আছে। মেঘের খানির ওপর থেকে সূর্য আলো ছড়াচ্ছিল। সেই আলোয় তরুণটিকে সম্পূর্ণ অন্য কোন জগতের অধিবাসী বলে মনে হচ্ছিল। তার রং সূর্যের আলোর সঙ্গে যেন মিশে যাচ্ছিল।

জানোয়ারটির ওপর থেকে নেমে দাঁড়াল তরুণটি। এখন সে পায়ে পায়ে বনের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

একটা অদ্ভুত রোমাঞ্চ ছুঁয়ে গেল সিহলীর শরীরটা। সে ঘত পাতার আড়ালে নিজেকে গোপন করে রাখবার চেষ্টা করতে লাগল।

পাতাগুলো নড়ছিল যেখানে সেদিকে এগিয়ে এল তরুণটি। সিহলীর একটু দূরে দাঁড়িয়ে সে না হেসে থাকতে পারল না। মেয়েটি পাতার মত দুটো হাতে চোখ-মুখ ঢেকে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

হাসির আওয়াজ কানে বাজতেই হাত নামিয়ে বড় বড় চোখ মেলে তরুণটির দিকে তাকিয়ে রইল

সিহলী।

তরুণ সিন্ধুনগরীর ভাষাতেই প্রথম কথা বলল, ওই দূরের নগরেই কী তোমার বাড়ি?

সিহলী মাথা দুলিয়ে জানাল, তার অনুমান ঠিক।

তরুণ এবার বনের ভেতর তাকিয়ে দেখতে দেখতে বলল, এমন সুন্দর বন কখনও দেখিনি আমি। কেমন বনের ভেতরে একফালি করে বসার জায়গা। আলো ভেঙে ভেঙে পড়ছে। ভারী সুন্দর সবকিছু।

একঝাঁক প্রজাপতি পাখার রঙে রোদ্দুরের পরাগ মেখে ছায়া ছায়া বনের দিকে উড়ে গেল। সেদিকে অবাক চোখে তাকিয়ে দেখতে লাগল তরুণটি, আর সিহলী বাঁকা চোখে দেখতে লাগল তরুণটিকে। এমন সুগঠিত দেহের পুরুষ সে এর আগে কোথাও দেখেনি। গায়ের রং থেকে চুলের রংটুকু পর্যন্ত তার একেবারে অদেখা অপরিচিত।

ক্ষণিক বিরতিমাত্র। তরুণটি আবার ফিরে তাকাল সিহলীর দিকে।

তরুণটি বলল, তুমি খুব সাহসী।

এবার সিহলী বলল, কী করে বুঝলেন?

তরুণটি হেসে বলল, আমার কোমরে ঝুলছে কুঠার, পিঠে রয়েছে ধনুর্বাণ তবু তুমি ভয় পেলে না আমাকে।

সিহলী বলল, আপনি তো মানুষ, আমি ভয় পাব কেন? তবে আপনার মত চেহারার মানুষ আমি আগে দেখিনি।

তরুণটি বলল, আমার চেহারাটা নিশ্চয়ই ভাল লাগার মত নয়?

সিহলী বলল, না, না তা কেন হবে। আপনি খুব সুন্দর পুরুষ।

কথাটা বলে ফেলেই লজ্জা পেয়ে গেল সিহলী। তার হঠাৎ মনে হল, একজন তরুণের সম্বন্ধে এ ধরনের কথা মনে এলেও মুখ ফুটে বলা ঠিক নয়।

কী নাম তোমার?— তরুণটি জানতে চাইল।

সিহলী!

তরুণটি বলল, খুব মিষ্টি তোমার নাম।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে তরুণটি আবার বলল, কই, আমার নাম জিজ্ঞেস করলে না তো?

মুখে হাসি আর চোখে জিজ্ঞাসা-চিহ্ন ফুটিয়ে মাথা নেড়ে তরুণের দিকে চাইল সিহলী।

তরুণ বলল, পূষণ আমার নাম। বলেই আকাশের সূর্যের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, ওঁরই নামে নাম। তারপর সিহলীর দিকে চেয়ে বলল, তোমার নামের মানে?

জানি না, মা জানতে পারে,—বলল সিহলী।

কে আছে তোমার বাড়িতে?— জিজ্ঞেস করল পূষণ।

মা আর আমি। আমাদের আর কেউ নেই, — বলল সিহলী।

পূষণ বলল, তুমি খুব ভাল মেয়ে।

সিহলী মাথা নেড়ে বলল, না, আমাকে সবাই ডানপিটে বলে। আমি অনেক রাতে একা একা নদীর ধারে ঘুরে বেড়াতে পারি। এ বনের অনেক ভেতরে ঢুকে একা বসে থাকতে পারি কতক্ষণ। আমার একটুও ভয় করে না।

পূষণ বলল, এমন মেয়েকে আমি খুব পছন্দ করি।

সিহলীর মনে হল, পূষণের কথাগুলো তার বুকে ঢেউ তুলছে। তার এই মুহূর্তে পূষণকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করল না।

সূর্য নেমে এসে ঢুকল বনের মাথায় জেগে থাকা মেঘের ভেতর। হঠাৎ ছায়া ঘনিয়ে উঠল বনে।

পূষণ বলল, তোমাদের নগরটি খুব সুন্দর, তাই না?

সিহলী বলল, অনেক অনেক সুন্দর। আমরা আগে যে বাড়িতে থাকতাম, সেটি হল পৌরসভার

কলাভবন। তার ওপরের ছাদে বসে নদী দেখতাম। অনেক রাতে যখন নগরীর সকলে ঘুমিয়ে পড়ত আর নদী ঢেউয়ের দোলায় জ্যোৎস্নার আলো নেচে নেচে বেড়াত, তখন আমিও নাচতাম।

পূষণ বলল, তুমি নাচতে পার বুঝি?

সিহলীর এখন মনে হল, নাচতে জানার কথাটা বলে ফেলা ঠিক হয়নি। সে বলল, সামান্য জানি আমি। আমার মা খুব ভাল নাচতে পারে।

পূষণ অবাক হয়ে বলল, তোমার মা-ও ভাল নাচতে পারেন?

সিহলী বলল, মা যে নগরনটী ছিল, তাই অনেক ভাল নাচতে পারে। মা নটীর কাজ ছেড়ে দিলে কলাভবনে আর থাকতে পেলাম না।

পূষণ বলল, এখন কোথায় থাক তোমরা?

অনেক দূরের একটা জায়গার দিকে আঙুল দেখিয়ে সিহলী বলল, ওই যে নগরের শেষ প্রান্তে।

গাছের ফাঁকে নিচু হয়ে জায়গাটা দেখবার চেষ্টা করছিল পূষণ। তার মাথাটা আরও নিচু করে নামিয়ে এনে সিহলী বলল, দেখতে পাচ্ছ না? ওই যে একটা অশ্বত্থগাছ, দূর থেকে অনেক ছোট দেখাচ্ছে, ওর পাশেই আমাদের ঘর। গাছের আড়াল পড়েছে কি না, তাই দেখতে পাচ্ছ না।

পূষণ মাথা তুলে হেসে বলল, অনেক নিচু হলে তবেই সবকিছু দেখা যায়।

সিহলী বলল, তার মানে?

পূষণ বলল, তুমি আমার উঁচু মাথাটাকে নিচু করে ধরলে বলেই তো সব কিছু দেখতে পেলাম।

সিহলীর মুখে সলজ্জ হাসি ফুটে উঠল। হঠাৎ মনে পড়ল তার একটা কথা, জান, মা ঠিক তোমার মত কথাই বলে। মা বলে, বড় হয়ে থাকতে নেই, ছোট হয়ে থাকতে হয়, তাহলেই সংসারে মাথা ঠিক রেখে চলা যায়। আরও বলে, দুঃখ পেতে শিখতে হয়, তাহলেই সত্যিকারের সুখ একদিন পাওয়া যায়।

আমি কিন্তু এসব কথার মানে বুঝি না। আমার ঐ শীলমোহর তৈরি করে যে বুড়ো পামীরভ তার গল্প শুনতে খুব ভাল লাগে। দেশ বিদেশের কত গল্প বলে ও।

পূষণ বলল, উনি বুঝি অনেক দেশ ঘুরেছেন?

সিহলী বলল, মোটেও না। এতটুকু ছোট একখানা ঘরের ভেতর বুড়ো বসে থাকে। রাজ্যের বণিক আসে ওর কাছে শীলমোহর বানাতে। তাদের কাছ থেকে হাজার গল্প শোনে। আর ওর মুখ থেকে ওইসব গল্প আমি আর তার নাতি বসে বসে শুনি।

পূষণ বলল, এখানকার বণিকেরা কী ধরণের ব্যবসা করে?

অতশত জানি না। তবে সোনা রূপো শঙ্খ পাথর এসবের দোকান অনেক আছে নগরের ভেতর। মনে হয় ঐসবই নিয়ে যায় বাইরের দেশবিদেশে।

পূষণ বলল, তোমাদের নগরের ছেলেরা কী ধরণের খেলাধূলো করে?

হাসল সিহলী। বলল সবাই যেমন খেলে। এই ধর সাঁতার কাটা, দৌড়ঝাঁপ।

পূষণ বলল, তীর-ধনুক নিয়ে খেলে না?

সিহলী বলল, ছোট ছোট ছেলেরা ওইসব নিয়ে খেলা করে।

পূষণ এবার আসল কথায় এল, নগর রক্ষা করার জন্যে তোমাদের কোন সৈন্য নেই?

সিহলী বলল, নগর রক্ষা করেন পৌরপিতারা। তাঁদের নিযুক্ত লোকেবা কাজ করে যায়। কাজে গাফিলতি করলে শাস্তি আছে। তবে সৈন্যসামন্ত আছে কি না জানি না, ওসব দেখিনি কোনদিন।

পূষণ সিহলীর কোমরে একখানা ছুরির মত কিছু গোঁজা আছে দেখে বলল, ওটা কী দেখা যাচ্ছে তোমার কোমরে?

সিহলী ছুরিটা বের করে বলল, ভারী দুষ্টুমি করে আমার ওই ছাগলগুলো। ওদের ভয় দেখানোর জন্য ছুরি দিয়ে ছোট ছোট ছড়ি বানাই।

পূষণ সিহলীর হাত থেকে ছুরিখানা চেয়ে নিয়ে দেখতে লাগল। না, ছুরিতে এদের লোহার কোন

ব্যাপারই নেই। পূষণ ভাবল, যদি লোহার ব্যবহার জানত এ নগরীর লোকেরা, তাহলে ছুরিতেও লেগে থাকত তার ছোঁয়া।

সিহলীর হাতে ছুরিখানা ফিরিয়ে দিয়ে পূষণ তার ঘোড়ার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, কেমন দেখতে বল তো আমার ঘোড়াটি?

সিহলী বলল, খুব ভাল দেখতে। আমি কখনও এমন জন্তু দেখিনি। কেমন তোমাকে পিঠে নিয়ে দৌড়োয়।

পূষণের মুখে কী যেন এক ধরনের জয়ের হাসি ফুটে উঠল। সে ভাবল, এখনও এ নগরীর অধিবাসীরা অশ্বের ব্যবহার সম্বন্ধে অজ্ঞ।

পূষণ বলল, এখন আমাকে অনেক দুরের পথে পাড়ি দিতে হবে। মেঘও ঘনিয়ে উঠছে।

সিহলীর এই মুহূর্তে পূষণকে ছেড়ে দিতে খুব খারাপ লাগছিল। সে বলল, তুমি কোথায় এসেছিলে বললে না তো?

পূষণ দুটি নীল চোখের চাহনি শ্যামলা মেয়েটির ঢলঢলে মুখের ওপর ফেলে বলল, যদি বলি তোমাকে দেখতেই এসেছিলাম?

সিহলী মাথা নেড়ে বলল, মিছে কথা।

পূষণ বলল, দেখ আমি যেদিক থেকে এসেছিলাম, আবার সেদিকেই ফিরে যাচ্ছি।

সিহলীর বিশ্বাস হচ্ছিল না। তবু একটি তরুণ তার জন্য এসেছে, এ কথা বিশ্বাস করতে তার খুব ভাল লাগছিল।

পূষণ সিহলীর হাত ধরে বলল, এসো আমরা বনের বাইরে যাই।

বলতে বলতে অঝোরে বৃষ্টি নামল। দেখতে দেখতে অন্ধকার হয়ে উঠল বনের ভেতরটা। ঘন ঘন বিদ্যুতের চমক দিয়ে মেঘ ডাকতে লাগল।

ওরা বনের ভেতর একটা গাছের তলায় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রইল।

অন্ধকার ,অরণ্য, আর মেঘ চিরদিনই দুটি হৃদয়কে কাছে টানে।

বৃষ্টি থামলে ওরা বেরিয়ে এল বন থেকে। পূষণ দেখল সিহলীর সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে। সিক্তবস্ত্রের ভেতর দিয়ে ফুটে উঠেছে তার দেহের শ্যামশ্রী।

পূষণ ঘোড়ার ওপর উঠে বলল, আমি আবার আসব সিহলী। এই বনে তোমার সঙ্গে আমার আবার দেখা হবে।

ঘোড়া চালিয়ে চলে যেতে যেতে ফিরে দাঁড়াল সে। বলল, আমাদের এ কথা কেউ যেন না জানতে পারে, কথা দাও।

সিহলী মাথা নেড়ে জানাল, কেউ জানবে না।

পূষণ চলে গেল। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সিহলীর চোখ ঝাপসা হয়ে এল। সে বনের ভেতর ছুটে গেল সেই গাছের তলায়। যেখানে পূষণ আর সে দাঁড়িয়েছিল অঝোর বৃষ্টির ভেতর। বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল, কিন্তু সিহলীর চোখে সেদিন নেমেছিল অশ্রান্ত বর্ষণ।

দ্বিতীয় দিনে সিহলী অনেক আগে বনে এল। ছাগলগুলো চরতে চরতে বনের কোল ঘেঁষে অনেকদূর চলে যাচ্ছে, কিন্তু সেদিকে আর চোখ নেই সিহলীর। সে তাকিয়ে রইল সেই পথটির দিকে যে পথে কাল ঘোড়ায় চড়ে এসেছিল তরুণ পূষণ।

সে বসে রইল পূষণের প্রতীক্ষায়, কিন্তু কোন অশ্বের খুরের শব্দ বেজে উঠল না। সূর্য মাথার ওপর থেকে নামতে লাগল পশ্চিমে। স্তব্ধ মূর্তির মত তেমনি বসে রইল সিহলী শেষসূর্যের রং গায়ে মেখে। সন্ধ্যার ছায়া ঘনিয়ে উঠতেই ঘন্টাধ্বনি তুলে ঘরের পথে ফিরে চলল ছাগল আর মেষের দল। সিহলী উঠে দাঁড়িয়ে চলতে লাগল তাদের পেছনে পেছনে। বড় শূন্য মনে হল তার বুকখানা। ভারহীন শূন্যতায় সে এলোমেলো পা ফেলে বিরাট প্রান্তরের ওপর দিয়ে পথ চলতে লাগল। কী এক অসম্ভব প্রত্যাশা যেন তার

সমস্ত শক্তিকে কেড়ে নিয়ে নিঃশেষ করে দিয়ে গেছে।

রাতে বিছানায় শুয়ে সে কতক্ষণ আপন মনে কাঁদল। কান্না ফুরিয়ে গেলে একটা কঠিন প্রতিজ্ঞা তার মনকে দৃঢ় করে তুলল। সে আর ও বনের পথে তার ছাগল নিয়ে যাবে না। একটি দিনের ঘটনাকে সে মিথ্যা স্বপ্ন বলে মনে করে ভুলে যাবে।

ভোরে উঠে মায়ের সঙ্গে ঘরের কাজ করল ক্ষিপ্রহাতে। নগরে গেল দুধের পাত্র নিয়ে দুধ বিক্রি করতে। হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে ভুলে গেল মা তাকে কী কী জিনিস নিয়ে যেতে বলেছিল। সে বুড়ো পামীরভের দোকানে গিয়ে বসল গল্প শোনার আশায়। বুড়ো গল্প শুরু করল, কিন্তু একটি বর্ণও তার কানের ভেতর দিয়ে মনে গিয়ে পৌঁছল না। সে শুধু পামীরভের মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল।

বাজারে গিয়েছিল সব ভোলার আশায়, কিন্তু বাজারে গিয়ে শুধু বাজারটাকে ভুলে গেল। ঘরে ফিরে এল সিহ্লী, কিন্তু ঘরের কাজে আর মন বসল না তার।

দুপুর হতে না হতেই সিহ্লীর ছাগলগুলো ঘন্টি বাজাতে বাজাতে চলল প্রভুর আগে আগে। সিহ্লী হাতের ছড়ি হাওয়ায় বাজিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে চলল তাদের।

আবার সেই বসে থাকা পথের দিকে চোখ চেয়ে।

কতক্ষণ এমনি বসে থেকে সে আবার গেল বনের ভেতর সেই গাছতলায়। দাঁড়িয়ে রইল গাছে হেলান দিয়ে। ভাবতে লাগল, ঝর ঝর করে পড়ছে বৃষ্টি, আর সে দাঁড়িয়ে আছে তরুণ পূষণকে জড়িয়ে ধরে।

চমকে উঠল সিহ্লী, পেছন থেকে সিসম্‌গাছটি সহ তাকে জড়িয়ে ধরেছে কেউ। সে চিৎকার করতে গিয়ে থেমে গেল। এ হাত তার অচেনা নয়। সে হঠাৎ জোর করে ছাড়িয়ে নিল তার দেহ। মুখ নিচু করে চলে এল বনের বাইরে। এখন প্রান্তরে বিচরণশীল মেষগুলো হয়ে উঠল তার লক্ষ্যবস্তু।

পাশে এসে দাঁড়াল পূষণ। বলল, আমি সেই কখন থেকে বনের ভেতর তোমার প্রতীক্ষায় ঘুরে বেড়াচ্ছি সিহ্লী।

সিহ্লী খুব চেঁচিয়ে কল্পিত কোন অপরাধের জন্য একটা মেষকে তিরস্কার করল। পূষণের কথা সে কানেই তুলল না।

পূষণ এবার বলল, দেখ, কাল তোমার কাছে যখন আসছিলাম তখন পাথর ছড়ানো পথে ঘোড়াটা পিছলে পড়ল। অমনি আমিও পড়লাম হুমড়ি খেয়ে। কেটে গেল বাম হাতখানা। তাই মাঝ-পথ থেকেই ফিরে যেতে হল শিবিরে।

ফিরে দাঁড়াল সিহ্লী। পূষণের বাম হাতখানা টেনে নিল সে নিজের বুকের কাছে। হাত বুলিয়ে দিতে লাগল ব্যথার ওপর। সব রাগ তার এখন চোখের জল হয়ে ঝরে পড়তে লাগল।

একটু শান্ত হয়ে সিহ্লী বলল, খুব লেগেছে?

পূষণ বলল, পড়ে গিয়ে লেগেছিল, তারপর ব্যথা বেড়েছিল রাতে। এখন বনৌষধি ব্যবহার করে ভাল আছি।

সিহ্লী বলল, বাড়িতে কে আছে তোমার?

পূষণের মুখে ম্লান হাসি ফুটে উঠল। সে বলল, তোমার মা আছেন, আমার কেউ নেই।

সিহ্লী শিউরে উঠল, কেউ নেই?

পূষণ বলল, জন্ম দিয়ে মা মারা গেলে আমি এক মহানুভব মানুষের কাছে থেকে বড় হয়েছিলাম। তিনি আমাকে যতদূর সম্ভব শিক্ষা দিয়েছিলেন। এখন আর তিনি ইহলোকে নেই। আমি আমার শক্তির পরিচয় দিয়ে এখন এক গোষ্ঠীর পরিচালক হয়েছি।

সিহ্লী বলল, তোমার খুব কষ্ট হয়, না?

পূষণ বলল, আমাকে যিনি পালন করেছিলেন তিনি দিয়েছিলেন কষ্ট জয়ের মন্ত্র। সে মন্ত্র হল কষ্টের ভেতর পড়লে তার চেয়ে অনেক বেশি কষ্টের কথা চিন্তা করতে হয়। তাই এখন কোন কষ্টই আর আমাকে পীড়া দিতে পারে না।

সিহলী বলল, তুমি কোন্ একটা দলকে চালিয়ে নিয়ে বেড়াও বললে না, তোমার কী ঘরবাড়ি নেই?

পূষণ বলল, রুক্ষ প্রকৃতির সঙ্গে চিরদিন আমাদের মানুষেরা যুদ্ধ করে বাঁচার পথ করে নিত। এখন আমরা তোমাদের মতো ঘর বেঁধে থাকতে চাই। তাই ঘরের জায়গার সন্ধানে দলে দলে ঘুরে ফিরছি।

সিহলী বলল, আমার মনে হয়, আমি যদি তোমাদের মতো পথে পথে ঘুরে বেড়াতে পারতাম তাহলে কী ভালই না লাগত।

পূষণ বলল, তুমি আসবে আমার সঙ্গে?

সিহলী মুখ নিচু করে কিছু ভাবল। তারপর একসময় বলল, মা রয়েছে ঘরে, তাকে ফেলে উধাও হয়ে যাই কেমন করে বল?

একটু থেমে পূষণের মুখের ওপর চোখ রেখে বলল, তুমিই থেকে যাও না এখানে। আমরা অনেক সুখে থাকব। তুমি গমের চাষ করবে, আমি ভাঙব, খাবার বানাব। তারপর চাষের মরশুম চলে গেলে আমি ছাগল চরাব আর তুমি অমনি ঘোড়ায় চড়ে এসে পেছন থেকে ভয় দেখাবে।

পূষণ বলল, তবে তুমি যে বল, তুমি নাকী ভয় পাও না?

সিহলী হেসে বলল, শুধু তোমার কাছ থেকেই পাই।

সেদিন গল্পের জোয়ারে ভেসে গেল দুটি তরুণ-তরুণী। সন্ধ্যা নামল। চাঁদের উদয় হল।

পূষণ তার ঘোড়ার উপর বসাল সিহলীকে। অতি দ্রুত ঘোড়া চালিয়ে সে নগরের কাছাকাছি একটি জায়গায় তাকে রেখে দিয়ে গেল। যাওয়ার সময় বলল, চিন্তা কোর না সিহলী, চন্দ্রের কলাপূর্তির দশম দিন আজ, চন্দ্রের কলাক্ষয়ের দশম দিনে আমি তোমার ঘরের সামনের ওই অশ্বত্থবৃক্ষের তলায় এসে দাঁড়াব। সে রাতে আবার তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে। এ কটি দিন আমার অদর্শনে অধীর হয়ো না।

।। সতেরো ।।

তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে নগরের ভেতর। দলে দলে নগরবাসী চলে যাচ্ছে সিন্ধুনদ পেরিয়ে পূর্ব মুখে। সিন্ধু ভরে উঠেছে কানায় কানায়। যে-কোন মুহূর্তে উচ্ছ্বসিত আবেগে ফেটে পড়বে সে। নতুন প্লাবনের আর একটিমাত্র তরঙ্গই নগরী মহেঞ্জোদড়োকে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট বলে মনে করছেন নগর-প্রবীণেরা।

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরও ভয়াবহ একটি সংবাদ, ঝড়ো হাওয়ার বুকে বিদ্যুৎ-চমকের মতো তা ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। কৃষ্ণা রাত্রির কোন একটি দিন এ নগরীকে বিধ্বস্ত করবার জন্য আসছে বন্যার চেয়েও ভীষণ শত্রুদল।

দেখতে দেখতে শ্মশানপুরীতে রূপান্তরিত হয়ে গেল মহানগরী মহেঞ্জোদড়ো। দিনের বেলাতেও কতকগুলি সারমেয় আর পথচারী বৃষভ ছাড়া অন্য কোন প্রাণীকে বিচরণ করতে দেখা গেল না সেখানে।

তুর্বাণ প্রথমে সভা ডেকে বলেছিল নগরবাসীদের , বন্যা আমাদের সহচর। আমরা উন্নত ভিত্তিভূমির ওপর নির্মাণ করেছি আমাদের ঘর। ভয় পেয়ে পিতৃপুরুষের স্মৃতি-জড়িত এই মহানগরীকে ত্যাগ করে যাবেন না। আর শত্রু যদি আসে, তাহলে আসুন সমবেত চেষ্টায় তাদের প্রতিরোধ করি।

তুর্বাণকে সমীহ করত সকলে তবু একটা অজানা আতঙ্ক যেন ঝড়ো হাওয়ার মুখে শুকনো পাতার মতো তাদের উড়িয়ে নিয়ে গেল।

নিঃসঙ্গ তুর্বাণ নগরের পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। সন্তরণ বাপীর তীরে বসে থাকে। তার চোখের ওপর ভেসে ওঠে ছবি, স্নান করতে নেমেছে স্নানার্থীর দল। তোলপাড় করে তুলেছে বাপীর জল।

মন্দির-প্রাঙ্গণে এলে তার মনে হয় মাতৃকা দেবীর পূজারতি চলেছে।

বিদেশি বণিকদের প্রশস্ত ঘরগুলির পাশ দিয়ে যেতে যেতে মনে হয়, বিচিত্র বিদেশি ভাষার কল-কোলাহলে সেগুলি পূর্ণ হয়ে আছে।

সিন্ধুর দিকে তাকিয়ে বসে থাকে তুর্বাণ। তার কেন জানি না মনে হয়, সাদা পাল তুলে এগিয়ে আসছে

সারি সারি তরণী। তার পিতা গুর্বাক দাঁড়িয়ে আছেন সম্মুখের তরণীর ওপর। দক্ষিণ বাহু প্রসারিত করে দেখাচ্ছেন, ওই আমাদের মহানগরী মহেঞ্জোদড়ো।

এক রাতে পথে ঘুরতে ঘুরতে কী মনে হল তুর্বাণের, এসে দাঁড়াল আন্দ্রার কুটিরের সামনে। লোকমুখে শুনেছিল, আন্দ্রা তার কন্যা সিহলীকে নিয়ে বাস করে নগরের এই উপান্তে। সে জানে মহানগরী শূন্য হয়ে গেছে। আন্দ্রা তার কন্যাকে নিয়ে সকলের মতো সরে চলে গেছে নিরাপদ স্থানে।

দূর থেকে একটা ক্ষীণ আলোকশিখা টেনে আনল তাকে আন্দ্রার ঘরে।

প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে তুর্বাণ অনেক দিন পরে ডাক দিল, আন্দ্রা আন্দ্রা।

আন্দ্রা, আন্দ্রা।

প্রদীপ নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল আন্দ্রা। হাতে ধরা দীপ কাঁপছে।

তুর্বাণ বলল, তুমি এখনও নগরী ছেড়ে চলে যাওনি আন্দ্রা?

আন্দ্রার মুখে ম্লান হাসি ফুটে উঠল। অন্ধকারে তা দেখা গেল না। সে শুধু বলল, বিপদের মুখে স্বামীকে ফেলে রেখে কোন নারী কী চলে যেতে পারে তুর্বাণ?

তুর্বাণ আন্দ্রার ঘরের ভেতর উঠে এল। আন্দ্রার হাত ধরে বলল, আজ তো কোন বাধা নেই আন্দ্রা, তবুও আজ কেন তুমি এখানে পড়ে থাকবে? চল আমার ঘরে চল।

আন্দ্রা বলল, তোমার ঘরে যখন যেতে পারি নি কোনদিন, তখন আজ সেখানে যাবার লোভ নাই বা দেখালে তুর্বাণ। শুধু তোমার মনের থেকে হারিয়ে যাই নি, এই আমার সব দুঃখের সান্ত্বনা। এসেছ আজ, দেখে যাও তোমার মেয়েকে। সে হয়েছে ঠিক তার বাবার মতো। স্বপ্ন নিয়ে থাকতে ভালবাসে রাত্রিদিন। সব কাজের মাঝখানে চোখ দুটি তার বাবার মতো ভাবনার জাল বুনতে থাকে।

কখন এসে দাঁড়িয়েছে সিহলী। সে অবাক হয়ে শুনছে ওদের কথা।

সিহলী বলল, কী বলছ মা নগরপিতাকে? কে আমার বাবা?

আন্দ্রা নিরুত্তর। তুর্বাণ এগিয়ে এসে বুকে চেপে ধরল সিহলীর মাথা। অজস্র চুম্বনে ভরে দিল তাকে। বলল, আমি আর নগরপিতা নই মা, আমি এখন থেকে শুধু তোরই পিতার অধিকারটুকু নিয়ে দাঁড়াতে পারব। এখন থেকে কেউ আর তোকে আমার কাছ-ছাড়া করতে পারবে না।

সিহলী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল, কেন বলনি এতদিন তুমি আমার বাবা? কেন তুমি আমাকে তোমার স্নেহ থেকে সরিয়ে রেখেছিলে?

তুর্বাণ শুধু বলতে লাগল, আমি অপরাধী। সব অপরাধ আমার মা।

সেদিন থেকে আন্দ্রার কুটিরেই রয়ে গেল তুর্বাণ। অভিমানী আন্দ্রার নগরের পথ স্পর্শ না-করার প্রতিজ্ঞাটুকু অটুট থেকে গেল।

অন্ধকার পক্ষ শুরু হবার পর থেকে বর্ষণও শুরু হয়েছিল। প্রবল বর্ষণে নগরীর পথ-ঘাট জলমগ্ন। ভূগর্ভের নালিপথ টানতে পারছিল না আকাশের বিপুল জলধারা। জলকুণ্ডগুলি পূর্ণ হয়ে উপচে পড়ছিল পথে। বিপর্যস্ত পৌর-ব্যবস্থার দিকে দূর থেকে অসহায়ের মতো তাকিয়েছিল তুর্বাণ।

আন্দ্রা এসে দাঁড়াল তার পাশে। বলল, কেন তুমি কষ্ট পাও তুর্বাণ? সবটুকু শক্তি নিয়ে কেউ কোনদিন আসেনি পৃথিবীতে। আমরা যখন হার মানি তখনই বুঝতে পারি আমরা সর্বশক্তিমান নয়।

তুর্বাণ বলল, নিজের হাতে গড়ে তুলেছি যাকে, চোখের সামনে তাকে পরিত্যক্ত কবরভূমি হয়ে যেতে দেখলে কার প্রাণ স্থির থাকে আন্দ্রা।

একটু থেকে আবার বলল, আমার জীবনে কোথাও একটা অভিশাপ আছে, যে অভিশাপ আমার প্রতিটি চেষ্টাকে ছুঁয়ে ব্যর্থ করে দিয়ে যাচ্ছে। জীবনের প্রথম বাণিজ্য-যাত্রা সফল হল না। আমার জীবনের প্রথম নারীকে আমি পেয়েও হারালাম।

আন্দ্রা বলল, তুমি তো আমাকে বলনি তুর্বাণ সে নারীর কথা?

তুর্বাণ বলল, বাণিজ্য-যাত্রার পথে আঁধিতে দিক হারিয়ে আমি তার আশ্রয়ে গিয়ে পড়েছিলাম। সে আমাকে সেবা আর সঙ্গ দিয়েছিল। আজ জীবনের সব হারিয়ে কোনও কথা আর গোপন করে রাখতে চাই না আন্দ্রা দেহ দান করে সন্তানের জননী হতে চলেছিল, কীন্তু আমি নির্মম নিয়তির তাড়নায় চলে আসতে বাধ্য হয়েছি তাকে ফেলে। আমি জানি না, আমার সে অতীত জীবনে বিধাতা কী যবনিকা ফেলে দিয়েছেন।

মুখে হাত চেপে প্রবল আবেগে কাঁদতে লাগল আন্দ্রা।

তুর্বাণ বলল, আমি জানি আন্দ্রা সবার কাছে আমি আজ অপরাধী। অলক্ষ্য পুরুষ কৃপাণ তুলেছেন। আমাকে শাস্তি নিতে হবে মাথা পেতে।

আন্দ্রা তুর্বাণের হাত ধরে বলল, তুমি কেন নিজেকে অপরাধী ভাবছ? আমার চোখের জলে কোনও ঈর্ষা নেই তুর্বাণ। শুধু সেই ভাগ্যহীনা নারীর কথা ভেবে আমি চোখের জল ফেলেছি।

তুর্বাণ বলল, আন্দ্রা, তোমার দিকে তাকীয়ে আমার বিস্ময়ের শেষ নেই। শত পুরুষে একদিন ভোগ করেছে যে দেহ সে দেহে এত পবিত্র মন কী করে আশ্রয় পায়, তা ভেবে আমি কূল পাই না।

আন্দ্রা বলল, তোমার স্পর্শই আমাকে সে শক্তি দিয়েছে তুর্বাণ।

সন্ধ্যার অন্ধকারে চলেছে মেঘের গর্জন। কয়েকদিন ক্ষান্ত বর্ষণের পর অপরাহ্ন থেকে আকাশে শুরু হয়েছে নতুন করে মেঘসজ্জা। অমা রজনীর দশম দিন আজ। তুর্বাণ বেরিয়েছে নদীতীর-পরিক্রমায়। বন্যার ভয়াবহ আক্রমণের সম্ভাবনা পরিমাপ করতে বেরিয়েছে সে মধ্যাহ্ন থেকে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হল, তখনও ফিরে এল না তুর্বাণ। বৃষ্টিপাত শুরু হয়নি, কীন্তু আকাশ জুড়ে শুরু হয়ে গেছে মেঘের তাণ্ডব। বার বার বিধাতাপুরুষের হাতের চাবুক বিদ্যুৎ হয়ে ঝলসে উঠছে আকাশে।

দ্রুতপায়ে সিন্ধুতীর থেকে রোজকার মতো নগর-পরিক্রমা শেষ করে ফিরে আসছিল তুর্বাণ। হঠাৎ দূর থেকে ভেসে আসা একটা শব্দ কানে এসে বাজল। তুর্বাণ স্থির হয়ে দাঁড়াল পথে। শব্দ ক্রমেই নিকটবর্তী হতে লাগল। বহু বছর আগে এ শব্দের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল তার । সহসা সে স্মৃতি তুর্বাণের মনে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কোনও অশ্বারোহী এগিয়ে আসছে। পরমুহূর্তে তার মনে হল, নগর আক্রমণের অশুভ ইঙ্গিত যেন বেজে উঠছে এই অশ্বখুরধ্বনিতে।

তুর্বাণের হাতের বর্শা দৃঢ় মুষ্টিতে আবদ্ধ হয়ে রইল। সে সরে এসে আত্মগোপন করল প্রাচীন অশ্বত্থবৃক্ষের আড়ালে। বিদ্যুতের আলোয় দূর থেকে দেখল অশ্বারোহী এগিয়ে আসছে। হঠাৎ কাছে এসে অশ্বের বল্গা আকর্ষণ করল আরোহী।

তুর্বাণ তুলে ধরেছে তার বর্শা। অব্যর্থ লক্ষ্যে সে ভেদ করবে ওই আগন্তুক শত্রুর বক্ষ। আর একবারমাত্র বিদ্যুৎ-চমকের অপেক্ষা।

বৃক্ষের আড়াল থেকে শত্রুর মুখোমুখি বেরিয়ে এসেছে তুর্বাণ। মুহূর্তে আকাশের বুক চিরে ঝলসে উঠল বিদ্যুৎ।

একি, কী দেখল তুর্বাণ! হাতের বর্শা খসে পড়ে গেল ভূমিতে।

তুর্বাণ বিদ্যুতের আলোয় দেখল উর্বীকে দেওয়া তার নামাঙ্কিত মালা দুলছে তরুণ অশ্বারোহীর কণ্ঠে।

মুহূর্তকাল মাত্র। বিহ্বলতা কেটে গেছে অশ্বারোহীর। সে লাফ দিয়ে নামল ভূমিতে। চক্ষের পলকে কুড়িয়ে নিল তুর্বাণের ফেলে দেওয়া বর্শা।

অশ্বারোহীর নির্ভূল নিশানায় তুর্বাণ আপন বর্শায় আপনি বিদ্ধ হল।

ঝর্ ঝর্ করে ঝরে পড়ছে রক্ত। তুর্বাণ গভীর শান্তিতে ডুবে যাচ্ছে।

একসময় বিদ্যুতের আলোয় পুত্রের মুখের দিকে চেয়ে বলল, তুমি আমার উর্বীর সন্তান, আমার সবসেরা ধন।

আর্তনাদ করে উঠল পূষণ, কে , কে তুমি?

আমি তুর্বাণ, তোমার হতভাগ্য পিতা।

হাহাকার করে তুর্বাণকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল পূষণ। ঋভুগণ তোমরা আকাশ থেকে দেখ, পুষণ তার পিতাকে হত্যা করেছে!

হাহাকার শব্দ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল শ্মশান-নগরীর প্রাসাদে প্রাসাদে।

ছুটে আসছে সিহলী আর আন্দ্রা। বিদ্যুতের আলোয় পথ চিনে ছুটে আসছে তার শব্দ লক্ষ করে।

ছুটে আসছে অন্ধ এক শক্তি। সিন্ধুতীরের নগর-প্রাকার চূর্ণ করে দিয়ে, নগরীকে গ্রাস করতে করতে ছুটে আসছে সে।

পূষণের প্রসারিত বাহুতে পিতা তুর্বাণের প্রাণহীন দেহ। পশ্চাতে সিহলী আর জননী আন্দ্রা। সামনে এগিয়ে আসছে সেই কল্লোলমুখর মহাস্রোত যা সবকিছুর ওপর শান্তির অতল যবনিকা টেনে দেয়।

প্লাবন

পাক খেয়ে ঘুরতে ঘুরতে ঝড়ের হাওয়ায় দ্রুত এগিয়ে আসছে যেন একতাল কালো মেঘ। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝলকানি। প্রাকারে প্রহবারত রক্ষী ডান হাতে বর্শা ধরে স্থির হয়ে দাঁড়াল। বাঁ হাতখানা কপালে ঠেকিয়ে সূর্যের ঝলক থেকে চোখ বাঁচিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে লাগল ধাবমান বস্তুটিকে। এগিয়ে আসছে। ক্রমেই এগিয়ে আসছে প্রাসাদ লক্ষ করে। সরস্বতী নদীর তীরে জনপতি দিবোদাসের প্রাসাদ। প্রাসাদের পশ্চাদ্‌ভাগে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত জনপদ। নদীর ওপারে কঙ্করময় প্রান্তর ও বনরেখা। দিগন্ত ছুঁয়ে যায় ধূমল রঙের পর্বতশ্রেণী।

এখন স্পষ্ট হয়ে উঠল কৃষ্ণবর্ণের বস্তুটি। দুরন্ত গতিতে কালো ঘোড়ার ওপর সওয়ার হয়ে এগিয়ে আসছে একটি সৈনিক। তার স্বর্ণখচিত শিরস্ত্রাণের ওপর সূর্যের খররশ্মি ঝলসে উঠছে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎচমকের মতো।

দ্রুত প্রাকার থেকে নেমে এল প্রাসাদরক্ষী। প্রধান দ্বারপালকে জানিয়ে দিল অশ্বারোহী সৈনিকটির আগমন-সংবাদ। সঙ্গে সঙ্গে সে সংবাদ চলে গেল প্রাসাদের সভাগৃহে।

তখনও সভার কাজ চলছিল। মধ্যাহ্ন-বিরতির ঘন্টাধ্বনি পড়েনি। যুদ্ধের অগ্রগতি ও ফলাফল সম্বন্ধেই সভ্যদের মধ্যে চলছিল উত্তপ্ত আলোচনা। তারই মাঝখানে এসে পড়ল অশ্বারোহী সৈনিকের আবির্ভাবের খবর।

রাজা দিবোদাসের মুখ সঙ্গে সঙ্গে ছায়াচ্ছন্ন হয়ে উঠল। কৃষ্ণ অশ্বে আরোহণ করে আসার একটিমাত্রই অর্থ, পরাজয় অথবা ধ্বংস। রাজা বসে থাকতে পারলেন না সিংহাসনে। উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালেন। প্রধান পরামর্শদাতা পুরোহিত, কয়েকজন আগন্তুক বিশ্‌পতি, গ্রামণী আর করসংগ্রাহক ভাগদুঘ ও কোষাধ্যক্ষ রাজার সঙ্গে সঙ্গে আসন ত্যাগ করলেন। কারো মুখে কথা নেই। সকলের দৃষ্টি এখন প্রধান প্রবেশপথের দিকে নিবদ্ধ।

উদ্‌গ্রীব প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে এসে দাঁড়াল বার্তাবহ সৈনিক। আভূমি লুণ্ঠিত হয়ে রাজা ও সভাসদদের প্রণাম নিবেদন করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, সুবাস্তু জনপদের রাজাধিরাজ দিবোদাসের জয় হয়েছে। দস্যু কবষের অভেদ্য দুর্গদ্বার ভেদ করেছেন সম্রাটের মহাসেনানী তুর্বসু। আমাদের পূর্বযুদ্ধের পঞ্চ সম্মানীয় বন্দিকে তিনি মুক্ত করে এনেছেন। অসুর কবষের পঞ্চ সহস্র গো-ধনও মহারাজের অধিকারে এসেছে।

উল্লাসে সভাগৃহ যেন বিদীর্ণ হয়ে গেল সেই মুহূর্তে। মহারাজ দিবোদাসের জয় হোক। শতজীবী হোক সেনাপতি তুর্বসু।

উল্লাস কিছু পরিমাণে প্রশমিত হলে বার্তাবহ সহসা হাহাকার করে উঠল, মহারাজ, সেনাপতি তুর্বসু, পিতৃযানে প্রস্থান করেছেন।

তুর্বসু, মৃত!

বজ্রাহত মহীরূহের মতো ভেঙে পড়ে কোনও রকমে আসনে বসে পড়লেন রাজা দিবোদাস। সভার পারিষদেরা শোকে মুহ্যমান হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন সভাগৃহে।

বার্তাবহ বলতে লাগল, যুদ্ধ আর সন্ধির সবকিছু কাজ শেষ হলে যখন মহাউল্লাসে দস্যু কবষের

আয়সী-পুর্ ত্যাগ করে আমরা চলে আসছিলাম, তখন নিকটবর্তী এক পর্বতের ওপর থেকে নিক্ষিপ্ত তীর ছুটে এসে সেনাপতি তুর্বসুর বক্ষ বিদীর্ণ করে বেরিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে মাটিতে পড়ে যান মহাবীর তুর্বসু। অল্পক্ষণের ভেতরেই তাঁর প্রাণবিয়োগ ঘটে। আমরা যখন হাহাকার করছিলাম সেনাপতিকে ঘিরে তখন হঠাৎ দেখলাম, এক পরমাসুন্দরী নারী ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন পাহাড় থেকে। আমরা ছুটে গিয়ে সেই রমণীর কোনও চিহ্নই দেখতে পেলাম না। পাহাড়ের পাদদেশে আবিষ্কার করলাম একটি পরিত্যক্ত কূপ। হয়তো উচ্চ পাহাড় থেকে কূপের অতল অন্ধকারে তলিয়ে গেছেন রহস্যময়ী সেই রমণী। আমাদের অনুমান, ওই নারীর নিক্ষিপ্ত শরেই সেনাপতি তুর্বসু নিহত হয়েছেন। কী উদ্দেশ্য ছিল ঐ রমণীর তা আমরা কোনরকমেই অনুমান করতে পারিনি। দস্যু কবষ আমাদের অতি বিনয়ের সঙ্গে বন্দনা করে বিদায় দিয়েছেন। সুতরাং তাঁর নিযুক্ত কোন নারী সৈন্য যে নয় তা আমাদের বিশ্বাস কে' নিতে কষ্ট হয়নি। শুধু মনে হয়েছে, ওই পাহাড় আর সংলগ্ন অরণ্যে কী মৃগয়ারত ছিলেন ওই নারী? তাঁর ধনু থেকে নিক্ষিপ্ত শরই কী আকস্মিক ভাবে এই ভয়াবহ অঘটনটি ঘটিয়ে দেয়? আর হঠাৎ তাঁর কৃতকর্মের ফল জানতে পেরেই কী তিনি অনুশোচনায় আত্মহত্যা করে বসলেন?

এ সকল জিজ্ঞাসার কোনও উত্তরই আমরা পাইনি। শুধু মৃত্যুর আগে আমরা সেনাপতির মুখে এক টুকরো আশ্চর্য হাসির রেখা ফুটে উঠতে দেখেছিলাম। তিনি ওই পাহাড়ের দিকেই তাকিয়েছিলেন।

এরপর সমস্ত সৈন্য বিহ্বল আর শোক-সন্তাপে কাতর হয়ে মহাবীর তুর্বসুর মৃতদেহটি তুলে নিয়ে চলে এসেছে। আমি বার্তাবহ, তাই মহারাজ এ দুঃসংবাদ আমাকে বহন করে আনতে হয়েছে। আমি দ্রুত অশ্ব চালনা করে এসেছি। পেছনে আসছে আপনার শোককাতর বিজয়ী বাহিনী।

জনপতি দিবোদাস ললাটে করাঘাত করে বলতে লাগলেন, আমার একখানা পাঁজরের অস্থি খসে গেল অমাত্যগণ। এই তরুণ যুবা তুর্বসু নিজের দক্ষতায় আজ সবাইকে অতিক্রম করে যেখানে উঠেছিল, সেখানে বোধকরি সরস্বতী তীরবর্তী সুবাস্তু নগরীর অন্য কোনও কুশলী যুবাপুরুষই আরোহণ করতে পারত না।

বারংবার ললাটে করাঘাত করে হৃদয়ের আকুল আক্ষেপ জানাতে লাগলেন মহারাজ দিবোদাস। সভাসদদের দীর্ঘশ্বাস আর বিলাপধ্বনিতে পূর্ণ হল সভাগৃহ।

প্রধান অমাত্য সভাস্থাণুকে ডেকে বললেন, এই মুহূর্তে বার্তাঘোষক জনবাদীকে দিয়ে গ্রামে, নগরে খবর পাঠাও, তারা যেন বিজয়ী সেনাপতির সম্মানে প্রতিটি গৃহের উর্ধ্বে ধ্বজা উত্তোলন করে। আজ তুর্বসু মৃত নয়, আমাদের সমস্ত জনপদবাসীর অন্তরের যুবরাজ।

দুর্গপ্রাসাদের উচ্চ ও প্রশস্ত সোপানে দাঁড়িয়ে আছেন জনপতি দিবোদাস। দুই পাশে বিশ্‌পতি, গ্রামণী, অমাত্য ও অন্যান্য সভাসদেরা পাষাণ মূর্তির মতো স্থির। প্রাসাদশীর্ষে ও প্রাকারের স্থানে স্থানে আদিত্যবর্ণের ধ্বজা মৃদু বাতাসে আন্দোলিত হচ্ছে। সামনে পশ্চিম-বাহিনী সরস্বতীর স্রোতধারা এখন অস্তসূর্যের আভায় গলিত স্বর্ণবর্ণ। তার সর্পিল তীরভূমি ধরে বিপরীত স্রোতের মতো এগিয়ে আসছে সেনাবাহিনী। অগ্রবর্তী অশ্বারোহীদের শিরস্ত্রাণ হিরণ্য-সিপ্র আর বক্ষাবরণীর ওপর সূর্যের শেষ রশ্মি স্পর্শ করে আছে। তাদের দক্ষিণ বাহুতে ধৃত বর্শাগুলি উর্ধ্বমুখী হয়ে যেন আকাশ বিদ্ধ করছে। অশ্বগুলি এগিয়ে আসছে ছন্দিত লয়ে। মাঝে পত্র-পুষ্প শোভিত একখানি সুবর্ণখচিত রথ। তাকে আকর্ষণ করে আনছে চারটি সজ্জিত তেজস্বী শ্বেতবর্ণের অশ্ব। রথের শীর্ষে উড্ডীন রক্তপতাকা। পেছনে অগণিত সৈন্য ও পঞ্চসহস্র ধেনু। সে এক বিশাল সমারোহ! কিন্তু প্রায় নির্বাক সেই চলমান জনস্রোত। মাঝে মাঝে অশ্বের হ্রেষা আর ধেনুর হাম্বা ধ্বনি শোনা যায়।

রাজপ্রাসাদের পশ্চাতে প্রসারিত জনপদের প্রতিটি গৃহশীর্ষে পতাকা উড়ছে। পথে, গবাক্ষে, প্রান্তরে, নদীতীরে অগণিত নরনারী। যুবা বৃদ্ধ শিশু। মহা শোকে স্তব্ধ।

প্রাসাদের সামনে এসে থেমে গেল বাহিনী। রাজা দিবোদাস সোপান বেয়ে অবতরণ করে রথের কাছে এগিয়ে গেলেন। প্রধান ব্রাহ্মণ-অমাত্য মন্ত্রোচ্চারণ করলেন। জনপতি দিবোদাস উপস্থিত অমাত্যদের

সাহায্যে কাষ্ঠাধারে রক্ষিত সেনাপতি তুর্বসুর মৃতদেহ সরস্বতী তীরে নামালেন। সহস্র জনতা অমনি তুর্বসুর জয়ধ্বনিতে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলল।

নদীতীরেই পূর্বাহ্নে সজ্জিত ছিল চন্দনকাঠের চিতা। সেখানে বহন করে নিয়ে যাওয়া হল সেনাপতির নশ্বর দেহ। রক্ত সম্পর্কের কোন নিকট আত্মীয় ছিল না তুর্বসুর। তাছাড়া পরিণত যুবাপুরষ হয়েও অকৃতদার ছিল দিবোদাসের অতি স্নেহভাজন এই তরুণ সেনাপতি।

অগ্নিসংযোগ করল তুর্বসুর বাল্যসখা রাজা দিবোদাসের জামাতা ঋষি কুমার শুনক। রথে মৃতদেহের পাশে বসে এসেছিল শুনক দস্যুরাজ কবষের রাজ্যসীমা থেকে। দ্বিবর্ষ পূর্বে পুত্রহীন রাজা দিবোদাসের সেনাপতি হয়ে কবষের রাজ্য আক্রমণ করতে গিয়ে পাঁচজন সহযোদ্ধার সঙ্গে বন্দি হয় জামাতা শুনক। তারপর প্রধান সেনাপতি রণনিপুণ তুর্বসুকে রাজা দিবোদাস পাঠান দস্যু কবষের রাজ্য ধ্বংস করতে। উদ্দেশ্য, যদি জামাতা শুনক জীবিত থাকে তাহলে তার মুক্তি-সাধন। শুনক মুক্ত হল, কবষের অগণিত গোধনও পাওয়া গেল, কিন্তু বিনিময়ে দিতে হল তুর্বসুর অমূল্য জীবন।

চিতার অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হল। শুনক উচ্চারণ করল, হে মৃত, তোমার দৃষ্টি সূর্যলোকে যাত্রা করুক; তোমার শ্বাস বায়ুপ্রবাহের সঙ্গে মিশে যাক। তুমি তোমার অর্জিত পুণ্যে আকাশ ও ধরিত্রীতে গমন কর। তোমার দেহ জল ও উদ্ভিদে মিশে যাক।

এবার নিমিলিত চোখে চিন্তা করতে লাগল শুনক। তুর্বসু ধূমের মধ্যে প্রবেশ করছে। ধুম পেরিয়ে প্রবেশ করছে রাত্রির অন্ধকারে। এরপর ছয়মাস চলল তার দক্ষিণায়নের ভেতর দিয়ে যাত্রা। দক্ষিণায়ণ থেকে পিতৃলোক। পিতৃলোক থেকে আকাশ, আকাশ থেকে চন্দ্রমণ্ডল। চন্দ্রমণ্ডলের অবস্থান করে কর্মক্ষয়। তারপর আবার আকাশে পতন। বায়ুরূপে পরিণতি। মেঘের আকারে বিরাজ। তারপর বৃষ্টিরূপে ভূমিতলে অবতরণ। যব ও ব্রীহি ইত্যাদি শস্যের মধ্যে প্রবেশ। খাদ্যরূপে ঐ শস্যের জীবদেহ-পুষ্টি ও শুক্রে পরিণতি লাভ। অবশেষে ঐ শুক্রের প্রাণীদেহ ধারণ। যে যায় সে এমনি করেই ফিরে আসে।

ভাবতে ভাবতে শুনকের চোখের সামনে এসে দাঁড়াল তুর্বসু। শস্যের মতো সজীব, ভোরের আলোর মত লাবন্য-দীপ্ত। বর্ষার বারিধারার মত স্নিগ্ধ, প্রসন্ন। আকাশের মত উদার।

।। দুই ।।

শশ্বতী শয়নগৃহের বাতায়ণ পথে তাকিয়েছিল সরস্বতীর বহমান স্রোত ধারার দিকে। তার গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিল জলের ধারা। তুর্বসুর চিতা কখন নিভে গেছে। জনতা চলে গেছে শেষ জয়ধ্বনি দিয়ে। শুনক বন্ধুর কৃত্য সমাধা করে ফিরে গেছে নিজের ঘরে। শ্বশুরের প্রাসাদে ওঠেনি। শশ্বতী এখন পিতৃগৃহে। যথাসময়ে পিতা দিবোদাস তাঁর একমাত্র কন্যা শশ্বতীকে তিথি-নক্ষত্র বিচার করে আবার পাঠাবেন স্বামীগৃহে। জামাতার প্রত্যাবর্তনে তিনি অন্তরে যে গভীর আনন্দ পেয়েছেন তা শোকের প্রবলতায় প্রকাশ করার কোন সুযোগই পাননি। শুনকের পিতা ঋষি চয়মান পুত্রের আশা প্রায় ত্যাগ করেছিলেন। কেবল মাঝে মাঝে রাজা দিবোদাসের গুপ্তচরের মুখে শুনতে পেতেন, এখনও তাঁর পুত্র বন্দি-জীবন যাপন করছে। ক্ষীণ আশা প্রবল ঝড়ের মুখে নিভু নিভু হয়েও কোনরকমে দীপশিখার মত জ্বলে থাকত। আজ রাজগৃহ থেকে প্রেরিত বিশেষ দূতের মুখে খবর পেয়ে জনপদ থেকে রথে চড়ে এসেছিলেন ঋষি চয়মান। পুত্র শুনকের ক্রিয়াকর্ম শেষ হলে তাকে রথে নিজের পাশে বসিয়ে নিয়ে গেছেন গৃহের পথে। সেখানে পুত্রকে দেখবেন বলে কাতর চোখে চেয়ে বসে আছেন শুনকের জননী। চাঁদের জ্যোৎস্নায় পরিচিত পথ প্রায় প্লাবিত। বহু সম্মানিত ও সম্পন্ন ঋষি চয়মান রাজা দিবোদাসের বৈবাহিক। সহস্র ধেনু অপরিমিত স্বর্ণসম্পদ আর একটিমাত্র পুত্র ঋষি চয়মানের। পুত্রকে ফিরে পেয়ে ঋষি আজ বিহ্বল। তিনি শুনককে নিজের হাতে শাস্ত্র আর শস্ত্র দুটোই শিক্ষা দিয়েছেন। যোদ্ধা হিসেবে সুবাস্তু জনপদে তুর্বসুর পরেই স্থান ছিল শুনকের। দুজনেই বীর, দুজনেই ছিল গভীর বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। গুরু শুনহোত্রের গৃহে দুজনে পাঠ গ্রহণ করেছে বাল্যে। সেই শৈশব-স্মৃতি দুজনের ভেতর সমুজ্জ্বল ছিল প্রথম যৌবনের দিনগুলিতেও। কিন্তু এক সময় একটা অনুচ্চারিত

বেদনায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল তুর্বসুর অন্তর। বাইরে সে বেদনার প্রকাশ ঘটল না, কিন্তু মনের মধ্যে একটা কিট অহরহ দংশন করে ফিরতে লাগল। তুর্বসু রাজা দিবোদাসের কাছ থেকে সেনাপতির গুরু দায়িত্বভার যেদিন পেল সেদিন সে শুনকের মুখে দেখেছিল বিষণ্ণতার ছায়া নেমে আসতে। সে বন্ধুর বেদনায় আহত হয়েছিল। কিন্তু রাজার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথা বলার শক্তি ছিল না তার। দুজনে বহুবার সুবাস্তু জনপদের মানুষদের দৃষ্টির সামনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হয়েছে, প্রতিবারই জয়ী হয়েছে তুর্বসু। আবার সবার মাঝখানে সে বিষণ্ণ বন্ধুকে বুকে জড়িয়ে ধরেছে। কিন্তু শেষ প্রতিযোগিতায় তাকে হারতে হল। রাজা দিবোদাসের কন্যা শশ্বতীকে লাভ করল শুনক। প্রধান সেনাপতির পদ একদিন দেওয়া হল তুর্বসুকে মহা সমারোহে, আর তার অধীনে অন্যতম সেনাপতির দায়িত্বভার পেল শুনক, তবু রাজদুহিতা শশ্বতীকে হারানোর আঘাত ভুলতে পারল না তর্বসু। হৃদয় থেকে একদিন সব আঘাত মুছে যায় মোছে না শুধু ভালবাসার আঘাত। বার বার তার ওপর সান্ত্বনার প্রলেপ পড়লেও একেবারে নিরাময় কোনদিনই হয় না। মাঝে মাঝে ক্ষতস্থান প্লাবিত করে রক্তক্ষরণ হতে থাকে। তুর্বসু সুবাস্তু জনপদে রাজা দিবোদাসের পরেই দ্বিতীয় শক্তিমান ব্যক্তিরূপে চিহ্নিত হল, কিন্তু একটি যুবকের অন্তরে সেই অভাবিত সম্মান বিশেষ কোনও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল না। যৌবন শক্তি প্রার্থনা করে, সম্পদ আহরণের চেষ্টা করে, পৃথিবীর অধীশ্বর হতে চায়, কিন্তু বোধহয় তার সবচেয়ে প্রার্থিত বস্তু প্রেম। পার্থিব জগতে শক্তিহীন কপর্দকহীন হয়েও যৌবন চায় প্রেমের জগতে সম্রাট হতে। তুর্বসু সেই সাম্রাজ্যের অধিকার হারিয়ে মনের জগতে সর্বহারা হয়ে গেল।

রাত্রি গভীর। বাইরে জ্যোৎস্নায় প্লাবিত চরাচর। সরস্বতীর উপল আহত তরঙ্গ প্রবাহে চন্দ্রলোকের ঝিলিমিলি। সেদিকে পলকহীন দৃষ্টিতে চেয়ে আছে শাশ্বতী। স্মৃতির আঘাতে হৃদয়ে সঞ্চিত অশ্রুর উৎস মুখ খুলে গেছে আজ। দুটি চোখ ছাপিয়ে গাল বেয়ে সে অশ্রুবিন্দু গড়িয়ে পড়ছে বুকে। বিনিসুতোয় গাঁথা হয়ে চলছে অশ্রু-মুক্তোর মালা।

প্রথম স্মৃতি সেই বালিকা বয়েসের। আজও তা প্রথম জেগে ওঠা কুঁড়ির মতো আনন্দের রোমাঞ্চ-ভরা। আলোর স্পর্শে, বাতাসের ছোঁয়ায় সে এক অভাবনীয় অনুভূতি। যে গন্ধের সন্ধান সে কোনদিনই পায়নি হঠাৎ তার অস্পষ্ট আলোছায়াময় আর্বিভাব। একটা ব্যাখ্যাহীন কান্নার এক পশলা বৃষ্টির মতো ব্যথায় মনোরম। সমস্ত মন জুড়ে একটা সিক্ততার অশ্রুসজল আনন্দ।

সেদিন রাজা দিবোদাসের প্রাসাদ সংলগ্ন প্রান্তরে বর্শা নিক্ষেপের শেষ প্রতিযোগিতা চলছিল। এটা ছিল তরুণদের বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানের একটি অঙ্গ। উৎসাহী রাজা সপারিষদ বসে প্রতিযোগিতার আনন্দ উপভোগ করছিলেন। তিনিই এই প্রতিযোগিতার প্রবর্তক। কেবলমাত্র আনন্দ উপভোগ নয়, এর ভেতর দিয়ে জনপদের ভাবী বীরদের নির্বাচন করাও ছিল তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য।

শশ্বতী বসেছিল রাজা দিবোদাসের আসনে। একমাত্র কন্যা রাজার বড় আদরের। তাই সমস্ত নির্দোষ আনন্দের ভাগ তিনি দিতে চাইতেন শাশ্বতীকে। মেয়েকে অন্তঃপুরে রেখে কোন কিছু উপভোগ করতে তাঁর মন চাইতনা। জনপদবাসী দেখত মৃতদার রাজার পাশে রথে বসে আছে শশ্বতী। মৃগয়ায় রাজার সঙ্গে হস্তীপৃষ্ঠে চলেছে চারুদর্শনা কীশোরী কন্যাটি। উৎসবে যজ্ঞে রাজার পাশে পাশে চম্পক ফুলের মত ফুটে থাকত রাজকুমারী শশ্বতী।

বালিকা সেদিন বসেছিল রাজার পাশে। সে বিস্ফারিত চোখে দেখে যাচ্ছিল পর পর অনুষ্ঠানগুলি। অসিযুদ্ধ, মল্লক্রিড়া, অশ্বচালনা। প্রতিটি ক্রীড়ায় সে দেখছিল একটি তরুণের আশ্চর্য কৃতিত্ব। প্রতিযোগিতায় তাকে অতিক্রম করা তো দূরের কথা, তার কাছাকাছি পৌঁছবার সাধ্যও ছিল না অন্য কোনও প্রতিযোগীর। পিতা দিবোদাস আর তাঁর অমাত্যেরা তরুণটির প্রশংসায় সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন বার বার। বালিকা শশ্বতী কখন যে তরুণটির সাফল্যের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিল তা সে নিজেই বুঝতে পারেনি। অসিচালনা কিংবা অশ্বচালনার চরম উত্তেজনাকর মুহূর্তে তার বুকের মধ্যে দ্রুত লয়ে একটা শব্দ বেজে উঠল। যতক্ষণ না তরুণটি জয়ী হচ্ছিল ততক্ষণ বুকের কাঁপুনি তার থামছিল না।

শেষ প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। অশ্বে আরোহণ করে প্রতিযোগীরা ছুটে চলেছে সামনের একটি টিলার দিকে। ওই টিলার গা ঘেঁষে ভীষণ বেগে বয়ে যাচ্ছে একটা ঝোরা। এঁকে বেঁকে ওই ঝোরা সরস্বতী নদীতে এসে মিশেছে। প্রতিযোগীদের ঘোড়া ছুটিয়ে পার হয়ে যেতে হবে ওই ঝোরা। তারপর টিলা বেষ্টন করে আবার ঝোরা ডিঙিয়ে ছুটে আসতে হবে মূল প্রতিযোগিতার আসরে। সেখানে বড় মাঝারি ছোট তিনটি ধাতুর বলয় সমান দূরত্বে রাখা হয়েছে দণ্ডায়মান অবস্থায়। তারই ভেতর দিয়ে বর্শা ছুঁড়ে মারতে হবে। একেবারে ছোট বলয়টির ওপারে রাখা আছে একটি কাষ্ঠনির্মিত সৈনিক পুতুল। তার বুকের মাঝখানে সাদা একটি চিহ্ন দেওয়া আছে। ওই চিহ্নে গেঁথে দিতে হবে বর্শাফলক। কিন্তু স্থির হয়ে মাটিতে দাঁড়িয়ে বর্শা ছোড়া চলবে না। প্রতিযোগিতার আসরটি ঘোড়ায় চড়ে তিনপাক ঘুরে ওই ঘোড়াতে বসেই সঙ্গে সঙ্গে ছুড়ে মারতে হবে বর্শা।

প্রতিযোগীরা টিলা লক্ষ করে ছুটে চলেছে। ঝোরার কাছে গিয়ে থেমে গেল অধিকাংশ ঘোড়সওয়ার। কেবল তিনটি ঘোড়া তাদের আরোহীদের নিয়ে শূন্যে লাফিয়ে উঠল। ঝোরা পার হয়ে টিলার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল তারা তিনজন। এরপর দেখা গেল, তারা টিলা পরিক্রমা শেষ করে আবার ঝোরা পার হয়ে এপারের মাটি স্পর্শ করছে। দূর থেকে সবাই সচকিত হয়ে দেখল, একটি ঘোড়সওয়ার ঘোড়া থেকে নীচে লুটিয়ে পড়ল। অন্য দুজন ছুটে আসছিল। তাদের ভেতর একজন ঘোড়ার রাশ টেনে পেছন দিকে ফিরল। ঘোড়া থেকে নেমে সঙ্গীর পরিচর্যা করে আবার তাকে ঘোড়ায় তুলল। তারপর প্রথম ব্যক্তিকে লক্ষ করে আবার তাকে ঘোড়ায় তুলল। তারপর প্রথম ব্যক্তিকে লক্ষ করে তারা তীব্র গতিতে ছুটে আসতে লাগল।

প্রথম ঘোড়সওয়ার আগেই পৌঁছেছিল। সে নিয়মমতো আসর পরিক্রমা করে বর্শা ছুড়ল ঘোড়ার ওপর বসে। বর্শা প্রথম বলয় অতিক্রম করে দ্বিতীয় বলয়ের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

এরপর এসে বর্শা ছুড়ল ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যাওয়া ঘোড়সওয়ারটি। আসরে আগে পৌঁছেও আহত বন্ধুকে প্রথমে বর্শা ছোড়ার সুযোগ দিল সেই বহু প্রতিযোগিতার বিজয়ী তরুণ। কিন্তু তিনচক্র ঘুরে ঘোড়াটিকে সম্পূর্ণ সংযত রেখে স্থির নিশানায় বর্শা ছুড়তে পারল না সে। বর্শাটি তৃতীয় বলয়ের পাশে মাটিতে তীব্র বেগে গেঁথে গেল।

এরপর সাদা ঘোড়ার সওয়ার দ্রুতগতিতে তিন চক্রপরিক্রমা শেষ করে যথাস্থানে এসে আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় ঘোড়ার লাগাম আকর্ষণ করল। শব্দ করে ঘোড়া লক্ষ্য বস্তুর দিকে দুপা তুলে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎচমকের মতো ছুটে গেল হাতের বর্শা। বিদ্ধ হল কাঠের পুতুলের হৃদয়।

এতক্ষণ যেন দম বন্ধ হয়ে আসছিল শশ্বতীর। এখন তার ছোট বুক থেকে একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে গেল। সে আনন্দে উত্তেজনায় ঠেকিয়ে রাখতে পারল না তার চোখের জল।

রাজা দিবোদাস ঘোষণা করলেন, বিজয়ী তরুণ তুর্বসু আমাদের সুবাস্তু জনপদের গৌরব বলে আমি মনে করি। সে যে আজ শুধু সবচেয়ে কৃতি প্রতিযোগী রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে তা নয়, সে যে কত বড় হৃদয়বান ও বন্ধুবৎসল তারও প্রমাণ রেখেছে। তাই আজ আমার প্রদত্ত অশ্ব ও অস্ত্রই তার একমাত্র পুরস্কার নয়, আমার সেনাবাহিনীতে সে পাবে কনিষ্ঠতম সৈন্য-পরিচালকের পদ। আজ থেকে পাবে রাজপ্রাসাদ রক্ষার গুরুদায়িত্ব।

রাজার কথা সমাপ্ত হলে সকলে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল দিবোদাসের। পরক্ষণেই তুর্বসুর জয়ধ্বনিতে কেঁপে উঠল আকাশ-বাতাস। আনন্দে করতালি দিয়ে উঠল শশ্বতী।

পুরস্কার গ্রহণ করতে উঠে দাঁড়িয়ে তুর্বসু বলল, আমার বন্ধু শুনক যদি আজ ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে না যেত, তাহলে হয়তো শেষ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর গৌরব সে-ই অর্জন করতে পারত।

এ কথায় বিমর্ষ শুনকের ওপর কোনও মমতা বা সহানুভূতি বোধ করল না শশ্বতীর বালিকা হৃদয়।

একটু থেমে তুর্বসু বলল, জনপতি দিবোদাস আমাকে আজ যে দায়িত্ব দিলেন তা বহন করা আমার মতো অভিজ্ঞতাহীন তরুণের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। তবু তাঁর আর্শীবাদ ও ভালবাসার মর্যাদা রক্ষার জন্য

আমি সাধ্যমত চেষ্টা করব।

এরপর কত সোনালি সকাল আর জ্যোৎস্না-ঝরা রাত্রি কেটেছে শশ্বতীর এই তরুণের দিকে চেয়ে চেয়ে। রাজপ্রাসাদে সে ছিল শুধু পরিচারিকাদের দ্বারা পরিবৃত। পত্নী-বিয়োগের পর রাজা দিবোদাস আর দার-পরিগ্রহ করেননি। ঋষি অঙ্গিরসের কন্যা ছিলেন সরণ্যু। তরুণ রাজা দিবোদাস মৃগয়া করতে গিয়ে বিশ্রামের জন্য প্রবেশ করেন ঋষি অঙ্গিরসের অরণ্যগৃহে। সেখানে ঋষিকন্যা সরণ্যুকে দেখে তিনি মুগ্ধ হন। অসঙ্কোচে সরণ্যু অতিথি দিবোদাসের সেবায় নিযুক্ত থাকেন। ঋষি অঙ্গিরস তরুণ রাজার বিনয় ও বিভিন্ন বিদ্যায় অধিকার দেখে বড়ই প্রীত হলেন। রাজার প্রত্যাবর্তনের সময়ে তিনি তাঁকে নিভৃতে ডেকে বললেন, আমার কন্যা সরণ্যু বিদূষী। পতির সঙ্গে যজ্ঞ সম্পাদনে সক্ষম। তুমি যদি তোমার অন্তঃপুরে সরণ্যুকে পত্নীরূপে গ্রহণ কর তাহলে আমি ভারমুক্ত হতে পারি। সে তোমার প্রধানা ·'হিষী হোক, এই ইচ্ছা আমি তোমার কাছে জানাব না, কিন্তু সে তার সেবায় ও গুণে তোমার প্রিয়তমা রানী 'গবাতা'র পদ লাভ করুক, এই ইচ্ছা তোমার কাছে জানাব। এখন তোমার অভিমত জানতে পারলে আমি সুখী হই। তুমি আমার অতিথি। যদি কোনও কারণে তুমি আমার কন্যাকে প্রত্যাখান কর তাহলেও আমি বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ না হয়ে তোমার স্পষ্টবাদিতার জন্য অন্তর থেকে আশীর্বাদ জানাব। অসংকোচে এখন তুমি তোমার মনের কথা জানাও দিবোদাস।

তরুণ দিবোদাসের মনে যে আশা উষার মতো উদিত হচ্ছিল তা যে এমন করে মেঘমুক্ত আকাশে সূর্যালোকের মতো উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পারবে তা সে খানিক আগেও ভাবতে পারেনি। সরণ্যুকে দেখে তার মনে হয়েছিল, সে ধ্রুব নক্ষত্রের মতো স্থির ও শান্ত সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি।

রাজা দিবোদাস বললেন, ঋষিপ্রবর, আমি এখনও দার-পরিগ্রহ করিনি। আপনার প্রস্তাব কার্যকরী হলে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করব। আর শুধু বাবাতার পদই আপনাব কন্যা লাভ করবে না, একমাত্র মহিষীর পদও তিনিই লাভ করবেন।

অঙ্গিরস বললেন, কিন্তু পুরুষের বহুবিবাহ শাস্ত্র অনুমোদিত। তোমার একাধিক বিবাহে কোন বাধা নেই দিবোদাস। তরুণ দিবোদাস বললেন, এইমাত্র আমার জিহ্বা আপনার কন্যাকে একমাত্র মহিষীর পদ দেবার অঙ্গীকার করেছে, আমি এর অন্যথা করলে সত্যভ্রষ্ট হব।

পরদিন রাজা দিবোদাসের ইচ্ছায় ঋষি অঙ্গিরসের অরণ্য-নিবাসে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হল। বিবাহের নিশা অনুষ্ঠানে বধূ সরণ্যু বরের দৃষ্টি ধ্রুবনক্ষত্রের দিকে আকর্ষণ করে বললেন, ধ্রুব ওই নভোলোক, ধ্রুব এই ধরিত্রী, ধ্রুব ওই নক্ষত্র। আমিও পতিগৃহে বিরাজ করব ধ্রুব বধূরূপে।

অমনি বর বধূকে কাছে আকর্ষণ করে নিয়ে অরুন্ধতী নক্ষত্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, বশিষ্ঠের অরুন্ধতী, অগ্নির স্বাহা, ইন্দ্রের শচী, তুমিও আমার হও।

রাজা দিবোদাস তাঁর কথা রক্ষা করেছিলেন। দ্বিতীয় বিবাহের কথা তিনি আর চিন্তা করেননি। সরণ্যুর মৃত্যুর পরেও একমাত্র মহিষীর ওপর তাঁর একনিষ্ঠ ভালবাসায় ভাঁটা পড়েনি। সরণ্যুর দান হিসেবে শাশ্বতীকে তিনি স্নেহে প্লাবিত করে অন্তরে সান্ত্বনা পাচ্ছিলেন।

২

জনপতি দিবোদাসের বিশাল প্রাসাদ, আর তার সংলগ্ন উদ্যান বিশেষভাবে সুরক্ষিত। সুউচ্চ প্রস্তর-নির্মিত প্রাকার পরিবেষ্টিত প্রাসাদটি পশ্চাদ্দেশের জনপদ থেকে প্রায় অদৃশ্য। কেবল সৌধ-শীর্ষের সূর্যবর্ণের ধ্বজাটি বহু দূর থেকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু প্রাসাদের সম্মুখভাগ প্রাকার বেষ্টিত হলেও প্রাসাদের যে-কোনও কক্ষ থেকে সরস্বতীর প্রবাহ চোখে পড়ে। নদীর ওপারে প্রসারিত প্রান্তর ও স্থানে স্থানে বনভূমি চোখের দৃষ্টি কেড়ে নেয়।

শশ্বতী তার শয়নকক্ষে কোনও পরিচারিকাকে রাত্রিবাসের অনুমতি দেয়নি। কৈশোর থেকেই সে ভালবাসে একা থাকতে। সারাদিন কাটায় দাসীদের তত্ত্বাবধানে, কিন্তু রাতটি তার নিজস্ব। তারাভরা আকাশের দিকে চেয়ে থাকতে ভালবাসে সে। মা বালিকা বয়সেই তাকে নক্ষত্র চিনতে শিখিয়েছিলেন। ঋষি

অঙ্গিরসের কাছেই তার মায়ের নক্ষত্র-পরিচয়। সারা আকাশ যেন আলোর ফুল দিয়ে সাজানো। প্রতিটি ফুলের নাম গোত্র চরিত্র, সবই ছিল ঋষি অঙ্গিরসের নখদর্পণে। সরণ্যু ঠিক তাঁর পিতার মতো নিষ্ঠায় আকাশপটে আলোর কুসুম চিনতে শেখাতেন কন্যাকে।

ওই দেখ মেরুনক্ষত্র উত্তানপাদ। এক পায়ের জানুর ওপর আর একটি পা তুলে শুয়ে আছে যেন একটি মানুষ।

মায়ের বুকে মাথা রেখে তারায় তারায় কাল্পনিক রেখা টানতে টানতে শশ্বতী উত্তানপাদ নক্ষত্রটি চিনে ফেলত।

শরৎকালের সন্ধ্যায় উত্তর আকাশের দিগ্বলয়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলতেন সরণ্যু, ঐ দেখ শশ্বতী, সাতটি উজ্জ্বল তারা কেমন ঝলমল করছে। ওঁরা হলেন সপ্তর্ষি। ক্রতু, পুলহ, পুলস্ত্য, অত্রি, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ আর মরীচি। ওই যে ক্রতু আর পুলহ নক্ষত্র দুটি, ওদের একটা রেখা টেনে যোগ করে দাও। ঐ রেখাটাকে এবার বাড়িয়ে যাও। এটা এসে ঠেকছে দেখ মেরুনক্ষত্র উত্তানপাদের গায়ে।

আর ওই দেখ অশ্বিদ্বয়, নাসত্য আর দস্র। যা সত্য নয় এমন কথা ও বলে না, তাই ওর নাম নাসত্য। আর দস্র কথাটির মানে হল, দেখার মতো স্রক্ বা সুদর্শন মালা। এই দুটি নক্ষত্র অশ্বিদ্বয় নাম নিয়ে পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করছে। অশ্বিদ্বয় স্বর্গলোকের বৈদ্য। এঁরা আমাদের সমস্ত রোগ হরণ করে সুস্থ করে তোলেন। শোন শশ্বতী, এই যুগল তারার কী অসীম মাহাত্ম্য। ঋষি পরাবৃজ ছিলেন পঙ্গু। এই অশ্বিদ্বয়ের চিকিৎসায় তিনি চলবার শক্তি ফিরে পেয়েছিলেন। এঁদের কৃপায় অন্ধ ঋজাশ্ব পেয়েছিলেন দৃষ্টিশক্তি। চ্যবনমুনি জরাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। অশ্বিদ্বয় তাঁদের বিস্ময়কর চিকিৎসায় মুনি চবনকে যুবাপুরুষে পরিণত করেছিলেন। বিশপলার একটি পা যুদ্ধে ছিন্ন হয়ে যায়, অশ্বিদ্বয় একটি লোহার জঙ্ঘা পরিয়ে তাকে চলবার শক্তি দিয়েছিলেন।

সূর্যের কন্যা সূর্যা অশ্বিদ্বয়কে বরণ করেন। সূর্যাকে রথে নিয়ে তাঁরা চলতে থাকেন আকাশপথে। কী অপূর্ব তাঁদের রথ! মধুর মতো বর্ণ। তিনটি চক্র সে রথের। তাকে টেনে নিয়ে চলেছে কখনো পক্ষযুক্ত অশ্ব, কখনো বা বৃহদাকার কোন বিহঙ্গ। গন্ধযুক্ত উজ্জ্বল পদ্মের মালায় শোভিত সে রথ।

কোনদিন পুষা নক্ষত্রের মাহাত্ম্যকথা বলতেন সরণ্যু। শশ্বতী অবাক হয়ে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে শুনত।

আজও আমাদের আর্যজাতির একটি শাখা মেষপাল নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। তারা আমাদের মতো ঘর বেঁধে বাস করে না। তারা তাঁকে পূজা করে।

মেষপালকরা বলে, হে পুষা, তুমি আমাদের ঠিক পথ দেখিয়ে নিয়ে চল। আমাদের নিয়ে চল সবুজ তৃণভূমিতে। যারা পশু অপহরণ করে, যারা আমাদের ভুল পথ দেখিয়ে দেয় মন্দ অভিসন্ধিতে, তাদের তুমি আঘাত কর তোমার লৌহাগ্র প্রতোদ দিয়ে। হে পূষা, আমাদের পশুগুলি যেন হিংস্র জন্তুর দ্বারা বিনষ্ট না হয়। কূপের মধ্যে আকস্মিক পতন থেকে তারা যেন রক্ষা পায়। আমরা যদি কোনদিন ভুল পথে চলে যাই, তাহলে তুমি এমন একজনের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিও যিনি আমাদের ঠিক পথের সন্ধান দিয়ে দেবেন। হে পূষা, তুমি আমাদের সঙ্গে চল।

মায়ের কথা মনে পড়ে শশ্বতীর। বড় স্থির আর গভীর ছিল তাঁর দুটি চোখ। রাতের আকাশে নক্ষত্রের দিকে চেয়ে চেয়ে মনে হয়, ওই তারার স্নিগ্ধ দৃষ্টির সঙ্গে তার হারানো মায়ের দৃষ্টির কোথায় যেন মিল আছে। মা বলত, নক্ষত্রেরা আগে আমাদেরই মতো মানুষ ছিলেন, তারপর অনেক পুণ্যের ফলে আজ তাঁরা নক্ষত্রলোকে নিজেদের স্থান করে নিয়েছেন।

শশ্বতীর মা-ও বড় দয়ালু আর পুণ্যবতী মহিলা ছিলেন। সকলে বলেন তাঁর নাকি অসাধারণ কবিত্বশক্তিও ছিল। শশ্বতীর কেন জানি না মনে হয়, তার মা-ও ওই নক্ষত্রলোকের কোথাও বসে তার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে আছেন।

।। তিন ।।

জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে চরাচর। তরুণী শশ্বতী দাঁড়িয়ে আছে প্রস্তর নির্মিত বাতায়নের ধারে। চোখ দুটি তার জ্যোৎস্নাপিপাসু চাতকের মতো উড়ে ফিরছে নিঃসীম শূন্যালোকে। আজ অনেক রাত অবধি প্রাসাদে সঙ্গীতের আসর বসেছিল। অতি কুশলী কলানায়ক সৃঞ্জয় শততন্ত্রী 'বাণ' বাজিয়েছিলেন। ঋতু বসন্ত যেন স্বয়ং উপস্থিত হয়েছিলেন সে সভায়। কিছু সময় শুনতে শুনতে মনে হয়েছিল শশ্বতীর, বহুদূর থেকে একটা ঝড় যেন বয়ে আসছে। বায়ু-তাড়িত বনস্থলীর গভীর অর্ন্তলোক থেকে আকুল আর্ত একটা ধ্বনি উঠে মিলিয়ে যাচ্ছে মহাশূন্যে।

কলাগুরু সৃঞ্জয়ের 'বাণ' থামল, কিন্তু সুরের রেশ সভাগৃহে আর শ্রোতাদের অন্তরে রইল বহুক্ষণ।

এরপর কণ্ঠসংগীত শুরু হল। 'বীণাগাথী'রা বীণা বাজিয়ে গান করতে লাগলেন। কণ্ঠ থেকে যেন প্রার্থনার সুর ঝরে পড়ছে। সামগানে সভা হল মন্ত্রমুগ্ধ। দেবতাদের স্তবগানে মনে হল, অন্তরীক্ষলোক থেকে দেবতারা একে একে নেমে এসে দাঁড়িয়েছেন সরস্বতী নদীতীরে। তাঁরা তন্ময় হয়ে শুনছেন মনুষ্যকণ্ঠে গীত বীণাধ্বনি সহযোগে বেদগান।

আসরের সমাপ্তিলগ্নে ছিল নৃত্যের আয়োজন। তাতে অংশ নিয়েছিল আরও দুটি সখীর সঙ্গে শশ্বতীও। তার পরনে ছিল শুভ্র পোশাক। কান্তিময়ী তরুণী নর্তকীর ভূমিকায় সে যখন ঘুরে ঘুরে নাচছিল তখন তাকে মূর্তিমতী উষা বলে ভ্রম হচ্ছিল। 'আঘাটি' বেজে চলেছিল তালে তালে। সেই করতালের ধ্বনির সঙ্গে সুচারু চরণের বিন্যাস রমণীয় হয়ে উঠেছিল। বংশীর ধ্বনি ব্যথিত করছিল বাতাস।

প্রাসাদের বিশিষ্ট সভাসদেরা এবং নিমন্ত্রিত ঋষিরা এসেছিলেন বসন্ত বাসরের সেই অনুষ্ঠানে। তাঁদের উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন ও আশীর্বাদে শিল্পীরা উৎসাহিত হয়ে উঠছিলেন।

শশ্বতী নাচের ভেতরেই চকিতে দেখে নিয়েছিল দু'বন্ধুকে পাশাপাশি বসে থাকতে। শুনক ছিল নিমন্ত্রিত অতিথি। ঋষি চয়মান, পুত্র শুনককে এনেছিলেন সঙ্গে করে। অন্যদিকে প্রাসাদের প্রধান রক্ষক ও রাজার বিশেষ স্নেহভাজন সেনাপতি হিসেবে উৎসবে যোগ দিয়েছিল তুর্বসু। দুটি বাল্যবন্ধু বসেছিল পাশাপাশি। বয়স্কদের সমাবেশ থেকে একটু দূরে নিজেদের সরিয়ে নিয়ে বসেছিল তারা। আলাপ আর মন্তব্য চলছিল নিচু গলায়।

তুর্বসু বলল, গুরু সৃঞ্জয় যখন বীণ বাজাচ্ছিলেন তখন ওঁকে এ পৃথিবীর মানুষ বলে মনে হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল, মরুদ্ দেবগণের একজন স্বর্গ থেকে নেমে এসে ওঁকে আশ্রয় করেছেন।

শুনক সমর্থনসূচক মাথা নাড়ল। পরক্ষণেই বলল, সেদিন বিশ্পতি রথীতরের সদনে এমনি এক সংগীত-সভায় নিমন্ত্রিত ছিলাম। সেখানে ঔদুম্বরী বীণায় আলাপ করলেন ঋচীক। মনে হচ্ছিল, বাদক ঋচীক সেখানে নেই, শুধু তাঁর বীণাই বেজে চলেছে! ঋচীক আর বীণা অভিন্ন হয়ে গেছে।

তুর্বসু বিস্ময়চিহ্ন মুখে ফুটিয়ে বলল, আশ্চর্য!

সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটি ছোট করে, ঠোঁটের কোণে হাসি টেনে বলল শুনক, কেমন লাগছে নাচ?

তুর্বসু বলল, নর্তকী অসাধারণ।

শুনক অনেকক্ষণ তুর্বসুর মুখের দিকে চেয়ে বলল, অসাধারণ কে? নর্তকী না তার নাচ?

বন্ধু হলেও তুর্বসুকে এবার সচেতন হতে হল। বলল, নর্তকী সাধারণ হলে তার নাচ অসাধারণ হয় কী করে?

সাধু ! সে অর্থে নর্তকী অসাধারণ সন্দেহ নেই।

তুর্বসু অমনি বলল, তোমার কথাতেই বলি, বাদক ঋচীক আর তাঁর বীণা যেমন অভিন্ন, নর্তকী শশ্বতী আর তার নাচও তেমনি অভিন্ন।

সাধু, সাধু! আমাকে ভুল বুঝো না তুর্বসু! বাগবৈদগ্ধ্যে তোমার অসামান্য উন্নতি লক্ষ করা যাচ্ছে। গুরু শুনহোত্রের গৃহে কিন্তু তুমি নির্বাক থাকতে।

হাসল তুর্বসু, বলল, চিরদিনই বাক্যে কিন্তু তোমার অনায়াস দক্ষতা শুনক।

শুনক অমনি বলল, সে কথা বহুজনবিদিত। কিন্তু তুমি যে সহসা চারুবাক্ হয়ে উঠলে, সেটাই সন্দেহের বিষয়!

গলা অনেক নামিয়ে, প্রায় তুর্বসুর কানের কাছে মুখ এনে আবার বলল শুনক, প্রেম তোমাকে মুখর করেনি তো বন্ধু?

তুর্বসু বলল, কর্তব্যের সঙ্গে কাজের সঙ্গে আমার প্রেমের সম্বন্ধ, অন্য কোনও প্রেমের স্বাদ এখনও পাইনি।

শুনক আবার কপট হাসি হেসে বলল, স্বপ্নে?

পাল্টা প্রশ্ন তুর্বসুর, তুমি পেয়েছ?

শুনক অমনি বলল, বিয়ের আগে যৌবনের ধর্মই হল স্বপ্নদর্শন। আমি যুবক হয়ে কী করে সে ধর্ম থেকে বিচ্যুত হই।

হেসে বলল তুর্বসু, হয় আমার যৌবন এখনও আসেনি, নয়তো আমার অগোচরেই গত হয়েছে।

শুনক চোখের ইশারায় নৃত্যানুষ্ঠানের দিকে তুর্বসুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, কী দেখছ?

তুর্বসু বলল, দ্রুত লয়ে পাক খেতে খেতে নাচ এখন সমের দিকে এগিয়ে আসছে।

শুনক বলল, বাইরের চোখে তাই, কিন্তু আসলে ওখানে সোম তৈরি হচ্ছে। যৌবন রসায়ন। ওই সুধা পান কর, দেখবে তোমার দেহ আর মন প্রেমের মধুতে ভরে উঠেছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে নাচও শেষ হল। দর্শকেরা উচ্ছ্বসিত হয়ে সাধুবাদ দিতে লাগলেন। দু'বন্ধু সেই অবসরে বাইরে উঠে চলে গেল। আজকের অনুষ্ঠান সত্যিই স্মরণীয়।

মধ্যরাত্রি কখন পার হয়ে চলে গেছে। রাজপ্রাসাদ সুপ্ত। বাইরে পূর্ণচন্দ্রের আলোয় প্লাবন। ঘুম নেই শশ্বতীর চোখে। সে চেয়ে আছে বাতায়নের বাইরে। প্রাসাদের পশ্চাদ্ভাগের উদ্যানটি অন্তঃপুরচারিকাদের জন্য তৈরি হয়েছিল। সেখানে পুরুষদের প্রবেশ নিষেধ। রানী সরণ্যু গিয়ে বসতেন সেই উদ্যানে। বড় বড় গাছের তলায় বাঁধানো শিলাবেদিকা। তিনি বহু রাত অবধি একাকী সেখানে বসে নির্জনতা উপভোগ করতেন। কখনও সঙ্গে পরিচারিকাদের রাখা পছন্দ করতেন না।

উদ্যানটি ছিল প্রাকার দ্বারা সুরক্ষিত। আর কেবলমাত্র রানীর শয়নগৃহের বাতায়ন থেকেই উদ্যানের দৃশ্য চোখে পড়ত। প্রাসাদের অন্য কোনও মহল থেকে কোনও ভাবেই এই উদ্যানের কোনও অংশ দৃষ্টিগোচর হত না।

রানীর মৃত্যুর পরে উদ্যানটি প্রায় পরিত্যক্ত অবস্থাতেই পড়েছিল। পরিত্যক্ত হলেও নিত্য পরিচর্যা রাজগৃহের নিয়ম অনুযায়ী চলছিল। দাসীরা প্রভাতে সন্ধ্যায় পরিমার্জনা করত। পুষ্পবৃক্ষে জলসেচন করত। বড় বড় বৃক্ষগুলির তলদেশ থেকে সঞ্চিত শুষ্কপত্র সম্মার্জনীয় তাড়নায় অপসারিত করে ফেলত। সন্ধ্যার পরে কিন্তু দাসীদেরও সেখানে প্রবেশের অধিকার ছিল না। রানী সরণ্যুর সময় থেকে এ নিয়ম চলে আসছে। কোনদিন প্রয়োজন বা ইচ্ছা হলে তিনি বিশেষ কোন পরিচারিকাকে সঙ্গে নিতেন, কিন্তু প্রায়দিনই বিহার করতেন একাকী। কেবল শবৎ সমাগমে রাজা দিবোদাস যেদিন মৃগয়া অথবা যুদ্ধে বের হতেন, তার আগের রাত্রে রানীর সঙ্গে বিচরণ করতেন এই উদ্যানে। গুপ্ত সুড়ঙ্গপথের দ্বার খুলে নিষ্ক্রান্ত হতেন প্রাসাদ প্রাকারের বাইরে। সেখানে পলাশ ও শিংশপা বৃক্ষের তলায় একটি প্রশস্ত প্রস্তর-বেদিকায় বসতেন দুজনে। পাশ দিয়ে বয়ে গেছে খরস্রোতা আদীন নদী। জনপদের অরণ্য ও কৃষিক্ষেত্র থেকে রাজপ্রাসাদকে পৃথক ও সুরক্ষিত করেছে এই খরস্রোতা তরঙ্গিনী। প্রাসাদ বেষ্টন করে এই নদী গিয়ে মিশেছে সম্মুখে সরস্বতীর সঙ্গে। রানী সরণ্যু বড় ভালবাসতেন এই নদীকে। তিনি রাজার হাতে হাত রেখে শুনতেন এর কলধ্বনি।

রানীর পিতৃলোক প্রস্থানের পর মাঝে মাঝে অতি অল্প সময়ের জন্য উদ্যানে এসে আপন মনে ঘুরে বেড়াত শশ্বতী। এ সময় বেশি করে মায়ের অভাব সে বোধ করত। তাই ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বেশি সময় একাকী তার পক্ষে উদ্যানে বিচরণ করা সম্ভব হত না।

আজ নিদ্রাহীন এই জ্যোৎস্নারাতের দিকে চেয়ে তরুণী শশ্বতীর মনে হল সে এখন প্রাসাদ-উদ্যানে একা ঘুরে বেড়াবে।

ভাবামাত্রই নীচে সোপান বেয়ে নেমে গেল সে। বড় বড় গাছগুলি উর্ধ্বমুখী হয়ে স্নান করছে জ্যোৎস্নার জলে। আলোছায়ার বিচিত্র আলপনা আঁকা পথে কতক্ষণ ঘুরে বেড়াল শশ্বতী। একসময় গুপ্ত পথের কাছে এসে থমকে দাঁড়াল সে। হঠাৎ কী মনে হল, অর্গলমুক্ত করল দ্বার। তারপর অন্ধকারে সোপানপথে অতি সাবধানে অনুমানে পা ফেলতে ফেলতে বেরিয়ে এল সুড়ঙ্গের পারে। আবার জ্যোৎস্নার রাজ্য। পলাশ আর শিংশপা গাছের পাতার ছায়ায় প্রস্তরবেদিকা চিত্রিত। শশ্বতী বেদির ওপর বসল। বহুদিনের দ্রষ্টা বৃক্ষগুলি দেখল, রানী সরণ্যুর জায়াগায় এসে বসেছে তাঁরই আত্মজা। অবিকল জননীর প্রতিমূর্তি। নীচে শিলাস্তূপে আহত জলস্রোত উচ্চরোলে পাক খেয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। সেদিকে চেয়ে শশ্বতী তন্ময় হয়ে দেখছিল জ্যোৎস্নার খেলা। জলস্রোত যেন ঘূর্ণির ঘাঘরা উড়িয়ে নাচছে। আর তাকে রৌপ্য অলঙ্কারে সাজিয়ে দিয়েছে জ্যোৎস্না। ঝিলমিল করে চোখে একটা স্নিগ্ধ ঝলক দিয়ে যাচ্ছে আদীন নদীর জলপ্রবাহ।

কতক্ষণ সেদিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে ছিল মনে নেই শশ্বতীর । হঠাৎ শুকনো পাতার ওপর কার যেন পায়ের সাড়া বেজে উঠল।

শশ্বতী চকিতে পাশে ফিরে তাকাল। বেশ খানিক তফাতে সাদা একটা ঘোড়া গাছের তলায় এসে দাঁড়িয়েছে। তাতে সওয়ার হয়ে বসে আছে যে মানুষটি তার মুখ স্পট নয়। গাছের ঘন ডাল-পাতার ছায়ায় সে মুখ আবৃত।

শশ্বতী উঠে দাঁড়াল। মায়ের সঙ্গে দু'একবার মাত্র সে এসেছে প্রাসাদ প্রাকারের বাইরে এই গুপ্ত সুড়ঙ্গ পথে। প্রায় নিষিদ্ধ স্থান এটি। কিছু পরিমাণে ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষ লতাগুল্মে স্থানটি জঙ্গলাকীর্ণ। আদীন নদী গভীর হলেও প্রশস্ত নয়। ওপারে জনপদের কৃষিক্ষেত্র, নদীতীরে বহু দূর প্রসারিত বনভূমি। ভল্লুক ও শালাবৃক বিতাড়নের জন্য মাঝে মাঝে জনপদবাসীর সমবেত উচ্চ রোল ও দুন্দুভিধ্বনি শোনা যেত।

শশ্বতী নির্ভীক। সে নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে অশ্বারোহীর মুখের দিকে। কে এই পুরুষ? প্রাসাদরক্ষীদের কেউ, না আদীন নদী অতিক্রম করে রাতের সুযোগে এসে দাঁড়িয়েছে কোন গুপ্ত শত্রু?

ঘোড়সওয়ার ঘোড়া থেকে নামল। মুহূর্তে গাছের ছায়া সরে গেল তার মুখের ওপর থেকে। চাঁদের আলোয় তাকে চিনতে পারল শশ্বতী। সঙ্গে সঙ্গে একটা উত্তেজনার ঢেউ বয়ে গেল তরুণী দেহের ভেতর দিয়ে।

তুর্বসু এগিয়ে এসে বলল, ক্ষমা করবেন, আপনি এখানে?

শশ্বতী প্রশ্নকর্তার দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে বলল, আমিও তো আপনাকে ঠিক এই প্রশ্নই করতে পারি।

মৃদু হেসে তুর্বসু বলল, নিশ্চয়ই পারেন। মহারাজ দিবোদাসের কন্যার সে অধিকার অবশ্যই আছে।

একটু থেমে আবার বলল, প্রভু দিবোদাস আমার ওপর প্রাসাদ রক্ষার ভার দিয়েছেন। আমি প্রাসাদ পরিক্রমা করে তাঁর কাজই করছি।

এত রাতে?

তুর্বসু বলল, অপরাধ নেবেন না। আমিও তো সবিনয়ে এ প্রশ্ন আপনাকে করতে পারি।

শশ্বতী প্রশ্ন শুনে এবার আর ক্ষুব্ধ হল না। শুধু বলল, এই পূর্ণিমার রাত আমার চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। তাই আদীন নদীর তীরে চলে এসেছি রাতের জগৎটাকে দেখব বলে।

তুর্বসুর গলায় বিস্ময়, কিন্তু কোন পথে এখানে এলেন আপনি? উত্তর দিকে প্রাসাদ-প্রাকার ধৌত করে বয়ে চলেছে নদী, ওদিকে তো কোনও পথ নেই। আর সামনে প্রাসাদের সিংহদ্বার বন্ধ। সেখানে বসে রয়েছে দৌবারিক। অন্যদিকে আমি প্রাসাদ পরিক্রমা করছি।

শশ্বতী কৌতুকের সুর গলায় ঢেলে বলল, যেমন করে আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে জ্যোৎস্না, ধরুন তেমনি করে আমি এখানে এসে পড়েছি।

তুর্বসু হেসে বলল, শুভ্র পোশাকে সজ্জিত বসন্ত বাসরের আশ্চর্য সেই নর্তকীর পক্ষে সবই সম্ভব।

শশ্বতী জানতে চাইল, নাচ আপনার ভাল লেগেছে?

তুর্বসু অমনি বলল, মুখে সে ভাল লাগাকে কী ভাষায় প্রকাশ করতে পারি বলুন? বিশ্বাস করুন, কিছুক্ষণ আগেও আমি আপনার সেই নাচের কথাই ভাবছিলাম। চোখের ওপর ছবি স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠছিল।

শশ্বতী আদীন নদীর জলকল্লোলের মতো হাসির তরঙ্গ তুলে বলল, যদি বলি, আপনার কাছ থেকে আমার নাচের এই শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পাব বলেই আমি এখানে এসেছি?

তুর্বসু শশ্বতীর কথা শুনে প্রথমে একটুখানি চমকে উঠল। তারপর নিজেকে সংযত করে নিয়ে বলল, এ আপনার অপাত্রে অনুগ্রহ। সন্ধ্যায় পূর্ণ সভাগৃহে আপনি সমস্ত দর্শকেরই সাধুবাদ কেড়ে নিয়েছেন।

শশ্বতী মুখে তর্জনী রেখে কৌতুকের ভঙ্গিতে বলল, সাধুবাদ বর্ষণের সময় সভাগৃহে কেবল দুজন দর্শক অনুপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মনোভাব সে সময় জানতে পারিনি।

তুর্বসু বলল, বিশ্বাস করুন, আপনার নাচ গভীর আনন্দে উপভোগ করেছি, কিন্তু সম্মানীয়দের সামনে এগিয়ে এসে আপনাকে সাধুবাদ জানাতে সংকোচ বোধ করেছি।

আপনার বন্ধু ঋষিকুমার শুনকের অভিমত কী? অনুষ্ঠান দেখে তিনি কী খুশী হয়েছেন?

শুনক বহুদর্শী। আমার চেয়ে তার শিল্পবোধ অনেক বেশী। সে-ও খুশী হয়েছে আপনার অনুষ্ঠান দেখে। সমঝদার হিসেবে সে যেহেতু আমার চেয়ে অনেক বড়, সেজন্য তার খুশী হয়ে ওঠার দাম অনেক।

শশ্বতী বলল, বড় সমঝদারের সাধুবাদ আমি মাথায় পেতে নেব, কিন্তু সামান্য সমঝদারের অন্তরের অভিনন্দন আমি ভরে রাখব হৃদয়ে। আমি জানি. সেটাই আমার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। গুরুজনের আশীর্বাদের চেয়ে প্রিয়জনের উত্তাপ আমার কাছে কম মূল্যবান নয়।

তুর্বসু ভাবতে লাগল, শশ্বতী কী সচেতন হয়ে এ কথা বলছে, না এ শুধু একটা কথার স্রোতে কথা ভাসানো। সত্যিই কী শশ্বতী তাকে এই মুহূর্তে প্রিয়জন বলে ভাবছে। তার এই অভিনন্দনকে সে কী যথার্থই হৃদয়ে ভরে নিল। 'প্রিয়জনের উত্তাপ', কথাটার ভেতর যে আশ্চর্য হৃদয় মাতানো সংগীত আছে সে কথা কী গভীরভাবে উপলব্ধি করে বলেছে শশ্বতী?

তুর্বসু ভাবনার জগৎ থেকে ফিরে এসে বলল, আজ কোন নক্ষত্রদর্শীর কাছে যদি আমি ভাগ্যগণনা করতাম তা হলে তিনি নিশ্চিত বলতেন, আজকের রাতটা আমার শুভরাত্রি।

শশ্বতী হয়তো বুঝল। হয়তো বা বুঝল না কথাটার অর্থ। সে অমনি বলল, রাতটা সত্যিই শুভ। এ জন্যে নক্ষত্রদর্শীর কাছে গণনার দরকার হয় না। সকলের জন্যই শুভ। এমন মন কেড়ে নেবার মতো জ্যোৎস্না বহুদিন দেখিনি। তাই প্রাসাদে থাকতে না পেরে বেরিয়ে পড়লাম। আর কী ভাগ্য, সঙ্গে সঙ্গে এমন একজন গুণগ্রাহীর দেখা পেয়ে গেলাম।

তুর্বসু বলল, আমার বন্ধু শুনক এখানে থাকলে আপনি তার সঙ্গে কথা বলে আনন্দ পেতেন। কথা কী করে বলতে হয় তা সে জানে। যে-কোন আসরই সে অল্প সময়ে জমিয়ে তুলতে পারে। অসাধারণ তার বাগ্মীতা, প্রশংসনীয় তার পঠন-পাঠন।

শশ্বতী বলল, অসাধারণত্ব আপনারও কিছু কম নয়।

কী রকম?

অসাধারণ আপনার বন্ধুপ্রীতি।

তুর্বসু বলল, আমি শুনকের বাল্যবন্ধু। তাকে আমি ভালবাসি।

এমন বন্ধুর জন্যে ঋষিকুমার শুনকের গর্বিত হওয়া উচিত।

তুর্বসু হেসে বলল, সে বিচার আমার নয়। ভালবাসা আমার কাজ, আর সে ভালবাসাকে মর্যাদা দেওয়া না দেওয়া অন্যের ব্যাপার।

সত্যি, আপনার কথা শুনে আমার ভীষণ ভাল লাগছে। এমন বন্ধু দুর্লভ। যিনি আপনার মতো বন্ধু

পেয়েছেন তাঁকে ঈর্ষা করতে ইচ্ছে হয়।

তুর্বসুর ঘোড়াটি এতক্ষণ শান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এবার অসহিষ্ণু হয়ে শিলাতলে পা ঠুকল কয়েকবার।

তুর্বসু বলল, আমার বাহনটি কিন্তু আপনার ওপর ঈর্ষান্বিত হয়েছে।

শশ্বতী হেসে উঠল, কী রকম?

ওই যে শিলার ওপর শব্দ তুলে জানিয়ে দিচ্ছে আমরা তাকে উপেক্ষা করে অনেক সময় নিচ্ছি।

ওটি আপনার নিশ্চয় খুব প্রিয় ঘোড়া?

এ বছর রথের প্রতিযোগিতায় জিতলে আপনার বাবা এই মূল্যবান সাদা ঘোড়াটি আর একটি শ্যাম-অসি আমাকে পুরস্কার দেন।

শশ্বতী কিছুক্ষণ তুর্বসুর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, আপনি কী ললাটে জয়তিলক নিয়েই জন্মেছেন?

এ কথা কেন?

প্রত্যেকটি প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর পুরস্কার বাঁধা। প্রতিটি প্রতিযোগীর বুকে মরুদ্ দেবতাদের মতো দীর্ঘশ্বাসের ঝড় তুলে আপনি জয়ী হয়ে আসছেন।

বিশ্বাস করুন শশ্বতী, প্রতিযোগিতা শেষ হলে রাতে আমার ঘুম আসে না। বন্ধুদের জন্য মন আমার ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার, প্রতিযোগিতায় যখন আমি নেমে দাঁড়াই তখন সম্পূর্ণ অন্য মানুষ হয়ে যাই। জয়ের জন্যে জেদ চেপে যায় মনের মধ্যে।

শশ্বতী বলে উঠল, সেটাই তো স্বাভাবিক। আর আপনি প্রতিযোগিতায় হার মেনেছেন, এ যেন আমি ভাবতেই পারি না।

কেন?

শশ্বতী মুখ নিচু করে বলল, কেন তা জানি না। কিন্তু কোনও দিন আপনি হেরে গেলে সে দুঃখ আমি সইতে পারব না।

হঠাৎ তুর্বসু শশ্বতীর নত মুখখানা দু'হাতের পাতায় তুলে ধরল। শশ্বতী বাধা দিল না। চাঁদের আলোয় তুর্বসু দেখল, তরুণী শশ্বতীর দু'চোখ ভরে জল টলটল করছে। মুহূর্তে তুর্বসু শশ্বতীর কপোলে এঁকে দিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিত্র। সঙ্গে সঙ্গে প্রেমিকার দু'গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল জলের ধারা।

কয়েকটি মুহূর্তের মধ্যে কী ঘটে গেল তা যেন দুজনের কেউই তলিয়ে দেখার সুযোগ পেল না। শশ্বতী জীবনের প্রথম প্রার্থিত পুরুষের প্রসাদ পেয়ে বিহ্বল হয়ে গেল। এই আনন্দের ভার সে যেন কিছুতেই বইতে পারছিল না। সংকোচ আর রোমাঞ্চ গোপন করার জন্যে সে দ্রুত পা চালিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল সুড়ঙ্গ পথে।

তুর্বসু বিহ্বল হয়ে চেয়ে রইল সেদিকে। শশ্বতীর চলে যাবার পরে প্রহর পার হল কিন্তু ধ্যান ভাঙল না তুর্বসুর। তার মনে হল কোনও শ্রেষ্ঠ জাদুকর তার কৃত্যা বা জাদুর খেলা দেখিয়ে চলেছে। এত নিপুণ তার অনুষ্ঠান যে মিথ্যা মায়াকেও সত্য বলে ভ্রম হচ্ছে।

ভোরের আলো ফুটল পূবে আর প্রাসাদের পশ্চিমে অস্ত গেল চাঁদ। এক ঝাঁক পাখি হাওয়ার সমুদ্রে ভেসে গেল পাখা মেলে। তুর্বসু সারা দেহে প্রথম সূর্যের কোমল সোনার রঙ মেখে উঠে বসল তার সাদা ঘোড়ায়। নিজেকে এই মুহূর্তে মনে হল সে সম্রাট, আর পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধন তার দুহাতের মুঠোয় এসে গেছে।

পরদিন আবার মধ্যরাত্রি পার হল। প্রাসাদের শেষ প্রদীপ নিভে গেল। চাঁদের প্লাবনে ভেসে গেল চরাচর। গাছের ছায়ায় এসে দাঁড়াল প্রতীক্ষাকাতর উন্মুখ অশ্বারোহী। গুপ্ত দ্বারপথে ভীরু পদসঞ্চারে আদীন নদীর তীরে শিলাবেদিকায় এসে দাঁড়াল তরুণী শশ্বতী। অশ্ব থেকে অবতরণ করে ধীর পায়ে তার দিকে এগিয়ে গেল সুবাস্তু জনপদের কনিষ্ঠ সেনানায়ক তুর্বসু। দুটি তরুণ হৃদয় মুহূর্তে আকুল আলিঙ্গনে বাঁধা পড়ল।

রজনী শেষ হয়ে আসছে। আলোছায়ার আলপনা আঁকা শিলাবেদির ওপর পাশাপাশি বসে আছে দুজনে। অজস্র কথা বুকের বাধা সরিয়ে উঠে আসতে চাইছে আদীন নদীর স্রোতের বুকে জেগে ওঠা বুদবুদের মতো। কিন্তু কথার বুদবুদ উঠতে না উঠতেই মিলিয়ে যাচ্ছে মনের অতলে। এ যে কী আশ্চর্য অনুভূতি, কী অসহনীয় আনন্দ, কী দুর্বার ব্যাকুলতা, তা দুটি মিলন-সমুৎসুক প্রেমিক হৃদয় ছাড়া কারও পক্ষেই বুঝে ওঠা সম্ভব নয়।

শশ্বতী চাপা গলায় বলছিল, জান তুর্বসু, কাল তোমার কাছ থেকে চলে যাবার পর আমার দিন যে কী করে কেটেছে তা তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না।

আমি নিজেকে দিয়ে বুঝতে পারি শশ্বতী?

তোমার দিন আর রাত কী করে কাটালে তুর্বসু? আমার জানতে বড় ইচ্ছে করে।

তুর্বসু বলল, তুমি চলে গেলে, আর তার কত পরে জানি না চাঁদ লুকলো প্রাসাদের আড়ালে। মনে হল এক অব্যক্ত যন্ত্রণা আমার বুকের ওপর পাষাণের ভার চাপিয়ে দিয়েছে। প্রথমে মনে হয়েছিল, আমি যেন জাদুর খেলা দেখছি। সব মিথ্যাকে আশ্চর্য সত্যের মতো মনে হচ্ছিল। আমি যেন ভাবতেই পারছিলাম না সন্ধ্যায় যাকে নৃত্যের আসরে দেখেছিলাম সে ওই জ্যোৎস্নার জলে স্নান করে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তারপর চাঁদ সরে গেল প্রাসাদের আড়ালে। আমার মনে হল, সে চাঁদ তুমি। আর তোমার অদর্শনে গভীর একটা বিষণ্ণতার ছায়া নামল আমার সমস্ত মন আচ্ছন্ন করে। ধীরে ধীরে দেখলাম পূর্বদিকে আলো ফুটে উঠল। প্রথমে রক্তসূর্য। ঠিক যেন আমার রক্তাক্ত হৃৎপিণ্ডখানা। কিন্তু অল্প পরেই সোনালি আলো ছড়িয়ে পড়ল চরাচরে। হঠাৎ আমার সব বিষণ্ণতা কেটে গেল। মনে হল, আমি সোনালি আশার জলে স্নান করে নতুন মানুষ হয়ে জন্ম নিয়েছি। সেই মুহূর্তে ঘোড়ার উপর বসে অনুভব করলাম, নতুন এক জগতের আমি সম্রাট। তারপর সারাদিন আমি আমার সেই সাম্রাজ্যে ঘুরে বেড়িয়েছি। প্রতীক্ষা করেছি সেই স্বর্গ নটীর, যে আমার নতুন আবিষ্কৃত সাম্রাজ্যের অধিশ্বরী হয়ে বসবে।

মুগ্ধ মদির চোখ মেলে তুর্বসুর দিকে চেয়ে তার কথা শুনছিল শশ্বতী। তুর্বসু থামলে গভীর আগ্রহ নিয়ে শশ্বতী বলল, বলে যাও, বলে যাও। তুর্বসু, থামলে কেন? আমার মনে হচ্ছে আমি যেন আজ আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত শুনছি।

তুর্বসু মৃদু হেসে বলল, আমি যাকে সারাটা দিন মনে মনে চেয়েছি, তাকে পেয়েছি আমার কাছে, তাই সব কথারও আমার শেষ হয়েছে এখানে এসে।

একটু থেমে আবার বলল তুর্বসু, কিন্তু তুমি কী করে কাটালে তোমার দিন শশ্বতী?

অতি সংক্ষিপ্ত একটি বাক্যে শেষ করল শশ্বতী, শুধু তোমার কথা ভেবে ভেবে তুর্বসু।

আমি ভাগ্যবান শশ্বতী।

সে সৌভাগ্য আমারও তুর্বসু।

তুমি বলেছ শশ্বতী, তোমার কৈশোরকাল থেকেই তুমি আমার গুণমুগ্ধ কিন্তু শুনে রাখ, রাজা দিবোদাসের পাশে তোমাকে দেখলে আমি মনে মনে গভীর প্রেরণা পেতাম। আমার মনের সে কথা আজ তোমাকে মুখোমুখি বলছি, এ যেন বিশ্বাসই হচ্ছে না নিজের কাছে।

শশ্বতী পশ্চিমগামী চাঁদের দিকে চেয়ে বলল, মনে মনে কোন কিছু গভীর করে চাইলে সে চাওয়া সফল হয় তুর্বসু।

অন্যমনস্ক হল তুর্বসু। বলল, জানি না তা। হয়তো হয়, হয়তো বা তা হয় না।

একথা কেন বলছ তুমি? আমাদের কৈশোর আর তারুণ্যের প্রার্থনা কী আমাদের এই মুখোমুখি চেয়ে থাকার স্বপ্ন সফল করেনি?

তা করেছে শশ্বতী। তবু চলার পথ বড় দুর্গম। সেখানে শুধু মনের জোরে চলা যায় না। আমি বার বার দেখেছি, যেখানে হারব না বলে নিশ্চিত ধারণা হয়েছে, সেখানে আমার সব শক্তি সব বিচারবুদ্ধি কেড়ে নিয়ে কে যেন আমাকে ব্যর্থ করে দিয়েছে।

চাঁদ প্রাসাদের আড়ালে আত্মগোপন করল। শশ্বতী এবার উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমার চলে যাবার সময়ে তুমি কেন এমন কথা বললে তুর্বসু? আমার আগামী দিনটা অশ্রুতে ভরে দিলে তুমি।

তুর্বসু শশ্বতীর দুটো হাত নিজের হাতের মুঠোয় ধরে বলল, তোমাকে দুঃখ দিতে চাই না বলেই তো সত্যকে এমন করে তোমার কাছে মেলে ধরতে পারলাম।

আমি সত্যের মুখ দেখতে চাই না তুর্বসু। আমি আমার ভালবাসার মুখ দেখতে চাই। ঋষি চয়মান সেদিন বাবার কাছে বলেছিলেন—

'হিরণ্ময়েণ পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।

তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্য ধর্মায় দৃষ্টয়ে।।

হিরণ্ময় পাত্রের দ্বারা সত্যের মুখ ঢাকা রয়েছে। হে আদিত্য পূষণ, তুমি সত্যধর্ম দেখাবার জন্য সেই ঢাকা খুলে দাও।

আমি পূষণের কাছে প্রার্থনা জানাব তিনি যেন হিরণ্ময় আবরণ তুলে আমাকে সত্যের মুখ দেখাবার চেষ্টা না করেন। সত্য আমার জীবনে কী মূর্তি ধরে আসবে জানি না, কিন্তু আমার এই ভালবাসার মুকুলকে একদিন আমি ফুল হয়ে ফুটে উঠতে দেখতে চাই। আমার অবুঝ প্রেমকে নিয়ে প্রতিদিন আমি স্বপ্ন দেখে যাব, সে স্বপ্নটুকু তুমি আমার ভেঙে দিও না তুর্বসু।

।। ৪ ।।

খদির কাষ্ঠ নির্মিত আসন্দীর ওপর বসে রয়েছেন রাজা দিবোদাস। আসন্দীর পৃষ্ঠরক্ষা স্থানে কোমল আস্তরণের ওপর পেপস্করণের কাজ। রৌপ্য ও রঙিন সূত্রে দর্শনীয় সে কাজ। এই পৃষ্ঠদেশের আস্তরণ বা 'হিরণ্যকুর্চ' রাজদুহিতা শশ্বতী নিজের হাতে তৈরি করেছে। রাজার পাদদেশে রক্ষিত একটি ব্যাঘ্রচর্ম। এটি ব্যাঘ্র সদৃশ শক্তিধর রাজার অসীম প্রতাপের প্রতীক।

রাজা কিন্তু নতমুখে বসে ভাবছেন। তাঁর কানে দূরাগত ধ্বনির মতো বাজছে কয়েকটি কথা। অভিষেক উৎসবের পর রাজা দিবোদাস প্রথম যেদিন সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন সেদিন প্রধান পুরোহিত তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে উচ্চারণ করেছিলেন, 'এই মহান রাষ্ট্র উন্নতির জন্য, প্রজাকূলের মঙ্গলের জন্য, সর্ববিষয়ে সমৃদ্ধি ও পরিপুষ্টির জন্য আপনার করে অর্পিত হইতেছে। আপনি ইহাকে সর্ব প্রযত্নে রক্ষা করুন।'

রাজা মুখ তুলে সভাসদদের দিকে তাকিয়ে বললেন, আজ আমরা একটা পরীক্ষার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি। আমরা 'অনব' জন। আমাদের আদি পিতা অনু থেকে আমরা জাত। পার্শ্ববর্তী পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিমের যাদ্ব, ভারত, পুরষু জনের লোকেরা আমাদের ঘনিষ্ঠ মিত্র। কেবল উত্তরের দ্রুহ্যবেরা আমাদের চিরশত্রু। পিতা-পিতামহেরা বার বার তাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন। আপনাদের স্মরণ আছে, আমার রাজ্যকালের মধ্যে ওই উত্তরসীমার দ্রুহ্যবদের সঙ্গে আমি কোনওরকম যুদ্ধে নিজেকে জড়িত করিনি। মধ্যে মধ্যে উত্তর সীমান্তে প্রবাহিত আদীন নদীর ওপর রজ্জুনির্মিত পারাপারের সেতুটিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে ওই হীনচেতা দ্রুহ্যবেরা। আমার যথেষ্ট ক্ষোভের কারণ ঘটলেও আমি নদীতীরে বিপুল সৈন্য সমাবেশ করে সেতুটির সংস্কার করেছি মাত্র। সৈন্য নিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হইনি। ওদের শুধু একথাই বুঝিয়ে দিয়েছি, ইচ্ছা করলে আমরা এই মুহূর্তে সেতু পার হয়ে ওদের প্রচণ্ডভাবে শাসন করতে পারি। কিন্তু অকারণ রক্তক্ষয়ের পক্ষপাতী আমরা নই। অনব আর দ্রুহ্যবদের সাধারণ মানুষেরা এই সেতুপথেই পারাপার করে। ওরা উত্তরের উচ্চভূমিতে থাকে। তাই ওদের খাদ্য, যব আর ব্রীহির জন্যে অনেক সময় আমাদের ওপর নির্ভর করতে হয়। আমাদের উর্বরভূমিতে উদ্বৃত্ত শস্য সাধারণ মানুষজনের উপকারে লাগে। অবশ্য আমি এ কথা বলি না যে এই শস্যের যোগান আমরা নিঃস্বার্থভাবে দিয়ে থাকি। পরিবর্তে আমরা পাই পাহাড়ি মধু আর সোম প্রস্তুতের জন্য প্রায় দুষ্প্রাপ্য সোমলতা। কিন্তু এ তো পারস্পরিক আদান-প্রদান। উপকার উভয় পক্ষের। আজ আপনারা শুনেছেন ঋষি চয়মান আর উদময়ের অরণ্যনিবাস থেকে প্রায় সহস্রাধিক ধেনু অপহৃত হয়েছে। এ কাজ যে যজ্ঞরহিত পণিদের তা আপনারা অবশ্যই অনুমান করেছেন। কিন্তু শেষ

রজনীর জ্যোৎস্নালোকে ওরা ধেনুগুলিকে চালিত করে নিয়ে গেলেও গো-বৎসদের হাম্বাধ্বনিতে নিদ্রিত গোপেরা উঠে পড়ে। তারা তস্করদের পশ্চাদ্ধাবন করে কিন্তু বিপুল সংখ্যক শক্তিমান পণিদের প্রতোদ তাড়নায় ওরা আহত হয়ে ফিরে আসে। শুনক সংবাদ পায় বিলম্বে। তবু সে রথ চালনা করে অগ্রসর হয়। কিন্তু আদীন নদীর সেতুর কাছে পৌঁছে দেখে শেষ ধেনুর দলটি সেতু পার হয়ে দ্রুহ্যবদের অঞ্চলের মধ্যে প্রবেশ করছে। সে বিস্মিত হয়ে দেখে ধেনুরা চলেছে সারিবদ্ধ হয়ে কিন্তু পণিরা অদৃশ্য। কী আশ্চর্য দক্ষতায় ওরা চলমান ধেনুর মধ্যে আত্মগোপন করে চলে গেল তা ভাবলে অবাক হতে হয়। শুনক তাদের দেখতে না পেয়ে শরসন্ধানে বিরত থেকেছে!

একটু থেমে রাজা দিবোদাস বললেন, কোন দূর-দুর্গমে পণিরা আমাদের ধেনু নিয়ে চলে গেল তা আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়, কারণ দ্রুহ্যবরা জানলেও সে খবর আমাদের কিছুতেই দেবে না। তাছাড়া আমাদের ধনক্ষয়েই তো ওদের উল্লাস। আমার ধারণা ওদের সঙ্গে গোপন ষড়যন্ত্র আছে পণিদের। না হলে তস্কর পণিরা দ্রুহ্যবদের দেশ দিয়ে পালাবার সাহস পায় কী করে? এখন আপনারা বলুন , আমাদের করণীয় কী ?

রাজার দীর্ঘভাষণ শুনে সভাসদরা চিন্তান্বিত হলেন। তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে নিম্নকণ্ঠে শুরু করলেন আলোচনা।

প্রধান অমাত্য পুরোহিত শরদ্বান বললেন, সাতটি পাহাড় ঘেরা হ্রদের তীরে পণিদের বাস। যদিও আমাদের এই সুবাস্তু জনপদের কেউ পণিদের ওই অঞ্চল সম্বন্ধে অভিজ্ঞ নয়, তবু আমরা শুনেছি শতক্রতু ইন্দ্র একসময় গো-তস্ক। পণিদের কাছ থেকে বহু ধেনু উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। সরমা নামে কুক্কুরী এ কাজে বৃত্রঘ্ন ইন্দ্রকে সাহায্য করেছিল। সে দুর্গম গুপ্ত স্থানে গিয়ে সন্ধান পেয়েছিল পণিদের। পণিরা সরমা কুক্কুরীকে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সফল হয়নি। অবশ্য ইন্দ্র কী কৌশলে কোন পথে গিয়ে গোধন উদ্ধার করেছিলেন তা আমাদের জানা নেই। তবে পণিরা যে সপ্তশৈল ঘেরা হ্রদের তীরে বাস করে তা সুবাস্তু জনপদবাসীরা শৈশব কাল থেকে শুনে এসেছে।

রাজা দিবোদাস বললেন, সেই দুর্গম সপ্তশৈল ঘেরা হ্রদের সন্ধান পেতে হবে প্রথমে, তারপর সেখানে যেতে হবে সসৈন্যে গোধন উদ্ধারের জন্য। এ কাজ সহজ-সাধ্য বলে মনে হয় না। শুনেছি পণিরা শুধু অদাতা, তস্করই নয়, সম্পন্ন বণিক ও সুদৃঢ় পার্বত্য দুর্গের অধিবাসী। আমরা যদি দ্রুহ্যবদের রাজ্য অতিক্রম না করে ওদের সন্ধানে অভিযান চালাই তাহলে আমাদের বহু দূর পর্যন্ত আদীন নদীর উৎসমুখে উঠে যেতে হবে। কিন্তু একবার যদি দ্রুহ্যবরা আমাদের উত্তরমুখী অভিযানের খবর পায় তাহলে পশ্চাৎদেশ থেকে আমাদের আক্রমণ করার চেষ্টা করবে। হয়তো উত্তরে পণি আর দক্ষিণে দ্রুহ্যবদের মাঝখানে পড়ে আমাদের সৈন্যেরা সংকটের মুখোমুখি দাঁড়াবে। এসবই অবশ্য আমার অনুমান। কিন্তু অকারণ লোকক্ষয়ের আগে আমাদের বিষয়টি বার বার ভেবে দেখতে হবে।

জনৈক সেনাপতি বললেন, যদি আমরা দ্রুহ্যবদের আগে সমুচিত শিক্ষা দি, তাহলে তাদের রাজ্যের ভেতর দিয়েই উত্তরে যাবার পথ করে নিতে পারি।

জনপতি দিবোদাস বললেন, অকারণে যুদ্ধ বাধানো অন্যায়। একটা কারণ পেলে আমরা অগ্রসর হতে পারি। কিন্তু তেমন কোন প্রমাণ্যযোগ্য অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে এখুনি পাওয়া যায়নি।

সবাই মাথা নিচু করে আবার গোধন উদ্ধারের উপায় সম্বন্ধে চিন্তা করতে লাগল। সভার এক প্রান্ত থেকে উঠে দাঁড়াল নতুন সেনাপতি তুর্বসু। সকলের দৃষ্টি সঙ্গে সঙ্গে তার দিকে আকৃষ্ট হল।

তুর্বসু বলল, এখানে সম্মানীয় সেনাপতিরা রয়েছেন। তাঁদের প্রতি কোনরকম অসৌজন্য প্রকাশ না করেও বলব, যদি মহারাজ আমাকে আদেশ করেন তাহলে আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি।

রাজা দিবোদাস তুর্বসুর দিকে গভীর আগ্রহে চেয়ে থেকে বললেন, তুমি কী সসৈন্যে অভিযান করতে চাও তুর্বসু?

না মহারাজ। আমি নিঃসঙ্গ যেতে চাই পণিদের ওই সপ্তশৈলের রাজ্যে। আমাকে আগে তাদের সম্বন্ধে

পুঙ্খানুপুঙ্খ জানতে দিন, তারপর ধেনু উদ্ধারের পথ আবিষ্কৃত হবে।

রাজা দিবোদাস বললেন, সহস্রটি ধেনু আমার কাছে হয়তো বিরাট কিছু একটা সম্পদ নয়, কিন্তু এর সঙ্গে জড়িত আমার এই রাজ্যের সম্মান। তাই এই সামান্য চৌর্য ব্যাপারেও আমি বিচলিত হয়ে পড়েছি। যদি আমি এ ব্যাপারে নীরব থাকি তাহলে দ্রুহ্যবেরা আমাদের কাপুরুষ ভেবে বসবে। তাছাড়া যাদ্ব, ভারত পুরুষুজনের লোকেরা এ খবর অবিলম্বে পেয়ে যাবে। তারা আমাকে নিশ্চেষ্ট দেখে বিস্মিতও হতে পারে।

একটু থেমে রাজা বললেন, তুমি নিজেই পণিদের এই সমস্যা সমাধানের ভার নিতে চাইছ তুর্বসু। তোমার ক্ষমতা আর সূক্ষ্ম বিবেচনার ওপর আমার পূর্ণ আস্থা রয়েছে। এ বিষয়ে আমি তোমাকে স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার দিলাম। আমরা কেউ তোমার পরিকল্পনার ও'পর হস্তক্ষেপ করব না। তুমি যখন যে সাহায্য চাইবে আমরা তোমাকে তাই দেবার জন্য প্রস্তুত থাকব।

সভার সকলে সম্মতিসূচক গুঞ্জন তুলল। তুর্বসু নত হয়ে সকলকে নমস্কার করে বলল, এ কাজ দ্রুত সম্পন্ন হবার নয়। আমি আপনাদের সকলের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে অগ্রসর হতে চাই।

সবাই শুভেচ্ছাজ্ঞাপক ধ্বনি তুলে তরুণ সেনাপতির কল্যাণ কামনা করল।

সভা ভঙ্গ করে রাজা দিবোদাস চলে গেলেন প্রাসাদের অভ্যন্তরে। তাঁর অন্তর এই মুহূর্তে প্রসন্ন হয়ে উঠল। তুর্বসুকে কেন্দ্র করে তাঁর মনের গভীরে একটা নিশ্বাস ক্রমাগত আবর্তিত হতে লাগল। কে যেন তাঁর কানে বার বার বলতে লাগল, যে কোনও রকম অসাধ্য সাধন একমাত্র তুর্বসুর দ্বারাই সম্ভব। ওর ওপর ভরসা রেখো। ও অসাধারণ হয়েই জন্মেছে।

পশুপারা যেমন ঘোড়ায় চড়ে দূর দূর তৃণভূমিতে পশুদের চরিয়ে নিয়ে বেড়ায় তেমনি একটা ঘোড়ার পিঠে চেপে অতি সাধারণ পোশাক পরে পাহাড়ি রাস্তায় চলেছে তুর্বসু। কোমরে বাঁধা একখানা কুঠার। পাশে ঝোলানো থলের থেকে উঁকি দিচ্ছে একটা বাঁশি। তাকে দেখে মনে হবে পশু ছাড়াই চলেছে সুদর্শন এক পশুপালক।

দ্রুহ্যবদের দেশ থেকেই উঁচুনিচু পাহাড়ের শুরু। পাহাড়ি ওম্ পথ ধরে তুর্বসু ওঠানামা করে এগোতে লাগল উত্তরমুখে। ভোরের আলো ফুটছে। সবুজ পাতায় চিকণ সোনার মাখামাখি। পাখি ডাকছে গাছের ডালে। পাখি উড়ছে আকাশে। নীচে দেখা যাচ্ছে একটা উপত্যকা। কাঠের তৈরি কয়েকটি বাসগৃহ দাঁড়িয়ে আছে। এসব ঘর দেখেই বুঝেছে তুর্বসু চলমান গৃহ। বড় বড় খাদির কাঠের চাকা লাগানো। এতে সংসার পেতে বসবাস করে একদল যাযাবর। এক জায়গার আনন্দ আর প্রয়োজন মিটিয়ে নিয়ে ওরা আবার ঘরগুলিকে অন্য জায়গায় টেনে নিয়ে যায়। এমনি করে বিচিত্র প্রকৃতি আর জীবনের স্বাদ পায় ওরা।

তুর্বসু ভোরের নরম রোদে অনেকখানি পথ পেরিয়ে গেল। পাহাড়ি পথে ঘোড়া ছুটিয়ে চলা যায় না। একটুখানি সমতল পথ পেলেই সে দ্রুতগতিতে পার হয়ে যাচ্ছে। এ পথ তার পরিচিত নয়, কারণ ছেলেবেলা থেকেই সে শুনে আসছে দ্রুহ্যবদের দেশে তাদের শুভ যাত্রা নিষিদ্ধ। শুধুমাত্র সাধারণ মানুষ, প্রধানতঃ দ্রুহ্যববাসীরাই আসে বছরের বিশেষ একটি সময়ে তাদের দেশে। প্রচুর খাদ্যশস্য বলীবর্দ-বাহিত গাড়িতে বয়ে নিয়ে যায়। বিনিময়ে দিয়ে যায় মধু আর সোমলতা। তুর্বসু শুনেছে, তার বাবা তরুণ সৈনিক হিসেবে দ্রুহ্যবদের দেশে এক সময় যুদ্ধ করতে এসে মারা যান। সে সময় তুর্বসু ছিল এক বছরের শিশুমাত্র। বাবা মারা যাবার সময় তাঁর এক বন্ধু-সৈনিকের হাতে বাণভরা তূণীর আর ধনুটি তুলে দিয়ে বলেছিলেন, এটি আমার পুত্রের হাতে পৌঁছে দিও। বড় অল্পকালের ভেতর পরমায়ু শেষ হয়ে গেল। দুঃখ নেই, আমি আমার কাজের ভেতর মরলাম। আমার পুত্রও যেন সততার সঙ্গে তার কাজ করে যায়।

পশ্চাৎ-শিবিরের আরোগ্যশালায় একদিন মাত্র তার বাবা বেঁচে ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর সৈনিক বন্ধুটি তাঁর দেওয়া ধনুর্বাণ ঘরে মায়ের কাছে পৌঁছে দেন। বড় হলে মা সেই ধনু আর শর তার হাতে তুলে দিয়ে বলেছিলেন, এ তোমার বাবার আশীর্বাদ। চিরদিন এর মর্যাদা রাখার চেষ্টা করবে।

আজ তার মা-ও গত হয়েছেন, কিন্তু সে পিতার অতি পবিত্র দান হিসেবে ধনুটি ব্যবহার করে চলেছে।

উজ্জ্বল রোদ্দুরে পাহাড়ের গায়ে ক্ষেতিব কাজ করছে কীনাশ। দাত্র চালিয়ে পাকা ফসল কেটে গোছ করে রাখছে পাহাড়ের গায়ে। তার একটু ওপরে পাহাড়ের কোলে একটি পর্ণশালা। কাঠ আর পাথর দিয়ে কাঠামোটা তৈরি। মাথায় পাতার ছাউনি। ঘরের সামনে বসে একজননী যবচূর্ণ করছে। দুটি শিশু উবু হয়ে বসে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে আছে। ধোঁয়া উঠছে অগ্নিস্থান থেকে। একটুখানি এগিয়ে গিয়ে দেখল তুর্বসু, ক্ষেতের সামনে দাঁড়িয়ে কী কারণে যেন আস্ফালন করছে সীরপতি। ভীত চর্ষাণ বলীবর্দের লেজে পাক দিতে দিতে দ্রুত চলেছে লাঙল চালিয়ে।

সবই পরিচিত ছবি! তুর্বসু এগিয়ে চলে। সে ভাবে, সরস্বতী নদীতীরের ক্ষেতিগুলিতে ভূমিকর্ষণের আগে ঋষিরা ক্ষেত্রপতির স্তব করে বলেন, হে ক্ষেত্রপতি, ধেনু যেমন দুগ্ধ দান করে তুমিও তেমনি মধুস্রাবী বারি দান কর।

আবার কৃষিকর্ম শুরু হয়ে গেলে তাঁরা প্রার্থনা করেন, বলীবর্দসমূহ সুখে বহন করুক ভার। কীনাশেরা সুখে চালনা করুক লাঙল। সুখে কর্ষণ করুক ভূমি।

জীবনের প্রতিটি কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে ঋষির প্রার্থনা। তার বড় ভাল লাগে এই অনুষ্ঠানগুলি।

জনপদের সীমা পার হয়ে এক অরণ্যভূমির কাছে যখন এসে পৌঁছল তুর্বসু তখন সূর্য ঢলে পড়েছে পশ্চিমাকাশে। হঠাৎ সে শুনতে পেল অরণ্যের ভেতর থেকে একটা শব্দ উঠে আসছে। প্রথমে সে বুঝতে পারল না। পরে ঘোড়ার রাশ টেনে ধরে কান পেতে শুনল। গুরু পাঠ দিচ্ছেন ছাত্রদের। একবার গুরু উচ্চারণ করছেন, পরক্ষণে সমবেত কণ্ঠে ছাত্ররা উচ্চারণ করছে গুরুর মুখনিঃসৃত বচন। বর্ষায় ডেকে উঠছে একটি ভেক। তাকে অনুকরণ করছে সমবেত ভেকেরা। অবিকল মণ্ডূকদের সেই পুনরাবৃত্তি রীতি।

বড় ভাল লাগল তুর্বসুর। মনে হল সে যেন এই মুহূর্তে শৈশবের দিনগুলিকে ফিরে পেয়েছে। গুরু শুনহোত্রের মুখের বাণী তারা উচ্চারণ করছে তারস্বরে। শুনকের কথা মনে পড়ছে। তার পাশে বসত শুনক। গুরু শুনহোত্র একবার উচ্চারণ করলেই শুনক খোঁচা দিত তাকে। ইঙ্গিতটা এই, যত জোরে পার ভেকেদের মতো গলা ফুলিয়ে চেঁচাও।

সহসা মনের মধ্যে একটা ভাবান্তর এল তুর্বসুর। সব দেশ, সব মানুষ সমান। ওই যে ভোরবেলায় পথ চলতে দেখা দরিদ্র ক্ষেতিকার কিনাশ, যব চূর্ণকারিণী মেয়েটি, পাঠরত ছাত্রদল, ওরা সব দেশেই এক। সূর্য চন্দ্র আকাশ পৃথিবীর মতো ওরা সত্য এবং নিত্যদিন একই কাজ করে চলেছে। হঠাৎ যেমন ঝড় ওঠে, মেঘে আচ্ছন্ন করে ফেলে আকাশ, গর্জনে বর্ষণে বিদ্যুতের চমকে ভীত চকিত হয়ে ওঠে দিকদেশ, ঠিক তেমনি যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ভেতর। তখন বাণ বর্ষণে, দুন্দুভি শঙ্খ নিনাদে, মানুষের কোলাহলে কেঁপে ওঠে চরাচর। আবার আকাশের পট থেকে মেঘ সরে গেলে চিরদিনের চন্দ্র সূর্য জেগে ওঠে। তাদের কিরণে প্লাবিত হয় বিশ্ব। যুদ্ধ থেমে গেলে মানুষও তেমনি সহজ, স্বাভাবিক। সে ক্ষেত কর্ষণ করে, গান গায়, প্রেমিকাকে বুকে জড়িয়ে ধরে, সন্তানের মাথায় হাত রাখে, গভীর স্নেহে।

তুর্বসু ঘোড়া থেকে নেমে ঘোড়ার রাশ ধরে বনের মধ্যে ঢুকল। কয়েকটি বড় বড় বৃক্ষের ভেতর দিয়ে শব্দ অনুসরণ করে সে এসে পৌঁছল একটি ফাঁকা জায়গায়। ভারী চমৎকার স্থান! পাশাপাশি দুখানি পর্ণগৃহ। পরিচ্ছন্ন ঋষির আশ্রম। এক শ্মশ্রু-গুম্ফধারী বৃদ্ধ ঋষি বসে আছেন। তাঁকে ঘিরে কিশোর ছাত্রের দল। সেদিনের মতো পাঠ শেষ হয়ে গিয়েছিল ছাত্রদের। তারা গুরুকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল। হঠাৎ তারা পেছন ফিরে দেখতে পেল তুর্বসুকে। ততক্ষণে তুর্বসু গাছের কাণ্ডে ঘোড়াটিকে বেঁধে রেখে গুরুর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

কিশোররা গুরুর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে অপরিচিতের আগমন বার্তাটি জানিয়ে দিয়ে সরে দাঁড়াল। তুর্বসু এতক্ষণে বুঝতে পারল গুরু দৃষ্টিশক্তিহীন। তুর্বসু এগিয়ে গিয়ে অন্ধ ঋষিকে প্রণাম করে বলল, আমি দক্ষিণ জনপদ থেকে আসছি। যাব উত্তরাপথে। অপরাহ্ন কাল আগত। সামনে লোকবসতির কোনও চিহ্ন নেই। এখানে আপনার শিষ্যকুলের পাঠাভ্যাসের ধ্বনি শুনে বুঝলাম এটি কোন ঋষির আশ্রম। তাই আপনার আশ্রয়ে এসেছি।

তুর্বসুর কথা শুনে ঋষি প্রসন্ন হয়েছেন বলে মনে হল। তিনি শিষ্যদের উপস্থিতি অনুভব করে বললেন, তোমরা সব ঘরে যাও। সায়াহ্ন কাল উপস্থিত হয়েছে, বিলম্ব হলে গুরুজনেরা চিন্তিত হবেন। শিষ্যেরা আশ্রম ত্যাগ করে চলে গেল। যাওয়ার সময় কৈশোর চাপল্যবশতঃ ঘোড়াটিকে খোঁচা দিলে সেই অবলা জীবও নিজস্ব বিশেষ স্বর উচ্চগ্রামে তুলে প্রতিবাদ জানাতে লাগল।

ঋষি বললেন, আপনি কী অশ্বে আরোহণ করে এসেছেন?

হ্যাঁ প্রভু।

ঋষি ক্ষণকাল চিন্তা করে বললেন, আমি সম্পন্ন নই, তাছাড়া অন্ধ, সুতরাং আপনার যথোচিত সংবর্ধনা আমাদের দ্বারা সম্ভব হবে না। এ অবস্থায়ও যদি আপনি আশ্রয় ইচ্ছা করেন, তাহলে আমরা সুখী হব।

তুর্বসু বলল, আমি আপনার পুত্র স্থানীয়, সুতরাং সম্মানীয় অতিথির মতো আমার সঙ্গে আচরণ না করলেই আমি সবচেয়ে বেশী তৃপ্তি পাব।

ঋষি বললেন, আমি অন্ধ, তোমার মুখ দেখতে পাচ্ছি না বাবা। তবে কণ্ঠস্বরে তোমার মধুর প্রকৃতি সম্বন্ধে অনুমান করতে পারছি। তুমি দক্ষিণের সমতল থেকে এসেছ, তাই স্বাভাবিকভাবেই তুমি সম্পন্ন। সংকোচ আমার সেখানেই। এখন তোমার সঙ্গে কথা বলে আমি নিশ্চিন্ত হলাম। তুর্বসু বলল, আমি পথচারী, নিরাশ্রয়। রাতের জন্য মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকু পেলেই আমি কৃতার্থ হই।

ঋষি জনৈকা স্ত্রীলোকের নাম ধরে ডাক দিলেন, কিন্তু কোন সাড়া না পেয়ে নিজেই উঠে দাঁড়ালেন। অভ্যস্ত পা ফেলে কুটিরের ভেতর ঢুকলেন। তুর্বসু কীভাবে অন্ধ ঋষিকে সাহায্য করবে বুঝতে না পেরে শুধু সেদিকে চেয়ে রইল। খানিক পরে বেরিয়ে এলেন ঋষি। হাতে একখানি কশিপু আর উপবর্হণ। দুটি জিনিস নিয়ে ঘরের দাওয়া থেকে আঙিনায় নামতে তিনি ইতস্ততঃ করছেন দেখে সেদিকে ছুটে গেল তুর্বসু। তাঁর হাত থেকে উপবেশনের মাদুর আর উপাধানখানা নিয়ে বলল, আপনি কেন এত কষ্ট করছেন? এই পরিচ্ছন্ন আঙিনায় কশিপুখানা পেতে বসার কোন দরকারই হবে না। আর তাছাড়া এখন তো শয়নের সময় আসেনি, তাই উপবর্হণের কোনও প্রয়োজনই নেই।

দাওয়া থেকে নেমে বৃদ্ধ ঋষি বললেন, তবু তুমি আমার অতিথি। তোমার জন্য সামান্য কিছু করতে পারলেও আমি শান্তি পাই।

তুর্বসু বলল, বেশ, আমি আপনার দেওয়া কশিপুখানা বিছিয়ে নিচ্ছি। উপাধানটিও রাখছি তার ওপর। আপনি আগে এসে বসুন।

এই বলে তুর্বসু অন্ধ ঋষির হাত ধরে এনে বসাল আঙিনায় বিছানো কশিপুর ওপর। তারপর নিজে বসল তাঁর পায়ের কাছে।

তুর্বসু দেখল, তাদের জনপদে ঋষিরা যেমন সম্পন্ন ও প্রতিষ্ঠাবান, এখানে তার একেবারে ব্যতিক্রম। বিশেষ করে এই অন্ধ ঋষির পরিবেশ দেখে তার মনে হল, কায়ক্লেশে ঋষি দিনযাপন করেন। তাদের জনপদে ঋষিকুল যখন রথে করে নগরের দিকে আসেন তখন তাঁদের মাথায় থাকে কনক উষ্ণীষ, হাতে সুবর্ণ বলয়, আর বক্ষে সুবর্ণ আভরণ। তাঁদের উজ্জ্বল পোশাক দেখে মনে হয় তাঁরা রাজার মতোই সমৃদ্ধিশালী। ঋষি চয়মান শাস্ত্র এবং শস্ত্র দুটিতেই পণ্ডিত, অতি সম্পন্ন সংসার তাঁর। পুত্র শুনক একদিকে শাস্ত্রজ্ঞ অন্যদিকে শস্ত্র-নিপুণ যোদ্ধা।

অন্ধ ঋষি কথা বললেন, সংসারে আমার কেউ নেই। আমি দার পরিগ্রহও করিনি। যখন চোখের দৃষ্টি ছিল তখন রাজগৃহ থেকে একটি মেয়েকে নিজের মেয়ের মতো কাছে এনে রেখেছিলাম। সেই এখন আমার আঁধার দিনের একমাত্র আলো।

একটু থেমে আবার বললেন, অন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে আমি বড় অনুশোচনায় ভুগছিলাম বাবা! মেয়েটিকে সংসারী করবার জন্য বিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমাকে ছেড়ে মেয়েটি কিছুতেই সংসার জীবনে আবদ্ধ হতে চায়নি। আমি বলেছিলাম, তাহলে আমার এই অরণ্য-আশ্রমে তুমি সংসারী হয়ে থাক মা।

তাতেও মেয়ে আমার রাজি হয়নি। বলেছিল, যে আসবে, সে তোমাকে অন্ধ দেখে একদিন উপেক্ষা করবে বাবা। সে আমি সইতে পারব না। তার চেয়ে তোমার কাছে থেকে শাস্ত্র পাঠ করে এ জীবনটা কাটিয়ে দেব। তাতেই আমার সুখ।

তুর্বসু বলল, শ্রদ্ধার যোগ্য আপনার মেয়ে।

অন্ধ ঋষি বললেন, মাঝে মাঝে মনটা অশান্ত হয়ে ওঠে বাবা! মনে হয় এক অন্ধের পরিচর্যার জন্য একটি মেয়ে তার জীবনের সব সুখ আহুতি দিল। নিজেকে বড় অপরাধী মনে হয়।

তুর্বসু বলল, পিতার হৃদয় চিরদিনই কন্যার সুখ দুঃখের জন্য কাতর হয়। আপনার এ কাতরতার কারণও তাই। আমাদের সমাজে যখন ব্রহ্মবাদিনী আর ব্রহ্মচারিণী, দু'শ্রেণীর কন্যারই স্থান আছে, তখন উনি না হয় ব্রহ্মচর্যের পর বিয়ে না করে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রহ্মবাদিনীই হয়ে রইলেন।

ঋষি বললেন, আমি আমার অধীত বিদ্যা ওকে দান করেছি। কিন্তু ও এখন শাস্ত্রবিচারে আমাকেও অতিক্রম করে গেছে। সম্প্রতি বাক্ আশ্চর্য সব ঋক্ রচনা করছে। দ্রুহ্যবরাজ কশুর কন্যা মদয়ন্তী ওর সখি। মাঝে মাঝে আমার এই আশ্রমে এসে বাক্ রচিত ঋক্ শুনে যায়।

তুর্বসু বলল, কিছু যদি মনে না করেন একটি কথা আপনার কাছে জানতে চাই।

বিনা দ্বিধায় বল।

তুর্বসু বলল, রাজগৃহের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ, কিন্তু আপনার সাংসারিক অবস্থার বিশেষ কোন উন্নতি দেখি না কেন?

ঋষি বললেন, ব্যক্তিগতভাবে দান গ্রহণ আমার অভিপ্রেত নয়। আমার কন্যা বাক্ও এর বিরোধী। সন্নিহিত জনপদের কিশোররা পাঠ নিতে আসে আমার আশ্রমে। তাদের প্রদত্ত দক্ষিণায় দুটি প্রাণীর জীবন-ধারণের ব্যবস্থা হয়ে যায়। শুধু কন্যার বিষয়টি ছাড়া আমি এই ধরিত্রীর বুকে বড় তৃপ্ত বাবা।

তুর্বসুর চোখ গিয়ে পড়ল পাশের অরণ্যে। বৃক্ষচ্যুত পত্রের ওপর পদপাতের ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। সামান্য পরেই তুর্বসুর চোখের সামনে অপরাহ্নকালে যেন মূর্তিমতী ঊষার আর্বিভাব হল।

কক্ষে জলভরা দ্রোণ। আকর্ষণীয় বঙ্কিম ভঙ্গি। চোখে অপার বিস্ময়। বাক্ এসে থমকে দাঁড়াল পর্ণশালার কূটদণ্ড ধরে।

ঋষি বললেন, জল আনতে গিয়েছিলি মা? এদিকে দেখ তোর ঘরে অতিথি এসেছেন। বহু দূরের অতিথি। দক্ষিণে সরস্বতী তীরের জনপদ থেকে এসেছেন।

সলজ্জ হাসিতে অতিথি আপ্যায়ন করে বাক্ গিয়ে ঢুকল কুটিরের ভেতর। কিছুক্ষণ পরে একটি পাত্রে জল এনে তুর্বসুর সামনে বসিয়ে নত হয়ে নমস্কার করে বলল, অপরাধ নেবেন না। অপরাহ্নে জল আনতে আমি নদীতে গিয়েছিলাম। দয়া করে হাত-মুখ ধুয়ে নিন।

তুর্বসু নিয়ম রক্ষা করল। গৃহপতির প্রশংসা করে ফিরিয়ে দিল জলপাত্রটি। বাক্ শূন্য জলপাত্র নিয়ে পর্ণশালায় ফিরে গেল।

ঋষি এবার জিজ্ঞেস করলেন, কি নাম তোমার বাবা? কোন জনেরই বা তুমি মানুষ।

নাম আমার তুর্বসু। আমি 'অনব' জনের মানুষ।

ঋষি কিছুক্ষণ স্থির হয়ে থেকে বললেন, দ্রুহ্যবদের সঙ্গে তোমাদের শত্রুতা, সাবধানে এ জনপদটুকু পার হয়ে যেও বাবা।

তুর্বসু বলল, ঋষিরা সর্বত্রই পূজ্য। তাঁদের কাছে মিথ্যাচার সম্ভব নয়, তাই আপনার কাছে আমার সত্য পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইনি।

একটুখানি নীরব হয়ে থেকে আবার বললেন ঋষি, তুমি তোমার বাক্যের দ্বারা আমার অন্তরকে স্পর্শ করেছ, তাই তোমার শুভাশুভের কথা চিন্তা করে একটি পরামর্শ দিতে চাই।

তুর্বসু বলল, বলুন। আপনার পরামর্শ আমার কাছে আশীর্বাদ।

কয়েকটি দিন তুমি আমার এখানে অবস্থান কর। দ্রুহ্যবরা এখন কিছু পরিমাণে উত্তেজিত। তারা অনবদের কাছ থেকে অচিরে একটা আক্রমণের আশঙ্কা করছে।

তুর্বসু গভীরভাবে সন্ধানী হয়ে উঠল, আপনি এ সংবাদ সংগ্রহ করলেন কোথা থেকে? আর কেনই বা এই যুদ্ধের আশঙ্কা?

ঋষি বললেন, কাল দ্রুহ্যবদের রাজা কশুর কন্যা মদয়ন্তী এসেছিল বাকের সঙ্গে আলাপ করতে। তার মুখ থেকেই এই আশঙ্কার কথা উচ্চারিত হয়েছে।

একটু থেমে আবার বললেন, মদয়ন্তী এসেছিল সখির সঙ্গে আলাপ করতে, কিন্তু সঙ্গে এনেছিল উৎকৃষ্ট এক ভাণ্ড ঘৃত। ওকে ঘৃতের কথা জিজ্ঞেস করায় বলল, পণিরা দ্রুত দ্রুহ্যবদেশ পার হয়ে যাওয়ার সময় রাজগৃহে কয়েক কুম্ভ ঘৃত উপঢৌকন দিয়ে যায়। তারা নাকি অনবদের সহস্রাধিক ধেনু হরণ করে নিয়ে যাচ্ছিল।

তুর্বসু কোনও কিছু না জানার ভান করে বলল, এতে যুদ্ধের আশঙ্কা কেন?

ঋষি বললেন, পণিরা জ্যোৎস্নার আলোয় দ্রুহ্যবদের দেশে তাদের অপহৃত ধেনু নিয়ে চলে আসছিল কিন্তু সেতু পার হওয়ার সময়ে অনবদের এক তীরন্দাজ নাকি তাদের দেখে ফেলে। তাই দ্রুহ্যবরাজ কশু আক্রমণের আশঙ্কাকে উড়িয়ে দিতে পারছেন না। তিনি তাঁর প্রজাদের সঙ্গে সঙ্গেই সর্তক করে দিয়েছেন। তাই বলছিলাম, তুমি বাবা ক'দিন এখানে থেকে যাও। পরিস্থিতি বুঝে অভীষ্ট পথে যাত্রা করবে। যদি তুমি অনব বলে পরিচয় না দিতে তাহলে তোমাকে এখানে থেকে যাওয়ার পরামর্শ দিতাম না।

তুর্বসু ঋষিকে এই মুহূর্তে বলল না যে অনবদের দিক থেকে আপাততঃ যুদ্ধের আশঙ্কা নেই। সে শুধু বলল, আমার এই আশ্রমে অবস্থানের ফলে আপনাকে কোনরূপ বিপদের যদি মুখোমুখি হতে হয় তাহলে সে অপরাধের থেকে কোনদিনই আমি মুক্তি পাব না।

ঋষি বললেন, এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পার। আমার এ সামান্য আশ্রমটি সব সন্দেহের বাইরে। লোকচক্ষুর আড়ালে এ অরণ্যভূমি। তুমি বিনা দ্বিধায় এখানে অবস্থান কর।

তুর্বসু আবার বলল, পণিরা দ্রুহ্যবদের কাছে এত প্রিয় কেন?

ঋষি বললেন, স্বার্থই ওদের একসূত্রে বেঁধেছে। আদীন নদী অথবা সরস্বতীর সমতলে যাদের বাস তারা খাদ্যে স্বয়ম্ভর। কিন্তু দ্রুহ্যবেরা অনূর্বর পাহাড়ি এলাকার মানুষ বলে নিত্য খাদ্যাভাব। পণিরা সমতল থেকে প্রায়ই গোধন হরণ করে দ্রুহ্যবদের দেশের ভেতর দিয়েই পালায়। চলে যাওয়ার সময় বেশ কিছু অপহৃত ধেনু আর দুগ্ধজাত দ্রব্য আমাদের রাজা কশুকে দিয়ে যায়। দ্রুহ্যবরাজ কশুর গো সম্পদ ওদের দ্বারাই বৃদ্ধিলাভ করেছে। তাই বলছিলাম, পারস্পরিক স্বার্থে আবদ্ধ।

এবার সোজাসুজি প্রশ্ন করে বসল তুর্বসু, এই হীনমনা পণিদের যথার্থ নিবাস কোথায়?

ঋষি বললেন, উত্তরের পর্বতঘেরা কোন দুর্গম অঞ্চলে ওদের বাস। ওরা কিন্তু বছরের অধিকাংশ দিন বাইরে বাইরেই ঘুরে বেড়ায়।

ওরা কি সমস্ত সংসার সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়?

না। ওদের ওই দুর্গম অঞ্চলটি বেছে নেবার কারণ হল, ওরা যখন ঘৃত ইত্যাদি বিক্রয়যোগ্য দ্রব্য নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে বেশ কিছুকালের জন্য, তখন ওদের ওই পাহাড়ঘেরা আস্তানায় থাকে প্রধানতঃ নারী আর শিশুরা। অশক্ত দু'দশ জন বৃদ্ধ ছাড়া কোনও পুরুষই থাকে না ওই সময়।

তুর্বসু বলল, বড় আশ্চর্য। মেয়েরা তাহলে তো একরকম অরক্ষিতই থেকে যায়।

ঋষি বললেন, দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় ওরা জেনেছে, ওই দুর্গম পাহাড় পার হয়ে কেউ যেতে চাইবে না ওদের অঞ্চলে। আর তাছাড়া মেয়েরাই রক্ষা করে ওদের আসল সম্পদ।

তুর্বসু বলল, কী সে সম্পদ?

কেন অজস্র গোধন। মেয়েরা গোধন পালন করে। তার থেকে প্রস্তুত করে দুগ্ধজাত দ্রব্য।

তুর্বসু বলল, পণিদের ছানা ও দধি প্রস্তুতের কৌশল এখন আমাদের সব গোষ্ঠীর লোকেরাই প্রায় শিখে ফেলেছে। কেবল ঘৃত প্রস্তুত প্রণালীটি এখনও অজ্ঞাত।

ঋষি বললেন, ওরা প্রায় সারা বছর বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে ছানা আর দধি প্রস্তুত করে দিত দুধ থেকে। ওরা ওদের ওই প্রস্তুত প্রণালীটি গোপন করে রাখার বহু চেষ্টা করেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারেনি। সন্ধানী আর্যরা জেনে ফেলেছে। এখন ওরা তাই সরস্বতী তীরবর্তী সুবাস্তু জনপদগুলি থেকে ওদের ব্যবসায়ের কেন্দ্র সরিয়ে নিয়ে গেছে অনেক দক্ষিণ-পশ্চিমে। সেখানে ওরা অনার্য রাক্ষস জনপদের অধিবাসীদের কাছে ওদের দুগ্ধজাত দ্রব্যের ব্যবসায় চালিয়ে যাচ্ছে। কেবল ঘৃত বস্তুটি দীর্ঘস্থায়ী বলে ওরা ওদের বাসস্থান থেকে ওটি প্রস্তুত করে নিয়ে এসে সর্বত্র বিক্রয় করে যায়।

তুর্বসু বলল, কিন্তু ওদের ওই বাসভূমির সন্ধান কি আপনি জানেন?

ঋষি মাথা নাড়লেন। বললেন, ওদের অনেক কথাই আমি কশুরাজের কন্যা মদয়ন্তীর মুখে শুনেছি, কিন্তু ওকে কোনদিন ওদের দেশে যাবার পথের নিশানা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিনি।

তুর্বসু এ বিষয়ে আর কোনও প্রশ্ন করল না। তার মনে হল, সে ইন্দ্রপ্রেরিত হয়ে উপযুক্ত জায়গাতেই এসে পড়েছে। হয়তো এখান থেকেই সে তার অভিষ্ট পথের সন্ধান পেয়ে যেতে পারে।

রাতে ঘৃত দিয়ে ভাজা যব বা 'ধানা' পরিবেশিত হল। খাবার সময় ঋষি বললেন, উৎকৃষ্ট টাট্‌কা ঘিয়ের গন্ধ পাচ্ছ তুর্বসু?

তুর্বসু বলল, খুবই উপাদেয় হয়েছে এই ধানা। ঘৃত যে অতি উৎকৃষ্ট তাতে সন্দেহ নেই।

ঋষি অমনি বললেন, বাক্ কালকের মদয়ন্তীর দেওয়া ঘৃতেই তৈরি এ খাবার, তাই না?

হ্যাঁ বাবা। আমাদের আগের ঘৃতের সঞ্চয় তো বহুদিন হল শেষ হয়ে গেছে।

ঋষি বললেন, সুবাস্তু জনপদবাসীরা পণিদের কাছে চিরদিন এ জন্যে কৃতজ্ঞ। দুগ্ধজাত এমন একটি প্রয়োজনীয় বস্তু যে তৈরি করা যায় তা আমরা কোনদিন ভাবতেই পারিনি। আমাদের যজ্ঞে, আমাদের ভোজ্যে এই সুবাসিত ঘৃত একটি অতি প্রয়োজনীয় স্থান জুড়ে আছে।

ভোজনের শেষ পাদে বাক্ পরিবেশন করল 'অপুপ'। তুর্বসুকে বলতে হল, এমন সুস্বাদু পিষ্টক সে এর আগে কখনও ভোজন করেনি।

ঋষি উচ্চকণ্ঠে গৃহমধ্যে কর্মরত বাকের কানে এ খবরটি পৌঁছে দিলেন। বাক্ অতিথির প্রশংসায় খুশী হল মনে মনে। এমন সুভদ্র কান্তিমান অতিথির সেবা করতে পেরে অন্তরে গভীর তৃপ্তি লাভ করল সে।

পরদিন অন্ধ ঋষি দেববাত বাক্‌কে নিভৃতে ডেকে বললেন, কিশোর মতি বড় চঞ্চল। এই নবাগত অতিথিটির সম্বন্ধে ছাত্রেরা কৌতূহলী হয়ে উঠলে বিপদের সম্ভাবনা দেখা দেবে। ওরা অভিভাবকদের কাছে গল্প করবে। তখন প্রতিবেশীরা ব্যাপারটা তলিয়ে দেখার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠবে।

বাক্ বলল, তাহলে এখন আমাদের করণীয় কী, তাই বলুন? আপনিই তো অতিথিকে এখানে থাকার অনুমতি দিয়েছেন।

ঋষি দেববাত হেসে বললেন, আমারই পরামর্শে যুবক তুর্বসু এখানে কদিন আত্মগোপন করে থাকতে রাজি হয়েছে। আমি ছেলেটিকে বড় বেশি স্নেহ করে ফেলেছি, তাই দ্রুহ্যবদের হাতে পড়ে লাঞ্ছিত হোক, এ আমি চাইনি। কয়েক দিনের ভেতর পরিস্থিতি বুঝে ওকে ওর পথে চলে যেতে দেওয়া যাবে।

বাক্ বলল, আপনি চান, এমন অতিথিকে আমরা কিশোর ছাত্রদের চোখের আড়ালে রাখি?

ঠিক তাই মা। রাজকন্যা মদয়ন্তী এলে বনের মাঝখানে যে নিভৃত পর্ণশালাটিতে তোমরা অনেক সময় রাত্রিবাস কর, আপাততঃ ওই কুটিরে তুর্বসুর থাকার ব্যবস্থা করে দাও। এদিকে তার আসার কোন প্রয়োজন নেই। সন্ধ্যায় ছাত্রেরা পাঠ শেষ করে চলে গেলে তুর্বসু দেখা করে যেতে পারে আমার সঙ্গে।

বাক্ কিছু সময় চিন্তা করে নিয়ে বলল, তাই হবে বাবা।

তুর্বসু আর তার অশ্বটির থাকার ব্যবস্থা হল বনের গভীরে মদয়ন্তী আর বাকের নিভৃত আলাপনের জন্য নির্মিত কুটিরখানিতে।

স্থানটি বড়ই মনোরম। বড় বড় গাছ শাখাবাহু মেলে পরস্পরকে আলিঙ্গন করে আছে। ফুলে ভরা লতা তৃণে ছাওয়া ঘরখানিকে যেন উৎসব মঞ্চের মতো করে সাজিয়ে রেখেছে। আঙিনায় অপরাহ্নের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত আলোছায়ার আলপনা আঁকা হয়ে থাকে। পাখি ডাকে। হরেক রকম পাখি। খরগোস ছুটে বেড়ায়। দু'একটা হরিণ পাশের সরু পথ দিয়ে বনপ্রান্তের নদীতে জল পান করতে যাওয়ার সময় অন্যমনে কুটিরটির দিকে একবার তাকিয়ে দেখে।

মদয়ন্তীর বড় প্রিয় এ জায়গাটি। সে পিতা কশুর কাছে অনুমতি নিয়ে রেখেছে অন্ধমুনির আশ্রমে বাকের সঙ্গে নিশিযাপনের। রাজা কশুর বড় প্রিয় কন্যা এই মদয়ন্তী। পুত্র আছে দ্রুহ্যবরাজের কিন্তু সে বড় দুর্দান্ত প্রকৃতির। বিবেচনাহীন, সারাক্ষণ যুদ্ধের নেশায় উন্মাদ। কয়েকটি উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির যুবক তার নিত্য সঙ্গী! পুত্রের ওপর রাজা কশু তাই সন্তুষ্ট নন, কিন্তু পুত্রকে পরিত্যাগ করার মতো কঠিন সবলতা নেই তাঁর চরিত্রে।

তৃতীয় দিনে কুটিরের সামনে দুটি ছায়াতরুর তলায় বসে গল্প করছিল তুর্বসু আর বাক্। আশ্চর্য ধর্ম এই যৌবনের। দুটি তরুণ-তরুণীর সান্নিধ্য সমস্ত সংস্কারের ওপর জয়ী হয়। একটা অদৃশ্য অনিবার্য আকর্ষণে কখন যে দুটি মন জড়িয়ে পড়ে তা তারা নিজেরাই স্পষ্ট করে বুঝতে পারে না।

তুর্বসু বলল, তোমাকে প্রথম দিন অপরাহ্নের আলোয় দেখে সত্যিই বিস্মিত হয়েছিলাম বাক্। ঊষার মতো আকর্ষণীয় ছিল তোমার আবির্ভাব। কিন্তু....।

কিন্তু কী?

তোমার দেহভঙ্গিমা ও বর্ণ ছিল আমাদের সম্প্রদায় থেকে পৃথক। তাই একটা সন্দেহের অঙ্কুর আমার মনের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল।

বাক্ মাথা নিচু করে বসে রইল কতক্ষণ। একটা ছোট নীল রঙের ফুল সামনের শিলাস্তূপের ফাঁকে ফুটেছিল। বাক্ ফুলটি তুলে এনে তুর্বসুকে দেখিয়ে বলল, আমাকে এমনি করে আমার দেশ থেকে তুলে আনা হয়েছিল।

যিনি নিয়ে আসুন , তিনি রত্ন চিনতেন।

তুর্বসুর মুখের ওপর চোখ রেখে বলল বাক্, তোমাকে যদি এখানে চিরদিন বন্দি করে রাখি তাহলে নিজের পরিজন, পরিবেশ ভুলে থাকতে পারবে এখানে?

তুর্বসু বলল, আমাকে ভুল বুঝো না বাক্, আমি তোমার দুঃখের অংশীদার। কিন্তু তোমার সম্বন্ধে যা সত্য তাই আমি বলেছি।

আমি বাক্ নই তুর্বসু, আমার মায়ের দেওয়া নাম, পরজ। আমার মা দক্ষিণ দেশের এক দস্যু রাজার অন্তঃপুরের দাসী ছিলেন। আমি তাঁর গর্ভের সন্তান। আমার জন্মের পর মাকে মহারানী প্রাসাদের বাইরে বের করে দেন। আমরা থাকতাম সুরক্ষিত প্রাসাদের বাইরে এক পাহাড়ের ওপর কুটির বেঁধে। লোকালয় থেকে দূরে নির্জনে আমাকে নিয়ে সময় কাটত মার। মাঝে মাঝে আমাকে ঘরে রেখে বেরিয়ে যেতেন তিনি। মুখ ঢেকে নিতেন বস্ত্রাঞ্চলে। খাদ্য পানীয় সংগ্রহ করতেন এই ভাবে, গোপনে।

এক সময় আমি বড় হয়ে উঠলাম, আর আমার মাকেও হারালাম। মহারানীর অনেক আগেই মৃত্যু হয়েছিল। আমি অন্তঃপুরের প্রধানা পরিচারিকার দয়ায় প্রাসাদে দাসীরূপে কাজ করার অধিকার পেলাম। কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতেই যুদ্ধ বাধল। সে যুদ্ধে পরাজিত হলেন আমাদের রাজা। সন্ধি হল। দ্রুহ্যবরাজ কশুর সেনাপতি পেলেন দুই সহস্র ধেনু, বহুমূল্য স্বর্ণপিণ্ড আর দশজন শ্রেষ্ঠ দাসী। রাজা আমাকে দাসীরূপে পাঠাতে চাননি, কিন্তু দ্রুহ্যবদের সেনাপতি দাসীমহলে ঢুকে নিজেই আমাকে টেনে বের করে আনেন। চলে আসার সময়ে বৃদ্ধ রাজার চোখে আমি জল দেখেছিলাম। তিনি নির্নিমেষ আমার দিকেই চেয়েছিলেন।

আমার কেন জানি না মনে হয়েছিল, ওই পরাজিত বৃদ্ধ রাজাই আমার জন্মদাতা পিতা। এ অনুমানের একটা সূত্রও ছিল। উনি এক রাতে সংগোপনে এসেছিলেন আমাদের পাহাড়ি কুটিরে। মায়ের সঙ্গে দীর্ঘ রাত কী নিয়ে যেন আলোচনাও করেছিলেন। তারপর তিনি চলে গেলে মা আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদেছিলেন সারা রাত।

সে স্মৃতি আজ আমার কাছে বিলুপ্ত, তুর্বসু। দ্রুহ্যবদেশে এসে প্রথমে আমি উত্যক্ত হয়েছিলাম। রাজা কশুর পুত্র আমাকে পেতে চেয়েছিল তার চরম ভোগের সঙ্গিনীরূপে। কিন্তু রাজকন্যা মদয়ন্তীর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। সে আমাকে নানা কৌশলে রক্ষা করেছে ওই পশুর আক্রমণ থেকে। তারপর আমি ঋষি দেববাতের কাছে কন্যারূপে সমর্পিত হই। সেই থেকে মদয়ন্তী আমার রক্ষাকর্ত্রী আর বান্ধবী। ঋষি আমাকে শাস্ত্র শিক্ষা দেন। নামকরণ করেন, বাক্। আমি ঋষির পালিতা কন্যা হয়ে আজ তাঁর সেবাতেই জীবন উৎসর্গ করেছি। আজ আমার সব ধ্যান, সব জ্ঞান তাঁরই কৃপায়।

তুর্বসু বলল, পরজ, মানুষের জীবন বড় বিচিত্র। আঁকাবাঁকা বহমান একটা নদীর সঙ্গে তার কিছুটা তুলনা চলে। তার ঘূর্ণি, আমাদের জটিল জীবনে ঘূর্ণাবর্ত। তার কলধ্বনি, আমাদেরই অন্তরের উন্মুখ ভাষা। তার জলের দাক্ষিণ্য, তার বন্যার ভাঙন, সবকিছুই আমাদের চরিত্রের ধর্ম। তবে সে যে কখন কোন পথে চলবে তা আমাদের অজানা। তার মিলন ঘটতে পারে কোন মহা জলনিধিতে, নয়তো লুপ্ত হতে পারে তার ধারা ধূসর কোন মরুভূমির বালুকারাশির অতল গর্ভে। শুধু স্রোতে ভেসে চলা ছাড়া আমাদের আর কতটুকুই বা করণীয় আছে পরজ।

বাক্ বলল, কতদিন পরে তুর্বসু আমাকে নিজের ভেতর ফিরিয়ে দিলে। তোমার মুখে ডাকা পরজ নামটা আমাকে দূরের অতীতে নিয়ে চলে গেল। আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ তুর্বসু। তুমি আমার হারানো দিনের দ্বার খুলে স্মৃতির গন্ধমাখা সোনালি অতীতটাকে দেখিয়ে দিলে।

তুর্বসু আর কোন কথা বলল না। স্মৃতি-ভারাক্রান্ত বাক্ নতমুখে তার কাছে বসে রইল। সন্ধ্যার ছায়া ঘনালে তুর্বসু বলল, পরজ ঋষি দেববাত হয়তো তোমার প্রতীক্ষায় বসে আছেন, তুমি যাও তাঁর কাছে।

বাক্ উঠে দাঁড়াল। তুর্বসুর দিকে একবার তাকাল। একটা দীর্ঘশ্বাস বুকের মধ্যে চেপে নিয়ে অরণ্যের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বাক্ চলে গেলে একা কুটিরে বসে থাকতে ইচ্ছে করল না তুর্বসুর। সে বনপ্রান্তে নদী লক্ষ করে চলতে লাগল। বনে অন্ধকার দ্রুত নেমে আসে। ছায়া ঘনিয়ে ওঠার আগেই তুর্বসু বন পার হয়ে এসে পৌঁছল নদীতীরে। ছোট্ট পাহাড়ি নদী। শ্রুতিসুখকর একটা শব্দ করে বয়ে চলেছে। এখানে এখনও ছায়া ঘনিয়ে ওঠেনি। গোধূলি আকাশে অস্তসূর্যের রং এখনও উজ্জ্বল। একটা শিংশপা গাছের কাণ্ডে হেলান দিয়ে নদী আর দূরের পাহাড়ের দিকে চেয়ে চেয়ে অন্যমনে ভাবতে লাগল তুর্বসু। সংসারই শুধু জীবনকে পূর্ণ করে দেয় না, পথও অযাচিত ভাবে দান করে। অতি দুর্গম অনিশ্চিত এক পথে বেরিয়ে কী অভাবিত জীবনের প্রসাদ সে পেয়ে গেল। মানুষের আশীর্বাদ, মানুষের ভালবাসা যখন না চাইতেই বর্ষিত হয় তখন জীবন ধন্য হয়ে যায়। এই মুহূর্তে তার মনে হল, দস্যুরাজকন্যা পরজ অনন্যা। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ল তার শশ্বতীকে। কী অপার ব্যথাভরা দুটো চোখের দৃষ্টি সে মেলে দিয়েছে উত্তরাপথের দিকে। একটা প্রার্থনা তার অন্তর থেকে নিত্য উচ্চারিত পথের দেবতার উদ্দেশ্যে। তুর্বসু যেন মুক্ত থাকে সমস্ত অকল্যাণ থেকে। তার উদ্দেশ্য যেন সিদ্ধ হয়। সে যেন বিজয়ীর মহা সম্মানে ফিরে আসে অতি প্রিয় সুবাস্তু জনপদে।

চলে আসার আগের রাতটিতে দুজনের যখন দেখা হয় আদীন নদীর কূলে তখন অশ্রু ছিল না শশ্বতীর চোখে! প্রিয়ের মঙ্গল কামনায় সে শুধু তুর্বসুর হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে ধরে রেখে বসেছিল। কোনও কথা ছিল না তার মুখে। কোন সাবধান বাণীও উচ্চারিত হয়নি সে রাতে তার মুখ দিয়ে। সে শুধু সকল কর্ম ও সংগ্রামের অধিনায়ক ইন্দ্রের স্তব করেছিল মনে মনে। শেষে বিদায়ের সময় তার হাতে বেঁধে দিয়েছিল একটি স্বর্ণসূত্র। কোনও এক ইন্দ্রযজ্ঞে পাওয়া ওই পবিত্র অভয় সূত্রটি প্রিয়তমের হাতে পরিয়ে দিয়ে সে নিশ্চিন্ত হয়েছিল।

তুর্বসু চোখের সামনে তুলে ধরল তার মণিবন্ধ। শশ্বতীর দেওয়া মঙ্গল সূত্রটি সেখানে বাঁধা হয়ে আছে।

তুর্বসু মনে মনে সেই মুহূর্তে উচ্চারণ করল, তোমাকে ভুলিনি শশ্বতী।

আমার হাতে বাঁধা এই স্বর্ণসূত্রটি কেবল আমার জন্য মঙ্গলই বহন করছে না, এর মধ্যে সে পরম যত্নে বয়ে নিয়ে চলেছে একটি হৃদয়।

নদীতীরে বসে থাকতে থাকতে কখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে উঠল। অরণ্যের কীট-পতঙ্গ শুরু করে দিল তাদের রাতের ঐকতান, তবু ধ্যান ভাঙল না তুর্বসুর। একটা পরম পরিতৃপ্তির সরোবরে সে যেন অবগাহন করতে লাগল।

কত রাতে চাঁদ উঠল সামনের পাহাড়ের মাথায়। অরণ্যের দীর্ঘ দীর্ঘ গাছের শাখা-প্রশাখা, পত্র-পুষ্পে সে চাঁদের আলো এসে পড়ল। আলোর ধারা একসময় গড়িয়ে পড়ল তুর্বসুর সারা দেহে।

চমকে উঠে দাঁড়াল তুর্বসু। আর ঠিক সেই সময়ে একটা ডাক ভেসে এল তার কানে, তুর্বসু! তুর্বসু!

ডাকটা অরণ্য ভেদ করে ক্রমেই এগিয়ে আসতে লাগল নদীর দিকে। তুর্বসু বুঝল তারই খোঁজে অরণ্যপথে এগিয়ে আসছে বাক্। সে-ও অমনি সাড়া দিয়ে উঠল, এই যে আমি এখানে পরজ। নদীর ধারে শিংশপা গাছের তলায়।

বাক্ এসে দাঁড়াল পাশে। স্পষ্ট করে দেখা যাচ্ছিল না তার মুখখানা। তবু চাঁদের আলোয় যতটুকু অনুমান করা গেল তাতে তুর্বসু বুঝল, বাকের মুখখানা অশ্রুভারে থম থম করছে।

তুর্বসু সহসা বাকের দুখানি হাত ধরে বলে উঠল, আমার অপরাধ হয়ে গেছে পরজ। আমি তোমাকে না বলেই চলে এসেছি এখানে। তোমার উদ্বেগের কথা আমার বোঝা উচিত ছিল।

বাক্ তার উদ্গাত অশ্রু হঠাৎ উজাড় করে দিল তুর্বসুর বুকে। সে অতিথির বুকে মাথা রেখে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। এই মুহূর্তে কোনও সংকোচ কোনও দ্বিধা তাকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারল না।

এমনি করে সবটুকু রুদ্ধ অশ্রু উজাড় করে দিয়ে বাক্ স্থির হয়ে সরে দাঁড়াল। তুর্বসু বাকের একখানা হাত ধরে বলল, রাত গভীর হয়েছে, তাই না পরজ? বাক্ মাথা নেড়ে জানাল তুর্বসুর অনুমান ঠিক।

তুর্বসু আবার প্রশ্ন করল, ঋষি দেববাত কি আমার জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন? তিনি কি তাঁর রাতের আহার গ্রহণ করেন নি?

বাক্ ধীর শান্ত গলায় বলল, চিন্তিত হয়ো না, সব ঠিক আছে। রাতের আহারের পর পিতা শয্যাগ্রহণ করেছেন। তিনি জানেন তুমি অরণ্য-কুটিরেই বিশ্রাম করছ। আমার ওপর তাঁর গভীর আস্থা আছে। অতিথি সৎকারের যে ত্রুটি হবে না তা তিনি জানেন।

তুর্বসু বলল, এই নদীতীরে জ্যোৎস্নালোকে একটুখানি বসার সময় কি পাবে? অবশ্য তোমার যদি কুটিরে ফেরার তাড়া থাকে তা হলে আমি তোমাকে নিশ্চয়ই বসতে বলব না।

বাক্ বলল, রাতের আর কোনও তাড়া নেই আমার, তবে অতিথি এখনও অভুক্ত, সে কর্তব্যটুকু বাকি আছে।

বাকের হাতখানা জোরে আকর্ষণ করল তুর্বসু। দুজনে বসল সেই শিংশপা গাছের তলায়। তুর্বসু বলল, আহারের কথা পরে ভাবা যাবে, এখন এই আশ্চর্য পরিবেশের মাঝখানে বসে কিছুক্ষণ কথা বলতে বড় প্রাণ চাইছে পরজ।

বাক্ নির্বাক। সে চোখের কোণায় চেয়ে রইল তুর্বসুর দিকে।

কিছুক্ষণ নীরবতার ভেতর কাটল। তুর্বসুর মনে হল, তার পাশে বাক্ নেই, ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে রয়েছে যে, সে শশ্বতী।

বাক্ এবার কথা বলল, কত জ্যোৎস্নারাতে আমি একা এই শিংশপা গাছের তলায় এসে বসে থাকি। তখন কী ভাব পরজ?

কখনো কিছু ভাবি, আবার কখনো নীরবে বসে শুধু নির্জনতা উপভোগ করি।

ঋষি দেববাতের কাছে শুনেছি তুমি ঋক্ রচনা করতে পার। তুমি তো ঋষিকা, সকলের শ্রদ্ধেয়া।

বাক্ এবার যেন অন্তরের গভীর থেকে কথা বলল, নারীর পরম প্রার্থনা শ্রদ্ধা নয় তুর্বসু, প্রার্থিত পুরুষের সান্নিধ্য। যে নারী সে সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হয়, সে-ই শুধু শ্রদ্ধার আশ্রয়ে নিজের-সান্ত্বনা খোঁজে।

তুর্বসু বলল, অতিথি যদি এই মুহূর্তে কিছুটা প্রগলভ হয়ে ওঠে তাহলে কি তোমার মার্জনা পাবে সে?

বল, কি বলতে চাও?

তুর্বসু বলল, তেমন সান্নিধ্য কি পরজের এই বহুবাঞ্ছিত তরুণী জীবনে আসেনি?

বাক্ বলল, এর যথার্থ উত্তর কি দেব তুর্বসু। সান্নিধ্য দেবার মানুষ যখন এগিয়ে এসেছে তখন সান্নিধ্য নেবার মানুষ সরে গেছে দূরে। সান্নিধ্য দিতে চাইলেই তো আর নেওয়া যায় না।

তুর্বসু বলল, আমি জানি পরজ, তোমার মত বিদূষীকে সঙ্গ দেবার সুযোগ পেলে বহু বিদ্বান ধন্য হয়ে যাবে।

বাক্ যেন আত্মগতভাবে বলল, বিদ্যা বিদ্যা। বিদ্যা আমাকে কী দিয়েছে? একটা শুষ্ক সান্ত্বনাহীন ব্যথায় ভরিয়ে দিয়েছে আমার মন। যখন অন্ধ ঋষি আকুল আগ্রহে তাঁর অধীত বিদ্যা আমার কাছে গচ্ছিত রাখতে চেয়েছিলেন তখন আমি তাঁর কাছ থেকে বিদ্যা গ্রহণ করেছি শুধু তাঁকে সান্ত্বনা দেব বলে। তিনি মহৎ তাই আমাকে প্রথমে সংসারী করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমি স্বীকৃত হইনি। তার প্রধান কারণ আমি তোমাদের গোত্র সম্পর্কের মানুষ নই। আমাদের তোমরা দাস, দস্যু, পিশাচ, রাক্ষস, যে আখ্যাই দাও না কেন, আমরা আগে মানুষকে ভালবাসার বাঁধনে বাঁধি, তারপর তাকে টেনে আনি সংসার-বন্ধনে। কিন্তু এই দ্রুহ্যবদের দেশে সম্পূর্ণ অপরিচিত কোন একটি মানুষের হাত ধরে আমাকে চলে যেতে হবে সংসার রচনার জন্য, ভাগ্যের এ অক্ষক্রীড়ায় আমার স্বীকৃতি নেই। তার চেয়ে অসহায় অন্ধ ঋষির সেবায় জীবন উৎসর্গ করার ভেতর একটা সান্ত্বনা আছে।

তুর্বসু বলল, তোমার ব্যথার স্থানে আঘাত করে আমি বোধহয় অন্যায় করলাম পরজ।

ভালই করেছ তুর্বসু। ক্ষতস্থান থেকে বদ্ধ রক্তগুলো ঝরে না গেলে একটা অসহ্য অব্যক্ত যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়তে হয়। তুমি আমার বন্ধুর মত কাজ করলে।

তুর্বসু বলল, আচ্ছা পরজ, তুমি যে ঋক রচনা কর তাতে তোমার এ যন্ত্রণার কিছু লাঘব হয়?

মুখে হাসির রেখা টেনে বাক বললে, যন্ত্রণা থেকেই আমার ঋকের জন্ম! আবার ওই ঋকই আমার আনন্দ, আমার সান্ত্বনা। সন্তানের জন্মলগ্নে জননী যে সান্ত্বনাহীন যন্ত্রণা ভোগ করে, তা আনন্দে রূপ নেয় যখন সে দেখে তার নবজাতকটির মুখ। ঋকও আমার কাছে সেই রূপ, সেই ভাব নিয়ে আসে।

আজ এই পরিবেশে যদি তোমার মুখ থেকে তোমার সৃষ্ট কোন ঋক শুনতে চাই, তাহলে কি তুমি আমার এই ইচ্ছাকে প্রশ্রয় দেবে পরজ?

বাক্ কতক্ষণ জানুতে চিবুক স্পর্শ করে বসে রইল। একসময় ঋজু হয়ে ধ্যানমগ্ন ঋষির মত উপবেশন করে বলল, এই অরণ্য, এই নদী আমাকে মুগ্ধ করে। আমি ঋকে এদেরই বন্দনা করি।

তুর্বসু কথা না বলে আগ্রহী শ্রোতার মত চেয়ে রইল।

বাক্ চেয়ে আছে, কিন্তু কোনও বিশেষ বস্তুর ওপর এখন তার দৃষ্টি নেই। সে দৃষ্টি ডুবে গেছে নিজেরই সৃষ্টিসাগরের অতলে।

একটি সংগীতের জন্ম হল বাকের কণ্ঠে। চন্দ্ররশ্মি যেন শততন্ত্রী বীণার তার, নদীর কলধ্বনিতে সে তারের সুর-ঝংকার।

'হে অরণ্য, মৃগনাভির গন্ধে তোমার সৌরভ। ছায়া-আলোর টানাপোড়েনে প্রস্তুত তোমার পরিচ্ছদ। পত্রমর্মর তোমার ভাষা। ঋতুর পুষ্পে তোমার নিত্য প্রসাধন। তুমি অপরূপা। হে অরণ্যানি, তোমাকে আমার এই ঋকের দ্বারা বন্দনা করি।'

অসাধারণ! অসাধারণ তোমাব ঋক্ রচনার দক্ষতা। এ শক্তি তুমি কি করে অর্জন করলে বাক্!

মৃদু হেসে বাক্ বলল, প্রশংসা করতে গিয়ে তুমি আমার 'পরজ' নামটা ভুলে গেলে।

একটু থেমে আবার বলল, ঠিকই করেছ। নিজের রাজ্যে পরজ শিখেছিল ধনু চালনা। এতদিন সেখানে থাকলে সে দাসী থেকে হত নারী-সৈনিক। কিন্তু দ্রুহ্যবদের দেশে এসে পেল নতুন নাম। ওই বাক্ নামের মেয়েটিই রচনা করছে ঋক্।

তুর্বসু বলল, তুমি যখন অরণ্যগৃহে আমার পাশে বসেছিলে তখন তুমি পরজ। আর এই মুহূর্তে তুমি যখন আমার সামনে বসেও দিগন্তে নবোদিত উষার মতো দূরে ছিলে তখন তুমি বাক্।

আমার আর একখানা ঋক্ শুনবে?

তুমি যদি ঋক্ রচনা করতে করতে এই রাত্রিকে উষার কোলে পৌঁছে দাও তাহলেও আমি অনড় হয়ে বসে থাকব তোমার ঋক্ শোনার জন্য।

আবার সেই স্তব্ধতা নেমে এল বাকের আচরণে।

'বীরপুত্র লাভের জন্য উন্মুখ মানুষ স্তব করছে তোমার। হে শোভনীয় শর্বরী, তুমি এস নক্ষত্রের অলঙ্কারে ভূষিতা হয়ে। সমস্ত কোলাহল এখন শান্ত। পাখিরা যেমন নীড়ের কোলে সুপ্ত, রাত্রির কোলে সুপ্ত পার্থিব প্রাণীকূল। উদ্বেলিত কামনার আধাররূপিণী রাত্রি, সমস্ত উত্তেজনার প্রশমনকারিণী রাত্রি, তুমি নেমে এস। জায়া ও জননীরূপিণী রাত্রি, আমার ঋকের মধ্যে তুমি আবির্ভূত হও।'

কতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল তুর্বসু। কোন স্তুতি এল না তার মুখে। এই নারী তার পাশে বসেছিল অরণ্যকুটিরে। এ যে অনেক দূরের নক্ষত্র। এর দিকে মুগ্ধচোখে চেয়ে থাকা যায়, কিন্তু একে স্পর্শ করা যায় না।

এক সময় বাক্ নদীর দিকে ইশারায় অঙ্গুলি-নির্দেশ করল। তদগত তুর্বসু প্রথমে ব্যাপারটা বুঝতে পারল না। সে ইতস্তত তাকাতে লাগল দেখে বাক্ একেবারে কাছে সরে এসে তার বাহুতে তুর্বসুর কণ্ঠবেষ্টন করে মুখমণ্ডলটিকে একদিকে ফিরিয়ে দিয়ে চুপি চুপি বলল, ওই দেখ, অরণ্য থেকে হরিণ জল পান করতে নদীতে নেমে এসেছে।

বাকের বাহুর স্পর্শে রোমাঞ্চিত হল তর্বসু। সে তাকিয়ে দেখল একটি মৃগ দম্পতি নিশ্চিন্ত মনে জলপানে নেমেছে। তীরে দাঁড়িয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে একটি অতি ক্ষুদ্র মৃগশিশু। জলপান শেষ হলে ওরা তীরে উঠে এল। হরিণশিশুটি লাফাতে লাফাতে চলল মা-বাবার দেহ স্পর্শ করে। তারা তুর্বসু আর বাক্‌কে একটি চিত্র উপহার দিয়ে অরণ্যের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ঠিক সেই মুহূর্তে সচেতন হয়ে উঠল বাক্। তুর্বসুর কণ্ঠ বেষ্টন করা হাতখানা সরিয়ে নিল সসঙ্কোচে।

সপ্তাহকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। ক্ষীণ একটা আশা শুক্লা চতুর্থীর শশাঙ্কের মতো জেগে আছে বাকের অন্তরাকাশে। কয়েকটি সন্ধ্যা-উত্তীর্ণ নদীতীর দুজনের কাছেই স্মরণীয়। কিছু অন্তরঙ্গ কথার অলক্ষ্য গ্রন্থীতে বাঁধা পড়েছে দুটি হৃদয়।

অন্ধ ঋষি দেববাত কোনও কোনওদিন সন্ধ্যা সমাগমে তত্ত্বচিন্তায় মগ্ন হয়ে থাকেন। তখন নিকটে কেউ থাকলে তাদের শোনান নিজের গভীর উপলব্ধির কথা। পূর্ব ঋষিদের ধ্যানলব্ধ বিষয়গুলিও শোনান। বাক্ আর তুর্বসু স্থিরচিত্তে ঋষির কাছে বসে শোনে তাঁর উপলব্ধির কথাগুলি।

এক সন্ধ্যায় ঋষি বললেন, আমরা সকল আর্যই একদিন এক ছিলাম। আমরা ছিলাম যাযাবর। নদীর স্রোতের মতো প্রবাহিত হয়েছি একই উৎসমুখ থেকে। তারপর সেই নদী বিভক্ত হয়েছে বহু শাখায়। আমরা ছড়িয়ে পড়েছি চতুর্দিকে। চারণক্ষেত্র নিয়ে, নদীর অধিকার নিয়ে আমরা প্রবৃত্ত হয়েছি সংগ্রামে। কোন দল বিধ্বস্ত, কোনও দল বিতাড়িত হয়েছে। কোনও দল বা তার গোত্রের মানুষদের নিয়ে ভোগ করেছে নতুন নতুন জনপদ। যাযাবর থেকে আমরা হয়েছি কর্ষণজীবী। ভূমি আমাদের দান করেছে শস্য। প্রাণ ধারণ আজ অনেক সহজ হয়ে উঠেছে।

একদিন উন্মুক্ত উদার আকাশের তলায় আমরা বিচরণ করেছি। আমরা পেয়েছি সূর্যের প্রসাদ, বৃষ্টির দাক্ষিণ্য, স্রোতস্বিনীর করুণা। তাঁদের স্তবে পূর্ণ হয়েছে আমাদের কৃতজ্ঞ অন্তর। যখন আমরা যাযাবর জীবন থেকে স্থির নিশ্চিন্ত ভূমির আশ্রয় পেলাম তখন আমাদের কৃতজ্ঞতা যজ্ঞের ভেতর দিয়ে প্রকাশ পেল। আমরা হবির দ্বারা আমাদের মঙ্গলকারী দেবতাদের অর্চনা করতে লাগলাম।

স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ আত্মমগ্ন থেকে বলতে থাকেন ঋষি, আকাশ জনক, ধরিত্রী জননী। দুজনের মিলনে সৃষ্ট এ জীবলোক। 'উরুব্যচসা মহিনী অসশ্চতা পিতা মাতা চ ভূবনানি রক্ষতঃ।' পিতামাতা যেমন সন্তানকে লালান পালন করে পরিবর্ধিত করেন, আকাশ ও পৃথিবী তেমনি জীবকুলকে প্রতিপালন করেন।

দেখ বাক্, পৃথিবী আমাদের মা। তিনি আমাদের অন্নদাত্রী। তাঁরই বুকের ওপর দিয়ে প্রবাহিত বায়ু আমরা গ্রহণ করি। সুজলা সুফলা ধরিত্রীর প্রাণরস থেকে আমাদের অস্থি মজ্জা শোণিত সঞ্জাত। তাঁরই বুকের ওষধি থেকে আমাদের রোগের আরোগ্য। আমাদের স্বল্পকালের জীবনের খেলা ও খেলার শেষ তাঁরই বুকে। তাই তিনি আমাদের আরাধ্যা জননী।

আর পিতা আমাদের আকাশ। আকাশের বুকে ভাস্বর সূর্যের প্রকাশ। তাপ ও আলোকের অফুরন্ত সঞ্চয় ওই সূর্যে। পৃথিবীর বুকে প্রাণের সঞ্চার সূর্যের ওই অফুরন্ত তাপের প্রবাহ থেকে। ঋতুর লীলা সূর্যেরই দান। সূর্য ছাড়া সবই অচল।

জনক সূর্য পৃথিবীর রস শোষণ করেন আবার মেঘ সৃষ্টি করে সেই রস বৃষ্টিরূপে সেচনও করেন ধরিত্রীর গর্ভে।

বাক্ প্রশ্ন করে, পিতা, এই যে আকাশের বুকে প্রজ্জ্বলিত সূর্য, যিনি তাঁর উত্তাপে পৃথিবীর গর্ভে প্রাণের বিকাশে সহায়তা করেন, তিনিই কি সকল তাপ, সকল অগ্নির উৎস?

ঋষি ক্ষণকাল স্তব্ধ থেকে বললেন, ' কো বেদঃ', কে জানে!

পরক্ষণেই বললেন, যে অগ্নি আকাশে বিদ্যুৎরূপে উদ্ভাসিত, যে অগ্নি যজ্ঞবেদিতে বিরাজিত, যে অগ্নি তাপরূপে শস্যে সঞ্চারিত, সেই অগ্নিই সূর্যরূপে পূর্বে উদিত ও পশ্চিমে অস্তমিত হন।

বাক্ আবার বলল, এই অগ্নির মূল উৎস কোথায়?

আবার বললেন, ঋষি, 'কো বেদঃ', কে জানে।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে তিনি 'অগ্নি' দেবের বন্দনা করতে লাগলেন। হে অগ্নি, তোমার আনন ঘৃতবর্ণ, কেশরাজি স্ফুলিঙ্গবর্ণ, শ্মশ্রু পিঙ্গলবর্ণ, দন্তপংক্তি ভাস্বর সুর্বণখচিত। হে অগ্নি, তুমি সমস্ত দেবতাদের মুখস্বরূপ। 'অগ্নিবৈ মুখং দেবানাম্'। তোমার লেলিহান শিখা তোমার জিহ্বা। তুমি তোমার ওই জিহ্বার দ্বারা সমস্ত দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত আহুতি গ্রহণ কর।

দ্যুলোক, ভূলোক, অন্তরীক্ষলোক, সর্বত্র তুমি বিরাজমান। তোমার জন্ম দ্যুলোকে। সেখান থেকে তুমি নেমে এসেছ পৃথিবীতে। এখানে তোমার জনক-জননী অরণি কাষ্ঠদ্বয়। তাদের ঘর্ষণে ভূলোকে তোমার নবজন্ম।

স্থির হয়ে বসে রইলেন ঋষি। শ্রোতারাও নির্বাক বসে। এক সময় বললেন, আমার কাছে তোমার জিজ্ঞাসার সঠিক উত্তর নেই মা। সবকিছুর উৎস কোথায়, কত দূরই বা তার যাত্রার সীমা, কোথায় তার সম্পূর্ণতা, কে তা জানে? শুধু অনুমান, শুধু উপলব্ধি। পরম সত্যের রূপ কে দেখেছে? সপ্তর্ষির দিকে তাকাও বাক্, সেই একই জিজ্ঞাসা। সপ্ত ঋষি সত্যের স্বরূপ দর্শনের জন্য ধ্যানস্থ হয়ে আছেন। উত্তর মেলেনি।

ঋষিকে পরম মমতায় শান্ত করে বাক্। সে জানে, কোনওকিছু প্রশ্ন উত্থাপিত হলেই ঋষির চিত্ত আলোড়িত হতে থাকে। সমাধানের সন্ধানে তিনি গভীর চিন্তার রাজ্যে বিচরণ করতে থাকেন। তাঁর আহার নিদ্রা, নিত্যকর্মে বিঘ্ন ঘটে।

আহারের পর ঋষি শয্যায় আশ্রয় নিলে বাক্ তাঁর মাথায় দেহে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। কিছুক্ষণের

ভেতরেই জননীর হাতের স্পর্শে শিশুর মতো নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লেন ঋষি। তখন বাক্ আহারের পাত্র হাতে নিয়ে চলল অরণ্যকুটিরে তর্বসুর কাছে।

তুর্বসু বলল, আজ একটি অনুরোধ জানাব পরজ?

অনুরোধ নয়, বল কী তোমার ইচ্ছা?

আমি রোজ একা এখানে আহার করি। তুমি...

কথাটা শেষ করতে পারল না সে।

বাক্ বলল, আমি তো রোজ তোমার আহারের সময় কাছে বসে থাকি।

আমি কষ্ট পাই পরজ। আহার আমার সম্পূর্ণ হয় না।

বিস্ময় বাকের কণ্ঠে, সে কি! কিসে তোমার আহারের বিঘ্ন ঘটে বল?

তুর্বসু এবার সহজ গলায় বলল, তুমি আমার সঙ্গী হও না বলে।

হেসে উঠল বাক্। বলল, ও এই কথা। অতিথির আহারের সময় অনবদের মেয়েরা বুঝি একইসঙ্গে আহারে বসে?

না তা বসে না। কিন্তু আমার একটি প্রশ্ন আছে।

বল তোমার কী জিজ্ঞাসা?

তুর্বসু বলল, মানুষ একসঙ্গে দু'পা চললে বন্ধু হয়। সাত পা চললে হয় জীবনসঙ্গী। আমি তোমাদের আশ্রমে এসেছি সাতটি দিনের বেশি, এখনও তুমি আমাকে অতিথি বলে দূরে সরিয়ে রাখবে?

বাক্ এ কথার কোনও উত্তর না দিয়ে জ্যোৎস্নায় স্বল্প আলোকিত বনের পথে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে আবার ফিরে এল সে। হাতের পাত্রে রাতের খাবার। তুর্বসুর পাশে খাওয়ার পাত্র নিয়ে বসে বলল, এখন থেকে তোমার অতিথি অপবাদ ঘুচল। আর আজ থেকে এই অরণ্যকুটিরেই বসবে আমাদের সান্ধ্যভোজ।

আরও কটি দিন অতিবাহিত হল। এখন বাকের দৃষ্টি চঞ্চল হয়ে ঘোরে নৃত্যশীল প্রজাপতির পেছনে। স্থির হয়ে থাকে সদ্য কলি থেকে ফুটে ওঠা কোনও ফুলের ওপর।

বাক্ বলে, তোমার এ অরণ্যে না আসাই ভাল ছিল।

এ কথা কেন পরজ? জীবন তো কোন কিছুই ফেলে দেয় না। সবকিছুই সে তার স্মৃতির মণিকোঠায় দুর্মূল্য রত্নের মতো সঞ্চয় করে রাখে। এ অরণ্য আমার ভিক্ষার ঝুলি পূর্ণ করে দিয়েছে।

বাক্ বলল, এমন কৃপণের মতো কথা বলছ কেন? শুধু কি ঝুলি ভরে নিয়েই যাবে, দিয়ে যাবে না কিছু?

তোমার হৃদয় সোনার কলস, তাকে ভরে দেবার মতো সম্পদ আমার কই পরজ?

আহত বাক্ বলল, আমাকে দুর্মূল্য বলে সবাই দূরে সরিয়ে দেয়, তুমিও কী তাই দেবে? রাজপ্রাসাদ থেকে জনপদের প্রতিটি গৃহ বাকের বন্দনা-গানে মুখর। বন্দনা আমার নারীত্বের অবমাননা, এর হাত থেকে মুক্তির কোন সন্ধান কি তুমি দিতে পারনা তুর্বসু?

আমি বড় অসহায় পরজ। আমার সমস্ত প্রাণ তোমাকে মুক্ত করে নিয়ে যেতে চাইলেও আমার কঠিন কর্তব্য আমাকে এই মুহূর্তে তা করতে দেবে না।

কী কর্তব্যে তুমি বাঁধা রয়েছ তুর্বসু? অবশ্য যদি তোমার উত্তর দিতে বাধা না থাকে।

তুর্বসু গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, সারা পৃথিবীর কাছে বিষয়টির গোপনীয়তা রক্ষা করলেও তোমার কাছে আজ আমার কোন কিছু লুকোবার নেই পরজ। আমি উত্তরের পথ ধরে চলেছি পণিদের সন্ধানে। আমি জানি না তারা কোন দুর্গমে বাস করে, তবে তাদের খুঁজে বের করার প্রতিজ্ঞা নিয়েই আমি পথে বেরিয়েছি।

আশ্চর্য, পণিরা তো বণিক। তাদের সঙ্গে তোমার কিসের ব্যবসায়?

হেসে বলল তুর্বসু, আমিও তো ব্যবসায়ী পরজ। তোমার অতিথি তুর্বসু যুদ্ধ-ব্যবসায়ী।

তুমি সৈনিক?

আমি অনব-শাসিত সুবাস্তু জনপদের কনিষ্ঠ এক সেনাপতি।

তুমি সেনাপতি!

তুর্বসু বলল, আমার কটিবন্ধে কুঠার আর তূণীরে তীর দেখনি?

খিল খিল করে হেসে উঠে আবার থেমে গিয়ে বলল বাক্, আমি তো এ অরণ্যে তোমার আবির্ভাবের পর থেকে শুধু তোমাকেই দেখেছি। আর কিছু দেখে নেবার সময় তো পাইনি।

তুমি এমন করে হাসলে যে?

বিশ্বাস কর তুর্বসু, আমি একটুও ভাবতে পারছি না যে তুমি একজন সেনাপতি।

তুর্বসু বলল, পরীক্ষা চাও? কাল দিনের আলোয় পরীক্ষা নিও।

বাক্ বলল, বেশ, তাহলে তোমার পরজও তীরের পরীক্ষা দেবে।

তুমি অসাধারণ গুণী পরজ। একদিকে ঋক্ রচনার দুর্লভ ক্ষমতা তুমি অর্জন করেছ, অন্যদিকে আবার ঋষি মুদ্গালের পত্নী ইন্দ্রসেনার মতো বাণ বর্ষণেও শক্তির স্বাক্ষর রেখেছ।

বাক্ বলল, প্রশংসাটি তোলা থাক কালকের জন্যে। কিন্তু পণিদের সম্বন্ধে তোমার আগ্রহের কারণটা জানতে চাই।

তুর্বসু বলল, পণিরা অনবদের গোধন হরণ করে এই পথেই তাদের দেশে পালিয়েছে। তাদের কাছ থেকে সেই ধেনু ফিরিয়ে আনার জন্যেই আমি চলেছি।

তুমি একা যুদ্ধ করে কেড়ে আনতে পারবে তোমার ধেনু? এতটা দুঃসাহসী হয়ে তুমি নিশ্চয় বিবেচনার কাজ করনি। আর তাছাড়া তুমি সেখানে গেলে পুরুষদের সন্ধান পাবে না। তারা ধেনুগুলি গোষ্ঠে রেখেই দক্ষিণপথে চলে যাবে পণ্যসম্ভার নিয়ে। এখন যুদ্ধ করতে তোমাকে পণিদের অঞ্চল-রক্ষাকারিণী নারী-সৈন্যের মুখোমুখি হতে হবে।

তুর্বসু বলল, শুধু যুদ্ধের অস্ত্রই বল নয় পরজ, কৌশলও অন্যতম বল। এখন তোমার কাছে জিজ্ঞাসা, তুমি কি পণিদের দেশের সঠিক সন্ধান জান?

বাক্ আবার হাসল। বলল, জানলে তোমাকে বলে দেব ভেবেছ?

কেন নয় পরজ?

প্রিয়জনকে বিপদের মুখে তুমি হলে পারতে পাঠাতে?

তুর্বসু বলল, আমি কখনও কোন কাজে হার মানিনি পরজ। আমি গোধন ফিরিয়ে আনার সঙ্কল্প নিয়েই বেরিয়েছি।

তুমি জয়ী হও, এ আমি চাই, কিন্তু এ দুঃসাহসী অভিযানে, বিশ্বাস কর তুর্বসু, তোমাকে একা ছেড়ে দিতে প্রাণ চাইছে না।

প্রতিটি প্রিয়জনের জন্য নারীর এই দুর্ভাবনা তাদের চিরকালের সামগ্রী।

বাক্ বলল, সঙ্গে নেবে আমাকে? তোমার পাশে থেকে আমিও দরকার হলে যুদ্ধ করতে পারব।

কোনও বিপদ এলে সব ফেলে তোমাকেই তখন দেখতে হবে। তার চেয়ে তোমার মূর্তি হৃদয়ে এঁকে নিয়ে যুদ্ধ করলে আমি অনেক বেশি শক্তি পাব।

বাক্ বলল, সৌভাগ্য আমার তুর্বসু, তুমি আমার ছবিকে তোমার হৃদয়ে স্থান দিতে চাও।

ঐ সূর্যের মত সত্য পরজ। যেখানেই থাকি, তুমি থাকবে আমার হৃদয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত।

আমি আর কিছু চাই না তুর্বসু, এই অরণ্যকে সাক্ষী রেখে যে কথা উচ্চারণ করলে শুধু তা মনে রেখো।

তুর্বসু বলল, আমি ভুলব না, কোনদিনও ভুলব না।

বাক্ স্তব্ধ হয়ে কিছু সময় বসে থেকে বলল, কাল আমি যাব রাজা কশুর প্রাসাদে। সেখানে দুটি মানুষই কেবল জানে পণিদের দেশে যাবার পথের নিশানা। আমি নিজে জানি না, কারণ আমার কোনও দরকারই হয়নি। শুধু মদয়ন্তীর কাছে ওদের সম্বন্ধে নানা ধরণের গল্প শুনেছি।

দ্রুহ্যব-রাজ কশুর প্রাসাদে কোন্ দুজন পণিরাজ্যে যাবার পথ জানে পরজ?

একজন স্বয়ং রাজা কশু, অন্যজন কন্যা মদয়ন্তী। এঁরা দুজনেই এক সময় আমন্ত্রিত হয়ে পণিদের রাজ্যে গিয়েছিলেন। শুনেছি সে নাকি গোলক-ধাঁধার পথ।

তুর্বসু সাগ্রাহে বলল, এনে দেবে পরজ সেই পথযাত্রার বিবরণটুক?

কী হবে তোমাকে দিয়ে! তুমি তো আর ফিরে আসবে না এই অরণ্যলোকে একটি মেয়েকে অন্ততঃ কৃতজ্ঞতাটুকু জানাতে।

আমার সমস্ত মন চিরদিনই তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।

থাক কৃতজ্ঞতা। কাল তোমার যাত্রাপথের বিবরণ জানতে পারবে আমার কাছ থেকে।

পরদিন ভোরে অরণ্যকুটিরের দাওয়ায় বসে অন্যমনে তুর্বসু ভাবছিল শশ্বতীর কথা। প্রতিদিন সে ইন্দ্রের কাছে তুর্বসুর মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা জানাবে বলেছিল। যতদিন না উদ্দেশ্য সাধন করে ফিরে আসে তুর্বসু ততদিন ঘটবে না তার পূজার বিরতি।

আশ্চর্য এক অগ্নি এই ভালবাসা। যেখানে ঘৃত, যেখানে সমিধ, সেইখানেই এর প্রজ্জ্বলন। শশ্বতীর কাছে যখন সে গেছে তখন দীপ্ত হয়ে উঠেছে তার সুপ্ত ভালবাসা। আবার যখন এসেছে বাকের কাছে তখন সে ভালবাসা নতুন সমিধ লাভ করে প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। তার ভালবাসার মুলে রয়েছে সত্য, সেখানে কোনও ছলনা, কোনও প্রতারণাই নেই।

হঠাৎ কিংশুকের একটি সরু ডাল কয়েকটি প্রজ্জ্বলিত ফুলের প্রদীপ জ্বেলে এসে পড়ল তুর্বসুর পায়ের কাছে। বিস্মিত তুর্বসু চমকে তাকাল। ডালে তখনও বিদ্ধ হয়ে আছে অর্ধচন্দ্রাকৃতি একটি তীর।

তুর্বসু এই ঘটনাটির উৎস সন্ধানের জন্য চোখ চালাতে লাগল চারিদিকে। বনের প্রান্তসীমায় আশ্রম-প্রাঙ্গণে তখন এসে গেছে গুরু দেববাতের শিষ্যের দল। তাদের সমবেত কণ্ঠের স্তোত্রপাঠ শোনা যাচ্ছে। অরণ্যের বিশাল বিশাল বৃক্ষ ও লতাগুল্ম ভেদ করে সে শব্দ ক্ষীণ হয়ে আসছে।

কিছু দূরে দেখা গেল কাঁধে জলভরা দ্রোণ বসিয়ে নদী থেকে বনের পথ ধরে আশ্রমে ফিরছে বাক্।

বিস্মিত তুর্বসু চাপা গলায় বলল, পরজ শুনে যাবে একবার?

বাক্ মাথা ঘুরিয়ে তাকাল। মৃদু হেসে ইশারায় জানাল, আশ্রমে অনেক কাজ, কিছু পরেই সে আসবে।

বাক্ চলে গলে তুর্বসু সামনের গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। ওই তো সেই কিংশুক বৃক্ষটি যার একটি ছিন্ন বাঁকা ডাল ফুলসমেত এসে পড়েছে তার পায়ের কাছে।

তীরখানা তুলে নিয়ে দেখল, পক্ষযুক্ত অর্ধচন্দ্রাকৃতি অতি তীক্ষ্ণ বাণ। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল গত রাতের কথা। বাক্ বলেছিল, সে-ও তার শর-সন্ধানের পরীক্ষা দেবে। এ কি বাকেরই বিস্ময়কর কীর্তি, না অন্য কেউ? কিন্তু বাক্ তো দ্রোণে জল ভরে নিয়ে চলে গেল। তার হাতে ধনু কিংবা শর ছিল না। তবে এ কার কীর্তি? যদি অপরিচিত কোনও শরসন্ধানীর লক্ষ্য হয় তুর্বসু তাহলে নিশ্চয় তাকে তীরন্দাজ ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা জানাবে না।

তুর্বসুর ভাবনার ভেতর তার পেছনে কখন ত্বরিতপদে এসে দাঁড়িয়েছে বাক্। সে কথা বলে চমকে দিল তুর্বসুকে।

এত ভাবছ কি তুর্বসু? জানি আশ্রম ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্যে মন তোমার ব্যাকুল। ভাবনা নেই, তোমাকে চিরদিন ধরে রাখব না এখানে। আজই রাজপ্রাসাদে যাব মদয়ন্তীর কাছে তোমার শুভযাত্রার ব্যবস্থা

করতে।

একটু থেমে আবার বলল, একি তোমার হাতে দেখছি কিংশুক ফুলের ডাল! কে ওই ফুলের প্রদীপ জ্বেলে তোমাকে আরতি করে গেল?

জানি না পরজ! বসেছিলাম এখানে, হঠাৎ একটা ফুলের ডাল এসে পড়ল আমার সামনে। আমি অবাক হলাম দেখে যে একটি তীরও গাছের ডালে আটকানো। ডালটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি তীরের শক্তিতে গাছ থেকে ভেঙে ওই তীরের সঙ্গে যুক্ত হয়েই এসে পড়েছে আমার পায়ের কাছে। আর একটু হলে আমার দেহের ওপর আঘাত হানতে পারত।

বাক্ হেসে বলল, না, আঘাত হানত না। যে তোমাকে ফুল দিয়ে বন্দনা করল, সে তোমাকে আঘাত হানার জন্যে তা করেনি। ভালবেসেই রাঙা ফুল উপহার দিয়েছে।

হঠাৎ তুর্বসু বাকের দুটো হাত ধরে বলল, তোমার ভালবাসার খেলার কাছে আমি হার মানলাম পরজ। কাল তুমি বলেছিলে, তীরের পরীক্ষা দেবে, আজ নিশ্চিতভাবে জানতাম, বহু ধুরন্ধর তীরন্দাজকেই তুমি হার মানাতে পার।

তবে আমাকে উপেক্ষা করে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইছ না কেন?

আমি জানি পরজ, এই মুহূর্তে ডাক দিলে তুমি নিজেই যেতে চাইবে না আমার সঙ্গে।

কী করে জানলে?

তুর্বসু বলল, ভালবাসা তোমার হৃদয়ে যতখানি গভীর, সেবার আগ্রহ তার চেয়ে একটুও কম নয়। একই হৃদয় থেকে ঝরছে তোমার প্রেম আর সেবার অমৃত। তাই বলছিলাম, অন্ধ একটি মানুষকে ছেড়ে যাওয়া তোমার পক্ষে সম্ভব নয়।

বাক্ তুর্বসুর ধরে থাকা হাত দুখানা তুলে ঢেকে ফেলল নিজের দুটো চোখ। তার গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল অশ্রু। তুর্বসু নিষ্পলক চোখে চেয়ে রইল বাকের মুখের দিকে।

রাতে ঋষি দেববাতকে শয্যায় শুইয়ে দিয়ে অরণ্য কুটিরে তুর্বসুর কাছে এল বাক্। সারা অপরাহ্ন আর সন্ধ্যা বাকের জন্য উদ্‌গ্রীব আগ্রহে প্রতীক্ষা করে আছে তুর্বসু। দ্রুহ্যবরাজ কশুর প্রাসাদে গেছে বাক্। মদয়ন্তীর মুখ থেকে জেনে আসবে পণিদেশে যাবার পথ-সংবাদ।

বাক্ এল একটি আলোক-বর্তিকা হাতে নিয়ে। অন্ধকার বনপথ। চাঁদ উঠতে বিলম্ব আছে। তুর্বসু দেখছে বাকের মুখ। আলোয় উদ্ভাসিত মুখে অনার্যকন্যার তাম্রাভ কান্তি। পথের ওপর প্রসারিত দুটি চোখে আঁকা হয়ে আছে যুগ-যুগান্তের অন্বেষণ। বঙ্কিম অধর ওষ্ঠ যেন তৃষ্ণার্ত পুরুষের কাছে পিপাসার আমন্ত্রণ।

আলোক-বর্তিকাটি নামিয়ে রেখে বাক্ বলল, প্রাসাদে যাওয়ার আগে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। তুমি নদীতীরে গিয়েছিলে পরিভ্রমণে। আমি তোমার রাতের খাবার রেখে গিয়েছিলাম, খেয়েছ তো?

তুর্বসু বলল, তোমার প্রতীক্ষায় থেকে খাবার কথা একেবারে ভুলে গেছি।

বাক্ ঘরের ভেতর থেকে সাজানো খাবারের পাত্র এনে আসন পেতে ডাক দিল তুর্বসুকে, অনেক রাত হয়েছে, এস খেয়ে নাও।

তুর্বসু আসনে বসে বলল, তুমি খাবে না?

আমাকে মদয়ন্তী না খাইয়ে কখনও ছাড়ে না, তাই তো তোমার আব পিতার খাবার সাজিয়ে রেখে গিয়েছিলাম। আমি তোমার পাশে আজ বসছি, তুমি খেয়ে নাও তুর্বসু। অনেক রাত হল।

তর্বুসু আহার শুরু করল। পাশে বসে কথা বলে চলল বাক্।

আজ সত্যিই মনে হচ্ছে তুমি আমার অতিথি।

এতদিন পরে আবার এই অভ্যর্থনা কেন পরজ?

বাক্ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তুমি তো চিরদিনের হয়ে আসনি তুর্বসু, দুদিনের জন্যে এসেছ, আবার চলে

যাবে, তাই তুমি অতিথি। এখন থেকে ভাবব, এক অতিথি এসেছিল আমাদের আশ্রমে, দুদিনের আতিথ্য নিয়ে চলে গেছে।

তুর্বসু একথার কোনও উত্তর দিতে পারল না।

বাক্ আবার বলল, তোমার চলে যাবার সময় আর বাধা দিতে চাই না তুর্বসু। তুমি অনুদ্বিগ্ন মন নিয়ে যাত্রা কর পণিদের দেশে।

তুর্বসু বলল, সখী মদয়ন্তীর কাছ থেকে সন্ধান এনেছ তুমি। ইচ্ছে করলে আমাকে সে সন্ধান-সূত্রটি তুমি নাও দিতে পার। আর যতকাল তোমার চিত্ত আমার প্রতি অপ্রসন্ন না হয় ততকাল আমি এ আশ্রমের এই অরণ্যকুটিরে থেকে যেতে পারি। আজ এই মুহূর্তে এ আমার অন্তরের কথা পরজ।

হাসল বাক্। বলল, তুমি কি মনে কর, বাক্ তোমার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পথে বাধা হবে? কখনো নয় তুর্বসু। ভালবাসাকে দুহাতের মুঠোয় ভরে রাখা যায় না। সে আলোর পাখি। মাটিতে নেমে আসা, আকাশে উড়ে চলা, সবই তার ইচ্ছাধীন।

একটু থেমে বলল, এখন তোমার জানবার কথাটুকু বলি শোন। দ্রুহ্যবদের দেশের সীমানা পার হলেই দেখতে পাবে এক শৈলশিরা পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে চলে গেছে। ওই পর্বতের পাদদেশ অরণ্যে নিবিড়। তোমাকে পার হয়ে যেতে হবে ওই অরণ্য-সমাচ্ছন্ন পর্বত। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে দুর্ভেদ্য ওই অরণ্যভূমি, দুর্লঙ্ঘ্য ওই পর্বত। কিন্তু পশ্চিমে পাহাড়ের পাশে পাশে এক যোজন পথ অতিক্রম করলেই দেখতে পাবে বনের মাথায় জেগে আছে ত্রিকোণাকৃতি এক শিলাখণ্ড। তার দেহ নীলাভ ধূসর। কোন উদ্ভিদ বা কূটজ কুসুম তার দেহকে আচ্ছন্ন করেনি। কাছে গেলে বোঝা যাবে ওখানে পর্বতের ভেতর পথের চিহ্ন। ওই পথের মুখও অরণ্য সমাচ্ছন্ন। সহজে বোঝা যাবে না যে ওখানে বিদীর্ণ করে একটি গিরিপথের সৃষ্টি হয়েছে। ওই পথের একদিকের পর্বতদেহে গিরিপথের সন্ধানচিহ্ন রূপে জেগে আছে ওই মসৃণ শিলাস্তূপটি। ওখানে গেলে মনে হবে এককালে ওই গিরিপথে নদী খাত ছিল। কোন সময়ে ওই নদী শুকিয়ে যায়। এখন পথের দুদিকে শুধু নুড়ির সঞ্চয়। পর্বত পার হতে কিছু সময় লাগবে। গিরিপথে ভোরবেলা প্রবেশ করতে পারলেই ভাল হয়। সূর্যের শান্ত কিরণে পাখির গান শুনতে শুনতে ওটুকু পথ পার হয়ে যাওয়া একটা স্মরণীয় স্মৃতি হয়ে থাকবে পরবর্তী জীবনে।

এরপর পর্বতের ওপারে দেখা যাবে একটি নদী। তারই একটি শাখা হয়তো কোনওকালে প্রবাহিত হয়েছিল এই গিরিপথে। এখন নদী সরে গেছে দূরে। প্রবাহের খাতও পরিবর্তিত হয়ে গেছে। ওই খরস্রোতা পশ্চিমবাহিনী নদীর নাম রসা। পাহাড়ের পর পাহাড়। তারই ভেতর দিয়ে চলেছে নদী। প্রবল বেগ তার। পাহাড়ি পথে উঁচু থেকে নিচুর দিকে তাকালে মনে হবে নদীর স্থানে ধূম্রজালের সৃষ্টি হচ্ছে। স্রোত যেখানে শিলাস্তূপে বাধা পাচ্ছে সেখানেই সাদা ফেন-পুঞ্জ আর ধূম্রজালের সৃষ্টি হচ্ছে। দর্শনীয় এক নদী। যেমন ভয়ঙ্কর তেমনি সুন্দর। ওই নদীর তীর ধরে উৎসমুখের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। উত্তর-পূর্বদিকে নদীর উৎপত্তি স্থান।

কয়েক দিনের যাত্রায় অনেকগুলি পাহাড় ডিঙিয়ে যেতে হবে। শুধু লক্ষ্য রাখতে হবে একটি পাহাড়ের দিকে। সে পাহাড়টি বড় বিচিত্র। বহু বর্ণের প্রলেপ তার দেহে। একটি প্রাসাদের মতো নীচের নদী থেকে উঠে এসেছে সেই পাহাড়। মনে হবে, কোন রাজার বিপুল ঐশ্বর্য রয়েছে তার ভেতর।

সেই চিত্রিত পাহাড় পেরিয়ে এসেই পাওয়া যাবে নদীর ওপর একটি সেতু। এখানে নদীর ঠিক মাঝ-বরাবর জেগে আছে বিশাল আকারের এক শিলাস্তূপ। স্রোত ওই শিলায় প্রতিহত হয়ে দুদিকে প্রবল বিক্রমে ঘুরে গিয়ে আবার এক হয়ে খরবেগে বয়ে চলে গেছে। যেখানে স্রোত এসে শিলাস্তূপে প্রথম ধাক্কা দিচ্ছে সেখানে অনেক উঁচু পর্যন্ত সৃষ্টি হয়েছে কুয়াশার আবরণ। সূর্যের আলো পড়লে সেখানে সাত রঙের একটা সেতু তৈরি হয়। ওই কুয়াশার আবরণের পরেই পাওয়া যাবে আসল সেতুর হদিস। অনেকগুলি পাহাড়ি গাছের জটলার মাঝে পড়ে আছে পাশাপাশি তিনখানি বিশাল বৃক্ষের কাণ্ড। সেই কাণ্ডগুলি জোড়া দেওয়া হয়েছে নিপুণ তক্ষাদের দ্বারা। মসৃণ করে বানান হয়েছে পারাপারের পথ। ওই সেতুপথেই প্রথম প্রবেশ

করতে হবে পণিদের দেশে। সেতু পার হলেই নদী-তীরের বন। বন পেরিয়ে দেখা যাবে সাতটি পাহাড় যেন গোল হয়ে ঋষিদের মত যজ্ঞবেদি ঘিরে বসে আছে। ওই পাহাড়ের দেহে হেতির ফলকের মত ঋজুকাণ্ড বিশিষ্ট বৃক্ষের সারি। স্থানটি যেমন মনোরম তেমনি সবুজ। ওখানে সেতুর সোজাসুজি যে পাহাড়টি দেখা যাবে তার পাশ দিয়ে ভেতরে ঢোকার পথটি খুঁজতে গেলেই ঠকতে হবে। পাহাড়ের গায়ে পথের চিহ্নও বর্তমান। কিন্তু ওই পথে কিছু দূর এগিয়ে গেলেই পরিশ্রম সার হবে। ভয়ঙ্কর বেগে একটা ঝর্ণাকে পাহাড়ের ভেতরে অজগরের মত এঁকে বেঁকে ঝরে পড়তে দেখা যাবে। ওই ভয়ঙ্কর ঝর্ণাটির পাশে এসেই পথ যাবে ফুরিয়ে। পারাপারও অসম্ভব।

যেতে হবে ডানদিকে তিনখানা পাহাড় ছেড়ে চতুর্থ পাহাড়টির কাছে। পাহাড়গুলো দাঁড়িয়ে আছে বৃত্ত রচনা করে। সুতরাং ঘুরে যেতে হবে অনেকখানি। চতুর্থ পাহাড়ের গায়ে কোনও পথচিহ্ন নেই। ভেকের আকৃতি বিশিষ্ট একটি প্রস্তরখণ্ড খুঁজে নিতে হবে। এ প্রস্তরখণ্ডের নীচ দিয়েই প্রশস্ত সুড়ঙ্গ পথ। ওই অন্ধকার পথে প্রবেশ করে সামনের দিকে তাকালে দেখা যাবে গোলাকার আলোকিত নিষ্ক্রমণের পথ। ওই পথ পার হলেই চোখে পড়বে অলৌকিক দৃশ্য। সমতল চারণভূমি। সবুজ তৃণ ও বৃক্ষগুল্মে ভরা। মাঝে মাঝে পাহাড় থেকে নেমে এসেছে ঝর্ণা। সেই ঝর্ণাগুলি গিয়ে পড়েছে একটি নীলকান্ত মণির মতো নীল হ্রদে। উপত্যকার মাঝখানে সেই হ্রদের বুকে আকাশের মেঘ ছায়া ফেলে। জলচর পাখিরা সাঁতার কেটে বেড়ায় সারাদিন। পাহাড়ের কোলে কোলে, হ্রদের তীরে তীরে পণিদের আস্তানা। ওই সবুজ উপত্যকা-ভূমিতে দেখা যাবে সহস্র সহস্র ধেনু বিচরণ করে বেড়াচ্ছে। পাহাড়ের গায়ে বহুসংখ্যক কাঠের আচ্ছাদন। তারি তলায় ধেনুদের থাকবার ব্রজ। পশ্চিমের পাহাড়ে যে সুদৃঢ় হর্ম্যটি পূর্বদিকে মুখ করে রয়েছে সেখানে বাস করেন পণিদের রাজা। রাজা হলেও তিনি ব্যবসায়ী। শিশির ঋতুতে সুবাস্তু জনপদের দিকে আসেন, তারপর বসন্ত সমাগমে একবার পক্ষকালের জন্য সঙ্গীদের নিয়ে ফিরে যান সপ্তশৈল ঘেরা নিজের রাজ্যে। তারপর আদীন নদীর উৎসমুখ পেরিয়ে চলে যান দক্ষিণ পশ্চিমের দেশগুলিতে। সেখানে অনার্যদের দেশে ওদের ব্যবসা নাকি সবচেয়ে ভাল চলে! ঘৃত, ছানা, দধি প্রভৃতি খাদ্যবস্তুর বিনিময়ে পায় প্রচুর স্বর্ণপিণ্ড আর গজদন্ত। কোনও কোনও অঞ্চল থেকে পায় সুগন্ধী চন্দনকাঠ। আর্য রাজাদের প্রাসাদে ওই বস্তুগুলির প্রভূত চাহিদা। ওরা চার মাস কাল দক্ষিণে কাটায় ওদের ব্যবসায়ের প্রয়োজনে। শরৎ ঋতুতে আবার পণিদের রাজা সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে ফিরে আসেন নিজেদের দেশে।

থামল বাক্। ইতিমধ্যে খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল তুর্বসুর। সে আচমন করে এসে বসল বাকের পাশে। বলল, কোন শুভক্ষণে আমি সুবাস্তু নগরী ছেড়ে এই দ্রুহ্যব রাজ্যের অরণ্যে এসেছিলাম তা জানি না, তবে আমার এ যাত্রা যে সফল হবে তার সব কটি লক্ষণই দেখা যাচ্ছে।

বাক্ এবার বলল, আমি জানি না ওই দুর্গম এলাকা থেকে তুমি কী করে তোমার ধেনু উদ্ধার করবে। তবে আমার মনে হচ্ছে তুমি এখানে তোমার মূল্যবান কয়েকটি দিন কাটিয়ে ভালই করলে।

তুর্বসু বলল, তুমি ঠিকই বলেছ পরজ। পক্ষকাল পার হতে যায়। এখন পণিরা দেশ থেকে বেরিয়ে যাবে দক্ষিণে। শুধু নারীরাই থাকবে সেখানে। সুতরাং আমার পক্ষে হয়তো সেখানে কিছু করা সম্ভব হবে।

বাক্ বলল হ্যাঁ, আমি সেরকম একটা কিছু ভেবেই কথাটা বলেছি। তবে সেই সঙ্গে তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি একটা বিষয়ে। পণিদের পুরুষেরা ব্যবসার ব্যাপারে ওস্তাদ হলেও অস্ত্র ধরার ব্যাপারে একেবারে আনাড়ি। তার ঠিক উল্টোটি হল পণিদের অঙ্গনারা। তারা রণবিদ্যায় অত্যন্ত কুশলী। তবে একথা ঠিক, অদাতা হীনমনা, অর্থপিশাচ পণিপুরুষদের চেয়ে মেয়েরা অনেক বেশি উদার স্বভাবের। মদয়ন্তী আমাকে এ খবর দিয়েছে।

তর্বুসু বলল, এর চেয়ে বেশি কোনও সংবাদ আমি আশা করতে পারি না পরজ।

বাক্ বলল, শুধু অনুরোধ আর দু'চারটি দিন থেকে যাও এই অরণ্য কুটিরে। পণিদের দেশত্যাগের সময়টাকে নিশ্চিতভাবে পার করে তবে যাও।

এই কটি দিনের অবস্থান আমার কাছে মধুপানের মতো স্বাদু হয়ে উঠবে পরজ।

কিছুক্ষণ নীরবে বসে রইল বাক্। কম্পিত দীপালোকে বাকের ললাটে চিন্তার একটা কুঞ্চন দেখা গেল। সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘশ্বাস পড়ল বুকের গভীর গহ্বর থেকে।

তুর্বসু বাকের একখানা হাত নিজের হাতের ভেতর নিয়ে বলল, চলে যাবার দিন আমাকে প্রসন্ন মনে বিদায় দেবে না পরজ?

বাক্ বলল, তোমার বিদায়ের জন্যে আমার মনকে প্রস্তুত করে নিয়েছি তুর্বসু। দুঃখ যত গভীরই হোক, তাকে সইতে হবে নীরবে। আজ আমার দুঃখ কিন্তু নিজেকে নিয়ে নয়। আমি নিজের দুঃখকে কখনও বড় করে দেখি না।

তবে?

সখী মদয়ন্তীর জন্যে সমস্ত মন আমার উদ্বিগ্ন।

কি হয়েছে তাঁর পরজ?

ভালবাসতে গিয়ে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে।

সে কী!

এক ঋষিপুত্র তার ভালবাসার পাত্র।

তুর্বসু বলল, ক্ষত্রিয় রাজকন্যাদের ভেতর অধিকাংশেরই তো ঋষি কুমারদের সঙ্গে বিয়ে হয়। তাঁর বাধা কোথায়?

দ্রুহ্যবরাজ কশু মেয়ের জন্যে স্বয়ম্বরের আয়োজন করেছেন। 'আজি' উৎসব হবে ঠিক এক সপ্তাহ পরে। তুমি জান, এ উৎসবে যুবকরা নামবে রথের প্রতিযোগিতায়। রাজা স্থির করেছেন, এই 'আজি' উৎসবে রথের প্রতিযোগিতায় যে যুবক বিজয়ী হবে তাকে পতিরূপে বরণ করবে মদয়ন্তী।

তুর্বসু বলল, ঋষিকুমারটি কি রথ চালনায় অক্ষম?

না কথাটা তা নয়। মদয়ন্তীর প্রেমিক অন্যান্য ঋষিপুত্রের মতো রথচালনা করে থাকে। কিন্তু অন্য একজন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী তার রয়েছে। মদয়ন্তীর দুশ্চরিত্র ভায়ের পার্শ্বচর। সে অসি ও রথ চালনায় সমান দক্ষ। মদয়ন্তীকে লাভ করার জন্য সে প্রায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছে।

তুর্বসু বলল, আমাদের 'আজি' উৎসবে প্রধান প্রতিযোগী একজন করে সহযোগী গ্রহণ করে, এখানে কি সে নিয়ম রয়েছে?

হ্যাঁ, একই নিয়ম! বহু দূর পাড়ি দিতে হবে এ উৎসবে। তাই প্রত্যেকেই এক একজন করে মনোনীত সহযোগী সঙ্গে নেয়। মাঝে মাঝে তারা রথ চালনায় প্রধান প্রতিযোগীকে সাহায্যও করতে পারে। এ তো সব জায়গাতেই স্বীকৃত নিয়ম।

তুর্বসু বলল, তোমার বান্ধবীর মনোনীত প্রার্থীটি কি আমাকে তাঁর সহযোগী হিসেবে গ্রহণ করতে রাজি হবেন?

বাকের কণ্ঠে বিস্ময়, তুমি কি রথের প্রতিযোগিতাতেও দক্ষ?

তা বলতে পারি না বাক্। মদয়ন্তীর ভ্রাতৃবন্ধুর শক্তি সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। তবে এটুকু বলতে পারি তোমার বান্ধবীর প্রেমিকটি আমার সাহায্য নিলে সাধারণ সহযোগীর চেয়ে কিছু বেশি উপকৃত হতে পারেন।

বাক্ হঠাৎ তুর্বসুর হাতখানা টেনে নিয়ে তাতে চুম্বন করে বলল, তোমার এই হাত অসাধারণ হোক।

তোমার এই প্রার্থনার যথার্থ যোগ্য যেন হতে পারে আমার দুটি বাহু। কিন্তু দ্রুহ্যবদের কাছে আমি কি অপরিচিত নই? তারা যদি আমাকে সন্দেহের চোখে দেখে প্রশ্ন করে?

তুমি আর্য তুর্বসু। আকার, বর্ণ তোমার ওদের থেকে আলাদা নয়। তাছাড়া প্রতিযোগীদের নিয়েই সবাই ব্যস্ত থাকে, সাহায্যকারীদের দিকে ফিরেও তাকায় না। অগণিত দ্রুহ্যবদের ভেতর তুমিও সাধারণ একজন।

বেশ, তোমার বান্ধবী আর তাঁর প্রেমিকটি রাজি থাকলে আমি তাঁদের সাহায্য করতে প্রস্তুত।

বাক্ বলল, সূচনা শুভ। ওই দেখ অরণ্যের আড়ালে চন্দ্রোদয় হয়েছে। শাখাপল্লবের বাধা থেকে চাঁদ ওপরের আকাশে মাথা তুলে উঠেছে উজ্জ্বল মহিমায়।

দুন্দুভি বেজে উঠল। যেন একটা যুদ্ধযাত্রার আয়োজন। খদিরকাষ্ঠ নির্মিত রথগুলির অঙ্গসজ্জা দর্শনীয়। কাঠের ওপর সোনার কারুকার্য। গোচর্মের আচ্ছাদনে রথখানি ঢাকা। রথের শীর্ষে উড়ছে পতাকা। বেগবান অশ্ব যাত্রার জন্য উৎসুক হয়ে উত্তেজনায় পা ঠুকছে।

প্রতিযোগীরা প্রস্তুত। রাজপ্রাসাদের সামনে বিশাল প্রান্তর। এই প্রান্তর দিয়েই সব ক'টি রথ প্রায় দু'যোজন পথ অতিক্রম করবে। তারপর আদীন নদীর পাথর বাঁধানো সংকীর্ণ পথ ধরে সারি দিয়ে চলবে রথ। সেখানে অগ্রবর্তী রথকে অতিক্রম করে যেতে পারবে না পশ্চাতের রথ। আবার সুযোগ আসবে স্থান নির্ণয়ের। আদীন নদীর সংকীর্ণ এক যোজন পথ অতিক্রমের পর প্রতিযোগীরা ডানদিকে পাবে আবার একটি উন্মুক্ত প্রান্তর। সেখানে রাজ-পরিদর্শকের সামনে তিনবার প্রান্তর প্রদক্ষিণ করতে হবে। ওই প্রান্তরে প্রতিযোগীদের ভাগ্য নতুন করে পরিবর্তিত হতে পারে। আবার ফিরতে হবে আদীন নদী তীরে। তারপর রাজপ্রাসাদের সামনে শেষ ভাগ্য পরিবর্তনের সুযোগ।

তৃতীয়বার দুন্দুভি নিনাদের সঙ্গে সঙ্গে রাজপ্রাসাদের সামনের প্রান্তরে যেন এক ঝড় বয়ে গেল। রাজকুমারী মদয়ন্তী, সপারিষদ রাজা কশু আর অগণিত দ্রুহ্যবদের চোখগুলি উড়ন্ত ভ্রমরের মত বার বার আছড়ে পড়তে লাগল ধাবমান রথের পশ্চাদভাগে।

সর্বাগ্রে চলেছে যুবরাজের বন্ধু ভৌবনের রথ। চতুর্থ স্থানে চলেছে রাজকুমারীর প্রেমিক ঋষিপুত্র দেবলের রথখানা। ব্যথায় ভেঙে পড়তে চাইছে মদয়ন্তীর বুক। সে শুধু মনে মনে আবৃত্তি করে চলেছে বিজয়ী ইন্দ্রের জয়সূচক সূক্তগুলি। ধীরে ধীরে রথ দৃষ্টির বাইরে চলে যাচ্ছে। মদয়ন্তী ঝাপসা হয়ে আসা চোখদুটি মুছে ফেলে সামনের দিকে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করল। এখন সব রথই একাকার হয়ে গেছে। কিন্তু মনে হল কোনও কোনও রথ যেন তাদের সামনের রথকে অতিক্রম করে যাচ্ছে।

আদীন নদীর তীর ধরে এখন ছুটে চলেছে রথ। সত্যি ভৌবন অসাধারণ দক্ষতায় সকলের আগে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে তার রথখানা। ঠিক তার অনুগমন করছে ঋষিকুমার দেবলের রথ। প্রতিযোগিতার প্রারম্ভে দেবলের হাতে ছিল বল্গা। প্রান্তরের মাঝামাঝি এসে বল্গা হাতে তুলে নেয় তুর্বসু। সে বথখানা এগিয়ে নিয়ে যায় দ্বিতীয় স্থানে। সঙ্গে সঙ্গে প্রায় শুরু হয়ে যায় আদীন নদীর পথ। এ পথ তুর্বসুর কাছে পরিচিত নয়। তাই প্রান্তরের শেষ আর নদীর শুরু কোথায় তা অনুমান করা সম্ভব হয়নি তার পক্ষে।

এখন দেবল বল্গা ধরে রথ চালিয়ে নিয়ে চলেছে। এ পথ দ্রুত রথ চালনার পক্ষে উপযুক্ত নয়। তাই সাবধানে সারি দিয়ে চলেছে প্রতিটি রথ। কিছুক্ষণের ভেতরেই এসে গেল সেই প্রান্তর। যেদিকে রাজ-পরিদর্শকেরা রয়েছে সেদিকে রথের মুখ ফেরার সঙ্গে সঙ্গে দেবলের হাতে চলে যায় বল্গা। আবার পশ্চাৎ ফিরলেই তুর্বসুর শক্ত হাতে বল্গাটি চলে আসে।

এবারও প্রথম প্রত্যাবর্তনের পথ ধরল ভৌবনের রথ। কয়েক অঙ্গুলি পরিমিত স্থানের জন্য দেবলের রথ থেকে গেল দ্বিতীয় স্থানে। এখন তুর্বসু অশ্বচালনার দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। সে শুধু চুপি চুপি দেবলকে বলল, রাজগৃহের সামনে যে দু যোজন প্রান্তর রয়েছে, তার তিনভাগ আমি অতিক্রম করব। বাকিটুকু আপনার চালনায় সমাপ্ত হবে। সেটুকু পথ অতিক্রমের জন্য এখন থেকে মনে মনে শক্তি সঞ্চয় করুন।

রথ চলেছে। আকাশে ভাঙা ভাঙা মেঘের গর্জনের মতো শব্দ উঠছে প্রতিযোগীদের রথচক্র থেকে। প্রায় সংলগ্ন দুটি রথ। অন্য প্রতিযোগীরা পড়ে আছে অনেক পশ্চাতে। আদীন নদীর তীরে সেই অরণ্য। তুর্বসু বন পার হবার সময় একটি মালা এসে পড়ল তার কোলের ওপর। সে মৃদু হেসে তাকাল, কিন্তু

কাউকে দেখা গেল না। সে বুঝল নিক্ষেপকারিণী সরে গেছে বনেব আড়ালে।

আবার শুরু হল প্রান্তর। একী! দেবলের রথখানা যেন পক্ষযুক্ত হয়ে গেছে। তার রথের চক্রনেমীগুলি যেন একেবারেই অদৃশ্য হয়ে গেল। বিদ্যুৎঝলকের মতো ভৌবনের রথকে অতিক্রম করে রাজপ্রাসাদের অভিমুখে তার রথখানাকে উড়িয়ে নিয়ে চলল তুর্বসু। পেছন থেকে একবার শুধু কানে এল ভৌবনের ঘন ঘন সঞ্চালিত হাতের কশাঘাতধ্বনি।

ক্রমেই ভৌবনের রথ পেছনে পড়ে যাচ্ছে। সামনে বহুদূরে দ্রুহ্যব রাজপ্রাসাদের ছবিটা ফুটে উঠেছে। একটা স্তূপের আভাস মাত্র। পেছনের রথ তখন সব মিলিয়ে বন্যবরাহের আকার ধারণ করেছে। তুর্বসুর চোখে এখন আন্দোলিত হচ্ছে রাজপ্রাসাদের ধ্বজা। ক্ষুদ্র চারাগাছের ডালের ম'তো প্রাসাদ সংলগ্ন জনতার উত্তেজিত বাহু উর্ধ্বে উত্তোলিত হয়ে আছে। তাদের কণ্ঠস্বর এখনও কানে পৌঁছ‍্ছে না।

তুর্বসু বলল, ভৌবনের রথের আকার এখন কিরূপ?

দেবল পেছনে তাকিয়ে বলল, একটি ধূসরবর্ণ মেঘের আকৃতি।

তুর্বসু দেবলের হাতে বল্গা তুলে দিয়ে বলল, সংগ্রামে পুরুষকার থাকে দীর্ঘ অংশ জুড়ে, কিন্তু একেবারে শেষ অংশটুকু থাকে অদৃশ্য ভাগ্যের হাতে। এখন রথচালনা করে দেখুন ভাগ্যের হাতের পুরস্কারটুকু আপনি লাভ করতে পারেন কিনা।

দেবল মদয়ন্তীর মুখখানা মনে করে তার রথ চালিয়ে চলল।

এখন দুদিকেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে ছবি। প্রাসাদের উদ্বেলিত জনতার আকাশ বিদীর্ণ করা চিৎকার ভেসে আসছে কানে। রাজা কশুর স্বর্ণমুকুটে সূর্যালোক ঝলসে উঠছে। ওদিকে পেছন থেকে এগিয়ে আসছে ভৌবনের রথ। তার আকার এখন একটি ক্ষুদ্রাকৃতি হস্তীর মতো দেখা যাচ্ছে। ভৌবন নিরন্তর কশাঘাতে জর্জরিত করে তুলছে তার অশ্ব। সে এগিয়ে আসছে। দেবলের রথকে অতিক্রম করার জন্য যেন মরণপণ সংগ্রাম চালিয়েছে সে।

দেবলের রথ প্রবল জয়ধ্বনির ভেতর স্পর্শ করল চিহ্নিত সীমারেখা। আর ঠিক সেই মুহূর্তে বিকটা হ্রেষাধ্বনি তুলে শূন্যে লাফিয়ে উঠল ভৌবনের অশ্ব। তারপর রথসমেত ভেঙে পড়ল পাথরের প্রান্তরে। ভূলুণ্ঠিত ভৌবন হতাশ চোখে চেয়ে রইল বিজয়ী দেবলের রথের দিকে।

শেষ রাতে চাঁদের আলোয় দেখা গেল বনপ্রান্তে নদীর তীরে তুর্বসুর বুকে মাথা রেখে অর্ধশায়িত অসহায় বসে রয়েছে বাক্। নিদ্রাহীন নিশিযাপন করছে দুজনে আসন্ন বিচ্ছেদের বেদনায়।

একসময় যখন রাত্রি শেষের বাতাস বয়ে এল নদীর শীতল জল ছুঁয়ে তখন তুর্বসুর বুকের ওপর থেকে মাথা তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল বাক্।

বলল, একটু অপেক্ষা কর তুর্বসু, আমি আসছি।

বনের ভেতর ঢুকে গেল বাক্। তুর্বসু বসে বসে ভাবতে লাগল তার দ্রুহ্যব দেশের সংক্ষিপ্ত দিনগুলির কথা।

বন থেকে আবার নদীতীরে ফিরে এল বাক্। বলল, আমার সামনে এসে দাঁড়াও তুর্বসু।

তুর্বসু কাছে এলে বাক্ তার হাতে একটি স্বর্ণনির্মিত কণ্ঠাভরণ দিয়ে বলল, এই নিষ্কটি কাছে রেখে দাও। এটি মদয়ন্তী তোমাকে দেওয়ার জন্যে তার বিশ্বস্ত পরিচারিকার হাতে পাঠিয়ে দিয়েছে। প্রয়োজন হলে এই নিষ্ক তোমার অশেষ উপকারে লাগতে পারে। এই নিষ্ক, পণিদের রাজার তরুণী পুত্রবধূ বীরা মদয়ন্তীকে পণিরাজ্য ছেড়ে চলে আসার সময় স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ দিয়েছিল।

এরপর বাক্ একটি কাণ্ড করে বসল। সে বলল, তুর্বসু, আমার অনুরোধ, তুমি দুটি চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাক। আমি না বলা পর্যন্ত তুমি চোখ মেলে তাকাবে না আমার দিকে।

তুর্বসু তাই করল। চোখ বন্ধ করে বলল, বিচ্ছেদের সময় ঘনিয়ে এসেছে, তাই বলে আমাকে এমনি করে নদীতীরে একা ফেলে রেখে চলে যেও না যেন।

বাক্ বলল, তুমি আমার পরম ধন। জীবনে আমি অনেক কিছুই পেয়েছি, কিন্তু আমার সবচেয়ে বড় পাওয়া তুমি। নিশ্চিন্ত থেকো, তোমার কাছ থেকে কোনদিনই আমি সরে যাব না।

বাক্ সহসা তার উর্ধ্ব অঙ্গের পশমী পোশাকখানা উন্মোচিত করে ফেলল। একটি তীক্ষ্ণাগ্র কণ্টকে বিদ্ধ করল তার বক্ষ। অমনি বুকের ওপর ফুটে উঠল রক্তকলি। সে বাম হস্তের অনামিকা ভরে মেখে নিল সে রক্ত। তারপর সেই রক্তের বিন্দু এঁকে দিল তুর্বসুর অনাবৃত বুকে।

নিজের শিথিল দেহবসন সংযত করে নিয়ে বাক্ বলল, এবার তাকাও তুর্বসু। দেখ তোমার পরজ তোমাকে ছেড়ে কোথাও চলে যায়নি।

তুর্বসু প্রথমে তাকাল তার বুকের দিকে। সেখানে রক্ত চিহ্ন আঁকা। এবার সে তার পূর্ণদৃষ্টি ফেলল বাকের মুখের ওপর। বাক্ তার দিকেই নিষ্পলক চেয়ে আছে।

এ রক্ত আমার বুকে কোথা থেকে এল পরজ?

আমার বুকের গভীর উৎস থেকে।

তুমি তোমার বুক বিদীর্ণ করে দিলে পরজ। আমি তার বদলে কি দিলাম তোমাকে?

আমি তোমাদের আর্যদের ভাষায় দস্যু-কন্যা তুর্বসু। বুকের রক্ত দিয়ে হৃদয় কেড়ে নিতে জানি।

এ হৃদয় তোমার কথা চিরদিন স্মরণ করবে পরজ।

তা হলেই আমি তোমার ভেতর বেঁচে থাকব তুর্বসু।

পঞ্চম দিনে যখন সেতু পার হয়ে পণিদের দেশে ঢুকল তুর্বসু তখন আকাশের পশ্চিম অঙ্গনে ঢলে পড়েছে সূর্য।

ক্লান্ত তুর্বসু ঘোড়াকে নদী থেকে জল পান করাল আর সঙ্গে সঙ্গে নিজেও অঞ্জলি ভরে পান করল। তারপর অরণ্য পার হয়ে সপ্তশৈলের কাছে এসে পৌঁছল। এবার ডানদিকে যাত্রা। পাহাড়ের গা ঘেঁষে ছুটে চলল অশ্ব। চতুর্থ পাহাড়ের কাছে যখন সে এসে পৌঁছল তখন দিন শেষের সূর্য অস্তাচলের পথে।

তর্বুসু কোথাও মনুষ্যজাতীয় কোন প্রাণীর দেখা পেল না। সে অশ্ব থেকে নেমে তাকে স্বেচ্ছা-বিচরণের সুযোগ দিল। অশ্বটি গ্রাসে গ্রাসে তৃণ ও বৃক্ষপত্র ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগল।

তুর্বসু ঢুকল ভেকের আকৃতি বিশিষ্ট শিলাখণ্ডের তলা দিয়ে গুপ্ত সুড়ঙ্গপথে।

অন্ধকার পথ। একটি পাহাড়কে সোজাসুজি বিদীর্ণ করে গেছে সে পথ। তুর্বসু চলতে গিয়ে দেখল বড় বড় মসৃণ পাথরের ওপর দিয়ে চলেছে তার পা! দূরে বাক্ বর্ণিত গোলাকার বহির্গমনের আলোকিত দ্বারটি দেখা যাচ্ছিল না। পরিবর্তে কয়েকটি ছিদ্রপথ দিয়ে আলোর প্রবেশ চোখে পড়ছিল।

কিছু পরে সুড়ঙ্গপথের শেষে এসে পৌঁছল তুর্বসু। এখন অবস্থাটা কিছু পরিমাণে তার বোধগম্য হল। সত্যিই বর্হিগমনের পথটি গোলাকার। কিন্তু একটি প্রস্তর নির্মিত ছিদ্রযুক্ত কপাট দ্বারা সে পথটি বন্ধ।

তুর্বসু বুঝতে পারল, মদয়ন্তী যখন তাঁর পিতা দ্রুহ্যবরাজ কশুর সঙ্গে এখানে এসেছিলেন, তখন ওই প্রস্তর নির্মিত দ্বারটি উন্মুক্ত ছিল। তাই তিনি দূর থেকে আলোকিত বৃত্তাকার বহির্গমনের পথটি দেখেছিলেন। এখন পণিরা দক্ষিণ দেশে চলে যাওয়ায় প্রমীলারা দ্বারটিকে রুদ্ধ করে দিয়েছে।

রুদ্ধদ্বারের ছিদ্রপথ দিয়ে দৃষ্টি ফেলতেই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল তুর্বসু! শেষ-সূর্যের গলিত স্বর্ণ এসে পড়েছে হ্রদের জলে। হংস কারণ্ডবেরা ভেসে বেড়াচ্ছে তার ওপর। কোনও একটি হংস জলের গভীরে। এমনি ডোবা-ভাসার খেলা চলল কতক্ষণ। কেউ ডোবে, কেউ ভাসে। এই খেলায় দেখতে দেখতে যোগ দিল অনেকগুলি হাঁস। সে এক দৃষ্টি-সুখকর দৃশ্য। এরপর শুরু হল জলের ওপর সাঁতারের প্রতিযোগিতা। পাখা ঝাপটাতে ঝাপটাতে উড়ে চলেছে শত শত হাঁস। তাদের দেহটা জলে আর পাখা চলেছে দাঁড়ের মতো হাওয়ার সমুদ্রে। হাঁসের সারি তীব্র গতিতে এগিয়ে চলেছে আর তাদের পেছনে ছিটকে ছড়িয়ে পড়ছে কোটি কোটি জলবিন্দু। শেষসূর্যের সোনার ছোঁয়ায় সে জলকণাগুলি হয়ে গেছে রাশি রাশি স্বর্ণবিন্দু।

চরে বেড়াচ্ছে সুপুষ্ট নানা বর্ণের শত শত ধেনু হ্রদের তীরে সবুজ তৃণভূমিতে। তাদের গলায় বাঁধা হয়ে আছে ধাতুনির্মিত ঘণ্টা। তারা নড়ছে, অমনি বেজে উঠছে শত শত ঘন্টা। সে এক অপূর্ব শ্রুতিসুখকর

ঐকতান। মনে হচ্ছে সপ্তশৈল থেকে ঝরে পড়ছে অগণিত ঝর্ণা। তাদেব নৃত্যের তালে তালে বেজে উঠেছে নুড়ির নূপুর।

নীচের দৃশ্য দেখতে দেখতে তুর্বসুর চোখ গিয়ে পড়ল পাহাড়ের গায়ে সারি সারি কাষ্ঠনির্মিত গৃহের ওপর। গৃহপার্শ্বে ঋজু কাণ্ড বিশিষ্ট সূচল পত্রযুক্ত বৃক্ষের সারি। গৃহগুলি পাহাড়ের ওপরে থাকায় এখনও শেষরৌদ্রের আভায় দৃশ্যমান। তুর্বসুর চোখের ওপর ফুটে উঠল কয়েকটি ছবি। তার মনে হল, এগুলি দেবলোকের চিত্র। এখানে দেবকন্যা, দেববধূ আর দেবশিশুরা বসবাস করে।

বেলাশেষের আলোর ঝর্ণায় গৃহাঙ্গনে বসে স্নান করছে মেয়েরা। দীর্ঘ কেশ প্রপাতের মতো ঝরে পড়ছে। তাকে সংস্কার করছে কর সঞ্চালনে। গ্রীবা ও মুখমণ্ডল বঙ্কিম ভঙ্গি ত স্থাপিত। কোন নারীর উর্ধ্ব অঙ্গ অনাবৃত। স্বর্ণাভ পক্ক বিল্বের মতো দুটি স্তনের একটিতে করস্থাপন করে অন্যটি মুখে ধরে দুগ্ধ পান করছে উলঙ্গ শিশু। কোন নারী অসংকোচে পরিবর্তন করছে পরিচ্ছদ। কোথাও রহস্যালাপ চলেছে। সমবয়স্করা কোথাও বা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে প্রবল আলিঙ্গনের অভিনয় করছে।

তুর্বসুর চোখ সরে সরে যাচ্ছে। নানাবয়সী মেয়েদের মিছিল। হাসিতে, দৃষ্টিতে, ক্রিয়াকলাপে সে যেন এক উৎসব। ছোট ছোট সাতটি পাহাড় ঢালু হয়ে নেমে এসেছে হ্রদের কুল অবধি। প্রতিটি পাহাড়েই পণিদের ঘরগুলি বড় সুন্দর করে সাজানো। অনব, দ্রুহ্যব, যাদ্ব, ভারত প্রভৃতি জনের মানুষদের ঘরবাড়ি এমন সুন্দর নয়। তারা সরস্বতী তীরে সুবাস্তুর প্রায়-সমতল ভূমিতে বাস করে। এলোমেলো বিচ্ছিন্ন তাদের গৃহগুলি। সুপরিকল্পিত ভাবে রচনার কোনও ছাপ নেই। কিন্তু এ যেন কোনও কুশলী স্থপতি ঘেরা পণিরাজ্যটিকে মনের মতো করে সৃষ্টি করেছেন।

তুর্বসু দেখল, যে শৈলটির আড়ালে এখন সূর্য অস্তে নামছে তার কোলে একটি মাত্র প্রাসাদোপম 'দম' বা দারু-গৃহ। সৌধটি পূর্ব দিগন্তের দিকে মুখ করে আছে। ওই সৌধচূড়াটি সুবর্ণ-নির্মিত। শেষসূর্যের তির্যক আলো এসে পড়েছে তার ওপর। একটা অতি কমনীয় জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে তার থেকে। তুর্বসু ভাবল, পণিদের রাজগৃহ ওটি। বাকের ব্যাখ্যা অনুযায়ী পণিদের রাজা বিপুল ধনের অধিকারী অর্থাৎ 'মঘবন' হলেও, নিজ সম্প্রদায়ের বণিকদের সঙ্গে তিনি অশেষ কষ্ট স্বীকার করে বাণিজ্য করতে যান দেশান্তরে। তাঁর একমাত্র পুত্রবধূ বীরা থাকে রাজগৃহে। স্বামী চলে যায় শ্বশুরের সঙ্গে ব্যবসায়ের কাজে। চার চারটি মাস স্বামীসঙ্গ-বঞ্চিতা বীরা কাটায় নিঃসঙ্গ জীবন। তাহলেও এই কটি মাস কর্মহীন নয় সে। তরুণী বীরা এ সময় সমস্ত পণিরমণীর নেত্রী। শুভাশুভের সকল দায়িত্ব তার।

তুর্বসুর মনে হল বীরা বসে আছে বাইরের অঙ্গনে। একটি সখি অথবা পরিচারিকা জাতীয় কেউ তার কেশবিন্যাস করে দিচ্ছে। অস্তসূর্যের আলোয় অন্যান্য পর্বত-সংলগ্ন গৃহগুলি উজ্জ্বল দেখালেও পশ্চিম পর্বতে অবস্থিত রাজগৃহটি আলোছায়ায় মায়াময়। তাই পণিরাজ পিজবনের পুত্রবধূ বীরার ছবিটি স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল না তুর্বসুর চোখের ওপর।

সন্ধ্যা ধীরে ধীরে নেমে এল। তুর্বসু দেখল পাথরের দরজাটি থেকে প্রায় আট-দশ হাত পরিমাণ স্থান একটি নালা কাটা। নালাটা এতখানি চওড়া হলেও গভীরতা কত তা অনুমানে বোঝা গেল না। কারণ নালা দিয়ে একটি জলধারা প্রবাহিত হয়ে চলছিল। তার শব্দটা ভেসে আসছিল কানে।

তুর্বসু সুড়ঙ্গপথে আবার ফিরে চলল। এখন সুড়ঙ্গ নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ভরে উঠেছে। সে অনুমানে সুড়ঙ্গের দেওয়ালে হাতের ছোঁয়া দিতে দিতে বাইরে বেরিয়ে এল।

পাশেই একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়েছিল তুর্বসুর ঘোড়া। তুর্বসু ঘোড়াটিকে এনে দাঁড় করাল সুড়ঙ্গের ভেতর। রাতের বিশ্রাম এখানেই নিতে হবে। বাইরে রাতের বেলা থাকা অসম্ভব। যদিও ঋতু বিচারে গ্রীষ্মকাল, তবুও এত উচ্চস্থানে রাত ভয়ঙ্কর শীতল হয়ে ওঠে।

বাহিরে তখনও সামান্য আলো ছিল। তুর্বসু পাহাড়ি গাছগাছালি থেকে কিছু শুকনো কাঠ সংগ্রহ করে আনল। তার কাছে ছিল দুটি অতি শুষ্ক অরণি। সেই দুটি অরণি ঘর্ষণে জ্বলে উঠল আগুন। তুর্বসু সেই আগুনে দেখে নিল সুড়ঙ্গের পারিপার্শ্বিকটা। আশ্চর্য, প্রবেশের সময় সে লক্ষ করেনি, সুড়ঙ্গের ডানদিকে

রয়েছে একটি গুহা! গুহাটি বেশ পরিষ্কার। বসবাসের উপযোগী। তুর্বসু সঙ্গে সঙ্গে সেই গুহাটিতে আশ্রয় গ্রহণ করল।

উত্তরদেশীয় মেষীর লোমে প্রস্তুত অতি আরামপ্রদ কয়েকখানি গরম বস্ত্র সে ঘোড়ার পিঠে বয়ে এনেছিল। ওই বস্ত্র গায়ে জড়িয়ে নিয়ে সে গুহার মধ্যে শয়ন করল। শ্রান্ত চোখ দুটি তার ঘুমে বন্ধ হয়ে এল।

পরদিন ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে সে গুহার ভেতর উঠে বসল। গত রাতে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামিয়ে রেখেছিল তার প্রয়োজনীয় জিনিসে ভরা 'কোশ'টি। সেটির ভেতর সে তার রাতের গরম বস্ত্রগুলি ভরে রাখল। সঙ্গে সঙ্গে বের করে আনল ঘৃত-ভর্জিত যব বা 'ধানা'র পাত্রটি। তারপর সযত্নে ওই চর্মপেটিকাটি গুহার ভেতর রেখে বাইরে বেরিয়ে এল।

প্রভুভক্ত ঘোড়াটি এখন স্বাধীন। তার খাদ্যের বড় একটা অভাব নেই এ অঞ্চলে। পাহাড়ী ঝর্ণাও ঝরে পড়ছে নিকটে। সেই মনুষ্যেতর প্রাণীটি অতি প্রত্যুষে বেরিয়ে খাদ্যান্বেষণে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

পাহাড়ের বেশ খানিক দূরে নদী-তীরের অরণ্য। নদীর ওপর সেতুপথ থেকে সে অনেকখানি দূরে সরে এসেছে। কারণ সে এখন রয়েছে সেতুর সামনের প্রথম পাহাড়টি ছাড়িয়ে চতুর্থ পাহাড়ের পাদদেশে। যদিও রসা নদী পাহাড়গুলির সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তচাপ রচনা করে ঘুরে এসেছে, তবুও এখন তার সন্নিহিত বন সরে গেছে পাহাড় থেকে খানিক দূরে।

তুর্বসু হেঁটে গেল বনের দিকে। সে সিকি যোজন পথ অতিক্রম করে পৌঁছল বনের ভেতর। সেখানে নদীর জলে আচমন করে উঠে বসল একটি শিলাস্তূপের ওপর। রাতে পথশ্রমে প্রবৃত্তি আসেনি খাবার। এখন ঘৃতভর্জিত যব খেতে লাগল। খেতে খেতে সে দেখল, বনের কয়েকটি বৃক্ষ অতি উচ্চ। ঋজু কাণ্ড বেশ কিছু দূর উঠে গিয়ে শাখাবাহু মেলতে শুরু করেছে। কাণ্ডগুলি আকাশস্পর্শী। পাশে পাশে ডালগুলি সূচীমুখ পত্র নিয়ে বর্শাফলকের মতো বিদ্ধ হয়ে আছে কাণ্ডের সঙ্গে।

সবচেয়ে উঁচু গাছটি ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। আচ্ছা ওই বৃক্ষটির ওপর আরোহণ করলে কেমন হয়। ওখান থেকে পণিদের পাহাড় ঘেরা অঞ্চলটি হয়তো আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে দাঁড়াল। জলযোগ তার শেষ হয়ে গিয়েছিল, সে নদী থেকে আঁচলা ভরে জল খেল। তারপর ধীরে ধীরে সবচেয়ে উঁচু গাছটির কাছে গিয়ে ঋজু কাণ্ড বেয়ে উঠতে লাগল। খানিকটা সরল কাণ্ড ধরে উঠে আসার পর সহজ হয়ে গেল তার ওপরে ওঠা। এবার ডালের ওপর পা রেখে রেখে ক্রমাগত উঁচুতে উঠতে লাগল। চারিদিকে ছত্রাকার সবুজ পাতা, মাঝখানে উঠে চলেছে তুর্বসু। একেবারে মগডালে পৌঁছে সে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল।

তর্বুসুর চারদিকে এখন পাতার ঝালর। আকাশ ঝকঝকে নীল। রোদ্দুরে তেজ নেই কিন্তু সোনালি মধুর মতো আলো ঝরে পড়ছে চরাচরে। তুর্বসু পাতার ফাঁকে সপ্তশৈলের দিকে তাকিয়ে রইল। এ যেন অন্য জগৎ। পাহাড় ঘেরা অঞ্চলটি একেবারে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল চোখের ওপর।

এখন রাজা পিজবনের সৌধশীর্ষে সোনালি ঝলক। অলিন্দ, অঙ্গন সবই উদ্ভাসিত। এই মুহূর্তে বীরা কিংবা তার পরিচারিকাদের কাউকে সেখানে দেখা গেল না। সরোবরটির জল একেবারে স্বচ্ছ নীল। হাঁসেরা তীর থেকে উড়ে উড়ে পড়ছে জলে। নীল জলে সাদা ঢেউ উছলে উঠছে। কোনও বাড়ির সামনে লোমশ কুকুর শুয়ে শুয়ে ভোরের আলো গায়ে মাখছে। সম্ভবত ওরা অলস চোখে দেখছে হাঁসেদের খেলা।

একদল মেয়ে সারি দিয়ে বেরিয়ে আসছে পূর্বদিকের পাহাড়ের কোল থেকে। ওই তো উত্তর-দক্ষিণের পাহাড় থেকেও বেরোল। সবাই চলেছে পশ্চিমের পাহাড়ের দিকে। হাতে রয়েছে এক একটি করে 'দৃতি'। তুর্বসু এই চর্মপাত্রগুলি পণি রমণীদের হাতে দেখে অনুমান করল, ওরা সম্ভবত দল বেঁধে চলেছে প্রভাতী গো-দোহনের কাজে।

তুর্বসুর অনুমান যে সত্য সে প্রমাণ পাওয়া গেল কিছু পরে। পশ্চিমের পাহাড়ের তলায় কোথায় যেন

প্রবেশ করল মেয়ের দল। জায়গাটি রাজগৃহের একেবারে নিম্নতলেব কয়েক ধাপ নীচে কোথাও অবস্থিত বলে মনে হল।

গত সন্ধ্যায় সুড়ঙ্গ-দ্বারের ছিদ্রপথে যে প্রশস্ত নালাটিকে দেখেছিল তুর্বসু, এখন সেটির পুরো ছবি দেখতে পেল সে। সাতটি পাহাড়ের কোল ঘিরে ওই আট-দশ হাত প্রশস্ত নালাটি বৃত্তাকারে পরিভ্রমণ করেছে। মাঝে মাঝে তার ওপর পড়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে পারাপারের জন্য এক একটি করে প্রস্তরখণ্ড। সুড়ঙ্গপথের সামনে যে প্রস্তরখণ্ডটি ছিল তাকে আপাতত সরিয়ে রাখা হয়েছে একপাশে। ওই নালার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে জলধারা। সূর্যের আলোয় সে প্রবাহ স্থানে স্থানে ঝলমল করে উঠছে।

তুর্বসু হঠাৎ দেখল, পশ্চিম পাহাড়টির পেছনে ঠিক তেমনি চওড়া একটি জলধারা অনেক দূর পর্যন্ত প্রান্তরের বুক চিরে বয়ে চলে গেছে। তার মনে হল বাইরের জলপ্রবাহের সঙ্গে ভেতরের প্রবাহের নিশ্চিত একটা যোগ আছে।

আবার সেই মেয়েগুলিকে পশ্চিম পাহাড়ের গুপ্ত তলদেশ থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। এখন তারা প্রায় সকলে 'দৃতি' গুলোকে কাঁধে তুলে নিয়েছে।

তুর্বসু বুঝল, দুগ্ধ দোহন করে তারা নির্দিষ্ট কোনও স্থানের উদ্দেশ্যে এগিয়ে চলেছে।

তারা এখন সকলে দক্ষিণ পাহাড়ের তলায় প্রবেশ করল। ওই অংশটুকু বৃক্ষশীর্ষ থেকে অদৃশ্য ছিল! তাই তুর্বসু ওদের প্রবেশের ছবিটা আর দেখতে পেল না।

এরপর সে যা দেখল তা দৃশ্য হিসেবে সত্যিই আকর্ষণীয়।

পশ্চিম পাহাড়ের প্রাসাদ-সোপান বেয়ে নেমে এল তিনটি তরুণী রমণী। সামনে তিনটি সাদা ঘোড়া ইতিমধ্যে কখন এনে রাখা হয়েছে। ওরা ঘোড়ার ওপর চড়ে বসল। দুটি তরুণী অশ্ব নিয়ে চলে গেল পাহাড়ের দুই প্রান্তে। ওদের হাতে দুটি ধাতব তুরী। সূর্যের আলো পড়ে ঝক ঝক করছিল। সেই তুরী মুখে তুলে ওরা ফুৎকার দিল। সঙ্গে সঙ্গে চলতে শুরু করল মাঝখানে দাঁড়ানো অশ্বটি। অসাধারণ দৃপ্ত ভঙ্গিমায় ঘোড়ার রাশ ধরে এগোতে লাগল তরুণী। তুর্বসু দেখল পশ্চিম পাহাড়ের তলদেশের গোষ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসছে শত শত ধেনু। তুরী তখনও বেজে চলেছে, আর সংখ্যাহীন ধেনু এগিয়ে চলেছে সম্মুখের অশ্বারোহিণীকে অনুসরণ করে। একদিকে গভীর নালা, অন্যদিকে হ্রদ। মাঝখানে সবুজ চারণ ভূমি। অশ্বটি হ্রদের চারিদিকে পরিক্রমা করল। সঙ্গে সঙ্গে ধেনুগুলিও ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে চারণভূমিতে। এবার দেখা গেল অন্য দুটি অশ্বারোহিণী তুরীগুলি কোমরে ঝুলিয়ে নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে ধেনুগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। যেখানে চারণক্ষেত্রে ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ধেনু, সেখান থেকে প্রশস্ত ক্ষেত্রে তাদের ছড়িয়ে দিচ্ছে। এমনি করে হ্রদের চতুর্দিকে তারা অশ্ব নিয়ে পরিভ্রমণ করে বেড়াল বহুক্ষণ। সূর্যরশ্মি ক্রমে তীক্ষ্ণ হল। অশ্বারোহিণীরা এবার কর্মশেষে পশ্চিম পাহাড়ের সানুদেশে চলে গেল। তারা অশ্ব থেকে নেমে, যথাস্থানে তাদের রেখে আবার সোপানে আরোহণ করে অদৃশ্য হল প্রাসাদের অন্তরালে। তুর্বসুর মনে হল, প্রভাতী গোপার ভূমিকায় অগ্রবর্তিনী রমণী বীরা ছাড়া আর কেউ নয়। গত দিন বেলাশেষে যে তরুণীকে সে কেশচর্চা করতে দেখেছিল, তারই আদল সে দেখল আজকের অশ্বারোহিণীর মধ্যে।

তুর্বসু নেমে এল গাছ থেকে। সে আবার ফিরে এল গুহায়। একটা চিন্তা ওই নালার জলের মতো প্রবাহিত হচ্ছিল তার মনের মধ্যে। পশ্চিমের পাহাড়ে নিশ্চয় এমন একটি স্থান আছে, যেখানে সংখ্যাহীন গোধন একসঙ্গে রাখা হয়। আবার ওই পশ্চিমের পাহাড় দিয়ে বহির্গমনের একটা পথ থাকা সম্ভব। কারণ, এই নালার প্রবাহ ওই পথেই সপ্তশৈলের বাইরে এসে পড়েছে। রসা নদীর সেতুর সামনের পাহাড়টি গণনায় যদি হয় প্রথম, তাহলে তার সংলগ্ন উত্তর-পশ্চিমের পাহাড়টি নিশ্চয়ই সংখ্যায় সপ্তম।

আবার ভাবনা এল মনে, যদি সেতুর কাছেই প্রথম এবং সপ্তম পাহাড়টি হয় আর সপ্তম পাহাড়ে যদি থাকে প্রবেশের পথ, তাহলে চতুর্থ পাহাড়ের গুপ্ত সুড়ঙ্গপথে রাজা কশুকে পণিরাজ্যে নিয়ে আসা হল কেন? কাছের পথ ছেড়ে দূরের পথ দিয়েই বা সম্মানীয় অতিথিকে রাজ্যে নিয়ে আসার সার্থকতা কোথায়? তাহলে কি তার অনুমানটা ভুল? অথবা এমনও হতে পারে ঐ গুপ্ত পথ সবার জন্যে নয়। রাজপ্রাসাদের

গুপ্ত সুড়ঙ্গপথ কোনও বিদেশি অতিথির কাছে একেবারেই নিষিদ্ধ। এ কেবল নিজেদের গোপন ব্যবহারের জন্য।

ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, সে যদি আজ বৃক্ষ আরোহণ না করত তাহলে পশ্চিমের ওই নালার জলের বহির্গমন পথটা দেখতে পেত না।

সারাদিন সে রইল সুড়ঙ্গের ভেতর। পাথরের দরজার ছিদ্রপথে সে দেখতে লাগল পণিদের জীবন-প্রবাহ। তৃষ্ণার্ত গাভীরা আসছিল নালাতে জলপানের জন্য। তার মনে হল, কোনও ঝর্ণা থেকে জলধারা প্রবাহিত হয়েছে নালার মধ্য দিয়ে।

রজয়িত্রীদের দেখা গেল পরিচ্ছদ রং করে ওই নালার জলে ধুয়ে নিতে। চটুল পরিহাস আর 'উহ' গানের সুর ভেসে আসছিল তুর্বসুর কানে। শিশুরা খেলা করছিল আঙিনায়। কয়েকটি কিশোরী অবিশালিকা ধবধবে লোমশ মেষগুলি নিয়ে চবিয়ে বেড়াচ্ছিল উঁচু পাহাড়ের গায়ে সবুজ তৃণভূমিতে। তাদের হাতের প্রতোদ তাড়না করছিল দলভ্রষ্ট মেষগুলিকে।

সারাদিনের ছবি দেখার ফাঁকে ফাঁকে তুর্বসু পরীক্ষা করে দেখছিল সুড়ঙ্গপথের বন্ধ দরজাটা খোলা যায় কিনা। সন্ধ্যার মুখোমুখি সে ছিদ্রপথে দরজার ওপিঠে হাতখানা গলিয়ে দিলে। সে অনুভবে একসময় বুঝতে পারল, দরজাটা ওপার থেকে কীলক দিয়ে বন্ধ করা।

এখন তার মনে হল, একটি হাতের মতো সরু পাথর গলিয়ে কীলকটির মুখে ধীরে ধীরে ধাক্কা দিতে পারলে ওটিকে খুলে ফেলা অসম্ভব নয়। কিন্তু ধাক্কা দিতে গেলেই শব্দ উঠবে। তখন সজাগ হয়ে যাবে পণিরাজ্যের অধিবাসীরা। কী করা যায় ভাবতে ভাবতে কেটে গেল দ্বিতীয় রাতটা। তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় একটা শব্দ উঠল। পণিরাজ্যের ভেতর থেকে। মনে হল কোনও কার্মার অয়স অথবা শ্যাম ধাতু পিটিয়ে কোনও অস্ত্র তৈরি করছে। পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে তার আঘাতের শব্দ। তুর্বসু এই সুযোগটি গ্রহণ করল। সে সুড়ঙ্গের বাইরে গিয়ে একটি পাথরের টুকরো এনে দরজার কীলকে আঘাত করল। আঘাতে আঘাতে কীলকটি খুলে পড়ে গেল নালার জলে। অমনি মুক্ত দ্বার খুলে এসে লাগল সুড়ঙ্গের দেওয়ালে। তুর্বসু পাথরের দরজাটি ঠেলে নিয়ে গিয়ে আবার সুড়ঙ্গপথ বন্ধ করল। কিন্তু যতক্ষণ এধার থেকে ঠেলে রাখা হল ততক্ষণ দরজা রইল স্থির, আবার হাত ছেড়ে দিলেই দরজাটি উন্মুক্ত হয়ে এসে লাগল সুড়ঙ্গের দেওয়ালে।

দরজা খুলল, কিন্তু একটা অসুবিধারও সৃষ্টি হল সঙ্গে সঙ্গে। দরজাটি ধরে বসে থাকতে হবে, না হলে খোলা থাকবে সুড়ঙ্গপথ।

রাতে কিছু শুকনো ফল খেল তুর্বসু। তারপর জেগে বসে রইল গভীর রাতের প্রত্যাশায়। যখন দেখল পশ্চিম পাহাড়-সৌধে রাতের আলো নিভে গেল, তখন চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় নালার জলে ধীরে ধীরে নামল তুর্বসু। জল গভীর নয়। জানুর নিচ দিয়ে বয়ে চলেছে। তুর্বসু পাথরে বাঁধানো নালায় আত্মগোপন করে এগিয়ে চলল। পণিরাজ্যে নেমেছে তন্দ্রা। পাতলা কুয়াশার মতো মেঘ চাঁদের আলোকে অস্পষ্ট করে দিয়েছে। তুর্বসু জলস্রোতের সঙ্গে সঙ্গে এসে পড়ল পশ্চিম পাহাড়ে। এ পাহাড়ের তলাতেও একটি সুড়ঙ্গ পথ। ওই নালাটি তার জলপ্রবাহ নিয়ে নেমে গেছে ওই পথে। ক্রমশ সামান্য ঢালু হয়ে গেছে পথটি। তুর্বসু ওই পথে বেরিয়ে এল পশ্চিম পাহাড়ের বাইরে। একটু দূরে বড় বড় গাছ দাঁড়িয়ে। সামনে ভেতরের নালার জল এসে পড়ছে আর একটি নালায়। সেটি সোজাসুজি উত্তর-দক্ষিণে অনেক দূর অবধি গিয়েছে। তুর্বসু তার কোমরে জড়ানো দড়ি বের করে তাতে একটি পাথর বেঁধে নালায় ফেলল। তুলে দেখল নালাটির গভীরতা এখানে প্রায় দু'মানুষ পরিমাণ। ঐ নালার ধারে দাঁড়িয়ে চারদিক তাকাতে গিয়ে তার নজরে পড়ল ভেতরের নালাটি যেখানে বাইরের নালায় এসে পড়েছে সেখানে তিনহাত চওড়া আর প্রায় দশ বারো হাত লম্বা একটি কাঠের মোটা তক্তা জলের তলায় পড়ে আছে। তুর্বসু পরীক্ষা করে দেখল তক্তাটির একদিক লৌহ-কীলকের সঙ্গে এমনভাবে বাঁধা যা চারদিকে ঘুরতে পারে। ওই কাঠটির শেষপ্রান্ত মোটা দড়ি দিয়ে একটি লোহার খুঁটির সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা। তুর্বসু দেখল, ভেতরের নালার জল ওর ওপর দিয়ে বয়ে

চলেছে। তার মনে হল নালা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসার সময় সে ওই কাঠের তক্তাতেই ধাক্কা খেয়েছিল। তুর্বসু ভেতরের নালা পেরিয়ে ও প্রান্তে গেল। লোহার খুঁটি থেকে দড়িটা খুলে নিয়ে কাঠের পাটাতনের ওপর দাঁড়াতেই সেটি তুর্বসুকে নিয়ে স্রোতের ধাক্কায় একেবারে উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত গভীর নালার ওপর সেতু তৈরি করে ওপারে গিয়ে ঠেকল। ওপারে উঁচু একটি পাথরের বেদি। তার সঙ্গে গাঁথা লৌহ কীলক। সেখানে কাঠের সেতুর মাথায় বাঁধা দড়িটি লৌহ-কীলকে গলিয়ে দিলেই পণিরাজ্য থেকে বেরিয়ে আসার পাকাপাকি একটা সেতু তৈরি হয়ে গেল।

তুর্বসু এখন পায়ের ধাক্কায় ওই কাঠের সেতুটিকে আবার এনে ফেলল যথাস্থানে। কীলকের সঙ্গে বেঁধে দিল শক্ত দড়িটি।

এবার ফেরার পালা। তুর্বসু হ্রদের দিকে মুখ করে বেরিয়ে আসছিল নালা পেরিয়ে। এখন তার চোখে পড়ল পাহাড়ের পাদদেশে প্রশস্ত টানা ছাউনি। সারি সারি ছাউনি। তার তলায় বিশ্রামরত অসংখ্য ধেনু। তুর্বসু নালা থেকে নিঃশব্দে উঠে এল গোষ্ঠে। বড় ক্ষুধার্ত সে। একটি দুগ্ধবতী ধেনুর সন্ধান করে সে দুগ্ধ দোহন করতে লাগল নিজের মুখগহ্বরে। কিছুক্ষণ পরে পর্যাপ্ত দুগ্ধপান করে ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর হল তার।

আবার ফিরে চলল সে সুড়ঙ্গের দিকে। এতক্ষণ হিম শীতল জলে তার দুটো পা অসাড় হয়ে এসেছিল, সে তাই চারণভূমির ওপর দিয়েই ফিরে চলল রাতের আস্তানায়। সুড়ঙ্গের কাছে এসে নালার জলে নামল সে। তারপর প্রবেশ করল সুড়ঙ্গমুখে। এখন সে গুহাতেই বিশ্রাম করবে। শেষরাতে দেহ দিয়ে অথবা বড় একখণ্ড পাথর এনে বন্ধ করে রাখবে সুড়ঙ্গ মুখের কপাট। এখন রাতের মতো মুক্ত থাক দরজা।

কত রাত জানা নেই। অঘোরে ঘুমোচ্ছিল তুর্বসু। হঠাৎ একটি আলোর শিখা তার চোখে এসে পড়তেই সে চমকে উঠে বসল গুহার ভেতর। তন্দ্রা জড়ানো চোখে দেখল, ডান হাতে শানিত একখানা বালী আর বাম হাতে আলোক-বর্তিকা নিয়ে তার দিকে চেয়ে আছে এক রহস্যময়ী তরুণী।

তাকে জেগে বসতে দেখে তরুণী রূঢ় গলায় বলল, কে তুমি? কী উদ্দেশ্যে এখানে এসেছ? কেনই বা তুমি চারণভূমিতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলে?

তুর্বসু গুহা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করতেই রমণী দৃঢ় গলায় বলল, একটুও নড়াচড়ার চেষ্টা করো না। ওখানে বসেই আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।

তুর্বসুর মুখে নির্ভীকতার ছবি ফুটে উঠল। সে মুখে মৃদু হাসি টেনে বলল, আপনার দৃপ্ত চেহারা দেখে মনে হচ্ছে আপনি পণিরাজ পিজবণের একমাত্র পুত্রবধূ বীরা।

এমন বিস্মিত হবার অবস্থা বীরার জীবনে বোধহয় আর কোনদিনই আসেনি। সে শুধু অবাক হয়ে চেয়ে রইল। মনে হল তার হাতের শাণিত বালী কিছুটা নত হল।

তুর্বসু আবার বলল, আমি তুর্বসু। এসেছি আপনার ঘনিষ্ঠ সখী মদয়ন্তীর দেশ থেকে।

কথাটা বলেই তুর্বসু তার পাশে পড়ে থাকা চামড়ার কোশের ভেতর থেকে মদয়ন্তীর দেওয়া সোনার কণ্ঠাভরণটি বের করল। সে সেই মূল্যবান নিষ্কটি তুলে ধরল আলোর সামনে।

বীরার মুখের ভেতর থেকে অর্ধস্ফুট একটা বিস্ময়ের উক্তি বেরিয়ে এল, আশ্চর্য! এ রত্ন আপনি পেলেন কোথায়? আমি মদয়ন্তীকে ভালবেসে দিয়েছিলাম। এ আমাদের বন্ধুত্বের স্মৃতিচিহ্ন।

তুবর্সু হেসে বলল, মনে করুন আপনাদের বন্ধুত্বের মাঝখানে আমি ভাগ বসালাম।

হাতের অস্ত্রখানা পায়ের তলায় নামিয়ে রাখল বীরা। বলল, সত্যি আপনি আমাকে বিস্মিত করলেন। মদয়ন্তীর সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা জানতে পারি কী?

তুর্বসু বলল, বন্ধুত্বের । আচ্ছা আপনি কি মদয়ন্তীর মুখে কখনও দেবল নামের কোন যুবকের নাম শুনেছেন?

বীরা বলল, সে তো অনেক গোপন নাম। আপনি কি দেবল? ছদ্মনামে এখানে এসেছেন?

না, আমি তাদের মিলনের ব্যাপারে কিছু সাহায্য করেছিলাম। আমার আসল নামই আপনাকে আমি বলেছি।

বিশেষ ঔৎসুক্য নিয়ে জিজ্ঞেস করল বীরা, ওদের কি বিয়ে হয়েছে?

স্বয়ংবর সভার আয়োজন হয়েছিল। রথের প্রতিযোগিতায় যে জয়ী হবে রাজা কশু তাঁরই হাতে কন্যা সমর্পণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সেই প্রতিযোগিতায় বন্ধু দেবল বিজয়ী হয়ে অভিষ্ট পুরস্কার পেয়েছে।

ভীষণ খুশি হলাম আপনার মুখে তাদের মিলনের কথা শুনে। মদয়ন্তী এখানে এসে অনেক চোখের জল ফেলে গেছে। কিন্তু আমার প্রশ্ন, আপনি আমার নিষ্ক ওর কাছ থেকে পেলেন কী করে?

সে কথা একান্ত গোপনীয়! যদি ওদের মিলনের ব্যাপারে কিছু উপকার করে থাকি তাহলে বন্ধু হিসেবে সেটা প্রকাশ করা কি বাঞ্ছনীয়? শুধু জানবেন, এ নিষ্ক আমি চুরি করে আনিনি। মদয়ন্তীর বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে পেয়েছি। আপনি হয়তো বলতে পারেন আপনার উপহারের বস্তুটি অন্যকে দিয়ে দেওয়া ঠিক হয়নি মদয়ন্তীর। কিন্তু সেটুকু অন্যায়ের জন্যে মদয়ন্তীর হয়ে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আপনার কাছে। পণিরাজ্যে এসে যদি কোনও বিপদে পড়ি তাহলে এই নিষ্কই হবে আমার আত্মরক্ষার কবচ। তাই মদয়ন্তী তার এত আদরের ধন আমার হাতে তুলে দিয়েছে।

বীরা আলোক বর্তিকাটি পাথরের মেঝেতে নামিয়ে রেখে বসল। তুর্বসুর দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি কেন এসেছেন জানি না, তবে এটুকু বুঝেছি দ্রুহ্যবদের রাজার কাছ থেকে কোন সংবাদ বয়ে আনেননি পণিরাজ্যে! তাহলে এমন ভাবে সুড়ঙ্গ গুহায় আত্মগোপন করে থাকতে হত না।

আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন।

বীরা বলল, এখন বলুন, আসল উদ্দেশ্য কী আপনার এখানে আসার?

তুর্বসু হেসে বলল, এত তাড়াতাড়ি সব জানতে চান? অনেক পথ পেরিয়ে এসেছি অনেক কষ্ট সহ্য করে। এখানে ক'দিন রয়েছি প্রায় অভুক্ত অবস্থায়। আর আস্তানা তো নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছেন।

আমি সত্যি লজ্জিত।

তুর্বসু বলল, না, না, লজ্জার কোনও কারণ নেই। আপনার কাছে গিয়ে তো আমি দাঁড়াইনি। আর আপনি নক্ষত্রদর্শ নন যে গণনা করে জানতে পারবেন, একটি অতিথি আপনার বান্ধবী মদয়ন্তীর কাছ থেকে এসে গুহাবাস করছে শুধু বায়ু ভক্ষণ করে।

গল্প করার ভঙ্গিতে এলিয়ে বসল বীরা। তরুণ-যুবা তুর্বসুকে তার বড় ভাল লেগেছে। সে বলল, আপনি কিন্তু খুব শুভ সময়ে আমার দেশে এসেছেন।

কেন বলুন তো?

বীরা বলল, আর সাতদিন আগে এলে অভ্যর্থনাটা একটু অন্যরকম হত। আমার স্বামী, শ্বশুর আর সারা পণিরাজ্যের মানুষজন সাতদিন আগে দক্ষিণদেশে চলে গেছে পণ্য নিয়ে।

তুর্বসু হেসে বলল, তা জানি। তবে তাঁরা যাঁকে পণিরাজ্যের ভার দিয়ে গেছেন তিনিও অতিথি আপ্যায়নে কম যাবেন না। প্রথমেই শানিত বালী হাতে নিয়ে অতিথি সৎকার করতে এসেছিলেন।

ঝর্ণার মতো হাসি ঝরাল বীরা। সুড়ঙ্গের ভেতর সে ধ্বনি অলৌকিক বলে মনে হল।

বীরা বলল, আপনি মদয়ন্তীর বন্ধু। চলুন আমার সঙ্গে আমার গৃহে।

তুর্বসু হেসে বলল, বলুন, আপনার গৃহে নয়, প্রাসাদে।

বেশ তাই না হয় হল। কিন্তু সেখানেও আপনাকে থাকতে হবে আত্মগোপন করে। আমি ছাড়া পণিরাজ্যের কাক-পক্ষীটিও আপনার উপস্থিতি জানতে পারলে, ফিরে যাবার পথ আপনার বন্ধ হয়ে যাবে।

তুর্বসু বলল, অশেষ অনুগ্রহ আপনার। একমাত্র আপনিই আমাকে প্রশ্রয় আর আশ্রয় দিলেন।

বীরা উঠে দাঁড়ানো মাত্রই হ্রেষাধ্বনি হল।

চমকে ফিরে তাকিয়ে বলল বীরা, আপনি ঘোড়ায় এসেছেন?

হ্যাঁ, ওটি আমারই বাহন।

বীরা বলল, আর একটি মুশকিল বাধালেন।

কী রকম?

বীরা বলল, আপনাকে না হয় গোপন কক্ষে রাখলাম, কিন্তু আপনার বাহনেব হ্রেষাধ্বনি থামাই কী করে?

একটু থেমে আবার বলল, এখন চলুন গৃহে। এর পরিচর্যার ভার আমার ওপরেই ছেড়ে দিন।

তুর্বসু কোশের ভেতর সবকিছু গোছগাছ করে তুলল। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, পথে পথে অভ্যর্থনা পেতে পেতেই এসেছি। চলুন এখন পণিরাজগৃহের বধূর অভ্যর্থনার নমুনাটা দেখা যাক।

বীরা বলল, আলো কিন্তু সুড়ঙ্গের ভেতরই জ্বেলেছি, এখানেই নিভিয়ে রাখতে হবে। অন্ধকারে আমার হাত ধরুন। চলে আসুন সাবধানে।

ফুঁ দিয়ে আলো নিভিয়ে বীরা হাত ধরল তুর্বসুর। সংকোচের লেশমাত্র চি হ্ন নেই তার আচরণে। তুর্বসু যদিও অন্ধকার সুড়ঙ্গপথ ধরেই এসেছে, তবু বীরার হাত ধরে অন্ধকারে চলতে সে রোমাঞ্চিত হচ্ছিল।

তুর্বসু চলতে চলতেই বলল, কি করে এত রাতে আপনি আমাকে দেখতে পেলেন।

বীরা বলল, সাতদিন সাতটি পাহাড়ে পর্যায়ক্রমে পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে। আজ পশ্চিম পাহাড়েব পালা ছিল।

কিন্তু সবাই বাদে শুধু আপনি?

আমি সবাইকে এই পাহারার দিনে ঘুমুতে দিয়ে নিজে জাগি।

আশ্চর্য!

আশ্চর্য কিছু নয়। জাগতে আমার ভাল লাগে। আমি রাতের জগৎকে দেখি।

তুর্বসু কৌতূহলী হল, আপনি আমাকে প্রথম কোথায় দেখলেন?

আপনি যখন চারণভূমি থেকে নালা পেরিয়ে সুড়ঙ্গে ঢোকার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন।

তুর্বসু আশ্বস্ত হল। তাহলে বীরা তার যাত্রাপথের দর্শক নয়, প্রত্যাবর্তনের শেষ পর্বে সে বীরার সন্ধানী চোখের কাছে ধরা পড়েছে।

ওরা এসে পড়ল নালার কাছে। বীরা কিছুক্ষণ আশপাশে সন্ধান চালিয়ে তুর্বসুকে বলল, দরজা বন্ধের খিলখানা কোথায় রেখেছেন?

ওটা হাত ফস্কে নালায় পড়ে গেছে। দাঁড়ান, খুঁজে দিচ্ছি।

বীরা বলল, থাক, অতিথিকে আর কষ্ট করতে হবে না। দয়া করে আপনি নালাটা পেরিয়ে যান। হ্যাঁ, গায়ে মাথায় চাদরখানা ভাল করে জড়িয়ে নিন।

তুর্বসু তাই করল। ওপারে গিয়ে সে দেখল, বীরা নিচু হয়ে জলে পাথরের খিলখানার সন্ধান করছে। না, বেশি খুঁজতে হল না। বুদ্ধিমতী মেয়ে স্রোতের সঙ্গে একটুখানি এগিয়ে গিয়ে সহজেই পাথরের কীলকটাকে তুলে আনল। ধীরে ধীরে সুড়ঙ্গের কাছে গিয়ে কপাট টেনে আলতো করে খিল বন্ধ করল। নালার এপারে উঠে এসে বলল, চলুন যাই।

কয়েকটি সপ্তাহ পার হয়ে গেছে। তুর্বসু বীরার নিভৃত আতিথ্যে বাঁধা পড়েছে। সে এখন পিজবনের পুত্রবধূর অতিথি নয়, আপনজন। রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে রক্ষিত অতিথিশালার পশ্চিম প্রকোষ্ঠে গুপ্তভাবে রয়েছে তুর্বসু। পশ্চিমের একটিমাত্র ক্ষুদ্র বাতায়নের ফাঁক দিয়ে সে দেখে অবারিত প্রকৃতির লীলা। নীচে পণিদের দ্বারা খোদিত নালা বা খাল। রাজ্যের পশ্চিমমুখী জলধারা বুকে নিয়ে উত্তর-দক্ষিণে বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত। খালের দিকে কোনও জনবসতি নেই। খালের ওপারের ভূমি কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টিলা আর বড় বড় বৃক্ষের সংসার বুকে ধরে শুয়ে আছে। টিলাগুলির মাঝ দিয়ে বনের ধার ঘেঁষে চলে গেছে পথ। এ পথ পশ্চিম পাহাড়ের সমান্তরাল দক্ষিণমুখে যাত্রা করেছে। তুর্বসুর নিশ্চিত ধারণা হল, ওই পথ গিয়ে পৌঁছেছে রসা নদীর সেতুর কাছ-বরাবর কোথাও। কিন্তু সে এতদিনের মধ্যে একটিবারও কোনও মানুষজনকে এ পথে চলতে দেখল না। তার মনে হল, এটি পণিরাজ্য থেকে বহির্গমনের কোনও গুপ্ত পথ।

একমাত্র বীরা এখানে তার সঙ্গী। আশ্চর্য এই নারী। সারাদিন কর্মব্যস্ততার মধ্যে কাটে তার। সভা-সমিতি, বিচার-আচার, উৎসব-অনুষ্ঠান, সবকিছুব মাঝখানে সে। চতুর্দিকে প্রবাহিত নালার জলস্রোতের মত

বিরামহীন কর্মে আবর্তিত তার দিন।

শুধু দিনান্তে বীরার অবকাশ। সপ্তাহে একটি রাত কেবল পণিরাজ্য প্রহরার জন্য তার নির্দিষ্ট। বাকি রাতগুলি সে বন্ধু তুর্বসুর সঙ্গী। তীক্ষ্ণ তার দৃষ্টি, নিখুঁত তার ব্যবস্থা। এতগুলি দিন তুর্বসু কাটাল রাজপ্রাসাদের অতিথি-নিবাসে, কিন্তু পরিচারিকা তো দূরের কথা, একটি ক্ষুদ্র পাখিও তাকে কোনও ছিদ্রপথ দিয়ে দেখতে পেল না।

রাতের কাজ দ্রুত শেষ করে নিয়ে বীরা পরিচারিকাদের আজকাল ছুটি দিয়ে দেয়। তারা চলে যায় নিজেদের সংসারে। তখন অখণ্ড নিভৃত অবসর। বীরা এসময়ে অধীর হয়ে ওঠে তুর্বসুর কাছে আসার জন্য। এ কী ভালবাসা? এ কী সুন্দর সুঠাম শক্তিমান পুরুষের জন্য নারী হৃদয়ের চিরন্তন আকর্ষণ?

বীরা তুর্বসুর কাছে যাওয়ার জন্যে নিজেকে সাজিয়ে তোলে। আঞ্জনীকারীর কাছ থেকে অঞ্জন আনিয়ে সে দুটি সুন্দর চোখকে আরও দীর্ঘায়িত করে। কেশবিন্যাস করে অতি সুচারু ভঙ্গিতে কণ্টকীর সাহায্যে। মাণ আর নিষ্ক দিয়ে আবৃত করে গ্রীবা। শ্রেষ্ঠ মণিকার, হিরণ্যকারদের নিপুণ হাতের তৈরি রুক্ম দিয়ে সারা বুকখানা সাজিয়ে তোলে। চন্দনের গন্ধে বাতাসকে ব্যাকুল করে, সোনার পদাভরণ খাদিতে জল ঝুমঝুমি শব্দ তুলে, বনস্পতি বীণা হাতে নিয়ে সে চলে নিভৃত অতিথি-নিবাসে অভিসারে।

তুর্বসু মনে মনে ভাবে শশ্বতীকে। সামনে এসে নারীর সর্বজয়ী মহিমায় দাঁড়ায় বীরা।

কী ভাবছ তুর্বসু?

কোনও একজন নারীর কথা।

সে নিঃসন্দেহে ভাগ্যবতী।

কেন বীরা?

তুমি ভাবছ বলে।

বীরা তুর্বসুর একটু দূরে কাঠের মেঝেতে পাতা সুন্দর কাজ করা কশিপুর ওপর বসল। এদিকে ওদিকে কতকগুলি উপবহন ছড়ানো। তাদের কোণায় কোণায় রঙিন সুতোয় পেশস্করণের কাজ। বীরার পরিধেয় বস্ত্রটিও উন্নত ধরনের সূচীকর্মে মনোহারী। দুই প্রান্ত, অঞ্চলদেশ ও বস্ত্রমধ্যভাগ রঙিন সূত্রে চিত্রিত।

তুর্বসু বলল, তোমার চোখে আজ সুন্দর কাজলের টান। ঠিক যেন একটি ধনু।

বীরা বলল, ও ধনু প্রিয়জনের সুন্দর মুখে বার বার দৃষ্টির শর নিক্ষেপের জন্য।

আজ তুমি তোমার বক্ষ আবৃত করেছ বীরা সুবর্ণ-নির্মিত আশ্চর্য সুন্দর রুক্মে। আমি ওখান থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারছি না।

বীরার দৃষ্টিতে হাসি উপচে পড়ল। সে বলল, সন্ধানীর দৃষ্টি থেকে দুটি স্বর্ণকমল গোপন করে রাখার জন্যে এই আবরণ।

আর্য তুর্বসুর রক্ত নদীর খরস্রোতের মতো আছড়ে পড়তে চাইল কোনও কোমল চিক্কণ দেহের তটে।

তুর্বসু উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, তোমার কানে দুলছে হিরণ্যকুণ্ডল। দীপের আলোয় বিদ্যুতের মতো ঝলসে উঠছে।

উত্তরে সুনিপুণা বীরা হেসে বলল, ও দুলে দুলে বারণ করছে মধুলোভী মানুষের ধীরে ধীরে এগিয়ে আসা মুখখানাকে।

এতকাল সান্নিধ্যে থেকেও যে সংযমকে রক্ষা করেছিল তুর্বসু, তা সহসা তট ভেঙে প্লাবিত করে দিল তীরভূমি!

শেষরাতের জ্যোৎস্না এসে পড়েছিল পশ্চিমের জানালা দিয়ে। তুর্বসু দেখল ঘুমন্ত বীরার মুখে এসে পড়েছে সে আলো। দীর্ঘ রাত বীরা তার নিপুণ হাতের বীণা শুনিয়েছে তুর্বসুকে। তারপর দুজনে একই সঙ্গে পান করেছে সোমসুধা। বীরা প্রতিদিনের মতো আর ফিরে যায় নি নিজের শয্যায়। সে বীণার আসরে এলিয়ে দিয়েছে তার দেহ। তারপর অন্ধকারের অতলে তলিয়ে যেতে যেতে অনেক স্বপ্ন দেখেছে। তুর্বসু জ্যোৎস্নার আলোয় দেখল বীরা অচেতনে ঘুমোচ্ছে। সেই একই নারী। এ যেন বাক্, এ যেন শশ্বতীরই অন্য

আর এক সংস্করণ। তেমনি বাসনায় উদ্বেল, প্রেমের কামনায় কাতর।

একদিন তুর্বসু প্রশ্ন করল বীরাকে, একটা প্রশ্নের জবাব আমি কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছি না বীরা?

কি সে প্রশ্ন তুর্বসু?

প্রবাসী স্বামীর কথা তোমার মনে পড়ে না?

হাসল বীরা। প্রথমে ধীর, তারপর দ্রুতলয়ে সে হাসির তরঙ্গ বয়ে চলল। একসময় হঠাৎ হাসি থামিয়ে বীরা বলল, তুমি বুঝি এসব কথা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ তুর্বসু?

না, ঠিক তা নয়। আজ হঠাৎ, দক্ষিণ থেকে ঝড়ো হাওয়া বইল। সঙ্গে সঙ্গে মেঘ ঘনাল। বৃষ্টিও পড়ল কান্নার বিন্দুর মতো। পশ্চিমের বাতায়নে চোখ পেতে বসেছিলাম। আমার ম" হল, ও ঝড় নয়, দক্ষিণ দেশ থেকে বয়ে আসা কারো দীর্ঘশ্বাস। যেন কারো মনের মধ্যে ব্যথার কালো মে' ঘনিয়ে উঠেছে। কেউ যেন চোখের জল ঝরিয়ে হাল্কা করছে তার বুক। আজ বিকেলটাকে মনে হয়েছিল আমার শোকের দিবস। তাই বলছিলাম, দক্ষিণের মানুষদের জন্যে তোমার মন উতলা হয় কি না?

বীরা হঠাৎ ফুঁসে উঠল ফণিনীর মতো। বলল, নারী কী তোমাদের কাছে শুধুমাত্র বিত্ত চায় তুর্বসু? মাসের পর মাস যারা কেবল বিত্তের সন্ধানেই ঘুরে বেড়ায়, যারা তাদের ওপর সারাক্ষণ মমতার হাত বুলায়, তারা কি কোনদিন মনের কারবারী হতে পারে বলে তুমি বিশ্বাস কর তুর্বসু? আমাকে তারা রাজ্য চালানোর ভার দিয়ে গেছে। এ শুধু প্রবোধ , একটা মিথ্যা প্রলোভন। আমি বাইরে সাম্রাজ্ঞীর মতো অভিনয় করে যাই প্রতিদিন কিন্তু তুমি কি আমাকে তোমার বুকের মধ্যে নিয়ে দেখনি, আমি কতখানি বুভুক্ষু, কতদূর রিক্ত।

কথাগুলো বলতে গিয়ে উত্তেজনায় কাঁদতে লাগল বীরা। পরক্ষণে দুচোখ ঢেকে ফেলল হাতের পাতায়।

তুর্বসু বলল, আমি প্রসঙ্গটা উত্থাপন করে অন্যায় করেছি বীরা। তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

চোখের ওপর থেকে হাত সরে গেল বীরার। বলল, কোনও অন্যায় তুমি করনি, বন্ধুর মতো কাজ করেছ তুর্বসু।

একটু থেমে আবার বলল, দীর্ঘদিন তুমি আর আমি রয়েছি এই নির্জন অতিথি নিবাসে। কত রাত আমরা ভোর করে দিয়েছি বীণা বাজিয়ে। আমাদের অজস্র অর্থহীন কথার প্রলাপে চোখ থেকে বিদায় নিয়েছে নিদ্রা। কিন্তু দুজনে এমন কোনও কাজ দীর্ঘদিন করিনি, যাতে দুটি যুবক যুবতীর দেহের ক্ষুধা মেটে। আমরা ও পথে চলার আকাঙ্খা থেকে মনকে নিবৃত্ত করেছি। কিন্তু বলতে পার তুর্বসু, যে স্বামীর কথা ভেবে আমি নিজেকে সংযত রেখেছিলাম , সে আমার দেহ আর মনের মর্যাদা রাখার জন্যে কি করেছে? বাণিজ্য শেষে যখন ফিরে আসে তখন সে একটা বুভুক্ষু মানুষ। আমার গোষ্ঠের পশুদের আচরণের থেকে তার কোন তফাৎ নেই। রাতে যখন সে শয্যায় আসে তখন ভালবাসার দুটো সুন্দর কথা শোনার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা তার থাকে না। আমি বীণা বাজাতে গেলে আমার হাতখানা ধরে সে শুধু টেনে নেয়। তার ভোগের ইচ্ছা তখন আগুনের জিহ্বার মতো লক্‌লক্ করতে থাকে। আমার দেহের তটে চলে একটা বিশ্রি রকম ঘোলা জলের ঘূর্ণির খেলা। একসময় খেলা ভাঙে আর মানুষটা অসাড় অবসন্ন দেহে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ে। আমি ওর ঘুমন্ত মুখের দিকে জ্যোৎস্নার আলোয় চেয়ে চেয়ে দেখি। ভাবলেশহীন এক বিচিত্র মুখ। পথের ধারে পড়ে থাকা একটা শিলাস্তূপের সঙ্গে তার এতটুকু তফাৎ নেই। ভোরে উঠে ও যখন বাইরে যাওয়ার জন্যে সোনার অলঙ্কারে নিজেকে সাজায় তখন আমি শুধু বলি, তুমি নিজেই তো নিরেট সোনার পিণ্ড। সোনার তালকে কী কেউ সোনার অলঙ্কার দিয়ে সাজায়?

ও আমার কথার শ্লেষটুকুও ধরতে পারে না। বলে, এতটা মূল্য আমাকে দিও না। সোনার সঙ্গে কী কোন বস্তুর তুলনা চলে বীরা?

বিশ্বাস কর তুর্বসু এই অতি স্থূল মানুষটার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে আমি মনে মনে প্রার্থনা করেছি। ওর পুনর্যাত্রা যাতে ত্বরান্বিত হয় সেজন্য উৎসুক মন নিয়ে দিনের পর দিন প্রতীক্ষা করেছি! ও চলে গেলে আমার বুক ঠেলে একটা গভীর শ্বাস বেরিয়ে এসেছে। ওটা বিরহের দীর্ঘশ্বাস নয় তুর্বসু। পরম

শান্তি আর স্বস্তির নিশ্বাস।

এতগুলো কথা বলে থামল বীরা। তুর্বসু কোনও কথাই বলল না। বেশ কিছু সময় কেটে গেল নীরবতার ভেতর। আবার কথা বলল বীরা। ধীর শান্ত গলায় বলল, তুমি সুপুরুষ আর বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী। আমার দেহ ভোগের ইচ্ছা থাকলে অনেক আগেই তুমি জানতে পারতে। কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে দিনের পর দিন মিশে শুধু কথা, জাল বুনে গেছি। তোমার কথার ভেতর থেকে যখন পেয়েছি তোমার শিল্পী মনটির পরিচয়, কেবল তখনই তুর্বসু তোমার কাছে সবই আমার উজাড় করে দিয়েছি। আমাকে 'সাধারণী', 'জারিণী', যা খুশি আখ্যা দিতে পার কিন্তু আমি আমার সত্যকে প্রকাশ করেছি, মিথ্যার কোন আবরণ না দিয়ে।

তুর্বসু বলল, পুরুষ হয়ে আমিও কিছু পরিমাণে অপরাধী বীরা।

না তুর্বসু, কোন অপরাধই তুমি করনি। আমিই তোমাকে আকর্ষণ করেছি আমার দিকে। অপরাধ যদি কিছু ঘটে থাকে তাহলে সে আমার, না হলে আমাদের কারোরই নয়। তুমি এতদিন এখানে রইলে তুর্বসু, কিন্তু প্রথম দিনের সেই স্বাভাবিক জিজ্ঞাসা ছাড়া আমি কোনদিনও তোমাকে প্রশ্ন করিনি, কেন তুমি এখানে এসেছ?

আমি তোমার আচরণে মুগ্ধ হয়েছি। এত বড় একটা পাওয়াকে হারাতে চাইনি বলেই তোমার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন তুলিনি।

উৎসব চলেছে পণিরাজ্যে। পণিদের বাণিজ্য করে ফিরে আসার সময় আসন্ন হলেই মেয়েরা উৎসব করে। জ্যোৎস্না রাতে পূর্বদিকের পাহাড়ে ওরা সমবেত হয়। ওখানে পাহাড়ের মাঝখানে কিছুটা সবুজ সমতল ভূমি। তার চারদিকে বড় বড় গাছ। একটি ঝর্ণা খরনৃত্যে বয়ে চলেছে। সেখানে সারা রাত ওরা পালা করে নাচগানে মাতে। স্বামীদের নীরোগ সুস্থ দেহে প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি নিয়ে পরস্পর আলোচনা করে। সোম আর সুরা পান করে মত্ত হয়।

চলে যাবার বাঁশি বেজেছে। আসন্ন বিচ্ছেদের বেদনায় ভারাক্রান্ত দুটি মন। বীরাকে প্রতিদিনই যোগ দিতে হয় উৎসবে। সে মধ্যমণি। তার উপস্থিতি না হলে সব উৎসবই নিষ্প্রভ। তাই বীরা যায়, কিন্তু সমস্ত মন পড়ে থাকে তার প্রাসাদে।

কৃষ্ণপক্ষ পার হয়ে যেদিন শুরু হবে শুক্লপক্ষ, কেবল সেদিনই পূর্ণ হবে পণি রমণীদের প্রতীক্ষার কাল।

ইতিমধ্যে বীরার অনুপস্থিতির সুযোগে তুর্বসু পশ্চিম পাহাড়ের গুপ্ত জলপথ পার হয়ে রসা নদীর সেতুটির সন্ধান করে এসেছে। এইবার তাকে চলে যেতে হবে। সে যাবে পণিরাজ্য ছেড়ে। যাবে রাজবধূ বীরার তীব্র আকর্ষণের বাঁধনকে ছিন্ন করে। বীরা একদিন বলেছিল, পারবে তুর্বসু, আমাকে এই পণিরাজ্য থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে? এত বড় পৃথিবীর কোথাও কী দুজনের এতটুকু ছোট পর্ণশালা গড়ে থাকার মতো জায়গা হবে না?

তুর্বসুর উত্তর দিতে একটুখানি দেরি হয়ে গিয়েছিল। অমনি খিল খিল করে হেসে উঠেছিল দারুণ অভিমানী বীরা। বলেছিল, সোনার শেকলে বাঁধা পাখি হঠাৎ একদিন আকাশে পাখা মেলতে চাইলেই কী উড়তে পারে তুর্বসু? তার পায়ে যে সোনার ভার, চোখ যে সোনার ঝলকে অন্ধ।

কোনও কথা না বলে তুর্বসু শুধু নিবিড় আবেগে হাত ধরেছিল বীরার। বীরা তুর্বসুর বুকে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল।

চলে যাবার ঘণ্টা বেজে চলেছে, তবু স্থির হয়নি বিশেষ দিনটি। শেষ মুহূর্তগুলোতে যেন কেউ কাউকে ছেড়ে দিতে চাইছে না। জানাতে পারছে না বিদায়ের শেষ কথাটি।

সেদিন দারুণ জমে উঠেছে পূর্ব পাহাড়ের উৎসব! বাজছে পিচ্ছোলা, গর্গর, মর্দল। ভেসে আসছে পণব, পুষ্কর, তুণবের শব্দ। শততন্ত্রী বাণ আর ধনুর্যন্ত্রের সম্মিলিত সুরধ্বনিতে কখনও বা বাতাস হয়ে উঠছে ব্যথা মন্থর।

বীরা উৎসব-শৈলের দিকে যেতে গিয়েও ফিরে এল। তুর্বসুব হাতে সুরাপাত্র তুলে দিয়ে বলল, আজ সারা রাত চলবে আমার নৃত্য, এসো আমরা আজ একই পাত্রে সুধা পান করি। তোমার অধর স্পর্শে সুরা আরও উত্তেজক হয়ে উঠুক। সেই সুরা পান করে আমি ক্লান্তিহীন নাচে ভেসে যাই।

বীরার সুরা পানের ইচ্ছা পূর্ণ হলে সে প্রাসাদ সোপাণ বেয়ে একটা ঝর্ণার মতো উচ্ছ্বলিত আবেগে নৃত্যের ঢেউ তুলে চলে গেল। তার প্রসারিত দুটি বাহু ও আশ্চর্য সুন্দর দেহশ্রীর দিকে তাকিয়ে তুর্বসু মনে মনে বলল, তুমি শ্রীদেবী। উজ্জ্বল যশোময়ী আনন্দদায়িনী মূর্তি তোমার। পদ্মে বিভূষিতা, দেব বন্দিতা তুমি। আমি তোমার শরণাপন্ন। দেবী , তুমি আমার সমস্ত অশুভ অলক্ষ্মীকে নাশ কর।

' চন্দ্রাং প্রভাসাং যশসা জ্বলন্তীং শ্রিয়ং লোকে
দেবজুষ্টামুদারাম।
তাং পদ্মিনীমীং শরণমহং প্রপদ্যে অলক্ষ্মীর্মে
নশ্যতাং ত্বাং বৃণে।। '

উৎসবে প্রমত্ত পণি-রমণীকূল। নৃত্যে বাদ্যে সঙ্গীতে সে এক প্রবল উন্মাদনা। পূর্ব পাহাড় আজ যেন আনন্দের অমরাবতী। এদিকে পশ্চিম পাহাড়ের তলায় ততক্ষণে চলেছে কাঠের সেতুর ওপর দিয়ে ধেনু পারাপারের কাজ। হাজারটি ধেনু প্রবাহিত নালার ওপর দিয়ে পার হয়ে গেলে তুর্বসু ওপারে গিয়ে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল সেতুর সম্মুখভাগ। তারপর গোধন বিতাড়ন করে নিয়ে চলল রসা নদীর সেতু লক্ষ করে। ইতিমধ্যে অশ্বটিকেও সে সুকৌশলে পার করে এনেছিল পশ্চিম পাহাড়ের এপারে। ধেনু চালনায় সক্ষম শিক্ষিত অশ্ব চালিয়ে নিয়ে চলল ধেনুকুলকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে। চাঁদ তখন পশ্চিম আকাশ থেকে নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে তুর্বসুর যাত্রাপথের দিকে।

।। পাঁচ ।।

ঋত্বিক হলেন ঋতু বিশারদ। সূর্যের দক্ষিণায়ন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্র-যজ্ঞ শুরু হয়ে যায়। বর্ষা সমাগমের জন্য এ যজ্ঞের অনুষ্ঠান।

শশ্বতী যখন বালিকা তখন থেকেই সে ভালবাসে ইন্দ্র-যজ্ঞ দেখতে। এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান বরাবর হয়ে আসছে সরস্বতী তীরে। সব থেকে সমারোহপূর্ণ এ যজ্ঞ। কৃষি ক্ষেত্রে এ যজ্ঞের ফলে আকাশ থেকে আশীর্বাদের মতো ঝরে পড়বে জলধারা। শস্যে পূর্ণ হবে ধরিত্রী।

জনসমাগমে যজ্ঞক্ষেত্র বিশাল তরঙ্গ-সংক্ষুব্ধ সমুদ্রের রূপ নেয়। যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত ব্রহ্মা। সেই ব্রহ্মার আসন গ্রহণ করেন ঋষি চয়মান। তিনি ত্রিবেদজ্ঞ, তাই তাঁর এ সম্মান। ঋগবেদীয় পুরোহিত হোতা। তিনি ঋক্ মন্ত্র পাঠ করে আহ্বান করেন যজ্ঞের দেবতাকে। সামবেদজ্ঞ পুরোহিত উদ্গাতা। তিনি সাম গান গেয়ে স্তুতি করেন দেবতার। যজুর্বেদবিৎ অধ্বর্যুর ওপর ভার থাকে যজ্ঞের সকল কর্ম সম্পাদনের।

মহা সমারোহে ইন্দ্র-যজ্ঞ শুরু হয়েছে সরস্বতী তীরে। যজ্ঞের হবি গন্ধ ভারী করে তুলেছে বাতাস। রাজা দিবোদাস সপারিষদ যজ্ঞস্থানে বসে যজ্ঞের ক্রিয়াকলাপ দর্শন করছেন। রাজগৃহ থেকে প্রয়োজনীয় স্বর্ণ রৌপ্যের তৈজসপত্র নিজে বহন করে আনছে শশ্বতী। পবিত্র সুন্দর ঊষার মতো মূর্তি নিয়ে রাজদুহিতা শশ্বতী বিচরণ করছে যজ্ঞস্থলে। তার সমস্ত অন্তর শক্তিমান ইন্দ্রের প্রার্থনায় পূর্ণ। সকল স্তবের শেষে সে যোগ করছে আর একটি প্রার্থনা, হে ইন্দ্র, তুমি তোমার শক্তি সঞ্চারিত কর তুর্বসুর দেহে। সে যেন তোমার মতো ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারে পণিদের অবরোধ।

ঋষি চয়মান ব্রহ্মার আসনে বসে আছেন। তাঁর সামনে আসা যাওয়া করছে শশ্বতী। ঋষির দৃষ্টি বার বার আকৃষ্ট হচ্ছে এই কান্তিময়ী কন্যাটির দিকে। একেবারে দিব্য ঊষার মূর্তি। জ্যোতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্যোতি, অপূর্ব জ্যোতির্ময়ী ঊষা। 'ইদং শ্রেষ্ঠং জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ।'

ঋষি চয়মান দেখেন, অদূরে পুত্র শুনক যজ্ঞ কাষ্ঠ বহন করে আনছে। ঋজু সুঠাম সুন্দর দেহ। মমতায়

মথিত হয় অন্তর। ঠিক যেন উদয় ভানু।

শশ্বতী এগিয়ে আসছে যজ্ঞের রৌপ্য পাত্র হাতে। তার পশ্চাতে অগ্নির জন্য সমিধ বহন করে আনছে শুনক।

... ...

ঋষি চয়মান ভাবছেন, 'সূর্যো দেবীমুষসং রোচমানাং মর্যো ন যোষামভ্যেতি পশ্চাৎ।' যুবক যেমন যুবতীকে অনুসরণ করে সূর্যদেবও তেমনি ঊষাকে অনুসরণ করেন।

ঋষি এবার উঠে দাঁড়িয়ে ইন্দ্রের স্তব শুরু করলেন। জনতা উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগল ইন্দ্রের মহিমা।

মেঘরূপী বৃত্র তার বিশাল দেহ দিয়ে আবৃত করে রেখেছিল আকাশ। সে জলকে করে রেখেছিল বন্দি। হে ইন্দ্র, তুমি সেই শক্তিময় বৃত্রের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলে। ঘন ঘন গর্জনে, বিদ্যুৎ শর বর্ষণে সে এক তাণ্ডব যুদ্ধলীলা।

বৃত্র তোমাকে উদ্যত হল আঘাত হানতে, অমনি তুমি অশ্বপুচ্ছের আকার ধারণ করে নিবারণ করলে সে আঘাত।

তারপর তুমি উত্তোলন করলে স্বয়ং ত্বষ্টা নির্মিত সহস্রক্ষুরধারযুক্ত হিরণ্ময় বজ্র। তোমার প্রচণ্ড আঘাতে বিদীর্ণ হল বৃত্র। তুমি নিম্নমুখী করে দিলে জলের সমুদ্রের ন্যায় মেঘসমূহকে। এখন মেঘরূপী বৃত্রের দ্বারা অবরুদ্ধ প্রাণদণ্ড ও বিনাশরহিত জল আকাশ থেকে বিতরিত হল সকল দিকে।

হে ইন্দ্র, নদী যেরূপ ভগ্ন কূলকে অতিক্রম করে যায় তেমনি মনোহর জলধারা পতিত বৃত্রদেহকে অতিক্রম করে গেল।

কয়েকটি দিন এমনি কেটে গেল আনন্দ উত্তেজনা আর স্তব প্রার্থনায়। যজ্ঞের শেষ দিন রাজা দাঁড়ালেন দাতার আসনে। ধেনু, হিরণ্য, কিঙ্কর কিঙ্করী দান গ্রহণ করতে লাগলেন পুরোহিত সম্প্রদায়।

অন্যান্য সকলের দান গ্রহণ শেষ হলে রাজা ঋষি চয়মানকে বললেন, পুরোহিত প্রধান, আদেশ করুন, আমি আপনাকে যৎকিঞ্চিৎ দান করে ধন্য হই।

ঋষি হেসে বললেন, আমি প্রার্থনা করব, তুমি পূর্ণ কর।

আদেশ করুন। সামর্থ্যের মধ্যে হলে অদেয় কিছুই থাকবে না।

আমি আমার পুত্র শুনকের জন্য তোমার কল্যাণীয়া কন্যারত্নটিকে প্রার্থনা করছি।

রাজা দিবোদাস সহর্ষে বললেন, এ তো আমার পরম সৌভাগ্য ঋষিবর। শশ্বতীর জননীরও একান্ত বাসনা ছিল কোনও ঋষির সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহ হয়। আপনার পুত্রকে কন্যা দান করে তাই আমি ধন্য আর গৌরবান্বিত হতে চাই। আপনি বিবাহের উপযুক্ত দিন স্থির করুন।

রাজা দিবোদাস অন্তঃপুরে এসে ক্রন্দনরতা কন্যাকে বললেন, মা, আমি ঋষি চয়মানের সঙ্গে বাক্যের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি। আমি এখন কী করে সত্যভ্রষ্ট হই। তাছাড়া তোমার পরলোকগতা জননীরও এই বাসনা ছিল। তিনি কোনও ঋষির করে চেয়েছিলেন কন্যা সমর্পণ করতে।

শশ্বতী চোখের জলের মাঝেও দৃঢ় হল। বলল, কিন্তু বাবা, মা তো শুধু ঋষিপুত্রের হাতে তাঁর কন্যা সমর্পণ করতে বলেননি, তিনি ঋষিকে কন্যা দান করতে বলেছিলেন।

ব্যাকুল দিবোদাস মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, এর অর্থ?

শাশ্বতী বলল, শুনক ঋষিপুত্র, কিন্তু তিনি এখনও তো ঋষি হতে পারেন নি। ঋক্ রচনা করতে পারলে তবে তিনি ঋষির মর্যাদা লাভ করবেন।

কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বসে থেকে আপন মনে কী যেন ভাবলেন দিবোদাস। একসময় বললেন, তুমি কি সুখী হতে পারনি মা এই বিবাহ-প্রস্তাবে? কিন্তু কেনই বা তোমার এ কান্না? ঋষি চয়মান বেদজ্ঞ এবং সংসার জীবনে বিশেষভাবে সম্পন্ন ও সম্মানিত। তাঁর একমাত্র পুত্র শুনক। সুন্দর সুঠাম দেহধারী যুবক। শুনেছি পরম বিদ্বান। দেখেছি, অশ্বচালনা, শরসন্ধান, রথ চালনা প্রতিযোগিতায় শুনকের কৃতিত্ব। এসব গুণ তো একটি যুবকের ক্ষেত্রে দুর্লভ মা।

শশ্বতী বলল, আমি তোমাকে আমার মনের কথা বুঝিয়ে বলতে পারব না বাবা। তবে তুমি যখন কথা দিয়েছ তখন সে কথার মর্যাদা নিশ্চয়ই রাখব আমি। তুমি বিবাহের আয়োজন কর। আর যত সত্বর এ কাজ সম্পন্ন হয় তার ব্যবস্থা কর।

রাজা দিবোদাস মেয়ের কাছ থেকে উঠে গেলেন ভগ্ন হৃদয় নিয়ে। মাতৃহীন মেয়েটিকে তিনি মাতৃ-মমতায় লালনপালন করেছিলেন। সেই মেয়ের বিবাহপ্রস্তাবে অনাগ্রহ দেখে তিনি মনে মনে দারুণ বিচলিত হলেন। অন্তঃপুরের থেকে বেরিয়ে এসে তিনি চললেন ঋষি চয়মানের কাছে।

ঋষি চয়মান রাজাকে দেখে আপ্যায়ন করলেন। সহাস্যে বললেন, দিন স্থির হয়েছে। কুনক্ষত্রের প্রভাবে সামনের কটি দিন অশুভরূপে চিহ্নিত। 'অমাবস্যা' অতিক্রান্ত হলে শুক্লপক্ষে'র সঙ্গে যুক্ত হবেন 'রাকা'। দেবী রাকা ধনদাত্রী ও শোভন শ্রীসম্পন্না। নক্ষত্রদর্শ বলেছেন, সামনের শুক্লপক্ষে নক্ষত্র দোষ নেই। সুতরাং সর্ব শুভ। তুমি কন্যা সমর্পণের জন্য প্রস্তুত হও।

রাজা দিবোদাস অতি সংকোচের সঙ্গে বললেন, একটি নিবেদন আছে প্রভু। অভয় পেলে ব্যক্ত করি।

বল। অসংকোচে।

রাজা বললেন, কল্যাণীয় শুনকের সঙ্গে আমার কন্যার বিবাহ প্রস্তাব স্থির হয়ে গেছে, এর কোনও পরিবর্তন নেই। কিন্তু প্রভু, মহারানী সরণ্যু মৃত্যুর আগে একটি ইচ্ছা প্রকাশ করে যান। তিনি বলেছিলেন ঋক্ রচয়িতা ঋষির হাতে কন্যা সমর্পণ করবেন। কল্যাণীয় শুনক কি ঋক্ রচনায় সক্ষম?

ঋষি চয়মান বললেন, এখনও নয় দিবোদাস। তবে সে বিদ্বান, ঋষিকুলে জন্ম। তার পক্ষে ঋক্ রচনা হয়ত অসম্ভব নয়। তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের কিছুকাল প্রতীক্ষা করতে হতে পারে।

রাজা বললেন, আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। যদি আমার কন্যা অনূঢ়া থাকে সারা জীবন তাতেও আমি কোন দুঃখ পাব না কিন্তু বিবাহ হলে ঋষি চয়মানের পুত্রের সঙ্গেই তার পরিণয় হবে।

ঋষি চয়মান বললেন, এত বিচলিত হচ্ছ কেন দিবোদাস। এর সমাধান কালের হাতে ছেড়ে দাও। শুভযোগ অচিরেই এসে যাবে। ঋক্ রচনার জন্য চাই ধ্যান আর প্রেরণা। শুনক এখন নবজীবনে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত হয়েছে। সুতরাং তার অন্তরে এখন বাসা বেঁধেছে নতুন প্রেরণা। শুধু ধ্যান চাই। প্রেরণার সঙ্গে ধ্যান এসে যুক্ত হলেই কবিত্বের স্ফূরণ ঘটবে। তখন আপনি কণ্ঠ থেকে ঋক্ উচ্চারিত হবে।

রথ চালিয়ে শুনক ফিরছিল বন্ধু হরিতের গৃহ থেকে। ইন্দ্র-যজ্ঞের পর সে যখন শুনতে পেল শশ্বতী আসছে তার গৃহলক্ষ্মী হয়ে তখন অকথিত এক আনন্দের শিহরণ খেলে গেল তার মনের মধ্যে। সে সঙ্গে সঙ্গে পিতার আদেশ নিয়ে চলে গেল বন্ধু হরিতের গৃহে। এসময় বন্ধু-সান্নিধ্য বিশেষভাবে কাম্য। মনের রুদ্ধ ভাবাবেগ ও স্বপ্ন-কল্পনা প্রকাশের একমাত্র ক্ষেত্র বন্ধু। তুর্বসু কাছে নেই, সুতরাং হরিতের গৃহে বন্ধু-সঙ্গ করার জন্য শুনককে কাটাতে হল কয়েকটি দিন। সেখানে দু'বন্ধুতে চলল শুধু শশ্বতীর কথা। নতুন জীবনের রঙিন স্বপ্ন দিয়ে রচনা করতে লাগল আশ্চর্য সব আলেখ্য।

ফিরে আসছিল শুনক। তার হৃদয় এখন শশ্বতীর ভাবনায় ভরা। প্রতিটি নিশ্বাসের সঙ্গে সে অনুভব করছিল চন্দনচর্চিত নববধূর অঙ্গের ঘ্রাণ।

পথ এখনও অনেক বাকি। শুনকের রথ ঘর্ঘর শব্দে চলেছে নির্জন পথের নীরবতাকে ভঙ্গ করে। আত্মচিন্তায় মগ্ন শুনক বুঝতে পারেনি কখন পশ্চিম আকাশে সূর্য ঢলে পড়েছে। শুধু তাই নয়, একটা কালো মেঘ পাহাড়ের ওপর থেকে একটা বিশালদেহ কৃষ্ণ বিহঙ্গের মতো উড়ে আসছে।

প্রবল ঝড়ের হাওয়া বয়ে গেল সামনের অরণ্যের ওপর দিয়ে। হঠাৎ শাখাবাহু মেলে উড়ন্ত সবুজ পত্র রচিত পরিচ্ছদ সামলাবার চেষ্টা করতে লাগল বৃক্ষগুলি। বায়ু তার ঝড়ের হাত মেলে যেন বিবস্ত্র করতে চাইছিল অরণ্য কন্যাদের।

রথের রজ্জু আকর্ষণ করে অশ্বকে থামাল শুনক। সে একটি বিশাল বৃক্ষের তলদেশে দাঁড়িয়ে ঝড়ের রূপ দেখতে লাগল।

ধরিত্রী এতক্ষণ দেখছিল ঝড়ের বস্ত্রহরণ লীলা। শাখা ভঙ্গ করে পল্লব ছিন্ন করে ঝড়ের সে কী তাণ্ডব-বিহার। এখন ধরাতলশায়ী ধূলিকে পাঠাল ধরিত্রী আপন কন্যাদের লোকচক্ষুর আড়ালে আবৃত করে রাখার জন্য। ধূলি উড়ল চতুর্দিকে । আবৃত হয়ে গেল চরাচর। অরণ্য বৃক্ষগুলি ঢাকা পড়ল দৃষ্টির অন্তরালে।

আকাশ থেকে ধরিত্রীর এই কৌশলটি দেখে গর্জে উঠলেন মরুৎগণ। তাঁরা তখন সারা আকাশে সমবেত হয়েছেন যুদ্ধ সজ্জায় সেজে। মেঘের দুন্দুভি প্রবল বেগে বেজে উঠল। ঝড়ের অশ্বে আরোহণ করে বিদ্যুতের কশাঘাতে সারা আকাশ বিদীর্ণ করতে করতে তাঁরা ছুটে আসতে লাগলেন ধরিত্রীর অভিমুখে। অজস্র শর বৃষ্টি রূপে বর্ষিত হতে লাগল ধরিত্রীর উপর। ধূলি আবরণ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। ছিন্নবাস নগ্ন বৃক্ষরাজি অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে স্নান করতে লাগল মরুৎগণ প্রেরিত জলধারায়।

একটা ধ্যানের দৃষ্টিতে এতক্ষণ প্রকৃতির এই লীলার ভাবরূপটি দেখছিল শুনক। হঠাৎ তার অন্তর মথিত করে একটা প্রেরণার আলোড়ন সৃষ্টি হল। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ দিয়ে অনর্গল উচ্চারিত হতে লাগল ঋক্। সৃষ্টি হল মরুৎ সুক্ত। রচিত হল 'দ্যাবা পৃথিবী'র আশ্চর্য সব স্তব। শুনক সেই স্তবগুলি উচ্চারণ করতে করতে গৃহের দিকে রথ চালাল। গৃহে পৌঁছতেই ঋষি চয়মান পুত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তাঁর অভিজ্ঞ চোখ বুঝতে পারল পুত্রের রূপান্তর। তিনি শুনককে প্রশ্ন করে জানতে পারলেন সে ইতিমধ্যে কয়েকটি ঋকের জন্ম দিয়ে ঋষিপদে উন্নীত হয়েছে। চয়মান কাল বিলম্ব না করে রাজা দিবোদাসের কাছে সংবাদ পাঠালেন।

সমারোহে শেষ হল রাজগৃহের বিবাহ-উৎসব। সারাক্ষণ শশ্বতী যেন নির্বাক এক বন-বিটপী। অতি অস্ফুটে সে উচ্চারণ করে গেল বিবাহের মন্ত্র। সমস্ত অনুষ্ঠানগুলি সে সম্পন্ন করে গেল নিষ্প্রাণ কর্তব্যের তাগিদে।

বিবাহের চতুর্থ রাত্রে বর এল বধূ সমাগমে! দীপের শিখা কম্পিত হচ্ছিল গৃহকোণে। শশ্বতীর দেহও সেই কম্পিত শিখার মতো থর থর করে কাঁপছিল। শুনক গৃহের দ্বার রুদ্ধ করে নতমুখী শশ্বতীর দিকে একবার চেয়ে দেখল। এ যেন সমীর চঞ্চল অর্ধ বিকশিত কমলিকা। শুনক গৃহকোণে গিয়ে ফুৎকারে নির্বাপিত করল প্রদীপ। কিন্তু বাতায়ন পথে প্রবেশ করল জ্যোৎস্নার আলো।

শশ্বতী শয্যার পাশে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। শুনক ধীরে ধীরে তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। চতুর্থ নিশীথে সহবাসের পূর্বে নির্ধারিত একটি অনুষ্ঠান আছে। শুনক শশ্বতীর হাত নিজের হাতের মধ্যে গ্রহণ করল। আশ্চর্য শীতল দুটি হাত। শুনক উচ্চারণ করল, 'আমাদের আত্মা মিলিত হোক্। মিলিত হোক্ আমাদের হৃদয়। আমাদের নাভি ও দেহ মিলিত হোক্। আমাদের বন্ধন হোক্ অবিচ্ছেদ্য।'

এরপর প্রথানুযায়ী শশ্বতীর কোমল মসৃণ মুখখানি হাতের পাতায় তুলে ধরল শুনক। পলকহীন চোখে শুনকের দিতে চেয়ে আছে শশ্বতী। এ যেন রক্তমাংসে গড়া কোনও নারী নয়, একখণ্ড অতি শীতল পাষাণ।

শুনক ভাবল, সূর্যের উত্তাপের স্পর্শ না লাগলে তুষারের ঘুম ভাঙবে কী? তাই শুনক শশ্বতীর স্থির মুখখানিতে চুম্বন চিহ্ন এঁকে দিয়ে প্রথামত বলল, 'মধু, মধু, এই তো মধু। মধুর বাণী আমার জিহ্বায়। মুখে আমার মধু মক্ষিকার মধু।'

সারা 'অনব' জনপদ যেন ভেঙে পড়েছে রাজপ্রাসাদের সম্মুখে। তুর্বসু ফিরিয়ে এনেছে তাদের সম্মান। রাজা দিবোদাস তুর্বসুর সম্বর্ধনার জন্য সভা আহ্বান করেছেন। সুসজ্জিত হয়েছে রাজপ্রাসাদের সম্মুখভাগ। তৈরি হয়েছে তোরণ। বাজছে তুরী, ভেরী, দুন্দুভি। তূণবম্ম বাজাচ্ছে তূণব। শঙ্খে ফুৎকার দিচ্ছে শঙ্খধ্বনি। পথের দুদিকে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে গজারোহী, অশ্বারোহী, রথী আর পত্তি সৈন্যের দল। প্রাসাদ সংলগ্ন প্রান্তরে সুসজ্জিত মণ্ডপের তলায় বসে রয়েছেন অমাত্যদের সঙ্গে নিয়ে রাজা দিবোদাস। ঋষি চয়মান রাজার পাশে অন্য একখানি আসনে উপবেশন করেছেন। তিনি আশীর্বাদ করবেন সম্বর্ধনা প্রাপ্ত ব্যক্তিদের।

প্রথমে রাজা আহ্বান করলেন প্রধান সেনাপতিকে।

বয়সোচিত গাম্ভীর্য আর প্রধানের পদমর্যাদা নিয়ে এগিয়ে এলেন প্রধান সেনাপতি। নত হয়ে সভাস্থ

প্রবীণদের নমস্কার করলেন।

রাজা ঘোষণা করলেন, সেনাপতি প্রধানের এতদিনের সেবায় আমাদের অনব জনপদ আজ বহু মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই আজ এই সভায় আমি তাঁকে রাজ অমাত্য পদ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

সভায় উল্লাস ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে ঋষি চয়মান সেনাপতি প্রধানকে চন্দন ও পুষ্পে আশীর্বাদ করলেন। অতঃপর রাজা দিবোদাস অমাত্যদের ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট একটি রৌপ্য নির্মিত ন্যায়দণ্ড প্রধান অমাত্যের হাতে এগিয়ে দিলেন। প্রধান অমাত্য আবার সেটি নিয়ম অনুযায়ী প্রধান সেনাপতির হাতে তুলে দিয়ে তাঁকে অন্যতম অমাত্যের পদে বরণ করলেন।

এরপর রাজা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আজ আমাদের বিশেষ আনন্দের দিন। আমাদের তরুণ সেনাপতি তুর্বসু সমস্ত 'অনব' জনের হৃত সম্মান ফিরিয়ে এনেছেন। তিনি দুর্গম পণিরাজ্যে প্রবেশ করেছেন। সেখান থেকে এনেছেন ঋষি চয়মানের অপহৃত গোধন। আমরা জানি, একমাত্র বজ্রহস্ত ইন্দ্র অতীতে সরমা নামক কুক্কুরীর সহায়তায় প্রবেশ করেছিলেন দুর্ভেদ্য পণিরাজ্যে। আর একালে একমাত্র তুর্বসু সেই অসাধ্য সাধন করেছেন। আপনাদের অতিপ্রিয় সেই তুর্বসুকে আপনারা আশৈশব দেখে এসেছেন। প্রতিটি প্রতিযোগিতায় তাঁকে আপনারা দেখেছেন শীর্ষস্থানে। আমি তাঁকে একদিন অন্যতম সেনাপতির পদে বরণ করেছিলাম। আজ সেই তরুণ বীরকে আমি 'অনব' রাজ্যের প্রধান সেনাপতি পদে বরণ করতে চাই। আমি আমাদের এই সুবাস্তু জনপদের সম্মান রক্ষার নিমিত্ত তুর্বসুকে প্রধান সেনাপতির পদ গ্রহণের জন্যে আহ্বান জানাচ্ছি।

সরস্বতী তীরের জনতা আনন্দে যেন উদ্বেলিত হয়ে উঠল। তারা উল্লাসে ক্রমাগত জয়ধ্বনি দিতে লাগল।

রাজা আবার একটি ঘোষণা করলেন, আমি মনে করি তুর্বসুর প্রধান সেনাপতির পদ গ্রহণের ফলে তাঁর পূর্বের যে পদটি শূন্য হল তাতে তাঁর বন্ধু কল্যাণীয় শুনককে গ্রহণ করা যেতে পারে। তিনি আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, তাই এক্ষেত্রে আপনাদের সকলের অনুমতি প্রয়োজন।

জনতা আবার উল্লাস প্রকাশ করে তাদের আন্তরিক সমর্থন ঘোষণা করল।

এবার হাতে হাত রেখে এগিয়ে এল দু বন্ধু। নত হয়ে দুজনেই নমস্কার করল সভাকে। ঋষি তাঁদের উভয়কে আশীর্বাদ জানালেন। রাজা দিবোদাস প্রথমে শ্যাম-অয়স নির্মিত 'হেতি' উপহার দিলেন প্রধান সেনাপতি তুর্বসুকে। তারপর একখানি শ্যাম-অসি তুর্বসুর হাত দিয়ে দিলেন জামাতা শুনককে।

দু বন্ধু রাজাকে প্রণাম জানিয়ে পরস্পর আলিঙ্গনে আবদ্ধ হল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে প্রাসাদের উর্ধ্বতলের বাতায়ন থেকে অজস্র পুষ্প বর্ষিত হতে লাগল দু বন্ধুর দেহে। সঙ্গে সঙ্গে উর্ধ্বে তাকাল তুর্বসু। সে দেখল শশ্বতীকে বাতায়ন থেকে গৃহাভ্যন্তরে সরে যেতে। সেই মুহূর্তে তুর্বসুর বুকখানা যেন বিদীর্ণ হয়ে গেল। সে প্রত্যাবর্তনের পর শুনেছিল শশ্বতী আর শুনকের পরিণয় সংবাদ! ব্যথায় জর্জরিত হয়েছিল তার হৃদয়। নিশীথে শয্যা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে যেন সারা দেহের রক্ত বুকের কোনও ছিদ্রপথ দিয়ে চুইয়ে চুইয়ে পড়েছিল। সেই অকথিত বেদনাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে তুর্বসু দিনমানে হেসে কথা বলেছিল শুনকের সঙ্গে। শুনতে বাধ্য হয়েছিল, বন্ধুর সোচ্ছ্বাস পরিণীত জীবনের কাহিনী। তবু সে নিজেকে স্থির রেখেছিল এই অনুষ্ঠান লগ্ন পর্যন্ত। কিন্তু শশ্বতীকে চোখে দেখার পর সে নিজেকে যেন আর স্থির রাখতে পারল না। ভেঙে পড়ল শুনকের বুকের ওপর। সকলে ভাবল, এ হল তুর্বসুর গভীর বন্ধুত্বের আলিঙ্গন।

রাজা দিবোদাস এরপর দু বন্ধুকে দুটি পৃথক আসনে বসালেন! তারপর ঘোষণা করলেন একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত।

তিনি বললেন, দক্ষিণ দেশে দস্যুরাজ কবষ সীমাহীন ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে চলেছে। তাদের সৈন্যরা বার বার আমাদের রাজ্যের সীমা লঙঘন করছে। এ অবস্থায় আমি মনে করি সেনাপতি শুনক রাজা কবষের স্বেচ্ছাচারিতার উপযুক্ত জবাব দিয়ে আসুক। আর অন্যদিকে আমি মনে করি আমাদের নতুন প্রধান সেনাপতি আমাদের 'অণব' জনের জন্য নতুন সম্মান বহন করে আনবেন। আমরা আরও পূর্বদিকে

আমাদের অভিযান চালাতে চাই। শুনেছি গঙ্গা নামে এক নদী আছে। তার কূলে রয়েছে দস্যুদলের সমৃদ্ধ সব জনপদ। তুর্বসু সৈন্যবাহিনী নিয়ে যাত্রা করুন সেই দিকে। তাঁর সুযোগ্য পবিচালনায় পূর্বদেশেব জনপদ সুবাস্তুর কাছে নতি স্বীকার করুক।

প্রবল উল্লাস আর জয়ধ্বনিতে প্রকম্পিত হতে লাগল সরস্বতী তীরের আকাশ বাতাস। তুর্বসু আর শুনক মাথা পেতে রাজাদেশ গ্রহণ করল। প্রতিশ্রুতি দিল, এ আদেশ তারা পালন করবে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে।

।। ছয় ।।

দীর্ঘ দু বছর অতিবাহিত হল। পূর্ব দেশের রাজাদের একে একে পরাজিত করে অগ্রসর হতে লাগল তুর্বসু। এ যেন এক ক্লান্তিহীন রণ অভিযান। সংগ্রামের ভেতর লিপ্ত থেকে জীবনের সান্ত্বনা খুঁজে পাবার চেষ্টা । শত্রুর সৈন্যবাহিনী, দুর্ভেদ্য দুর্গ, সবকিছু চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল তুর্বসুর বিদ্যুৎ বাহিনীর আক্রমণে। অকুতোভয় সংগ্রামী যুবক তুর্বসু। মুহূর্তে অশ্ব নিয়ে ভেদ করে চলে যেতে জানে ব্যূহ।

হস্তী আর পদাতিক সৈন্যের বিপুল বহর নিয়ে যখন শত্রু সৈন্য অগ্রসর হতে থাকে, তখন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিধর তুর্বসু তাদের অগ্রসর হবার সুযোগ দান করে। সে নিজের সৈন্যবাহিনীকে পশ্চাদ অপসরণের আদেশ দেয়। তারপর সহসা একসময় ফিরে দাঁড়ায়। ইতিমধ্যে তার দেখা হয়ে যায় শত্রুর দুর্বল অংশটি। সে তখন ঝটিকার গতি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওই অংশে। অশ্বেরা হস্তী দর্শনে ভীত হয়ে অনেক সময় উচ্চরব তোলে, কিন্তু নিম্নমুখী নদীর মতো বার বার ব্যূহ ভেদ করার জন্য তারা প্রধাবিত হয়।

পক্ষ-বিশিষ্ট তীক্ষ্ণাগ্র দীপ্ত বাণে আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে যায়। তুর্বসুর নির্ভীক সৈন্যেরা আক্রমণ করে সংঘবদ্ধভাবে। তারা দুর্বার গতিতে এগিয়ে গিয়ে যখন শত্রুপক্ষের দুর্বল অংশ ছিন্নভিন্ন করে দেয় তখন তাদের তুরী, ভেরী, দুন্দুভি নিনাদে চতুর্দিকে ত্রাসের সৃষ্টি হয়। শত্রু সৈন্যেরা পলায়ণ করতে থাকে প্রাণভয়ে। তুর্বসুর সৈন্যেরা তাদের ছত্রভঙ্গ করে বিতাড়িত করে। যাতে তারা পুনরায় দুর্গের দিকে যেতে না পারে সে জন্য তুর্বসুর অশ্বারোহীরা আগেই দুর্গমুখে সংঘবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়।

শত্রুপক্ষের ছত্রভঙ্গ সৈন্যেরা দুর্গ-প্রবেশের সুযোগ না পাওয়ায় নতুন আক্রমণ রচনা তাদের দ্বারা সম্ভব হয় না। তখন অবরুদ্ধ দুর্গ জয় করা সহজসাধ্য হয়ে পড়ে।

গঙ্গার কূলে কিকট দেশ। নদীর বিশাল বিস্তার এখানে। দাসরাজ থাকেন প্রস্তর নির্মিত দুর্গগৃহে। সহস্রাধিক হস্তী দাসরাজের সম্পদ। নদী এখানে বাঁক নিয়েছে পরশুর ফলার মতো। নদী অতিক্রম না করলে প্রাসাদ আক্রমণ সম্ভব নয়। কিন্তু খরস্রোতা না হলেও এই বিশাল নদী অতিক্রম করে ওপারে যাবার চেষ্টা করলেই শত্রুপক্ষের তীব্র বাধার সম্মুখীন হতে হবে। তাই এত দূর পথ বিজয় যাত্রা করে এসেও কিকট দেশের মুখোমুখি স্থির হয়ে দাঁড়াতে হল তরুণ সেনাপতি তুর্বসুকে। দুর্বার গতিই তুর্বসুর শ্রেষ্ঠ যুদ্ধকৌশল। কিন্তু স্থির বুদ্ধি তার সফলতার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। তাই চঞ্চল না হয়ে তুর্বসু সৈন্যবাহিনী নিয়ে নদীর এপারে অপেক্ষা করতে লাগল।

তুর্বসু পর্যবেক্ষণ করে দেখল, রাজ্যের শস্যভাণ্ডার এপারে। কৃষিজীবীদের ঘন বসতি এ অঞ্চলে। রাজপ্রাসাদ আর সৈন্যবাহিনীর সারা বছরের শস্য একটি বৃহৎ গোলাকার প্রস্তর নির্মিত গৃহের মধ্যে রক্ষিত। প্রথমে তুর্বসু স্বল্পায়াসে বৃহৎ শস্যভাণ্ডারের অধিকার কেড়ে নিল। কিন্তু সাধারণ মানুষদের কাছে প্রচার করে দিল, তারা প্রয়োজন হলে রাজভাণ্ডার থেকে প্রয়োজনীয় শস্য নিতে পারে।

এই প্রচারে কাজ হল। সাধারণ মানুষ চিরদিনই দারিদ্রপীড়িত। নিতান্ত দুর্ভিক্ষ ছাড়া তারা রাজার শস্যভাণ্ডার থেকে কোনদিনই সাহায্য পায় না। তাই তুর্বসুর এ ঘোষণায় তারা এই বিদেশি সৈন্যবাহিনীকে সন্দেহের চোখে না দেখে মনে মনে সাধুবাদ দিতে লাগল। তুর্বসু এইভাবে জয় করে নিল সাধারণ মানুষের মন। তাছাড়া সৈন্যবাহিনীর ওপর কঠিন নির্দেশ ছিল তুর্বসুর। বিজিত দেশের সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার করা চলবে না। নারীদের সম্মান রক্ষা করতে হবে।

কিকট দেশের সাধারণ মানুষ যখন দেখল তারা পরদেশিদের কাছ থেকে ঘরের সম্মান বজায় রাখতে পারছে তখন তারা তুর্বসুর ভক্ত হয়ে উঠল। এই সুযোগটুকু গ্রহণ করল তুর্বসু। সে তাদের কাছ থেকে জেনে নিল ওপারের দুর্গের অবস্থান আর গুপ্ত কিছু পথের কথা। সাধারণ স্থপতি, যারা এপার থেকে যায় দুর্গ সংস্কারের কাজ করতে তারাই প্রধানত দিল গুপ্ত পথের সংবাদ। তুর্বসু আরও জানতে পারল প্রাসাদের প্রায় চতুর্দিক জল দ্বারা বেষ্টিত। সামনে গঙ্গা, তারপরে প্রস্তর-প্রাসাদ, আর ঠিক তার পরেই নিচু অগভীর জলা জায়গা।

তুর্বসু যত পূর্বদিকে অগ্রসর হয়েছে ততই সে দেখেছে ভূমিভাগ অত্যন্ত নিচু। ফলে নদীর জল ও বর্ষার জলধারা প্লাবিত করে দেয় সেই নিম্নভূমি। গ্রীষ্মের খর রৌদ্রে জলতল নেমে গেলে কূর্মপৃষ্ঠের মতো জেগে ওঠে স্থলভাগ। আবার বর্ষা শুরুর সঙ্গে সঙ্গে নদীর জল ফুলে ওঠে। তখন ভাসিয়ে দেয় দুটি কূল। জেগে ওঠা স্থলভাগের অতি অল্পই নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে, আর সব চলে যায় জলের তলায়।

এখন গ্রীষ্মকাল। তাই কিকট দেশের মানুষেরা ঘর বেঁধেছে জলের উপর। তারপর বর্ষা নামলে কাঠ বাঁশ দিয়ে তারা সে ঘরকে উঁচু করে নেবে। তখন ছোট ছোট নৌকায় ঘুরে বেড়াবে তারা। উঁচু ডাঙা চষবে। তাতে ফসল ফলাবে। আর মাছ শিকার করবে।

তুর্বসু জানতে পারল নদীকূল ধরে যোজন খানিক পথ পশ্চিমে উজিয়ে গিয়ে ওপারে যেতে পারলে একটা খাল দেখতে পাওয়া যাবে। ওই খাল গঙ্গা আর রাজপ্রাসাদের সঙ্গে যুক্ত। খালটা একটা পাথর বাঁধান তোরণের ভিতর দিয়ে একেবারে জেনানা মহলে প্রবেশ করেছে। ঐ তোরণের কাছে গাছ গাছালির জটিল জটলা। বিশেষ করে একটি বটবৃক্ষ তার জটাজাল নামিয়ে স্থানটিকে আবৃত করে রেখেছে। রাজা জ্যোৎস্না রাতে নৌকায় তাঁর রমণীদের নিয়ে ওই পথে গঙ্গায় বিহার করতে যান। ওই খালের কিংবা ওই অঞ্চলের গঙ্গার দু'দিকে কোনও জনবসতির চিহ্ন মাত্র নেই।

নিঃশব্দে তুর্বসু একটি নিপুণ তক্ষার দল পাঠিয়ে দিল গঙ্গার ওই অঞ্চলে। তারা সবার অলক্ষ্যে তৈরি করল কয়েকটি পারাপারের নৌকা। সেই নৌকাগুলি রাখা হল, গঙ্গার খাড়ির আড়ালে।

যখন সকল আয়োজন সম্পূর্ণ হল তখন তুর্বসু দক্ষ দুইশত সৈন্য সঙ্গে নিয়ে রাতের অন্ধকারে নৌকায় নদী পার হয়ে ঢুকল খালের মধ্যে। অতি ক্ষীণ জ্যোৎস্নায় তারা খালের পথ অতিক্রম করে প্রাসাদ তোরণের কাছে এসে পৌঁছল। জটিল বৃক্ষের জটাজালের ভিতর তারা প্রচ্ছন্ন রইল কিছু সময়। এখন তাদের পথ প্রদর্শক কিকট দেশিয় এক স্থপতি। এই স্থপতি দুর্গের অন্ধিসন্ধির সকল পথই জানে। কারণ সে তার দলবল নিয়ে দুর্গ মেরামতের কাজ করেছে বহুদিন। স্থপতি কিকটরাজের উপর ভীষণ ক্ষুব্ধ। কারণ পুরো পাঁচটি বছর সে সংস্কারের কাজ করেছে কিন্তু একটি দিনের জন্যও তাকে দুর্গের বাইরে বেরিয়ে আসতে দেওয়া হয়নি। সে ঘরে ফিরে গিয়ে দেখেছে তার স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। তার একমাত্র পুত্র প্রতিপালিত হচ্ছে দুঃখী ভিখারীর ঘরে। তাই সে আজ পথ প্রদর্শক হয়ে এসেছে প্রতিশোধ নিতে।

ওরা অতি সন্তর্পণে প্রাসাদের গুপ্ত সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল জেনানা মহলের সামনে। এ অংশে প্রহরার ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। বেত্র হাতে বসে রয়েছে দৌবারিক। স্তিমিত দীপালোকে সে বসে বসেই নিদ্রা যাচ্ছে।

তাকে জাগরিত করা মাত্রই সে তুর্বসুর সুসজ্জিত সৈন্যদের দেখে শঙ্কায় বাকরুদ্ধ হয়ে গেল।

তাকে অভয় দিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই জানা গেল, মহারাজ এই জেনানা মহলেই আত্মগোপন করে আছেন। সামনে থেকে আক্রমণ ঘটলে তিনি এই গুপ্ত খাল পথেই পলায়ন করবেন।

অতর্কিতে তুর্বসুর সৈন্যেরা ঘিরে ফেলল জেনানা মহল। তারা দৌবারিককে দিয়ে ভিতরে সংবাদ পাঠাল রাজার কাছে। বিনা রক্তপাতে যদি রাজা আত্মসমর্পণ করেন তাহলে রাজার সঙ্গে একটা সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে বিবেচনা করা যেতে পারে। আর যদি তিনি যুদ্ধের জন্য প্রাসাদের সম্মুখে অবস্থিত সৈন্যদের কাছে কোনও সংকেত পাঠান, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে নিহত হতে হবে।

বেশ কিছু সময় পরে মহল থেকে দ্বারের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন কিকটরাজ। তাঁর দেহ কম্পিত হচ্ছিল।

শিথিল বসনা সুন্দরীরা তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ক্রন্দন করতে লাগল। তারা নতজানু হয়ে দলনেতা তুর্বসুর কাছে রাজার প্রাণভিক্ষা চাইতে লাগল।

ভোরবেলা গঙ্গার এপারে শস্যভাণ্ডারের সংলগ্ন প্রান্তরে কিকটরাজের আত্মসমর্পণের আয়োজন চলছিল। দফায় দফায় নৌকাতে করে অস্ত্রাগার থেকে আসছিল অস্ত্রশস্ত্র। স্তূপীকৃত হচ্ছিল সব। হাতী এল পঞ্চশত। এসব বিজয়ীর কাছে বিজিতের উপঢৌকন।

সবশেষে তুর্বসু বলল, কিকটরাজ, আজ আপনি নারীদের প্রার্থনার বিনিময়ে আপনার প্রাণ বাঁচালেন। আপনার মহিষীরা যদি আকুল হয়ে আপনার প্রাণের জন্য প্রার্থনা না জানাত, তাহলে আপনার ভাগ্যে এই মুহূর্তে কী ঘটত তা বলা কঠিন। সুতরাং আজ থেকে নারীদের সম্মান রক্ষার জন্য চেষ্টা করবেন। আপনার মহিষীরা যেমন সান্নিধ্য পাবার জন্য উৎসুক, অনুরূপভাবে মনে রাখবেন সাধারণ একটি মানুষের স্ত্রীও তার স্বামী-সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য কাতর। তাদের মানসিক অবস্থাও আপনি গভীর সহানুভূতির সঙ্গে বোঝার চেষ্টা করবেন।

একটু থেমে আবার বলল, আপনার রাষ্ট্র একটি দুগ্ধবতী গাভী। তার বৎস হচ্ছে প্রজাকুল। আপনি দোহনকারি। দুগ্ধে বৎসের অধিকার সবার আগে। তাকে বঞ্চিত করে আপনি সমস্ত দুগ্ধ দোহন বা পান করতে পারেন না। আপনার পার্শ্বে যে শস্যভাণ্ডার সেটি প্রজাদের প্রয়োজনের জন্য সর্বদা উন্মুক্ত রাখবেন। যে রাজ্যের প্রজারা তার দেশের রাজাকে ভালবাসে, সে দেশ শত্রুর দ্বারা সহজে বিজিত হয় না।

কিকটরাজ বললেন, আপনি বয়সে আমার চেয়ে অনেক তরুণ, কিন্তু অভিজ্ঞতা ও বিবেচনায় অনেক প্রবীণ। আপনার অমূল্য কথাগুলি আমি অক্ষরে অক্ষরে পালনের চেষ্টা করব।

তুর্বসু বলল, এ কথাগুলি আমাদের ঋষিরাই বলেছেন। এগুলি আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছি। আপনিও আচরণ করুন, অবশ্যই ফল পাবেন। আর জানবেন, আজ থেকে 'অনব'রা কিকটের মানুষদের সঙ্গে বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হল।

কিকটরাজ গভীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন তুর্বসুকে।

ফিরে চলল তুর্বসু সুবাস্তু নগরী অভিমুখে। দীর্ঘ দুটি বছর সৈন্যরা চালিয়ে গেছে বিজয় অভিযান। এখন তাদের গৃহগত প্রাণ। তাছাড়া প্রাচ্যভূমির দিকে আর অধিক দূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। যতদূর দেখা যায় অগভীর জলমগ্ন ভূমি। স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের মতো ভূমিখণ্ড। তুর্বসু বহুমূল্য রত্ন, দাস-দাসী আর প্রাচ্যদেশের সহস্রাধিক হস্তী নিয়ে যাত্রা করল নিজ দেশের উদ্দেশ্যে। রণবাদ্য বাজিয়ে, জয়ধ্বনি দিতে দিতে তারা চলল বিজিত দেশগুলি অতিক্রম করে। সখ্য বন্ধনে আবদ্ধ রাজারা তাদের সম্বর্ধনা জানাতে লাগল।

সুবাস্তু নগরী উল্লাসে মুখর। দীর্ঘ দুটি বছর পরে তাদের সবার প্রিয় তরুণ সেনাপতি তুর্বসু ফিরে এসেছে। 'অনব' জনেরা কখনও এতগুলি হস্তী একসঙ্গে দেখেনি। তারা প্রতিদিন হস্তী দর্শনে আসতে লাগল। আবালবৃদ্ধবণিতা। সে যেন এক বিশাল জনপ্রবাহ। অনিঃশেষ কৌতূহল, বিরামহীন দর্শনার্থীর ভিড়।

মহারাজ দিবোদাস তুর্বসুকে আলিঙ্গন করলেন। তিনি তাকে একান্তে ডেকে বললেন, তুমি সমস্ত সুবাস্তু নগরীর গর্বের বস্তু। তুমি আমার সন্তানের মত প্রিয়। আজ এই আনন্দের মুহূর্তে আমার হৃদয়ে যে বেদনার ভার চেপে আছে, তা তোমাকে না জানিয়ে পারছি না তুর্বসু।

বিস্ময়ে হতবাক তুর্বসু রাজার মুখের দিকে চেয়ে রইল। রাজাকে এমন বিহ্বল হয়ে কথা বলতে সে কোনও দিনই দেখেনি।

রাজা দিবোদাস বললেন, তোমার বন্ধু শুনক একই সঙ্গে যাত্রা করেছিল রাজা কবষের পুরী অধিকার করতে, কিন্তু দুর্ভাগ্য, সেখানে সে পরাজিত আর বন্দি হয়েছে। ছত্রভঙ্গ সৈন্যদের অনেকেই ফিরে এসেছে প্রাণ নিয়ে, আবার নিহতের সংখ্যাও নগণ্য নয়। কিন্তু শুনক আর তার রণনিপুণ চারজন সহযোদ্ধাকে রাজা কবষ বন্দি করে রেখেছে।

তুর্বসু বলল, আপনি নিশ্চিত যে ওরা এখনও ওখানে বন্দিজীবন যাপন করছে?

গুপ্তচর নিযুক্ত রেখেছি। তারাই কবষের রাজ্য থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে আনে। শুনকেরা নাকি রাজা কবষের পীড়া-যন্ত্র গৃহে আজও শাস্তি পাচ্ছে। তাদের কখনও অনলবেষ্টিত ঘরে রাখা হয়, আবার কখনও বা জলে আকণ্ঠ নিমগ্ন করে সপ্তাহকাল পর্যন্ত একইভাবে রেখে শাস্তি দেওয়া হয়।

একটু থেমে নিজের ভাবাবেগকে সংযত করে রাজা দিবোদাস বললেন, আমি নিজে কবষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করতে পারতাম, কিন্তু তাতে অরক্ষিত থাকত 'অনব' জনপদ। দ্রুহ্যবরা ওঁৎ পেতে বসে আছে। তারা আমার অনুপস্থিতির সুযোগ পুরোপুরি ব্যবহার করত। তুমি বহু দূরে তাই তোমাকে সংবাদ পাঠিয়ে রাজ্যে ফিরিয়ে আনার কোনও চেষ্টাই করিনি আমি।

তুর্বসু বলল, আপনি আদেশ করলে সসৈন্যে আমি কবষের রাজ্যে যুদ্ধযাত্রা করতে পারি।

রাজা সস্নেহে তুর্বসুর কাঁধে হাত রেখে বললেন, আমি জানি, তোমার বন্ধুর বন্দিদশার কথা শুনে তুমি বিচলিত হবে। তবে যেখানে দু'বছর অতিক্রান্ত হয়েছে সেখানে আরও ক'টি দিন অতিবাহিত হলে এমন কিছু ক্ষতি হবে না। তুমি সবে ফিরেছ, সৈন্যরাও ক্লান্ত। এ অবস্থায় কিছুদিন বিশ্রাম কর।

তুর্বসু বলল, আমি এই মুহূর্তে যুদ্ধে যেতে প্রস্তুত। কিন্তু সৈন্যদের বিশ্রামের যথার্থই প্রয়োজন। অবশ্য রাজধানীতে পূর্ব থেকে যে সকল সৈন্য রয়েছে তাদের নিয়েও অভিযান করা যেতে পারে।

রাজা বাধা দিয়ে বললেন, না তুর্বসু, তাতে পুরোপুরি সুফল পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। তোমার পরিচালনায় সৈন্যরা যেভাবে শিক্ষিত হয়ে উঠেছে তাতে তাদের সেইভাবে ব্যবহার করলে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে। তাছাড়া বিজয়ী সৈন্যরা বাড়তি মনোবলের অধিকারী হয়। একবার পরাজিত হয়ে ফিরে এসেছে যারা তাদের দলভুক্ত করলে শুভ ফল লাভ সম্ভব নাও হতে পারে।

তুর্বসু বলল, আপনার যেমন অভিরুচি। তবে আমি বন্ধু শুনকের জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন জানবেন। আমি আপনার আদেশের প্রতীক্ষায় রইলাম।

রাজা দিবোদাস বললেন, আমার কন্যা শশ্বতী এ দু'বছর আমার কাছেই রয়েছে। সম্প্রতি তার মাতামহ ঋষি অঙ্গিরস তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন তাঁর আশ্রমে। কিছুকাল আশ্রমের শান্ত পরিবেশে থাকলে হয়তো শশ্বতীর মানসিক যন্ত্রণার কিছু উপশম হতে পারে! তুমি যদি শশ্বতীর সঙ্গে ঋষি শ্রেষ্ঠ অঙ্গিরসের আশ্রমে কিছুকাল অতিবাহিত করে আসতে পার তাহলে তোমারও শ্রান্তি দূর হতে পারে।

তুর্বসু বলল, আপনি আদেশ করলে রাজকুমারী শশ্বতীকে আমি আশ্রমে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারি।

রাজা বললেন, তাই যাও। ইচ্ছে হলে থেকো কিছুকাল, না হলে ফিরে এস রাজধানীতে।

রথ চালিয়ে ঋষি অঙ্গিরসের আশ্রমের অভিমুখে চলেছে তুর্বসু। রথের ভিতর বসে আছে শশ্বতী। দীর্ঘ পথ। 'অনব' জনপদের পশ্চিম প্রান্তে ঋষি অঙ্গিরসের শান্তরসাম্পদ তপোবন। একই দিনে প্রাসাদ থেকে তপোবনে পৌঁছানো প্রায় অসম্ভব। কিছু দূর পর্যন্ত রাজপথ। প্রশস্ত, সুরক্ষিত, বৃক্ষশোভিত। তারপর একটি সংকীর্ণ পথ রাজবর্ত্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চলে গেছে। সে পথ স্থানে স্থানে ভগ্ন ও কঙ্করময়। ওই পথটি জনসাধারণের পরিত্যক্ত পথ। কঙ্করভূমি চলার পক্ষে বিশেষ সুখকর নয়। তাছাড়া রাজ্যের ওই পশ্চিম প্রান্ত পর্বতসঙ্কুল ও অহল্যা ভূমিতে পূর্ণ। কীনাশেরা কখনও এখানে হলকর্ষণে সক্ষম হয়নি। এ পথে কিছু দূর অতিক্রম করলে দেখা যাবে এক অরণ্যভূমি। সেখানে রাজা দিবোদাস একটি বন বিশ্রাম গৃহ তৈরি করে দিয়েছেন। ঋষি অঙ্গিরসের কন্যা সরণ্যুকে বিবাহের পর তিনি ওই বিশ্রাম গৃহটি নির্মাণ করেন। মহারানী পিতৃগৃহে যাত্রার সময় এই গৃহে অবস্থান করে শ্রান্তি দূর করতেন। পরদিন আবার যাত্রা করে দ্বিপ্রহরের পূর্বে পৌঁছতেন পিতা অঙ্গিরসের আশ্রমে।

দিনান্তের সঙ্গে সঙ্গে পথের ধারে বনগৃহে এসে পৌঁছল রথ। এখানেই নিশিযাপন করতে হবে। প্রাসাদ থেকে এখানে রাত্রিবাসের জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যই রথে করে নিয়ে আসা হয়েছে। কোনও কিছুর জন্য যাতে অসুবিধার সম্মুখীন হতে না হয়।

বিশ্রাম গৃহে রাত্রি নামল। বাইরে দুটি অশ্বের আহারের ব্যবস্থা করে রথের ভিতরেই উঠে বসল তুর্বসু।

সে বিশ্রাম-গৃহের বাইরেই নিশি যাপন করতে চায়। ওদিকে গৃহের অভ্যন্তরে উপবেশন আর শয্যার জন্য সবকিছু আয়োজন সম্পূর্ণ করে ফেলেছে শশ্বতী। দীপ জ্বলছে গৃহকোণে। সে আসন পেতে পাত্রে সাজিয়েছে যবের পুরোডাশ, স্বাদু ফল, পায়স আর মধু। অনেক সময় প্রতীক্ষা করেছে। কিন্তু যখন রাত ঘনাল অথচ বাইরে থেকে ঘরের ভিতর এল না তুর্বসু তখন শশ্বতীই বেরিয়ে এল বাইরে। রথের কাছে এগিয়ে এসে অনুমানে ডাক দিল, তুর্বসু।

এই প্রথম শশ্বতীর মুখে কথা উচ্চারিত হল। প্রাসাদ থেকে এতদূর পথযাত্রায় একটিবারও কথা হয়নি উভয়ের ভেতর।

তুর্বসু রথের ভিতর থেকেই উত্তর দিল, কিছু দরকার?

তোমার খাবার সাজিয়ে বসে রইলাম, খাবে না?

তুর্বসু বলল, এনেছ এখানে?

কেন, ভেতরে আসতে কী বারণ?

অগত্যা তুর্বসুকে রথের থেকে নেমে দাঁড়াতে হল। বলল, চল যাই।

সামনে দীপ হাতে চলেছে শশ্বতী, পিছনে তুর্বসু। দীপের শিখা বাইরের হাওয়ায় কাঁপছে। ছায়াগুলোও চঞ্চল।

ঘরের ভিতর আসনে এসে বসল তুর্বসু। খাবার খেতে লাগল অন্যমনে। একটু দূরে বসে তাকে দেখতে লাগল শশ্বতী। জানুতে মুখখানা গুঁজে স্থির দৃষ্টিতে চেয়েছিল সে। তুর্বসু দু'দুটো বছর বিরামহীন যুদ্ধ করে গেছে। কিন্তু এতটুকুও ক্লান্তির ছায়া ঘনায়নি তার মুখে। কেবল মুখের কোমল লাবণ্যটুকু মুছে গিয়ে একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছাপ পড়েছে।

খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। শশ্বতী বলল, আরও কিছু নাও। এখনও অনেক রয়েছে সংগ্রহে।

তুর্বসু বলল, অসম্ভব। এতেই অতিরিক্ত।

শশ্বতী বলল, এত অল্প খেয়ে এত বড় বড় যুদ্ধগুলো জয় করলে কী করে?

তুর্বসু হেসে বলল, যুদ্ধক্ষেত্রে কেউ যদি এমন করে পাশে বসে খাওয়াতো তাহলে যুদ্ধে আর জয়ের মুখ দেখতে হত না।

শশ্বতী বলল, কেন?

ভুরি ভোজের পরে আয়েসি হয়ে যায় মানুষ। তখন যুদ্ধের বদলে বিশ্রাম চায়।

খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। উঠে দাঁড়িয়ে তুর্বসু আচমন করে এল বাইরে থেকে। বলল, সত্যি, অনেকদিন পরে বড় তৃপ্তি করে খেলাম। এখন তুমি খাও, আমি রয়েছি বাইরে রথের ওপর। রাতেও কোন দরকার হলে আমাকে ডেকো, আমি তো পাশেই রইলাম।

শশ্বতীর চোখেমুখে বিস্ময়, সেকি! সারারাত পড়ে রইবে বাইরে, আর আমি ঘরের ভেতর আরাম করে ঘুমোব! অসম্ভব।

তুর্বসু হেসে বলল, তাহলে স্থান বদল করে নাও। আমি থাকি ভেতরে আর তুমি বাইরে।

বরং ভাল। দু'দুটো বছর যুদ্ধক্ষেত্রে তো বাইরে পড়েই কাটালে, এখন ক'দিন ঘরের ভেতরেই না হয় বিশ্রাম করলে।

একটু থেমে হঠাৎ প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে বলল শশ্বতী, তুমি কী এমনি করে সারা জীবন বাইরে কাটাবে তুর্বসু। সংসারী হবে না? ঘরের ভেতরের সুখ কী কোনদিনও পেতে চাইবে না?

গলাটা শশ্বতীর কান্নায় ভিজে উঠল।

ম্লান হেসে তুর্বসু বলল, সংসার তো তুমি করলে, সংসারের সুখ কি তুমি পেয়েছ?

শশ্বতী বলল, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বসই না।

তুর্বসু বসল। শশ্বতীও বসল একটু দূরে। তুর্বসুর কথার সূত্র ধরে বলল শশ্বতী, মানুষের মন যা চায় তা কী সবসময় পায় তুর্বসু। আমি জীবনে প্রতিদিনের প্রার্থনায় যা চেয়েছি তা কী পেয়েছি? সব চাওয়া আমার

কোন্ অদৃশ্য শক্তি হৃদয়ের পাত্র থেকে তুলে নিয়ে সেখানে শুধু কান্নার জলে ভরে দিয়েছেন।

তুর্বসু বলল, সুখের পাখি গগনবিহারী, তাকে সহজে ধরা যায় না, কিন্তু দুঃখের পাখিটা না চাইলেও বুকের পিঞ্জরে বার বার উড়ে আসে।

শশ্বতীর কান্না হঠাৎ চোখের সাগর উপচে কপোলে, চিবুকে, বুকে প্লাবন বইয়ে দিল।

তুর্বসু বলল, শশ্বতী, তুমি আমার প্রিয় বন্ধুর স্ত্রী, তোমাকে স্পর্শ করে তোমার চোখের জল তো মুছিয়ে দিতে পারব না।

শশ্বতী এগিয়ে গিয়ে তুর্বসুর হাতখানা টেনে নিয়ে তার বুকের উপর চেপে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ে বলল, তুমি একবার আমার বুকে হাত রেখে দেখ তুর্বসু কী অসহ্য যন্ত্রণায় আমার বুকের পাঁজরগুলো হাপরের মতো হাহাকার করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলেছে।

তুর্বসু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, জীবনে চলার পথে নারীর সঙ্গ হয়তো দুর্লভ নয় শশ্বতী, কিন্তু প্রথম ভালবাসার স্পর্শ যে নারীর কাছে পাওয়া যায়, তাকে জীবনের শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত বোধহয় ভোলা যায় না। ভালবাসার দ্বার সে প্রথম খুলে দিয়ে আশ্চর্য ভোরের খবর বয়ে এনেছে। সবুজ পাতার আড়ালে অজানা পাখির মিষ্টি গলার গান শুনিয়েছে। তুমি আমার সেই পাখি শশ্বতী, যতদূরে যাও, তোমার সেই প্রথম ভোরের গান ভুলব কেমন করে।

এবার আরও উতলা হয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল শশ্বতী। একসময় কান্না ভেজা গলায় বলল, কেন এমন হয় তুর্বসু? কেন এত চাওয়া, এত কামনা সব ব্যর্থ হয়ে যায়? তুমি চলে যাওয়ার পর প্রতিদিন আমি ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনা করেছি। বলেছি, হে বৃত্রঘ্ন, তুমি আমার তুর্বসুর সঙ্গে থেকে তাকে বিজয়ী কর। তুমি তার বাহুতে, বক্ষে, আর বুদ্ধিতে প্রচ্ছন্নভাবে থেকে তাকে পরিচালিত কর।

আমার ইন্দ্রপূজা ব্যর্থ হয়নি তুর্বসু। তিনি তোমাকে সর্বজনপ্রিয় আর দুর্জয় শক্তির অধিকারী করেছেন। কিন্তু—।

কিন্তু কী শশ্বতী?

আমার সবচেয়ে বড় প্রার্থনা তিনি পূর্ণ করেছেন ঠিকই, কিন্তু কুঁড়ির মত যে ছোট্ট চাওয়াটুকুকে আমি বুকের ভেতর লালন করেছিলাম, কখন দেখি তা নিষ্ঠুর ঝড়ে খসে পড়ে গেছে।

তুর্বসু বলল, আজ এই অন্ধকার রাত্রিতে নির্জন অরণ্যালোকে যদি আমরা আমাদের অতীতকে টেনে আনি তাহলে দুর্বার একটা স্রোতে হয়ত ভেসে চলে যাব শাশ্বতী। তার চেয়ে প্রসঙ্গের ইতি হোক এইখানে।

শশ্বতী যেন আপন মনে বলে উঠল, এ আমার অপরাধ তুর্বসু। হয়ত আমার ভালবাসায় খাদ ছিল। হয়ত নয়, নিশ্চিত। না হলে ঋষিপুত্রের সঙ্গে যখন আমার বিয়ের প্রস্তাব এল তখন আমি কঠিন আঘাতে সে প্রস্তাবকে ভেঙে দিতে পারলাম না কেন? লোকাচারের দিকে চেয়ে, পিতার অনুরোধে, মাতার ইচ্ছার কথা ভেবে আমি কেন আমার ভালবাসার সত্যকে বিসর্জন দিলাম?

তুর্বসুর দৃষ্টি শশ্বতীর মুখ থেকে অন্যদিকে নিক্ষিপ্ত হল। যন্ত্রণাময় অতীত এই মুহূর্তে তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

শশ্বতী বলল, তুর্বসু, 'নারীর মন শালাবৃকের হৃদয়ের মতোই নিষ্ঠুর আর কঠিন। তার সঙ্গে প্রাণের মিল হয় না।' স্বর্গের অপ্সরা উর্বশী একদিন মর্তের রাজা পুরুরবাকে এই কথাই বলেছিলেন। এ কথা আজও সত্য তুর্বসু। আমি সেই হৃদয়হীন নারী। যে তার ভালবাসার মানুষের সমস্ত হৃদয় নিঙড়ানো আকুতিকে উপেক্ষা করে চলে যায়।

তুর্বসু বলল, অশান্ত আক্ষেপে নিজেকে ক্ষতবিক্ষত কর না শশ্বতী। যা হয়ে গেছে সে তো আর ফিরে আসবে না। বরং যাকে জীবনে পেয়েছ তার কথাই চিন্তা কর। সে আজ অসহায়ের মত বন্দি জীবন যাপন করছে। তোমার মঙ্গল কামনা তাকে ফিরিয়ে আনুক।

শশ্বতী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, মঙ্গল হোক ঋষিপুত্রের। অশেষ নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পাক তার জীবন. এই আমার আন্তরিক কামনা। কিন্তু আমার সান্ত্বনা কোথায় তুর্বসু? তুমি কবষের সঙ্গে যুদ্ধ করতে

যাবে। জানি ইন্দ্র তোমার সহায় হবেন। তুমি অবশ্যই জয়ী হবে। তারপর হয়তো বন্দিদশা থেকে মুক্ত হবে তোমার বন্ধু। তোমারই সঙ্গে ফিরে আসবে স্বরাজ্যে। কিন্তু তাকে ফিরে পেয়ে কী সান্ত্বনা আমি পাব তুর্বসু? একটি পরাজিত মানুষ সারা 'অনব' জনের প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ আর উপহাসের পাত্র হয়ে থাকবে। তুমি আমাকে ভুল বুঝো না তুর্বসু। তোমার বন্ধুর দুঃসহ জীবনের শেষ হোক! মুক্তি লাভ করুক সে। কিন্তু আমার যে অন্তর ইন্দ্রের মতো শক্তিমান স্বামীর জন্য প্রার্থনা জানিয়েছিল তার কথা ভেবে আমার প্রাণ হাহাকার করবে। আমি অক্ষম স্বামীকে কাছে পেয়ে তার মুক্তির জন্য অন্তর থেকে আনন্দ প্রকাশ করতে পারব না।

তুর্বসু বলল, জয় পরাজয় জীবনের সঙ্গী শশ্বতী। আবাল্য সব কটি প্রতিযোগিতায় আমি জয়ী হয়েছি, যুদ্ধে জয়ী হলাম, কিন্তু পরাজিত হতে হল ভাগ্যের হাতে। যাকে জয় করে নেবার জন্যে সমস্ত মন আমার উন্মুখ হয়ে উঠেছিল, সেখানে আমি হেরে গেলাম। ঠিক তেমনি করে শুনক ঋষিত্ব লাভ করে তোমাকে জয় করে নিল, কিন্তু পরাজিত হল সেনাপতির ভূমিকায়।

একটু থেমে কী যেন ভাবল তুর্বসু। বলল, যদি জয়ী হই কবষের সঙ্গে যুদ্ধে তাহলে এটুকু জেনো তোমার স্বামী শুনককে সম্মানীয় সেনাপতির মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেই ফিরিয়ে আনব। যদি মুক্ত করতে পারি তাহলে তাকে দিয়েই রচনা করাব সন্ধির প্রস্তাব। সে-ই কবষের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার শাস্তি অথবা মুক্তি বিধান করবে।

একটা প্রচ্ছন্ন হাসির আভা ফুটে উঠল শশ্বতীর মুখে। সে বলল, অশেষ করুণা তোমার তুর্বসু। কিন্তু এটা বন্ধুর জন্যে ত্যাগ স্বীকার না বন্ধু পত্নীর প্রতি অনুগ্রহ?

এ আমার কর্তব্য শশ্বতী। ত্যাগ নয়, অনুগ্রহ নয়, বন্ধুর জন্যে বন্ধুর অবশ্য কর্তব্য। সে কথা এখন নয় শশ্বতী। যুদ্ধের ফলাফল আমার হাতে নয়। সবকিছু নির্ভর করছে যুদ্ধের পরিণামের ওপর। তোমাকে যদি কোনদিন ভালবেসে থাকি শশ্বতী, তাহলে তোমার জীবনে স্বামীকে নিয়ে অসম্মানের বেদনা থাক্, এ আমি চাইব না।

ঝড় এল অরণ্য ভূমিতে। বৃষ্টি নামল অরণ্য বৃক্ষের শাখাপ্রশাখা, ফুল পল্লব প্লাবিত করে। রুদ্ধ ঘরে পাশাপাশি শয্যায় শুয়ে রইল দুজনে। কারও চোখে ঘুম নেই। গৃহকোণে কম্পিত দীপ কখন নিভে গেছে ঝড়ের ঝাপটায়। দুটি শয্যার মাঝের ব্যবধান অতি সংকীর্ণ। তবু সেই সংকীর্ণ গণ্ডিটুকু পার হয়ে দুটি দেহ এই চরাচর বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া ঝড়ের রাতেও মিলিত হতে পারল না। তুর্বসুর মনে হল, তাদের দুজনের মাঝখানে ওই সংকীর্ণ জায়গাটুকু অধিকার করে শুয়ে আছে বন্ধু শুনক। ধীরে ধীরে বন্ধুর প্রতি প্রীতি আর কর্তব্যবোধে পূর্ণ হয়ে উঠল তুর্বসুর অন্তর।

।। সাত ।।

যুদ্ধ চলেছে পক্ষকাল। কবষের 'আয়সী-পুর' তবু অভেদ্য রয়ে গেছে। খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ হয়েছে পুরীর বাইরে। সেখানে প্রবল বিক্রমে কবষের সৈন্যদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তুর্বসুর সৈন্যরা নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে তাদের। কিন্তু হার মেনেছে কবষের আয়সী-পুরের ভিতরে প্রবেশ করতে। সুউচ্চ প্রাকারে বেষ্টিত দুর্গ-প্রাসাদ। ঈষৎ রক্তাভ প্রস্তরে নির্মিত প্রাকার। সেই প্রাসাদের চূড়া দেখা যায়। সে চূড়াও রক্ত-প্রস্তর দ্বারা নির্মিত। কিন্তু সেই প্রাকার ভেদ করে প্রাসাদ-দুর্গে প্রবেশ প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। অর্ধচন্দ্রাকার প্রাকারের স্থানে স্থানে লৌহ নির্মিত বৃহদায়তন দরজা। ভিতর থেকে লৌহ-অর্গলে আবদ্ধ। দুর্গপ্রাকারের সারা দেহে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র। শত্রুরা দুর্গের দিকে অগ্রসর হতে চাইলেই ওই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রপথ দিয়ে দ্রুত উড়ে আসবে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর। প্রাকারের কোনও দরজার মুখোমুখি দাঁড়াতে যাবার আগেই সারা শরীর বিদ্ধ হবে তীক্ষ্ণ শরে। তাছাড়া বর্ম নিয়ে অগ্রসর হতে গেলেও উপায় নেই পরিত্রাণের। প্রাকারটি অর্ধচন্দ্রাকারে গঠিত হওয়ায় তীর কেবল সম্মুখ দিক থেকেই আসবে না, পার্শ্বদেশ থেকেও ছুটে আসবে। ছিদ্রগুলির নির্মাণ-কৌশলেও পরিকল্পনার ছাপ আছে। কোনও ছিদ্র সোজাসুজি তৈরি , কোন ছিদ্র আবার বাঁকাভাবে নির্মিত।

তুর্বসুর প্রথম অশ্বারোহী দল দুর্গ অভিমুখে দুর্বার গতিতে ছুটে গিয়ে অধিকাংশই মৃত্যুবরণ করে। তখন যুদ্ধের কৌশল পরিবর্তন করে নেয় তুর্বসু। সে দুর্গ থেকে তীরের এলাকার বাইরে তার সৈন্য সমাবেশ করে রাখে। রাত্রিতে প্রাকারদ্বারের যে কোনও একটি দিয়ে কবষের অশ্বারোহী সৈন্যরা দুর্গের বাইরে এসে দাঁড়ায়। তারপর বিপুল গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে তুর্বসুর সৈন্যবাহিনীর উপর। প্রথমে তুর্বসু এই অতর্কিত আক্রমণে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু পরদিন থেকে সেও ঘাঁটি তৈরি করে প্রস্তুত হয়ে রইল। তীরের মাথায়, ঠিক ফলার নীচে জড়িয়ে নিল ঘৃতে ভেজান বস্ত্রখণ্ড। তারপর তাতে অগ্নি সংযোগ করে জ্বালামুখী তীর ছুড়তে লাগল। এতে অন্ধকারে শত্রুদলের আত্মগোপন করে থাকার কোনও সুযোগই আর রইল না।

প্রাসাদের দু'দিকে উঁচু পাহাড়। পিছনে পশ্চিমবাহিনী নদী। অবস্থানের দিক থেকে একেবারে দুর্ভেদ্য। নদীর তীর জুড়ে স্তূপীকৃত বালির সঞ্চয়। প্রাসাদের পশ্চাদভাগ দিয়ে তাই আক্রমণ অসম্ভব। ওই বালুভূমির উপর দিয়ে চলতে গেলেই অশ্ব কিংবা হস্তীর পা প্রোথিত হয়ে যাবে বালুকা স্তূপের মধ্যে! এসব খবর সংগ্রহ করে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে দেখেছে তুর্বসু। সে আরও জেনেছে রাজা কবষের মূল প্রাসাদটির অবস্থান বেশ অভিনব। নদীর তীরভূমি থেকে অনেক নীচে প্রাসাদটি নির্মিত। প্রাসাদের চারিদিকের প্রাকার কিন্তু অনেক উঁচুতে অবস্থিত। তাই দূর থেকে দুর্গ প্রাকারের উপর দিয়ে কেবল প্রাসাদের চূড়াটি চোখে পড়ে।

সম্মুখের অঞ্চলগুলির সঙ্গে দুর্গের যোগাযোগ প্রথমেই বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে তুর্বসু। খাদ্য কিংবা জনসংযোগ ব্যবস্থা সম্মুখ দিয়ে তাই আর সম্ভব নয়। কিন্তু পশ্চাদ্‌ভূমির সঠিক নিশানা তার জানা নেই। শুধু অবস্থান সম্বন্ধে তার একটা ধারণা জন্মেছে। কিন্তু ওই পথে অন্য কোনও অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভব কি না তা সে জানে না!

এখন দুর্গের পার্শ্ববর্তী পাহাড় অধিকার করা প্রয়োজন। পাহাড়ের উপর উঠে দাঁড়ালে দুর্গের ভিতর এবং পশ্চাদ্ ভাগের ছবিগুলি স্পষ্টভাবে দেখতে পাওয়া সম্ভব। তখন আরও সঠিকভাবে স্থির করা যেতে পারে যুদ্ধ-পরিকল্পনা।

কয়েকদিন অবিচ্ছিন্ন যুদ্ধের পর দুর্গের একটি প্রান্তের পাহাড় তুর্বসুর অধিকারে এল। কিন্তু পাহাড়ে তুর্বসুর সৈন্যদের অবস্থান নির্বিঘ্ন হল না। দুর্গের ভিতর থেকে তীর আর পাথর বৃষ্টির মতো এসে পড়তে লাগল পাহাড়ের উপর।

তুর্বসু সমস্ত সৈন্যকে নীচে রেখে রাতের অন্ধকারে পাহাড়ে উঠে গেল। তারপর একটি গুহার আড়ালে আত্মগোপন করে রইল।

ভোর হলে প্রথমে কিছু সময় দুর্গের ভিতর থেকে পাহাড়ের উপর শিলাবৃষ্টি চলল। তারপর যখন এ পক্ষ থেকে কোনরকম সাড়া পাওয়া গেল না তখন স্তিমিত হয়ে গেল শিলা নিক্ষেপের প্রচেষ্টা।

তুর্বসু গুহার ভিতর বসে গাছের আড়াল থেকে দেখতে লাগল। দুর্গপ্রাকার পিছনের নদীর একেবারে গা ঘেঁষে উঠেছে। প্রাসাদটি যেন পাতাল খুঁড়ে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। নদী বয়ে চলেছে তার জলসম্ভার নিয়ে বালির তীর রচনা করে। প্রাসাদের তলদেশ থেকে বেশ খানিক উপরে নদীর খাত। দুগের ভিতরে বহুদূরে বিস্তৃত চারণভূমি। সহস্র সহস্র ধেনু চরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু দুচারটি গোপাল ছাড়া বিশেষ কাউকে দেখা গেল না। দুর্গপ্রাকার অনেকখানি প্রশস্ত। তুর্বসুর মনে হল, কবষের সৈন্যরা ওই প্রাকারের অভ্যন্তরে আত্মগোপন করে আছে।

নদীর ওপারে বালুর তীর। তারপরেই পাথুরে প্রান্তর। আরও দূরে বনরেখা।

দুপুরের দিকে দেখা গেল কয়েকটি উট সারি দিয়ে আসছে নদীর দিকে। তাদের পিঠে মনে হল খাদ্যবস্তু বোঝাই করে আনা হচ্ছে। একটি নৌকাকে দেখা গেল দুর্গপ্রাকার থেকে ভেসে ওপারে যেতে। কিছুক্ষণ উটের পিঠের মালপত্র নিয়ে নৌকাখানি যাতায়াত করল। তারপর আবার প্রাকারের আড়ালে অদৃশ্য হল। উটগুলো মালপত্র খালাস করে যে পথ দিয়ে এসেছিল সে পথে চলে গেল। আবার এল অপরাহ্নের দিকে। এবার সংখ্যায় অনেক বেশি। দুটি নৌকা দুর্গপ্রাকার থেকে জিনিসপত্র নিয়ে পারাপার করল। বেলা শেষের

সূর্য রক্ত আভা ছড়াল পশ্চিম আকাশে। উটের সারি ফিরে চলল একটি ধূসর সরল রেখা সৃষ্টি করে।

সূর্যাস্তের বেশ কিছু পরে চাঁদ উঠল আকাশে। উঁচু প্রাকারের ছায়া পড়ল প্রাসাদের উপর। তার তলদেশও ছায়ায় আবৃত হয়ে রইল।

তুর্বসু তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টিতে চেয়ে দেখল, প্রাকার থেকে সিঁড়ি বেয়ে বহু মানুষ নামছে প্রাসাদের তলদেশে। আবার কেউ কেউ উঠে আসছে। ওদের চলাফেরায় দারুণ ত্রস্ততা। একটা মশাল হাতে নিয়ে নদীর দিকের প্রাকার ঘেঁষে এগিয়ে চলেছে কটি মানুষ। তারা কয়েকটা সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে গেল। কোথায় যেন ঢুকল তারা। মশালের আলো অদৃশ্য হল।

আবার স্তিমিত জ্যোৎস্না। রহস্যময় দুর্গ-প্রাসাদ। কিছু পরে বেরিয়ে এল প্রাকারের অভ্যন্তর কক্ষ থেকে সেই মশাল। পাঁচটি মানুষকে রজ্জু দিয়ে বাঁধা হয়েছে। তাদের নিয়ে মশালবাহীরা চলল দুর্গপ্রাকারের সেই অংশের দিকে যেখানে তুর্বসু দিনের আলোর চারণভূমিতে ধেনুগুলিকে চরে বেড়াতে দেখেছিল।

তুর্বসুর সমস্ত দেহ উত্তেজনায় কাঁপছিল। এ যেন তার কাছে এক অভাবিত মুহূর্ত। সে ঠিকই অনুমান করেছে, এ শুনক আর তার সঙ্গী চারজন যোদ্ধা ছাড়া আর কেউ নয়। তাহলে ওরা এখনও জীবিত। তুর্বসুর মনে দারুণ একটা শক্তি এল। সে ভাবল, দুদুটো বছর যদি ঐ মানুষগুলি বন্দি অবস্থায় বেঁচে থাকতে পারে তাহলে নিশ্চয়ই তুর্বসু ওদের উদ্ধার করতে পারবে। জ্যোৎস্নার আলোয় তুর্বসু পথ চিনে নেমে গেল পাহাড়ের নীচে।

পরের দিন দেখা গেল পড়ন্ত বেলায় নদীর ওপারে এসে দাঁড়িয়েছে একটি পারার্থী মানুষ। পণিদের পোশাক তার শরীরে।

এপারের দুর্গপ্রাকার থেকে নৌকা গেল ওপারে। পণিটি সেই নৌকায় উঠে চলে এল দুর্গের ভিতর।

পণিরা দক্ষিণ দেশবাসীদের বন্ধু। ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়িক সম্পর্ক তাদের সঙ্গে। প্রতি বছর প্রায় এই সময় কবষের রাজ্যে তাদের দেখা পাওয়া যায়।

পণি এল রাজা কবষের দরবারে। যে দৌবারিক তাকে সঙ্গে নিয়ে এল সে তাকে পৌঁছে দিয়েই চলে গেল।

পণি রাজাকে অভিবাদন জানিয়ে বলল, আমাদের দলনায়ক মহামান্য পিজবন আমাকে পাঠিয়েছেন আপনার কাছে। আপনি যে ঘোরতর যুদ্ধে লিপ্ত সে খবর তাঁর কানে পৌঁছেছে। স্বাভাবিক অবস্থায় তিনি ঠিক এ সময়েই আপনার কাছে এসে পৌঁছতেন কিন্তু যুদ্ধের মধ্যে দলবল নিয়ে তাঁর পক্ষে আপনার দুর্গে প্রবেশ করা অসম্ভব ভেবেই তিনি যাত্রা স্থগিত রেখেছেন। আমি তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর। তাঁর গোষ্ঠের পূর্ণ দায়িত্ব আমার। তিনি আমাকে একাকী পাঠিয়েছেন আপনার কাছে। আমি সোজা পথে দুর্গে প্রবেশের সুযোগ পাইনি। সামনের থেকে পণিদের চিরশত্রু 'অনব'রা দুর্গ অবরোধ করে রেখেছে। তাই বহুদূর পথ ঘুরে পাহাড় ডিঙিয়ে নদী অতিক্রম করে এখানে এসে পৌঁছেছি। এ সময়ে যদি দুগ্ধজাত খাদ্য তৈরির কাজে আমি আপনাদের কোনরকম সাহায্য করতে পারি তাহলে আপনার বিশেষ প্রিয় পণিরাজ পিজবন ধন্য মনে করবেন।

রাজা কবষ উঠে দাঁড়ালেন আসন থেকে। এগিয়ে এসে হাত ধরলেন পণিরাজ প্রেরিত যুবকটির। বললেন, পিজবন শুধু আমার বন্ধু নয়, আমার সহোদর ভাইয়ের মতো। বিপদের দিনে সে আমাকে ভোলেনি, তার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমার নেই। তুমি বিপদের মাঝে এসে পড়েছ, এই আমার দুশ্চিন্তা। যদি আত্মীয় মনে কর তাহলে বিপদের অংশ নাও। তুমি আজ থেকে আমার গোষ্ঠের ভারপ্রাপ্ত কর্ম-পরিচালক নিযুক্ত হলে।

পণি যুবকটি রাজা কবষের কাছে মাথা নিচু করে বলল, আমি যতক্ষণ আপনার প্রাসাদে থাকব ততক্ষণ দুগ্ধজাত ঘৃত, দধি আর ছানার কোনও অভাবই থাকবে না মহারাজ। আপনি নিশ্চিন্তে যুদ্ধ-কার্যে মন দিন।

তিন চারটি দিনের মধ্যে পণি যুবক জহ্নু দুর্গের সবার প্রিয় হয়ে উঠল। সৈন্যদের পরিবর্তন ঘটল

খাদ্যে। জহ্নুর উপর মহাখুশি হয়ে তারা সাধুবাদ দিতে লাগল। দুর্গের সর্বত্র জহ্নুর অবাধ বিচরণ। তার মুখের হাসি, তার কথার সরসতা সবার মনের উপর জমে থাকা মেঘকে কোথায় যেন উড়িয়ে নিয়ে গেল।

কি ভাই, কোথায় চলেছ তোমরা? --- জহ্নু জিজ্ঞেস করল মশালধারী দুটি মানুষকে।

একজন বলল, যাবে নাকি আমাদের সঙ্গে?

পণি যুবক হেসে বলল, নতুন কিছু দেখাবে তো যেতে পারি।

অন্যজন বলল, আমাদের এই দুর্গের ভেতর সব সময় দেখতে পাবে নতুন চমক। চল আমার সঙ্গে।

তৃতীয় জন বলল, দেখতে মজাই লাগবে।

ওরা তিনজনে মশাল নিয়ে সিঁড়ি ভেঙে উঠল প্রকারের একটি প্রকোষ্ঠে।

অন্ধকারে প্রকোষ্ঠ সহসা আলোয় ভরে গেল। কিন্তু ওই পাষাণ দেয়াল ঘেরা ঘরের মধ্যে জহ্নু কিছু দেখতে পেল না।

সে অমনি বলে উঠল, এখানে তো একটি পিঁপড়ের দেখাও পাচ্ছি না। কি জন্যে ঢুকলে এ ঘরে?

ওরা পণি যুবকের কথার কোন উত্তর দিল না। হেসে একজন মেঝের পাটাতন সরিয়ে ফেলল। একটি কাঠের সিঁড়ি নীচে নেমে গেছে। মশাল নিয়ে একটি লোক সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে লাগল। জহ্নু উঁকি দিয়ে দেখল, হাত বাঁধা অবস্থায় পাঁচটি মানুষ নীচের সংকীর্ণ একটি ঘরে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের হাঁটু অব্দি ডুবে আছে জলের মধ্যে।

ওদের হাতের বাঁধন খুলে দিতেই ওরা উঠে এল উপরে। ওরা উপরের মানুষজনের মুখের দিকে তাকাল না। ঘরের একটি প্রান্তে গিয়ে এক জায়গায় জড়ো করে রাখা কিছু খাবার গো-গ্রাসে গিলে খেতে লাগল। তারপর মাটির কুম্ভে রাখা জল খেয়ে কাঠের পাটাতনের উপর ক্লান্তিতে গড়িয়ে পড়ল।

ওরা শুয়ে পড়লে মশালধারী মানুষটি ইংগিতে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে পণি যুবকটিকে নীচে নেমে যেতে বলল। জহ্নু নীচে নামলে লোকটি চুপি চুপি বলল, এটি আমাদের জল-যন্ত্র-গৃহ। এখানে জলের মধ্যে বন্দিদের জানু, এমনকি কণ্ঠ পর্যন্ত ডুবিয়ে রেখে শাস্তি দেওয়া হয়। এরা 'অনব' জন। দু'বছর আগে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসে বন্দি হয়ে আছে।

জহ্নু বলল, কিন্তু এর ভেতরে তো হাঁটু জল দেখছি। গলাজলে ডুবিয়ে শাস্তি দেবার দরকার হলে তখন কী তোমরা এর ভেতর আবার জল ঢালতে থাক?

মশাল উঁচু করে লোকটি পাথরের প্রাকারে সংলগ্ন একটি লোহার দরজা দেখিয়ে বলল, ওই দরজার হাতলে খিল লাগান আছে। খিল খুলে ধীরে ধীরে হাতল ঘোরালে ওই দরজার গায়ে তৈরি করা এক একটি ছিদ্রের মুখ খুলে যাবে। ওই সব মুখের সঙ্গে নদীর জলের যোগ আছে। যতটুকু খুলবে ততটুকু জল এসে পড়বে এই ঘরে।

জহ্নু বলল, সবটা খুলে দিলে?

প্রলয় হয়ে যাবে। কয়েক মুহূর্তের ভেতর এ ঘরটি ভরে গিয়ে জল গড়িয়ে চলবে প্রাসাদের দিকে। এক রাতের ভেতর প্রাসাদ ডুবে যাবে। দুর্গপ্রাকারের সামান্য নীচে নদী বরাবর জল দাঁড়িয়ে যাবে।

এ খিল যদি বন্দিরা খুলে দেয়?

লোকটি হেসে বলল, ওরাই আগে ডুবে মরবে। আমরা বাইরে যাওয়ার সময় ওদের ঘরের দরজা বন্ধ করে দেব। কেউ নিশ্চয় এমনি করে নিজের মৃত্যু ডেকে আনবে না।

পণি যুবক বলল, এমন মুর্খ বোধহয় কেউ নেই।

ওরা বেরিয়ে এল। দরজা অর্গলবন্ধ করে খিল দিয়ে দিল।

রোজ আসছে খাদ্যবস্তু নদী পার হয়ে। দুর্গের দুটি নৌকা সারাদিন প্রায় খাদ্য পরিবহনের কাজে ব্যস্ত। কেবল রাতটুকু প্রাকারের ওপারে লোহার কিলকের সঙ্গে বাঁধা থাকে। একটা বিশেষ সোপান পথে লোকে প্রাসাদ থেকে ওপারে নদীর উপর ভাসমান নৌকায় গিয়ে ওঠে।

দুর্গ অবরোধের আজ সপ্তম দিবস। মাঝে মাঝে শক্তি পরীক্ষার জন্য কিছু সৈন্য পাঠান হয় দুর্গের বাইরে। তারা মৃত্যুপণ করে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। কারণ পিছনে ফেরার দুর্গদ্বার তাদের জন্য আর খোলা থাকে না।

নিরন্ধ্র অন্ধকার রাত্রি। আকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘের মিছিল। থর থর বিদ্যুৎ কেঁপে কেঁপে উঠছে। আবহাওয়ায় একটা শীতল স্রোত বয়ে চলেছে।

ছ'টি প্রাণী অন্ধকার প্রাকার ঘেঁষে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছে। ওরা খুলে দিয়ে এসেছে বন্দিগৃহের সেই জল প্রবেশের লৌহ দ্বার। হাতল বন্ধের খিলটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এসেছে নদীগর্ভে। নিঃশব্দে সন্তর্পণে ডুবিয়ে দিয়ে এসেছে পারাপারের দুটি নৌকা।

বিদ্যুৎ চমকালো। ওরা প্রাসাদস্তম্ভের আড়ালে আত্মগোপন করে রইল কিছুক্ষণ। নিজেদের বুকের শব্দ ওরা শুনতে পাচ্ছে। আবার অন্ধকার। গুরু গুরু আওয়াজ উঠল মেঘের। ওরা দৌড়ে এসে দাঁড়াল পাহাড় সংলগ্ন দুর্গদ্বারের কিছুটা দূরে। অরণি ঘর্ষণে আগুন জ্বলে উঠল। একটা প্রজ্জ্বলিত তীর উঠে গেল পশ্চিম আকাশে সবার অলক্ষ্যে। হঠাৎ উত্তর পূর্ব প্রান্তের দুর্গ-মুখে বেজে উঠল যুদ্ধের দুন্দুভি। দুর্গের সৈন্যরা প্রাকারের ভিতর আত্মগোপন করে ছুটে চলল সেদিকে। দুর্গের সমস্ত মানুষের আতঙ্কিত দৃষ্টি নিবদ্ধ রইল উত্তর-পূর্ব প্রান্তের দ্বারগুলির দিকে।

এরা ছ'টি প্রাণী খুলে ফেলল পাহাড় সংলগ্ন পশ্চিম দ্বারের লৌহ কিলক। ঠিক সেই মুহূর্তে চিৎকার উঠল এক রমণী কণ্ঠের। দুন্দুভির নিনাদে, মেঘের ধ্বনিতে সে শব্দ এই ছ'জন পলাতক ছাড়া আর কেউ শুনতে পেল না। শোনামাত্রই ছ'টি প্রাণীর বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। তারা পাথরের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বিদ্যুৎ চমকে দেখা গেল একটি অশ্বারোহিণী রমণী-মূর্তি দ্বারের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। হাতে তার উদ্যত অসি।

উত্তর এল, আমি জহ্নু, গোষ্ঠের ভারপ্রাপ্ত পণিদেশবাসী। বাইরে যুদ্ধের দুন্দুভি শব্দে কৌতূহলী হয়ে দ্বার খুলেছি।

নারী কণ্ঠে বিদ্রূপ হাস্য বেজে উঠল, কী আশ্চর্য, বাঘের গুহায় মৃগ দলপতি আপনি এসে ধরা দিল।

কে তুমি?

নারী কণ্ঠে আবার উচ্ছ্বসিত হাসি, আমারও তো সেই একই প্রশ্ন। কে তুমি? কেন এই পণিদেশবাসীর ছদ্মবেশ?

জহ্নু বলল, আমি যে পণিদেশবাসী নই সে পরিচয় তোমার কাছে অজ্ঞাত নয়। আর আমি যে ছদ্মবেশে 'অনব' সৈন্যের দলপতি তাও তুমি নির্ভুল জানতে পেরেছ। আমি এই সংকট মুহূর্তে এক অপরিচিতা নারীর কাছে নতজানু হয়ে প্রার্থনা জানাব, এই পাঁচটি অসহায় মানুষের মুক্তির জন্য। আজ দীর্ঘ দুটি বছর তারা এখানে অসহ বন্দিজীবন যাপন করছে। অন্যদিকে তুমি নারী হয়ে বুঝবে আর পাঁচটি নিরপরাধ নারীর সীমাহীন যন্ত্রণার দীর্ঘশ্বাস। তুমি আমাকে বন্দি কর, বিনিময়ে দয়া করে মুক্তি দাও এই অসহায় ক'টি মানুষকে।

নারী সামান্য সময় আপন মনে চিন্তা করে বলল, তোমাদেরই কাউকে আমি বন্দি করে রাখতে চাই না তুর্বসু। এই মুহূর্তে আমি তোমাদের মুক্ত করে দিচ্ছি। কিন্তু একটি প্রশ্নের জবাব দেবে তুমি?

বল?

নারীর কণ্ঠে এবার সমস্ত মেঘাচ্ছন্ন আকাশের ক্ষোভ যেন ভেঙে পড়ল। সে বলল, কেন তোমরা বার বার আক্রমণ করতে আস আমাদের দেশ? কি করেছেন আমাদের রাজা তোমাদের রাজার কাছে অপরাধ? দ্রুহ্যবরা আসছে তাদের দুর্ধর্ষ বাহিনী নিয়ে, অনবরা আসছে তাদের অগণিত হস্তী রথ আর পত্তি বাহিনী নিয়ে, কিন্তু কেন? কেন তোমরা বার বার ঝাঁপিয়ে পড়ছ আমাদের সুন্দর দেশটার ওপর?

বার বার নষ্ট করে দিচ্ছ শান্তির পরিবেশ?

তুর্বসু বলল, তোমার প্রশ্নের উত্তর দেব এমন সাধ্য নেই আমার। বুঝি মানুষের রক্তের ভেতরে থাকে

যুদ্ধের বাসনা। কখনও সে ইচ্ছা ঘুমন্ত কখনও বা তরঙ্গিত।

প্রাসাদের তলদেশ থেকে কিসের যেন একটা কোলাহল শোনা যাচ্ছিল। আকাশের মেঘগর্জন, বাইরের দুন্দুভি নিনাদে সে শব্দ মাঝে মাঝে ডুবে যাচ্ছিল!

অশ্বারোহিণী নারী বলল, তোমরা পাঁচজন এই মুক্ত দ্বার দিয়ে চলে যাও তোমাদের শিবিরে। ভয় নেই, তোমাদের মহামান্য সেনাপতিকে আমি বন্দি করে রাখব না। অল্প সময়ের ভেতরেই তোমরা তোমাদের শিবিরে তাঁকে ফিরে পাবে।

তুর্বসুর ইংগিতে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল পাঁচটি মানুষ।

নারী এবার অশ্ব থেকে অবতরণ করে কাছে এগিয়ে এল।

তুর্বসু, তুমি আমাকে সত্যিই কী চিনতে পারনি! পুরুষের বুকে ভালবাসার রংচিহ্ন কী এত সহজে মিলিয়ে যায়?

পরজ! আমি ভাবতেও পারিনি পরজ, তোমাকে এখানে এই মূর্তিতে দেখতে পাব! কিন্তু কী করে তুমি এখানে এলে দ্রুহ্যবদের দেশ থেকে?

সে অনেক পরের কথা তুর্বসু। আজ এই যুদ্ধের মুহূর্তে সব কথা বলা সম্ভব নয়। তবে দ্রুহ্যবরাজ কশু আর ঋষি দেববাতের মৃত্যু হয়েছে। তুমি বুঝতেই পারছ, এরপর আর দ্রুহ্যব-দেশে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। সখি মদয়ন্তীর সাহায্যে আমি মাংসলোভী হিংস্র মানুষগুলোর কবল থেকে পালিয়ে বাঁচতে সমর্থ হয়েছি।

তুর্বসু বলল, আজ এই মুহূর্তটি আমার জীবনে সবচেয়ে বড় বিস্ময় এনে দিল। তুমি আমার জীবনের হারানো পাখি পরজ।

পরজ হাসল। আকাশের দিকে আঙুল তুলে বলল, অনেক পথ পেরিয়ে এসে যখন নীড়ের কাছে দুজনের দেখা হল তখন আকাশ তোলপাড় করা ঝড় উঠেছে তুর্বসু। আমাদের দেখা হল শুধু ঝড়ের ঘূর্ণিতে আবার হারিয়ে যাওয়ার জন্যে।

এখন নীচের প্রাসাদের কোলাহল তীব্র হয়ে উঠছে। পরজ চঞ্চল হয়ে উঠল। সে কান পেতে কিছু যেন অনুমান করার চেষ্টা করল।

তুর্বসু বলল, তুমি এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে চলে এস পরজ। আমি কথা দিচ্ছি, কোনদিনই তোমার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ ঘটবে না।

পরজ বলল, সত্যি করে বলছ তুর্বসু— তোমার বুকে এখনও আমার স্থান আছে?

হাহাকার করে উঠল তুর্বসুর শূন্য বুক। সে শুধু বলল, আমার বুকে এখনও তোমার দেওয়া সেই রক্তের ফোঁটা মিলিয়ে যায়নি পরজ। এখনও সেই রাত্রি-শেষের নদীতীর, আমার বুকে তোমার প্রপাতের মত চুলে ভরা মাথা, তোমার আঙুলের আশ্চর্য ভাষা আমার মনে অক্ষয় হয়ে আছে। তোমাকে কী এত সহজে ভোলা যায় পরজ!

এখন তীব্র কোলাহলের সঙ্গে ভেসে আসতে লাগল জলকল্লোলধ্বনি।

কান্নায় ভেঙে পড়ল পরজ। এখন সমস্ত পরিস্থিতি তার কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠেছে।

তুর্বসু, তুর্বসু, এ তুমি কী করলে তুর্বসু! জলযন্ত্রের মুখ খুলে দিয়ে তুমি ডুবিয়ে দিলে আমাদের সোনার প্রাসাদ! হায়, দুর্গরক্ষার সব দায়িত্ব পূর্ণ বিশ্বাসে আমার ওপর তুলে দিয়েছিলেন মহারাজ কবষ। আজ আমি তাঁকে কী প্রতিদান দিলাম। সমস্ত রাজ্যের পরাভবের কারণ হলাম আমি।

তুর্বসু পরজের হাত ধরে আকর্ষণ করে বলল, তুমি চলে এস পরজ, চলে এস আমার সঙ্গে। এতে কোনও অন্যায় নেই, এ হল যুদ্ধের রীতি।

এখন আর কান্না নেই পরজের বুকে। সে বলল, যাব তোমার সঙ্গে তুর্বসু, তবে এই মুহূর্তে নয়। এখন আমার অসহায় দুর্গবাসীর সঙ্গে আমাকে পরাভবের গ্লানিটুকু ভাগ করে নিতে দাও। জীবিত অথবা মৃত, তোমার সঙ্গে আমার মিলন ঘটবেই!

কথাগুলো উচ্চারণ করে অন্ধকার সোপান বেয়ে দ্রুত মিলিয়ে গেল পরজ। দুর্গদ্বারে পবিত্র অশ্বটি শুধু একবার হ্রেষাধ্বনি করল।

পরদিন প্রভাতে তুর্বসু বন্ধু শুনককে সেনাপতির বেশে সাজিয়ে দিয়ে বলল, কিছু পরেই মহারাজ কবষ আসছেন সঙ্গীদের নিয়ে আত্মসমর্পণের জন্যে। 'অনব'রাজ দিবোদাসের প্রতিনিধি হয়ে তুমি তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্য প্রস্তুত হও।

তুমি প্রধান সেনাপতি তুর্বসু।

তা হোক। তুমি দীর্ঘ দুটি বছর যে নির্যাতন ভোগ করেছ, সেজন্যে এ সম্মান তোমারই প্রাপ্য। আর তুমিই জলযন্ত্রের সন্ধান দিয়ে আজ দুর্গ ধ্বংসের কারণ হলে, আমি সেকথা আমার সৈন্যদের মাঝে প্রচার করে দিয়েছি।

এ কথা তো সত্য নয় তুর্বসু। তুমিই জলযন্ত্রের মুখ খুলে দিয়েছ। তুমিই তো আমাদের উদ্ধার করে এনেছ।

তুর্বসু বলল, তোমাদের বন্দিগৃহে আমি যদি রক্ষীদের সঙ্গে না যেতাম তাহলে ওই জলযন্ত্রের সন্ধান পেতাম না। আর তাহলে আজকের এই আত্মসমর্পণ ঘটত না। সুতরাং তোমরাই পরোক্ষভাবে 'অনব'দের জয়ের কারণ হলে।

একটু থেমে তুর্বসু বলল, আর তাছাড়া আমি প্রধান সেনাপতি, শুনক। আমার বন্ধুত্বের আবেদনে সাড়া দিতে দ্বিধা করলেও আমার আদেশ অমান্য করার অধিকার তোমার নেই।

শুনক বলল, এখানে আমি হার মানলাম তুর্বসু। তোমার আদেশ শিরোধার্য।

রাজা কবষের আত্মসমর্পণের পর তুর্বসু এগিয়ে চলেছে বিপুল বাহিনী নিয়ে বিজয় গৌরবে। সৈন্যেরা ঘন ঘন জয়ধ্বনি দিচ্ছে। উচ্ছ্বাসে উল্লাসে যেন উদ্বেলিত সমুদ্র। তুর্বসু কিন্তু অন্যমনা। আত্মসমর্পণের সময় দুর্গের সমস্ত মানুষ দাঁড়িয়েছিল দুর্গ প্রাকারের সামনে। ছিল না কেবল পরজ, যার ওপর ছিল সমস্ত দুর্গ রক্ষার ভার। তন্ন তন্ন করে প্রতিটি মানুষের ভিতর পরজকে খুঁজে ফিরেছে তুর্বসুর উৎসুক চোখ। কিন্তু বৃথা হয়েছে অন্বেষণ। তাই প্রত্যাবর্তনের সময় পবজের জন্য বুকের মাঝখানে একটা অব্যক্ত ব্যথা অনুভব করছিল তুর্বসু। হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ তীর ছুটে এল সামনের পাহাড় থেকে। বিঁধে গেল তুর্বসুর বুকের ঠিক সেই বিন্দুতে যেখানে আপন বুকের রক্ত ঝরিয়ে পরজ একদিন তিলক এঁকে দিয়েছিল।

সকলে চেয়ে দেখল, শুভ্রবসনা একটি মেয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল সামনের পাহাড়ের তলদেশের কূপের মধ্যে।

সেনাপতি তুর্বসুও সে দৃশ্য দেখল। তার মুখে ফুটে উঠল অপার্থিব এক হাসি। মৃত্যুশয্যায় শায়িত তুর্বসুর বারবার মনে হতে লাগল, একটি মেয়ে তার বুকের মধ্যে চুলে ভরা মুখখানা ডুবিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে। একবার তার মনে হল, এ পণিরাজের পুত্রবধূ বীরা। আবার মনে হল, রাজা কবষের দাসীকন্যা পরজ। শেষ নিঃশ্বাস নির্গত হবার পূর্ব মুহূর্তে তার মনে হল, এ কন্যা শশ্বতী।

।। আট ।।

সরস্বতীর স্রোতধারায় তুর্বসুর চিতাভস্ম ধীরে ধীরে ধুয়ে যেতে লাগল। প্রাসাদ বাতায়ন থেকে সে দৃশ্য পলকহীন চোখে দেখতে লাগল শশ্বতী। প্রতিদিন 'অনব' জনপদের আবালবৃদ্ধবণিতা আসতে লাগল হাতে নিয়ে ফুল। তারা তাদের প্রিয় মানুষটির স্মৃতির উদ্দেশ্যে পুষ্পাঞ্জলি দিল। কেউ বা ঝরাল চোখের পবিত্র দু'ফোঁটা জল।

একদিন রাজা দিবোদাসের প্রাসাদের সামনে এসে দাঁড়াল একখানা রথ। তখন শশ্বতী দেখছিল চিতার শেষ অঙ্গারটুকু কেমন করে সরস্বতীর স্রোত ধুয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে।

পরিচারিকা এসে বলল, রথ এসে গেছে ঋষি চয়মানের গৃহ থেকে।

শশ্বতী ফিরে দাঁড়াল। বলল, চল, আমি প্রস্তুত।

রথ এসে থামল চয়মানের গৃহের সামনে। যজ্ঞের আয়োজন সম্পূর্ণ। 'বরুণ প্রঘাস' যজ্ঞ। গৃহপ্রবেশের পূর্বে স্বামী-স্ত্রী একই সঙ্গে মন্ত্র পাঠ করে যজ্ঞ সমাপন করবে। কিন্তু এই যজ্ঞে মন্ত্রপাঠের পূর্বে স্ত্রীর আচরণীয় একটি বিধি আছে। প্রস্থাতৃ যজমানের পত্নীকে বলবেন, হে নারী, তোমার অন্তরে যদি কোনও পুরুষের জন্য গোপন প্রণয়-বেদনা অনুভব কর, তাহলে তা সংসারের মঙ্গলের জন্য প্রকাশ কর। এ সত্য ব্যক্ত হলে কল্যাণ হবে। সত্য গোপনের চেষ্টা করলে তোমার সবচেয়ে প্রিয়জনের অমঙ্গল হবে। তোমাকে এ সত্য মুখে ব্যক্ত করতে হবে না। হস্তের কুশ উত্তোলন করে দেখাও এক অথবা একাধিক প্রণয়ীর সঙ্গে তুমি সংযুক্ত ছিলে। যদি কোন প্রণয়ী তোমার না থাকে, তাহলে মুখে উচ্চারণ কে' তা তুমি ব্যক্ত কর।

শশ্বতী হস্তধৃত ক্ষুদ্র একটি কুশ উর্ধ্বে উত্তোলন করে দেখাল।

নিশীথে একই শয্যায় শুয়ে আছে শুনক আর শশ্বতী। দুজনের কারো চোখেই নিদ্রা নেই। বাক্য নেই কারু মুখে। দুজনের মাঝে পড়ে আছে অতি তীক্ষ্ণ ক্ষুদ্র একটি কুশ। সে কুশটি কারো পক্ষেই দূরে সরিয়ে ফেলে মিলিত হওয়া সম্ভব হচ্ছে না। শুনক ভাবছে, কে তার প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বি। শশ্বতী দেখছে, ক্ষুদ্র কুশ-তৃণটি ধীরে ধীরে মানুষের আকার লাভ করছে। শশ্বতী বিস্ময় বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল, শুনক আর তার মাঝে শুয়ে আছে তুর্বসু।

প্রথম মৌর্য

ষোড়শী যুবতীটি কঙ্করময় পথের ওপর দিয়ে অতিদ্রুত পায়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছিল। বামে জঙ্গল, অদূরে শোন নদীর বিস্তীর্ণ চর। পশ্চিম আকাশে ছড়িয়ে পড়েছিল সূর্যাস্তের ঘন আবির। শোনের বহতা স্রোতে তার প্রতিবিম্ব। কোনদিকে লোকালয়ের চিহ্নমাত্র নেই। যুবতী ভীত, সন্ত্রস্ত।

শেষ খেয়ার আশায় উদ্বিগ্ন যুবতীটি ছুটে চলল চর লক্ষ করে। ওপারে যদি রাতের মত কোনও আশ্রয়ের সন্ধান পাওয়া যায়।

কাঁকরের সঙ্গে ঘন ঘন আঘাতে বেজে উঠছিল রুপোর পাঁয়জোড়। হাতের পোঁটলাতে কিছু খাবার আর পরিধেয়।

উত্তেজনায় আর দ্রুতচলার পরিশ্রমে সে জানতে পারেনি, তাকে অনুসরণ করছে এক সম্ভ্রান্ত অশ্বারোহী যুবক।

হঠাৎ একটুকরো শিলাখণ্ডে আঘাত পেয়ে চলার পথে পড়ে গেল যুবতী। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই অশ্বারোহী দ্রুত এগিয়ে এসে অশ্ব থেকে নেমে তাকে তুলে ধরল।

যুবকের স্পর্শে লজ্জিত, সংকুচিত সেই ষোড়শী পথের একপাশে সরে দাঁড়াল। তার আঘাত খুব বেশি ছিল না। বিস্মিত যুবক প্রশ্ন করল, একা এসময় এখানে?

আমি 'ময়ূর পোষক', গ্রামে আমার বাবার বাড়িতে যাব বলে পথে বেরিয়েছি। আসছি 'পিপ্পলিবন' থেকে। ওখানে আমার শ্বশুর বাড়ি। আমি ওখানকার 'মোরিয়' বংশের কূলবধূ।

যুবক বলল, আমি শুনেছি, শাক্য গোষ্ঠীর মোরিয়রা একসময় ছোটখাট ভূখণ্ড শাসন করত।

ঠিক শুনেছেন। তবে ইদানীং তারা প্রায় কপর্দক শূন্য।

যুবক বলল, আমার যতটুকু অনুমান পিপ্পলিবন এখান থেকে অনেকখানি দূরে।

আমি সেখান থেকে বেরিয়ে দুদিন ধরে পথ চলছি।

কিন্তু একা এই দুর্গম পথে!

যুবতী তার পোশাকের প্রান্ত দিয়ে মুখ ঢাকল।

মনে হচ্ছে তুমি ক্লান্ত আর উদ্বিগ্ন। এসো, আমরা এই গাছের তলায় কিছুক্ষণ বসি।

মেয়েটির চোখ থেকে আঁচল সরে গেল। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল কান্নায় ভেজা তার চোখ।

সে উদ্বিগ্ন গলায় বলল, সন্ধ্যার দেরি নেই, আমাকে নদী পার হয়ে যেতে হবে।

কিন্তু এখন তো খেয়াঘাটের মাঝিকে তুমি পাবে না, সে বেলা থাকতেই দূর গাঁয়ে চলে যায়।

যুবতী এবার পাশের গাছতলাতে বসে পড়ল। তার চোখেমুখে হতাশা আর আতঙ্কের চিহ্ন।

যুবক বলল, নদী পার হলেও অন্ধকার রাতে কয়েক ক্রোশ দূরের লোকালয়ে জঙ্গল পেরিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। হিংস্র চিতা আর ভল্লুকে ভরা এসব জঙ্গল।

দুহাতে কপাল চেপে ধরে মেয়েটি যুবকের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, তাহলে উপায়!

বড় অসহায় লাগছিল তাকে।

যুবক বলল, একটিমাত্র উপায় আছে, তোমার মনঃপুত হবে কিনা জানি না।

যুবতী অন্ধকারে যেন একটু আলোর রেখা দেখতে পেয়ে সেদিকে উৎসুক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল।

যুবতীকে আগ্রহী দেখে অপরিচিত যুবক বলল, আমি এক রাজপুরুষ, পার্শ্ববর্তী মগধ রাজ্য থেকে শিকারের আশায় এই জঙ্গলে এসেছি। জঙ্গলের ভেতরেই আমার লোকেরা শিবির ফেলেছে। তুমি ইচ্ছা করলে আমার শিবিরে রাতটুকু কাটাতে পার।

যুবতীর মনে হল, ঈশ্বরই রক্ষাকর্তা। সে বলল, অশেষ অনুগ্রহ আপনার। দুদিন পথ চলেছি, আশ্রয় মিলেছে লোকালয়ে। কিন্তু আজ ভোর থেকে জঙ্গল আমার সঙ্গী। দূরে কাছে কোথাও লোকালয়ের চিহ্নমাত্র নেই। আমি বড় অসহায় বোধ করছিলাম। আপনি ভগবানের দূত হয়ে এই মুহূর্তে আমার কাছে এসে পড়লেন।

যুবক বলল, আমি ভগবানের কি শয়তানের দূত তা জানি না, তবে অনেকখানি দূর থেকে একা তোমাকে অনুসরণ করছিলাম। আমি বনের আড়ালে আত্মগোপন করে চলেছিলাম বলে তুমি আমাকে দেখতে পাওনি। তোমাকে বড় উদ্বিগ্ন আর বিপন্ন বলে মনে হয়েছিল।

যুবতী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আপনি যেখানে নিয়ে যাবেন সেখানেই যাব। রাতে এই নির্জন জঙ্গলের ধারে একা পড়ে থাকলে ভল্লুকে শরীরটাকে চিরে ফেলত, নয়তো চিতায় খেয়ে ফেলত।

এখন ঐ হিংস্র প্রাণীদের আস্তানায় থেকেও তুমি আমার শিবিরে নির্ভয়ে রাত কাটাতে পারবে।

পশ্চিম আকাশে ধীরে ধীরে মুছে গেল সূর্যাস্তের রঙ। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসার আগেই অরণ্য শীর্ষে পৌর্ণমাসী চাঁদ তার রূপালি আলো ছড়িয়ে দিল।

চন্দ্রালোকে অরণ্য মায়াময়, প্রস্তরাকীর্ণ প্রান্তর প্লাবিত।

কিছুসময় নীরবে বসে থেকে রাজপুরুষ বলল, আজ সারাদিন মৃগয়ায় বড় ক্লান্ত ছিলাম। সঙ্গীদের শিবিরে পাঠিয়ে আমি একাই আসছিলাম খোলা প্রান্তরের দিকে, হঠাৎ তোমাকে দেখতে পেলাম গাছের আড়াল থেকে।

যুবতী বলল, আমার সৌভাগ্য।

কি নাম তোমার?

মুরা।

যুবক বলল, এই প্রথম এরকম একটি নাম শুনলাম।

নামটা নিশ্চয়ই আপনার ভাল লাগেনি।

নামের অধিকারিণীর মতই নামটি সুন্দর আর বলিষ্ঠ।

মুরা বুদ্ধিমতী। রাজপুরুষের প্রশংসায় সে মাথা নত করল।

যুবক বলল, সন্ধ্যার হাওয়ায় শরীর জুড়োতে এসেছিলাম,এখন মনও জুড়িয়ে গেল।

মুরা পাশের ঐ নদী তরঙ্গের মত হেসে উঠল। পক্ষকাল তার মুখে কোনও হাসি ছিল না। কেবল অভিশাপ আর ভর্ৎসনায় ভারী হয়ে উঠেছিল তার বুক। নিরন্তর অশ্রুপাতে শুকিয়ে গিয়েছিল তার চোখের জলের উৎস।

হাসলে যে?

যুবতী বলল, এই প্রথম একজনের মুখে নিজের প্রশংসা শুনলাম বলে।

বিশ্বাস হল না আমার কথা?

আপনার কথা বিশ্বাস না করি এমন শক্তি নেই, আবার পুরো বিশ্বাস করতেও ভরসা পাই না।

ধননন্দ কিন্তু অকারণে গুণগান করে না, সে যথার্থ গুণের সমাদর করতে জানে। তুমি যে আর পাঁচজনের থেকে বিশিষ্ট, এটা তোমার আকার, আচরণ থেকে সহজেই বোঝা যায়। এখন বল, সুন্দরী, সম্ভ্রান্ত এক নারী হয়ে তুমি একা এ পথে কেন? দীর্ঘ আর বিপদসঙ্কুল এই পথে?

মুরা বলল, আমি একা বলে।

তার অর্থ?

আমার স্বামী তাঁর আশ্রয় থেকে আমাকে পথে বের করে দিয়েছেন। তাই আমি একাই পথ চলছি।

তোমার অপরাধ?

তাও শুনতে চান?

বলা, না বলা তোমার ইচ্ছে।

তবে শুনুন, বার বছর বয়সে আমার বিয়ে হয়েছে। 'মোরিয়'দের কুলখ্যাতির জন্য বাবা আমাকে তাঁর সাধ্যাতীত ব্যয় করে বিবাহ দিয়েছিলেন। ধীরে ধীরে আমার স্বামী আমার সমস্ত অলঙ্কার খুলে নিয়ে স্বর্ণকারের কাছে বিক্রয় করেছেন।

দরিদ্র বলে তাঁর বুঝি সংসার প্রতিপালনের অন্য কোনও উপায় ছিল না?

দৈনন্দিন জীবনযাত্রার জন্য যতটুকু প্রয়োজন তার অভাব মোরিয়দের থাকার কথা নয়, কিন্তু আমার স্বামী তাঁর অতিরিক্ত পানদোষের জন্য সর্বস্ব খুইয়েছিলেন। শেষে ঐ নেশার টানে একটি একটি করে আমার সমস্ত অলঙ্কার উধাও হয়ে যায়।

এখন তোমার সঞ্চয়ে তেমন কোন অলঙ্কার নেই বলেই কি তোমাকে পথে বের করে দিয়েছেন?

না, আমি মোরিয়দের এতদিনেও কোন বংশধর দিতে পারিনি বলে।

ধননন্দ বুঝল, মেয়েটি অসংকোচে তার মনের কথা বলতে পারে।

এখন তাহলে কি তুমি তোমার পিত্রালয়েই আশ্রয় নেবে?

লোকমুখে সম্প্রতি আমি আমার বাবার মৃত্যুর খবর পেয়েছি। আমার মা আর একটিমাত্র ভাই বেঁচে আছে। তাদের কাছে গিয়েই আশ্রয়-প্রার্থনা করতে হবে। তারাও দরিদ্র।

ধননন্দ বলল, তুমি প্রথমে অবশ্যই পিতৃগৃহে যাবে, তবে তোমাকে আশ্রয় দেবার জন্য তোমার এই পথিক-বন্ধুর প্রাসাদ চিরদিনই খোলা থাকবে। আমি মগধের রাজপ্রাসাদেই থাকি।

কথাগুলো শুনে চরম দুঃখের ভেতরেও বুক ঠেলে কান্না উঠে এল মুরার। সে দুহাতের পাতায় চোখ চেপে ধরল।

যুবক হাত ধবল ষোড়শীর।

মুরা নিজের উচ্ছ্বসিত আবেগকে কিছুটা সংযত করল। সে কিন্তু যুবকের হাত থেকে তার হাত ছাড়িয়ে নিল না।

বিয়ের পর থেকে কোনও সহানুভূতিই আমি পাইনি, আজ প্রথম একজন হৃদয়বান মানুষের দেখা পেলাম।

তোমাকে আমার ভাল লেগেছে মুরা।

আবেগ বিহ্বল মুরা অস্ফুটে বলল, হে সুদর্শন দয়ালু যুবক, তোমাকেও।

এবার যুবক শুনতে পায় এমনিভাবে বলল, আপনি মগধের রাজপুরুষ, এই তথ্যটুকু জেনেছি, কিন্তু আপনার পুরো পরিচয় এখনও পাইনি।

যুবক বলল, আমার পিতা নন্দবংশের প্রথম রাজা মহাপদ্ম নন্দ। মগধে তাঁর রাজধানী। পিতা শুধু তাঁর সাম্রাজ্য থেকে নয়, এই বিশ্ব থেকেই বিদায় নিয়েছেন।

মুরা কৌতূহলী হয়ে উঠল, এখন তা হলে কে রয়েছেন মগধের সিংহাসনে?

যুবক বলল, আমার এক দাদা গোভিশ্যনক এখন মগধ সাম্রাজ্য শাসন করছেন।

এবার সকৌতুকে মুরা বলল, একজন পথচারিণীকে আপনি রাজপ্রাসাদে থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন, এতে আপনার অগ্রজ মহারাজ গোভিশানক ক্ষুব্ধ হতে পারেন।

তাঁর ক্ষোভের কোন কারণ নেই, আমরা প্রত্যেকেই এক একটা অংশ ভোগ করে থাকি। সেখানে মহারাজ কখনও খবরদারি করেন না।

মুরা বলল, দয়া করে আপনি আমার মত একজন নগণ্যকে যে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন সেজন্যে আমার গর্বের শেষ নেই। তবে উপযুক্ত সময়ই হয়ত একদিন মগধের প্রাসাদে আমাকে টেনে নিয়ে যাবে। তখন আমি নিজেই আপনার আশ্রয়প্রার্থী হব।

ধননন্দ বলল, তোমার যেমন অভিরুচি। আপাততঃ আমার অরণ্য শিবিরের আমন্ত্রণ গ্রহণ করলে আমি খুশি হব। চল, আমরা শিবিরে যাই। তুমি সারাদিন পথশ্রমে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছ।

মুরা উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, এ আমার আশাতীত সৌভাগ্য।

ধননন্দ সুদক্ষ ঘোড়সওয়ার। মুরাকে সামনে বসিয়ে দ্রুত গতিতে বনের ধারে ধারে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

একসময় নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে, ঘোড়া থেকে নামাল মুরাকে। তারপর একহাতে ঘোড়ার রাশ, অন্যহাতে মুরার বামহাত ধরে বনের ভেতর ঢুকে পড়ল ধননন্দ।

জ্যোৎস্নার আলোকে মায়াময় অরণ্য। আলো আঁধারির স্বপ্নময় জগৎ।

বনের ভেতর দিয়ে অল্পদূর অগ্রসর হতেই ওদের চোখে পড়ল মশালের আলো। শিবিরের বাইরে জ্বালা হয়ে আছে সারি সারি মশাল বন্য জন্তুদের দূরে রাখার জন্য। ঝল্লরী, পটহের নিনাদে কম্পিত হচ্ছে বনস্থলী।

স্বতন্ত্র তাঁবুতে মুরাকে নিয়ে প্রবেশ করলেন ধননন্দ।

মাঝরাতে নিশ্চুপ হয়ে গেল শিবিরের কলরব। মাঝে মাঝে অগ্নিকুণ্ডগুলো ধিক্ ধিক্ করে জ্বলছে। প্রহরীরা ঝিমুচ্ছে অগ্নিকুণ্ডের চারদিকে ঘিরে। মৃগয়ার পর ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছে সমস্ত শিবির। জেগে থাকার মত অবস্থায় একজনও কেউ নেই।

ধননন্দের বেশ বড় আকারের তাঁবুর পাশেই ছোট্ট একটি তাঁবু মুরার থাকার জন্য টাঙান হয়েছে. সারাদিন পথ চলার পর সে অঘোরে ঘুমোচ্ছে সেই তাঁবুতে।

হঠাৎ স্বপ্ন দেখল সে, একটা চিতা তার তাঁবুর চারদিকে রয়েছে। ঘন গাছের নিবিড় ছায়ায় ঢাকা পড়েছিল মুরার তাঁবু। সেই ছায়ার ভেতর তার মনে হল, ঐ ভয়ঙ্কর চিতাটার দুটো চোখ জ্বলছে। জানোয়ারটা তাঁবুতে ঢোকার পথ খুঁজছে হন্যে হয়ে। যেই মনে হল ও তাঁবুর কাপড় আঁচড়াতে শুরু করেছে অমনি আতঙ্কে ঘুমের ভেতরেই একটা চিৎকার করল ও। সে আওয়াজ শুনে পাশের তাঁবু থেকে একখানা বর্শা হাতে নিয়ে মুরার তাঁবুর ভেতর ঢুকে পড়ল ধননন্দ। ততক্ষণে মুরা ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় উঠে বসেছে বিছানার ওপর। ঘর্মাক্ত দেহে মহা আতঙ্কে সে প্রতীক্ষা করছে জন্তুটার আক্রমণের।

ধননন্দ মুহূর্তে বুঝে নিল, ভয়ের কোথাও কিছু নেই। হাতের বর্শাখানা মেঝেতে ফেলে দিয়ে সে এগিয়ে গেল মুরার একেবারে পাশটিতে। মুখে অভয় দিয়ে বলল, ভয় নেই, ভয় নেই, আমি রয়েছি তোমার পাশে।

সেই মায়াময় অন্ধকারে অভয়দাতাকে জড়িয়ে ধরল বিহ্বল ভয়ার্ত হরিণী। সে বাঁধন ভোরের শুকতারা জেগে ওঠার আগে আর কেউ খুলল না।

শেষরাতে পদ্মের মত একখানা মুখ জেগে রইল ধননন্দের বুকের ওপর।

পরদিন বেলায় ধননন্দের সঙ্গে খেয়াঘাটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল মুরা। চলার পথে কথা হচ্ছিল দুজনের।

এখনও ভেবে দেখ, তুমি আমার সঙ্গে মগধে যাবে কিনা? তোমার তো কোনও পিছুটান নেই।

মুরা মুখ নিচু করে পথ চলতে চলতে উত্তর দিল, আপনার কাছে একদিন আমাকে পৌঁছতেই হবে, তবে আজ নয়। এখন আমি পিতৃগৃহেই যেতে চাই। অমানুষ স্বামীর অত্যাচারের কাহিনী সবার কাছে না বললে ঐ মানুষটাই আমাকে গৃহত্যাগিনী ভ্রষ্টা বলে রটনা করবে। তবে আমি যেখানেই থাকি, আমার সমস্ত দেহ মন বাঁধা পড়ে থাকবে মগধের এক রাজপুত্রের কাছে।

আমিও তোমার জন্য প্রতীক্ষা করব। দূর অরণ্যে মৃগয়া করতে এসে তুমিই আমার শ্রেষ্ঠ লাভ।

ওরা এসে পৌঁছল খেয়াঘাটের কাছে। ওপারে নৌকা বাঁধা। তখনও মাঝি এসে পৌঁছায়নি।

হঠাৎ ধননন্দ লাল সুতোয় বাঁধা রূপোর ক্ষুদ্র একটি কবচ নিজের গলা থেকে খুলে নিয়ে মুরার হাতে দিয়ে বলল, এটি হিমালয়ে তপস্যারত এক সাধুর কাছ থেকে পাওয়া অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন একটি রক্ষা-কবচ। এই কবচ যে ধারণ করবে, সে নানা রকম বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পাবে। শুধু তাই নয়, এর

অলৌকিক ক্ষমতাবলে ধারণকারী অনেক অসাধ্য কাজও সম্পন্ন করতে পারবে।

মুরা বলল, এ কবচ নিয়ে আমি কি করব, এতে আপনারই প্রয়োজন। আপনি নিজের কাছে এটি রেখে দিন।

ধননন্দ বলল, তা আর হয় না।

মুরার গলায় বিস্ময় আর কাতরতা, কেন?

ধারণকারী যদি একবার একে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে, তাহলে দ্বিতীয়বার ধারণে কোনও ফলই সে পাবে না। কিন্তু অন্য কেউ ধারণ করলে এই কবচ ফলদায়ী হবে।

কান্নাভেজা গলায় মুরা বলল, তবে আপনি কেন এই শক্তিশালী কবচ আপনার কণ্ঠ থেকে খুলে ফেললেন? আমার মত অতি সাধারণ একটি মেয়ের কি প্রয়োজনের কথা ভেবে আপনি এ কাজ করলেন কুমার?

ধননন্দ বলল, যাকে ভালবাসা যায় তাকে সর্বস্ব দেওয়া যায়। তোমাকে ভাল লেগেছে মুরা। তোমার দুঃখ আমার বুকেও বেজেছে। কাল রাতে তোমাকে দুটো বাহুতে বেঁধে নিতে গিয়ে বুঝেছিলাম, তুমি চোখের জলের সাগরে ভাসছ, তাই যদি তোমার কিছু দুঃখ লাঘব হয় এই ভেবে দিয়েছি।

মুরা বলল, আপনার দান আমি মাথা পেতে নিলাম কেবল আপনার কথা ভেবে। এই কবচের কাছে রোজ প্রার্থনা জানাব, আপনার বিপদমুক্ত সুখী জীবনের জন্য।

ওপার থেকে মাঝিকে নৌকা বেয়ে আসতে দেখা গেল।

ধননন্দ মুরার হাত ধরে বলল, আমি তোমাকে তোমার পিত্রালয়ের দিকে এগিয়ে দিতে চেয়েছিলাম, রাজি হওনি। এখন একা চলতে হবে তোমাকে, কিন্তু ভাবনে, তুমি একা নও। আরও একজন রয়েছে তোমার পথ চলার সঙ্গী। তাছাড়া আমার দেওয়া কবচ এখন থেকে তোমাকে রক্ষা করুক।

নৌকা এসে ঘাটে লাগল। মগধের রাজকুমার, দরিদ্র অথচ সুশোভনা সম্ভ্রান্ত এক যুবতী কন্যাকে সযত্নে তুলে দিল সেই নৌকায়।

মুরা শেষবারের মত বলল, আপনি আর এদিকে না তাকিয়ে শিবিরে ফিরে যান কুমার, না হলে ওপারে গিয়ে পথচলা আমার অসম্ভব হয়ে উঠবে।

তাই হবে মুরা, এখন থেকে একরাত্রির সহবাসের মধুর স্মৃতিই হবে আমার সম্বল। তুমি তোমার পথে চলে যাও ভারমুক্ত মন নিয়ে, আর আমি যাচ্ছি আমার শিবিরে।

অচিরেই পিতৃগৃহে সন্তান-সম্ভবা হল মুরা। সে কিছুতেই স্থির করতে পারল না, অনাগত সন্তানটির আসল পিতা কে ! এ 'মোরিয়' বংশজাত না 'নন্দ'কুলোদ্ভব।

যে প্রভাতে সে স্বামীর দ্বারা লাঞ্ছিত হয়ে বিতাড়িত হল, তার পূর্ব রাত্রেই নির্মম স্বামীর লালসার শিকার হতে হয়েছিল তাকে। তার ঠিক দুদিন পরেই ঘটনাচক্রে নদীতীরের অরণ্যবাসরে সে স্বেচ্ছায় দেহদান করেছিল মগধের রাজকুমারকে। তাই অনাগত সন্তানের পিতৃত্বের প্রশ্নে তার পক্ষে সম্ভব হল না কোন সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছন।

শ্বশুরগৃহে তাকে অপমান করা হত বন্ধ্যা অপবাদ দিয়ে। আজ সে তা খণ্ডন করতে পেরেছে বলে গভীর আনন্দ পেল মনে মনে।

এ সন্তান যারই হোক না কেন, সে তার জননীকে মুক্তি দিয়েছে নারীত্বের অসহনীয় অপমানের হাত থেকে।

সন্তান ধারণের চতুর্থ মাসে মুরার জননী তাঁর পুত্রকে পাঠালেন কন্যার শ্বশুরগৃহে শুভসংবাদটা পৌঁছে দেবার জন্য।

চতুর্থ দিনে ফিরে এল মঙ্গল-সংবাদ-বাহক সেই দূত। মেঘবর্ণ, মেঘভারাক্রান্ত তার মুখ। শ্রান্ত ক্লান্ত অপমানিত হয়ে ফিরেছে সে।

মুরার মত প্রতিবাদমুখরা, স্বেচ্ছাচারী রমণীর এ সন্তানকে তারা কোনমতেই নাকি মৌরিয় বংশের সন্তান বলে স্বীকার করে নেবে না।

এই নিয়ে গুঞ্জন উঠল 'ময়ুর-পোষক' গ্রামে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর সেই গুঞ্জন কলরবে পরিণত হল।

সন্তানের একটি বছর পূর্ণ হবার আগেই মুরাকে ত্যাগ করে যেতে হল পিতৃগৃহ।

আবার সেই পথ। অনন্ত অনিশ্চয়তায় ভরা বিপদসংকুল সেই পথ।

এবার আর একা নয়, সঙ্গে দুর্দান্ত প্রাণচঞ্চল এক শিশু।

মুরা পিপ্পলিবনে শিশু নিয়ে শেষবারের মত বোঝাপড়ার জন্য ফিরে গেল না। সে পাটলিপুত্র নগরীর পথ ধরল। সেখানে সে খোঁজ করবে ধননন্দের। আশ্রয় যদি কোথাও সে পায়, তাহলে তা পাবে রাজভ্রাতা ধননন্দেরই কাছে। সেই অরণ্যের নিবিড় স্মৃতি কি এত সহজে ভুলে যাবার। সেই মধুর জ্যোৎস্না নিশি, বাহুবন্ধনে ভেসে যাওয়া, পাটলিপুত্রে সঙ্গী হওয়ার জন্য উত্তপ্ত আমন্ত্রণ, সেই আশাহত ভারাক্রান্ত মন নিয়ে খেয়াঘাট অবধি এগিয়ে দেওয়া, এখনও জ্বলজ্বল করছে স্মৃতির মুকুরে। ধননন্দ তার মুরাকে ফেরাবে না।

এই দৃঢ় বিশ্বাস মনে নিয়ে দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলল ভাগ্যান্বেষী মুরা।

অনেক নদী ও জলধারা পেরিয়ে, শস্যপূর্ণ ভূমি ও অনুর্বর প্রান্তর অতিক্রম করে, জনপদবাসীর নিবিড় আতিথ্য ও করুণা লাভ করতে করতে অবশেষে মুরা এসে পৌঁছল পাটলিপুত্রে।

নগরীর প্রান্তে একটি ছায়াছন্ন বৃক্ষের তলায় ক্লান্তি দূর করার জন্য বসে পড়ল মুরা। শিশুটি স্তন্যপান করে ঘুমিয়ে পড়ল মায়ের কোলে। মুরাও পথশ্রম দূর করার জন্য বৃক্ষের গায়ে হেলান দিয়ে তন্দ্রামগ্ন হল।

একসময় অনেকগুলি ঘণ্টার সম্মিলিত শব্দ কানে যেতেই চমকে জেগে উঠল সে। একি! তার শিশুটি গেল কোথায়।

মুরা উঠে দাঁড়িয়ে ইতস্তত তাকাতে লাগল। তোলপাড় করতে লাগল তার বুক।

হঠাৎ তার চোখে পড়ল, অদূরে একপাল গরু চরছে। তাদের গলায় বাঁধা ঘণ্টা থেকে ভারী মিষ্টি একধরনের ধ্বনি উঠছে।

তৃণভূমির নিকটেই অনেকগুলো গাছের জটলা। তারই ভেতর দাঁড়িয়ে আছে পশুপালকটি।

মুরা পাগলের মত ছুটে গেল তার দিকে। সে যদি শিশুটির কোনও সন্ধান দিতে পারে।

কাছাকাছি হতেই মুরা দেখতে পেল, পশুচারকটি নির্নিমেষ চোখে তারই দিকে তাকিয়ে আছে।

এবার লোকটি গাছতলা থেকে কি যেন কুড়িয়ে নিল, তারপর দ্রুতপায়ে এগিয়ে এল মুরার দিকে।

এই তো তার শিশুটি। পরম নিশ্চিন্তে জড়িয়ে ধরে আছে অপরিচিত মানুষটিকে। একবিন্দু উদ্বেগ কিংবা কান্নার চিহ্ন নেই তার চোখে। মুরাকে দেখে সে যেন দুষ্টুমির হাসি হাসছে, আরও জোরে জড়িয়ে ধরছে তার বাহকের গলা।

নিকটে এসে পশুচারক বলল, এ বাচ্চাটি কি আপনার দিদি?

মুরা বলল, তুমি একে পেলে কোথায় ভাই? ঐ সামনের গাছটার আড়ালে আমি ওকে ঘুম পাড়িয়ে কোলে নিয়ে বসেছিলাম, কখন নিজেও ঘুমিয়ে পড়েছি। তোমার গরুর গলার ঘণ্টার আওয়াজ পেয়ে ঘুম ভেঙে যেতেই দেখি, ও কোলে নেই। কি করে পালাল তোমার কাছে?

আমার মনে হয় আপনার কানে ঘণ্টার আওয়াজ পৌঁছবার বেশ কিছু আগেই ওর কানে শব্দটা পৌঁছেছে। আপনি বেশ গাঢ় ঘুমে ছিলেন, তাই জানতে পারেননি ও কখন এতখানি পথ চলে এসেছে। ও যে হামা দিয়ে এসেছে, তা বোঝা যাচ্ছে ওর হাঁটুর আঁচড় আর ধুলো দেখে।

মুরা বলল, ওর দোষের ভেতর সারাদিন প্রচণ্ড দস্যুবৃত্তি, আর গুণের ভেতর আপনপর ভেদাভেদ নেই।

পশুচারকটি হেসে বলল, তা তো দেখাই যাচ্ছে।

এবার গাছের জটলার ভেতর দুজনে বসে পড়ে গল্প করতে লাগল।

পশুপালকটিকে বেশ ভদ্র আর দয়ালু বলে মনে হল মুরাব।

কি নাম ভাই তোমার?

ভৃগু।

কে আছেন তোমার সংসারে?

বাবা মা গত হয়েছেন, সংসারে থাকার ভেতর বউ আছে।

ছেলে পিলে?

একটিও নেই। ঘর একদম ফাঁকা, বউ কাঁদে। আমি সারাদিন গরুর পাল নিয়ে ঘুরে বেড়াই, ওর একা ঘরে দিন কাটে না।

নিজের জীবনের কথা মনে পড়ল মুরার। সে অমনি বলল, কতদিন বিয়ে হয়েছে তোমার?

সাত বছর। পাড়াপড়শীরা বলে, ভৃগু তোর বউ বাঁজা, তুই আর একটা বিয়ে কর। আচ্ছা দিদি বলুন তো, ভগবান যদি দয়া না করেন তাহলে ও বেচারা বাচ্চা পাবে কোথা থেকে ? আমি আর একটা বিয়ে করলে ওর বুকটা ভেঙে যাবে, সেটা কি ভাল?

মুরার বড় ভাল লাগল ভৃগুকে। তার নিজের ব্যর্থ সংসার-জীবনের কথা ভেবে বুক ঠেলে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। ভৃগু বয়সে তার চেয়ে কয়েক বছরের বড়ই হবে, কিন্তু মনটা একেবারে শিশুর মত সরল আর পবিত্র। মুরার মনে হল, এমন মানুষ সংসারে দুর্লভ।

ভৃগুরও ভাল লেগে গিয়েছিল এই বিদেশিনীকে। সে যখন জানল, মুরা তার সন্তানকে নিয়ে বহুদূর পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে এবং পাটলিপুত্রে তার কোন পরিচিত মানুষ নেই, তখন সে হাত দুটি জোড় করে বলল, দিদি, বেলা পড়ে এল, আপনি আমার সঙ্গে চলুন আমার কুঁড়েতে। গরীবের ঘরে অসুবিধে অনেক, কিন্তু আমার বউ ভাবিনী তার সেবা দিয়ে আপনাকে তুষ্ট করে দেবে।

চোখে জল এসে গেল মুরার এই সামান্য পশুপালকের অযাচিত আমন্ত্রণ পেয়ে।

সে কান্নাভেজা গলায় বলল, যাব ভাই যাব, এমন ভাইয়ের বাড়ির কাছে রাজপ্রাসাদও তুচ্ছ হয়ে যায়।

ভাবিনী যথার্থই মধুর স্বভাবের মেয়ে। স্বামী-স্ত্রীর ছোট্ট সংসার, কিন্তু পরিচ্ছন্ন সুন্দর এক আনন্দ-নিকেতন। সবুজ গাছগাছালির ভেতর খড় পাতায় তৈরি ভৃগুর বাড়িখানা। ঝকঝকে নিকোন উঠোনের একদিকে কয়েকটি ফুলের গাছ। ভাবিনী এই গাছগুলির থেকে পুজার ফুল সংগ্রহ করে আনে। উঠোনের অন্যদিকে দু'একটি ফলের গাছ। গাছের তলায় বেশিক্ষণ পাতা পড়ে থাকতে দেয় না ভাবিনী।

কুঁড়ের সংলগ্ন একটি টানা ছাউনির তলায় ভৃগু পহালের সাতটি গরু থাকে। গরু নয়তো, এক একটা কামধেনু। খুব ভোরবেলাতেই স্বামী স্ত্রী মিলে গাভী দোহন করে। সে দুধ ভোরবেলাতেই রাজপ্রাসাদ থেকে এক পহেলবান এসে নিয়ে যায়। নামমাত্র মূল্যে বিকোয় এই দুধ। ভোরবেলায় রাজবাড়ির আখড়ায় কুস্তি লড়ার পর সবকটা পহেলবাজ মিলে ঐ দুধ পান করে। তারা বলে, এমন দুধ নাকি এ তল্লাটে মেলা ভার। এসব মন্তব্য করার পরও কিন্তু তারা দুধের দাম বাড়ায় না। তারা বলে, একবার কোন কিছুর দাম বাড়ালে সেটা পরপর বাড়তেই থাকবে, তা আর কমবে না। তারা নির্ধারিত ওজনের শস্য দিয়েই দাম চুকিয়ে দিত।

ভোরবেলা পহেলবান এসে দুধ নিয়ে যাবার পর গরু নিয়ে বেরিয়ে পড়ে ভৃগু। সবুজ তৃণভরা মাঠে মাঠে সে চরিয়ে বেড়ায় তাব পশুপাল। প্রতিটি গাভীর নাম রেখেছে ভাবিনী। কৃষ্ণা, পিঙ্গলা, ধবলী, সোমা, মঙ্গলা, সুরভি, নন্দিনী।

আসলে নামগুলো ভাবিনীর সংগ্রহ করে আনা। পাটলিপুত্র নগরীর প্রান্তে নদীতীরে বাস করেন ঋষিতুল্য এক বৃদ্ধ। সংসারে একাকী নিজের যৎসামান্য কাজ এখনও নিজে করেন। আর নিত্য শাস্ত্র পাঠে মগ্ন।

সেই বৃদ্ধকে প্রতিদিন সামান্য দুধ দিয়ে সেবা করে আসে ভাবিনী। তিনিই গাভীগুলির এইসব নামকরণ করে দিয়েছেন।

ভাবিনী যে গাভীটির নাম ধরে ডাকবে, সে ডাক ছাড়তে ছাড়তে ছুটে আসবে। অন্য গাভীগুলি কিন্তু উৎকর্ণ হয়ে থাকলেও আসবে না।

গোধুলিতে আঙিনায় এসে দাঁড়াবে সব কটি গাভী ও গোবৎস। তাদের সারা দেহে, বিশেষ করে গলকম্বলে ভাবিনীর হাতের ছোঁয়া না পড়লে তারা এক পাও নড়বে না।

গোয়ালে ভাবিনী প্রত্যেকের জন্য নির্দিষ্ট জায়গা স্থির করে রেখে দিয়েছে। গাভীগুলি একদিনের জন্যও অন্যের জায়গা অধিকার করে দাঁড়ায় না। ভাবিনীর নির্ধারিত স্থানটি তাদের এতই চেনা যে তারা ঠিক সেখানটিতে গিয়েই দাঁড়াবে।

সন্তানহীনা তার সমস্ত মমতা উজাড় করে দিয়েছে ঐ অবলা জীবগুলি. ওপর।

মুরা তার শিশুপুত্রটিকে নিয়ে ভৃগুর বাড়িতে ঢোকামাত্র পরিবর্তিত হয়ে .গল সমস্ত পরিবেশ।

ভৃগুর মুখে ভাবিনী যখন মুরার বৃত্তান্ত শুনল, তখন সে মুরার শিশুপুত্রটিকে তার নিজের বুকে টেনে নিল। দীর্ঘক্ষণ পরে আপন সন্তানকে কাছে পেলে মা যেমন তার শিশুটিকে আদরে সোহাগে চুম্বনে অস্থির করে তোলে, ভাবিনীও ঠিক তেমনি আচরণ করতে লাগল। আশ্চর্য! শিশুটিও একেবারে নির্বিকার। সে খিল খিল করে হাসল, দুহাতে জড়িয়ে ধরল ভাবিনীর গলা, তারপর একসময় মায়ের বুকের নিবিড় সান্নিধ্যে আর উত্তাপে সন্তান যেমন ঘুমিয়ে পড়ে তেমনি ঘুমিয়ে পড়ল। রাতে ভাবিনীর সঙ্গে একই শয্যায় শয়ন করল মুরা, কিন্তু সারারাত শিশুটি কণ্ঠলগ্ন হয়ে রইল তার হঠাৎ পাওয়া মায়ের।

পরদিন যথাসময়ে এল সেই পহেলবান। তখন উঠোন দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল শিশুটি।

আরে, এক রাতের ভেতর এই বাচ্চাটা এল কোথা থেকে !

ভাবিনী বলল, আমার এক বোন এসেছে, তার বাচ্চা।

কথা শেষ হতে না হতেই দেখা গেল বাচ্চাটি পহেলবানের কাছে হাজির। সে কুস্তিগিরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাকে নিরীক্ষণ করতে লাগল।

এত বিশাল আকারের মানুষ সে আগে কখনও দেখেনি, তাই তার বড় বড় চোখে উপচে পড়ছিল বিস্ময়।

হঠাৎ তার সমস্ত দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত হল পহেলবানের গোঁফ জোড়াটির ওপর। অমনি তার মনে হল, এই বস্তুটিকে হ্যাঁচকা টান মেরে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। যেই ভাবা সেই কাজ। সে বিশাল দৈত্যটির কাছে এগিয়ে গেল নির্ভীক পা ফেলে। খামচে ধরল তার বিশাল আকারের অতি পুষ্ট গোঁফ।

তবে রে বেটা, বলে হুঙ্কার ছেড়ে পহেলবান বাচ্চাটাকে ছুঁড়ে দিল শূন্যে।

সকলে ভীত, সচকিত।

এবার পহেলবানই ধরে নিল তাকে।

শিশুটি আতঙ্কে কেঁদে উঠবে বলে ভেবেছিল সকলে, কিন্তু দেখা গেল সেই অকুতোভয়, অদম্য প্রাণশক্তি সম্পন্ন শিশুটি সশব্দে হেসে উঠছে। যত বারই ছুঁড়ে দিচ্ছে, খিলখিলিয়ে হাসছে ততবার।

পহেলবান একসময় ওকে মাটিতে নামিয়ে দিয়ে বলল, এ ছেলে কোনদিন ভয় পাবে না কারোর কাছ থেকে, বরং একেই সকলে ভয় করবে, মান্যি করে চলবে।

কয়েকদিন পরে ছেলেকে কোলে নিয়ে ভাবিনী চলল সেই ঋষিতুল্য জ্ঞানী বৃদ্ধটির কাছে। সঙ্গে মুরার হাতে দুগ্ধজাত কিছু খাদ্যবস্তু। সে নিজের হাতে তৈরি করা এই খাদ্য জ্ঞানীপ্রবর বৃদ্ধটিকে নিবেদন করতে চায়।

অবশ্য ভাবিনীদের আজকের যাত্রার বিশেষ এক উদ্দেশ্য আছে। শিশুটির উপযুক্ত একটি নামকরণ।

ওরা দূর থেকে দেখল, জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ সৌম্য দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর পর্ণকুটিরের দ্বারে। এক শিখাযুক্ত পণ্ডিত সেইমাত্র তাঁকে প্রণাম জানিয়ে বিদায় নিলেন।

পণ্ডিত যখন তাদের অতিক্রম করে গেলেন তখন মনে হল, এক জ্বলন্ত মশালের মত তিনি জ্বলছেন। তাঁর সুপুষ্ট শিখাটিতে একটি রক্তপুষ্প বাঁধা। গমনের সঙ্গে সঙ্গে ঐ শিখা মাঝে মাঝে নৃত্য করছিল। দূর

থেকে মনে হচ্ছিল, ওটি রক্তবর্ণের আগুনের কৃষ্ণবর্ণ শিখা।

পণ্ডিতের মুখভাব, পদসঞ্চার এতই দৃঢ়তাব্যঞ্জক যে তাঁকে দেখলে মানুষ সহজেই সংকুচিত হয়ে পড়ে।

ওরা এসে গেল কুটিরের একেবারে সন্নিকটে। বৃদ্ধ মানুষটি ওদের দিকে তাকিয়ে হাসছেন। এমন অনাবিল হাসি নিশীথ রাত্রির উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলিই হাসতে পারে।

ওরা প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই উনি বললেন, আজ নতুন সব মানুষের আগমন দেখছি।

ভাবিনী বলল, ও আমার এক পথে কুড়িয়ে পাওয়া দিদি। এটি ওরই একমাত্র সন্তান।

তা বেশ। বাইরে দাঁড়িয়ে কথা নয়, ভেতরে চল, আলাপ হবে।

এরা ভেতরে গিয়ে খাবারগুলি নিবেদন করল।

জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ সৌম্য বললেন, এগুলি কি বস্তু?

মুরা বিনীতভাবে বলল, দুগ্ধে প্রস্তুত পিষ্টক। এর নাম 'চন্দ্রকান্তি'।

বাঃ চমৎকার। চন্দ্রের মতই কান্তিবিশিষ্ট, নিঃসন্দেহে স্নিগ্ধ ও উপাদেয়। অমৃতভোগ।

সকলে বৃদ্ধকে ঘিরে বসল।

এতক্ষণে বৃদ্ধের দৃষ্টি নিবদ্ধ হল শিশুটির ওপর। বেশ কিছুসময় তিনি তার দিকে তাকিয়ে রইলেন অপলক চোখে। আশ্চর্য! চঞ্চল শিশুটিও স্থির হয়ে মায়েদের সঙ্গে বসে বৃদ্ধের দিকে চেয়ে রইল।

ভাবিনী নীরবতা ভেঙে বলল, বাবা, আপনার কাছে আমি আমার বোনকে এনেছি তার ছেলের একটা নামকরণ করে দেবার জন্য।

মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন বৃদ্ধ। বললেন, তুমি 'চন্দ্রকান্তি' নিয়ে এসেছ, তোমার ছেলের নাম তো তুমিই ঠিক করে ফেলেছ মা।

ভাবিনী বলল, কি রকম?

এর নাম হবে চন্দ্র। কিন্তু এখন ও অমাবস্যার অন্ধকারে অপ্রকাশিত বা গুপ্ত, তাই এখনই ওর নামকরণ করতে গেলে পূর্ণ নাম হবে চন্দ্রগুপ্ত।

অবশ্য অমাবস্যা বিদীর্ণ করে চন্দ্র যেমন ধীরে ধীরে প্রকাশিত হয়, এই শিশুও তেমনি একদিন পূর্ণচন্দ্রের মহিমা নিয়ে প্রকাশিত হবে।

ঋষি সৌম্য যেন ধ্যানস্থ হয়ে কথাগুলি বললেন।

মুরা বলল, ও বড় দুর্দান্ত। কখন কি করে বসে, এই ভয়। হাতের কাছে যা পায় তাই ভেঙে ফেলে।

ঋষি সৌম্য আরও গভীর হলেন। তিনি যেন দিব্যদৃষ্টিতে সবকিছু দেখতে পাচ্ছেন।

ও বড় হলে অনেক কিছু ভাঙবে। কিন্তু সেটা অনেক বড় কিছু একটা গড়ে তোলার জন্য। আমি যতই ওর দিকে তাকাচ্ছি, ততই আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি।

সামান্য সময় নীরব থেকে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা সৌম্য মুরার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার কি পরিচয় মা?

আমার পিতৃদত্ত নাম মুরা। আমি 'ময়ুর-পোষক' গ্রামের কন্যা। আমার বাবা ছিলেন ওখানকার গ্রাম-নায়ক। আমার বিয়ে হয়েছিল হিমালয়ের পাদদেশে পিপ্পলিবন নামে একটি জায়গায়। আমার শ্বশুরকুল শাক্যগোষ্ঠীর 'মোরিয়' বংশজাত ক্ষত্রিয়।

তোমার পুত্রের ললাটে একটা শুভযোগ দেখতে পাচ্ছি। ও হয়ত একদিন রাজচক্রবর্তীও হতে পারে। আর তখন ঐ 'ময়ূর-পোষক', 'মোরিয়' আর তোমার ঐ 'মুরা' নাম থেকে ওর প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের নাম হবে 'মৌর্য সাম্রাজ্য'। ও তখন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য নামে বিদিত হবে।

মুরা বলল, বাবা আমি অতি দুঃখী। রাজমাতা হবার স্বপ্ন দেখি না। আপনি শুধু আমার সন্তানকে আশীর্বাদ করুন, যেন সে সুস্থ থেকে কর্মঠ পাঁচজনের একজন হতে পারে।

ঋষি সৌম্য ও প্রসঙ্গে আর কোনও কথা বললেন না। তিনি শুধু মৃদু হেসে তাঁর হাতখানি তুললেন।

দুই

ও মেয়ে, তুমি চলে যাচ্ছ কেন, ভাবী মহারাজ অনুগ্রহ করে তোমাকে সাক্ষাতের অনুমতি দিয়েছেন।

মুরা ভাবিনীর কাছে ছেলেটিকে রেখে পহেলবানের সঙ্গে এসেছিল রাজপ্রাসাদ দেখতে। মনে মনে ইচ্ছা ছিল, যদি মৃগয়ায় আসক্ত সেই রাজপুরুষটির দেখা পাওয়া যায়।

অপূর্ব কাঠের কাজকবা প্রাসাদটি ঘুরে ঘুরে দেখছিল সে। চারদিকে সান্ত্রী সেপাই, হাতি ঘোড়া লোকলস্কর।

মুরার সামনে লাঠি কাঁধে তুলে লম্বা লম্বা পা ফেলে চলেছিল সেই পহেলবান। তাকে অনুসরণ করে প্রায় ছুটতে ছুটতেই চলেছিল মুরা। সে দ্রুতবেগে পা চালালেও হাঁ করে দেখছিল প্রাসাদের মনোরম সৌন্দর্য।

সহসা তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হল প্রাসাদ অলিন্দে।

ঐ তো! ঐ তো সেই রাজপুরুষ, যাঁর সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল নদীতীরের অরণ্যে। যিনি পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার মত সেই রাত্রিতে তাকে প্লাবিত করে দিয়েছিলেন ভালবাসায়।

মুরা ছুটে গিয়ে থামাল সেই পহেলবানকে।

ঐ যে, ঐ রাজপুরুষ দাঁড়িয়ে আছেন, ওঁর সঙ্গে আমি একটু দেখা করতে চাই।

পহেলবান ওপরের দিকে তাকিয়ে বলল, আরেব্বাস। হবু সম্রাটের কাছে তোমার আর্জি পেশ করতে গেলে হয়ত আমার গর্দানটাই যাবে।

মুরা বলল, না না, মানুষটি খুব ভাল, গর্দানটর্দান নেবার ধান্দা নেই ওঁর।

তুমি চিনলে কি করে?

বছর দুয়েক আগে উনি শোননদীর তীরে মৃগয়ায় গিয়েছিলেন, সে সময় হঠাৎ ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

পহেলবান বলল, হবু সম্রাটের খাস দেহরক্ষীকে তোমার আর্জিটা আমি জানাতে পারি, মঞ্জুর হবে কিনা বলতে পারি না। হাঁ, কি নাম বলব তোমার?

বলবে, শোনতীরের অরণ্যে দেখা সেই মেয়েটি, যার নাম 'মুরা'।

পহেলবান ঢুকে গেল রাজপ্রাসাদে, আর পথের একপাশে দাঁড়িয়ে মুরা তাকিয়ে রইল প্রবেশপথের দিকে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে তার মনে হল, এ-সে কি করতে চলেছে। যে মানুষটি সম্রাট হবার জন্য তৈরি, সে কেনই বা তার মত পথচারী একজন অতি সামান্য মেয়েকে মনে রাখবে!

মুরা পায়ে পায়ে সে স্থান ত্যাগ করে ভাবিনীর গৃহের দিকে চলতে লাগল। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই পহেলবান পেছন থেকে চেঁচিয়ে জানাল, তার সাক্ষাতের আবেদন মঞ্জুর হয়েছে।

এখন রাজ-আহ্বানকে উপেক্ষা করে পেছন ফেরার আর কোনও উপায় নেই।

মুরা পহেলবানের নির্দেশে ভিন্ন এক প্রাসাদ-রক্ষীর সঙ্গে প্রাসাদে প্রবেশ করল।

অতি সুসজ্জিত সব কক্ষ পার হয়ে যেতে লাগল সে। প্রাসাদরক্ষী নারীপুরুষ বল্লম হাতে দাঁড়িয়েছিল স্থির প্রস্তরপ্রতিমার মত। অলিন্দে অলিন্দে পিঞ্জরে বন্দি বহুবর্ণের বিহঙ্গ কুল। মাঝে মাঝে তারা শিস দিয়ে বাতাসে সুমিষ্ট তরঙ্গ তুলছিল।

অনেকগুলি প্রকোষ্ঠ আর অলিন্দ অতিক্রম করে হবু সম্রাট ধননন্দের দেহরক্ষী মুরাকে এনে তুলল একটি সুসজ্জিত কক্ষে। তারপর তাকে একটি বহুমূল্য আসনে সবিনয়ে বসতে বলে ঘরের বাইরে চলে গেল। মুরা কিন্তু অতি মূল্যবান আসনটিতে সংকোচে বসতে পারল না। সে বিহ্বল দৃষ্টিতে ঘরের আসবাবপত্র দেখতে লাগল।

এক সুন্দরী রমণী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল করজোড়ে। অত্যন্ত নম্র আর সুমিষ্ট কণ্ঠে বলল, আপনি আসন গ্রহণ করুন, এখুনি রাজাধিরাজ এই কক্ষে প্রবেশ করবেন।

অগত্যা বহু সংকোচে নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করল মুরা। সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরী রমণীটি গৃহ থেকে

নিষ্ক্রান্ত হল।

পরমুহূর্তে ঘরে প্রবেশ করলেন ধননন্দ।

উঠে দাঁড়িয়ে ধননন্দকে নত হয়ে নমস্কার করল মুরা।

ধননন্দ মুরার হাত ধরে নিয়ে গিয়ে একটি পালঙ্কে বসিয়ে দিলেন। নিজেও তার পাশটিতে বসলেন।

এবার মুরার একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে ভরে নিয়ে বললেন, এতদিন পরে আমার ডাকে সাড়া দেবার সময় পেলে?

এই সামান্য কথাটুকুর ভেতর হৃদয়ের যে উত্তাপ ছিল, তা মুরার বুকের পাষাণভারকে গলিয়ে ঝরিয়ে দিল। তার চোখের জল মুক্তোর বিন্দুর মত ঝরে পড়তে লাগল তার গাল বেয়ে।

ধননন্দ এ দৃশ্য দেখে কিছুটা বিচলিত হলেন।

তিনি বললেন, শান্ত হও মুরা, পরামর্শ আছে তোমার সঙ্গে।

মুরা বস্ত্র প্রান্ত দিয়ে চোখের জল মুছল।

ধননন্দ বললেন, আমার দাদা গোভিশ্যনক মগধের সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন। মাসাধিককাল হল তিনি পরলোকগমন করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই সিংহাসনের ভার বইতে হবে আমাকে। পণ্ডিতরা বিধান দিয়েছেন, কয়েকদিন পরে যে শুভযোগ আসছে, ঐ যোগেই আমার রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হবে।

মুরা বলল, আপনি চিরদিনই সৌভাগ্যশালী, প্রজাদের সন্তানের মত পালন করলে আপনার সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বে। আপনার শক্তি আর সমৃদ্ধিরও অন্ত থাকবে না।

তুমি আমার পাশে থাকলে আমি অনেক প্রেরণা পাব, মুরা।

আনত হল মুরার মুখমণ্ডল। একসময় মুখ তুলে বলল, আমি অতি সাধারণ এক নারী সম্রাট। আপনাকে পরামর্শ বা প্রেরণা দেবার সামর্থ আমার নেই। আমার বাবা বলতেন, মানুষের শক্তির উৎস তার নিজের মধ্যে। সেই শক্তি জাগিয়ে তুলতে হয় নিজেকেই। আপনি নিজেই পারবেন আপনার শক্তি আর শুভবুদ্ধিকে জাগাতে।

তবু, আমি কি আমার পাশে তোমাকে চিরদিনের করে পাব না?

মহারাজ, আপনারা রাজ্যের পর রাজ্য জয় করে পরাজিত রাজ্য থেকে সুন্দরী রমণীদের নিয়ে আসেন। তাদের কাছে আমি একান্ত গ্রাম্য আর বে-মানান।

তোমার গ্রাম্য সরলতার সঙ্গে মিশেছে অফুরন্ত সাহস। এই শ্রী যে নারীর ভেতর রয়েছে তাকে চাইলেই পাওয়া যায় না। তাই শোননদীর ধারে সেই অরণ্যভূমিতে তোমাকে দেখামাত্র আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। আমার কাছে সেদিন যেসব দেহরক্ষী ছিল, তারা তোমাকে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও আমার প্রাসাদে তুলে আনতে পারত। কিন্তু আমি তা করিনি। কারণ অনিচ্ছুকের দেহটাকেই কেবল জোর করে টেনে আনা যায়, কিন্তু তার মধুর স্বভাবে গড়া ঐ মনটাকে নয়। তাই তোমাকে সেদিন জোর করিনি, শুধু আমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছিলাম।

আপনার যেমন অভিরুচি, তাই হবে মহারাজ। আজ স্বেচ্ছায় এসেছি আপনার কাছে। কোন উদ্দেশ্য বা কামনা নিয়ে নয়।

তুমি অভিষেক না হওয়া পর্যন্ত এই কক্ষে থাকবে। তোমার পরিচর্যায় নিযুক্ত থাকবে পাঁচজন পরিচারিকা। অভিষেকের পর প্রাসাদ থেকে অনতিদূরের এক উদ্যানে তোমার থাকার ব্যবস্থা হবে। সেখানেই আমি খুঁজে পাব আমার তৃষ্ণার শান্তি আর তপ্ত মনের আশ্রয়।

মুরা আবার বলল, আপনার যেমন অভিরুচি।

ধননন্দ সামান্য সময় কিছু ভেবে নিয়ে বললেন, মৃগয়া থেকে ফিরে আসার পর আমাকে দার পরিগ্রহ করতে হয়েছে। একবার নয়, দুবার মহারাজ গোভিশ্যনকের আদেশে। রাজ্যের সুস্থিরতা কিংবা কূট রাজনৈতিক কারণে এক রাজ্যের সঙ্গে অন্য রাজ্যের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়।

মহারাজ ধননন্দ থামলেন। তিনি এ বিষয়ে মুরার মনের কোন প্রতিক্রিয়া হয় কিনা জানার জন্য

অপেক্ষা করতে লাগলেন।

মুরা কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য কথার অবতারণা করল।

মহারাজ, আমি পাটলিপুত্রে এক দরিদ্র গোপালকের আশ্রয়ে রয়েছি। বিদায় নেবার জন্য আমাকে তাদের কাছে একবার ফিরে যেতে হবে।

অবশ্যই তুমি যাবে। রাজবাড়ির শিবিকা তোমাকে নিয়ে যাবে সেখানে।

ভৃগু আর ভাবিনীর কাছে মুরা কেবল বলল, আমার পূর্ব পরিচিত এক গজপুরুষের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তার কৃপায় আমি রাজবাড়িতে আশ্রয় আর কাজ পেয়েছি। তাঁরা আমাকে একটি শর্ত দিয়েছেন, রাজপ্রাসাদের এলাকা ছেড়ে আমার বাইরে কোথাও যাওয়া চলবে না।

মুরার কথা শেষ হওয়ামাত্র বুক চাপড়ে কাঁদতে লাগল ভাবিনী। মুখে বারবার বাজতে লাগল এক কথা, আমি চন্দ্রকে ছেড়ে কি করে থাকব।

ভৃগু সেই যে মাথায় হাত দিয়ে মুখ নিচু করে বসে রইল, সে আর মুখ তুলল না।

উঠোনে ঘণ্টাধ্বনি শুনে তিনজনেই তাকাল সেদিকে।

একটি বাছুরের গায়ে হেলান দিয়ে তার গলায় বাঁধা ঘণ্টা ধরে নাড়ছে চন্দ্র। আশ্চর্য! চঞ্চল বাছুরটা কিন্তু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কান্না ভুলে ছুটে এল ভাবিনী। সে বুকে তুলে নিল চন্দ্রকে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

আর একটুখানি দেরি হলেই বাছুরটার ডাকে ছুটে আসত তার মা। তখন চন্দ্র তার শিঙের গুঁতোয় আহত হতে পারত।

ভৃগু গাভীটাকে একটু দূরে সরিয়ে বেঁধে দিয়ে এল।

মুরা বলল, তোমাদের স্নেহ ভালবাসা দেখে আমার মনে হচ্ছে, তোমরাই চন্দ্রের আসল মা বাবা। আমি একটি শর্তে চন্দ্রকে তোমাদের কাছে রেখে দিতে পারি।

ওরা সঙ্গে সঙ্গে তাকাল মুরার দিকে। ওদের কান যেন কোন দৈববাণী শোনার জন্য সজাগ হয়ে রইল।

আজ থেকে ভাবতে হবে, চন্দ্র ভাবিনীর গর্ভজাত সন্তান। শিশুও দিনে দিনে তাই জানবে। কেবল ঋষি সৌম্য ছাড়া অন্য কেউ ওর আসল পরিচয় জানবে না।

ভৃগু বলল, তাই হবে।

ভাবিনী আনন্দে বুকে চেপে ধরল শিশু চন্দ্রগুপ্তকে।

মুরা বলল, চন্দ্র মহাভাগ্যবান। ওকে ওর ভাগ্যই চালিয়ে নিয়ে যাবে। ও যখন ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠবে, তখন ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমরা কোন বাধা দেবে না। ও যেখানে যেতে চায়, যা করতে চায়, তাই করতে দিও।

ভাবিনী বলল, তোমার কথা মতই কাজ হবে দিদি।

মুরা বলল, আর একটি কথা।

বল কি কথা।

আমি যে রাজবাড়ির আশ্রয়ে রয়েছি, একথা কেউ যেন না জানতে পারে।

ভৃগু বলল, কিন্তু আর কেউ না হোক, ঋষি সৌম্য যখন তোমার কথা জানতে চাইবেন তখন আমি কি উত্তর দেব।

তাঁর কাছে কোনও সত্যই গোপন রাখার দরকার নেই। তিনি যা প্রশ্ন করবেন, তার সঠিক উত্তর দিও। তাছাড়া......

কথাটা শেষ না করে মুরা কিছু ভাবছে দেখে ভৃগু বলল, তাছাড়া কি দিদি?

মুরা বলল, তাছাড়া উনিই একমাত্র মানুষ। যাঁর কাছ থেকে তোমরা প্রয়োজনে পরামর্শ নেবে। আগেই বলেছি, চন্দ্র তার ভাগ্যের বলেই অনেক কিছু লাভ করবে, কিন্তু তাকে ঠিক পথে চলবার নির্দেশ দেবেন

ঋষি সৌম্যের মতোই মানুষ।

আমি আপনার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করব দিদি।

রাজবাড়ির যে শিবিকায় চড়ে মুরা গোপালক ভৃগুর বাড়িতে এসেছিল, সেই শিবিকাতেই সে রাজপ্রাসাদে ফিরে গেল। যাবার সময় একবার শুধু ছেলের মুখের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকাল। চুম্বন করল না, কিংবা আবেগে জড়িয়ে ধরল না।

দিনে দিনে বড় হতে লাগল চন্দ্রগুপ্ত। সে বনের ধারে মহানন্দে গরু চরিয়ে বেড়ায়। ভৃগু ওকে গরু চরাতে দিয়ে মাঝে মাঝে ক্ষেত খামারের কাজ সামলায়।

একদিন বনের ধারের মাঠে গরুর পাল ছেড়ে দিয়ে চন্দ্রগুপ্ত ঢুকল বনের মধ্যে।

বেশ কিছুটা ভেতরে ঢুকে সে একটা তৃণাচ্ছাদিত ফাঁকা জায়গা দেখতে পেল। ঐ জায়গাটির পরেই আবার বড় বড় গাছে ভরা জঙ্গল। তাদের ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে ঝিলিক দিয়ে উঠছিল একটা বয়ে চলা নদী।

ঐ ফাঁকা জায়গাটির ওপর দিয়ে সাঁ সাঁ আওয়াজ তুলে ছুটে গেল কয়েকটা তীর। ঐ তীরগুলোর পেছনে ধবধবে সাদা পালক গোঁজা।

কে, কোথা থেকে ছুঁড়ছে, কি উদ্দেশ্যেই বা ছুঁড়ছে, তার হদিস করতে না পেরে কিশোর চন্দ্রগুপ্ত ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। সে ভয় পেল না, কিংবা পিছু হটে গেল না, তার কৌতূহল ক্রমেই বেড়ে চলল।

এবার চন্দ্রগুপ্ত তীরের গতিপথ লক্ষ করতে গিয়ে দেখল, তীর সরলরেখায় কিংবা নীচ থেকে ওপরের দিকে ছুটছে না। ওগুলো বরং ওপর থেকে কিছুটা নীচের দিকেই ছুটছে। সঙ্গে সঙ্গে সে পেছন ফিরে বনের বড় বড় গাছগুলোর দিকে তাকাল।

হ্যাঁ, এতক্ষণে ধরতে পেরেছে সে। ঐ তো, বিশাল এক বটবৃক্ষের প্রসারিত ডালের ওপর দাঁড়িয়ে আছে একটি ব্যাধ জাতীয় লোক। সে ধনুর জ্যা আকর্ষণ করে তীর ছুঁড়ছে।

আবার সামনের দিকে ফিরল চন্দ্রগুপ্ত। তীরগুলো সঠিক কোথায় গিয়ে বিদ্ধ হচ্ছে, তা দেখার জন্য তাব অনুসন্ধিৎসু চোখ এখন আরও সজাগ আর তীক্ষ্ণ হল।

এখন একটি শ্বেত পুচ্ছওয়ালা তীরকে বিদ্যুৎগতিতে অনুসরণ করল চন্দ্রগুপ্তের চোখ।

মনে হল, তীর গিয়ে বিদ্ধ হয়েছে প্রান্তরের ওপারে একটি গাছে। অমনি তার অনুমান সঠিক কিনা জানবার জন্য সে ছুটে চলল প্রান্তর পেরিয়ে।

এতক্ষণ জোরাল একটা হাওয়া গাছের ডালপালা কাঁপিয়ে বইছিল। ফাঁকা প্রান্তরের ভেতর দিয়ে ছুটে যাওয়ার সময় চন্দ্রগুপ্ত সে হাওয়ার বেগ উপলব্ধি করল।

ওপারের বনে ঢুকে গিয়ে সে দেখতে পেল, স্ফীতকায় একটি গাছের কাণ্ডে প্রকৃতি মস্তবড় একটি ছিদ্র তৈরি করেছে। সে ছিদ্রের চারদিক রক্তবর্ণের প্রস্তরচূর্ণ দিয়ে রাঙান।

সাদা পুচ্ছওয়ালা তীরগুলি কে যেন সাজিয়ে রেখেছে একটি তূণের ভেতর।

চন্দ্রগুপ্ত এবার প্রান্তর পেরিয়ে এপারে এল। আসামাত্রই দেখতে পেল, গাছ থেকে নেমে ব্যাধটি তার দিকেই এগিয়ে আসছে। সে ব্যাধের দিকে তাকিয়ে নির্ভয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

শিকারিটি চন্দ্রগুপ্তের সামনে এসে বেশ কিছুক্ষণ ধরে তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করল।

এখানে কি করছ তুমি?

চন্দ্রগুপ্ত উত্তর দিল, তোমার তীর ছোঁড়া দেখছিলাম।

ওপারে গিয়ে কি দেখে এলে?

তোমার অবাক করা কেরামতি।

কি রকম?

এতদূর আর ওপর থেকে যে তীর ছুঁড়েছ, তার প্রত্যেকটি কে যেন গাছের ঐ কোটরে সাজিয়ে রেখে

দিয়েছে।

তীরের পেছনে যে সাদা পালকগুলো রয়েছে, সেগুলোর দিকে ভাল করে তাকিয়েছ কি ?

ওগুলো এমনভাবে সাজান হয়েছে, দেখে মনে হচ্ছিল একটা সাদা ময়ূর চক্রাকারে তার পেখম মেলে ধরেছে।

সাবাস!

চন্দ্রগুপ্ত বলল, তুমি কি করে একাজ করলে, আমি অবাক হয়ে ভাবছি।

এই কাজটা কিন্তু খুব সহজে হয়নি। হাওয়া যদি স্থির থাকে, তাহলে সহজেই তীর লক্ষ্যভেদ করতে পারে, কিন্তু এলোমেলো ঝোড়ো হাওয়ায় লক্ষ্য স্থির রাখা কঠিন। হাওয়ার গা ি বুঝে তীর ছুঁড়তে হয়। আজ সেই এলোমেলো ঝোড়ো হাওয়ার দিন।

চন্দ্রগুপ্ত বলল, তোমার একটি তীরও কিন্তু লক্ষ্য থেকে বেরিয়ে যায়নি। এখন আর একটা প্রশ্ন আমি তোমাকে করব, যদি উত্তর দাও।

বল, কি প্রশ্ন।

তুমি এমন করে তীর চালিয়ে কি লক্ষ্যভেদ অভ্যেস করছ?

ঠিক তাই। তবে ঝোড়ো হাওয়া বা প্রতিকূল হাওয়ার ভেতরে কিভাবে লক্ষ্য স্থির রাখতে হয়, তাই অভ্যেস করছি।

এ রকম অভ্যেস করার কারণ?

আমি শিকারি, তাই এসব আমাকে শিখতে হয়। ধর, তীব্র বেগে হাওয়া বইছে। একটা হরিণ লাফ দিয়ে সেই বাতাস চিরে বেরিয়ে যাচ্ছে। তার চলার বেগ, বাতাসের বাধা দেবার ক্ষমতা, সবকিছু অনুমান করে তীর চালাতে হয়। তা ছাড়া, এই পাটলিপুত্রের নন্দরাজারা যখন যুদ্ধে চলছে, আমরা অদূরে পাহাড়ের আড়ালে দাঁড়িয়ে তীর ছুঁড়ছি, বাতাস বইছে এলোমেলো, এ অবস্থায় অনেক হিসেব করে তীর চালাতে হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে অকারণে একটা তীর নষ্ট হয়ে যাওয়া, অনেক ক্ষতি।

চন্দ্রগুপ্ত দারুণভাবে আকৃষ্ট হল এই শিকারিটির ক্রিয়াকর্মে। সে অনুনয়ের সুরে বলল, তুমি আমাকে তীর চালাবার কৌশলগুলো শেখাবে?

শিকারি বলল, নিশ্চয়ই শেখাব। তোমার আগ্রহ দেখে আমার খুব ভাল লেগেছে। শুধু তীর কেন, বর্শা, তলোয়ার চালাতেও শিখবে।

কোথায় তুমি আমাকে শেখাবে?

কেন, এইখানে। বনের ভেতর নির্জন জায়গা বলে এখানে কেউ আসে না। আমি মনের আনন্দে একা একা বছরের পর বছর এখানে অভ্যেস করেছি। আমি যা কিছু আমার গুরুর কাছ থেকে শিখেছি, সবই তোমাকে শিখিয়ে দেব।

আমি রোজ এই সময় আসব।

কি নাম তোমার?

চন্দ্রগুপ্ত।

বাঃ, বড় সুন্দর নামটি তোমার। যেমন সুন্দর তোমার নাম, মুখশ্রীও সেই নামের মতই। কিন্তু তোমার হাত পা, গর্দান আর বুকের গড়ন মহাবীরের মতই। ধৈর্য ধরে শিখলে কালে তুমি মহাযোদ্ধা হতে পারবে।

তোমাকে কি বলে ডাকব? কাকা?

আমি তোমার চেয়ে বয়সে অনেক বড় হলেও আমাকে তুমি বন্ধু বলে ভাববে, নাম ধরেই ডাকবে। এতে আমি তোমার মনের কথা, ইচ্ছার কথা সহজেই জানতে পারব।

কি নাম তোমার?

হণ্ডা।

হণ্ডা।

হাঁরে, নাম আমার ঐ একটাই।

হণ্ডা মানে তো হাঁড়ি, একটা বড় হাঁড়িকেই বোঝায়।

ঠিক তাই। শিকারী দলের সঙ্গে যখন বাবা বেরিয়ে যেত, তখন আমাদের ব্যাধ-জাতের মেয়েরা সব ঐ সামনের নদীতে যেত মাছ ধরে আনতে। বাচ্চা-কাচ্চাগুলোকেও সঙ্গে বয়ে নিয়ে যেত তারা। আমার মায়েব আবার বাচ্চাকে পিঠে বেঁধে নিয়ে যাওয়া পোষাত না। তাই ঘর খালি করে মা বাবা বেরিয়ে যাবার আগে আমাকে একটা পাকাপোক্ত হণ্ডায় শুইয়ে ঘরের শিকাতে ঝুলিয়ে দিয়ে যেত। আমি গা হাত পা নাড়লেই শিকা সমেত হণ্ডাটা দুলত আর আমি দোল খেতাম।

তাই ব্যাধপাড়ার সবাই সেই শিশুকাল থেকে আমাকে ডেকে আসছে হণ্ডা বলে।

চন্দ্রগুপ্ত বলল, তাহলে আজ থেকে আমিও তোমাকে ঐ নামেই ডাকব।

অবশ্যই। আর কাল থেকে আমি তোর অস্ত্রগুরু, কি বলিস?

অবশ্যই।

জন্ম থেকে অসীম ক্ষমতাধর চন্দ্রগুপ্ত। হাতে যে কোন অস্ত্র ধারণ করা মাত্রই তার চোখমুখের ভাব র্তিত হয়ে যেত। সে সময় তাকে দেখে মনে হত, মহামাত্য, সেনাধ্যক্ষ, পরিষদবেষ্টিত হয়ে মহারাজ সিংহাসনে উপবেশন করেছেন। চারিদিকে তাঁর সদাজাগ্রত সতর্ক চক্ষু।

আবার কখনো বা মনে হত, বিস্তীর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে অগণিত সৈন্যসামন্তের সম্মুখভাগে অশ্বপৃষ্ঠে বসে রয়েছেন সম্রাট, শত্রু নিধনের ভঙ্গিতে হাতে উদ্যত বল্লম।

অতি গুণী আর সুযোগ্য শিক্ষক হণ্ডা, তবু বর্ষ পূর্ণ হতে না হতেই গুরু হণ্ডার সমস্ত শিক্ষাকে জহ্নুমুনির গঙ্গা পানের মত শুষে নিল চন্দ্রগুপ্ত।

যেদিন শিক্ষা সম্পূর্ণ হল, সেদিন চন্দ্রগুপ্ত প্রথা অনুযায়ী গুরুকে দিতে চাইল দক্ষিণা।

হণ্ডা বলল, তুই কি আর দিবি, মগধের সম্রাট হ'লে না হয় তোর কাছ থেকে কিছু দক্ষিণা চেয়ে নিতাম।

একদিন আমি হতেও তো পারি, সেদিনের কথা ভেবে তুমি আজ থেকে চেয়ে রাখ।

বেশ, আমার একটা দুঃখের কথা তোকে আজ শোনাব। সেই দুঃখের প্রতিকার যেদিন করতে পারবি, সেদিনই তোর গুরুদক্ষিণা দেবার ইচ্ছা পূর্ণ হবে।

বল, কি সে দুঃখ?

হণ্ডা বলল, আয়, এই বটগাছের গুঁড়ির ওপর বসি দুজনে।

পশ্চিমে সূর্যাস্ত হচ্ছে, সামনের বনান্তরালে নবীন চন্দ্রোদয়ের আয়োজন।

আমার আগের পুরুষরা শিশুনাগ বংশের রাজাদের হয়ে যুদ্ধ করত। রাজারা তাদের ব্যাধ বলে ঘৃণা করত না। অনেক সম্মান দিত। এমন কি রাজসেনাপতিদেরও নির্দেশ দেওয়া ছিল, আমার পূর্বপুরুষদের গুরুর মত মান্য করার জন্য। কারণ তারাও অস্ত্রচালনার অনেক কৌশল শিখে নিত আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে।

কিন্তু একসময় শিশুনাগ বংশে একটা অঘটন ঘটে গেল।

কি সে অঘটন?

শিশুনাগ বংশের শেষ রাজাকে হত্যা করল তার এক ক্ষৌরকার।

কিভাবে, কেনই বা সে হত্যাকাণ্ড ঘটল?

রাজা ছিল দুর্বল। রানী ঐ ক্ষৌরকারের সঙ্গে মিলিত হয়ে ঐ অঘটনটি ঘটাল।

কি নাম ছিল ঐ ধূর্ত মানুষটার?

মহাপদ্ম নন্দ। সে শুধু রাজাকেই হত্যা করেনি, রাজার উত্তরাধিকারীদেরও অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছিল।

এ সুযোগ আর সাহস সে পেল কোথা থেকে ?

নষ্ট চরিত্রের সেই রানীর কাছ থেকে। এই রানীটি আবার রাজার বড় সোহাগের পত্নী ছিল। রাজা তাকে বড় বেশী বিশ্বাস করতেন। রাজকোষের অনেক মূল্যবান রত্ন মণিমাণিক্য রানীটি নিজের সিন্দুকে ভরে রেখেছিল।

চন্দ্রগুপ্ত জানতে চাইল, কেবলমাত্র একজন ক্ষৌরকার আর এক নারীর পক্ষে কি এই অঘটন ঘটিয়ে বিনা বাধায় রাজ্যলাভ করা সম্ভব ছিল? মন্ত্রী, সেনাপতি, রাজার দেহরক্ষী, প্রাসাদ-রক্ষক, এরা সব কোথায় ছিল? তারা সবকিছু জানার পর ঐ ক্ষৌরকারকে সিংহাসনে বসতে দিল!

হাসল হণ্ডা। বলল, এমন নারীর অভাব নেই, যাদের কুহকী মায়ায় পুরুষের মতিভ্রম না হয়। এসব বড় হয়ে বুঝবে।

আমাকে আরও একটুখানি সহজ করে বুঝিয়ে দাও।

আসলে অনেক দিন থেকে মূল্যবান সব রত্ন মন্ত্রী, সেনাপতিদের ভেতর উপহার হিসেবে ছড়াতে আরম্ভ করেছিল রানী। তাতে আসল লোকগুলোকে রানী জড়িয়ে ফেলেছিল কুহকী মায়ায়।

চন্দ্রগুপ্ত বলল, এখন বল, নন্দবংশের ওপর তোমার ক্ষোভের কারণ কী?

আমার পিতামহ রাজার দেহরক্ষীর কাজ করতেন। সেই বিশেষ দিনটিতে রানীর প্ররোচনায় রাজা তাকে একটা অজুহাত দেখিয়ে ছুটি দেন।

তোমার বংশের দেহরক্ষীকে কি রানী কোনরকম পুরস্কার দিয়ে বশ করার চেষ্টা করেননি?

একবার মাত্র চেষ্টা করতে এসে বিফল হয়েছিলেন। দেহরক্ষী রানীকে বলেছিলেন, খুব সামান্য ঘর থেকে আমি এসেছি, আমার প্রয়োজনও সামান্য। রানীমা, যে মূল্যবান রত্নকে আমি রাখতে পারব না, তাকে নিয়ে আমি কি করব।

রানী তখন বললেন, তুমি অর্থ নাও। তোমার নিষ্ঠায় আমরা খুব সন্তুষ্ট হয়েছি।

দেহরক্ষী জবাব দিয়েছিলেন, রাজবাড়ি থেকে যে অর্থ পাই, তাতেই আমার সংসার চলে যায়। অতিরিক্ত কিছু পেলে আমার লোভ বেড়ে যাবে মা। আপনি যে আমার মত এত সাধারণ একজন মানুষকেও ভোলেননি, এতে আমার গৌরব বেড়ে গেল। আপনার দান আমি মাথা পেতে নিয়ে, আপনারই চরণে অঞ্জলি দিলাম।

আশ্চর্য! এত সুন্দর করে এমন বিচক্ষণতার সঙ্গে তোমাদের ব্যাধজাতির মানুষেরা কথা বলতে পারে!

এ সবই ঋষি সৌম্যের শিক্ষা। তিনি আমার পিতামহের চেয়েও বয়সে বড়। তাঁর যৌবনকালে প্রায়ই ব্যাধপল্লীতে আসতেন। তাঁর এক একটি কথা ছিল হীরের চেয়েও দামী। তিনি ব্যাধপল্লীর সবাইকে সদাচার শিক্ষা দিতেন, জীবনের ধর্ম নিয়ে আলোচনা করতেন। কত সুন্দর সুন্দর উপমা দিয়ে কথা বলতেন। এখন উনি অতি বৃদ্ধ, তাই আর আমাদের পল্লীতে আসতে পারেন না, আমরা সবাই মিলে যে কোনও পরামর্শের জন্য আজও ওঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াই। উনিই আমাদের শিক্ষাগুরু।

চন্দ্রগুপ্ত বলল, আমাকে একদিন ওঁর কাছে নিয়ে যাবে? আমি খুব ছোটবেলা একবার মায়ের সঙ্গে গিয়েছিলাম।

নিশ্চয়ই। উনি এখনও আমাদের প্রাচীন বটের মত ছায়া দিয়ে, আশ্রয় দিয়ে, ঝড়ের আঘাত থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

এবার তোমার দুঃখ বা ক্ষোভের কারণটি শোনাও।

আমার পিতামহকে রানীর পরামর্শে রাজা ছুটি দিয়ে বললেন, কাল সারা দিনরাত্রি আমি আর মহারানী বিশেষ পূজায় ব্যস্ত থাকব। কেউ আমাদের কাছে থাকবে না, তোমারও কাল এসে কাজ নেই।

পিতামহ পল্লীতে ফিরে আসার পথে একবার ঋষি সৌম্যের সঙ্গে দেখা করলেন।

ঋষি বললেন, কি খবর ধূমল? আজ দেখছি, ভারী খুশী খুশী মুখ।

পিতামহ বললেন, কালকের দিন রাজবাড়িতে যেতে হবে না। রাজামশায় আমাকে ছুটি দিয়েছেন।

তা বেশ। কিন্তু কি উপলক্ষে ছুটিটা পেলে?

পিতামহ রাজা রানীর বিশেষ পূজার কথা বললেন। কথায় কথায় রানীর উপহার দেবার কথাও উঠল। হয় রত্ন, নয় অর্থ উপহার হিসেবে নেবার জন্য রানীর পীড়াপীড়ির কথা জানাতে ভুললেন না পিতামহ।

সব শুনে ঋষি সৌম্য নাকি বলেছিলেন, বাইরের থেকে কোন্ লোক সব থেকে বেশী আসে রাজবাড়িতে ?

পিতামহ বলেছিলেন, একটি ক্ষৌরকার। সে প্রতিদিন ক্ষৌরকর্ম করতে রাজার কক্ষে প্রবেশ করে।

তুমি তখন কোথায় থাক?

রাজার কক্ষের বাইরে।

তুমি ক্ষৌরকারকে মুখোমুখি দেখেছ?

দেখেছি।

কেমন মানুষ বলে মনে হয়।

ঠোঁটে মুচকি হাসিটি লেগে আছে, কিন্তু সারা মুখে ধূর্তামির ছাপ।

তোমার সঙ্গে কোনও কথা বলে?

না।

রাজবাড়ির আর কারোর সঙ্গে?

একদিন রাজার কক্ষে মহারানীর সঙ্গে ওকে কথা বলতে দেখেছি।

মহারাজ তখন কোথায় ছিলেন?

ক্ষৌরকর্ম করার পর ভেতরে স্নানঘরে গিয়েছিলেন।

তোমাকে ওরা কথা বলার সময় দেখতে পেয়েছিল?

হ্যাঁ, ক্ষৌরকার বেরিয়ে যাবার ঠিক পরেই রানী বাইরে এসে বলেছিলেন, ঘরের ভেতর তাকিয়ে কি দেখছিলে?

মহারাজ আছেন কিনা দেখছিলাম।

রানী ধমক দিয়ে বললেন, এভাবে কোনদিন আব ভেতরে তাকাবে না, এটা খুব খারাপ।

সৌম্য বললেন, এ ঘটনার পরই কি রানী তোমাকে ঐ উপহারগুলো দিতে চেয়েছিলেন?

ঠিক তাই।

উনি কি তোমার মত আর কাউকে উপহার দিয়েছেন?

আমি পরিষ্কার দেখতে পাইনি, তবে মহারাজ রাজসভাতে গেলে দুদিন মন্ত্রী আর সেনাপতির সঙ্গে রানীকে কথা বলতে দেখেছি। দূব থেকে ওঁদের হাতের নড়াচড়া দেখলেও কোনও জিনিসের আদান প্রদান হয়েছে কিনা বলতে পারব না। তবে দাসীদের ভেতর কিছু আলোচনা আমার কানে এসেছে।

কি রকম?

রানী নাকি কোষাগার থেকে সবচেয়ে মূল্যবান রত্নগুলো নিজের কাছে সরিয়ে রেখেছেন। তারই কিছু কিছু বিলিয়ে দিচ্ছেন প্রিয়জনদের ভেতর।

সবশুনে ঋষি সৌম্য বলেছিলেন, লক্ষণ ভাল মনে হচ্ছে না। শিকারি অনেক কৌশলে হরিণের মতো রাজাকে জালের কাছে টেনে এনেছে। মনে হচ্ছে তার বাঁচার কোনও উপায় নেই। সেই জালে অন্য দু'একটা রাজভক্ত নির্বোধ হরিণও জড়িয়ে পড়তে পা'ব। সাবধান ধূমল।

ঋষি সৌম্যের অনুমান অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হল।

পরদিনই রানীর ঐ প্রিয় ক্ষৌরকার ক্ষৌরি করার কালে রাজা মহান্দীনের কণ্ঠনালীটি কেটে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে সেই ক্ষৌরকারকে রানী প্রাসাদের অন্তরালে গোপন করে রাখেন।

সেইদিনই প্রাসাদ থেকে দুটি সান্ত্রী এসে আমার পিতামহকে ধরে নিয়ে যায়। চতুর্দিকে রটনা করা হয়, রাজার দেহরক্ষীর হাতেই রাজা খুন হয়েছেন।

অবুঝ জনতা তখন রাজপ্রাসাদের বাইরে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। তারা আততায়ীকে সেই মুহূর্তে তাদের হাতে সঁপে দেবার জন্য চিৎকার করতে থাকে।

রানীও সুযোগ বুঝে সেই উন্মত্ত জনতার দিকে ঠেলে দেন আমার অসহায় পিতামহকে। তিনি কোনকিছু বলা সুযোগই পেলেন না। কেবল দুটি হাত জোড় করে ওপরের দিকে তুললেন।

পরমুহূর্তেই ক্ষিপ্ত জনতা তাঁকে হিংস্র জন্তুর মত ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলল।

এবার দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল হণ্ডা। তাকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিতে লাগল চন্দ্রগুপ্ত।

হণ্ডা কিছুটা শান্ত হলে চন্দ্রগুপ্ত বলল, তুমি কি তোমার পিতামহে' হত্যার জন্য নন্দবংশের ওপর প্রতিশোধ নিতে চাও?

ঠিক তাই।

কিন্তু তুমি যে বললে, প্রয়োজনে নন্দরাজাদের হয়ে তোমাকে আজও যুদ্ধে যেতে হয়?

কথাটা মিথ্যে নয়। ওদের হয়ে আমি যুদ্ধ করি। আর যুদ্ধের সময় কিংবা সৈন্যদের শেখানোর সময় আমার ভেতর কোনও ফাঁকি থাকে না। তবে প্রতিশোধের আগুন আমার ভেতর অহরহ জ্বলছে। নন্দরাজাদের অত্যাচারে দেশের মানুষরা জর্জরিত। অর্থের লোভে রাজপুরুষরা সৈন্য সামন্ত নিয়ে চষে বেড়াচ্ছে দেশবিদেশ। শিশুনাগ বংশের বিপুল ধনভাণ্ডার নাকি ঐ পাপিষ্ঠা রানী বাইরে কোথায় সরিয়ে রেখে দিয়েছিল, মৃত্যুর আগে বলে যেতে পারেনি। তাই আজও সেই গুপ্তধনের সন্ধানে হন্যে হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে রাজা ধননন্দের লোক।

চন্দ্রগুপ্ত বলল, নন্দরাজাদের ওপর তুমি কি রকম প্রতিশোধ আশা কর?

ঐ বংশটার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ। আমি ব্যাধজাতির মানুষ হলেও সেনাপতিরা পর্যন্ত আমার কাছ থেকে অস্ত্র চালাবার কৌশলগুলো শিখে নেয়। তাই আমি ওদের সৈন্যসামন্ত কিংবা অস্ত্রশস্ত্রের সব খবরই রাখি। একজন শক্তিশালী সৎ মানুষ যদি কোনদিন ওদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তাহলে আমি তাকে নানাভাবে সাহায্য করতে পারি।

চন্দ্রগুপ্ত বলল, তুমি তোমার পিতামহের হত্যাকাণ্ডের স্মৃতিটা মন থেকে কিছুতেই মুছে ফেলতে পারনি, তাই না?

সে কি ভোলা যায়? স্বপ্নের ভেতরেও আমি তাঁর করুণ আর্তনাদ শুনতে পাই। আমি তখন খুবই ছোট। ব্যাধপল্লী ভেঙে মানুষজন এসেছিল আমার পিতামহের পরিণতি দেখতে। তারা পাছে ক্ষিপ্ত হয়ে প্রাসাদে তাণ্ডব চালায়, তাই কুচক্রী রানী তাদের সৈন্য দিয়ে ঘিরে রেখেছিল।

সে সময় আমি আমার অসহায় পিতামহের আর্তনাদ শুনি।

তার কিছুকাল পরেই আবার আমাদের আর একটা দৃশ্য দেখতে বাধ্য করা হয়েছিল।

বাধ্য করা!

তাকে বাধ্য করাই বলব। জোর করে আমাদের সে দৃশ্য দেখাবার জন্য পল্লী থেকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

কি রকম?

নতুন রাজার অভিষেক দেখার জন্য উপস্থিত থাকতে হবে সমস্ত নগরবাসীকে। আমরা নগরীর নিকটে অরণ্যে থাকি বলে আমাদেরও ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে ডাক দেওয়া হল। এ কথাও ঘোষণা করা হল, যে না যাবে, তাকে নতুন রাজার রাজসভায় গিয়ে পরে জবাবদিহি করতে হবে।

পল্লীর প্রবীণ মানুষরা পরামর্শ নিতে চললেন ঋষি সৌম্যের কুটিরে।

ঋষি সব শুনে বললেন, বায়ু এখন বলশালী। প্রবল বায়ুর প্রতিকূলে যাওয়া মানেই বিপদ ডেকে আনা। বায়ু তোমাদের তাড়িয়ে নিয়ে যাবে, তার প্রতাপকে আপাতত মেনে নাও। পরে সময়ই ওকে স্তব্ধ করে দেবে। সেই সময় বা মহাকালের প্রতীক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

তোমরা তাহলে নতুন রাজার অভিষেক দেখতে গিয়েছিলে? মানে বাধ্য হয়েছিলে যেতে।

হণ্ডা বলল, হাঁ।

রাজার মৃত্যুর কতদিন পরে নতুন রাজার অভিষেক হল?

প্রায় মাসাধিককাল পরে। ঐ এক মাস মন্ত্রী আর সেনাপতির সাহায্যে রানী রাজ্য চালিয়েছিলেন।

তারপর?

হণ্ডা বলল, নতুন রাজার অভিষেকের ঘটনাটি বড় বিচিত্র। কি পদ্ধতিতে নতুন রাজা সিংহাসনে বসবে, তা ঘোষণা করে দিয়েছিলেন মহারানী স্বয়ং। বুদ্ধিটা কিন্তু যুগিয়েছিলে সেই ক্ষৌরকার।

এ কথাটি কি করে জানা গেল যে ক্ষৌরকারই অভিষেকের পদ্ধতিটি রচনা করেছিল?

অনেক পরে কথাটা জানা গিয়েছিল। রানীর প্রধান পরিচারিকা রাজার হত্যাকাণ্ড থেকে সব ঘটনাই জানত। বেশ কিছুকাল পরে সে বিবেকের জ্বালায় ভুগে সব কথা বাইরে ফাঁস করে দেয়।

তাকে ধরে রানী সাজা দেয়নি?

হণ্ডা বলল, রানীর সাজা দেবার আগেই সে আত্মহত্যা করে মানুষের ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে গিয়েছিল। ঋষি সৌম্য ওর মৃত্যুর খবর শুনে বলেছিলেন, আত্মহত্যা পাপ, কিন্তু ও সত্যকে প্রকাশ করে ঈশ্বরের করুণা পাবার যোগ্য হয়েছে। তাছাড়া সত্যকে প্রকাশ করার পর ও কোনভাবেই আত্মরক্ষা করতে পারত না। রানী ওকে অকথ্য যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করত।

চন্দ্রগুপ্ত জানতে চাইল, নতুন রাজার অভিষেকের পদ্ধতিটা কি ছিল?

প্রথমেই ক্ষৌরকারটি রাজসিংহাসনে গিয়ে বসতে চায়নি। সে জানত, তাতে প্রজারা তাকে সন্দেহ করবে। তাই রানীর হাতে সে প্রায় একমাসের জন্য শাসনদণ্ডটা দিয়ে রেখেছিল। এই একমাস ধরে রানী প্রজাদের ভেতর অনেক খাদ্য আর বস্ত্র বিতরণ করেছিলেন। দুর্মুখ আর ক্ষমতাশালীদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছিলেন রাজকোষের বহু রত্ন উপহার হিসেবে বিলিয়ে দিয়ে। এরপর শুরু হল সেই ক্ষৌরকারটিকে সিংহাসনে বসানোর আসল খেলা।

উৎসুক চন্দ্রগুপ্ত বলল, সেটাই আমি জানতে চাইছি।

রানী রাজসভায় ঘোষণা করলেন, আগামী পূর্ণিমার শেষ রাত্রিতে রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন সুসজ্জিত ময়দানে আমার প্রজারা সকলে সমবেত হয়ে পাটলিপুত্রের নতুন রাজার অভিষেক ক্রিয়া দর্শন করবে। সেই দিনই সবার সম্মুখে পরীক্ষা দিয়ে নির্বাচিত হবেন নতুন রাজা।

হণ্ডা যেন রানীর ঘোষণাপত্রটি পাঠ করে থেমে গেল।

চন্দ্রগুপ্ত সঙ্গে সঙ্গে বলল, রাজ সিংহাসন লাভ করার জন্য কি ধরনের পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়েছিল?

হণ্ডা বলল, প্রাসাদ সংলগ্ন বাঁধান একটি সরোবর আছে। ঐ সরোবরের তীরে যার যেমন খুশি দাঁড়িয়ে যাবে প্রতিযোগীরা। তারপর প্রাসাদ থেকে ঘণ্টাধ্বনি শোনামাত্র তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে জলে।

জলে পড়ে কি করবে তারা?

ঐ সরোবরের জলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল একটি তরবারি। ওটি যে তুলে আনতে পারবে সেই পাবে রাজপদ। অবশ্য তরবারিটি সবার অলক্ষ্যে ফেলা হয়েছিল।

চন্দ্রগুপ্ত বলল, বহু প্রতিযোগী নিশ্চয় যোগ দিয়েছিল।

না।

কেন? সহজে এমন একটা ভাগ্যপরীক্ষার সুযোগ কি কেউ হারাতে চায়!

প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার একটা শর্ত ছিল। যারা প্রতিযোগিতায় হেরে যাবে, তাদের যাবজ্জীবন কারাগারে কাটাতে হবে। তাই সেদিন অতি অল্পসংখ্যক সাঁতারু প্রতিযোগিতায় নেমেছিল।

চন্দ্রগুপ্ত বলল, ঐ ধূর্ত ক্ষৌরকার নিশ্চয়ই জয়ী হয়েছিল, কিন্তু কি ভাবে?

পূর্ব বন্দোবস্তমত ও পুকুরের একটা নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়িয়েছিল। জলে নামামাত্র ও যাতে একটা রজ্জু

হাতে পেয়ে যায় সে ব্যবস্থা করা ছিল। ঐ রজ্জুর অন্য প্রান্তে বাঁধা ছিল সেই তরবারি। এরপব ডুব সাঁতার দিয়ে সেই তরবারিটি খুলে নিয়ে কূলে উঠে এসেছিল ক্ষৌরকার।

উষালগ্নে অভিষেক-মঞ্চে তাকে নিয়ে গেলেন পুরোহিত। অতি সূক্ষ্ম একটি বস্ত্রখণ্ডে আবৃত ছিল তার মুখমণ্ডল। ডানহাতে সে উঁচু করে ধরে রেখেছিল সেই তলোয়ার।

সমবেত জনতা মানুষটাকে চিনতে না পারলেও বিজয়ী বীর ভেবে করতালি দিতে লাগল। মানুষের কৌতূহল যখন সীমা ছাড়াল আর তারা নতুন রাজার জয়ধ্বনি দিতে লাগল, তখন রাজপুরোহিত টেনে সরিয়ে দিল রাজার মুখের সেই বস্ত্রখণ্ড।

আমি বয়সে তখন অনেক ছোট হলেও আমার স্পষ্ট মনে আছে, রাজার মুখখানা দেখার সঙ্গে সঙ্গে জনতা বিস্ময়ে একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল। আমার এখন মনে হয় ক্ষৌরকারের মুখখানা দেখে সমবেত মানুষগুলোর মুখ বিকৃত হয়ে গিয়েছিল।

এখন সেই ধূর্ত মহাপদ্ম নন্দের বংশধররাই রাজত্ব করছে। ওরা কেবল নিতে জানে, দিতে জানে না। অত্যাচারে নাভিশ্বাস উঠেছে প্রজাদের। তাদের চোখ থেকে রাজার জন্য ঝরে পড়ছে শুধু ঘৃণা।

চন্দ্রগুপ্ত কথাগুলো শুনছিল, মাঝে মাঝে মাথা নিচু করে ডুবে যাচ্ছিল ভাবনার গভীরে।

একসময় মাথা উঁচু করে বলল, হণ্ডা, আমার মা বলেছে, আমি নাকি রাজা হব। আমার গলায় ঝুলছে হিমালয়ের সাধুর দেওয়া এক কবচ। যার গুণে আমি অসাধ্য-সাধন করতে পারব। ঐ কবচ আমাকে সমস্ত বিপদ আর বিপর্যয়ের হাত থেকেও রক্ষা করবে।

হণ্ডা বলল, তুমি তাড়াতাড়ি বড় হয়ে ওঠ রাজার শক্তি নিয়ে, ধ্বংস কর এই নন্দবংশটাকে। নির্দয়ভাবে, মিথ্যা অপবাদ দিয়ে আমার যে পিতামহকে হত্যা করা হয়েছে, তাঁর আত্মা শান্তি পাবে।

কয়েকদিন পরের কথা। হণ্ডার সঙ্গে ঋষি সৌম্যের কুটিরের দিকে যাচ্ছিল চন্দ্রগুপ্ত। তারুণ্যের ছোঁয়া লাগা সুদর্শন কিশোর। আকাশে শারদ মধ্যাহ্নের দীপ্ত সূর্য।

হণ্ডা তার একখানি শুদ্ধ অঙ্গবস্ত্রের কোণায় বেঁধে নিয়েছিল সুপক্ক একটি বিল্ব ফল। আর একটি পাথরের বাটিতে চন্দ্রগুপ্ত নিয়ে চলেছিল কৃষ্ণা গাভীগুলির দুধ থেকে তৈরি কিছু নবনী।

হঠাৎ চলার পথে থমকে দাঁড়াল হণ্ডা। অদূরে এক ব্রাহ্মণ একটি পোড়োজমি থেকে সবেগে কুশ তৃণ উৎপাটন করছিলেন।

হণ্ডা চন্দ্রগুপ্তের দৃষ্টি আকর্ষণ করল সেদিকে।

চন্দ্রগুপ্ত দ্রুতপায়ে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল সেই ব্রাহ্মণের সামনে।

ব্রাহ্মণ কিন্তু একমনে উৎপাটিত করে চললেন সেই শুষ্ক কুশ তৃণ। তাঁর হাত ক্ষতবিক্ষত, সেদিকে কিন্তু তাঁর কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি কেবল বলে চলেছেন, তুই আমার চরণ বিদ্ধ করেছিস, আমি তোকে ধ্বংস করব।

ব্রাহ্মণের এই আচরণে আকৃষ্ট হল চন্দ্রগুপ্ত। সে নিজেও লেগে গেল তৃণ উৎপাটনের কাজে।

অল্প পরেই ব্রাহ্মণের দৃষ্টি পড়ল তরুণ কিশোরটির মুখের দিকে। আশ্চর্য প্রদীপ্ত মুখশ্রী। ললাটে পরম সৌভাগ্যশালীর সুস্পষ্ট চিহ্ন।

চন্দ্রগুপ্ত উঠে দাঁড়িয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষটিকে প্রণাম জানিয়ে বলল, আমার সঙ্গীটির কাছে চকমকি পাথর আছে, এই কুশের ক্ষেতে আগুন লাগিয়ে দিলে ওগুলো মুহূর্তে ধ্বংস হয়ে যাবে।

ব্রাহ্মণটি চন্দ্রগুপ্তের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বললেন, তোমার ভেতর শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, বুদ্ধি আর আগুন আছে, তুমি পারবে।

মুখে বললেন, তোমার পরিচয়?

পিতা গোপালক ভৃগু, জননী ভাবিনী। আমি চন্দ্রগুপ্ত।

তুমিই সেই চন্দ্রগুপ্ত! গুরু সৌম্যের মুখে আগেই শুনেছি তোমার নাম। তোমার পরিচয় আমার

অবিদিত নয়। অচিরেই তোমার সঙ্গে আমার দেখা হত। গুরু ঠিকই বলেছেন, তুমি 'অনির্বাণ অগ্নি'। কোথায় চলেছ?

ঋষি সৌম্যের কুটিরে। অতি অল্প বয়সে মায়ের সঙ্গে গিয়েছিলাম, স্মৃতিতে কোন ছবি নেই, আজ দ্বিতীয়বার চলেছি তাঁর দর্শনে।

ব্রাহ্মণ বললেন, অবিশ্বাস্য শুভযোগ। চল, আমিও তাঁরই কাছে চলেছি।

তিনজনে অচিরেই এসে পৌঁছলেন ঋষি সৌম্যের কুটির প্রাঙ্গণে।

সৌম্য দাওয়ায় বসেছিলেন, উঠে দাঁড়ালেন। তিনজনেই ভূমিতে লুণ্ঠিত হয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন।

এস চাণক্য, আমি তোমার প্রতীক্ষা করছিলাম।

হণ্ডার দিকে তাকিয়ে বললেন, বেশ কিছুদিন এদিকে আসনি তুমি, সঙ্গীটি কে ?

দুজনে একসঙ্গে ঋষি সৌম্যের কাছে এগিয়ে গিয়ে পক্ক বিল্প ও নবনীত নিবেদন করল।

চন্দ্রগুপ্তই নিজের পরিচয় দিল। সে যে শৈশবে একবার ঋষির কুটিরে এসেছিল, সে কথা বলতে ভুলল না।

ঋষি সৌম্য সস্মিত মুখে বললেন, হ্যাঁ, তুমি সেই বটে। আমার ভবিষ্যদ্বাণীর পথ ধরেই তুমি এগিয়ে চলেছ। এখন তোমার উপযুক্ত শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশের সময় হয়ে গেছে। কালই একবার ভৃগু আর ভাবিনীকে পাঠিয়ে দিও আমার কাছে। তোমার জন্য ওদের চিন্তার যে কিছু নেই, তা আমি বিশেষভাবে বুঝিয়ে বলেছি।

ঋষি সৌম্য ওদের ভেজানো মুগ, ইক্ষুগুড় আর কূপের সুশীতল জল খেতে দিলেন।

হণ্ডার দিকে তাকিয়ে বললেন, লক্ষ্যভেদের প্রথম পাঠ কেমন নিচ্ছে তোমার শিষ্য?

পাঠ শুধু শেষ হয়নি প্রভু, ও আমাকে ছাড়িয়ে গেছে।

অস্ত্রচালনা?

অতি অল্প সময়ের ভেতরেই মাটিতে খসে পড়ছে আমার হাতের অস্ত্র। তাছাড়া শিষ্যের ছুঁড়ে দেওয়া বর্শা বাতাস চিরে বাজপাখির মত উড়ে গিয়ে বিদ্ধ করছে শিকারকে।

সহসা ঋষি সৌম্য চাণক্যের দিকে তাকিয়ে বললেন, সময় অনুকূল, সুবাতাস বইছে। শাণিত অস্ত্র এসে গেছে হাতের মুঠোয়। এবার তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ ধর।

এক সময় ঋষি সৌম্য আর পণ্ডিত চাণক্যকে প্রণাম করে চন্দ্রগুপ্ত বিদায় নেবার জন্য উঠে দাঁড়াতেই ঋষি সস্নেহে বললেন, কাল ভৃগু আর ভাবিনীর সঙ্গে তুমিও আসবে।

চন্দ্রগুপ্ত সবিনয়ে সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল।

সৌম্য বললেন, কেমন দেখলে?

চাণক্য সোৎসাহে উত্তর দিলেন, যথার্থ রাজ চক্রবর্তীর লক্ষণযুক্ত। আপনি ঠিকই বলেছেন, ও শাণিত অস্ত্র। এখন ওকে যথাস্থানে প্রয়োগ করতে হবে। তবে ওর আরও কিছুকাল উচ্চতর নানা ধরনের শিক্ষার প্রয়োজন। আমি ওকে এখনই তক্ষশীলা নিয়ে যেতে চাই।

সৌম্য বললেন, ওর পালক পিতামাতাকে আমি আগেই ওর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলে রেখেছি। ওরা সকল বিষয়েই আমার পরামর্শ মেনে চলে। কাল ওদের এখানে আসতে বলে দিয়েছি। এ যাত্রায় মনে হয় তুমি ওকে সঙ্গী করে নিয়ে যেতে পারবে।

চাণক্য বললেন, সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে নন্দ রাজাদের ঔদ্ধত্য আর অত্যাচার।

সৌম্য মন্তব্য করলেন, ছেদ টেনে দেবার সময় আসন্ন হয়েছে। বিনাশের সমস্ত লক্ষণ দেখা দিয়েছে দেহে।

এবার চাণক্য নিজের এলো শিখাটিকে মেলে ধরে বললেন, আজ আপনার গৃহে আসার পথে একটি প্রতিজ্ঞা করেছি।

কি সে প্রতিজ্ঞা, চাণক্য?

যতদিন না নন্দবংশের উচ্ছেদ সাধন করতে পারি, ততদিন শিখা-বন্ধন করব না।

অত্যাচারী নন্দ সাম্রাজ্যের পতন হোক্, এটি আমার মত তোমারও মনোবাসনা ছিল, কিন্তু তার সঙ্গে শিখা নিয়ে এতবড় একটা প্রতিজ্ঞার আশু কোন কারণ ঘটেছে কি?

চাণক্য ক্রোধোদ্দীপ্ত মুখে বললে, আপনার এখানে আসার পূর্বে আমি পাটলিপুত্রের প্রাসাদ অতিক্রম করছিলাম। মধ্যাহ্ন আসন্ন দেখে এবং ক্ষুধার তাড়না প্রবল হওয়ায় আমি রাজগৃহের ভোজনালয়ে প্রবেশ করি। ওখানে সারি সারি আসন পাতা ছিল। আমি ভোজনগৃহের ব্যবস্থাপককে জিজ্ঞেস করি, এখানে কি ক্ষুধার্তকে অন্নদান করা হয়?

লোকটি আমার দিকে তাকিয়ে শ্রদ্ধেয় মনে করে বলল, আপনি আসন গ্রহণ করুন। রাজপ্রাসাদের সমস্ত সম্মানীয় ব্যক্তিরাই এখানে ভোজন করেন। এখুনি তাঁরা এখানে এসে পড়বেন।

আমি লোকটির আপ্যায়নে প্রসন্ন হয়ে ভোজনগৃহের একদিকে একটি উৎকৃষ্ট আসন দেখে বসে পড়লাম। লোকটি একবার কী যেন মনে করে আমার দিকে তাকাল। তারপর কিছু না বলেই অন্যদিকে চলে গেল।

ঘণ্টাধ্বনি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কলরব করতে করতে ভোজনগৃহে উপস্থিত হল উত্তম পোশাক পরা কতকগুলি রাজপুরুষ।

তারা আমাকে আসনে বসে থাকতে দেখে তেড়ে এল, কে তুমি? এ আসনে কে তোমাকে বসতে দিয়েছে?

উত্তর দিলাম, আমি ক্ষুধার্ত।

প্রায় একই সঙ্গে কতকগুলো কর্কশ গলা আক্রোশে ফেটে পড়ল, ওঠ্ ব্যাটা রাস্তার ভিখিরি, ওঠ্ ওঠ্, আরে কে আছিস ওকে ঘাড়ে ধরে তুলে দে না। আশ্চর্য সাহস, রাজপুত্রদের সারিতে এসে বসেছে।

আমি ব্যবস্থাপকের কাছে ভোজনের অনুমতি নিয়েছি, একথা বললাম না। বেচারা দুর্বৃত্তদের হাতে নিগৃহীত হতে পারে।

আমি আসন ছেড়ে উঠে পড়ার আগেই কিন্তু রাজপুত্রেরা আমার হাত ধরে টেনে তুলল। ওদের ভেতর একজন অতি উৎসাহী আমার শিখা ধরে টেনে খুলে দিল। তারপর দু'তিন জন আমাকে ধাক্কা দিতে দিতে ঠেলে বের করে দিল রাস্তায়।

কথা বলতে গিয়ে যেন আগুন বেরিয়ে আসছিল চাণক্যের দু'চোখ দিয়ে। কেঁপে কেঁপে উঠছিল তাঁর মুখমণ্ডল, সারা শরীর।

ঋষি সৌম্য বসে রইলেন, নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপের মত।

চাণক্যের কথা শেষ হলে তিনি অনুত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, অচিরেই প্রবল ঝড় উঠবে, ফলগুলি খসে পড়ে যাবে বৃন্তচ্যুত হয়ে।

চাণক্য বললেন, গুরুদেব, নন্দ বংশের ধ্বংস সাধন আমার মহাব্রত। তবু বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই শত্রুর শক্তির পরিমাপ করে থাকে। নন্দবংশের সাম্রাজ্যের পরিধি বিশাল তার সৈন্যবলও বিপুল। শুনেছি দু'লক্ষ পদাতিক, দু'হাজার রথ, বিশ হাজার অশ্বারোহী আর চার হাজার রণহস্তী নিয়ে সজ্জিত ধননন্দের চতুরঙ্গ-বাহিনী।

ধননন্দের সাম্রাজ্যের পরিধিও বিপুল। তার পিতা মহাপদ্ম অস্মর্ক, ইক্ষ্বাকু, কুরু, পাঞ্চাল, মিথিলা, শূরসেনের ক্ষত্রিয়দের উচ্ছেদ করে 'সর্বাক্ষত্রান্তক' উপাধি ধারণ করেছিল। তাছাড়া কোশল, কলিঙ্গও ধননন্দের অধীনে এসেছে। দাক্ষিণাত্যের কোন কোন অঞ্চলও নন্দ-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। বিপাশার পূর্ব উপকূল পর্যন্ত ওরা চষে বেড়াচ্ছে অপ্রতিহত প্রতাপে। এদের পরাভূত করতে হলে এদের চেয়েও বেশী শক্তির সঞ্চয় চাই। এই সঙ্কল্পে সিদ্ধ হতে গেলে অফুরন্ত মনোবলের সঙ্গে চাই অপরিমিত অর্থবল।

সৌম্য বললেন, তোমার সংগৃহীত সমস্ত তথ্যই নির্ভুল। এখন এই বিপুল শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য

কতখানি প্রস্তুতি নিয়েছ?

নন্দদের হাতে নির্যাতিত অপমানিত রাজারা আমাকে সৈন্য ও অর্থ দিয়ে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ইতিমধ্যে সৈন্য না এলেও আশাতীত অর্থ এসেছে আমার হাতে। অবশ্য আরও বিপুল অর্থের প্রয়োজন।

ঋষি সৌম্য বললেন, পাবে।

বিস্মিত চাণক্য শুধু বলতে পারলেন, গুরুদেব!

শিশুনাগ রাজবংশের গুপ্তধনের কথা তুমি শুনেছ নিশ্চয়ই। স্বামীহন্ত্রী রানী রাজার কোষাগার থেকে যে সকল স্বর্ণ ও মহামূল্য রত্নরাজি সরিয়ে ফেলেছিল, তার কথাই বলছি।

চাণক্য বললেন, মৃত্যুর আগে রানী বলে যেতে পারেনি, কোথায় রেখে গেছে ঐ বিপুল সম্পদ। হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে নন্দরাজারা।

আমার কাছে তার সন্ধান আছে।

কি বলছেন গুরুদেব!

প্রয়োজনে তুমি ও চন্দ্রগুপ্ত তা পাবে। আমি হিসেব করে দেখেছি, দু'লক্ষ সৈন্যের দু'বছরের উপযুক্ত পারিশ্রমিকের অর্থ, প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের অর্থ, চতুরঙ্গ-বাহিনীর দু'বছরের মত রসদের অর্থ, সবই পাওয়া যাবে ঐ সঞ্চয় থেকে। তারপর যুদ্ধে পরাজিত রাজ্যগুলি থেকে পাওয়া যাবে আরও সম্পদ, আরও রসদ।

গুরুদেব, আমার চিন্তার আকাশে জমে থাকা একটা কালো মেঘ এই মুহূর্তে দৃষ্টির আড়ালে উড়ে চলে গেল।

তুমি আমার অসাধারণ প্রতিভাধর ছাত্র ছিলে, চাণক্য। তক্ষশিলা তোমার মত অতি অল্পসংখ্যক প্রতিভারই দেখা পেয়েছে। রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতির এমন পরিচ্ছন্ন জ্ঞান আর ভাবনা বর্তমান ভারতভূমির আর কোনও রাষ্ট্রনেতার আছে কিনা সন্দেহ। এমন অদম্য উৎসাহ, লক্ষ্যের দিকে এমন স্থির দৃষ্টি, পরিকল্পনাকে কাজে রূপ দেবার এমন ঐকান্তিক নিষ্ঠা এ যুগে সত্যিই বিরল।

চাণক্য গুরুকে প্রণাম করে বললেন. আমিও এমন ছাত্র বৎসল গুরু দ্বিতীয় পাইনি। আমার চিন্তায় যদি কোন স্বচ্ছতা এসে থাকে, তার জন্য আমি আপনার কাছেই ঋণী।

আমি তোমাকে দীর্ঘদিন না দেখে থাকতে পারি না চাণক্য।

তাই তো আমি সুদুর তক্ষশীলা থেকে ছুটে আসি আপনার চরণ-দর্শনের জন্য।

ঋষি সৌম্য কুটিরের ভেতর উঠে গেলেন। কিছুপরে একটি পাথরেব.থালাতে ফল সাজিয়ে, শর্করার সঙ্গে নবনী মিশিয়ে বাইরে নিয়ে এলেন। অন্য হাতে জলের পাত্র।

কূপের জলে মুখ প্রক্ষালন করে চাণক্য আসনে এসে বসলেন।

গুরু বললেন, আমার অনেক আগেই তোমাকে কিছু খাবার দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু কথায় কথায় সবই ভুল হয়ে গেল।

চাণক্য পরম পরিতৃপ্তিতে গুরুর দেওয়া ভোজ্য খেতে লাগলেন। সমস্ত অপমানকে ভুলে গিয়ে মহা আনন্দে এই মুহূর্তে পূর্ণ হয়ে উঠল চাণক্যের প্রাণ।

সৌম্য বললেন, মগধের প্রজারা নন্দরাজাদের পীড়নে কেবল জর্জরিত নয়, দারুণভাবে ক্ষুব্ধ। শুষ্কপত্রের স্তূপে একটি স্ফুলিঙ্গ পড়ার অপেক্ষা।

চাণক্য বললেন, এবার আমি এক তরুণ বীরকে নিয়ে যাতে মগধে ফিবতে পারি, সেই আশীর্বাদ করুন গুরুদেব।

আমি সেই শুভক্ষণটির জন্য প্রতীক্ষা করে থাকব।

আর একটি কৌতূহল.....।

কথাটা শেষ হল না পণ্ডিত চাণক্যের। সৌম্য বললেন. আমার গুপ্তধন-প্রাপ্তির রহস্য জানতে চাও তো?

চাণক্য বললেন, আপনি মানুষের অন্তর পর্যন্ত পাঠ করতে পারেন, আপনি সর্বজ্ঞ।

সৌম্য বললেন, অনুমান করতে পার, আমার ঐ অর্থপ্রাপ্তি কিভাবে হয়েছে?

চাণক্য কিছু সময় ভেবেও কোন কূলকিনারা করতে পারলেন না। তিনি মাথা নেড়ে জানালেন, তাঁর পক্ষে কোন রকম অনুমান করাই সম্ভব নয়।

শিশুনাগ বংশের ঐ স্বামীহন্ত্রী রানীই এক অমারাত্রিতে গর্দভের পিঠে অমূল্য রত্নরাজী সহস্রাধিক স্বর্ণপিণ্ড ও কয়েক পেটিকা-পূর্ণ স্বর্ণালঙ্কার নিয়ে উপস্থিত হয়।

পরে গণনা করে দেখেছি, শতাধিক গর্দভ এইসব ভার বহন করে এনেছে।

চাণক্য বিস্মিত হয়ে বললেন, একা রানী এতগুলি গর্দভকে কি করে তাড়িয়ে আনল?

বিশজন অত্যন্ত বলিষ্ঠ মানুষ ভারবাহী পশুগুলোকে তাড়িয়ে এনেছি ।

তারা তো সবই জানতে পেরে গেছে, এসব গুপ্ত ধনের কথা অচিরেই জানাজানি হয়ে যেতে পারে।

তার আশঙ্কা কম। ঐ মানুষগুলি ছিল বিদেশী বণিক। তারা পাটলিপুত্রে ব্যবসা সেরে ফিরছিল তাম্রলিপ্তে। তারাই ফেরার পথে এগুলি রানীর গুপ্তভাণ্ডার থেকে তুলে নিয়ে এখানে নামিয়ে দিয়ে যায়। শুধু তাই নয়, সারা রাত ধরে ঐ সামনের আম্রকাননে গভীর গর্ত খুঁড়ে পেটিকাগুলি সাজিয়ে রেখে গেছে। ঐ জায়গাটির ওপর এখন সবুজ ঘাসের আস্তরণ দেখতে পাবে।

একাই রানী ঐ অন্ধকারে ফিরে গেল রাজপ্রাসাদে?

দুজন সশস্ত্র দেহরক্ষী ছিল, একজন পুরুষ, অন্যজন নারী। দুজনকেই নাকি রানী একসময় মহাপদ্মের দেওয়া মৃত্যুদণ্ড থেকে মুক্তি দেয়। তাই তারা রানীর জন্য নাকি প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। এসব কথা রানী সেই রাত্রেই আমাকে বলেছিল।

চাণক্য বললেন, প্রাসাদ থেকে এতসব রত্ন সরিয়ে আনার সময় কোন মানুষের চোখে পড়েনি?

রানী শিশুনাগ বংশের পরিত্যক্ত পুরাতন প্রাসাদেই থাকত। তারই এক গোপন কুটুরিতে ছিল রানীর এই গুপ্তধন। নতুন প্রাসাদ তৈরি করে একসময় মহাপদ্ম নন্দ উঠে যায়, কিন্তু শিশুনাগ বংশের রানী তার পুরাতন প্রাসাদেই থেকে যায়। রাজকোষ অবশ্য নতুন প্রাসাদেই সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

চাণক্য জানতে চাইলেন, হঠাৎ কি মনে করে আপনাকে এত বিশাল সম্পদ দিয়ে গেল?

মৃত্যুর আগে কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে সাধুর কাছে গচ্ছিত রেখে গেল সমস্ত সঞ্চয়। উপযুক্ত কোন কাজে সাধু ব্যয় করুন, এই ইচ্ছা ছিল তার মনে। শেষে এই অর্থ ব্যয়ের ব্যাপারটা আমার ওপরেই পুরো ছেড়ে দিয়েছিল।

চাণক্য সোচ্ছ্বাসে বললেন, আমার কাজের উৎসাহ সহস্রগুণ বেড়ে গেল গুরুদেব। সহজ আর সুগম হয়ে গেল আমার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পথ।

পাঁচ বছরের কঠোর সাধনা আর একাগ্র অনুশীলনের পর চন্দ্রগুপ্ত সূর্যের দীপ্তির মত শাণিত হয়ে উঠল। আজানুলম্বিত বাহু, প্রশস্ত বক্ষ, সুস্থির প্রতিভাদীপ্ত মুখমণ্ডল।

সর্বপ্রকার অস্ত্রচালনায় কেবল সুদক্ষ নয়, সতীর্থদের অনায়াসে অতিক্রম করে গেল সে।

গুরুরা বলতে লাগলেন, জন্মান্তরের সুকৃতি না থাকলে সম্ভব নয় এমন প্রতিভা।

সর্বক্ষেত্রে সিদ্ধিলাভ করল চন্দ্রগুপ্ত। অগ্নিবর্ণের একটি অশ্বে আরোহণ করে যখন সে দ্রুতগতিতে প্রান্তর পার হয়ে যেত, তখন মনে হত যেন দেব দিবাকর অগ্নিময় অশ্বে আরোহণ করে ভুবন পরিক্রমা করছেন। প্রস্তর-প্রান্তরে গতিশীল অশ্বের ক্ষুর-সংঘাতে ঝলসে উঠত বিদ্যুৎ দীপ্তি। অশ্বের স্ফীত নাসা থেকে স্ফূরিত হত অতি উষ্ণ প্রশ্বাস। বায়ুপ্রবাহে উড্ডীন রক্তবর্ণের কেশরগুলি দেখে মনে হত, লক্‌লক্ করে জ্বলছে ঊর্ধ্বমুখী অগ্নিশিখা।

ঝক্‌ঝক্ করে উঠত চন্দ্রগুপ্তের করধৃত শাণিত তরবারি। উত্তোলিত বর্শা যখন সবেগে নিক্ষিপ্ত হত লক্ষ্যবস্তুর কেন্দ্রে, তখন সমস্ত প্রতিযোগী প্রতিদ্বন্দ্বিতা ভুলে করতালি দিয়ে উঠত।

অসাধারণ ব্যক্তিত্ব আর সংগঠকের ক্ষমতা নিয়ে জন্মলাভ করেছিল চন্দ্রগুপ্ত। তার চতুর্দিকে ভিড় করে

আসত তক্ষশীলার শিক্ষার্থীরা। বিদ্যার্থীমণ্ডলের সে ছিল মধ্যমণি। তার আহ্বানমাত্রই সমবেত হত সতীর্থরা। একসময় বন্ধুরা সকলে সমবেত হয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিল, চন্দ্রগুপ্তকে সর্বাধ্যক্ষ করে তারা গঠন করবে একটি দল। তারই পরিচালনাধীনে থেকে তারা খণ্ডক্ষুদ্র রাজ্যগুলোকে এক রাষ্ট্রীয় বাঁধনে বেঁধে ফেলবে। সংকীর্ণ ঈর্ষা, তুচ্ছ দ্বেষ মুছে ফেলবে তারা।

চন্দ্রগুপ্ত বন্ধুদের বলেছিল, সেই সুদিন বহুদূরে নয়। তোমরা প্রস্তুত থেকো। আমি মহাকালের হাতছানি দেখতে পাচ্ছি।

তিন

উত্তর পশ্চিম সীমান্তের আকাশে পাখার ঝাপটায় প্রবল ঝড় তুলে সিন্ধু উপত্যকার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল শাণিত নখর, তীক্ষ্ণ চঞ্চু ঝাঁক ঝাঁক বাজপাখি। হিন্দুকুশ পর্বত ডিঙিয়ে উপত্যকায় আছড়ে পড়ল তারা। ঝড়ের আগে শুকনোপাতার মত উড়ে আসতে লাগল খবর।

সুদূর গ্রীসের অভ্যন্তরে ম্যাসিডনের তরুণ রাজা আলেকজাণ্ডার বেরিয়েছেন দিগ্বিজয়ে। সুসজ্জিত, সুশিক্ষিত বিশাল সৈন্যবাহিনী।

বিনা বাধায় জয় করে নিলেন এশিয়া মাইনর, সিরিয়া আর মিশর। ঝাঁপিয়ে পড়লেন পারস্য সাম্রাজ্যের ওপর। আরবেলার রণাঙ্গনে প্রাণপণ যুদ্ধ করলেন তৃতীয় দরায়ুস। প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ বিশাল সাম্রাজ্য। ভারতের সিন্ধুতীর পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের অধীশ্বর পারস্য-সম্রাট তৃতীয় দরায়ুস। পৃথিবীর অন্যতম বনেদী সম্রাট। সম্মান, সম্ভ্রম রক্ষার তাগিদে বহু সৈন্যের সমাবেশ ঘটালেন পারস্য-রাজ।

কিন্তু বিষাক্ত পিপীলিকার সুশৃঙ্খল ও সংঘবদ্ধ আক্রমণে যেমন বিশালকায় হস্তীও বিভ্রান্ত অসহায় আর শক্তিহীন হয়ে পড়ে, ঠিক তেমনি গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের উন্নততর রণকৌশলের কাছে সম্পূর্ণ পরাভুত হলেন পারস্য অধিপতি।

তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে আত্মরক্ষা করলেন না, নিজের জীবিত ও মৃত সৈন্যদের পাশে রক্তাক্ত অস্ত্রহীন অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইলেন।

রণোন্মত্ত, ক্ষিপ্ত গ্রীকবীরের তরবারি সম্পূর্ণ ছিন্ন করল সম্রাটের শির। রক্তে ভেসে গেল পরিচ্ছদ, সারা দেহ। সূর্যাস্তের আকাশে ভেসে উঠল সেই মহৎ মৃত্যুর প্রতিচ্ছবি।

পরদিন রাজধানী পার্সিপলিসে মহাবিক্রমে প্রবেশ করলেন গ্রীক বীর। তখনও নির্বাপিত হয়নি তাঁর সঞ্চিত ক্রোধাগ্নি। তিনি তাঁর সৈন্যদের আদেশ দিলেন, সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দাও এই নগরীর গর্বোদ্ধত প্রাসাদগুলো।

সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে গেল প্রাচীন মহানগরীর বহুযুগ সঞ্চিত অমূল্য যত ঐতিহ্য।

এবার লক্ষ্য, ভারতভূমি।

হিন্দুকুশ অতিক্রম করে গ্রীক-বাহিনী ধেয়ে এল ভারতের অভিমুখে। কাবুলের সন্নিকটে শিবির স্থাপন করা হল সারি সারি। সেখান থেকেই আলেকজাণ্ডার দূত পাঠালেন তক্ষশিলা আর সিন্ধু-প্রদেশের রাজন্যবর্গের কাছে। হয় আনুগত্য, নয় যুদ্ধ।

প্রাচীন গান্ধারে অবস্থিত পুষ্কলাবতী, তার পূর্বে তক্ষশিলা, পার্বত্য অঞ্চলে ঘেরা অভিসাররাজ্য। বিতস্তা নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত সৌভূমি, বিতস্তা ও চেনাবের মধ্যবর্তী রাজ্য পৌরব। ইরাবতী আর চেনাবের মাঝে মল্লরাজ্য। সিন্ধুদেশে অবস্থিত মৌসিকেনস। এ সমস্ত রাজ্যে উদ্ধত-নিশান রথারূঢ় আলেকজাণ্ডারের দূত গিয়ে দাঁড়াল।

যে রাজ্যের গৌরব-শিখর ঝলমল করছিল সূর্যালোকে দীপ্ত তুষারশৃঙ্গের মত, সেই বিদ্যাভূমি তক্ষশিলার রাজা অম্ভি সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন যুদ্ধের নামে।

তিনি দূতকে সাদরে আমন্ত্রণ জানিয়ে বললেন, আমি আপনাদের সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করছি। তবে একটি আবেদন, তিনি যেন আমার রাজ্যটিকে কোনওভাবেই না ধ্বংস করেন।

দূত তক্ষশিলা থেকে ফিরে যাবার সময় মহারাজ অম্ভি সম্রাট আলেকজান্ডারের জন্য প্রভূত উপঢৌকন পাঠাতে মনস্থ করলেন।

তরুণ চন্দ্রগুপ্ত ভাবল, এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ। সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিত চাণক্যের সঙ্গে সে পরামর্শে বসল।

গুরুদেব, তক্ষশিলার অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা আমার সমাপ্ত হয়েছে। এখন উন্নততর কোন শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করা যায় কিনা তার সুযোগ-সন্ধান করতে হবে।

চাণক্য বললেন, সারা ভারতভূমিতে তক্ষশিলার চেয়ে উৎকৃষ্ট কোন অস্ত্রশিক্ষা কেন্দ্র নেই। তবে পঠনপাঠনে আরও উৎকর্ষ লাভ করার জন্য তুমি পাটলিপুত্র যেতে পার. সেখানে উন্নত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন আছে, তেমনি স্থিতধী জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ ঋষি সৌম্যও আছেন।

আমি শস্ত্রবিদ্যার কথাই ভাবছি গুরুদেব, শাস্ত্রবিদ্যা নয়।

সেটি কিভাবে সম্ভব?

আপনি শুনেছেন, সিন্ধু উপত্যকায় ঘাঁটি গেড়ে বসেছে দুর্ধর্ষ গ্রীক-বাহিনী। বিদ্যুৎ-গতি ও রণনৈপুণ্যে ওরা পরাস্ত করেছে পারস্য-সম্রাটকে। ধ্বংস করে দিয়েছে সমস্ত দেশটা। তক্ষশিলার রাজা অম্ভি তো ভীত হয়ে আনুগত্য স্বীকার করেছেন ম্যাসিডন অধিপতি আলেকজান্ডারের। তিনি বহু উপঢৌকনও পাঠাবার ব্যবস্থা করছেন।

এ সকল সংবাদ আমার অবগত, চন্দ্রগুপ্ত। এখন তোমার অভিপ্রায়টুকু জানতে চাই।

গুরুদেব, মহারাজ অম্ভির উপহারের মধ্যে থাকবে, পাঁচটি অতি উৎকৃষ্ট অশ্ব ও দুটি হস্তী। আমি ঐ অশ্বগুলি নিয়ে যেতে চাই অশ্বারোহী হিসেবে।

তাতে তোমার লাভ ?

আমি ওখানে কিছুদিন থেকে চেষ্টা করব ওদের যুদ্ধকৌশলগুলো আয়ত্ত করতে।

চাণক্য বললেন, তোমার এ পরিকল্পনা উত্তম। তবে তোমার উদ্দেশ্যটি যেন কোনওভাবে প্রকাশ না পায়।

আমি পাঁচটি অশ্বের পরিচর্যার জন্য কিছুকাল রয়েছি, এমনি ভাব দেখাব।

নিজেকে রক্ষা করার দায়িত্ব তোমার, খুব সাবধান। নন্দবংশের বিরুদ্ধে অচিরে অস্ত্রধারণ করতে হবে, একথা ক্ষণকালের জন্যও বিস্মৃত হয়ো না।

আমি ঐ কাজের জন্য আপনার কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ। আমার শপথ আমি ভুলে যাব না গুরুদেব।

চাণক্য সামান্য সময় নীরব থেকে বললেন, পরস্পর বিবাদে লিপ্ত ছোট চোট রাজ্যগুলিকে জয় করে, নন্দবংশের বিশাল রাজ্যটিকে অসির দ্বারা অধিকারভুক্ত করে আমরা বিরাট এক ভারত-রাষ্ট্র তৈরি করব। তোমাকে তারই সিংহাসনের ওপর 'একরাট' সম্রাট করে বসাব আমি।

আমার ভেতর আপনি সেই প্রেরণাই জাগিয়ে রেখেছেন, গুরুদেব।

আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন চাণক্য, এ আমার একটা অলীক স্বপ্নমাত্র নয় চন্দ্রগুপ্ত, বৈদিক সমাজ এমনি রাষ্ট্রেরই স্বপ্ন দেখেছিল। আমি সেই স্বপ্নকেই সফল করে তুলব বাস্তবে। অনাগত সেই রাষ্ট্রের কথা ভেবে আমি কূটনীতি, রাষ্ট্রশাসন পদ্ধতি, অর্থনীতির ওপরে একটি 'নিয়মাবলী' প্রস্তুত করছি।

চন্দ্রগুপ্ত বলল, আপনার আশীর্বাদ মাথায় নিয়েই আমি এগিয়ে চলেছি। আপনি পাশে থাকলে সিদ্ধি আমার হবেই।

তুমি মহারাজ অম্ভির বিশেষ প্রিয়পাত্র, তাঁর কাছে অবিলম্বে তোমার ইচ্ছার কথা জানাও। তুমি যেদিন অশ্ব নিয়ে রওয়ানা হয়ে যাবে, আমিও সেদিন যাত্রা করব পাটলিপুত্রের উদ্দেশ্যে।

আপনি এতদূরের পথ একাই যাবেন?

এখন আমাদের মুহূর্তকাল নষ্ট করার মত সময় হাতে নেই, চন্দ্রগুপ্ত। ঋষি সৌম্যের কাছ থেকে অর্থ আনতে হবে। এখানে ভাড়াটে সৈন্য সংগ্রহ করে মগধের উদ্দেশ্যে যুদ্ধযাত্রা করতে কিছু সময় লাগবে। তুমি সে সময়ের ভেতর অবশ্যই ফিরে আসবে। তখন সৈন্য পরিচালনার দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেবে।

তাই হবে গুরুদেব।

ইতিমধ্যে পুষ্কলাবতীর রাজা অষ্টক আলেকজান্ডারের বশ্যতা স্বীকার না করায় তাঁর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল গ্রীক সৈন্যেরা। যুদ্ধে নিহত হলেন অষ্টক। গ্রীকদের পদানত হল পুষ্কলাবতী।

এমনি দশা হল অশ্বকজাতির। একমাস বীর বিক্রমে যুদ্ধ চালাবার পর ভেঙে পড়ল তাদের প্রতিরোধ। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে চলল নির্মম হত্যালীলা।

এরপর সামান্য কটি দিন বিশ্রামের ভেতর কাটালেন সম্রাট। আর ঠিক তারই ভেতর এসে পড়ল রাজা অম্ভির উপঢৌকন।

সুসজ্জিত হস্তীগুলি ছিল গ্রীকদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় বস্তু। সম্রাট আলেকজান্ডার আর সেনাপতি সেলিউকাস এই উপঢৌকনের বিশেষ তারিফ করতে লাগলেন।

সেলিউকাসের সঙ্গে এসেছিল তাঁর মাতৃহীন একটি মাত্র কিশোরী মেয়ে। তার ডাক নাম ছিল ইকো। চিত্রিত একটি প্রজাপতির মত সে উড়ে বেড়াত সর্বত্র। সম্রাট আলেকজান্ডার তাকে শিবিরের বাইরে যেখানে খুশি বেড়িয়ে বেড়াবার অধিকার দিয়েছিলেন। সে হাতিব মত জীবটিকে দেখে বিস্ময়ে হতবাক।

কিন্তু বিস্ময় লুকিয়ে ছিল আরও একটি বস্তুতে। তিনটি সাদা ঘোড়া আর দুটি কালো ঘোড়াকে নিয়ে চন্দ্রগুপ্ত যখন খেলা দেখাতো, তখন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেত আলেকজান্ডারের বিশাল সৈন্যবাহিনী। স্বয়ং সম্রাটও সেনাপতি সেলিউকাসকে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে সে দৃশ্য দেখতেন। পিতার পাশে দাঁড়িয়ে থাকত ইকো। তার মনে হত অলৌকিক কোনওকিছু দেখছে সে।

পাঁচটি ঘোড়া ছুটত সারি দিয়ে। সবকটি ঘোড়া সমান গতিতে ছুটত। বলগা আকর্ষণ না করে ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে দাঁড়িয়ে থাকত চন্দ্রগুপ্ত। শুধু তাই নয়, এক ঘোড়া থেকে অন্য ঘোড়ার পিঠে লাফ দিতে দিতে চলে যেত।

আনন্দে বিস্ময়ে হৈ হৈ করে উঠত সৈন্যবাহিনী। করতালি দিত ইকো। তার উচ্ছ্বাস থামতেই চাইত না।

অল্প কয়েকদিনের ভেতরেই চন্দ্রগুপ্ত একান্ত প্রিয় হয়ে উঠল প্রতিটি সেনাধ্যক্ষ আর সৈনিকের কাছে। তার অন্তরঙ্গ ব্যবহার, মধুর হাসি, প্রতি মুহূর্তে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবার আকর্ষণীয় ক্ষমতা তাকে ভিনদেশী মানুষদের কাছে অত্যন্ত আপনজন করে তুলল। যে যুবক এসেছিল অশ্বের পরিচর্যাকারী হিসেবে, সে অচিরেই নবীন সেনাধ্যক্ষদের বন্ধুর পদবীতে উন্নীত হল।

আলোচনার ভেতর দিয়ে সে জানতে পারল, যুদ্ধক্ষেত্রে গ্রীকদের সৈন্য সাজানোর কৌশল। অল্প কিছু ক্ষতির ভেতর দিয়ে বৃহৎ সৈন্যবাহিনীকে কয়েকটি ত্রিভুজের আকারে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

তীরন্দাজরা কিভাবে তীর ছুঁড়বে, বর্শাধারীরা কি কৌশলে কতখানি দুরত্ব বজায় রেখে বর্শা চালাবে, অর্ধপাক ঘুরে কিভাবে বিপুল শক্তিতে চালাবে কুটার, সে সকল প্রক্রিয়া অত্যন্ত নিপুণভাবে আয়ত্ত করে নিল সে।

সৈন্যদের প্রতিদিনের অভ্যাসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সে জানতে লাগল আক্রমণের কলাকৌশল। পশ্চাদপসরণের অভিনয় করে শত্রুপক্ষের সৈন্যদের কিভাবে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে হয়, কিভাবে তাদের সঙঘবদ্ধ না রেখে ছড়িয়ে দিতে হয়, আবার কোন মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়াতে হয় আক্রমণে, এ সকল শিখে নিল সে।

শিরস্ত্রাণ, অঙ্গত্রাণ, বিচিত্র ধবনের অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের কৌশল সে জেনে নিল বাহিনীর সঙ্গে আগত অস্ত্রনির্মাতাদের কাছ থেকে।

একদিন সম্রাট ও সেনাপতিদের আনন্দবিধানের জন্য রথ-দৌড় ও অস্ত্র প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হল।

দিগন্তবিস্তৃত সিন্ধু-উপত্যকার একদিকে উচ্চাসনে বসেছিলেন সপারিষদ সম্রাট । তারপর নিম্নভূমিতে তরঙ্গের মত দেখা যাচ্ছিল সারি সারি সৈন্যের আন্দোলিত বাহু ও মস্তক। তারা মাঝে মাঝে গগন বিদীর্ণ করে তুলছিল আনন্দ-ধ্বনি।

প্রতিযোগীদের নাম ঘোষণা করা হল রথ দৌড়ের প্রতিযোগিতায়।

সর্বশেষ নামটি ছিল চন্দ্রগুপ্তের। সেনাধ্যক্ষেরা ভালবেসে তার নামটি প্রতিযোগীদের তালিকায় যুক্ত করে দিয়েছিল। কেবল তাই নয়, তীরন্দাজী, বর্শা নিক্ষেপ, অসি চালনাতেও ছিল তার নাম।

আলেকজান্ডার বিস্মিত হলেন। পার্শ্বে উপবিষ্ট সেনাপতির উদ্দেশ্যে বললেন, সেলিউকাস, যে রাজ্যের রাজা যুদ্ধ না করেই আত্মসর্মপণ করল, সে রাজ্যে এমন কুশলী সর্বশস্ত্র বিশারদ জন্মায় কি করে!

সেলিউকাস বললেন, ব্যাপারটা সেনাপতিদের নিছক এক ধরনের কৌতুক হতে পারে। আগে সমস্ত অনুষ্ঠানটি মহামান্য সম্রাট প্রত্যক্ষ করুন।

বেশ তাই হোক্।

অসি যুদ্ধে নিয়ম করা হয়েছিল, দেহে এমন কোনও আঘাত করা চলবে না, যাতে রক্তপাত ঘটে। মস্তিকে কিংবা পদদ্বয়ে অসি যে আগে ছোঁয়াতে পারবে, সে-ই হবে বিজয়ী।

বহু প্রতিযোগীকে বিভক্ত করা হল দুটি ভাগে। ঐ অসি যুদ্ধ থেকে বিজয়ী হয়ে বেরিয়ে এলো দুজন। একজন গ্রীক বীর, অন্যজন চন্দ্রগুপ্ত।

এবারে শেষ লড়াই চলল দুজনের। দীর্ঘ সময় ধরে চলল, পলক পড়ে না দর্শকদের চোখে।

একবার মনে হল, চন্দ্রগুপ্তের অসি ছুঁয়ে গেল গ্রীক বীরের শিরস্ত্রাণ। কিন্তু ধাতব বস্তুতে অস্ত্রাঘাতের শব্দ এতই ক্ষীণ হল যে তা বিচারকের শ্রবণে পৌঁছল না। চোখের দেখায় চন্দ্রগুপ্ত জয়ী হলেও শ্রুতিতে শব্দ ধরা পড়ল না বলে বাতিল হয়ে গেল চন্দ্রগুপ্তের জয়।

আবার শুরু হল যুদ্ধ। এবারে স্বল্প সময়ের মধ্যেই গ্রীক বীরের অসি স্পর্শ করল চন্দ্রগুপ্তের ধাতব পাদুকা। আঘাত এড়াবার জন্য উল্লম্ফন করতে গিয়েই ঘটল এ বিপর্যয়। এর ফলে গ্রীক বীরকে ঘোষণা করা হল বিজয়ী বলে। বহুজনের কাছে কিন্তু বিতর্কিত থেকে গেল প্রথম আঘাতটি।

শুরু হল বর্শা নিক্ষেপ। প্রথম দূরত্বে রাখা লক্ষ্যবস্তু বিদ্ধ করল বেশ কয়েকজন প্রতিযোগী।

এবার দূরত্ব বাড়িয়ে দেওয়া হল। টিকে রইল দুজন। তার ভেতর একজন সেই চন্দ্রগুপ্ত। তক্ষশিলা থেকে আগত বীর যুবক।

শেষবার অনেকখানি দূরত্ব বাড়িয়ে দেওয়া হল। এবারে দুজনের একজনও লক্ষ্যভেদ করতে পারল না। দূরত্বের জন্য লক্ষ্যবস্তু পর্যন্ত পৌঁছতে পারল না একটিও বর্শা।

বিচারক সেনাপতিদের সঙ্গে পরামর্শ করে দুজনকেই বিজয়ী বলে ঘোষণা করলেন।

তীরের খেলাটিও যুক্ত হল রথ দৌড়ের সঙ্গে। প্রথম, দ্বিতীয় আর তৃতীয় স্থানাধিকারী রথীরা সীমারেখা অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গেই চলন্ত রথ থামিয়ে দিয়ে দূরের লক্ষ্য বস্তুকে বিদ্ধ করবে তীর ছুঁড়ে। রথ-দৌড় আর তীর নিক্ষেপ, দুটি পরীক্ষাই হয়ে যাবে একসঙ্গে।

রথারোহীরা ঘর্ষণের শব্দ তুলে চলে গেল দিগন্তের দিকে। সেখান থেকেই তারা ছুটে আসবে দশর্কদের দিকে শেষ সীমারেখাটি লক্ষ করে। এটি শেষ পরীক্ষা। সবাই উত্তেজনায় ফুটছে।

প্রান্তর কাঁপিয়ে ছুটে আসছে পঞ্চাশখানা রথ। দূর থেকে মনে হচ্ছে, একই সরলরেখায় ছুটছে তারা। যাযাবর হাঁসেরা যেমন আকাশপথে সরলরেখায় উড়ে যায়, তারপর ঝোড়ো হাওয়ার ধাক্কায় যেমন ভেঙে যায় সারি, ঠিক তেমনি ছুটন্ত রথগুলো এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। কখনো কেউ এগিয়ে আসছে, আবার অন্যজন তাকে অতিক্রম করছে।

আরও কাছে এগিয়ে এলে প্রতিযোগিতার চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে উঠল।

পঞ্চম স্থান থেকে উঠে আসছে একটা রথ। চতুর্থ রথের পাশাপাশি কয়েক মুহূর্তে ছুটতে ছুটতে সে তাকে পেছনে ফেলে দিল। তৃতীয় আর দ্বিতীয় স্থানাধিকারী রথটিকেও।

এবার তার সামনে প্রবল বেগসম্পন্ন প্রথম রথখানা। সীমারেখাও অদূরে।

তিন অশ্ব-যোজিত রথ। দ্বিতীয় রথখানা প্রথম রথকে অতিক্রম করছে। একহাতে বল্গা, অন্যহাতে কশা ধরে উঠে দাঁড়িয়েছে রথের দুই চালক। এদিকে উত্তেজনায় টানটান হয়ে দর্শকরাও নিজেদের জায়গায় উঠে

দাঁড়িয়েছে।

আকাশপথে মহাবেগে ধাবমান কোন অলৌকিক বিহঙ্গের মত প্রথম রথটিকেও পাখার ঝাপটে পেছনে ফেলে দিয়ে উড়ে চলে এল সেই আশ্চর্য রথ।

সীমারেখা ছুঁয়েই অপূর্ব অদ্ভুত ভঙ্গিতে সামনের পা ওপরের দিকে তুলে লাফিয়ে উঠল তিনটি ঘোড়া। দুটি সাদার সামনে একটি কালো।

আর সেই মুহূর্তে বল্গাকে সম্পূর্ণ টেনে নিয়ে প্রতিযোগী থামিয়ে দিল তার রথ। দ্রুতহাতে ধনুর্বাণ তুলে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে অদূরে বিশাল বৃক্ষশাখায় সুকৌশলে রাখা একটি কাঠের বাজপাখির মাথা লক্ষ করে তীর ছুঁড়ল। তীরটি গেঁথে গেল বেশ বৃহৎ আকারের বাজপাখিটির মাথায়। দ্বিতীয় স্থানধিকারী রথীর নিক্ষিপ্ত তীর উড়ে গেল উপর দিয়ে। তৃতীয় রথারোহীর তীর পাখা স্পর্শ করে পড়ে গেল নীচে।

চর্তুদিকে উঠল উল্লাস, কোলাহল আর 'সাবাস' 'সাবাস' ধ্বনি।

সেলিউকাসের পাশে দাঁড়িয়ে মহাউল্লাসে ফেটে পড়ছিল ইকো। সেনাপতি এই সামান্য যুবকের কৃতিত্বে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। কেবল একজন ছিলেন গম্ভীর চিন্তামগ্ন, তিনি স্বয়ং সম্রাট আলেকজান্ডার।

মধ্যরাত্রি। অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে প্রান্তর রহস্যময়। দুজন সৈনিকের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্ত এসে দাঁড়াল সম্রাটের শিবিরের সামনে।

মশাল জ্বলছে শিবির ঘিরে। অতন্দ্র প্রহরীরা সশস্ত্র অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে প্রস্তরমূর্তির মত।

একজন সৈনিক ভেতরে গিয়ে সম্রাটের কাছে পৌঁছে দিয়েই ফিরে এল শিবিরের বাইরে।

তিনটি বৃহদাকার সুবর্ণ দীপাধারে দীপ জ্বলছে। সম্রাটের বামপার্শ্বে কিছু তফাতে অপেক্ষাকৃত নিম্নাসনে বসে আছেন সেনাপতি সেলিউকাস। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে কন্যা ইকো। সম্রাটের একান্ত প্রিয়পাত্রী। বাতাসের মত স্বচ্ছন্দ গতি তার , সেনা নিবাস থেকে সম্রাটের শিবির পর্যন্ত।

সম্রাট কথা শুরু করলেন, তুমি সমস্ত রকমের অস্ত্রচালনায় সুদক্ষ। এমনকি তোমার মত একজন রথী আমার রথচালকদের মধ্যে নেই। এখন যুবক, তোমার কাছে প্রশ্ন, তুমি কি সত্যিই তক্ষশিলা-রাজ্যের অশ্ব পরিচর্যার কাজে নিযুক্ত?

সম্প্রতি সে কাজেই আমি নিযুক্ত, সম্রাট।

আলেকজান্ডার বললেন, যুবক, তুমি অত্যন্ত বুদ্ধি ধর। তোমার উত্তরের ভেতরে মিশে আছে সত্যতার সঙ্গে বেশ কিছু গোপনতা, যা সহজে ধরা পড়ে না। আচ্ছা এবার বল , তুমি অস্ত্র শিক্ষা করেছ কার কাছে এবং কোথায়?

মগধ রাজ্যের এক পশুশিকারি ব্যাধ আমার অস্ত্রগুরু।

সামান্য পশুপক্ষী শিকারি একজন মানুষ অস্ত্রচালনার রথচালনার এত কলাকৌশল জানবে, এ একেবারেই অসম্ভব। তুমি অন্য কোথায় এসব শিখেছ, সত্য করে বল?

আমি কিছু কিছু অস্ত্র শিক্ষা করেছি আমার সেই অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন গুরুর কাছে। তারপর সারা ভারত চষে বেড়িয়েছি অস্ত্র শিক্ষার আশায়। যেখানে যতটুকু পেয়েছি আয়ত্ত করে নিয়েছি।

তুমি কি এখন কোন রাজার সৈন্যদলে কাজ কর?

না সম্রাট, আমি কেবল রাজা অম্ভির আদেশে অশ্ব পরিচর্যার কাজ করছি। আপনার অশ্বশালার রক্ষকের কাছে মহারাজা অম্ভির পাঁচটি অশ্ব রেখে দিয়ে অবিলম্বে আমি ফিরে যাব।

আমার সৈন্যদের সঙ্গে তোমাকে খুব ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতে দেখেছি যুবক। তুমি ওদের কাছ থেকে কিছু যুদ্ধ কৌশল লাভ করেছ কি? আমার যতদূর অনুমান, তুমি যুদ্ধ বিশারদ।

মহামান্য সম্রাট, যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য সাজাবার কৌশল কিছু পরিমাণে আয়ত্ত করেছি, আপনার সেনাবাহিনীকে নিকট থেকে লক্ষ করে।

ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন সম্রাট, আমার অনুমানই সত্য প্রমাণিত হল সেলিউকাস। এ তরুণ যুবক নিঃসন্দেহে কোন ভারতীয় রাজার প্রেরিত গুপ্তচর। ওহে তরুণ, গুপ্তচরের শাস্তি কি জান?

জানি সম্রাট, মৃত্যু।

তাহলে প্রস্তুত হও।

আমি কোন রাজার দ্বারা প্রেরিত গুপ্তচর নই সম্রাট, আমি স্বেচ্ছায় শিক্ষার্থী হয়ে এসেছি এখানে। রাজা অম্ভি অশ্ব পাঠাচ্ছিলেন উপঢৌকন হিসেবে,আমি সেই সুযোগটুকু গ্রহণ করেছি মাত্র। অশ্বের পরিচর্যাকারীর কাজটুকু নিয়ে এসেছি।

যা রাজা কিংবা সম্রাটের পরিকল্পনার বিষয়, তা জেনে তোমার মত অতি সাধারণ এক তরুণের কি লাভ? তুমি রণক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনার কৌশল জেনে কি করবে?

সম্রাট, ভারতের খন্ড ক্ষুদ্ররাজ্যগুলিকে একসূত্রে বেঁধে নিতে চাই আমি । ৮ক ভারতবর্ষের ছবি আমার চোখের ওপর ভেসে ওঠে। সেই বিশাল রাষ্ট্রের সিংহাসনে বসে আমি দুষ্টের ঃমন আর শিষ্টের পালন করছি, এই স্বপ্ন দেখি।

হা হা করে হসে উঠলেন দিগ্বিজয়ী সম্রাট।

তাহলে সম্রাট হওয়ার প্রবল বাসনা জেগেছে তোমার মনে?

এ বাসনা একদিন আপনারও মনে জেগেছিল সম্রাট।

সেলিউকাস দৃঢ়স্বরে বললেন, তোমার কৃতিত্বের প্রশংসা করেছি আমরা, কিন্তু তুমি শেখ নি যুবক, সম্রাটের সঙ্গে কিভাবে বাক্য বিনিময় করতে হয়।

আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি, সেনাপতি। আমার গুরুর গুরু বলেন, সত্য আগুনের মত, তার ওপর কোনও আবরণ দিতে নেই। তাই যা আমার সত্য বলে মনে হয়েছে, তাকে আমি আবরণ না দিয়েই অকপটে প্রকাশ করেছি। আমার গুরু কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য কথা বলেন।

কি রকম?

কূটনীতির ক্ষেত্রে গোপনীয়তা। এখানে জটিল বিষয় নিয়ে চিন্তা করার সময়ে মুখের ভাবে প্রকাশ পাবে না। আর তাকে আবৃত করে রাখতে হবে মনের একান্ত গোপন কুটুরিতে।

সেনাপতি বললেন, তোমার গুরুর গুরু দার্শনিক, কিন্তু তোমার গুরু কূটনীতিজ্ঞ, বস্তুবাদী, পরিস্থিতি সম্বন্ধে একান্ত সচেতন।

সম্রাট জানতে চাইলেন, তোমাকে সম্রাট হওয়ার স্বপ্ন কে দেখিয়েছেন?

স্বপ্ন দেখার পরিস্থিতি আমার গুরু তৈরি করে দিয়েছেন, কিন্তু তাকে সার্থক রূপ দিতে হবে আমাকেই।

ঠিক সেই মুহূর্তে এক নৈশ প্রহরী এসে অভিনন্দন জানিয়ে একটি কাঠের পাতলা পিঁড়ি জাতীয় জিনিস সেনাপতির হাতে তুলে দিয়ে বলল, এই বস্তুটি তক্ষশীলা থেকে আগত ঐ যুবকের শয্যার উপাধানের তলায় পাওয়া গিয়েছে।

কথাটুকু শেষ করেই লোকটি বেরিয়ে গেল।

সম্রাট ও সেনাপতি ঐ অল্প পরিসর কাঠের পিঁড়িটির ওপর ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগলেন। ইকো কিন্তু তাকিয়ে রইল আজানুলম্বিত বাহু, আয়তচক্ষু, কুঞ্চিত কৃষ্ণকেশ, বলিষ্ঠ যুবকটির দিকে। ইকোর চোখে মুখে লেগেছিল উদ্বেগের ছাপ। সে জানে, সম্রাট আলেকজান্ডার আবেগপ্রবণ। কখনও দয়ালু, আবার কখনো খেয়ালী নৃশংস।

ইকোর দৃষ্টি কিন্তু চন্দ্রগুপ্তকে দেখার পর থেকে স্বপ্নময় হয়ে উঠেছে। আজকের প্রতিযোগিতার বিজয়ী এই যুবক অগ্রাধিকার করে বসেছে তার দরদী কিশোরী মনটিকে। এ যেন তার প্রাণের বেদিতে এসে দাঁড়িয়েছে স্বপ্নের বীর। কিন্তু কাঁপছে তার বুক। সম্রাট শেষ পর্যন্ত তার প্রিয় যুবকের ভাগ্য কি করে নির্ধারণ করেন, তাই দেখার জন্য তার উৎকণ্ঠা আর উদ্বেগের শেষ রইল না।

সম্রাট বললেন সেলিউকাস, কাঠের ওপর লৌহ শলাকা দিয়ে বিভিন্ন অবস্থায় আমাদের সৈন্য সংস্থাপনের চিত্র খোদাই করা হয়েছে। তুমি কি দেখতে পাচ্ছ?

সেনাপতি বললেন, আমিও তাই দেখছি সম্রাট। অবশ্য ও যে সৈন্য স্থাপনের কৌশল শিখে নিয়েছে,

সে কথা ও নিজে মুখে স্বীকার করেছে।

সম্রাট বললেন, এই খোদিত মানচিত্রটি কেড়ে নিয়ে অতি উচ্চাকাঙক্ষী যুবকটিকে বিতাড়িত করলে কিন্তু আমাদের বিপদ সংশয় কাটবে না। শত্রুরা আমাদের সৈন্য পরিচালনার কৌশলগুলো জেনে যাবে আর সেই ভাবে আমাদের আক্রমণ করবে।

সেনাপতি বললেন, তা অসম্ভব নয়।

সম্রাট ঘণ্টাধ্বনি করলেন। দুটি প্রহরী ঘণ্টার বিশেষ নির্দেশ অনুযায়ী প্রবেশ করল।

সম্রাট আলেকজান্ডার যুবকের দিকে ফিরে বললেন, তোমার অপরাধের জন্য তুমি কিরূপ মৃত্যু আশা কর?

কোন মৃত্যুই আমার অভিপ্রেত নয়, সম্রাট। তবে মৃত্যুদণ্ড দেবার মালিক যখন আপনি, তখন আপনার অভিপ্রায় অনুযায়ী দণ্ড কি প্রকারে হবে, তা নির্ধারণ করুন।

তুমি স্বপ্ন দেখতে ভালবাস, তাই না?

কোন উত্তর না দিয়ে দৃপ্ত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে রইল চন্দ্রগুপ্ত।

এবার সম্রাট বললেন, কোন অস্ত্রাঘাতে তোমার মৃত্যু হোক্, এ আমি চাই না। তোমাকে হস্তপদ বন্ধন করে ভাসিয়ে দেওয়া হবে সিন্ধুর স্রোতে। তুমি শুনবে তার গর্জন আর কল্লোল ধ্বনি। কিছুসময় তুমি এইভাবে স্বাদ পাবে সংগ্রামের। তারপর তুমি যেখানে চলে যাবে সেখানে তোমার জন্য পাতা আছে বালিকঙ্করের তৈরি সিংহাসন। তার চারদিকে শৈবালের কারুকার্য। সেখান বসে তুমি নৃত্যলীলা দেখবে মৎস্যকন্যাদের। একে নিশ্চয়ই তোমার স্বপ্নের জগৎ বলেই মনে হবে।

সম্রাট এবার ইঙ্গিত করলেন। প্রহরী দুজন চন্দ্রগুপ্তকে নিয়ে চলে গেল শিবিরের বাইরে।

একই জায়গায় স্থির মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল ইকো। যেন কোন দেবতার অভিশাপে সে স্পন্দহীন পাষাণে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

সেলিউকাস বলে উঠলেন, আমি নিজে উপস্থিত থেকে কাজটি সমাধা করতে চাই সম্রাট। এখন গভীর রাত্রি, সম্রাটের বিশ্রামের প্রয়োজন।

আলেকজান্ডার ইকোকে শুভরাত্রি জানিয়ে তাঁর বিশ্রাম কক্ষে চলে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে পিতাপুত্রী বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলেন, চন্দ্রগুপ্তকে প্রহরী দুটি নদীর দিকে টেনে নিয়ে চলেছে। হাতে তাদের বন্ধন-রজ্জু। ইতিমধ্যে অপরাধীর দুটি হাত বেঁধে ফেলেছে তারা। একটু তফাতে থেকে তাদের অনুসরণ করতে লাগলেন সেনাপতি ও তাঁর কন্যা।

নিশীথ রাত্রি, সুষুপ্ত স্কন্ধাবার। অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় চরাচর রহস্যময়।

একটি কিশোরী কণ্ঠের উক্তি, বাবা, ওকে কিভাবে বাঁচানো যায়?

পিতার কণ্ঠ, অসম্ভব। আমারও ইচ্ছা নয় এই ফুটন্ত সম্ভাবনাময় যৌবনে ওর মৃত্যু হোক, কিন্তু সম্রাটের আদেশ লঙঘন করার অধিকার আমার নেই।

বাবা, আমি যদি সঠিক শুনে থাকি, তাহলে সম্রাট অপরাধীকে জলে নিক্ষেপ করার আগে 'হস্তপদ' বন্ধন করতে বলেছেন।

ঠিকই শুনেছ তুমি।

সম্রাট কিন্তু একবারও 'হস্তপদদ্বয়' বন্ধন করতে বলেন নি। বন্দীর একটি হাত একটি পা যদি সামান্য এক এক টুকরো রজ্জুতে বেঁধে ওকে জলে ফেলে দেওয়া যায় তাহলে সম্রাটের বাক্য লঙিঘত হয় না। এদিকে যুবকের ভাগ্য যদি প্রসন্ন থাকে, তাহলে ভয়ঙ্কর স্রোতের সঙ্গে লড়াই করে সে ওপারে উঠে প্রাণরক্ষা করতে পারে।

অত্যন্ত বুদ্ধিমতী আর দয়ালু মেয়ে তুমি, তোমার ইচ্ছা মতই কাজ হোক।

প্রহরী দুটিকে বিশ্রামের জন্য শিবিরে পাঠিয়ে দিলেন সেনাপতি। ইকো ছুটে গেল নিজের শিবিরে।

কিছুক্ষণের ভেতরেই সে ফিরে এল দুখণ্ড রঙীন রজ্জু নিয়ে, কোমর থেকে ঝুলছে চামড়ার মশক।

সেনাপতি মৃদু প্রতিবাদের ছলে বললেন, কি করতে যাচ্ছ ইকো?

কন্যা আবদারের সুরে বলল, তুমি একটু তফাতে গিয়ে দাঁড়াও না বাবা, আমি সম্রাটের কথামত কাজ হাসিল করে যাব।

আদরিণী মাতৃহারা মেয়ের সকল আব্দার বাধ্য ছেলের মত রক্ষা করেন সেনাপতি সেলিউকাস। তিনি মেয়ের আবদার রক্ষা করতে হটে গেলেন কিছু দূরে।

ইকো একটি ছোরা কোমর থেকে টেনে বের করে চন্দ্রগুপ্তের হাতে বাঁধা দড়িটাকে কেটে ফেলল। তারপর দুটি রঙীন রজ্জু তার একটি হাত ও একটি পায়ে বেঁধে দিয়ে বলল, এবার তুমি এই মশকটাকে বায়ুপূর্ণ করে মোটা রজ্জুখানা দিয়ে বুকের সঙ্গে বেঁধে নাও।

মন্ত্রচালিতের মত চন্দ্রগুপ্ত তাই করল। মশকটা বাঁধার সময় তাকে সাহায্য করল ইকো।

এবার তোমার ভাগ্য তোমার নিজের হাতে। সাহসী যুবক, মশকে দেহের ভার রেখে পার হয়ে যাও তরঙ্গসংকুল নদী।

চন্দ্রগুপ্ত বলল, যদি বেঁচে থাকি, এ জীবনে তোমার কথা ভুলব না।

আমি তোমার গুণমুগ্ধ বন্ধু। তোমার অসীম শক্তি আর দুর্জয় সাহসের পূজারী। তোমার স্বপ্ন একদিন সার্থক হবে। তুমি অবশ্যই সম্রাট হবে অখণ্ড ভারতের।

সেদিন সবার আগে সকৃতজ্ঞ চিত্তে তোমাকে স্মরণ করব, ইকো।

আমি তোমাকে ভালবাসি, চন্দ্রগুপ্ত।

তোমার ভালবাসাই আমার নদী পার হওয়ার পাথেয়। শুধু তাই নয়, আমার আগামী সংগ্রামভরা দিনগুলির প্রেরণা। বিদায় বন্ধু, বিদায়।

সিন্ধুর বেগবান স্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়ল চন্দ্রগুপ্ত। আর সেই অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় নতজানু হয়ে চন্দ্রগুপ্তের নিরাপদ যাত্রার জন্য জিউসের কাছে প্রার্থনা জানাতে লাগল ইকো।

চার

বিপুল সৈন্যবাহিনী নিয়ে অশ্বারোহণে এগিয়ে চলেছেন চন্দ্রগুপ্ত মগধের অভিমুখে। সূর্যালোকে ঝলসে উঠছে লক্ষ লক্ষ উন্মুক্ত আয়ুধ। রথারূঢ় হয়ে চলেছেন চন্দ্রগুপ্তের গুরু ও পরামর্শদাতা মহা কূটনীতিবিদ পণ্ডিত চাণক্য।

প্রথমবার অতি স্বল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে গুরু শিষ্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন মগধের ওপর। সে সময় তাদের মূলধন ছিল অত্যাচারী নন্দবংশের ওপর প্রজাদের গভীর ঘৃণা। কিন্তু নিরস্ত্র প্রজাদের কেবলমাত্র উৎসাহ সম্বল করে এতবড় সৈন্য-সমৃদ্ধ সাম্রাজ্যের অবসান ঘটান সম্ভব ছিল না। তাই গুরুশিষ্যকে ফিরে আসতে হয়েছিল বিফল অভিযানের বেদনা বহন করে। কিন্তু আলোকে উদ্ভাসিত সূর্যোদয় তাঁরা দেখতে পেলেন অচিরে।

মাত্র উনিশটি মাস ভারতে অবস্থান করেছিলেন আলেকজান্ডার। তিনি সিন্ধু পার হয়ে এসে পঞ্চনদের মধ্য দিয়ে তাঁর আক্রমণের জাল ছড়িয়েছিলেন বিতস্তা, চেনাব, ইরাবতী, বিপাশা পর্যন্ত। আগেই বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করেছিলেন তক্ষশিলার রাজা অম্ভি। তারপর আপনরাজ্য বিতস্তার কুলে রাজা পুরু সৈন্যবাহিনী নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন ম্যাসিডন অধিপতি আলেকজান্ডারের জন্য।

কৌশলী গ্রীকবীর পুরুর অগোচরে পার হয়ে গেলেন বিতস্তা। গ্রীক সৈন্যের মূল শিবিরের দিকেই নিবদ্ধ ছিল পুরুর দৃষ্টি। তিনি ভাবতেই পারেননি তাঁর অগোচরের নিঃশব্দে বিপাশা পার হয়ে যাবে একটি দল। পেছন থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে একটি আক্রমণ আসবে তা বুঝতে পারেননি বিতস্তার বীর নৃপতি পুরু।

তিনি বাধ্য হয়ে সৈন্যদের পশ্চাদ দিকে আক্রমণের আদেশ দিলেন। সেই সুযোগে বিতস্তা পার হয়ে গেল আলেকজান্ডারের মূল বাহিনী।

শুরু হয়ে গেল ভয়ঙ্কর যুদ্ধ। ঘোরতর যুদ্ধে আহত হলেন পুরু। কিন্তু তিনি অসীম বীরত্বে যুদ্ধ চালিয়ে

যেতে লাগলেন।

অবশেষে রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত পুরুকে বন্দি অবস্থায় নিয়ে আসা হল বিজয়ী সম্রাট আলেকজান্ডারের কাছে।

সম্রাট প্রশ্ন করলেন, এখন তুমি আমার কাছে কিরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা কর বন্দি?

রাজার কাছে রাজার মত ব্যবহার।

পুরুর দৃপ্ত উত্তরে আলেকজান্ডার এমনি অভিভূত হলেন যে তিনি পুরুকে সসম্মানে তাঁর সিংহাসনে পুনঃপ্রাতিষ্ঠিত করলেন। কেবল তাই নয়, বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ দান করলেন আরও কয়েকটি অঞ্চল।

আলেকজান্ডার শিবি, মল্ল, ক্ষুদ্রক, মৌসিকেনস প্রভৃতি রাজ্যকে আপন বিশাল সাম্রাজ্যের অধীনে নিয়ে এলেন।

এতে আলেকজান্ডারের দেশে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তের পক্ষে সহজ হয়ে গেল একই সঙ্গে এতগুলি রাজ্যকে অধিকার করে নেওয়া।

পাঞ্জাব বিজয় সমাপ্ত করে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত আর পাঞ্জাব থেকে বহু সৈন্য সংগ্রহ করলেন তিনি। সেই সঙ্গে বিপুল অর্থের বিনিময়ে সংগৃহীত হল, বেশ কিছু সুদক্ষ গ্রীক সৈন্য।

এবার সুসংহত বিশাল এক বাহিনী সজ্জিত করে চন্দ্রগুপ্ত মহাবুদ্ধিধর বিচক্ষণ গুরুকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চললেন মগধের রাজধানী পাটলিপুত্র অভিমুখে।

পথে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজারা চন্দ্রগুপ্তের বশ্যতা স্বীকার করলেন। তাঁদের রাজকোষ থেকে যে অর্থ বিজয়ীর প্রাপ্য হিসেবে সংগৃহীত হল, তিনি গুরুর পরামর্শে তা দান করে দিলেন সেই সব রাজ্যের প্রজাদের কল্যাণে।

পথে পথে জনতার জয়ধ্বনিতে মুখরিত হল দিক দেশ।

রাজারা চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে দিলেন বেশ কিছু সশস্ত্র সৈন্য।

উৎসমুখ থেকে প্রবাহিত নদী মোহনার অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার সময়ে পথে পথে যেমন অজস্র ক্ষুদ্র, বৃহৎ জলধারার দ্বারা পুষ্ট হয়ে ওঠে, ঠিক তেমনি চন্দ্রগুপ্তের চতুরঙ্গ সৈন্যবাহিনী মগধে প্রবেশের পূর্বে পরিপুষ্ট হয়ে বিপুল বিস্তার লাভ করল।

লক্ষ লক্ষ পদাতিক সৈন্যের পদভারে, হস্তীর বৃংহণে, অশ্বের হ্রেষায়, রথচক্রের ঘর্ঘরধ্বনিতে কেঁপে উঠল মগধের রাজধানী পাটলিপুত্র মহানগরী।

এইরূপ বিপুল উত্তেজনা, দুশ্চিন্তা আর উন্মাদনার ভেতরেও চন্দ্রগুপ্ত দেখা করে আশীর্বাদ নিয়ে এলেন ঋষি সৌম্য, তাঁর গোপালক পিতামাতা আর ব্যাধগুরু হণ্ডার।

শুরু হল ঘোরতর যুদ্ধ। এবার আর অকিঞ্চিৎকর সৈন্যবাহিনী নিয়ে আক্রমণ নয়, সম্পূর্ণ প্রস্তুত এক শৃঙ্খলাবদ্ধ চতুরঙ্গ বাহিনী।

নন্দ বংশের অত্যাচারে বিক্ষুব্ধ প্রজারা এতদিন কামনা করে এসেছে এই রাজবংশের অবসানের। চন্দ্রগুপ্তের আগমনে তাই তাদের উল্লাস হয়ে উঠেছে সীমাহীন। বিশিষ্ট বাঞ্ছিত অতিথিকে বরণ করার জন্য তারা উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে।

রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর ভেঙে পড়ল প্রতিরোধ। সমুদ্রের প্রবল ঘূর্ণিঝড়তাড়িত তরঙ্গ যেভাবে আছড়ে পড়ে ভেঙে দেয় তীরের সমস্ত প্রতিরোধ, চন্দ্রগুপ্তের সৈন্যবাহিনীর আক্রমণে তেমনি বিধ্বস্ত হয়ে গেল বিশাল নন্দ-বাহিনী।

প্রাসাদ ছেড়ে, নগরী ছেড়ে পালাবার চেষ্টা করতে লাগল রাজপুরীর লোকেরা। নগরদ্বারে তাদের আটকে দিল জনতা। পণ্ডিত চাণক্য দাঁড়িয়ে থেকে নারী, শিশু ও রাজকর্মচারীদের ছেড়ে দেবার আদেশ দিলেন। তাঁর দৃষ্টি সন্ধান করতে লাগল উদ্ধত, দুর্বিনীত সেই কটি রাজপরিবারের যুবককে, যারা তাঁকে টেনে তুলে দিয়েছিল ভোজের আসন থেকে, টেনে খুলে দিয়েছিল তাঁর শিখা।

ছদ্মবেশে পালাতে গিয়ে ধরা পড়ল কয়েকজন। তাদের ছদ্ম বেশ বাস সরিয়ে প্রসাধন মুছে দিতেই

বেরিয়ে পড়ল আসল মানুষ।

জনতা হৈ হৈ করে উঠল। নন্দবংশের ঝাড় এগুলো। এদেরই অত্যাচারে অতিষ্ঠ প্রজারা। কত সৎ নিরীহ মানুষ নিজেদের বুদ্ধি বিচার অনুযায়ী চলতে গিয়ে এদের বিরাগ ভাজন হয়েছে। শেষে। প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হয়েছে এই নরদেহধারী রাক্ষসগুলোর হাতে।

পণ্ডিত চাণক্য এদের ভেতর অন্তত পাঁচজনকে চিনতে পারলেন। এরাই তাঁকে ক্ষুধার্ত জেনেও টেনে তুলে দিয়েছিল মধ্যাহ্নভোজের আসন থেকে। সেই অপমানের জ্বালায় তিনি শিখা খুলে রেখেছেন আজও। সেদিন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, এ বংশের ধ্বংস সাধন না করে তিনি শিখ'-বন্ধন করবেন না। আজ সেই মহাসুযোগ উপস্থিত হয়েছে তাঁর কাছে।

চাণক্য এক প্রতিহারীকে ইঙ্গিতে কাছে ডাকলেন। সে দ্রুত এসে পণ্ডিত চাণক্যকে অভিবাদন জানিয়ে দাঁড়াল।

চাণক্য ধীর গম্ভীর গলায় বললেন, ঐ ছদ্মবেশধারী মানুষগুলোকে উত্তমরূপে স্নান করিয়ে নতুন পোশাকে সজ্জিত কর। তারপর শিবিরের ভোজনাগারে উত্তম আসনে বসিয়ে ওদের চর্বচূষ্য ভোজন করাও। ভোজনান্তে নিয়ে এস আমার কাছে।

ওদের এই সমাদর দেখে মনে মনে ক্ষুব্ধ হলেও পণ্ডিত চাণক্যের নির্দেশের বিরুদ্ধে জনতা কিছুই বলতে পারল না।

বেশ কিছু সময় পরে পরিচ্ছন্ন পোশাকে ভূষিত হয়ে আহারান্তে এসে দাঁড়াল রাজ পরিবারের সেই মানুষগুলো।

জনতার দিকে তাকিয়ে চাণক্য বললেন, আহারের পর কিসের প্রয়োজন হয় আপনারা বলুন?

একজন বলল, মুখশুদ্ধির।

অন্যজন বলল, তাম্রকূট সেবনের।

আর একজন বলল, বিশ্রামের।

চতুর্থজন বলল, দিবানিদ্রার।

চাণক্য বললেন, এদের নিদ্রারই ব্যবস্থা করা যাক্, স্বপ্নহীন নিদ্রার। যে নিদ্রা যুদ্ধের তূর্য নিনাদেও ভাঙবে না।

নন্দসাম্রাজ্যের সৈন্যেরা দলে দলে চন্দ্রগুপ্তের নিকটে এসে আত্মসমর্পণ করতে লাগল।

চন্দ্রগুপ্ত তাদের বললেন, তোমরা যোদ্ধা, ফেলে দেওয়া অস্ত্র তুলে নাও। আজ থেকে তোমরা সকলেই আমার সৈন্য দলভুক্ত হলে।

নন্দরাজপুরীর পৃথক একটি মহল আছে, সেই মহলটি পরিখা পরিবেষ্টিত। সেখানে বিশাল বিশাল বৃক্ষ, পুষ্পিত লতাগুল্ম, অপূর্ব শোভা ধারণ করেছে। তারই মধ্যে অতি মনোরম স্বপ্নময় একটি প্রাসাদ। সেই প্রাসাদে আত্মগোপন করে রয়েছেন মহারাজ ধননন্দ। পাছে শত্রুপক্ষের শ্যেনদৃষ্টিতে পড়ে যান তাই একটিও প্রহরী রাখেননি সেই রাজভবনে।

সুসজ্জিত একটি রাজতরণী পরিখাটি পারাপার করে। মহল ছেড়ে শেষ ভৃত্যটি চলে যাবার সময়ে মহারাজ তাকে নৌকাটি মূল প্রাসাদের দিকে বেঁধে রাখতে বলেছিলেন। এর একটি উদ্দেশ্য ছিল। ওপারে যে নৌকাটি দেখবে তারই মনে হবে, জলমহলটিতে কেউ নেই। শেষ মানুষটিও নৌকোযোগে চলে এসেছে মূল প্রাসাদ-নগরীর দিকে।

যুদ্ধের প্রায় শেষ পর্বে ফল সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হওয়ার পর মহারাজ যখন দেখলেন, শত্রুরা পলায়নের সব পথ রুদ্ধ করে দিচ্ছে তখন তিনি এই নির্জন মহলেই আত্মগোপন করে রইলেন। রাতে মশাল তো দূরের কথা, একটি দীপের ক্ষীণ রশ্মিও কারোর দৃষ্টিগোচর হল না।

মহারাজের সেবা, পরিচর্যার জন্য তাঁর কাছে ছিল এক নারী। রানীর মর্যাদা সে না পেলেও দাসীর

দলভুক্ত ছিল না কোনদিন। রাজা তাকে ভালবাসতেন। এই বিশেষ মহলটিতে ঐ নারীকে অনেক মর্যাদা দিয়ে রেখেছিলেন তিনি।

যুদ্ধ যখন ক্রমাগত মহানগরীর দিকে এগিয়ে আসছিল তখন নিরাপত্তার কথা ভেবে মহারাজ তাঁর দুই রানীকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন দাক্ষিণাত্যের কোনও নিরাপদ আশ্রয়ে।

পথে রানীদের শিবিকাকে ঘিরে ধরেছিল চন্দ্রগুপ্তের সৈনিকেরা। পাছে তাঁদের পরিচয় কেউ জানতে পাবে সেজন্যে শিবিকার দক্ষ, বিশ্বস্ত কয়েকজন বাহক ও একজন পথ-প্রদর্শক ছাড়া অন্য কোন অস্ত্রধারী রক্ষী সঙ্গে ছিল না।

কিন্তু চাণক্য-নিযুক্ত গুপ্তচরেরা দুটি শিবিকার গঠন-পারিপাট্য লক্ষ্য করে যাত্রীদের সন্দেহ করল। গুপ্তচরদের ইঙ্গিতে সৈনিকেরা শিবিকা আটকাল। তারা দুটো শিবিকাকেই নিয়ে চলল অদূরে চন্দ্রগুপ্তের শিবিরে।

শিবিরের মাঝখানে একটি পর্দা টাঙান হল। একদিকে চন্দ্রগুপ্ত, অন্যদিকে দুই রমণী।

চন্দ্রগুপ্ত প্রশ্ন করলেন, নির্ভয়ে বলুন আপনারা কে ? কি আপনাদের পরিচয়? সত্য বললে আপনাদের যথাস্থানে যেতে দেওয়া হবে।

একজন সুস্পষ্ট কণ্ঠে উত্তর দিলেন, আমরা মহারাজ ধননন্দের দুই রানী। যুদ্ধের বিভীষিকার ভেতর মহারাজ আমাদের রাখতে চান না, তাই দাক্ষিণাত্যের নিরাপদ আশ্রয়ে চলেছি।

চন্দ্রগুপ্ত বললেন, আপনাদের দূরে পাঠিয়ে মহারাজ কোথায় আত্মগোপন করলেন?

অন্য এক রানী বললেন, আপনি কি আশা করেন কোন ভারতীয় সতী নারী আপন জীবনরক্ষার বিনিময়ে তার স্বামীর বিপদ ডেকে আনবে?

চন্দ্রগুপ্ত অভিভূত হয়ে বললেন, আমার আর কোন প্রশ্ন নেই, আপনারা নিশ্চিন্তে গন্তব্যস্থলে যেতে পারেন। আমার বিশ্বস্ত কিছু সৈন্য সম্মুখের দুর্গম অরণ্য অঞ্চলটা পার করে দিয়ে আসবে। আপনারা অনুমতি করলে আপনাদের সেবায় সামান্য ব্যবস্থা আমি করে দেব।

একজন বর্ষীয়সী রানী বললেন, বাবা, তুমি আমার পুত্রতুল্য, তোমার মহত্বের কথা আমি কোনদিনও ভুলব না। তুমি জননীর সেবার জন্য যা কিছু দেবে তাই আমরা সাগ্রহে গ্রহণ করব। একদিকে স্বামী, অন্যদিকে পুত্রতুল্য শত্রু, আমরা উভয়সঙ্কটের মধ্যে রইলাম।

ব্যাধ দলপতি হণ্ডার পৌত্র ষণ্ডার দেহে অসম্ভব শক্তি থাকলে কি হবে, তার মনটা ছিল জলে ভেজা মাটির মত নরম আর কোমল। সে তীর ধনুক চালিয়ে অথবা জাল পেতে পশুপক্ষী শিকার করতে চায় না। সে ওই পশুপক্ষীদের খুবই ভালবাসে। তারাও বোঝে ষণ্ডার হৃদয়ের কথা।

ভোরবেলা ষণ্ডা বনের ভেতর গাছতলায় গিয়ে বসে। তাকে দেখলেই উড়ে আসে পাখিরা। মাথায়, কাঁধে বসে খাবার চায়। তার চারদিকে ঘুরে ঘুরে নানা রকম ডাক শোনায়।

ষণ্ডা মুঠি ভরে ভরে দানা ছড়িয়ে দেয় চারদিকে। পাখিগুলো ঠোঁট ঠুকে ঠুকে দানা খুঁটে খায়। খরগোস আর কাঠবেড়ালি এসে ভিড় জমায়। তাদের জন্য ষণ্ডা গাছগাছালি টুঁড়ে ফলপাকড় পেড়ে আনে। তারা সামনের দুটো পা দিয়ে ফল আঁকড়ে ধরে কুটুর কুটুর কামড়ে কামড়ে খায়।

দুটো পাখিকে কথা বলা শিখিয়েছে ষণ্ডা। একটি টিয়া, অন্যটি ময়না। ওরা আবার উত্তর প্রত্যুত্তর দিয়ে কথা বলে।

টিয়া যদি বলে, 'কেমন আছ ময়না ভাই?'

ময়না অমনি উত্তর দেয়, 'কি করে ভাল থাকি বল?'

'কেন কেন?'

'গাছে যে ফল পাকড় নাই।'

পর পর সাজিয়ে কথা বলা শেখাতে অনেক মেহনত করতে হয়েছে ষণ্ডাকে। ওরা দুটি ষণ্ডার পোষা

পাখি। কত লোকে ওদের কথা শুনতে ভিড় জমায়। সবাই কিছু না কিছু ফলমূল, খাবারদাবার আনে পাখি দুটোর জন্য।

সেই পাখির একটা পালিয়েছে বেইমানি করে। সেটা ময়না। তাই বন্ধুর অদর্শনে টিয়ার মুখে আর কথা যোগায় না।

ষণ্ডা পাখির খোঁজে দুনিয়া টুঁড়ে বেড়াচ্ছে।

হঠাৎ একদিন ঘুরতে ঘুরতে মহারাজের জলমহলের ভেতর একটি গাছের ডালে সে তার ময়নাকে দেখতে পেল। অমনি পাগলের মত গভীর পরিখা সাঁতরে সে উঠল গি'য় জলমহলে।

ষণ্ডা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে শিস্ দিয়ে ডাক দিল তার ময়নাকে।

এবার আর ময়না ষণ্ডাকে ছেড়ে উড়ে পালাল না। সে নীচে নেমে এসে বসে পড়ল ষণ্ডার কাঁধে।

ষণ্ডা পাখিটাকে নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে দেখতে পেল ছোট্ট মনোরম একটি প্রাসাদ। এই জলমহলের প্রাসাদটিকে সে আগে কখনও দেখেনি। তাই কৌতূহল পরবশ সে প্রাসাদের ভেতর উঁকি দিয়ে দেখতে লাগল। দরজা জানালা সব হাট করে খোলা। সামনের ঘরগুলোতে নানান আসবাবপত্র উল্টে পাল্টে গড়াগড়ি খাচ্ছে। বাইরে থেকে মনে হচ্ছে, একটা পরিত্যক্ত বাড়ি। সবাই চলে গেছে বাড়ি ছেড়ে।

ষণ্ডা অত্যন্ত সৎ স্বভাবের ছেলে। সে একেবারে নির্লোভ, তাই ঘরের ভেতর ঢুকে কোনকিছু কুড়িয়ে নিল না।

হঠাৎ তার মনে হল, কারা যেন চুপি চুপি কথা বলছে একটা ঘরের ভেতর। সে বাইরে থেকে একবার উঁকি দিল।

এ কাকে দেখছে সে! এ যে স্বয়ং মহারাজ!

একজন মহিলার সঙ্গে তিনি কথা বলছিলেন। সেখান থেকে পায়ে পায়ে সে সরে এল পরিখার ধারে। পাখিটাকে মাথায় বসিয়ে পর হয়ে এল পরিখা।

কথাটা সহজ সরল মনে সে বলল তার বাড়িতে। অমনি হণ্ডা জেনে গেল ধননন্দের আত্মগোপনের জায়গাটা। সে ছুটে চলল চন্দ্রগুপ্তের কাছে।

ধননন্দ যে মূল প্রাসাদে নেই সেটা জেনে গিয়েছিলেন চন্দ্রগুপ্ত। তারপর থেকে অনেক সন্ধান চলেছে মহারাজের কিন্তু কোনভাবেই তাঁর সংবাদ কেউ দিতে পারছিল না। জলমহলেও পণ্ডিত চাণক্যের গুপ্তচর গিয়ে খোলা দরজা, আসবাবপত্রের গড়াগড়ি আর শুকনো পাতার ওড়াউড়ি দেখে ফিরে এসেছে। কিন্তু এবার হণ্ডার মুখে চন্দ্রগুপ্ত পেয়ে গেলেন সঠিক খবর। অমনি তিনি কজন বিশ্বস্ত দেহরক্ষীকে নিয়ে দিনান্তবেলায় ছুটে গেলেন জলমহলে।

অসি উন্মুক্ত করে তিনি প্রবেশ করলেন প্রাসাদে। পাপকে বিনাশ করতে হবে সমূলে।

কক্ষের ভেতর দীপ জ্বাললে, যদি তার সামান্য রশ্মিও বাইরে গিয়ে পড়ে তাহলে মুহূর্তে প্রকাশিত হবে সমস্ত গোপনতা। তাই মহারাজ ধননন্দ পূবের গবাক্ষপথে তাকিয়েছিলেন অরণ্য শীর্ষে উদিত চন্দ্রের দিকে। কোমল রজত কিরণে তাঁর সমস্ত অবয়ব স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছিল।

প্রাসাদে প্রবেশ করে একটি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে চন্দ্রগুপ্ত চন্দ্রালোকে দেখলেন, মহারাজ ধননন্দকে।

দেহরক্ষীর হাত থেকে একখানা তলোয়ার ইঙ্গিতে চেয়ে নিয়ে নিজের তলোয়ারখানা ছুঁড়ে দিলেন ধননন্দের দিকে। পাথরের মেঝেতে ভয়ঙ্কর একটা ধাতব ঝঙ্কার উঠতেই চমকে ফিরে দাঁড়ালেন মহারাজ ধননন্দ।

তলোয়ার তুলে নিন, অরক্ষিত মানুষকে কোনদিন অস্ত্রাঘাত করে না এ যোদ্ধা। বাইরে বেরিয়ে এসে সংগ্রাম করুন। আপনি বিজয়ী হলে ফিরে পাবেন আপনার সাম্রাজ্য।

বিদ্যুতের শিহরণ খেলে গেল মহারাজ ধননন্দের দেহে। তিনি গৃহতল থেকে অস্ত্র কুড়িয়ে নিলেন। মুহূর্তে বুঝে নিলেন, সমন সম্মুখে দাঁড়িয়ে। তাঁর একহাতে মৃত্যু, অন্যহাতে রাজলক্ষ্মী।

আঘাত হানবার জন্য অস্ত্র তুলেছিলেন মহারাজ কিন্তু আলো অন্ধকারের আড়ালে দাঁড়ান যোদ্ধা

চীৎকার করে উঠলেন, এখানে নয়, বাইরে খোলা আকাশের নীচে, সেখানে সারা আকাশের নক্ষত্র থাকবে আমাদের জয় পরাজয়ের সাক্ষী।

চন্দ্রগুপ্তের ইঙ্গিতে তাঁর দেহরক্ষীরা তুলে ধরল জ্বলন্ত মশাল। শুরু হয়ে গেল অসি-যুদ্ধ।

একজন ফিরে পেতে চান তাঁর হৃত সিংহাসন, অন্যজন চান দুষ্কৃতকারীর বিনাশ।

অস্ত্রবিদ্যায় সুনিপুণ চন্দ্রগুপ্ত বিস্মিত হয়ে গেলেন ধননন্দের আত্মরক্ষামূলক অস্ত্রচালনার কৌশল দেখে। তিনি যতবারই সংহারমূর্তি ধরে আঘাত করতে যান, ততবারই সঠিক স্থানে অস্ত্র ঠেকিয়ে আত্মরক্ষা করেন ধননন্দ।

অবশেষে জয় হল যৌবনের। প্রৌঢ়ত্বের শেষসীমায় উপনীত ধননন্দ অধিকসময় পারলেন না নিজেকে রক্ষা করতে। নিঃশেষিত হল তাঁর শক্তির সর্বশেষ সঞ্চয়। চন্দ্রগুপ্তের প্রচণ্ড অস্ত্রপ্রহারে খসে পড়ল ধননন্দের করধৃত তরবারি। তিনি বিবশ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। তরবারি তুলে নেবার মত শক্তিটুকুও রইল না তাঁর শরীরে।

আঘাতপ্রাপ্ত সর্প আর শত্রুর শেষ রাখতে নেই, এই নীতিবাক্য স্মরণ করে শত্রুকে বিনাশ করবার জন্য চন্দ্রগুপ্ত তুলে ধরলেন শাণিত তরবারি।

ঠিক সেই মুহূর্তে আর্তনাদের মত একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার ভেসে এল প্রাসাদের বাতায়নপথে, চন্দ্রগুপ্ত ক্রোধ সংবরণ কর। তোমার জননীর অনুরোধ রক্ষা কর বীর পুত্র আমার। মহারাজকে হত্যা কোর না।

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন চন্দ্রগুপ্ত। কে এই নারী, যিনি তাঁকে পুত্র সম্বোধন করে রাজাকে হত্যা করতে নিষেধ করলেন!

আপনি কে ? শত্রুকে সংহারের সময় আপনি আমাকে বারণই বা করছেন কেন?

প্রাসাদ থেকে উত্তর এল, সব কথা বলব পুত্র, তুমি প্রাসাদের অভ্যন্তরে এস।

নারীর সকাতর আহ্বানে বিচলিত হলেন চন্দ্রগুপ্ত। তিনি দেহরক্ষীদের রাজার প্রহরায় নিযুক্ত করে কক্ষের ভেতর প্রবেশ করলেন।

দীপ হস্তে অতি সম্ভ্রান্ত এক রমণী প্রত্যুদ্গমন করে চন্দ্রগুপ্তকে একটি সুসজ্জিত কক্ষের ভেতর নিয়ে গেলেন। তিনি গৃহকোণে দীপটি রেখে চন্দ্রগুপ্তকে উপযুক্ত আসনে বসতে অনুরোধ করলেন।

রমণীর আচরণে এমনি এক মমতার স্পর্শ ছিল যে চন্দ্রগুপ্ত তাঁর অনুরোধকে উপেক্ষা করতে পারলেন না। তিনি মুক্ত তরবারি কোষবদ্ধ করে রমণীর নির্দিষ্ট আসনটিতে উপবেশন করলেন।

রমণী স্নিগ্ধ স্বরে বললেন, তুমি তো বিজয়ী হয়েছ পুত্র তবে আর অকারণ রক্তপাত কেন?

মহারাজ ধননন্দ আমার পরমশত্রু তাই তাঁকে সরিয়ে দিতে চাই এ পৃথিবী থেকে। কখনও শেষ রাখতে নেই শত্রুর।

ধননন্দ এখন আর মহারাজ নয় পুত্র, নগরপ্রান্তে উপবিষ্ট ভিক্ষাজীবীরাও আজ তাঁর চেয়ে সুখী।

চন্দ্রগুপ্ত বললেন, জীবনে প্রজাদের ওপর তিনি যে পাপ করেছেন তার প্রায়শ্চিত্ত তো তাঁকে করে যেতে হবে মা।

রমণী বস্ত্রাঞ্চলে তাঁর চোখ দুটি আবৃত করলেন। পরক্ষণেই অশ্রুসংবরণ করে চোখ থেকে অঞ্চল সরিয়ে নিলেন।

আপনি চোখের জল ফেলছেন কেন?

তুমি যে আমাকে 'মা' বলে ডাকলে বাবা, তাই চোখে জল এল।

আমি যখন মহারাজ ধননন্দকে হত্যা করব বলে অস্ত্র তুলেছিলাম তখন আপনি আমার নাম ধরে ডেকেছিলেন, কিন্তু আমিই যে চন্দ্রগুপ্ত আপনি তা জানলেন কি করে?

তোমার গলায় বাঁধা কবচই তোমাকে চিনিয়ে দিয়েছে।

আশ্চর্য! আমার গলায় যে কবচটি আছে, তা যে চন্দ্রগুপ্তের, সেটি আপনার পক্ষে জানা কি করে সম্ভব হল?

আমিই তো তোমার কণ্ঠে ঐ কবচ পরিয়ে দিয়েছিলাম বাবা।

আপনি!

তোমার শিশুকালে আমিই একদিন তোমার কণ্ঠে ঐ আশ্চর্য ফলপ্রদ কবচটি পরিয়ে দিয়েছিলাম।

আমি আমার মায়ের মুখে শুনেছি, এটি এক সাধুপ্রদত্ত কবচ।

ঠিকই শুনেছ, আমি ভাবিনীকে তাই বলেছিলাম। আর যাকে তুমি আজ হত্যা করতে উদ্যত হয়েছ, এ কবচ তাঁরই কণ্ঠে ছিল।

আমার কাছে সবই বিস্ময়কর আর রহস্যময় বলে মনে হচ্ছে।

আমি যা বলছি সবই সত্য বাবা। আজ সমস্ত কথাই তোমাকে খুলে বলতে চাই। সত্য যতই নির্মম হোক তার আবরণ সরিয়ে আমি তাকে প্রকাশ করে যাব নিজের সন্তানের কাছে।

বিহ্বল দৃষ্টিতে রমণীর দিকে তাকিয়ে চন্দ্রগুপ্ত বলল, আমি বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছি আপনার কথা শুনে। কে আমার মা?

তুমি এই দুর্ভাগা রমণীর গর্ভজাত সন্তান বাবা। গোপালক ভৃগু আর ভাবিনীর আশ্রয়ে আমি তোমাকে এতকাল ফেলে রেখে এসেছি। তাদের প্রতিজ্ঞা করিয়ে নি যাতে তারা তোমার সত্য পরিচয়টি গোপন রেখে তাদের আপন সন্তান বলে তোমার পরিচয় দেয়। তারা সন্তানহীন ছিল তাই তোমাকে আপন সন্তান ভেবে বুকে তুলে মানুষ করেছে। তারা ছাড়া একমাত্র ঋষি সৌম্যই অবগত আছেন এই সত্যটি।

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে চন্দ্রগুপ্ত বলল, তুমি আমার মা, আমার গর্ভধারিণী জননী! তাহলে আমার পিতৃপরিচয় কি মা! আমার মা হয়ে তুমি কেনই বা পড়ে আছ এই অসম্মানিত জায়গায়।

মুরা তাঁর স্বামীর অত্যাচার, নদীতীরের অরণ্য শিবিরে অসহায় অবস্থায় ধননন্দের সঙ্গে রাত্রিযাপন, প্রভাতে পিতৃগৃহে যাত্রার কালে ধননন্দকর্তৃক ঋষিপ্রদত্ত অভয় ও মহাফলদায়ী কবচটি দান, পিতৃগৃহে সন্তানের জন্ম, শেষে স্বামী ও পিতার গৃহে সন্তানসহ আশ্রয় লাভে অসমর্থ হয়ে পাটলিপুত্রে আগমন —

জীবনের সমস্ত আলো অন্ধকারের কাহিনী ভারত-সম্রাট, বীরপুত্র চন্দ্রগুপ্তের কাছে অকপটে বলে গেলেন মুরা। শেষে বললেন, তোমার পিতার সত্য পরিচয় আমারও জানা নেই বৎস।

সহসা চন্দ্রগুপ্ত উচ্ছ্বসিত আবেগে বলে উঠলেন, যে জননী সমস্ত সত্যকে এমন অকপটে প্রকাশ করতে পারেন, তাঁর গর্ভে জন্মলাভ করে আমি গৌরবান্বিত।

সামান্যসময় নীরব থেকে আবার বললেন, মা, কেবল একটিমাত্র শর্তে আমি মুক্তি দিতে পারি মহারাজ ধননন্দকে।

মুরা নির্নিমেষে তাকিয়ে রইলেন তাঁর বিজয়ী পুত্রের মুখের দিকে।

তুমি এখন থেকে থাকবে তোমার স্নেহবঞ্চিত পুত্রের কাছে। আর মহারাজকে আমি উপযুক্ত দেহরক্ষীসহ পাঠিয়ে দেব দাক্ষিণাত্যে, যেখানে তাঁর দুই রানী আশ্রয়লাভ করেছেন পরম নিশ্চিন্তে।

মুরা বললেন, তোমার ইচ্ছাই জয়যুক্ত হোক পুত্র।

চন্দ্রগুপ্ত বললেন, আজ থেকে শুধু আমার জননী মুরার নামেই আমার বংশ পরিচিত হবে মৌর্যবংশ নামে।

মুরা বললেন, ঋষি সৌম্য বহু পূর্বেই তোমার বংশ এবং সাম্রাজ্যের এই নাম হবে বলে ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন।

চন্দ্রগুপ্ত বললেন, তিনি আমার গুরুর গুরু, সত্যদ্রষ্টা ঋষি মা।

পাঁচ

বঙ্গদেশ থেকে সৌরাষ্ট্র, হিমাচল থেকে মহীশূর এক রাষ্ট্রভুক্ত করে নিলেন সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত। তিনি পূর্বেই মগধ আক্রমণ করে তাকে বিধ্বস্ত করেন। নন্দবংশের উচ্ছেদ সাধন করে তিনি পাটলিপুত্রকেই তাঁর রাজধানীরূপে নির্বাচন করেছিলেন। মনোরম উদ্যান ও পুষ্করিণীতে সুশোভিত করেছিলেন সমস্ত নগরী। সুদক্ষ কারিগরেরা কাষ্ঠ খোদাই করে নির্মাণ করে দিল অপূর্ব দৃষ্টিনন্দন রাজপ্রাসাদ। চন্দ্রগুপ্ত দারুশিল্পীদেরই কেবল উৎসাহ দিলেন না, বস্ত্র, গজদন্ত, প্রস্তর, স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধাতু শিল্পীদেরও তিনি বিশেষ উৎসাহ ও সহযোগিতা দান করলেন। অল্পসময়ের মধ্যেই পাটলিপুত্র তার পুরাতন পোশাক পরিত্যাগ করে উজ্জ্বল সুন্দর নব কলেবরে সজ্জিত হল। কাষ্ঠনির্মিত অতিসুদৃশ্য নৌবহর কেবলমাত্র জলযুদ্ধের জন্য নদী বা সমুদ্রে ভাসানো হল না, মৌর্য সাম্রাজ্যের অতি মূল্যবান শিল্প সামগ্রী নিয়ে সেগুলি যাত্রা করল দেশে বিদেশে।

পণ্ডিত চাণক্য নিযুক্ত হলেন সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের প্রধানমন্ত্রী ও পরামর্শদাতা। তিনি রচনা করলেন অর্থশাস্ত্র, যার ভেতর লেখা হল সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার এক সুপরিকল্পিত ও সুবিস্তৃত নির্দেশনামা। প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্বন্ধে এমন একখানি গ্রন্থ সত্যিই দুর্লভ।

চন্দ্রগুপ্ত গুরু চাণক্যকে বললেন, গুরুদেব, আপনার এই গ্রন্থের নির্দেশিত পথে চললে একজন অন্ধও চক্ষুষ্মানের মত সুশাসকের বিপুল খ্যাতি অর্জন করতে পারবে।

চাণক্য বললেন, এ গ্রন্থখানি তোমার কথা মনে রেখে রচিত হলেও ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রনায়করা রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে এ গ্রন্থের নির্দেশ অনুসরণ করলে উপকৃত হবে। তোমাকে একটি উপদেশ দি বৎস, সুস্থির শাণিত বুদ্ধি, সদাজাগ্রত পরিস্থিতি জ্ঞান, আর সতত সুযোগের সদ্ব্যবহার একজন রাষ্ট্রনায়ককে তার আকাঙ্ক্ষার শীর্ষে পৌঁছে দেবে।

আপনার অমূল্য উপদেশ স্মরণে রাখব গুরুদেব।

বিশাল ভারতের খণ্ডক্ষুদ্র রাজ্যগুলি এই প্রথম একই রাষ্ট্রের বাঁধনে বাঁধা পড়ে যাওয়ায় পরস্পরের মধ্যে সংঘাতের সম্ভাবনা আর রইল না। প্রায় সমগ্র ভারতের প্রজাসাধারণ একই রাজদৃষ্টির প্রসাদ পেল। একই কেন্দ্রীয় শাসন ও সহযোগিতার স্বাদ তারা পেতে লাগল। তারা যে অখণ্ড ভারতের অধিবাসী, এই বোধটুকু ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হতে লাগল তাদের চেতনায়।

এখন আর তারা নিজেদের গ্রাম কিংবা অঞ্চলটুকুর আলোচনা নিয়েই তৃপ্ত থাকে না, সমস্ত রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংবাদের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে।

একরাট সম্রাটরূপে চন্দ্রগুপ্ত ভারতকে একসূত্রে বেঁধে দেওয়ার ফলে ভারতের জনগণের মনে কেবল একতার বোধই জাগ্রত হল না, রাষ্ট্রের শুভাশুভের চিন্তাও তাদের মনের মধ্যে ঠাঁই পেতে লাগল।

আলেকজান্ডারের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পথে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অধিকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি পুনরায় স্বাধীনতা লাভের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিল। তাদের সঙঘবদ্ধ করে গ্রীকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণায় নেতৃত্ব দান করেছিলেন চন্দ্রগুপ্ত। যার ফলে পাঞ্জাব থেকে গ্রীকদের বিতাড়ন করে অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যের সঙ্গে সেই রাজ্যটিও চন্দ্রগুপ্ত নিজের অধিকারে এনেছিলেন।

প্রায় সমগ্র ভারতের শাসন কর্তৃত্ব নিয়ে চন্দ্রগুপ্ত যখন রাজচক্রবর্তীর মহিমায় বিরাজ করছেন তখনই একটি দুঃসংবাদ বয়ে আনল গুপ্তচর।

আলেকজান্ডারের অন্যতম কোনও এক সেনাপতি, ব্যাবিলনের অধীশ্বর, ভারতে গ্রীক রাজ্যগুলি পুনরুদ্ধারের জন্য ঝটিকার বেগে এগিয়ে আসছেন। তিনি ইতিমধ্যেই অতিক্রম করেছেন আফগানিস্থান, এখন ভারতের সিন্ধুতীরের দিকে তাঁর লক্ষ্য নিবদ্ধ।

গুরু চাণক্যের সঙ্গে পরামর্শে বসলেন চন্দ্রগুপ্ত।

চাণক্য বললেন, সর্বদিক থেকে সুরক্ষিত তোমার রাজ্য। এখন কাল বিলম্ব না করে নগর রক্ষার জন্য কিছু সৈন্য রেখে বাকি সমস্ত সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হও। যুদ্ধের কলাকৌশল তোমার অবিদিত নয়। এখুনি দ্রুতগামী অশ্বারোহীদের সিন্ধু-সীমান্তে পাঠিয়ে দাও। ওখানে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের তারা অভয় দিয়ে

বলুক, চতুরঙ্গ বাহিনী নিয়ে সম্রাট দ্রুত এগিয়ে আসছেন। তোমরা কোনওমতেই শত্রুকে সিন্ধু পার হতে দিও না।

চন্দ্রগুপ্ত বললেন, আপনার পরামর্শ মতই কাজ হবে গুরুদেব। শত্রুপক্ষ নদী পার হয়ে মূল ভূখণ্ডে প্রবেশ করলেই দুর্বার হয়ে উঠবে, সুতরাং ওদের নদীতীরেই বাধা দিতে হবে প্রবল বিক্রমে। ওদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে আমরা সুযোগ সুবিধা বুঝে ওপারে যাবার চেষ্টা করব। সৈন্য শিবির থেকে বেশ কিছু দূরে দূরে কয়েকটি নৌ-সেতু নির্মান করে সমস্ত বাহিনীকে অক্ষত অবস্থায় চেষ্টা কবব ওপারে নিয়ে যাবার।

চাণক্য বললেন, মনে রাখবে, গ্রীকরা কেবলমাত্র যুদ্ধ বিশারদ নয়, অত্যন্ত কৌশলী। পুরুর দৃষ্টিকে কিভাবে নিজেদের সমর-সজ্জার দিকে আকৃষ্ট করে অন্য এক স্থানে বহু সৈন্যকে ঝিলম পার করে নিয়ে গিয়েছিল তা তোমার অজানা নয়।

আমি সবদিক দিয়ে সচেতন থাকব গুরুদেব।

ঋষি সৌম্য অতি বৃদ্ধ হয়ে পেড়েছেন। তিনি একেবারেই চলৎশক্তিহীন, কিন্তু শতাধিক বৎসরের এই প্রাজ্ঞ বস্তুজগৎ ও আধ্যাত্মিক জগৎ সম্বন্ধে এখনও সম্পূর্ণ সচেতন। তিনি আমাদের এই বিশাল কর্মযজ্ঞে প্রভূত অর্থ দান করে একে সার্থকভাবে সম্পন্ন করার সুযোগ এনে দিয়েছেন। তুমি যুদ্ধযাত্রার আগে তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা কর।

আমি এখুনি তাঁর আশ্রমে যাচ্ছি গুরুদেব।

ঋষি সৌম্য বসেছিলেন তাঁর পর্ণকুটিরের দ্বারে। গৃহপালিত পারাবতগুলি অঙ্গনে কলরব তুলছিল আর খুঁটে খুঁটে খাচ্ছিল শস্যকণা। মাঝে মাঝে মৃৎপাত্র থেকে এক এক মুষ্টি দানা তুলে নিয়ে তিনি প্রাঙ্গণে ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন।

চন্দ্রগুপ্ত আশ্রম সীমানার বাইরে রথ রেখে নগ্নপদে ঋষি সৌম্যের অঙ্গনে প্রবেশ করলেন। অপরিচিত আগন্তুককে প্রবেশ করতে দেখে শঙ্কিত পারাবতগুলি পাখায় শব্দ তুলে উড়ে গিয়ে বসল নিকটবর্তী একটি তরুশাখায়।

ঋষি সৌম্যের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল। তিনি বুঝলেন, নগরে নিত্যপ্রয়োজনীয় কিছু দ্রব্য আনতে যে আশ্রমিক গিয়েছিল, সে এ নয়। কারণ সে মানুষটি পারাবতদের বিশেষ পরিচিত। আগন্তুক নিঃসন্দেহে অপরিচিত। তিনি স্থির হয়ে বসে রইলেন। কিন্তু পদধ্বনি যত এগিয়ে আসতে লাগল তাঁর ইন্দ্রিয় ও সূক্ষ্ম অনুভূতি সজাগ হয়ে উঠল।

মুখে খুশীর উদ্ভাস দেখা গেল।

এস চন্দ্রগুপ্ত।

আভূমি লুণ্ঠিত হয়ে চন্দ্রগুপ্ত ঋষি সৌম্যের চরণ স্পর্শ করলেন।

বিজয়ী ভব।

মাথায় হাত রাখলেন ঋষি।

রোমাঞ্চিত হলেন চন্দ্রগুপ্ত।

আমি যুদ্ধযাত্রা করব তাই আপনার আশীর্বাদ নিতে এলাম।

চাইবার আগেই তো আশীর্বাদ পেয়েছ।

আপনার কৃপা।

আমার নয়, ঈশ্বরের। আমার মুখ দিয়ে তিনিই উচ্চারণ করিয়ে নিয়েছেন।

একটু সময় নীরব থেকে বললেন, কেমন যুদ্ধ, এতটুকু রক্তচিহ্ন নেই!

আপন মনে গভীর থেকে যেন কথাগুলো উচ্চারণ করলেন।

চন্দ্রগুপ্ত ঋষির কথার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারলেন না। এ বিষয়ে তিনি আর কোনও প্রশ্ন না করে নীরব রইলেন।

ঋষি সৌম্য এবার অন্য কথার অবতারণা করলেন, সম্রাটের ঐশ্বর্যের ভেতরে ঢুকে থেকেও যিনি

অন্তরে সন্ন্যাসী, তিনিই প্রকৃত সম্রাট।

চন্দ্রগুপ্ত বললেন, আমি এখনও নিজের ভেতর সেই সম্রাটকে খুঁজে পাইনি ঋষি।

অবশ্যই পাবে। আর সেইদিনই তুমি উপলব্ধি করবে সম্রাট নামের সার্থকতা।

আপনার প্রতিটি বাক্যই সত্যের স্পর্শে উদ্ভাসিত। আমি অন্তরে সেই সন্ন্যাসীর প্রতীক্ষায় থাকব।

দশ সহস্র রথারোহী, দশ সহস্র হস্তী, পঞ্চাশ সহস্র অশ্বারোহী ও পাঁচ লক্ষ পদাতিক সৈন্য নিয়ে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চললেন সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত। তিনি কারুকার্যখচিত রথে বসেছিলেন যোদ্ধার বেশে। হাতে ধরা ছিল ভল্ল, কোমরে ঝুলছিল নাতিদীর্ঘ কোষবদ্ধ তরবারি। বর্ম আর শিরস্ত্রাণে সুরক্ষিত ছিলেন সম্রাট।

পথিপার্শ্বে জনতা বিপুলভাবে উল্লাসধ্বনি করে তাদের সম্রাটকে উৎসাহিত ও অভিনন্দিত করছিল।

সম্রাটের দৃঢ়তাব্যঞ্জক মুখমণ্ডল, প্রদীপ্ত চক্ষু। তিনি বামহস্ত ঊর্ধ্বে উত্থিত করে জনতার উদ্দেশ্যে আন্দোলিত করছিলেন।

বিশাল সৈন্যবাহিনীর ঊর্ধ্বে উত্তোলিত যুদ্ধাস্ত্রে সূর্যালোক পড়ে ঝলসে উঠছিল।

নদনদী নগর জনপদ পার হয়ে চলল বিপুল বিশাল বাহিনী। পদভরে যেন শুরু হয়ে গিয়েছিল ভূকম্প। ধূলি মেঘে সমাচ্ছন্ন আকাশ। মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছিল হ্রেষাধ্বনি, মাঝে মাঝে বৃংহণ। কিন্তু কোথাও নেই এতটুকু বিশৃঙ্খলা, দ্রুত অথচ নিশ্চিত পদক্ষেপে সম্মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে চলেছিল বিশাল বাহিনী।

মাঝে মাঝে দ্রুত অশ্বারোহণে সিন্ধুতীর অথবা পাটলিপুত্রের দূতেরা দুইপ্রান্ত থেকে ছুটে আসছিল সংবাদ নিয়ে। সম্রাট তাদের যথোচিত নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছিলেন যথাস্থানে।

অবশেষে সিন্ধুতীরের রণভূমিতে এসে পৌঁছলেন সম্রাট। তাঁকে বেশ কিছু দূর থেকে প্রত্যুদগমন করে নিয়ে এলেন সিন্ধুর প্রাদেশিক শাসনকর্তা।

পূর্ব থেকেই প্রস্তুত সারি সারি শিবির। বিশাল কর্মকাণ্ডের সমস্ত ব্যবস্থাই সুশৃঙ্খলার সঙ্গে সম্পন্ন।

নদীর তীর ঘেঁষে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত সৈন্যদের শিবির। নীল বস্ত্র পরিহিতা সিন্ধু ঊর্মিমালার শঙ্খশুভ্র অলঙ্কার পরিধান করে নর্তকীর ভঙ্গিমায় এগিয়ে চলেছে নৃত্য করতে করতে।

ওপারে গ্রীক সৈন্যরা ইতিমধ্যেই শিবির স্থাপন করেছে। বিস্তীর্ণ নদীতীর জুড়ে চলেছে বিশাল কর্মকাণ্ড। জোড়ায় জোড়ায় তৈরি হচ্ছে নৌকা।

এপারে সংবাদ সংগ্রাহকেরা নদীতীর বরাবর অশ্বারোহণে গিয়ে ফিরে এসে জানাল, বহুদূর অবধি নৌকা নির্মাণের কাজ চলেছে।

চন্দ্রগুপ্ত সংবাদ শুনে অনুমান করলেন, সামনে প্রায় মধ্যরাত্রির দিকে যখন ম্লান চন্দ্রমা আকাশে দেখা দেবে তখন ওরা নদীর উৎস মুখের দিকে এগিয়ে গিয়ে নৌ-সেতু বেঁধে পারাপারের চেষ্টা করবে। কিন্তু নৌকা সোজাসুজি ভাসিয়ে দেবে স্রোতে। যেগুলি দেখে মনে হবে গ্রীক সৈন্যেরা নৌকায় চেপে পার হবার চেষ্টা করছে। যখন সেই দিকেই আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে আর কূলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সংহারের জন্য প্রস্তুত হব তখন নিঃশব্দে দূরের নৌ-সেতু দিয়ে পার হতে থাকবে মূল সৈন্যস্রোত।

রাজা পুরুর ক্ষেত্রে এ ধরনের ঘটনাই ঘটেছিল। চন্দ্রগুপ্ত ভাবলেন, গ্রীকরা ঐ কৌশল দ্বিতীয়বার অবলম্বনের সুযোগ পাবে না। তিনি নদীতীর বরাবর বহুদূর পর্যন্ত নৈশপ্রহরার ব্যবস্থা করলেন। সৈন্যরা স্থানে স্থানে বৃক্ষাদির অন্তরালে আত্মগোপন করে গ্রীকদের অভিসন্ধি জানার চেষ্টা করতে লাগল।

সিন্ধুতে ধীবর সম্প্রদায়ের লোকেরা মৎস্য শিকারের জন্য পালতোলা ছোট ছোট নৌকা ব্যবহার করে। জ্যোৎস্না রাতে কিংবা দিনে তারা যখন খুশি নৌকা ভাসায় এপার ওপার কোনও পারে যেতেই তাদের মানা নেই। তারা যুদ্ধ বোঝে না, জীবিকা বোঝে। তারা অধিকাংশই এপারে ধীবর পল্লীতে থাকে, ওপারে মাত্র দুচার জনের ডেরা।

তখন যুদ্ধের উত্তেজনা একেবারে তুঙ্গে উঠেছে। দু'পক্ষই পরস্পরের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তৈরি, ঠিক সেই সময় একটি ঘটনা ঘটল।

আবছা জ্যোৎস্নার অস্পষ্ট আলোয় রহস্য চরাচর, একটি জেলে নৌকা এসে ভিড়ল সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের শিবিরের সন্নিকটে।

ধীবর-নৌকার চলাচলের ওপর কোনও বিধিনিষেধ না থাকলেও সম্রাটের শিবিরের এত কাছাকাছি আসায় নৈশপ্রহরীরা সতর্ক হয়ে গেল।

একজন এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, কি মতলবে নৌকা ছেড়ে তীরে উঠলে হে ধীবর? ঠিক এ জায়গাটিতে তো তোমাদের ধীবর পল্লী নয়।

আমি মহামান্য সম্রাটের সঙ্গে দেখা করতে চাই, জরুরী বার্তা আছে। তাঁকে খবর দাও।

সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত দীর্ঘরাত্রি পর্যন্ত সমস্ত সাম্রাজ্যের শুভাশুভ নিয়ে চিন্তা করেন, তারপর শয্যার আশ্রয়ে যান। সে রাত্রে তিনি তখনও শয্যা গ্রহণ করেননি।

ধীবরের বার্তা নিয়ে প্রহরী প্রবেশ করল সম্রাটের শিবিরে। সম্রাট ধীবরের অভিপ্রায় শুনে তাকে সেই মুহূর্তে শিবিরে নিয়ে আসার আদেশ দিলেন।

ধীবর এসে সম্রাটকে যথোচিত অভিবাদন জানিয়ে অতি সংগোপনে তার বক্তব্য নিবেদন করল।

কিছু সময়ের ভেতরেই দেখা গেল, সম্রাট একখানি কৃষ্ণবর্ণের চাদরে দেহ আবৃত করে ধীবরটির সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন। যাত্রার সময় প্রহরীকে বলে গেলেন, আমার নিরাপত্তার কথা ভেবেও কেউ আমাকে অনুসরণ কোর না।

ধীবরের নৌকাতে উঠলেন সম্রাট। তাঁকে দেখে তখন মহিমময় সম্রাট বলে মনে হচ্ছিল না, মনে হচ্ছিল অতি সাধারণ এক ধীবর পল্লীর মানুষ।

বেশকিছু পথ গুণধরে নৌকাটাকে উজানের দিকে টেনে নিয়ে গেল ধীবর। তারপর একটি বিশেষ জায়গায় পৌঁছে নদী স্রোতে নৌকা ভাসিয়ে পাল তুলে দিয়ে নিজে হাল ধরে বসল। অনুকূল স্রোতে একটি পাখামেলা জলচর পাখির মতো ওপারে উড়ে চলে গেল নৌকাটি।

হালধারী নিশ্চিত নিশানায় নৌকাটিকে পৌঁছে দিয়ে নোঙর করে উঠে দাঁড়াল। এবার ছদ্মবেশী সম্রাটের হাত ধরে তাঁকে অতি সন্তর্পণে তীরে তুলল ধীবর। কিছুদূরে গ্রীক স্কন্ধাবারে দেখা যাচ্ছিল নৈশ মশালের শিখা।

পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে লাগল সেই রহস্যময়ী রমণী, যার আহ্বানে স্বয়ং ভারত সম্রাট বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে প্রবেশ করলেন ভয়ঙ্কর শত্রুর এলাকায়।

জ্যোৎস্নার নরম জলে স্নান সেরে শ্বেতবসনা সুন্দরী কাছাকাছি এসে সম্রাটকে অভিবাদন জানিয়ে দাঁড়াল।

মুখে স্মিত হাসি টেনে বলল, আমি একটা অসম্ভবকে সম্ভব করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সম্রাট যে আমার আহ্বানে সাড়া দেবেন, তা আমি স্বপ্নেও আশা করিনি।

চন্দ্রগুপ্ত বললেন, আমাকে কি এতখানি অকৃতজ্ঞ ভাবলে ইকো! একদিন এই প্রাণ যে নারী বাঁচিয়েছিল তার আহ্বানে কোনরকম সন্দেহ, শঙ্কা তো থাকবার কথা নয়। একে তুমি বলতে পার রক্ষকর্ত্রীর কাছে অকুণ্ঠ আত্মসমর্পণ।

এতখানি গৌরব দেবেন না সম্রাট। আজ আমার বাক্য বন্ধ হয়ে আসছে, আমি অভিভূত।

ইকো নতজানু হয়ে তার কৃতজ্ঞতা জানাল।

সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত তাঁর প্রাণদাত্রীকে দুহাত ধরে তুললেন।

চল, আমরা নদীতীর ধরে আরও খানিক উজানে উঠে গিয়ে কোনও নির্জন স্থান দেখে কয়েক দণ্ড উপবেশন করি।

পরক্ষণেই বললেন, কিন্তু তোমার অনুপস্থিতিতে হয়ত চঞ্চল হয়ে উঠবে শিবির। এখুনি প্রহরীরা বেরিয়ে পড়বে তোমার অন্বেষণে।

ইকো বলল, সবকটি শিবিরের বেশ কিছু তফাতে ঐ বালির স্তূপের আড়ালে আমার শিবির। আমার

পবিচারিকা থেকে প্রহরী সকলেই নারী। তাদের আমি বারণ করে এসেছি, তারা যেন অকারণে আমাকে অনুসরণ না করে অথবা আমার জন্য উদ্বিগ্ন না হয়।

তোমার মহান পিতা, যিনি আমার প্রাণ রক্ষায় তোমাকে পরোক্ষে সাহায্য করেছিলেন, তিনি কোথায়?

তিনিই তো এ অভিযানের সর্বাধিনায়ক। ব্যাবিলনের অধীশ্বর।

চন্দ্রগুপ্ত বললেন, আমি জেনেছিলাম, যিনি পাঞ্জাব পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন নিয়ে সিন্ধুতীরে শিবির স্থাপন করেছেন তিনি সম্রাট আলেকজান্ডারের সুদক্ষ এক সেনাপতি। কিন্তু তিনি যে তোমার পিতা, মহামান্য সেলিউকাস তা জানতাম না।

ইকো এ প্রসঙ্গের ছেদ টেনে দিয়ে বলল, চলুন মহারাজ, আমরা পদব্রজে কিছু পথ অতিক্রম করি।

ওরা এসে বসল নদীতীরে নিঃসঙ্গ একটি বৃক্ষের তলায়। বৃক্ষটি তাকিয়ে থাকে সিন্ধুর দিকে। হয়ত সে চলমান নদীর স্রোতের মত ভেসে যেতে চায়, আকাশের ভাসমান মেঘের মত উড়ে যেতে চায়, কিন্তু মাটির আকর্ষণ কাটিয়ে সে চলে যেতে পারে না।

চন্দ্রগুপ্ত ভাবে, কয়েক বছর আগে সে যে কিশোরীকে দেখেছে, আজ সে পূর্ণ যৌবনের মহিমায় উদ্ভাসিত। তার দেহের সমস্ত রেখায় গ্রীকজাতির অপরূপ সৌন্দর্যের স্বাক্ষর।

বৃক্ষতলে বসে প্রথম কথা বলল ইকো, সেই প্রথম যখন আমি এক সম্ভাবনাময় তরুণ যুবাপুরুষকে দেখি তখনই আমার চোখে তাঁর স্থির শক্তিমান রূপটি ধরা পড়েছিল। পরে তা প্রমাণিত হল প্রতিযোগিতার ভেতর দিয়ে।

চন্দ্রগুপ্ত বললেন, আমি যদি বলি, সেদিন একটি নারী ছিল আমার সমস্ত প্রেরণার উৎস, তাকে আমি প্রভাতে সন্ধ্যায়, এমনকি স্বপ্নেও দেখেছি, তুমি কি বিশ্বাস করবে?

কে সে সৌভাগ্যবতী নারী সম্রাট ?

চন্দ্রগুপ্ত সহসা ইকোর একটি হাত নিজের হাতের মুঠোয় ভরে নিয়ে বললেন, আমি এখন সম্রাট নই ইকো, আমি শুধু চন্দ্রগুপ্ত। দেখ, আমার চারদিকে কোন দেহরক্ষী নেই, এমনকি সহসা আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য আমার পোশাকের ভেতর একটি খঞ্জরও নেই। তাছাড়া তুমি ভেবে দেখ, কোনও পূর্বপরিচিত নারীর আহ্বানে কোন সম্রাট কি সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় ভয়ঙ্কর শত্রুব্যূহে প্রবেশ করতে পারে? একজন উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিক ছাড়া এ কাজ কেউ করতে পারে না ইকো, আর সেই প্রেমিকই আজও বেঁচে আছে চন্দ্রগুপ্তের হৃদয়ে।

সহসা চন্দ্রগুপ্তের একখানি হাত তুলে ধরে আকুল আবেগে চুম্বন করল ইকো। তার দুটি চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল।

পরক্ষণেই নিজের আবেগকে কিছু পরিমাণে সংযত করে ইকো বলল, যেদিন এক ভাগ্য বিড়ম্বিত তরুণকে একটিমাত্র মশক দিয়ে এই সিন্ধুর জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলাম, সেদিন থেকে আমার দিবারাত্রির চিন্তাকে সে আচ্ছন্ন করেছিল। পিতার সহস্র অনুরোধ সত্ত্বেও তাই আমি অন্য কোনও পুরুষকে এতদিন জীবনসঙ্গী হিসাবে নির্বাচন করতে পারিনি।

আমার কিশোর বয়সের ভালবাসার মানুষটির যদি কোন সন্ধান পাওয়া যায় তাই পিতাকে দ্বিতীয়বার ভারতে অভিযান পরিচালনার জন্য প্রলুব্ধ করি। কিন্তু আমি ভাবতেই পারিনি, আমি যাকে মনে প্রাণে খুঁজে ফিরছি রাত্রিদিন সেই আসবে গ্রীকদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে সম্রাটের মহিমায়।

চন্দ্রগুপ্ত বললেন, আমিই যে তোমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে সিন্ধুর পরপারে অবস্থান করছি, এ সংবাদ তুমি সংগ্রহ করলে কিভাবে?

যে ধীবরটি আমার দূত হয়ে গিয়ে তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছে, তারই কাছ থেকে আমি তোমার অনেক সংবাদ সংগ্রহ করেছি।

আমি অতি সামান্য অবস্থা থেকেই সংগ্রাম করে আজ ভারতরাষ্ট্রের অধীশ্বরের মর্যাদা লাভ করেছি ইকো।

ঐ প্রবীণ বহুদর্শী ধীবরটি আমাকে তাও বলেছে। এবং তুমিই যে আমার স্বপ্নের সেই চন্দ্রগুপ্ত ছাড়া আর কেউ নও তখনই সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত হয়েছি।

এমনই কিছু সময় অন্তরঙ্গ আলাপের পর চন্দ্রগুপ্ত বললেন, এবার আমাকে শিবিরে ফিরে যেতে হবে ইকো। শেষ রাতটুকু গ্রীস দেশ থেকে ভেসে আসা একটি তাজা ফুলের সৌরভে ভরে থাকবে আমার দেহমন। বল প্রিয় নারী, বিদায়ের মুহূর্তে আমি কি দিয়ে যেতে পারি তোমাকে ?

ইকো চন্দ্রগুপ্তের হাতখানা নিজের বুকের কাছে ধরে রেখে বলল, একটি কথা দিয়ে যেতে হবে প্রিয়।

বল কি কথা?

সে কথা তোমাকে রক্ষা করতে হবে।

অবশ্যই।

তুমি শিবিরে সৈন্য নিয়ে অবস্থান করবে কিন্তু আগে আক্রমণের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বে না।

চন্দ্রগুপ্ত বললেন, তোমার পিতাকে আগে আক্রমণের সুযোগ দেব, এই কি চাও?

না।

তবে?

এ নিয়ে আর কোন প্রশ্ন কোর না প্রিয়।

বেশ, তোমার ইচ্ছার মর্যাদাই থাকবে।

ধীবর চন্দ্রগুপ্তকে নিয়ে শেষ রাত্রিতে সিন্ধু পার হয়ে চলে গেল।

ঠিক দুদিন পরে গ্রীকদের একটি নৌকো এসে ভিড়ল এপারে। নৌকোবাহক বসে রইল নৌকোয়। তীরে উঠে এলেন গ্রীক দূত, সঙ্গে এক ভারতীয় পণ্ডিত। তাঁরা সম্রাট দর্শনে যেতে চান। এই পণ্ডিতটি সেলিউকাসের কন্যার ভাষা-শিক্ষক।

প্রহরী সম্রাটের অনুমতি নিয়ে দর্শনার্থীদের পৌঁছে দিয়ে এল সম্রাটের শিবিরে।

দূতের মাধ্যমে সংবাদ পাঠিয়েছেন সেলিউকাস। দূত গ্রীকভাষায় তাঁর প্রভুর বক্তব্য বলে যেতে লাগলেন, আর সঙ্গী পণ্ডিতটি সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যাখ্যা করে বলে যেতে লাগলেন এ দেশীয় ভাষায়।

সমস্ত সংবাদ শুনে বিস্মিত ও অভিভূত হলেন চন্দ্রগুপ্ত। তিনি তাঁর মনের ভাব প্রকাশ না করে সংযত ভাষায় শুধু জানিয়ে দিলেন, ব্যাবিলনের অধীশ্বরের প্রস্তাব আমি সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করছি, তাঁকে আমার অভিবাদন জানাবেন।

ওঁরা চলে গেলে চন্দ্রগুপ্ত সেলিউকাসের প্রস্তাব নিয়ে আপন মনে ভাবতে লাগলেন। এই পরমাশ্চর্য ঘটনাটি যে ঘটিয়েছে তার উদ্দেশ্যে মনে মনে নিবেদন করলেন হৃদয়ের গভীর ভালবাসা আর কৃতজ্ঞতা।

সেলিউকাস জানিয়েছেন, প্রিয় সম্রাট, ভারতভূমির সম্পূর্ণ অধিকার কেবলমাত্র আপনারই করায়ত্ত থাকবে, তার ওপর আমি আপনাকে দিয়ে যাব কাবুল, কান্দাহার, হিরাট আর বেলুচিস্থান, যা সম্প্রতি আমার অধিকারে এসেছে। এগুলি লাভ করলে আপনার সুবিশাল সাম্রাজ্য প্রসারিত হবে উত্তর-পশ্চিমে পারস্য পর্যন্ত। এ সব কিছুর বিনিময়ে আমার একটিমাত্র অনুরোধ আশাকরি আপনি রক্ষা করবেন। আমার প্রিয় কন্যা আপনার একান্ত গুণমুগ্ধ। যদি তাকে সসম্মানে রানীর মর্যাদা দেন তাহলে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত থাকবে না।

রক্তক্ষয়ী রণক্ষেত্র সহসা রূপান্তরিত হয়ে গেল আনন্দমুখর বিবাহ-বাসরে। নীল সিন্ধু জলে শ্বেতশুভ্র পালতোলা নৌকাগুলি দল বেঁধে বিচরণ করতে লাগল মরাল-মরালীর মত।

যুদ্ধক্ষেত্রে যারা পরস্পরকে সংহার করার জন্য উদ্যত হত তারা মহা আনন্দে বিদ্বেষ ভুলে আবদ্ধ হল আলিঙ্গনে। চন্দ্রগুপ্ত সেলিউকাসকে শ্রদ্ধার অর্ঘ্যরূপে নিবেদন করলেন পাঁচশত সুসজ্জিত হস্তী। মহাসমারোহে অতঃপর একই রথে বরবধূ যাত্রা করলেন মগধের উদ্দেশ্যে। সঙ্গে সেলিউকাস প্রেরিত বিদগ্ধ দূত মেগাস্থিনিস।

পাটলিপুত্রের প্রায় সন্নিকটে এসে বিরতি ঘটল যাত্রার।

বধূবেশে সজ্জিতা গ্রীক রাজকন্যাকে সঙ্গে নিয়ে নগ্নপদে বরবধূ চললেন ঋষি সৌম্যের আশ্রমে।

ঋষি চন্দ্রগুপ্তের মুখ থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খ সবকিছু শুনে গভীর আনন্দ প্রকাশ করে বললেন, তোমাদের মিলনে ভারত আর গ্রীসের সীমানা প্রসারিত হল। দুটি মহান দেশ মিলিত হল পরস্পরের সঙ্গে। আমি মৃত্যুর আগে দেখে গেলাম, ভালবাসার অমৃত আলোকে জাতিভেদ, বর্ণভেদ, দেশভেদের গ্লানিময় অন্ধকার দূরে সরে যায়। আর তোমরা প্রথম এ কাজে ব্রতী হয়ে সারা ভারতে একটি মহান আদর্শ স্থাপন করলে। গৌতম বুদ্ধ আর মহাবীরের জাতিভেদমুক্ত সমাজের আদর্শ তোমাদের ভেতর রূপলাভ করতে দেখে আজ আমার আনন্দের সীমা নেই। তোমরা জয়ী হও, ভালবাসাকে উপভোগ কর।

হঠাৎ চন্দ্রগুপ্তের অন্তরে সুপ্ত একটি প্রশ্ন জাগ্রত হল, মহর্ষি আপনি একসময় বলেছিলেন, অন্তরে সন্ন্যাসী হলে তবেই সে সম্রাটের পূর্ণ মহিমা লাভ করে। আমি এখনও সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর সে স্বাদ লাভ করতে পারিনি।

ঋষি সৌম্য বললেন, এখন তোমার ভোগপর্ব চলেছে, সময় হলে সন্ন্যাসী তোমাকে আপনিই ডেকে নেবেন।

চন্দ্রগুপ্ত আর তাঁর বিদেশিনী বধূ প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই ঋষি সৌম্য বধূকে বললেন, তুমি মৌর্য সাম্রাজ্যের অগ্রমহিষীর পদলাভ করতে না পারলেও তুমি হবে সাম্রাজ্যের রাজলক্ষ্মী। তোমারই কল্যাণে ভারত সাম্রাজ্য আজ পারস্য পর্যন্ত প্রসারিত।

চন্দ্রগুপ্তকে বললেন, মহাবীর আর বুদ্ধের অমৃত আদর্শ একদিন তোমার মহান বংশ থেকেই প্রচারিত হবে। তোমার প্রতিষ্ঠিত মৌর্য বংশই একদিন লাভ করবে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বংশের মর্যাদা।

দিব্যবাণীর মত ঋষি সৌম্যের এই বাণী সত্যে পরিণত করেছিল মহাকাল। চন্দ্রগুপ্ত আর তাঁর পৌত্র ধর্মাশোকের মহান কর্মকাণ্ডের ভেতর দিয়ে রূপায়িত হয়েছিল ঋষিবাক্য।

সাম্রাজ্য শাসনের দুটি সুবর্ণ যুগ পার হয়ে যাবার পর এল সেই প্রতীক্ষিত মুহূর্ত। সন্ন্যাসী এসে দাঁড়ালেন সম্রাটের সামনে।

জৈন সাধু ভদ্রবাহু বললেন, সম্রাটের পরিধেয় খুলে ফেলে চলে এস আমার সঙ্গে। তোমার ভোগবাসনার নিরঞ্জনের সময় এসেছে।

একটিও বাক্য উচ্চারণ করলেন না ভারত সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত। রাজবেশ পরিত্যাগ করলেন। পেছনে পড়ে রইল সিংহাসন, পুত্র পরিজন। সাধু ভদ্রবাহুকে অনুসরণ করে চলে এলেন তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত শ্রবণবেলগোলায়।

সেখানে পদ্মাসনে উপবেশন করে জৈনধর্মের অনুশাসন অনুযায়ী গ্রহণ করলেন আমৃত্যু অনশনব্রত।

আত্মচিন্তায় মগ্ন সম্রাটেব মুখমণ্ডলে ধীরে ধীরে ফুটে উঠল নিরাসক্ত সংসারবিবাগী এক সন্ন্যাসীর দিব্যজ্যোতি।

বৈজয়ন্তী

শোভাযাত্রাটি এইমাত্র একটি শুষ্ক নদী-খাত পার হয়ে এল। মাঝে বিপুল কলেবর এক হস্তী। তার প্রশস্ত পৃষ্ঠদেশে কারুকার্যখচিত এক আস্তরণ। হাওদার চারি কোণে গজদন্ত খোদিত চারিটি দণ্ড। বারণসীর লোহিত বর্ণের বস্ত্রে চারিপার্শ্ব আবৃত। মন্দির আকৃতির চূড়াটি হরিদ্রা বর্ণের চীনাংশুকে অতি সুশোভিত। হস্তীর পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে তরঙ্গিত হচ্ছিল বুটিদার ঝালর। চূড়ার শীর্ষে কর্পটধ্বজ (নিশানযুক্ত ধ্বজ-দণ্ড)। ধ্বজের ঊর্ধ্বে একটি ময়ূরপুচ্ছ গোঁজা। ভারী দৃষ্টিনন্দন ছিল ময়ূরপুচ্ছের চন্দ্রকটি (চন্দ্রাকার চিহ্ন)। সম্মুখে লোহিত অশ্বে আরূঢ় রক্ষীবাহিনী। তাদের প্রত্যেকের দক্ষিণ হস্তে অচ্ছধার (ঝকঝকে ফলাযুক্ত) এক একটি ভল্ল। বাম কটিদেশ থেকে প্রলম্বিত কোষবদ্ধ অসি। হস্তীর পশ্চাতে নানা ধরনের অস্ত্রে সজ্জিত পদাতিক বাহিনী। হস্তীর দক্ষিণ পার্শ্বে আবরণ ঘেরা কয়েকখানি শিবিকা। বাম পার্শ্বে অতি সুশোভিত এক শ্বেত অশ্ব। ষোড়শ বর্ষীয় এক তরুণ সেই অশ্বে আরূঢ়। তার অঙ্গকান্তি এবং পোশাক-পরিচ্ছদে তাকে কোনো রাজপরিবারের সন্তান বলে মনে হচ্ছিল। হস্তীপৃষ্ঠের আরোহিণীকে দেখা যাচ্ছিল না। মহা অভিজাত কোনো কুল-রমণীর যাত্রা-সংকেত বহন করছিল এই শোভাযাত্রাটি।

সহসা তরুণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল প্রায় তারই সমবয়স্ক এক তরুণ কিশোরের দিকে। সে বহুক্ষণ বেশ কিছু দূরত্বে থেকে তাদের শোভাযাত্রাটিকে অনুসরণ করছিল।

শ্বেত অশ্বের আরোহী তরুণটি তার অশ্বটিকে চালিয়ে নিয়ে গেল ওই কিশোরটির দিকে।

মনে হল কিশোরটি শঙ্কিত হয়েছে। সে অশ্বারোহীর কাছ থেকে আরও দূরে পালাবার চেষ্টা করল। কিন্তু অশ্বারোহী তরুণ মুহূর্তে তাকে ধরে ফেলল।

অত্যন্ত শান্ত কণ্ঠে তরুণটি জিজ্ঞেস করল, কি পরিচয় তোমার? মনে হয় বেশ কিছু সময় তুমি আমাদের অনুসরণ করে চলেছ।

আমি ভিল্‌সা, দর্বাহারের (কাষ্ঠ সংগ্রহকারী) ছেলে। বৈশালীতে এক ভূম্যাধিকারী আমার প্রভু ছিলেন। তিনি শিকারে গেলে আমি তাঁকে সাহায্য করতাম।

তুমি তোমার পিতামাতাকে সাহায্য কর না?

আমার মা বহুপূর্বে গত হয়েছে। আমার বাবাকে দুবছর আগে এক তরক্ষু (হায়েনা) বনে হত্যা করেছে।

তরুণ বলল, সে জন্যেই কি তুমি তোমার প্রভুর সঙ্গে পশুশিকারে বনে যাও?

কিশোরটি মাথা নিচু করে রইল।

আবার প্রশ্ন করল তরুণ, তুমি কোথায় গিয়েছিলে?

প্রভু আমার কাজে অসন্তুষ্ট হয়ে আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন।

সবিস্ময়ে তরুণ বলল, কেন, কি অপরাধ তুমি করেছ?

কিশোরটি বলল, তীর চালনায় আমার দক্ষতা আছে। একদিন প্রভু আমাকে একটি হরিণের দিকে তীর ছুঁড়তে আদেশ করেন। মৃগীটি তখন জলপান করছিল। তার সঙ্গে ছিল একটি শাবক। আমি সে দৃশ্য দেখে তার দিকে তীর ছুঁড়তে পারিনি।

কেন পারনি? শিকার করাই তো তোমার কাজ।

কিশোরটি কিছু সময় চুপ করে রইল। এক সময় মুখ তুলতে তরুণটি দেখল কিশোরের চোখ দুটি জলে ভিজে উঠেছে।

কিশোর বলল, ছোটবেলায় মাকে জড়িয়ে ধরে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে থাকতাম। মাকে হারানো যে কী কষ্ট তা আমি জানি। তাই সেদিন মৃগীটির দিকে তীর ছুঁড়তে পারিনি।

সে জন্যই কি তোমার প্রভু তোমাকে বিতাড়িত করেছেন?

কিশোরটি এবার বেশ সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। তার প্রভু কারু কাছে অসম্মানিত হোক তা সে একেবারেই চাইছিল না। তাই সে বলল, আপনিই বলুন, প্রভুর আদেশ পালন না করলে প্রভ তো তাকে শাস্তি দেবেনই।

তরুণের ভারী পছন্দ হয়ে গেল ছেলেটিকে। সে সাগ্রহে বলল, তুমি যাবে আমার সঙ্গে?

কিশোরটি সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল।

তরুণ বলল, আমরা কোথায় চলেছি তা তো তুমি জিজ্ঞেস করলে না?

কিশোর বলল, আপনাকে আমার ভাল লেগেছে, আমি এর বেশী আর কিছু জানতে চাই না।

কিশোরটিকে সঙ্গে নিয়ে তরুণ এবার শোভাযাত্রার সামিল হল। স্থির শোভাযাত্রাটি এতক্ষণে হঠাৎ সচল হয়ে উঠল।

হস্তীপৃষ্ঠে মন্দির-আকৃতির হাওদার ভেতর বসে পর্দাটি ঈষৎ ফাঁক করে কুমারদেবী ছেলেকে দেখছিলেন। তরুণ সূর্যের মতোই দীপ্ত তার চেহারা। শক্তির চিহ্নগুলি আঁকা হয়ে আছে তার বাহু, বক্ষস্থল আর পদযুগলে। অন্তরের গভীর বাসনাগুলো যেন স্তব্ধ হয়ে আছে চোখের তারায়।

শোভাযাত্রাটি কিছুক্ষণ থেমে গিয়েছিল দেখে কুমারদেবী কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলেন। তিনি দেখলেন, তাঁর আদরের পুত্র কাচ একটি মলিন বস্ত্রপরিহিত কিশোরের সঙ্গে কথা বলছে। কৌতূহল সে সময়ের জন্য দমন করে রাখলেন কুমারদেবী, কারণ শোভাযাত্রাটি তখন চলতে শুরু করে দিয়েছিল।

সারাক্ষণ শোভাযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে কাচের ঘোড়ার পাশে পাশে ছুটছিল কিশোর ভিল্‌সা। অবশ্য শোভাযাত্রাটির অতি দ্রুত লয়ে চলবার কোনো উপায় ছিল না। হস্তীর গতির সঙ্গে সমতা রক্ষা করে চলছিল অশ্বারোহী, পদাতিক আর দেহরক্ষী বাহিনী। এবার পথ বিভক্ত হয়ে দুদিকে প্রসারিত হলো। পথ প্রদর্শকের ঘোষণা শোনা গেল, বাঁ দিকের পথ বৈশালী নগরীতে চলে গেছে। আমরা দক্ষিণের পথ ধরে মিথিলার দিকে চলে যাব।

কাচ কিশোরটির কাছে জানতে চাইল, বৈশালীতে কি শুধু লিচ্ছবীরাই বাস করেন?

কিশোর বলল, লিচ্ছবী ছাড়া যাঁরা ওখানে বসবাস করেন তাঁদের সংখ্যা খুবই অল্প।

তুমি ওদের ভেতর যুদ্ধবিগ্রহ হতে দেখেছ কখনো?

না যুবরাজ, নিজেদের ভেতর মতান্তর হলে ওঁরা সভা ডেকে তা মিটিয়ে নেন।

আমিও তাই শুনেছি ভিল্‌সা।— একটু থেমে আবার বলল কাচ, তোমার প্রভু কি লিচ্ছবী ছিলেন?

কিশোর মাথা নেড়ে জানাল, যুবরাজের অনুমান সত্য।

পরে কিশোর বলল, ওখানে লিচ্ছবীরা ছোট বড় নানা ধরনের ভূখণ্ডের অধিকারী। ওদের মধ্যে বেশির ভাগই বুদ্ধের অনুগামী হলেও ভিন্নধর্মের লিচ্ছবীদেরও আপনি দেখতে পাবেন।

তরুণ কাচ হেসে বলল, এসব আমার অজানা নয় ভিল্‌সা।

ইতিমধ্যেই ভিল্‌সা কথা প্রসঙ্গে কাচের পুরো পরিচয়টি জেনে ফেলেছিল। পাটলীপুত্রের মহারাজাধিরাজ চন্দ্রগুপ্তের মহিষী মিথিলার অনতিদূরে পিতৃগৃহে যাত্রা করছেন। সঙ্গে দেহরক্ষী ছাড়াও চলেছে তাঁর তরুণ পুত্র কাচ বা সমুদ্রগুপ্ত।

পশ্চিম দিগন্তের অনেক নীচে নেমে গিয়েছিলেন সূর্যদেব। মধুবিন্দুর মত ঝরে ঝরে পড়ছিল দিনান্তের আলোকবিন্দুগুলি। কাচের কাছে এগিয়ে এলেন নক্ষত্রদর্শ (তিনি-নক্ষত্রবিদ জ্যোতিষী)। কাচের সঙ্গে পরামর্শের পর স্থির হল, আজ এখানেই যাত্রা-বিরতি বিধেয়।

ঘোষক যাত্রা-বিরতির ঘণ্টাধ্বনি করতেই সমস্ত শোভাযাত্রাটি পথের ওপর থেমে দাঁড়াল। গৃহচিন্তক

চেট (যে সকল ভৃত্য সৈনাদের তাঁবু সংস্থাপনের ব্যবস্থা করে) অশ্বপৃষ্ঠ থেকে শিবিরগুলি নামিয়ে দক্ষিণ পার্শ্বের অরণ্যভূমি সংলগ্ন একটি তৃণভূমিতে রাতের মত বিশ্রামের আয়োজন করতে লাগল।

দেহরক্ষীদের বিশাল এক শিবির তৈরি হল, তার সামনেই যুবরাজের সুচিত্রিত শিবির। সর্বশেষে দাসীপরিবৃতা মহারানীর শিবির সংস্থাপিত হল। যুবরাজ কাচের নির্দেশে তার শিবিরের পাশেই তৈরি হল একটি পটকুটী (ছোট তাঁবু)। এই তাঁবুতেই হল কিশোর ভিল্সার রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা।

উত্তরের দিকে বনভূমি গভীর থেকে গভীরতর হয়ে গিয়েছিল। রাতের অন্ধকার নিবিড়তর হয়েছিল বনভূমির বিশাল বিশাল বৃক্ষ-লতা-পল্লবের আশ্রয়ে। এদিকে শৈত্যের প্রাদুর্ভাব অতিশয় প্রবল। বিশেষভাবে রাত্রি যত গভীর হতে লাগল ততই বাড়তে লাগল উত্তর থেকে বয়ে আসা শীতের প্রবাহ। রাতের রক্ষীরা ইতস্ততঃ অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে পরিবেশকে উত্তপ্ত রাখার চেষ্টা করছিল। শেষ রাতের দিকে তারাও নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ল।

রাতের চতুর্থ যামে তরক্ষুর (হায়েনা) প্রাণফাটা চীৎকারে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল বনভূমির স্তব্ধতা। পরিচারিকাদের শিবিরের দিক থেকে শোনা গেল আর্ত কোলাহল। নৈশ প্রহরীরা জেগে উঠে তখন ভীষণভাবে ডাকহাঁক শুরু করে দিয়েছে। তরক্ষুর আর্তনাদ ক্রমে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে মিলিয়ে যেতে লাগল।

ভোরের আলো ফুটলে অনুসন্ধানে জানা গেল পরিচারিকাদের শিবিরের অল্প দূরে একটি তরক্ষু মৃত অবস্থায় পড়ে আছে। তার কণ্ঠনালীতে গাঁথা হয়ে আছে একটি সুতীক্ষ্ণ বাণ। আরও জানা গেল, সে বাণটিতে খোদিত আছে যুবরাজ কাচের নাম।

কাচের কাছে তখন নতমুখে দাঁড়িয়েছিল ভিল্সা। যুবরাজ হঠাৎ তার দিকে তাকিয়ে বলল, ভিল্সা, তুমিই কি তীর ছুঁড়েছিলে?

ভিল্সা মাথা তুলল না কিন্তু নত-মস্তকের আন্দোলনে বুঝিয়ে দিল যুবরাজের অনুমানই ঠিক।

তরক্ষুর সন্ধান তুমি কি করে পেলে ভিল্সা?

এবার ভিল্সা মাথা তুলে বলল, আমি জানি তরক্ষুরা ভীষণ ধূর্ত। আর এ অঞ্চলে তাদের অবাধ গতিবিধি। ভয়ঙ্কর হিংস্র জীব।

তুমি এই অন্ধকারে তরক্ষুটিকে দেখতে পেলে কিভাবে?

ভিল্সা বলল, আপনারা নিদ্রিত হলে আমি নিঃশব্দে আপনার তীর-ধনুটি নিয়ে সামনের ওই সপ্তচ্ছদ (ছাতিম) বৃক্ষের ওপব আরোহণ করি। প্রভুর সঙ্গে বহুবার শিকারে যাবার ফলে রাতেব অন্ধকারেও জানোয়ারদের গতিবিধি আমার চোখে পড়ে। আমি তরক্ষুটিকে শেষ রাতের ফিকে অন্ধকারে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণের স্রোতে ভাসমান একটি ক্ষুদ্র ভেলার মত নিঃশব্দে এগিয়ে আসতে দেখি। সঙ্গে সঙ্গে আমি তাকে তীরবিদ্ধ করি।

বিস্মিত হল যুবরাজ কাচ। সবার সামনে গভীর আবেগে উচ্চারণ করল, আজ থেকে তুমিই আমার প্রধান দেহরক্ষী নিযুক্ত হলে ভিল্সা। যতকাল আমরা জীবিত থাকব ততকাল এই পদেই তুমি অধিষ্ঠিত থাকবে।

ভিল্সা নত-নমস্কারে তার সম্মতির কথা জ্ঞাপন করল।

যাত্রার দশম দিবসে সমস্ত দলটি এসে পৌছল একটি পার্বত নদীর ধারে। দূরে পর্বতের রূপরেখা দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। পথ-প্রদর্শক বলল, নদীতে বান এসেছে, এখন পারাপার নিরাপদ নয়। যদিও আমরা গন্তব্যস্থলের কাছাকাছি এসে গেছি তবুও রাতের বিশ্রাম-শিবির এপারে রচনা করাই যুক্তিযুক্ত।

কাচ পথ-প্রদর্শকের এ যুক্তি সমর্থন করল। আর ঠিক সে রাতেই ঘটল এমন এক ঘটনা যা সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত স্মৃতিতে অটুট হয়ে রইল।

এখানে অরণ্য নেই। উপলাস্তীর্ণ প্রান্তরেই পাতা হল শিবির। সন্ধ্যালগ্ন থেকেই শুভ্র জোৎস্না-ধারা নদীর স্রোতে মিশে ঝলকিত রৌপ্যনির্মিত হাঁসুলীর মত কান্তিময় হয়ে উঠেছিল।

কাচ ভিল্‌সাকে কাছে ডেকে বলল, চল, অশ্বারোহণে আমরা দুজনে প্রান্তরের বুকে কিছুদূর অগ্রসর হই।

ইতিমধ্যেই ভিল্‌সার জন্য একটি কৃষ্ণবর্ণের দ্রুত অতি গতিশীল অশ্ব বরাদ্দ হয়েছিল।

যুবরাজ ও তার দেহরক্ষী ভিল্‌সা জ্যোৎস্নালোকিত প্রান্তরে পশ্চিম দিক লক্ষ করে অগ্রসর হতে লাগল। কিছুক্ষণ শোনা গেল অশ্বদ্বয়ের পদধ্বনি। তারপর দুটি বিন্দু দিগন্তে মিলিয়ে গেল।

রাতে অতি সাধারণ বেশেই সজ্জিত ছিল যুবরাজ। প্রাণের আনন্দে জ্যোৎস্নার জলে বিধৌত হয়ে তারা দুজনে অতিক্রম করল অনেকখানি পথ। এবার তাদের চোখে পড়ল অদূরে কোনো গ্রামের বনরেখা। দক্ষিণে নদীতীরে তারা দেখতে পেল কতকগুলি পলাশ বৃক্ষ। একটি বৃক্ষের তলায় দেখা গেল অপরিসর একখানি পর্ণকুটীর। ওরা অশ্ব থেকে নেমে দুটি প্রস্তরখণ্ডের সঙ্গে তাদের বাঁধল। কাচ বলল, তুমি এই শিলাখণ্ডে উপবেশন করে অশ্ব দুটিকে রক্ষা কর।

কাচ নদীতীরের কুটীর লক্ষ করে অগ্রসর হল। কুটীরের সন্নিকটে পৌঁছনো মাত্র সে শুনতে পেল আশ্চর্য এক বীণার ধ্বনি। সে কতক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে সেই মোহিনী বীণার বাদ্যধ্বনি শুনতে লাগল।

রাজপুরীতে কাচ বীণাবাদকের বাদ্যধ্বনি প্রতি সন্ধ্যাতেই শুনতে পায়। কলাভবনে নৃত্য ও সঙ্গীতের আসর বসে। মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত সপারিষদ শ্রবণ করেন সেই অপূর্ব গীতবাদ্য। কাচ সেই সঙ্গীত সভাতে উপবেশন না করলেও শুনতে পায় সেইসব সঙ্গীতের সুর-মূর্ছনা। কিন্তু এই ধ্বনি কাচের কাছে মনে হল যেন অশ্রুতপূর্ব। জ্যোৎস্নার জলের সঙ্গে মিশে, নদীর স্রোতধারার কলধ্বনির সঙ্গে মিশে সেই বীণার সুর সৃষ্টি করছিল এক অপার্থিব জগতের।

এক সময় কাচ ধীর পায়ে কুটীর-সমীপে উপস্থিত হল। কুটীরের দেহলীতে বসে এক বৃদ্ধ বীণা বাজাচ্ছিলেন। তাঁর কাছে তদ্‌গত হয়ে বসেছিল একটি কিশোরী।

এমন তদ্‌গত হয়ে বীণ্‌কার বীণা বাজাচ্ছিলেন এবং এমন মগ্ন হয়ে শ্রোতা তা শুনছিল যে কাচের উপস্থিতি তারা লক্ষই করল না।

কাচ পায়ে পায়ে নিঃশব্দে সেখান থেকে ফিরে এল। ভিল্‌সা অপেক্ষা করছিল। কাচ বলল, আমার শিবিরে ফিরতে কিছু বিলম্ব হবে। তুমি এ সংবাদ রক্ষীদের জানিয়ে দাও। কেউ যেন অহেতুক চিন্তা না করে। আমার জন্য উৎকণ্ঠায় কারু যেন বিশ্রামের ব্যাঘাত না হয়।

ভিল্‌সা যুবরাজ কাচের আদেশমতো কাজ করল। সে অশ্বারোহণে ফিরে গেল শিবিরে। কাচের অশ্বটি প্রভুর জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগল।

কাচ আবার ফিরল সেই কুটীরের সম্মুখে।

বীণাধ্বনি থেমে গিয়েছিল। তখন বীণ্‌কার কিশোরীকে বীণার গঠনপ্রকৃতি সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছিলেন।

ব্রহ্মবীণার থেকে সৃষ্টি হয়েছে মহতী বীণার। এই বীণা নারদ ঋষি বাজাতেন। তাই একে নারদী বীণাও বলা হয়ে থাকে। যে যন্ত্র বাজবে, আগে তার রূপটা নিজের ধ্যানের মধ্যে রেখে দিতে হবে। এই যে বীণাটি দেখছ, এর মাঝখানে রয়েছে একটি বংশদণ্ড। বংশদণ্ডের দুদিকে দুটি তুম্ব দেখতে পাচ্ছ। স্বরগাম্ভীর্যের জন্যই স্থাপিত হয়েছে এ দুটি তুম্ব। মধ্যস্থলে লক্ষ কর, নবমুষ্টি পরিমিত স্বরস্থান। দেখ, ঊনবিংশটি লৌহনির্মিত সারিকা এই স্বরস্থানে সংযুক্ত। এই সারিকাগুলিতেই প্রকৃত, বিকৃত, সার্ধ, দ্বিসপ্তক স্বরের স্থান নির্দিষ্ট আছে। অর্থাৎ এক একখানি সারিকাতে ষড়জাদি প্রকৃত বিকৃত স্বর প্রকাশ পায়।

এবার লক্ষ কর, এই যন্ত্রের সাতটা কীলকে সাতগাছি ধাতুময় তার সংযুক্ত রয়েছে। তিনগাছি তার লৌহনির্মিত আর চারগাছি পিত্তলনির্মিত। লৌহের তিনগাছি তারের মধ্যে এই একগাছি তার 'নায়কী', অর্থাৎ প্রধান তার। এই তারটিকে মন্দ্রসপ্তকের মধ্যম করে যন্ত্রের তার বাঁধতে হয়। অপর একগাছি

মধ্যসপ্তকের ষড়জ, আর একগাছি তার-সপ্তকের ষড়জ করে বাঁধতে হয়। পিত্তলের চারগাছি তারের মধ্যে একগাছি মন্দ্রসপ্তকের যড়জ, একগাছি পঞ্চম, একগাছি মন্দ্রসপ্তকের নিম্নসপ্তকের ষড়জ আর অবশিষ্ট গাছিটি এর পঞ্চম করে বাঁধতে হয়।

হঠাৎ শ্রোতার দৃষ্টি পড়ল অদূরে দণ্ডায়মান অপরিচিত আগন্তুকের দিকে। গভীর বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটে উঠল কিশোরীর মুখে চোখে। সে মুহূর্তে বীণকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করল আগন্তুকের দিকে।

বীণকার কাচের দিকে তাকিয়ে বললেন, কে আপনি? আমি বৃদ্ধ, ক্ষীণদৃষ্টি, আপনি আরও নিকটে আসুন।

কাচ দেহলীর সামনে এসে দাঁড়াল এবং বৃদ্ধের উদ্দেশ্যে নমস্কার নিবেদন করল।

ততক্ষণে কিশোরী গৃহের অভ্যন্তর থেকে একটি আসন এনে অতিথির উপবেশনের জন্য পাথরের মেঝেতে বিছিয়ে দিল।

বীণকার বললেন, উপবেশন করুন।

কাচ আসনে বসে বলল, আমি পাটলীপুত্রের অধিবাসী। আমার জননীকে নিয়ে নদীর ওপারে মাতুল গৃহের উদ্দেশ্যে চলেছি। রাত্রি সমাগত, তাই নদী পারের চেষ্টা না করে রাত্রিবাসের আয়োজন করেছি প্রান্তরে।

বীণকার বললেন, তোমাকে দেখে এবং তোমার কণ্ঠস্বর শুনে মনে হচ্ছে তুমি সম্ভ্রান্ত-বংশীয় এবং তরুণ। হঠাৎ এখানে কি উদ্দেশ্যে তোমার আগমন? আমরা কি তোমার কোনো প্রয়োজন সিদ্ধ করতে পারি?

কাচ বলল, নিছক কৌতূহলের বশে জ্যোৎস্নালোকে প্রান্তরে বিচরণ করতে করতে আমি এখানে উপস্থিত হয়েছি। এই প্রান্তরে নদীতীরে একমাত্র কুটীর দেখে আমি আকৃষ্ট হই। আপনার বীণার ধ্বনি আমাকে সম্মোহিত করেছে।

বীণকার মৃদু হেসে বললেন, কেবল সুরই মানুষকে সম্মোহিত করে না। পরিবেশের ভেতরেও থাকে সম্মোহন । সুরস্রষ্টারা তাই ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী গাইবার কাল ও পরিবেশ নির্দিষ্ট করে গিয়েছেন। যথা নিয়মে যথা সময়ে শুদ্ধচিত্তে তদ্গত হয়ে রাগ-রাগিণীর সাধনা করলে অবয়ব নিয়ে সে রাগ-রাগিণী গায়ক বা বাদকের অন্তর্দৃষ্টির সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

একটু থেমে বৃদ্ধ আবার বলতে লাগলেন, পূর্বাহ্নে গাইতে হয় ভৈরব। তোমার বাদনে অথবা সঙ্গীতে তুমি ভৈরবকে প্রত্যক্ষ করবে। শিরে গঙ্গার লহরীলীলা। চন্দ্রকলার তিলকে চর্চিত ললাট। অঙ্গে নাগ-ভূষণ, পরনে শার্দূল চর্মবাস। ত্রিশূল হস্তে ত্রিলোচন দণ্ডায়মান।

আবার সায়াহ্নে গাও রাগিণী গৌবী। গৌরী ধীরে ধীরে আবির্ভূতা হবেন তোমার সম্মুখে। আহা কি অপরূপ রূপ তাঁর! কণ্ঠে গজমোতির মালা, পরণে ময়ূর-পুচ্ছাঙ্কিত বিশুদ্ধ বস্ত্র, বরতনু মাল্যচন্দনে বিভূষিত। শুভদা গৌরীর মুখখানি পূর্ণচন্দ্রের মতো উদ্ভাসিত।

সেই জ্যোৎস্নালোকিত সন্ধ্যায় বৃদ্ধের কথাগুলি মন্ত্রোচ্চারণের মত যুবরাজের কানে এসে বাজতে লাগল।

কিশোরী অতিথি সৎকারের জন্য পাথরের পাত্রে নিয়ে এল কিছু খাদ্য ও পানীয়। বৃদ্ধ বললেন, এই নদীতীরে নির্জন নিবাসে আমি একাই থাকি। এই কন্যাটি আমার দৌহিত্রী। এর পিতামাতা প্রান্তরের শেষে লিচ্ছবী জনপদে বসবাস করে। মাঝে মাঝে বীণা শিক্ষার জন্য আমার এই দৌহিত্রীটি কয়েক দিবস আমার এই কুটীরে কাটিয়ে যায়।

কাচ বলল, আপনি লোকালয় ছেড়ে এত দূরে একা বসবাস করছেন কি কারণে?

বৃদ্ধ বললেন, নির্জনতাই সাধনার ক্ষেত্র। এখানে সুরগুলি রূপ ধরে আমার সামনে উদিত হয়। জনপদে তাদের আমি দেখতে পাই না।

কাচ বলল, আপনার এ নির্জন পরিবেশ যথার্থই সুরের জগৎ। আমি সঙ্গীত বড় ভালবাসি। আপনার

অনুমতি পেলে মাঝে মাঝে আপনার বীণাবাদন শোনার জন্য চলে আসব।

বৃদ্ধ বললেন,পাটলিপুত্র তো এখানে নয়। সে তো বহুদূরের পথ। তুমি কি এতখানি দূরত্ব অতিক্রম করে কেবলমাত্র আমার বীণা শোনার জন্য এখানে আসবে?

কাচ বলল, সেই দুঃসাধ্য কাজটি সম্ভব হবে কিনা আমি জানি না তবে যতদিন মাতুলালয়ে থাকব আপনার এখানে আসা হয়তো সম্ভব হবে।

বৃদ্ধ বললেন, বয়সে তুমি একেবারেই তরুণ কিন্তু তোমার প্রাণের মধ্যে ইতিমধ্যেই একটা সুরের জগৎ সৃষ্টি হয়ে গেছে। আমার কাছে গচ্ছিত কিছু সম্পদ তোমাকে দিতে পা:লে আমি বড় তৃপ্তি পেতাম।

কাচ দুটি হাত জোড় করে বলল, আপনার কাছে সামান্য শিক্ষালাভ করলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করব। বীণা সম্বন্ধে আমার আগ্রহ প্রবল, ইতিমধ্যে সামান্য কিছু শিক্ষাও করেছি। আপনি আমাকে পথ দেখিয়ে দিলে আমি আমার সাধনায় হয়তো একদিন সিদ্ধিলাভ করতে পারব।

বৃদ্ধ বললেন, নিষ্ঠা, শুধু নিষ্ঠা চাই। এ বড় কঠিন সাধনা । প্রতিদিন ব্রাহ্ম মুহূর্তে শয্যাত্যাগ করে এই বীণাকে বুকে তুলে নিয়ে সাধনা করতে হবে। গুরুর কাছে পথের নির্দেশ পাবে কিন্তু অবিরত সাধনায় রাগ-রাগিণী তোমার অন্তর্দৃষ্টির সামনে ধরা দেবে।

কাচ বলল, যতদূরে থাকি না কেন, শিক্ষার প্রয়োজনে আমি আপনার এই কুটীরে চলে আসার চেষ্টা করব।

বৃদ্ধ হেসে বললেন, আর অধিক সময় আমার হাতে নেই, এই কিশোরী আমার কাছ থেকে যা পেয়েছে তোমাকেও আমি তাই দিয়ে যেতে চাই।

কাচ নমস্কার করে উঠে দাঁড়াল। সবিনয়ে বলল, রাত্রি অধিক হওয়ার পূর্বেই আমাকে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিন।

বৃদ্ধ কিশোরীকে বললেন, তুমি অতিথিকে কিছু পথ এগিয়ে দিয়ে এস।

কাচ সংকুচিত হয়ে বলল, আমার পথ চিনে যেতে কোনো অসুবিধেই হবে না।

বৃদ্ধ বললেন, আমি তা জানি। তবু অতিথিকে কিছু পথ এগিয়ে দেবার সৌজন্য গৃহস্বামীর অবশ্যই থাকা উচিত।

কাচের সঙ্গে কিশোরী প্রান্তরের ওপরে উঠে এল।

কিশোরী বলল, আপনি কি পদব্রজে প্রান্তর পার হবেন?

দক্ষিণে একটা শিলাস্তূপের দিকে কিশোরীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে কাচ বলল, অদূরে আমার অশ্বটি প্রভুর জন্য অপেক্ষা করছে। আমি অশ্বারোহণেই আমার রাত্রি-নিবাসে ফিরে যাব।

কিশোরীটি বলল, যদি কিছু মনে না করেন আমি আপনাকে একটি প্রশ্ন করব।

কাচ হেসে বলল, কিছুই মনে করব না আমি। যদি তুমি আমাকে সম্মান সূচক 'আপনি' সম্বোধনটি না কর তাহলে আমি খুশী হব।

কিশোরী বলল, আমার মাতামহ একেবারে আপনভোলা মানুষ, তিনি তোমার নাম কিংবা পরিচয় কোনোটাই জিজ্ঞেস করেননি। কৌতূহলী হলেও আমি তাঁর সামনে তোমাকে কোনো কথা জিজ্ঞেস করতে পারিনি।

থামল কিশোরী। প্রসন্ন হাসি হেসে বলল কাচ, তোমার একটা পরিচয় আমার জানা হয়ে গেছে, কিন্তু নামটা এখনো অজানা।

আমার নাম মুক্তামালা, আমাকে তুমি মুক্তা বলেই ডেকো।

আমার নাম সমুদ্রগুপ্ত। আমার মা আমাকে কাচ নামেই ডাকেন। তুমিও এই নামেই ডেকো।

কিশোরী বলল, আর একটি কথা জানতে চাই, তোমার কণ্ঠের ওই মুক্তামালাটি সাতনরীতে গাঁথা। সাধারণত লিচ্ছবীরা তাদের কণ্ঠের হারে সপ্তসংখ্যাক রত্ন ব্যবহার করেন। বুদ্ধ তথাগত লিচ্ছবীদের সাতটি অমূল্য উপদেশ দিয়েছিলেন। ঐ সাতনরী মালা তারই প্রতীক। তোমার ঐ সাতনরী মালাটি দেখে আমার

কেবলই লিচ্ছবীদের কথা মনে হচ্ছে।

কাচ বলল, তোমার এই সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে আমি মুগ্ধ হয়েছি। আমার পরিবারের সঙ্গে লিচ্ছবীদের কিছু সম্পর্ক আছে। তোমার মতোই আমার জননীও লিচ্ছবীকন্যা। তিনিই আমার কণ্ঠে এই সাতনরী মুক্তামালাটি পরিয়ে দিয়েছেন।

হঠাৎ সেই চন্দ্রালোকে তরুণ কিশোর সমুদ্রগুপ্তের হৃদয়টি উদ্বেলিত হয়ে উঠল। সে তার কণ্ঠ থেকে সাতনরী মুক্তার মালাটি খুলে পরিয়ে দিল কিশোরী মুক্তামালার গলায়।

আচম্বিতে ঘটনাটি ঘটে গেল। কাচ বলল, মুক্তামালা তোমার নাম, এ হার তোমার কণ্ঠেই সাজে।

মুক্তামালা কিছুক্ষণ ভাবাবেগে কোনো কথা বলতে পারল না। সে প্রান্তরের একদিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। হয়তো সে ভাবছিল এ ভালবাসার দানটুকু সে কি করে রক্ষা করবে! সে তার পিতামাতার কাছে এই দানের কথা কিছুতেই প্রকাশ করতে পারবে না।

এক সময় মুক্তমালা বলল, তোমার এই মুক্তামালার কথা আমি চিরদিন মনে রাখব, কিন্তু আমি কিশোরী, আমার কণ্ঠে এই মালা দেখলে নানা ধরনের প্রশ্ন উঠবে, তাই আমার এ মালা তোমার কাছেই গচ্ছিত রাখতে চাই।

মুক্তামালা তার কণ্ঠ থেকে মালাটি খুলে কাচের হাতে তুলে দিতে গেল।

কাচ বলল, তোমার নিজের হাতে আমার গলায় পরিয়ে দাও তোমার মালা। মুক্তামালা চিরদিন আমার কণ্ঠে থাকবে জয়ের মালা হয়ে।

মুক্তামালা ফিরে গেল মাতামহের সঙ্গীত-সদনে। বুকের মধ্যে সে বারবার অনুভব করতে লাগল একটা আশ্চর্য স্পর্শ। সেটা সেই সাতনরী মালার অথবা অন্য কিছুর তা সে পরিষ্কার করে বুঝতে পারল না। কেন জানি না কয়েক ফোঁটা অশ্রু-মুক্তাবিন্দু তার নিরাভরণ বুকের ওপর গড়িয়ে পড়তে লাগল।

অন্যদিকে কাচের অশ্ব ছুটে চলল আস্তানার অভিমুখে। কাচের মুখে সোজাসুজি এসে পড়েছে চন্দ্রালোক। উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে সে মুখ। চন্দ্রালোকে অথবা অন্তরের আনন্দ উচ্ছ্বাসে তা বোঝা গেল না।

মাঝপথে দেখা হয়ে গেল ভিল্‌সার সঙ্গে। সে একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে কাচের জন্য অপেক্ষা করছিল।

কাচ বিস্মিত হয়ে বলল, আমি তোমাকে শিবিরে পাঠিয়েছিলাম আমার বিলম্বের খবরটি জানিয়ে দিতে, কিন্তু দেখছি সে কাজ তুমি করনি। আমার জননী এতে নিদারুণ চিন্তিত হয়ে পড়বেন।

ভিল্‌সা মাথা নিচু করে বলল, আপনার আদেশ আমি অমান্য করিনি যুবরাজ। আপনার বিলম্বে প্রত্যাবর্তনের খবরটি আমি আগেই জানিয়ে এসেছি। সেখান থেকে ফিরে এসে প্রতীক্ষা করছি আপনারই জন্য।

কাচ বলল, চল আমবা শিবিরে যাই।

দুটি অশ্ব শব্দ তুলে শিবিবের অভিমুখে ছুটতে লাগল।

প্রভাতে আবার শোভাযাত্রা অগ্রসর হল। নদীপার হয়ে আর এক অরণ্যভূমি। সেই অরণ্য শেষ হতেই ঘোষক যাত্রা-বিরতির ঘন্টাধ্বনি করে থামিয়ে দিল সমস্ত দলটিকে।

দূর প্রান্তর থেকে একটা শব্দ শোনা যাচ্ছিল। সেই শব্দের প্রকৃতি নির্ধারণের জন্য প্রবীণ কয়েকজন রক্ষী উৎকর্ণ হয়ে রইল।

কিছুক্ষণ পরেই একজন অভিজ্ঞ রক্ষী বলে উঠল, শঙ্কার কোনো কারণ নেই, ঐ ধ্বনি আনন্দের। কোনো দেবতার উদ্দেশ্যে বাদ্যধ্বনি করে এ মিছিল অগ্রসর হচ্ছে।

ক্রমে মিছিলের লোকজন দৃষ্টিগোচর হল। শঙ্খ, ঘণ্টা, ঝল্লরী, কাহল আর শিঙ্গাধ্বনি করে একদল মানুষ এসে দাঁড়াল শোভাযাত্রার সামনে।

মহারাজাধিরাজ চন্দ্রগুপ্তের জয় হোক। মহারাণী কুমারদেবীর জয় হোক।

জানা গেল, রাজপুরীর শীর্ষ থেকে শোভাযাত্রাটিকে দেখামাত্র কন্যা ও দৌহিত্রকে প্রত্যুৎগমন করে নিয়ে আসবার জন্য মহারাজ ভবদেব লোক পাঠিয়েছিলেন।

এবার সেই বাদ্যধ্বনি ফিরে চলল রাজপুরীর দিকে, আর তার পশ্চাতে অনুসরণ করে চলল মহারানী কুমারদেবীর শোভাযাত্রা।

রাজপুরীর সম্মুখের প্রান্তরে দাঁড়িয়েছিলেন সপারিষদ ভবদেব। একপার্শ্বে রাখা ছিল রাজপুরীর শিবিকা। এই শিবিকাতে আরোহণ করে কন্যা প্রবেশ করবে অন্তঃপুরে।

দূর থেকে রাজার উদ্দেশ্যে নত হয়ে প্রণাম জানিয়ে রক্ষীরা পথ-নির্দেশকের সঙ্গে চলে গেল তাদের জন্য নির্দিষ্ট আস্তানায়। নক্ষত্রদর্শককেও তাঁর জন্য নির্দিষ্ট বিশ্রাম-কক্ষে নিয়ে গেল একজন বিশিষ্ট অমাত্য। রাজগৃহের দাসীরা হস্তীপৃষ্ঠ থেকে অবতরণের পর কুমারদেবীকে শিবিকায় তুলে নিল। নারীবাহিত শিবিকাটি চলে গেল প্রাসাদের অভ্যন্তরে।

ভবদেবকে আভূমি লুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই মহারাজ সূর্যের মত উজ্জ্বল আর তেজস্বী দৌহিত্র সমুদ্রগুপ্তকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন।

মহাসমারোহে কাচকে রাজপুরীতে নিয়ে যাবার আগে কাচ মাতামহকে বলল, কৃষ্ণ অশ্বের বল্গা ধরে অদূরে যে কিশোরটি অপেক্ষা করছে সে আমার প্রধান দেহরক্ষী। এখানে তার কোনো কাজ না থাকলেও তার ওপর একটু বিশেষ দৃষ্টি রাখবেন। ও আমার একান্ত অনুগত।

মহারাজ বললেন, অবশ্যই তাকে উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে রাখা হবে।

বিপুলাকার হস্তীটিকে আলানস্তম্ভে (হাতি বাঁধার খোঁটা) বাঁধা হয়েছে। নালিবাহিক (হাতির সহিস) তার পরিচর্যায় রত। হস্তীদর্শনে কৌতূহলী জনতা ভিড় জমিয়েছে রাজগৃহের প্রাঙ্গণে। শিশুরা পরস্পরের স্কন্ধ এবং কটিদেশ বেষ্টন করে মুগ্ধ চোখে লক্ষ করছে হস্তীটির শুণ্ড-সঞ্চালন। একটি অঞ্জনশিলার ওপর রাখা হয়েছে কদলী বৃক্ষ ও রাশিকৃত চাউল।

অন্যদিকে মহারাজ ভবদেব দৌহিত্রকে নিয়ে প্রথমে প্রবেশ করলেন সভাগৃহে। উপস্থিত অমাত্য ও সম্ভ্রান্ত জনমণ্ডলীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন, জামাতা মহারাজাধিরাজ চন্দ্রগুপ্তের সুযোগ্য পুত্র যুবরাজ সমুদ্রগুপ্তের।

সমুদ্রগুপ্তের নাম উচ্চারণ মাত্র চতুর্দিকে হর্ষধ্বনি উত্থিত হল।

মহারাজ ভবদেব বললেন, দীর্ঘযাত্রার পরে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে আমার দৌহিত্র কাচ, আপনারা তাকে বিশ্রামের অনুমতি দিন।

সকলের অনুমতি নিয়ে মহারাজ ভবদেব দৌহিত্রকে বাহুবন্ধনে বেঁধে কক্ষান্তরে প্রবেশ করলেন।

নির্দিষ্ট সুসজ্জিত কক্ষে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে কাচের। পাটলীপুত্র থেকে আগত প্রধান পরিচারক নিযুক্ত রয়েছে সেখানে। তার অধীনে রাখা হয়েছে অন্য একদল কিঙ্কর, যারা প্রধান পরিচারকের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করবে।

আহারাদির পর নির্দিষ্ট কক্ষে বিশ্রাম করছিল কাচ। একটি উচ্চ ভূমির ওপর প্রস্তরনির্মিত প্রাসাদ। মুক্ত বাতায়নপথে প্রশস্ত প্রান্তর চোখে পড়ে। কয়েকজন কিনাশ (কৃষক) দূরে ক্ষেতের কাজ করছিল। এক ঝাঁক কলবিঙ্ক (চড়াই) উড়ে উড়ে মাঠ থেকে সংগ্রহ করে বেড়াচ্ছিল শস্যকণা। বিটঙ্কবেদিকা (পায়রা বসার জায়গা) থেকে পারাবতদের কলকূজন শোনা যাচ্ছিল। প্রান্তরের শেষে নীল আকাশ ছুঁয়ে দিগন্তের অর্ধবৃত্তাকার বনরেখা। ঐ বন যেখানে শেষ হয়েছে তারই দক্ষিণ প্রান্ত ছুঁয়ে স্বচ্ছধারা একটি প্রবাহিনী বয়ে চলেছে।

দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রামে অভ্যস্ত নয় কাচ। সে বাতায়নপথে চেয়ে চেয়ে দেখছিল রৌদ্রস্নাত প্রকৃতির শান্ত মন্থর জীবনলীলা।

হঠাৎ কাচের চোখের সামনে ভেসে উঠল একটি কিশোরীর আলেখ্য। চতুর্দিকে ইন্দ্রধনুর মত সুরের

বলয় সৃষ্টি হয়েছে. তার মাঝে একখানা বীণা হাতে ধরে দূব বনরেখা থেকে প্রান্তরের দিকে এগিয়ে আসছে কিশোরী।

কাচের মনে হল এ কিশোরী যেন তার স্বপ্নে দেখা। স্বপ্নের ঘোর কেটে গেলেই মিলিয়ে যাবে এমন অপরূপ একখানা ছবি।

কাচ তার কিঙ্করকে পেটিকা থেকে ভূর্জপত্র আর লেখনী বের করে আনতে বলল। ভূর্জপত্র শয্যার ওপর বিছিয়ে আপন মনে লিখল তার প্রথম কবিতা—

‘কপালে আঁকা ছিল তার চন্দনতিলক,
মনে হল, আকাশের চন্দ্রমা ধরা দিয়েছে ললাটে।
কিংশুকের ডালে ডালে আধফোটা ফুলের উৎসব,
মনে হল, তারই হাতে জ্বালিয়ে দেওয়া
সারি সারি দীপশিখা।
তখন ব্রহ্মবীণায় উঠেছিল আনন্দরাগিণী,
মনে হলো, প্রবাহিনীর কলধ্বনি—
জেগে উঠেছে সেই বীণার তন্ত্রিতে।
জ্যোৎস্নার উত্তরীয়খানি ওড়াচ্ছিল মধুমাসলক্ষ্মী,
তারই তলায় দাঁড়িয়ে কোন সুরকন্যা—
তার চোখের দুটি কালো ভ্রমরীকে উড়িয়ে দিল!
আমি দাঁড়িয়ে রইলাম নিস্পন্দ, মন্ত্রমুগ্ধ।
আমার আঁখি-ভ্রমর কখন যে বন্দি হল
তা জানতে পারিনি।’

বিদেশি পথিক।।

কবিতাটি রচনার পর আশ্চর্য এক অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল কাচের অন্তরে। প্রথম কবিতা সৃষ্টির আনন্দ তাকে বিহ্বল করে তুলল। কাচ চিরদিনই ভাবুক প্রকৃতির। যখন নিঃসঙ্গ বসে থাকে তখন অদ্ভুত সব স্বপ্ন দেখে সে। কখনো দেখে , অশ্বারোহণে চলেছে সে দেশ থেকে দেশান্তরে। অপরিচিত প্রকৃতি, অপরিচিত মানুষজন। তারা তাকে হাতছানি দেয়, তারা তাকে আপনজনের মতো অন্তরঙ্গ অভ্যর্থনা জানায়। কখনো সে স্বপ্ন দেখে তুষারশুভ্র শৈলশিখরের তলায় সে বসে আছে। নীচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে উপবীতের মত অজস্র নদনদী। কত অরণ্য, কত জনপদ তার চোখের সামনে প্রসারিত। কাচ দেখে জনপদ থেকে, অরণ্য থেকে অগণিত মানুষ নদীতীর ধরে এগিয়ে আসছে শৈলশিখর লক্ষ করে। তারা তাদের অঞ্জলিবদ্ধ হাত ঊর্ধ্বে তুলে নমস্কার নিবেদন করছে নগাধিরাজকে।

প্রথম কবিতা রচনার আনন্দানুভূতি কিছু পরিমাণে প্রশমিত হওয়ার পর কাচের মনে হল, অন্য কোন একজন বোদ্ধাকে চাই যার কাছে সে তার কবিতাটি শোনাতে পারে। মাতামহের গৃহে এখনো সে সবার সঙ্গে পরিচিত হতে পারেনি। সে গুরুজনদের প্রণাম করেছে কিন্তু তার সমবয়সী কোনো তরুণ তরুণীর সাক্ষাৎ সে পায়নি।

হঠাৎ তার চোখের সামনে একখানা মুখ ভেসে উঠল। চন্দনের তিলক পরা সে মুখ মুগ্ধ দুটি চোখ মেলে একজন শ্রেষ্ঠ বীণকারের বীণাবাদন শুনছে। কাচ রোমাঞ্চিত হল, যখন সে দেখল, সেই কিশোরী তার কল্পনার পথ বেয়ে নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে তার প্রথম কাব্য-কমলের ওপর। কি আশ্চর্য! কমলের পাপড়িতে পাপড়িতে সেই কিশোরীর কথাই তো লিখে রেখেছে সে।

কাচের মনে হল সেই মুহূর্তে সে ছুটে চলে যায় তার স্বপ্নচারিণীর কাছে। তাকে শুনিয়ে আসে তার বন্দনা-গান।

মহারাজ ভবদেব অন্তঃপুরের বিশ্রামকক্ষ ছেড়ে চলে এলেন দৌহিত্র সমুদ্রগুপ্তের ঘরে। এতক্ষণ তিনি

কন্যা কুমারদেবীর সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপ করছিলেন। কতদিন পরে দেখা। তাঁর পরম স্নেহের একমাত্র কন্যাটিকে নিজের গৃহ থেকে বিদায় দিয়ে তিনি দীর্ঘদিন মনঃকষ্টে কাটিয়েছেন। বিবাহের পর কন্যাকে নিয়ে জামাতা চন্দ্রগুপ্ত এসেছিলেন একবারমাত্র। সমুদ্রগুপ্তের জন্মের পর সেই যে স্ত্রী আর নবজাতক সন্তানটিকে নিয়ে শ্বশুরালয়ে এসেছিলেন তারপর পঞ্চদশ বর্ষ অতিক্রান্ত হয়ে গেছে শ্বশুর ও জামাতার আর সাক্ষাৎকার ঘটেনি। এই দ্বিতীয়বার কন্যা এল তার তরুণ কুমারকে সঙ্গে নিয়ে। পূর্বাহ্ণেই সংবাদ এসেছিল, তরুণ দৌহিত্র তার জননীকে সঙ্গে নিয়ে মহারাজ ভবদেবের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আসছে। তাই মহারাজ প্রাসাদকে সজ্জিত করেছেন উৎসব সজ্জায়।

কন্যার বিশ্রামগৃহে পিতামাতা এতক্ষণ কন্যাটিকে আগলে বসেছিলেন। পাটলীপুত্রের রাজগৃহে কন্যা কিভাবে তার দিন ও রাত্রি অতিবাহিত করে সে সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন জননী। পিতা ভবদেবও ছিলেন আগ্রহী শ্রোতা কিন্তু তাঁর জিজ্ঞাসার বিষয় ছিল ভিন্ন। জামাতা চন্দ্রগুপ্তকে কেন্দ্র করে তিনি বারংবার তাঁর কৌতূহলকে পরিতৃপ্ত করার জন্য প্রশ্ন করে যাচ্ছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের দিগ্বিজয় সংবাদ শুনে তিনি বিশেষভাবে পুলকিত হচ্ছিলেন। সর্বশেষে কন্যা কুমারদেবী তাঁর পেটিকা থেকে কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা বের করে এনে পিতামাতার সামনে মেলে ধরলেন। বিস্মিত হয়ে মহারাজ ভবদেব ও রাজমহিষী কনকদত্তা দেখলেন, স্বর্ণমুদ্রার একদিকে মহারাজাধিরাজ চন্দ্রগুপ্ত এবং অন্যদিকে কুমারদেবীর মূর্তি উৎকীর্ণ। এই আলেখ্য দেখে ভবদেব অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন আর মহিষী কনকদত্তার চোখ দিয়ে ঝরে পড়েছিল আনন্দাশ্রু।

দৌহিত্রের ঘরে ঢুকে ভবদেব বললেন, দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রাম কেমন হল যুবরাজ?

মাতামহের সকৌতুক প্রশ্নে যুবরাজ কাচ জবাব দিল, কারাগারে বন্দিরা যেমনভাবে বিশ্রামসুখ লাভ করে।

ভবদেব বললেন, তুমি শুধু শক্তিমান সম্রাটের পুত্রই নও, তুমি একেবারে রসচূড়ামনি। কিন্তু দাদা, নিজেকে বন্দি ভাবার কারণটুকু আমাকে খুলে বলবে কি?

কাচ বলল, আমি অমরাবতী চাই না, যদি তা জনহীন হয়।

মহারাজ ভবদেব দৌহিত্রের মনোবেদনার কারণ অনুধাবন করে বললেন, অবিলম্বে পাটলীপুত্রের যুবরাজের মনোরঞ্জনের জন্য আমি নৃত্যগীতাদির ব্যবস্থা করছি।

কাচ হেসে বলল, দোহাই আপনার দাদামহাশয়....।

সঙ্গে সঙ্গে ভবদেব বললেন, 'আপনি' নয় ভাই, এই বৃদ্ধকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করলে সে অনেক বেশী আনন্দিত হবে। এখন কি বলতে চাইছিলে বল।

কাচ বলল, রোজ সন্ধ্যায় পাটলীপুত্রের কলাভবনে নৃত্যগীতাদির আসর বসে। এখানে এসেও আমার দিনগুলো নৃত্যগীতাদির ভেতরে কাটুক, এটা আমি চাই না।

ভবদেব বললেন, তবে বল ভাই, আমি কিভাবে পাটলীপুত্রের যুবরাজের মনোরঞ্জন করতে পারি?

কাচ বলল, তুমি যদি রক্ষী ছাড়া আমাকে ইচ্ছানুযায়ী পরিভ্রমণের সুযোগ দাও তাহলে আমি সবচেয়ে খুশী হব।

মহারাজ ভবদেব কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন।

কাচ বলল, এত কি ভাবনার আছে দাদা। আমি নিজেকে রক্ষায় সম্পূর্ণ সমর্থ জানবে। কেবলমাত্র সে কারণেই পিতা নিজে না এসে আমাকে জননীর সঙ্গী করে পাঠিয়েছেন। আর তাছাড়া...

ভবদেব বললেন, তাছাড়া কি ভাই?

কাচ বলল, আজ তুমি আমার কিশোর দেহরক্ষীটিকে দেখেছ। সে অন্ধকারেও তরক্ষুর (হায়েনা) পদশব্দ শুনে তাকে তীরবিদ্ধ করতে পারে।

বিস্মিত ভবদেব বললেন, আশ্চর্য! কোথা থেকে সংগ্রহ করলে এই বীর কিশোরটিকে ?

পথ থেকে। তোমার এখানে আসার পথেই এই পিতৃমাতৃহীন কিশোরটিকে আবিষ্কার করি। বৈশালীতে

কোনো বিত্তবানের গৃহে ও কর্মে নিযুক্ত ছিল। সামান্য ত্রুটিতে ওকে প্রভুগৃহ থেকে বিতাড়িত হতে হয়।

মহারাজ বললেন, এখনো বৈশালীতে বেঁচে আছে লিচ্ছবীদের গণপরিষদ। আমি ওখানে প্রায়ই গিয়ে থাকি। অনেক সময় সভা পরিচালনার কাজও আমাকে করতে হয়। ওর সুবিচারের কোনো প্রয়োজন হলে আমাকে বলতে পার।

কাচ বলল, ও এখন পাটলীপুত্রের যুবরাজের রক্ষিত। তাছাড়া ও আমাকে ছেড়ে আর কোথাও যেতে চায় না। এ অবস্থায় সে তার প্রভুর ন্যায়-অন্যায়ের জন্য কোনো বিচার চাইবে না।

ভবদেব বললেন, উত্তম। তুমি এক অসহায়, পরিত্যক্তকে আশ্রয় দিয়েছ, এদিক থেকে তুমিও নির্মল।

কাচ বলল, দাদামহাশয়, একটি বিষয় জানতে আমার বিশেষ কৌতূহল আর সেটি হল লিচ্ছবীদের সম্বন্ধে।

ভবদেব বললেন, কি জানতে চাও ভাই?

কাচ বলল, আমি লিচ্ছবী-দৌহিত্র বলে গর্বিত। আমার পিতা লিচ্ছবী-কুলের সঙ্গে আত্মীয়তা করে যে কতখানি আনন্দিত তার প্রমাণ আপনি সম্প্রতি প্রচলিত পাটলীপুত্রের স্বর্ণমুদ্রায় দেখতে পাবেন। সেখানে তিনি নিজের প্রতিকৃতির সঙ্গে জননীর প্রতিকৃতিও খোদিত করেছেন।

এইমাত্র তোমার জননী আমাকে সেই মুদ্রাটি দেখিয়েছেন। মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত যদি লিচ্ছবীবংশের সঙ্গে আত্মীয়তা করে খুশী হন তাহলে আমরাও পাটলীপুত্রের সম্রাটের হাতে কন্যা সমর্পণ করে গর্বিত।

কাচ বলল, আমি লিচ্ছবীদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানি না, আপনি আমাকে আপনাদের এই সুপ্রাচীন বংশ সম্বন্ধে কিছু বলুন।

ভবদেব বললেন, লিচ্ছবীরা সূর্যবংশীয়। মহারাজ দশরথের অষ্টম পুরুষে লিচ্ছবীর জন্ম। আমরা সেই বংশেরই সন্তান। অবশ্য পালিগ্রন্থে আমাদের উৎপত্তির একটু ভিন্ন রকমের ইতিহাস আছে। কাশীরাজের পূজাবলী নামে এক মহিষী ছিলেন। কথিত আছে, তিনি একটি মাংসপিণ্ড প্রসব করেন। সেটি ছিল যমজ সন্তান। দাসী কিছু বুঝতে না পেরে পাছে রানী কষ্ট পান সেজন্যে সেটিকে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেয়। এক সময় এক ঋষি ঐ যমজ ভাইবোনকে জল থেকে তুলে নিয়ে প্রতিপালন করতে থাকেন। পরে তিনি এক গৃহস্থের হাতে ওদের অর্পণ করেন। গৃহস্থ পরম স্নেহে তাদের লালনপালন করতে থাকে। বিদ্যালয়ে যখন তারা পাঠগ্রহণ করত তখন অন্য সব ছেলেরা পিতৃমাতৃহীন বলে তাদের বজ্জিত বা 'বজ্জি' নামে অভিহিত করত। এই 'বজ্জি'-রা পরবর্তীকালে প্রবল পরাক্রান্ত হয়েছিল। মিথিলাতে তারা রাজ্যস্থাপন করে। যমজ ভাইবোনের আকৃতিতে কোনো ভেদ ছিল না বলে ওরা 'নি-ছবি' বা লিচ্ছবী নামে অভিহিত হয়েছিল। জৈনধর্মের শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর এই বংশেরই সন্তান। বুদ্ধ শাক্যসিংহও এই বংশের একটি শাখায় জন্মগ্রহণ করেন। কোশল ও মিথিলায় আমাদেব পূর্বপুরুষেরা এক সময় প্রবল পরাক্রান্ত হয়ে উঠেছিলেন। লিচ্ছবীরা চিরদিনই সাম্যবাদী। বুদ্ধ এবং মহাবীরের সাম্যবাদও এই বংশের দান বলতে পার।

কাচ বলল, লিচ্ছবীদের সাম্যবাদ সম্বন্ধে একটা ধারণা আমাকে দিন।

ভবদেব বললেন, প্রাচীনকালে লিচ্ছবীরা খণ্ডক্ষুদ্র বহু রাজ্যের পত্তন করেছিলেন। তাঁরা ইচ্ছেমতো ধর্মাচারণ করতেন। কেউ ছিলেন জৈন, কেউ বা বৌদ্ধ, আবার কেউ বা বিশুদ্ধ ব্রহ্মবাদী। কিন্তু পরস্পরের মধ্যে কোনো বিবাদ ছিল না। বৈশালীতে এখনকার মত তখনো একটি গণপরিষদ ছিল। সেখানকার প্রবীণ, অভিজ্ঞ সদস্যরা 'বজ্জি' বা লিচ্ছবীদের জন্য যে নিয়ম প্রবর্তন করতেন, তাই নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলত সবকটি লিচ্ছবী রাজ্য। প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাটরাও লিচ্ছবীদের আক্রমণ করতে সাহসী হতেন না। ক্ষুদ্র একটি রাজ্য আক্রান্ত হলে সমস্ত বজ্জিরাজগণ এমন হুঙ্কার করতেন যে আক্রমণকারী পালাবার পথ পেত না।

কাচ বলল, লিচ্ছবীদের ভেতর এ ধরনের একতা সত্যিই প্রশংসনীয়।

ভবদেব বললেন, যতকাল বুদ্ধ তথাগত জীবিত ছিলেন, ততদিন বজ্জিদের ভেতর কেউ বিভেদ ঘটাতে পারেনি। কিন্তু পরে বজ্জিদের মধ্যে বিভেদ ঘটিয়ে তাদের হীনবল করে দেওয়া হয়েছিল। অবশ্য এখন যে

কটি লিচ্ছবী রাজ্য রয়েছে তারা মোটামুটি সংঘবদ্ধ। বৈশালীতে আজও আমরা গণপরিষদের অধিবেশন করে থাকি। সেখানেই আমাদের শুভাশুভ নির্ধারিত হয়।

কাচ বলল, বজ্জিদের ভেতর বিভেদ ঘটল কিভাবে তা জানতে আমার বিশেষ কৌতূহল হচ্ছে।

ভবদেব বললেন, এ বিষয়ে একটি ইতিহাস আছে। মহারাজ বিম্বিসার বুদ্ধের পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি আমাদের লিচ্ছবীকুলেই বিবাহ করেছিলেন। বুদ্ধ তথাগত ভক্ত বিম্বিসারকে 'সেচনক' নামে একটি হস্তী উপহার দেন। তার সঙ্গে দিয়েছিলেন একছড়া অষ্টাদশ রত্নখচিত মালা। বিম্বিসার কনিষ্ঠ পুত্র বেহল্লকে সেগুলি দান করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র অজাতশত্রু পিতার এই কাজে মনে মনে অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ লাভের আট বছর পূর্বে অজাতশত্রু পিতাকে হত্যা করে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। বেহল্লা প্রাণরক্ষা করেন মাতুল বংশ লিচ্ছবীদের আশ্রয়ে গিয়ে। অজাতশত্রু তখন লিচ্ছবীদের শাস্তিবিধানের পথ খুঁজতে থাকেন। তিনি মন্ত্রী বিশ্বাকরকে ডেকে বললেন, তুমি ভগবান বুদ্ধের সমীপে গিয়ে বল, আমি লিচ্ছবীদের বিনাশ করতে চাই। এর উত্তরে তিনি কি বলেন জেনে এস।

মন্ত্রী বিশ্বাকর অজাতশত্রুর কথাগুলি তথাগতের কাছে যথাযথ নিবেদন করলে ভগবান আনন্দের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি লিচ্ছবীদের সাতটি উপদেশ দিয়েছি। তাঁরা সাধারণ সভায় উপস্থিত হয়ে একতার সঙ্গে সবকিছুর মীমাংসা করেন। বয়োবৃদ্ধের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকে তাঁরা ধর্ম বলে মনে করেন। প্রাচীন প্রথাগুলি নষ্ট করতে তাঁরা সবসময়েই বিমুখ। নারীজাতি তাঁদের দৃষ্টিতে অত্যন্ত সম্মানীয়। চৈত্যের পূজা ও অর্হতের সেবা তাঁদের পবিত্র করণীয় বলে তাঁরা মনে করেন। যতদিন বজ্জিরা এই আদর্শে অবিচল থাকবেন ততদিন কেউ তাঁদের সংহতি ভেঙে বিনাশ করতে পারবে না।

বিশ্বাকর ভগবান বুদ্ধের কথাগুলি রাজধানীতে ফিরে এসে অজাতশত্রুকে জানিয়ে দিলেন। ভগবানের পরিনির্বাণের পরে ঐ বিশ্বাকরের চেষ্টাতেই লিচ্ছবীদের মধ্যে বিভেদের বীজ ছড়িয়ে পড়ে। অজাতশত্রু লিচ্ছবীদের কলহের সুযোগে তাঁদের সমৃদ্ধ বৈশালীপুরী ধ্বংস করে ফেলেন। লিচ্ছবীরা নিজেদের রক্ষার জন্য নেপাল, তিব্বত আর লাদাকে আশ্রয় নেন। পরে অবশ্য বৈশালীপুরী পুনর্গঠিত হয়েছিল। সেখানে কালাশোক করেছিলেন বৌদ্ধধর্মের সম্মেলন। এখনো সেই বৈশালী নগরী অক্ষত মহিমায় বিরাজ করছে। মগধের অধিপতিদের সঙ্গে আমাদের যে প্রীতির বন্ধন অটুট আছে তার প্রমাণ তুমিই স্বয়ং।

প্রসন্ন হাসি হাসতে লাগলেন ভবদেব।

কাচ আবেগকম্পিত গলায় বলল, এ বন্ধন চিরদিনই অটুট থাকবে মাতামহ। পিতা যেমন আপনাদের বংশকে মর্যাদা দেখিয়েছেন, সিংহাসনের পরবর্তী অধিকারীরাও অবশ্যই সেই সম্মান দেখাবে বলে আমি মনে করি।

ভবদেব দৌহিত্রের হাত ধরে বললেন, পিতার যোগ্য উত্তরাধিকারী হও, এই কামনা।

মধ্যাহ্নের প্রখর সূর্য অপরাহ্নকে স্পর্শ করে ধীরে ধীরে তার দীপ্তি হারাল। কোমল একটা স্বর্ণাভ জ্যোতি ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে। সাদা আর কালো দুটি অশ্ব চলছিল পাটলীপুত্রের অভিমুখে। আরোহীরা পরস্পর কথা বলছিল। ওরা অরণ্যভূমি পার হয়ে নদীতীরে এসে পৌছল।

ভিল্‌সা বলল, সাবধানে নদী পার হতে হবে যুবরাজ। ইতস্ততঃ ছড়ানো স্তূপীকৃত প্রস্তরখণ্ডে অনভ্যস্ত অশ্বদের পা পিছলে যেতে পারে। আসুন, আমরা অশ্ব থেকে নেমেই নদী পার হই।

এসব অঞ্চল সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ভিল্‌সার কথামত কাচ অশ্ব থেকে অবতরণ করে সাবধানে নদী পার হল। ভিল্‌সা দুটি অশ্বের বল্‌গা একই সঙ্গে আকর্ষণ করে নদীর এপারে এসে উঠল।

কিছু সময়ের ভেতরেই ওরা এসে পৌছল বীণকারের কুটীর-প্রাঙ্গণে। একটি পলাশ বৃক্ষে অশ্ব দুটিকে বেঁধে সেখানে একটি পাথরের স্তূপে বসে রইল ভিল্‌সা। পাশ দিয়ে কলধ্বনি তুলে নদী প্রবাহিত হচ্ছিল।

কুটীর থেকে কোনো বীণার ধ্বনি শুনতে পেল না কাচ। ওর হঠাৎ মনে হলো, মুক্তামালা কি তাহলে জনপদে তার পিতমাতার কাছে ফিরে গেছে!

ও কুটীরের দেহলীতে উঠে দাঁড়াতেই দেখতে পেল এক প্রান্তে চোখ দুটি বন্ধ করে প্রার্থনার ভঙ্গীতে বসে আছেন বীণকার। সামনে রয়েছে গতরাত্রে দেখা সেই ব্রহ্ম-বীণাটি কিন্তু কিশোরী মুক্তামালাকে দেখা গেল না সেখানে।

যতক্ষণ না বৃদ্ধ চোখ খুললেন কাচ দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। কিছু সময়ের ভেতরেই গৃহের এক পার্শ্ব থেকে পাঁয়জোরের মিষ্টি আওয়াজ ভেসে এল । কাচ দেখল, পেতলের ঝকঝকে মাজা একটি কলসীতে জল নিয়ে আসছে মুক্তামালা। দেহলীতে উঠেই সে দেখতে পেল কাচকে। দুজনের মুখেই হাসি ফুটে উঠল।

পদশব্দে চোখ মেলে তাকালেন বীণকার। বললেন, এখানেই তোমাকে বীণা নিয়ে বসতে হবে দিদি।

ঘরের ভেতরে ঢুকতে ঢুকতেই মুক্তামালা বলল, এখুনি আসছি দাদা। তোমার সামনে যিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন তাঁকে দিয়েই আজ শুরু হোক না তোমার বীণার শিক্ষা।

বীণকার এতক্ষণ আত্মস্থ ছিলেন, এখন সচেতন হয়ে উঠলেন।

কাচ এগিয়ে গিয়ে বীণকারকে নত হয়ে নমস্কার করল।

বীণকার উল্লসিত হয়ে বললেন, বীণার প্রতি তোমার আগ্রহ দেখে আমি সত্যই মুগ্ধ হলাম। এতদূর পথ কি করে এলে? আবার কি করেই বা ফিরবে?

কাচ বলল, আপনি চিন্তিত হবেন না। বাইরে আমার অশ্ব বাঁধা রয়েছে, আমার ফিরতে কোনো কষ্টই হবে না।

বৃদ্ধ বীণকার পাঠ দিতে শুরু করলেন। গম্ভীর নাদে বেজে উঠল ব্রহ্মবীণা। কিছুক্ষণের ভেতরেই মুক্তামালা এসে কাচের একটু দূরে উপবেশন করল।

কিছু সময় বীণা বাজিয়ে এবং বীণা সম্বন্ধে কতকগুলি মূল্যবান কথা বলে থামলেন বৃদ্ধ। কাচের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা দুজনে আজ পরপর বীণা বাজাবে, আমি শুনব। তিনি কাচের দিকে বীণা এগিয়ে দিলেন। কোনরকম ভূমিকা না করে কাচ সেই বীণায় সুর বেঁধে নিয়ে বাজাতে লাগল।

কাচ চিরদিনই গভীর স্বভাবের। যে কোন কাজেই তার নিষ্ঠা ও আগ্রহ প্রশ্নাতীত। অসিচালনা, তীরনিক্ষেপ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়ের ধর্মগুলি পালনের সময় কাচ যতখানি আগ্রহ প্রকাশ করে, কাব্য ও সঙ্গীত শ্রবণের সময়েও তার অভিনিবেশ ঠিক ততখানি।

কাচের পরীক্ষা শেষ হলে বীণকার বললেন, তোমার শিক্ষা সঠিক পথেই পরিচালিত হয়েছে। নিষ্ঠা না থাকলে এত অল্পবয়সে তুমি এতখানি দক্ষতা অর্জন করতে পারতে না। আমার শিক্ষাদানের পথ তুমি সুগম করে দিয়েছ।

এবার মুক্তমালার দিকে বীণা এগিয়ে দিল কাচ। মুখ নিচু করে বীণাটি তুলে নিয়ে বাজাতে লাগল মুক্তামালা। দক্ষ বীণকারের কাছে শিক্ষালাভ করেছে সে। তার বীণার ধ্বনি শুনে মনে হলো, রাগ বসন্ত যেন মূর্তির্মান হয়ে উঠেছে। হেমাভ তার দেহকান্তি, পীত অঙ্গবাসে অতি সুশোভিত। অঙ্গে আম্রমঞ্জরীর অলঙ্কার। তার রক্তপদ্ম আঁখির তারায় চাঞ্চল্য। যৌবনমাদলসারা যেন তাদের প্রিয় বসন্তকে আমন্ত্রণ করে আনছে অঙ্গনে প্রাঙ্গণে আর তাদের অন্তরের অন্তঃপুরে।

মুক্তামালা বীণা নামিয়ে রাখলে মুগ্ধ শ্রোতা কাচ ঘনঘন সাধুবাদ দিতে লাগল।

বৃদ্ধ বীণকার বললেন, শিক্ষার কোনো শেষ নেই। ঈশ্বর আকাশে বাতাসে জলে স্থলে সুর ছড়িয়ে দিয়েছেন। যার ধ্যান যত গভীর তার প্রাপ্তিও ততখানি।

এবার নিজেই বীণা তুলে নিয়ে বাজাতে লাগলেন বীণকার। হঠাৎ বাজনা থামিয়ে বললেন, তোমরা দুজনেই যে দুটি রাগ বাজিয়েছ সেই ভূপালী আর বসন্ত নিশার প্রথম প্রহরেই গেয়। কাচ, তোমার ভূপালীর ধ্যানে তার নন্দিত শোভন সুন্দর শ্রীসম্পন্ন মূর্তিটিই ফুটে উঠবে। সে যেন প্রেমাকুল দৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে নায়কের ওপর বর্ষণ করে চলেছে অজস্র পুষ্পদল। এবার দেখ ভূপালীর রূপটি আমি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছি। ভাস্কর যখন কোনো মূর্তি পাথর খোদাই করে সৃষ্টি করেন তখন তাঁর ধ্যানের মধ্যে থাকে ঐ মূর্তির সম্পূর্ণ অবয়ব, এমনকি তাঁর ভাব-ভাবনাও। মুখের হাসিটি ফোটাতে গিয়ে ভাস্করকে নিবিষ্ট হতে হবে

তাঁর ওষ্ঠ এবং ওষ্ঠের পার্শ্ববর্তী রেখাগুলির মধ্যে। চিত্ত একটু বিচলিত হলেই সৃষ্টি হয়ে পড়বে কৃত্রিম। ধ্যানের মূর্তিটিকে সুষ্ঠুভাবে রূপ দিতে গেলে চাই নিষ্ঠা।

কথা থামিয়ে সুরের ইন্দ্রজাল ছড়িয়ে চন্দ্রালোকিত প্রান্তরে নামিয়ে আনলেন লীলা-চঞ্চল ভূপালীকে।

সূক্ষ্ম সুরের যে ঐশ্বর্য বৃদ্ধ বীণকারের সৃষ্টির ভেতর মূর্ত হয়ে উঠেছিল তা গভীরভাবে স্পর্শ করল কাচের অন্তর। সে বীণাটি বাজিয়ে বাজিয়ে বৃদ্ধের শেখানো পদ্ধতিতে অনুশীলন করতে লাগল।

রাত্রি অধিক হবার পূর্বেই উঠে দাঁড়াল কাচ। বলল, আমাকে অনেকখানি পথ যেতে হবে, আজকের মত বিদায় দিন।

বৃদ্ধ পূর্বদিনের মতই দৌহিত্রীকে বললেন, তুমি কাচকে কিছু পথ এগিয়ে দিয়ে এস।

মুক্তামালা পাঁয়জোরের ঝঙ্কার তুলে এগিয়ে চলল কাচের পাশে পাশে।

কাচ হঠাৎ বলল, তোমার 'বসন্ত' অপূর্ব! তুমি যখন বাজাচ্ছিলে তখন আমি একাত্ম হয়ে গিয়েছিলাম বসন্তের রূপের সঙ্গে। শ্রোতার অন্তরকে তুমি কি আশ্চর্য শক্তিতে আকর্ষণ করেছ তা তুমি নিজেই জান না।

রোমাঞ্চিত হল মুক্তামালা। বলল, আজ বাজিয়ে আমি বড় তৃপ্তি পেয়েছি কাচ। আমি যেন ঋতুরাজ বসন্তের আবির্ভাব মনের গভীরে অনুভব করছিলাম। এ অনুভূতি প্রতিদিন আসে না।

কাচ মুক্তামালার কথার অর্থটি উপলব্ধি করে মনে মনে গভীর আনন্দ লাভ করল। সে বলল, আমার 'ভূপালী'র রূপ তোমার কেমন লেগেছে মুক্তামালা?

মৃদু হাসি ফুটে উঠল মুক্তামালার মুখে। সে কোনো মন্তব্য করল না। কিংশুকের নুয়ে পড়া ডাল থেকে অর্ধস্ফুট একটি কুসুম চয়ন করে কাচের হাতে তুলে দিল। পলাশের অরুণ রাগের ছোঁয়া লাগল যুবরাজ সমুদ্রগুপ্তের অন্তরে।

মুক্তামালা বলল, আজ তুমি আসবে তা আমি ভাবতেও পারিনি। কাল কি আমি তোমার আগমন সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারি?

অবশ্যই। যতগুলি দিন আমি মাতুলালয়ে থাকব তোমার সুরসভায় আমার উপস্থিতি ততদিন সুনিশ্চিত থাকবে।

মুক্তামালা হঠাৎ কাচের গলায় প্রলম্বিত হারটিকে স্পর্শ করে বলল, এ মালাটি কিন্তু আমার। কেবল তোমার কাছে আমি গচ্ছিত রেখেছি। এ মালা তোমার কণ্ঠে থাকলে চিরদিনই তুমি মুক্তামালাকে মনে রাখবে।

কাচ বলল, আমি একটি জিনিস আজ তোমার জন্য এনেছি। অতি ক্ষুদ্র সে উপহার। শুধু তোমার হাতেই তুলে দিতে পারি এই সামান্য বস্তুটি। এটিকে তুমি আর আমার হাতে ফিরিয়ে দিও না। যদি কোনো কারণে এটি তোমার কাছে রাখা অসম্ভব হয়ে ওঠে তাহলে ভাসিয়ে দিও ওই নদীর জলে।

কিশোরী মুক্তামালা মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সমুদ্রগুপ্তের মুখের দিকে।

কাচ তার পোশাকের অভ্যন্তর থেকে বের করল সদ্যরচিত তার প্রথম কবিতা। শুক্লা-একাদশীর চন্দ্রালোকে মুক্তামালা সে কবিতা পাঠ করে রোমাঞ্চিত হল। কতক্ষণ নীরবে থেকে মুক্তামালা বলল, তোমার এ উপহার চিরদিনই আমার কাছে গচ্ছিত থাকবে। শুধু জেনে রেখ তোমার কবিতার কন্যাটি কখনো ভুলবে না তার স্রষ্টাকে।

পূর্ণিমা রজনীতে শেষ দেখা হয়েছিল কাচের সঙ্গে মুক্তামালার। সেদিন কাচ ছিল বিশেষভাবে অস্থির আর উদ্বিগ্ন। সে বীণা বাজাতে বাজাতে মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল। এত সত্বর যে মাতুলালয় থেকে তাকে পাটলীপুত্রে ফিরে যেতে হবে তা সে জানত না। নির্দিষ্ট দিনের আগেই পাটলীপুত্র থেকে রাজকর্মচারী এল মহারাজ ভবদেবের কাছে সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের পত্র নিয়ে। মহারাজধিরাজ অচিরেই

পাটলীপুত্রের প্রাসাদ ত্যাগ করে বেরুবেন তাঁর কোনো এক দুর্বিনীত সামন্তরাজাকে শাসন করতে। প্রাসাদ অরক্ষিত হয়ে পড়ার পূর্বেই তিনি পুত্র সমুদ্রগুপ্তকে দিয়ে যেতে চান সমগ্র পাটলীপুত্র রক্ষার ভার।

কন্যা ও দৌহিত্রকে এত স্বল্পদিনের মধ্যে ছেড়ে দিতে ভবদেবের হৃদয় আলোড়িত হচ্ছিল। কিন্তু এ অবস্থায় অবিলম্বে কন্যাকে পতিগৃহে পাঠানোর জন্য তিনি বিশেষভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কৃষ্ণা-প্রতিপদেই স্থির হল যাত্রার লগ্ন। আজ রজনীতে মুক্তামালার সঙ্গে তার শেষ সাক্ষাৎকার। জানে না, আর কোনোদিন সে মুক্তামালাকে দেখবে পাবে কিনা।

বীণাশিক্ষার শেষে মুক্তামালা যখন তার সঙ্গে প্রান্তরে এসে দাঁড়াল তখন সমুদ্রগুপ্ত তাকে জানিয়ে দিল তার পাটলীপুত্র যাত্রার সংবাদ।

সেদিন পূর্ণচন্দ্রের আলোকে বিদায়-মুহূর্তটি হয়ে উঠেছিল বিষাদ-করুণ। উভয়ের নয়ন সেদিন পূর্ণ হয়েছিল বিচ্ছেদের অশ্রুজলে।

অশ্বে আরোহণ করে সমুদ্রগুপ্ত বলল, যখনই অঙ্কে বীণা নিয়ে আমি সুরসাধনা করব তখনই তুমি সুরের দূতী হয়ে আমার দৃষ্টির সামনে আবির্ভূত হবে।

মুক্তামালা অশ্বারূঢ় সমুদ্রগুপ্তের একখানা হাত ধরে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, যদি বিচ্ছেদই ঘটবে তাহলে তোমার সঙ্গে আমার এমনভাবে দেখা হল কেন কাচ?

মুক্তামালার এই উচ্চারণ রুদ্ধ কণ্ঠের দ্বার দিয়ে প্রকাশের পথ খুঁজে পেল না।

রাজধানীতে ফিরে আসার পর সমুদ্রগুপ্ত পিতার চরণবন্দনা করে উঠে দাঁড়াল। চন্দ্রগুপ্ত পুত্রের শির চুম্বন করে সস্নেহ আশীর্বাদ জানালেন।

কাচ বলল, আমার একটি অভিপ্রায় আছে, যদি অনুমতি দেন তাহলে নিবেদন করি।

চন্দ্রগুপ্ত বললেন, স্বচ্ছন্দে।

আপনি রাজধানীতে অবস্থান করুন, দুর্বিনীতকে শাসন করার ভার দিন আমার ওপর।

চন্দ্রগুপ্ত বিচলিত হয়ে বললেন, তোমার ক্ষমতার ওপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে কাচ। কিন্তু তুমি বয়সে একান্তই তরুণ। এ অবস্থায় তোমাকে অনুমতি দিতে গিয়ে আমি দ্বিধাগ্রস্ত হচ্ছি।

কাচ বলল, যদি সুযোগ না পাই তাহলে আপনার অর্জিত এত বড় সাম্রাজ্যকে কোনোদিনই আমাদের দ্বারা রক্ষা করা সম্ভব হবে না। আপনি মুক্তমনে আমাকে আশীর্বাদ করুন, আমি অচিরে আপনার কর্ম সম্পাদন করে ফিরে আসব।

সমুদ্রগুপ্ত দুর্বার বেগে ঝাঁপিয়ে পড়লেন বিদ্রোহী সামন্ত নৃপতিটির ওপর। যুদ্ধের তৃতীয় দিবসে সমুদ্রগুপ্তের তীক্ষ্ণ শরে বিদ্ধ হয়ে সামন্ত নৃপতি রণদেব মৃত্যুবরণ করলেন।

মৃত্যুর পূর্বে ইঙ্গিতে তিনি সমুদ্রগুপ্তকে আহ্বান করলেন তাঁর সমীপে। সমুদ্রগুপ্ত নিকটে গেলে তিনি তার একটি হাত নিজের দুটি হাতের মধ্যে ভরে নিয়ে বললেন, আমি স্বাধীনভাবে বাঁচতে চেয়েছিলাম, তাই সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে কুণ্ঠিত হইনি। তোমার বীরত্ব দেখে আমি একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেছি। আমার পুত্র থাকলে আজ তোমারই বয়সী হত। তোমার হাতে রইল আমার এই ক্ষুদ্র রাজ্যটি রক্ষার ভার। রণদেব কথা কটি বলে চিরদিনের মতো নীরব হয়ে গেলেন।

সমুদ্রগুপ্ত রাজকীয় মর্যাদায় সামন্ত নৃপতির সৎকারের ব্যবস্থা করল। রাজগৃহের প্রতিটি নরনারী শিশু বৃদ্ধ সকলের প্রতি সদাচার প্রদর্শন করল। রাজ্যের প্রজাকুল সমুদ্রগুপ্তের হৃদয়বত্তা ও সুভদ্র আচরণে এতই মুগ্ধ হল যে যুবরাজের প্রত্যাবর্তনের সময় তারা পথের দুই পার্শ্বে দাঁড়িয়ে জয়ধ্বনিসহ পুষ্প বর্ষণ করতে লাগল।

পুত্রের পারদর্শিতায় সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত অত্যন্ত প্রীত হলেন। তিনি অমাত্যবর্গকে আহ্বান করে যুবরাজ সমুদ্রগুপ্তকেই চিহ্নিত করলেন ভাবী সম্রাটরূপে।

চন্দ্রগুপ্ত নাগবংশীয় কন্যা দত্তাদেবীকে ভাবী সম্রাটের বধূরূপে মনোনীত করেছিলেন। এই বৈবাহিক

সম্পর্ক স্থাপনেব একটি উদ্দেশ্য ছিল। উত্তর ভারতে নাগবংশীয়গণ ছিলেন প্রবল পরাক্রমশালী। দিগ্বিজয়ের পথে তাঁরা যাতে কোনোরূপ বাধা সৃষ্টি করতে না পারেন সেদিকে লক্ষ্য রেখেই এই সম্বন্ধ-বন্ধনটিকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত।

এই প্রস্তাব নতমস্তকে মেনে নিতে হয়েছিল পুত্র সমুদ্রগুপ্তকে। কিন্তু আবেগ-মথিত হৃদয়ে এক রাত্রিতে কাচ গিয়েছিল মহারানী কুমারদেবীর কাছে তার উদ্বেলিত অন্তরের একটি কথা জানাতে।

পুত্রকে দেখামাত্রই কুমারদেবী অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। তবু উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, শরীরের কুশল তো?

মায়ের সামনে একটি আসনে উপবেশন করল কাচ। বলল, শরীর সুস্থই আছে মা।

কুমারদেবী বললেন, বিবাহের লগ্ন এগিয়ে আসছে, এসময় শরীরটাকে সুস্থ রাখা দরকার।

কিভাবে তার মনের গোপন বাসনাটি মায়ের কাছে নিবেদন করবে তা ভেবে পাচ্ছিল না কাচ। এক সময় মনের ভেতর সঞ্চিত আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটল। কাচ বলল, পিতার মত আমি যদি কোনো লিচ্ছবী কন্যাকে বিবাহ করতাম তাহলে আমাদের মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পেত মা। লিচ্ছবীদের মধ্যে রয়েছে অতি প্রাচীন বংশের গৌরব। তাঁরাও পরম শক্তিশালী। তাঁদের সহায়তা সব সময়েই আমাদের কাম্য।

কুমারদেবী বললেন, রাজনীতির আমি কিছু বুঝি না কাচ কিন্তু মহারাজের কথা থেকে আমি যতটুকু জানতে পেরেছি তাতে সমস্ত প্রভাবশালী রাজবংশের সঙ্গে তিনি বৈবাহিক সূত্রে গুপ্তবংশকে বেঁধে ফেলতে চান। এই চিন্তা থেকেই তিনি নাগবংশীয় কন্যাকে গুপ্তবংশের বধূরূপে নির্বাচন করেছেন।

মুক্তামালার চিন্তায় সমুদ্রগুপ্তের হৃদয় উদ্বেলিত হলেও জননীর কাছে তার গোপন অভিসারের কথাটা প্রকাশ করতে পারল না। পিতার প্রবল ব্যাক্তিত্ব সেই মুহূর্তে তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। সে ভাবল, মুক্তামালাকে সে গভীরভাবে ভালবাসে সত্য কিন্তু তাকে সে গুপ্তবংশের বধূরূপে গ্রহণ করবে এমন আশ্বাস দেয়নি। তবে যদি কোনো দিন সুযোগ আসে তাহলে সে এ ভালবাসার অবশ্যই প্রতিদান দেবে।

কাচ নীরবে বসে আছে দেখে কুমারদেবী বললেন, দত্তাদেবী বধূ হয়ে আমাদের প্রাসাদে এলে সমস্ত প্রাসাদই আলোয় ভরে উঠবে কাচ। আমি যতটুকু শুনেছি, সৌন্দর্যের সঙ্গে বহু গুণের সমাবেশ ঘটেছে তার মধ্যে। পুত্রবধূর সন্ধান করতে গিয়ে তোমার পিতা কেবলমাত্র রাজনৈতিক বন্ধনের কথাই ভাবেননি, নারী হিসেবে তার মর্যাদা কতখানি সে পরীক্ষাও করেছেন।

কাচ এখন মুখ তুলে মায়ের মুখের দিকে তাকাল। নববধূর কিছু প্রসঙ্গ সে এখন শুনতে চায়।

কুমারদেবী বলে চললেন, দূতমুখে তোমার পিতা নাগবংশীয় কন্যা দত্তার কথা শুনেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাকে প্রাসাদে আনার কথা তিনি চিন্তা করলেন। এক সামন্ত রাজা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করলেন মধ্যস্থের ভূমিকা। তিনি প্রথমে তাঁর অত্যন্ত অনুগত দুজন বস্ত্রব্যবসায়ীকে নাগরাজের প্রাসাদে পাঠালেন। মূল্যবান শাটিকা দেখবার জন্য অন্তঃপুরে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। চীনাংশুক, মসলিন, ক্ষৌম, বেনারসীর সম্ভার নিয়ে গিয়েছিল বস্ত্রব্যবসায়ীরা। তাদের অন্তঃপুরে ডেকে নিয়ে গেল পরিচারিকার দল। সেখানেই তারা দেখতে পেল মহারানী আর তাঁর কন্যাকে। উৎসবের সজ্জায় সজ্জিত ছিল না কন্যা। তাই তার স্বাভাবিক রূপটি দেখতে কোনো অসুবিধে হয়নি ব্যবসায়ীদের। তাছাড়া ওরা আর একটি জিনিস লক্ষ করল, দত্তা ব্যবসায়ীদের কাছে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে প্রতিটি কাপড়ের কুলজি-ঠিকুজির সন্ধান করে নিচ্ছে। মহারানী কিংবা কুমারী দত্তা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কোনোরকম দরদাম করেননি। পছন্দসই শাটিকাগুলি মহারানী একদিকে সরিয়ে রেখে বললেন, বল, কত মূল্য দিতে হবে?

ব্যবসায়ীরা একটা মূল্য বলল। মহারানী বিনাবাক্যে তাদের হাতে সেই অর্থ তুলে দিলেন।

কাচ বলল, এতে মহারানীর বিবেচনার কি পরিচয় পাওয়া গেল মা?

ভাল লাগার বস্তু অমূল্য। সেখানে তুচ্ছ দরদামের স্থান নেই। তারপর শোন, বস্ত্রগুলো মহারানী কন্যার হাতে তুলে দেওয়ামাত্র কন্যার মুখে কৃতজ্ঞতার ছবি ফুটে উঠল। সে সঙ্গে সঙ্গে জননীর চরণ-বন্দনা করে সস্মিত মুখে উঠে দাঁড়াল।

কাচ জানতে চাইল, এতে কি প্রমাণিত হয় মা?

মহারানী বললেন, আমরা যখন আহার্য গ্রহণ করি তখন তা প্রথমে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিবেদন করতে হয়। এর ভেতর দিয়ে যিনি দাতা তাঁর প্রতি আমরা জানাই আমাদের কৃতজ্ঞতা। বস্ত্রপ্রাপ্তির পর দত্তাও তার জননীকে সেই কৃতজ্ঞতাটুকুই নিবেদন করেছে। এতে তার সম্ভ্রান্ত মনের একটি সুন্দর পরিচয় পাওয়া গেছে।

তরুণ সমুদ্রগুপ্ত ধীরে ধীরে ভাবীবধূর প্রতি অনুরক্ত হল। পিতার গভীর বিবেচনার প্রতি তার অকুণ্ঠ বিশ্বাস জন্মাল। সে আর কোনওরকম প্রশ্ন করল না। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এই অন্তঃপুরের মর্যাদারক্ষার সম্পূর্ণ ভার তোমার উপরেই ন্যস্ত রয়েছে মা। তুমি এবং পিতা, প্রাসাদ এবং রাজ্যের কল্যাণের জন্যে যা কিছু বিবেচনা করবে আমি সেটা মাথা পেতে গভীর আনন্দে গ্রহণ করব।

মহারানী আবেগজড়িত কণ্ঠে বললেন, তা আমরা জানি কাচ। তোমার পিতা তাঁর এতগুলি পুত্রের মধ্যে তোমাকে যোগ্যতম বিবেচনা করেন, এটা তোমার পক্ষে কম গৌরবের কথা নয়।

কাচ প্রসন্ন মুখে মাথা নত করে মহারানীর বিশ্রামাগার থেকে নিষ্ক্রান্ত হল। কিন্তু যখনই কাচের হাত কণ্ঠের মুক্তামালাটি স্পর্শ করত তখনই একটি কিশোরীর জন্য তার প্রাণ আকুল হয়ে উঠত। বারবার একটি কথা সে উচ্চারণ করত মনে মনে, তোমাকে ভুলিনি মুক্তামালা, কোনোদিনও ভুলতে পারব না।

চিরঅস্তমিত হয়েছেন সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত। পাষাণভার নিয়ে কুমারদেবী বিচরণ করেন অন্তঃপুরে। মহারাজের অবর্তমানে সম্রাট হলেন পুত্র সমুদ্রগুপ্ত। জননীর প্রতি-মুহূর্তের আশীর্বাদকে তিনি মনে করতে লাগলেন তাঁর রক্ষাকবচ।

নাগবংশীয়দের সঙ্গে পূর্বকালে লিচ্ছবীদের কোনো কোনো স্থানের আধিপত্য নিয়ে সংঘর্ষ হয়েছিল, কিন্তু গুপ্তসম্রাটের অন্তঃপুরে আজ যেন সে বিবাদের অবসান ঘটল। লিচ্ছবীকন্যা কুমারদেবী নাগরাজকন্যা দত্তাদেবীকে পরম আদরে নিজবক্ষে স্থান দিলেন। কুমারদেবীর স্নেহে অভিভূত দত্তা ধীরে ধীরে ভুলে গেলেন নিজের জননীর বিচ্ছেদ-দুঃখ।

একদিন কুমারদেবীর বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ কবলেন সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত। কুমারদেবী দেখলেন পুত্রের পশ্চাতে রয়েছে বধূ। জননীর পাদবন্দনা করে দুজন উঠে দাঁড়াতেই কুমারদেবী কুশল জিজ্ঞাসা করে উপবেশনের আসনের দিকে ইঙ্গিত করলেন।

সম্রাট বললেন, নতুন মুদ্রার প্রচলন করা হল মা।

হঠাৎ চমকে উঠলেন কুমারদেবী। তাঁর মনে পড়ে গেল সদ্যপ্রয়াত স্বামীর কথা। সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত নতুন স্বর্ণমুদ্রা প্রচারের পরিকল্পনা নিয়েছিলেন সংগোপনে। পরে সেই মুদ্রা এনে তাঁকে দেখিয়ে অবাক করে দিয়েছিলেন। মুদ্রার একদিকে ছিল মহারাজ ও মহারানীর যুগল আলেখ্য। আজ তেমনি করে পুত্র এল তার প্রচলিত মুদ্রাটি দেখাতে। তাঁর মনে পড়ল পিতৃবংশের কথা। সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত বলেছিলেন, তোমাকে আমার বংশের বধূ করে এনেছি সেটা আমার গৌরব। তাই মুদ্রায় তোমার প্রতিমূর্তি উৎকীর্ণ করে আমি তোমার ভেতর দিয়ে লিচ্ছবীকুলকেই সম্মান জানালাম।

কুমারদেবী ভাবনায় ছেদ টেনে দিয়ে বললেন, মুদ্রাটি আমাকে একবার দেখাতে পার কাচ?

সম্রাট বললেন, সঙ্গেই মুদ্রাটি এনেছি মা।

সমুদ্রগুপ্ত মুদ্রাটি জননীর হাতে তুলে দিলেন।

কুমারদেবী গভীর আগ্রহে নেড়েচেড়ে দেখতে লাগলেন।

একদিকে বীণা বাজাচ্ছেন সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত, অন্যদিকে দত্তাদেবীর মূর্তির পরিবর্তে যে কথাটি উৎকীর্ণ ছিল তা পড়ে গভীর আনন্দে ভরে উঠল জননীর মন। লেখা ছিল, 'লিচ্ছবয়ঃ'। সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত লিচ্ছবীদের দৌহিত্র বলে নিজেকে পরিচয় দিতে গর্ব অনুভব করেছেন।

কুমারদেবী বধূর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, নতুন মুদ্রাটি তোমার কেমন লেগেছে মা?

দত্তাদেবী বললেন, কোলে বীণা নিয়ে সম্রাট বাজাচ্ছেন, এই চিত্র উৎকীর্ণ করে আপনার পুত্র রাজ্যশ্রীর

সঙ্গে সঙ্গে কলালক্ষ্মীকেও সম্মান জানিয়েছেন। তাছাড়া রাজনীতিতেও যে তিনি কতখানি দক্ষ সে পরিচয়ও রেখেছেন এই মুদ্রা পরিকল্পনায়।

সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগলেন মহিষী দত্তাদেবীর বিশ্লেষণ।

. কুমারদেবীও কান পেতে রইলেন, বধূর মুখ থেকে ব্যাখ্যা শোনার জন্য।

দত্তাদেবী একটু থেমে বলতে লাগলেন, সম্রাট যে লিচ্ছবীদের ভোলেননি তার পরিচয় তিনি 'লিচ্ছবয়ঃ' কথাটির ভেতরেই জানিয়ে দিয়েছেন।

কুমারদেবী বললেন, কিন্তু মা, তুমি নাগবংশীয় কন্যা, তোমার চিত্র উৎকীর্ণ থাকলে তোমার পিতৃকুল অত্যন্ত আনন্দিত হতেন।

দত্তাদেবী বললেন, আমি তো গুপ্তকুলের বধূ হয়েই এসেছি মা, সে সম্মান আগেই আপনারা আমাকে দিয়েছেন। এ বিবাহে আমার পিতৃকুল অত্যন্ত পরিতৃপ্ত।

সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত মহিষীর বিশ্লেষণে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। গুপ্তবংশীয়রা যে লিচ্ছবী ও নাগবংশীয়কে একই প্রীতির বন্ধনে বাঁধতে পেরেছেন এ কথা ভেবে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করলেন সম্রাট।

কুমারদেবীর পিতা ছিলেন বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক। বহু চৈত্য ও বিহার তিনি স্থাপন করেছিলেন। কন্যা পিতৃগৃহে নিত্য অর্হতদের সেবা করতেন। কিন্তু পতিগৃহে এসে তাঁর ধর্ম পরিবর্তিত হয়ে গেল। তিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান মানতে শিখলেন। তবুও তাঁর অন্তরের গভীরে ছিল প্রতি জীবের প্রতি অসামান্য মমতা। বুদ্ধের একটি বাণী তার অন্তরে খোদিত হয়ে গিয়েছিল, মাতা যেমন করে নিজের পুত্রের প্রতি স্নেহ-দৃষ্টিপাত করেন ঠিক তেমনি বিশ্বের সকল জীবের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে।

কুমারদেবীর অন্তরের গভীরে বৌদ্ধধর্মের প্রতি যে অনুরাগ ছিল তা সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের অজ্ঞতা ছিল না। তিনি রাজধানী থেকে কিছুদূরে গঙ্গার অপর পারে এক পরিত্যক্ত জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে একটি ক্ষুদ্রাকার চৈত্য নির্মাণ করে দেন। এই চৈত্যের প্রতিষ্ঠা-দিবসকে উপলক্ষ করে তিনি কোনোরূপ আড়ম্বর প্রদর্শন করেননি। দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের রাজন্যবর্গ সে সময় ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করছিলেন। একমাত্র লিচ্ছবীদের একাংশ ছিলেন বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী। সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মনে করতেন, ব্রাহ্মণ্যধর্মের পরিকল্পিত দেবগণ অজস্র শক্তির আধার। তাই ব্রাহ্মণ্যধর্মের উপাসনা করলে অন্তরে সঞ্চিত হবে গভীর শক্তি। তাছাড়া একই ধর্মের বন্ধনে আবদ্ধ রাজাদের সঙ্গে নানাবিধ ধর্মানুষ্ঠানে একত্রে মিলিত হওয়া সম্ভব।

কেবলমাত্র মহারানী কুমারদেবীর প্রীতি সম্পাদনের জন্য মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত লোকালয়ের বহির্ভাগে জঙ্গলাকীর্ণ ভূখণ্ডে এই চৈত্যের প্রতিষ্ঠা করেন। মহারানী কুমারদেবী গভীর চন্দ্রালোকিত রাত্রে, যখন প্রায় সমস্ত নগরী সুপ্তির কোলে আশ্রয় নিত, তখন গঙ্গা পার হয়ে ঐ স্থানে গমন করতেন। অবশ্য বিশেষ বিশেষ বৌদ্ধ-উৎসব উপলক্ষেই তিনি তথাগতকে অনুধ্যান ও পূজা নিবেদন করতে যেতেন ঐ চৈত্যে। তাঁর সঙ্গে প্রায়ই থাকত কন্যা অপালা। রাজকুমারী অপালা বৌদ্ধধর্মের প্রতি বিশেষ অনুরাগী হয়ে পড়েছিল। এটি ছিল আজন্ম মাতৃসান্নিধ্যের প্রভাব। কুমারদেবী বুদ্ধের জন্মজন্মান্তরের কাহিনীগুলি জানতেন। তিনি অপলোকে সেইসব কাহিনী শৈশবকাল থেকেই শুনিয়েছিলেন। সে কারণে আশৈশব বুদ্ধের প্রতি অন্তরে অনুরাগ পোষণ করত অপালা।

রাজ্যে দস্যু-তস্করের উপদ্রব না থাকলেও মহারানীর যাত্রাকালে একজন নির্ভরযোগ্য দেহরক্ষী থাকত তাঁর সঙ্গে। সে ছায়ার মতো অনুসরণ করত মহারানী ও রাজকুমারীকে। চৈত্যের অনতিদূরে একটি বিশাল পিপ্পলী বৃক্ষের তলায় সে তার কোষবদ্ধ তরবারি নিয়ে অপেক্ষা করত। পূজা সমাপন করে সকন্যা মহারানী যখন নৌকাতে ফিরতেন তখন সেই বলিষ্ঠ যুবা পুরুষটি অনুসরণ করত তাঁদের।

বহু পূর্বকাল থেকে পাটলীপুত্রের সন্নিহিত কোনো কোনো অঞ্চলে কয়েক ঘর লিচ্ছবী বাস করত। তারা ছিল দরিদ্র, কিন্তু আত্মসম্মানবোধ ছিল তাদের প্রবল। তারা জানত মহারানী কুমারদেবী লিচ্ছবী-কন্যা, কিন্তু সেই সুযোগের পথ ধরে তারা কখনো সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা করেনি।

চৈত্য নির্মাণের পর মহারানী অনেক অনুসন্ধান করে এক লিচ্ছবী যুবককে আবিষ্কার করলেন। যুবকটি মগধের একটি উচ্চ বিদ্যায়তনে বৌদ্ধশাস্ত্রের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত ছিলেন। পালি গ্রন্থ থেকে তিনি যখন কোনো কিছু পাঠ করে ব্যাখ্যা করতেন তখন অন্য বিষয়ের ছাত্রেরাও ভিড় করে আসত।

যুবক শিক্ষকটি কেবল পালি নয়, সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্রে বিশেষ বুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। তিনি যে একজন পণ্ডিত, একথা লোকমুখে শোনামাত্রই সে স্থান পরিত্যাগ করতেন যুবক উদয়ভদ্র।

জ্ঞানভিক্ষু এই মানুষটি শৈশবেই জননীর স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। পিতা কিছুটা বিবাগী হয়েই পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে তাম্রলিপ্তে যাত্রা করেন। সেখানে বালক আপন মেধা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে অল্পকালের মধ্যেই আয়ত্ত করে বহু প্রকার বিদ্যা।

কর্মরত অবস্থায় পিতার মৃত্যু হলে পুত্র শিক্ষা সমাপ্ত করে পরবাস থেকে ফিরে আসেন পাটলীপুত্রে।

জ্ঞান অগ্নির মত, তাকে কোনও কিছুতেই ঢেকে রাখা সম্ভব নয়। উদয়ভদ্র প্রথম দিকে নিজেকে গোপন রাখার চেষ্টা করতেন কিন্তু তাঁর জ্ঞান অগ্নির মত সমস্ত আচ্ছাদনকে ভেদ করে প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছিল।

মহারানী কুমারদেবী অন্তঃপুরে বসেও শুনতে পেলেন উদয়ভদ্রের কথা। তিনি মহারাজের কাছে অনুরোধ জানালেন, তাঁর নবনির্মিত চৈত্যের ভার যেন উদয়ভদ্রের ওপর অর্পণ করা হয়। অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি চৈত্যের কর্মও সম্পাদনা করবেন। এজন্যে বিশেষ কোনো বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে আমন্ত্রণের প্রয়োজন নেই।

মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত তাঁর রাজসভায় উদয়ভদ্রকে আহ্বান না করে এক সন্ধ্যায় পরিভ্রমণছলে উদয়ভদ্রের আস্তানায় উপস্থিত হলেন।

উদয়ভদ্র তখন প্রজ্জ্বলিত প্রদীপের সামনে বসে একাগ্রচিত্তে অধ্যয়নে ব্যস্ত ছিলেন।

মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত উন্মুক্ত দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে বললেন, জ্ঞানভিক্ষু, আমার নমস্কার গ্রহণ করুন।

দুবার একই বাক্য উচ্চারণ করলেন মহারাজ। পুঁথি থেকে ধীরে ধীরে দৃষ্টি সরিয়ে বাইরে তাকালেন উদয়ভদ্র।

চন্দ্রগুপ্তকে নানা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে দেখেছেন তিনি। তাই মহারাজকে চিনতে তাঁর বিন্দুমাত্র অসুবিধে হল না।

অনুদ্বিগ্ন চিত্তে একখানি উপবেশনের আসন বিছিয়ে দিয়ে উদয়ভদ্র মহারাজ চন্দ্রগুপ্তকে আহ্বান জানালেন।

মহারাজ কুটীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে আসন গ্রহণ করলেন।

প্রথমে কথা বললেন উদয়ভদ্র, মহারাজের কি সেবা আমি করতে পারি?

সস্মিত মুখে মহারাজ বললেন, একটি ভিক্ষা নিয়ে এসেছি আপনার কাছে।

প্রসন্ন হাসিতে উদ্ভাসিত হল উদয়ভদ্রের মুখমণ্ডল। বললেন, এ বড় আশ্চর্য! দাতা এসেছেন গ্রহীতার গৃহে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে!

চন্দ্রগুপ্ত বললেন, পার্থিব বস্তু দান করি আমি কিন্তু আপনার দান অপার্থিব বস্তু নিয়ে! আমার দানে দেহের পুষ্টি হতে পারে, কিন্তু আপনার দানে তৃপ্ত হয় আত্মা।

বিনীত নমস্কারে বললেন উদয়ভদ্র, আপনার এ ধরনের প্রশংসার যোগ্য পাত্র আমি নই মহারাজ।

চন্দ্রগুপ্ত বললেন, আমি বিষয়াসক্ত ঠিক কিন্তু জ্ঞানের আলোকে প্রদীপ্ত মানুষ আমার দৃষ্টিতেও ধরা পড়ে।

হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন উদয়ভদ্র। বললেন, মহারাজ, আমার পর্ণকুটীরে আজ আপনার শুভাগমন হয়েছে, আমাকে অতিথি সৎকারের সামান্য সুযোগ দিন। একটি সুগন্ধযুক্ত সুপক্ক বিল্ব আর একপাত্র সুশীতল পানীয় আপনার সেবায় নিবেদন করতে চাই।

মহারাজ বললেন, আমি সানন্দে গ্রহণ করব, কিন্তু তার পূর্বে আমার প্রার্থনাটি মঞ্জুর করতে হবে।

উদয়ভদ্র বললেন, একেবারে অক্ষম না হলে অবশ্যই আপনার প্রার্থনা পূর্ণ হবে।

মহাবাজ কালবিলম্ব না করে চৈত্য নির্মানের কথাটি প্রকাশ করলেন। তিনি জানালেন, মহারানীর আগ্রহে এ চৈত্য নির্মিত হয়েছে। তিনি চান না সেখানে জনসমাগম হোক। তাই গঙ্গাপারে জঙ্গলাকীর্ণ একটি স্থানে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ক্ষুদ্র চৈত্যটি। মহারানী বৌদ্ধ-উৎসবের বিশেষ লগ্নগুলিতে সেখানে পূজা নিবেদন করতে চান। সেই পবিত্র অনুষ্ঠানগুলিতে আপনার উপস্থিতি তিনি কামনা করেন।

উদয়ভদ্র আবেগে বললেন, জননীর ইচ্ছা অপূর্ণ থাকবে না। আমি এ দায়িত্ব সানন্দে গ্রহণ করব। তবে মহারাজ...।

এরপর আর 'তবে'র কি প্রয়োজন জ্ঞানভিক্ষু?

আছে মহারাজ। কর্মের বিনিময়ে পারিশ্রমিকের প্রয়োজন।

চন্দ্রগুপ্ত সঙ্গে সঙ্গে বললেন, অবশ্যই তা আপনি পাবেন।

উদয়ভদ্র বললেন, আমার পারিশ্রমিক 'মহারানীর স্নেহ'। এর বেশী কোনো পার্থিব বস্তু আমি গ্রহণ করব না।

উদয়ভদ্রের কথায় অভিভূত হলেন মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত। বললেন, মহারানী উপস্থিত থাকলে তিনি নিজমুখে এই পারিশ্রমিক স্বীকার করে নিতেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর হয়ে আমিই স্বীকার করছি।

উদয়ভদ্র বললেন, সংসারে আমি সম্পূর্ণ একাকী, তাই সাংসারিক প্রয়োজন আমার নিতান্তই নগণ্য। যে প্রয়োজনটুকুর জন্য এই হৃদয়ের ভেতর হাহাকার বয়ে বেড়াতাম তারই প্রাপ্তির আশ্বাস আজ পেয়ে গেলাম মহারাজ।

সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত এই নির্লোভ যুবা পুরুষটির সঙ্গে দেখা করে মনে মনে বড় পরিতৃপ্তি লাভ করলেন। যুবকটি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় সাধারণ মানুষের মত যে আপ্লুত হয়ে পড়েননি সেজন্য তিনি ক্ষোভের পরিবর্তে পরম আনন্দ অনুভব করলেন।

প্রিয় পুত্র সমুদ্রগুপ্তকে কাছে ডেকে সেইদিনই সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত উদয়ভদ্রের কথা বললেন। তাঁর এত বড় রাজ্যে নির্লোভ এই যুবকটি ধ্রুব নক্ষত্রের ন্যায় একাকী জেগে রয়েছে স্থির, অচঞ্চল। তাঁকে একদিন বিদায় নিতে হবে সংসার থেকে, সেদিন যেন কাচ এই যুবককে উপযুক্ত মর্যাদা দিতে না ভোলে।

সমুদ্রগুপ্ত বললেন, পিতা, এমন একজন মানুষ আমাদের গুপ্ত সাম্রাজ্যের গৌরব বলে আমি মনে করি। যাঁকে আপনি সম্মান দেখিয়েছেন তিনি চিরদিনই থাকবেন আমার নমস্য ও পরম বন্ধু।

বৈশাখী পূর্ণিমায় বুদ্ধ-জয়ন্তী উৎসব চলেছে সমস্ত বৌদ্ধ জগতে। কাষায় বস্ত্র পরিহিত মুণ্ডিত মস্তক সন্ন্যাসীর দল বাদ্যধ্বনি সহকারে পরিক্রমা করছেন পাটলীপুত্র নগরী। মঠে, বিহারে, চৈত্যে আজ উৎসবসজ্জা। নগরীর প্রতিটি গৃহদ্বার, গবাক্ষ উন্মুক্ত। যে কোনো ধর্মাবলম্বী মানুষ পথের দুই পার্শ্বে ভিড় করে দাঁড়িয়ে শ্রমণদের কণ্ঠে বুদ্ধ-বন্দনা-স্তোত্র শ্রবণ করছে।

এ বৎসর অতিরিক্ত একটি আকর্ষণ সংযুক্ত হয়েছে। এ অঞ্চলের বৌদ্ধরা হিমালয়ের উত্তরে অবস্থিত গোদানের (মধ্য এশিয়ায় অবস্থিত খোটান রাজ্য) মত বুদ্ধের রথযাত্রার আয়োজন করেছে। একদল শ্রমণ বুদ্ধ-বন্দনা করে চলে যাবার পর জনতার মাঝে একটা উল্লাসধ্বনি উঠল। সবার কণ্ঠে একই শব্দ, রথ আসছে, রথ আসছে।

প্রস্তরনির্মিত রাজপথে ঘর্ঘর শব্দ তুলে রথ এগিয়ে আসতে লাগল। কাষ্ঠনির্মিত অতি সুশোভিত ত্রিতল রথ। নানা বর্ণের পুষ্পসজ্জায় অতীব মনোহর দর্শন। রথের উপরিভাগ চৈত্যের আকারে পরিকল্পিত। শুভ্র পুষ্পনির্মিত চৈত্যটি এমনই দৃষ্টিনন্দন যে কৌতূহলী জনতা মুহুর্মুহু জয়ধ্বনি দিতে লাগল। রথের মধ্যভাগটি বেশ প্রশস্ত। সেখানে কাষ্ঠনির্মিত এক ধ্যানমগ্ন বুদ্ধমূর্তি উপবিষ্ট। দক্ষ শিল্পী তথাগতের করুণাঘন অবয়বখানি আশ্চর্য নিপুণতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। নিম্নভাগে রথারূঢ় সন্ন্যাসীর দল বাদ্যধ্বনিসহ পূজার্চনায় মগ্ন।

রথ আকর্ষণ করে নিয়ে চলেছিলেন কাষায় বস্ত্র পরিহিত মুণ্ডিতমস্তক শ্রমণেরা। তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন শুভ্র বস্ত্র পরিহিত ভক্ত ও অনুরাগীবৃন্দ।

একটি জলপূর্ণ কলস থেকে মধ্যে মধ্যে পথের ধূলিতে জলসিঞ্চন করতে করতে সর্বাগ্রে চলেছিলনে বৌদ্ধশাস্ত্রবিশারদ উদয়ভদ্র। একটি কলস জলশূন্য হলে রথের অভ্যন্তর থেকে আর একটি জলপূর্ণ কলস সংগ্রহ করে নিচ্ছিলেন তিনি।

উদয়ভদ্রের পরিধানে ছিল শুভ্র বসন। উর্ধ্ব অঙ্গে ছিল একখানি পীতবর্ণ রঞ্জিত উত্তরীয়। কণ্ঠে দুলছিল শুভ্র মল্লিকার একটি মালা। দীপ্ত ললাট, আয়ত নয়ন, অতি অপূর্ব প্রশান্ত মুখশ্রী।

শোভাযাত্রা পাটলীপুত্রের পরিত্যক্ত, কাষ্ঠনির্মিত মৌর্যযুগের অপূর্ব প্রাসাদটি অতিক্রম করে চলল। গুপ্তসম্রাট চন্দ্রগুপ্ত নতুন প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন, কিন্তু শোন ও গঙ্গার সঙ্গমভূমিতে নির্মিত প্রাচীন প্রাসাদটির রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিয়েছিলেন তিনি।

মগধের বৌদ্ধমঠে যে সকল শ্রমণ অবস্থান করতেন তাঁর সম্রাট অশোকের যুগের ঐ প্রাসাদটিকে পবিত্র তীর্থভূমির মর্যাদা দিতেন।

শোভাযাত্রা মহারাজাধিরাজ চন্দ্রগুপ্তের প্রাসাদ-সমীপে উপস্থিত হল। জনতার জয়ধ্বনিতে তখন রাজপথ মুখরিত। বহুতল প্রাসাদের শীর্ষ গবাক্ষটি খুলে গেল। রাজকুমারী অপালার অঞ্জলিবদ্ধ দুটি হাত থেকে ঝরে পড়ল পবিত্র পুষ্পাঞ্জলি।

সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানে বিশ্বাসী ছিলেন, তবু তিনি মহামাত্যকে অগ্রণী করে বাহকদের হাতে বহু উপাচার ও উপঢৌকন রথে উপবিষ্ট শ্রমণদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

জনতার মধ্যে মহারাজের জয়ধ্বনি উঠল। যথানির্দিষ্ট পথে এগিয়ে গেল বুদ্ধ তথাগতের রথ।

যতদূর দৃষ্টি যায় প্রাসাদশীর্ষ থেকে চলমান জনতা ও রথের দিকে তাকিয়েছিল রাজকুমারী অপালা। শ্রমণদের কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছিল, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙঘং শরণং গচ্ছামি।

ঐ বিস্ময়কর ধ্বনি অন্তরের গভীরে প্রবেশ করে রাজকুমারীর মধ্যে সঞ্চার করছিল এক অদ্ভুত অনুভূতি।

রথযাত্রার শেষ চিহ্নটুকু মিলিয়ে গেল দৃষ্টির সম্মুখ থেকে, অপালা কিন্তু একঠাই দাঁড়িয়ে রইল চিত্রাপির্তের মতো। তার চোখের ওপর ভেসে রইল একটি রথ আর একটি যুবা পুরুষ। পুষ্পাচ্ছাদিত মনোহর রথটির সামনে দণ্ডায়মান দীর্ঘদেহী যুবা। অন্তরের আলোকে প্রদীপ্ত মুখমণ্ডল। শ্বেত বসন, পীত উত্তরীয়, শুভ্র মল্লিকার মালায় সজ্জিত সে পুরুষের আলেখ্যটি মন থেকে মুছে ফেলতে পারল না অপালা।

সেই পূর্ণিমা রজনীতেই মায়ের জন্য নির্মিত নিভৃত নির্জন চৈত্যটিতে কন্যা অপালা এসে দাঁড়াল মায়ের হাত ধরে। মহারাজের বিশেষ দেহরক্ষী অদূরে বৃক্ষের তলায় দাঁড়িয়ে রইল কৃপাণ হাতে নিয়ে। সম্ভ্রান্ত এক সামন্ত রাজবংশে জন্ম এই যুবক রক্ষীব। সে অস্ত্রচালনায় নিপুণ, দক্ষ তীরন্দাজ আর অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্খী।

প্রহরায় নিযুক্ত ছিল যুবক কিন্তু তার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল কুমারী অপালার প্রতিটি পদক্ষেপ ও অঙ্গ সঞ্চালনের ওপর।

এক কুশলী, শক্তিশালী যুবকের উচ্চাশা থাকা খুবই স্বাভাবিক। সে তখনো দার পরিগ্রহ করেনি, সুতরাং তার বাসনা ছিল বল্গাহীন। যুবক সুদত্ত কেবল মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের পার্শ্বরক্ষীই ছিল না, অত্যন্ত প্রিয়পাত্রও ছিল। তাই মহারাজ নিশাকালে মহারানী এবং কন্যাকে চৈত্যে পাঠাবার সময় সুদত্তকেই রক্ষীরূপে নির্বাচন করেছিলেন।

ভিন্ন একখানি নৌকায় বহু পূর্বেই উদয়ভদ্রকেমহারাজ তাঁর নবনির্মিত চৈত্যটিতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সঙ্গে দিয়েছিলেন পূজার প্রয়োজনীয় উপচার। আজ বুদ্ধ জয়ন্তী উপলক্ষে হবে বুদ্ধের বিশেষ আরাধনা। এই পুণ্যদিনে প্রথম অরণ্য-চৈত্যটির ভার নেবেন উদয়ভদ্র।

চৈত্যের মধ্যে মহারাজ যে বেদিটি নির্মাণ করে দিয়েছিলেন তাকে পুষ্পসজ্জায় সজ্জিত করে তুলেছিলেন উদয়ভদ্র। দীপাধারে রক্ষিত দীপগুলি জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। চন্দন ও গুগ্‌গুলের গন্ধে বাতাস আমোদিত হয়ে উঠেছিল। পবন সেটিকে বহন করে ছড়িয়ে দিয়েছিল গঙ্গাতীর পর্যন্ত।

উদয়ভদ্র আসনে বসে বুদ্ধের নামগান শুরু করেছিলেন। যুবকের সতেজ সুরেলা কণ্ঠে উচ্চারিত শব্দ

সেই অরণ্যভূমির পত্রাচ্ছাদন ভেদ করে জ্যোৎস্নাকিরণের রজতশুভ্র পথ ধরে উত্থিত হচ্ছিল ঊর্ধ্বলোকে। বহু যোজন দূরত্বে অবস্থিত দুগ্ধধবল পূর্ণচন্দ্রকে ভ্রম হচ্ছিল একটি শ্বেতহস্তীরূপে।

উদয়ভদ্র দেখলেন, চৈত্যের পাদপীঠে এসে দাঁড়িয়েছেন দুই নারী। একজন করুণাময়ী জননীর প্রতিমূর্তি, অন্যজন কম্প্র প্রদীপ-শিখার মত লাজনম্র তরুণী।

অপালার বিস্ময়ের অবধি নেই। জননীর মুখে সে শুনেছিল, বৌদ্ধমঠের শিক্ষায়তন থেকে আসবেন এক তরুণ অধ্যাপক। তিনিই প্রথম শুরু করবেন বুদ্ধ-পূজা। কিন্তু সেই অধ্যাপকই যে আজ প্রভাতে দেখা তার স্বপ্নের পুরুষ সেকথা সে কল্পনাতেও আনতে পারল না।

উদয়ভদ্র উপবিষ্ট অবস্থায় নত হয়ে প্রণাম জানাল।

কুমারদেবী বললেন, পুত্র, করুণাঘন বুদ্ধ তোমার কল্যাণ করুন।

সঙ্গে সঙ্গে অপালা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম নিবেদন করল। একই প্রণামে সে তার অন্তরের পূজা উৎসর্গ করল পূজারী ও দেবতাকে।

উদয়ভদ্র করজোড়ে বসেছিলেন। অপলার প্রণাম শেষ হলে তিনি আবার শুরু করলেন মন্ত্রোচ্চারণ।

মহারানী তাঁর কন্যাকে নিয়ে চৈত্যের চতুর্দিকে দীপ জ্বালিয়ে দিলেন। মনে হল, পূর্ণিমাতেই যেন দীপাবলীর উৎসব শুরু হয়েছে।

দীপ প্রজ্জ্বলনের কাজ শেষ হলে সকন্যা মহারানী এসে বসলেন শ্বেত পাথরের অঙ্গনে, চেয়ে রইলেন পূজারীর দিকে। তদ্‌গত নিষ্ঠায় বুদ্ধ-বন্দনা করছিলেন উদয়ভদ্র। তাঁর উচ্চারণ এমনই ভাবগম্ভীর ছিল যে প্রতিটি মন্ত্র প্রবেশ করছিল ভক্তের হৃদয়ের গভীরে।

'ত্রিপিটকে'র নির্বাচিত অংশ পাঠের পর উদয়ভদ্র 'জাতকের' কয়েকটি কাহিনী শোনালেন। তাঁর বাক্‌ভঙ্গী এতই সরস আর হৃদয়গ্রাহী ছিল যে শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধের মত তা শুনতে লাগল।

বিচিত্র মনুষ্য চরিত্র, রাজার কর্তব্য, গৃহীর আচরণীয় বিষয় প্রভৃতি গল্পের ছলে শিষ্য ভক্তদের বলতেন তথাগত। সেগুলি উদয়ভদ্র ব্যাখ্যা করে বোঝাতে লাগলেন।

উদয়ভদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মহারানী কুমারদেবীর মনে হল, তিনি বিশ্বজননীতে রূপান্তরিত হয়ে গেছেন। যে বুদ্ধভক্ত পূজকের আসনে বসে ব্যাখ্যা করে চলেছে, যে আচারনিষ্ঠ যাজ্ঞিক বৈতানবহ্নি (যজ্ঞাগ্নি) প্রজ্জ্বলনের ব্যবস্থা করছে, যে কিনাশ (কৃষক), স্থপতি (ঘরামি), কর্মার (কামার), কুলাল (কুম্ভকার), রজয়িত্রী (বস্ত্ররঞ্জনকারিণী) আপন আপন কাজ করে সংসারের রথটিকে সচল রেখেছে তারা সকলেই তাঁর সন্তান।

মহারানীর মনে হল, তাঁর হৃদয় থেকে নির্গত হচ্ছে অনিঃশেষ পীযূষধারা। বিশ্বের দিকে দিকে প্রবাহিত হচ্ছে সে অমৃত।

অপালার কেন জানি না মনে হচিছল, যশোধরার কথা। বিশ্বমানবের হৃদয়েশ্বর যাঁর স্বামী, তিনি অন্তরে চিরনিঃসঙ্গ। একটা নিঃশব্দ হাহাকারে পূর্ণ যশোধরার হৃদয়।

কি যেন না পাওয়ার বেদনায় আলোড়িত হতে লাগল অপালার কুমারী মন। তার চোখের কোণে দেখা দিল মুক্তার মত একবিন্দু অশ্রু।

অপালা হঠাৎ সচেতন হয়ে সংযত করল নিজেকে। অশ্রুবিন্দু মুছে নিল।

পূজা সমাপ্ত হয়েছে। ছেদ পড়েছে কথকের বুদ্ধ-কথায়। মহারানী প্রণাম জানালেন বুদ্ধ তথাগতকে। কন্যা অপালাও বুদ্ধের উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করল। কিন্তু অপালার প্রণাম নিবেদন তখনো শেষ হয়নি। উদয়ভদ্র বেদি ছেড়ে যখন শান্ত পদক্ষেপে এসে দাঁড়ালেন চৈত্য-প্রাঙ্গণে, তখন তাঁর চরণে প্রণাম নিবেদন করল অপালা।

অপ্রস্তুত উদয়ভদ্র চোখ বন্ধ করে করজোড়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

কিছু পরে দৃষ্টি উন্মীলিত করে দেখলেন, মহারানী বড় প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে আছেন।

আবেগে উচ্ছ্বসিত হলেন উদয়ভদ্র। মনে হল, তিনি যেন তাঁর সামনে বিশ্বজননীকে দেখছেন। দক্ষিণ

হস্ত বাড়িয়ে উদয়ভদ্র গ্রহণ করলেন কুমারদেবীর পদধূলি।

কুমারদেবী আশীর্বাদ জানিয়ে বললেন, পুত্র, তুমি পণ্ডিত। জননী অজ্ঞ হলেও চিরদিনই তিনি পুত্রের নমস্যা। আমি তোমার যথার্থ পরিচয় মহারাজের কাছ থেকেই জেনেছি। তুমি নির্লোভ, তাই ইচ্ছা থাকলেও কোনো রত্ন তোমার পূজার দক্ষিণা হিসেবে দান করতে পারছি না।

সস্মিত মুখে উদয়ভদ্র বললেন, আপনার স্নেহই আমার পূজার অতিরিক্ত দক্ষিণা মা। এর পরিবর্তে অন্য কোনো দক্ষিণা আমার আকঙক্ষাকে পূর্ণ করতে পারবে না।

মহারানী বললেন, আমি সংবাদ নিয়ে জেনেছি, তুমি মাতা-পিতাকে হারিয়েছ। একখানি অতিক্ষুদ্র পর্ণকুটীরে একাকী থেকে তুমি বিদ্যাচর্চা করে চলেছ।

উদয়ভদ্র বললেন, আপনার সংবাদ সত্য মা।

কুমারদেবী বললেন, এবার আমি তোমাকে একটি প্রশ্ন করতে পারি বাবা?

সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন উদয়ভদ্র।

তুমি কোন ধর্মের উপাসক? এটি আমার নিছক কৌতূহল পুত্র।

জ্যোৎস্না যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠল উদয়ভদ্রের মুখমণ্ডলে।

আমি মানবধর্মে বিশ্বাসী মা।

মহারানী সংকটে পড়লেন। তিনি এ ধরনের একটি ধর্মের নাম কখনো শোনেননি।

একটু বিমূঢ় হয়েই বললেন, এটি কি বৌদ্ধ, জৈন অথবা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মধ্যে কোনো একটি?

উদয়ভদ্র বললেন, এ ধর্মটি সকল ধর্মের ভেতরের বস্তু মা। এ ছাড়া সব ধর্মই নিরর্থক। ধর্ম মানেই যা মানুষের মনুষ্যত্বকে ধরে রাখে। সৎচিন্তা, সদাচার, সর্বজীবের প্রতি অপরিমেয় ভালবাসা মানবধর্মের সোপান। বিশেষ কোনো একটি ধর্মের গণ্ডীতে মানবধর্মকে বেঁধে রাখা যায় না। সে সবার মধ্যে থেকেও মুক্ত। শুভবুদ্ধিই মানবধর্মকে সুগম অথবা বন্ধুর পথের ওপর দিয়ে আকর্ষণ করে নিয়ে যায়।

মহারানী বললেন, শুনেছি, পাটলীপুত্রের বিশ্ববিদ্যায়তনে তুমি বৌদ্ধগ্রন্থের পাঠ দান কর।

আপনি ঠিকই শুনেছেন মা। এর অর্থ কিন্তু এ নয় যে আমি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। আপনাদের রাজপরিবারের অনুগ্রহপুষ্ট আরও একটি বিশ্ববিদ্যায়তন এই মগধেই রয়েছে। তাঁরা আমাকে বেদ, উপনিষদের তত্ত্বগুলি ব্যাখ্যার জন্য মাঝে মাঝে আহ্বান করে নিয়ে যান। এতে এটা প্রমাণিত হয় না যে আমি ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুগামী।

মহারানী বললেন, আমি বুঝেছি বাবা, তুমি আপন অন্তরের বিশুদ্ধ প্রেরণায় পরিচালিত হও।

অপালা এতক্ষণে কথা বলল, আমি জ্ঞানী নই, তবু আপনাকে একটি প্রশ্ন করতে প্রাণ চাইছে।

বলুন অসংকোচে।

অপালা বলল, আপনি আজ প্রভাতে বুদ্ধ-পূজায় মুখ্য একটি ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। সমবেত জনতা কিন্তু ধরে নিয়েছে আপনি বৌদ্ধসঙ্ঘেরই একজন।

হেসে বললেন উদয়ভদ্র, আবার কোনোদিন হয়তো ঐ জনতাই আমাকে যজ্ঞভূমিতে হোতার ভূমিকায় দেখতে পাবে। আমি তাম্রলিপ্তে অবস্থানকালে একজন সংস্কারমুক্ত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের কাছ থেকে বেদশিক্ষা করেছি।

শুনেছি, আপনি লিচ্ছবী সমাজেরই একজন।

জন্মসূত্রে তাই, হয়তো সে কারণেই খানিকটা সংস্কারমুক্ত।

অপালা এবার আর একটি প্রশ্ন তুলল, বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান, এ সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি?

অনুষ্ঠান যেখানে চিত্তকে প্রসন্ন করে, অনুভূতিকে জাগ্রত করে সেখানে যে কোনো ধর্মানুষ্ঠানই গ্রহণযোগ্য। কিন্তু শুভবুদ্ধিকে আচ্ছন্নকারী যে কোন অনুষ্ঠানই নিন্দনীয়।

অপালা বলল, আমি আপনাকে শেষ একটি প্রশ্ন করতে চাই। আপনি জন্মসূত্রে ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয়ের

অসিচালনা, তীরনিক্ষেপ অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয়।

এইটুকু বলে থামল অপালা। আসল জিজ্ঞাসা পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারল না।

উদয়ভদ্র অনাবিল একটি হাসি হেসে বললেন, প্রয়োজনে অস্ত্রবিদ্যার পরিচয় দিতে আমি পশ্চাদপদ হব না রাজকুমারী।

বিস্মিত, অভিভূত হল অপালা। যে পুরুষকে সে প্রভাতে দেখেছিল শ্বেত আর পীত বসনে সুসজ্জিত, যাঁর কণ্ঠে দুলে চলেছিল শুভ্র মল্লিকার মালা, সে পুরুষ সহসা যেন তার চোখের সামনে এসে দাঁড়াল অন্য এক রূপসজ্জায়। রক্তাম্বর পরিহিত, হাতে ধনুর্বাণ, মস্তকে মকরচূড় মুকুট।

সেই জ্যোৎস্না বিধৌত রাত্রে আর একটি যুবা পুরুষ অদূরে অরণ্যবৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়িয়ে ওদের দেখছিল। ঈর্ষার জ্বালাময় একটা বৃশ্চিক দংশন করছিল তাকে। অরণ্যের লতাগুল্ম, আকাশের জ্যোৎস্না শান্ত করতে পারছিল না তার বিষক্ষত। একটা উষ্ণ নিঃশ্বাস তার দেহ থেকে নির্গত হয়ে ভারী করে তুলছিল গঙ্গার সুশীতল বাতাস।

।। দুই।।

সমুদ্রগুপ্ত সম্রাট হয়ে পিতার একটি কথাও ভোলেননি। উদয়ভদ্রকে তিনি গ্রহণ করছিলেন বন্ধুরূপে। রাজমাতার চৈত্যের ভার অর্পিত ছিল তাঁর ওপর; কিন্তু রাজকোষ থেকে তার পরিবর্তে একটি মুদ্রাও গ্রহণ করতেন না উদয়ভদ্র।

সারাদিন রাজকার্য পরিচালনার পর ক্লান্ত সম্রাট বিশ্রামের জন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করতেন। একটি গোলাকার সুসজ্জিত গৃহের মধ্যস্থলে রাখা থাকত তাঁর বীণা। একটি মৃদঙ্গও শোভা পেত ঐ বীণাটির পাশে।

ঐ সময় সম্রাটের আহ্বানে প্রাসাদে আসতেন উদয়ভদ্র। মৃদঙ্গবাদনে তিনি অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন।

তাম্রলিপ্তে থাকার সময়ে উদয়ভদ্র একবার বুদ্ধের দন্ত দর্শনের জন্য লঙ্কা দ্বীপে যান। পালতোলা বাণিজ্য তরণীতে পক্ষকাল লেগেছিল এই যাত্রায়। সেখানে বৌদ্ধমন্দিরে তথাগতের দন্তটি রক্ষিত ছিল। পরম শ্রদ্ধায় সেই জাগ্রত স্মৃতিচিহ্নটি দর্শনের পর সহজে নিজ দেশে ফিরে আসতে পারেননি উদয়ভদ্র। বৎসরাধিককাল শ্রীলঙ্কায় থেকে গিয়েছিলেন তিনি।

পালিগ্রন্থ থেকে পাঠ ও ব্যাখার জন্য তিনি শ্রীলঙ্কার বৌদ্ধসমাজের কাছে বিশেষ আদৃত হয়েছিলেন। কিন্তু উদয়ভদ্রের চিত্তকে অধিকার করেছিল আর একটি বিষয়। রাজপ্রাসাদে একবার আমন্ত্রিত হয়ে তিনি শুনেছিলেন মৃদঙ্গ বাদন। সেই বাদ্যধ্বনি তাঁকে এমনই মুগ্ধ করে যে উপযুক্ত গুরুর কাছে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে বৎসরাধিককাল তিনি মৃদঙ্গবাদন শিক্ষা করেন। দেশে ফিরে এসেও তিনি এর অনুশীলনে বিরত থাকেননি।

সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত উদয়ভদ্রের এই গুণটির পরিচয় পেয়ে উল্লসিত হয়ে উঠেছিলেন। বীণার ধ্বনির সঙ্গে তালবাদ্যের সহযোগ অপূর্ব এক মূর্ছনার সৃষ্টি করত। দুই শিল্পী দীর্ঘরাত্রি পর্যন্ত মত্ত হয়ে থাকতেন সঙ্গীত-রসে।

আর দুজন নারীও নিভৃত প্রকোষ্ঠে আত্মগোপন করে পান করতেন এই রসসুধা। তাঁদের একজন, মহারানী দত্তাদেবী, অন্যজন রাজভগিনী অপালা।

অপালার অনিন্দ্য যৌবনশ্রী বসন্তের অশোকমঞ্জরীর মত পুষ্পিত হয়ে উঠেছিল। কন্যার উপযুক্ত বিবাহের জন্য উৎকণ্ঠিত ছিলেন কুমারদেবী। মহারানী দত্তাদেবীও স্বামীর কাছে প্রিয় ননদিনীর একটি সুপাত্রের জন্য আর্জি জানাতেন।

সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত যখন একাকী অন্যমনে কিছু চিন্তা করতেন তখন তাঁর চোখের ওপর ভেসে উঠত ভগ্নী অপালার ছবি। এমন পবিত্র সুন্দর মুখশ্রী তিনি দ্বিতীয় আর একটি দেখেছেন কিনা মনে পড়ত না। ভাবুক স্বভাবের ভগ্নীটি সংসারের সব কাজই সুচারুরূপে সম্পাদন করত, কিন্তু সংসারের সঙ্গে গভীর

বাঁধনে বাঁধা পড়তে দেখা যেত না তাকে।

সম্রাটের সঙ্গীত মঞ্চটি সাজানোর দায়িত্বে ছিল অপালা। প্রতি ঋতুর পুষ্পবৈভব দেখা যেত সঙ্গীত মঞ্চের সজ্জায়। মাল্যে, পুষ্পস্তবকে মনোরম হয়ে উঠত স্থানটি। নিত্যদিন যেন নব নব উৎসব।

সম্রাট এবং সংগতকারী উদয়ভদ্র উপস্থিত হলে কলাভবনের প্রধানা নটী স্বর্ণপাত্রে পুষ্পমাল্য নিয়ে এগিয়ে আসত। তার মঞ্জীরের ঝঙ্কার কলহংসের ধ্বনি বলে ভ্রম হত। সে যে মাল্য শিল্পীদের অর্পণ করত তার নিপুণ রচয়িত্রী অন্তরালে বসে লক্ষ করত শিল্পীদের।

সম্রাট জানতেন এই সুচারু মালা অপালা ছাড়া অন্য কেউ রচনা করতে সক্ষম হবে না। তিনি উচ্চৈঃস্বরে সাধুবাদ জানাতেন রচয়িত্রীর উদ্দেশ্যে। কিন্তু কখনো উচ্চারণ করতেন না ভগ্নীর নাম।

উদয়ভদ্র মালাটি দেখে বলতেন, চম্পক আজ সেজেছে মনোহারী কন্যার মত। স্বর্ণকান্তি, সুকোমল, সুরভিত তনুশ্রী। এমনকন্যা দেবলোকেও দুর্লভ।

চম্পকবর্ণের চীনাংশুকে সজ্জিত অপালা অন্তরালে বসে লজ্জায়, অনুরাগে আরক্ত হয়ে উঠত।

মহারানী দত্তা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী নারী। তিনি আলাপচারিতার ভেতর দিয়ে বুঝে নিয়েছিলেন অপালার হৃদয়ের বার্তা।

এক রাত্রে সম্রাট বিশ্রামকক্ষে এলে দত্তা স্বামীর কাছে প্রসঙ্গটি উত্থাপন করলেন।

মহারানী বললেন, উদয়ভদ্র কেবল সুদর্শন পুরষই নন, নানা গুণের সমাবেশ ঘটেছে তাঁর মধ্যে।

সম্রাট মৃদুহাস্যে বললেন, সুপাত্র সন্দেহ নেই।

মহারানী মনে মনে সম্রাটের কুশাগ্র বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারলেন না।

মুখে বললেন, আমি অপালার কথা চিন্তা করছিলাম।

আমার চিন্তার সঙ্গে তোমার চিন্তার আশ্চর্য মিল আছে দেখছি।

মহারানী দত্তা খুশী হয়ে উঠলেন। এতদিন গুপ্তবংশের সম্রাট কেবলমাত্র সাম্রাজ্য সুদৃঢ় করার জন্য বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে এসেছেন শক্তিশালী রাজ-পরিবারের সঙ্গে, কিন্তু আজ বিবাহের ভাবনার ভেতর লেগেছে হৃদয়ের ছোঁয়া।

মহারানী বললেন, উদয়ভদ্র জন্মে দরিদ্র কিন্তু কর্মে নন। তাঁর হৃদয় আকাশের মতো উদার, তাঁর আচরণ সূর্যের মতো দীপ্তিময়।

সম্রাট বললেন, আমার সভাকবি হরিষেণ এখানে উপস্থিত থাকলে মহারানীর প্রশস্তি রচনা করতেন। তাঁর বোধ এবং প্রকাশের ভাষার ভূয়সী প্রশংসা না করে পারতেন না। আমি নিজে কবি হয়ে তোমাকে অন্তর থেকে সাধুবাদ না জানিয়ে পারছি না।

মহারানী বললেন, কৌতুকের বিষয় নয় মহারাজ, আমি কিছুদিন গভীরভাবে বিষয়টি নিয়ে ভাবছি।

সম্রাট বললেন, আমি যা বলেছি তার ভেতর কৌতুক ছিল না মহারানী। একটি যথার্থ মানুষকে তুমি যেভাবে তুলে ধরলে তাতে উচ্ছ্বসিত না হয়ে পারলাম না। এখন আমি একটি কথা শুধু তোমার কাছ থেকে জানতে চাই। অপালা কি তোমার পরিকল্পনাটি গ্রহণ করেছে?

অপালার সঙ্গে সোজাসুজি এ বিষয়ে আমার কোনো কথা না হলেও আমি নানা আলোচনায় উদয়ভদ্রের ওপর তার অনুরাগের পরিচয় পেয়েছি।

সম্রাট চিন্তিত মুখে বললেন, রাজপরিবারে অপালার জন্ম, সে কি দারিদ্রে দুঃখ সইতে পারবে!

দত্তাদেবী সঙ্গে সঙ্গে বললেন, আপনি সম্রাটের আসনে বসে আছেন, ইচ্ছে করলে উদয়ভদ্রের শিরে সামন্তরাজের শিরোপা পরিয়ে দিতে পারেন।

অনাবিল অট্টহাস্য করে উঠলেন সম্রাট।

ক্ষুণ্ণ হলেন মহারানী। বললেন, মহারাজ, আমার অন্তরের ইচ্ছেটাই আপনার কাছে নিবেদন করেছি।

সম্রাট বললেন, তোমার ইচ্ছের ঐকান্তিকতা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই মহারানী। তবে উদয়ভদ্রের চরিত্রের একটি দিক এখনো তোমার অজ্ঞাত।

মহারানী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন দেখে সম্রাট আবার বললেন, উদয়ভদ্রকে সম্পদে ভূষিত করব এমন দুঃসাহস আমার নেই। তার মহাসম্পদ হল, স্বল্পে তুষ্টি। সে রাজঐশ্বর্য কখনো কামনা করে না। আমার ভগ্নী যদি উদয়ভদ্রকে কামনা করে তাহলে তাকে দারিদ্র বরণের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

দত্তাদেবী বললেন, আমি যতটুকু জানি, অপালা তার ভালবাসার মানুষটির জন্য দুঃখবরণে পেছপা হবে না।

সম্রাট বললেন, আমি প্রস্তাবটি উত্থাপন করব, তবে উদয়ভদ্র অত্যান্ত স্পষ্টবাদী, গ্রহণ বর্জন তারই ওপর নির্ভর করবে।

মহারানীকে এবার কিছুটা চিন্তান্বিত দেখা গেল। কিছুক্ষণ পরে তাঁর মুখের ওপর থেকে চিন্তার মেঘটা সরে গেল। তিনি বললেন, একটা পরিকল্পনা এইমাত্র আমার মাথায় এল।

সম্রাট উৎকর্ণ হলেন।

মহারানী বলতে লাগলেন, অপালার মাতুলালয়ে যাত্রার ইচ্ছে বহুদিনের। এদিকে রাজমাতা কন্যার সঙ্গে পিত্রালয়ে যেতে সমর্থ হবে না। এ অবস্থায় আপনি যদি উদয়ভদ্রকে ভগ্নীর যাত্রা-সঙ্গী হিসেবে আমন্ত্রণ জানান তাহলে ভাল হয়। এই দীর্ঘ পথযাত্রায় দুজনের সান্নিধ্য হয়তো নিবিড় হয়ে উঠতে পারে।

তুমি বুদ্ধিমতী মহারানী, স্বামীকে প্রত্যাখ্যানের অসম্মান যাতে স্পর্শ করতে না পারে সেদিকে লক্ষ রেখেই এই পরিকল্পনাটি রচনা করেছ।

দেখাই যাক না। যদি অপালা লজ্জার কারণে ভালবাসার সেতু রচনায় অক্ষম হয় তাহলে তো সম্রাট স্বয়ং রইলেন।

কয়েকদিন পরের কথা। সম্রাটের নৈশ সঙ্গীত সম্মেলনটি জমে উঠেছে। সম্রাট রাগিণী আশাবরীর আলাপে মগ্ন। কান পেতে সে আলাপ শুনছেন উদয়ভদ্র। হঠাৎ রাগিণী কায়ারূপ ধারণ করল। উদয়ভদ্র স্পষ্ট দেখতে পেলেন, তাঁর সামনে বিদ্যা-প্রতিমার মতো একটি কন্যা এসে দাঁড়িয়েছে। পট্টবস্ত্রে সংবৃত তার দেহ। রক্তজবার অনুরাগ ছড়িয়ে পড়েছে তার সারা মুখে। অঞ্জলিবদ্ধ দুটি হাতে ধরে রেখেছে সে নীল পদ্ম।

উদয়ভদ্র উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলেন, অপূর্ব! অপূর্ব!

সম্রাটের বাজনা থেমে গেল। বললেন, কি অপূর্ব দর্শন হল উদয়ভদ্র?

আপনার আলাপের সঙ্গে সঙ্গে রাগিণীকে রূপ ধরে এ ঘরে এসে দাঁড়াতে দেখলাম।

সম্রাটের আদেশেই সঙ্গীত-প্রকোষ্ঠটি স্বল্প আলোকিত থাকত।

সম্রাট উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করে উঠলেন। বললেন, আশাবরীই বটে। ও তোমার একান্ত পরিচিত আশাবরী। গঙ্গাপারের চৈত্যে ও জননীর সঙ্গে প্রায়ই পূজা দিতে যায়।

ভীষণভাবে লজ্জিত হয়ে পড়লেন উদয়ভদ্র। সসঙ্কোচে বললেন, ও, আপনি অপালার কথা বলছেন!

সম্রাট বললেন, — ঐ যে রৌপ্যপদ্মের আকারে একটি পাত্র দেখছ, ওটিতে প্রাসাদ-দেবতার পূজার পায়সান্ন রেখে গেছে অপালা। তুমি সেবা করবে এই অভিলাষ।

নিরতিশয় লজ্জিত হলেন উদয়ভদ্র।

সম্রাট বললেন, সেবা হোক। তোমার আশাবরী লজ্জায় অন্তর্হিত হয়েছে।

সেই রাতেই গানের আসরের ফাঁকে সম্রাট অপালার মাতুলালয়ে গমনের কথাটি প্রকাশ করলেন। এ কথাও বললেন, বিশেষ কোনো অসুবিধে না থাকলে উদয়ভদ্র যদি সঙ্গী হয় তাহলে সম্রাট নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

উদয়ভদ্রের উত্তর শোনার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছিলেন অন্তরালবর্তী দুই রমণী।

উদয়ভদ্র বললেন, আমাকে একটুখানি ভাববার সময় দিন। আগামীকাল সন্ধ্যায় সংগীতের আসরে আপনি অবশ্যই জানতে পারবেন।

সঙ্গীতের আসর যেমন চলছিল তেমনি চলতে লাগল।

মাঝরাতে আসর ভাঙলে স্বল্প চন্দ্রালোকে প্রাসাদ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন উদয়ভদ্র।

কলাবিদের নিষ্ক্রমণের কিছু আগে নিঃশব্দে একটি ঘটনা ঘটে গিয়েছিল।

মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের দেহরক্ষী ছিল সামন্ত রাজবংশের অন্যতম কুমার, সুদত্ত। সমুদ্রগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণের পর তাঁর একান্ত দেহরক্ষীরূপে নিযুক্ত হল অতি বিশ্বস্ত অনুচর ভিল্‌সা। এতে ক্ষুব্ধ ক্ষুন্ন হয়েছিল সুদত্ত। এ ধরনের একটি পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে তা পূর্বাহ্নেই অনুমান করেছিলেন সম্রাট। তিনি সুদত্তকে আহ্বান করে সমস্ত প্রাসাদ রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করলেন। এতে খুশী হলো সুদত্ত। প্রাসাদের রক্ষী ছাড়া দাসদাসীদের সঙ্গেও যোগাযোগ স্থাপিত হল তার।

উদয়ভদ্রের প্রাসাদ থেকে নিষ্ক্রমণের কিছু পূর্বে অপালা তার নিজস্ব দাসীর হাতে পাঠিয়েছিল একটি পত্র। সংগোপনে সে পত্রটি দিতে বলেছিল উদয়ভদ্রের হাতে।

প্রাসাদ থেকে পথে বেরিয়েই দাসী ঢুকল সুদত্তের আস্তানায়। অপালার খাস দাসীটিকে বহু পারিতোষিক আর প্রিয়বাক্যে হাত করেছিল সুদত্ত। মাঝে মাঝে দাসী চারুকেশী তাকে রাজকুমারীর সমাচার জানিয়ে যেত। সত্য মিথ্যায় মেশা থাকত সেই সংবাদগুলি। সুদত্ত প্রতিটি খবরের জন্য, তা যত ক্ষুদ্রই হোক, চারুকেশীকে পুরস্কৃত করত।

আজ নিশাকালে প্রাসাদের বাইরে চারুকেশীকে দেখে সুদত্ত বিস্মিত হল।

কি খবর চারুকেশী, এত রাতে আমার আস্তানায়?

চারুকেশী বলল, হাতে সময় বেশী নেই, এখনই চলে যেতে হবে। তবে বড় রকমের কিছু একটা পুরস্কার দেন তো খুব বড় রকমের একটা খবর পাবেন।

তোমার বলার আগেই পুরস্কার কবুল করছি। তোমাকে সন্তুষ্ট করেই পুরস্কারটা দেব।

চারুকেশী রাজকুমারীর লেখনটা সুদত্তের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, এখনই সম্রাটের অন্দরমহল থেকে বাজনদার বেরুবেন। তাঁর হাতে দেবার জন্য রাজকুমারী এই লেখনটা পাঠিয়ে দিয়েছেন।

সুদত্ত ভীষণ আগ্রহে লেখাটায় চোখ বুলিয়ে নিল।

আগামী শুক্লা তৃতীয়াতে মাতুলালয়ে যাত্রার দিন স্থির হয়েছে। আপনি সম্রাটের কথামতো আমার সঙ্গে যেতে অমত করবেন না। ওখানে আমার মাতামহ বিশাল এক বিহার নির্মাণ করে দিয়েছেন, সেই বিহারটি দেখার সুযোগও আমাদের ঘটবে। এই অনুরোধটুকু রক্ষা করা আপনার পক্ষে কি খুবই অসম্ভব হবে?

শ্রীচরণে প্রণতি জানাই।

পত্রটি দাসীর হাতে ফিরিয়ে দিতেই সে দৌড়ে পালাল। এখনকার মত মুলতুবি রইল পুরস্কার।

হাঁ, বড় রকমের পুরস্কারের যোগ্য খবর বটে।

সুদত্তের রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠল। তার ভাবনা ঘুরতে লাগল নানা গোলকধাঁধার পথে। রাগে কাঁপতে লাগল তার সারা শরীর। মনে হল, এখনি তলোয়ারের এক কোপে শেষ করে দেয় ভিখিরীটার ভবলীলা। কিন্তু না, মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করতে হবে। এই একটা সুযোগ, একে কোনওরকমেই হাতছাড়া করা চলবে না।

পরদিন প্রভাতে সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত শিশুপুত্র চন্দ্রকে নিয়ে পরিভ্রমণ করছিলেন রাজউদ্যানে। মনটি প্রভাত সমীরের মতো শীতল আর প্রসন্ন ছিল। পরিস্থিতি অনুকূল বুঝে প্রাসাদরক্ষী সুদত্ত কাছে এসে দাঁড়াল।

কি সংবাদ সুদত্ত, প্রাসাদের কুশল তো?

সম্রাট যেখানে শক্তি আর করুণার আধার সেখানে কুশল ছাড়া অমঙ্গলের কোনো স্থানই থাকতে পারে না।

সম্রাট এবার প্রশ্ন করলেন, তোমার পারিবারিক কুশল তো? রাজা মাণিক্যদেবের কোন সমাচার পেয়েছ কি?

সুদত্ত বলল, পিতৃদেব কুশলেই আছেন, যদিও মাসাধিককাল তাঁর কোনো সংবাদ পাইনি।

সম্রাট বললেন, তোমাদের রাজ্যখণ্ডের উত্তরাধিকার নিয়ে যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল তার সমাধানের কোনো পথ খুঁজে পেয়েছ কি?

পিতা তাঁর রাজ্যের ভার আমার মধ্যম ভ্রাতাকেই দিয়ে যেতে চান। অবশ্য প্রকাশ্যে এখনো ঘোষণা না করলেও আমি তাঁর মনোগত অভিলাষ জানি।

শুনেছি তোমার মধ্যম ভ্রাতাটি তোমাদের বিমাতার সন্তান। সে নাকি দক্ষ রাজনীতিবিদ আর অসিচালক।

সুদত্ত কেবল নিজের ললাটের একটি ক্ষতচিহ্নের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলল, এখানেই সে তার অসিচালনার প্রথম স্বাক্ষর রেখেছে সম্রাট।

একটু থেমে আবার বলল সুদত্ত, আমি সম্রাটের অন্নপুষ্ট, অনুগ্রহভাজন, আমার শুভাশুভের জন্য আমি সম্রাট ছাড়া আর কার ওপর নির্ভর করব।

সমুদ্রগুপ্ত বললেন, তোমার পিতা মাণিক্যদেব অত্যন্ত বিচক্ষণ ও গুপ্ত সম্রাটদের প্রতি অনুগত। অন্যদিকে তুমি আমাদের বিশেষ প্রিয়পাত্র। তাই এ সমস্যার সমাধান তোমাদের নিজেদেরই করতে হবে, সম্রাট থাকবেন নিরপেক্ষ।

সুদত্ত এবার বলল, আমাকে কিছুকাল ছুটি দিন সম্রাট, হয়তো আমি পিতার সান্নিধ্যে নেই বলে তিনি রাজ্যের ব্যাপারে আমার কথা ভাবতে পারেননি।

সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত বললেন, প্রাসাদরক্ষার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছিল তোমার ওপরে। তোমার একটি দিনের অনুপস্থিতিও কাম্য নয় আমার। তবু তোমার স্বার্থের কথা ভেবে আমি ছুটি মঞ্জুর করছি। কাজ সমাপ্ত হলেই ফিরে এস প্রাসাদে।

সুদত্ত পরদিনই অশ্বারোহণে বহির্গত হল। কিন্তু সে তার রাজ্যে ফিরে গেল না। পাটলীপুত্রের সন্নিহিত অঞ্চল থেকে সে সংগ্রহ করল কয়েকজন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। নিজে গ্রহণ করল ছদ্মবেশ। এর পর বিশ্বস্ত সঙ্গীদের নিয়ে সে উধাও হয়ে গেল।

পরদিন নৈশ-সঙ্গীতবাসরে সম্রাটের সঙ্গে দেখা হলো উদয়ভদ্রের। সঙ্গীত শুরু হবার আগেই উদয়ভদ্র বললেন, সম্রাটের গত রজনীর প্রস্তাব শিরোধার্য।

সস্মিত মুখে উদয়ভদ্রের দিকে তাকালেন সম্রাট। বললেন, ওখানে গেলে তোমারও কিছু লাভ হতে পারে বন্ধু। ওখানকার বিহারে বহু বৌদ্ধধর্ম রক্ষিত আছে। তুমি অবশ্যই সেগুলি দেখার সুযোগ পাবে।

উদয়ভদ্র হেসে বললেন, আমাকে প্রলোভন দেখাবেন না সম্রাট। গ্রন্থের রসে মজে গিয়ে সেই পার্বত্যভূমিতেই হয়তো সারাজীবন কাটিয়ে দিতে পারি।

উচ্চহাস্য করে উঠলেন সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত। বললেন, তোমার এরকম পরিবর্তন হলে পাটলীপুত্রের সমূহ ক্ষতি। যদি এমন কোনো অভাবিত ঘটনা ঘটে তাহলে মগধের সম্রাট সসৈন্যে অভিযান চালিয়ে তার প্রিয় সখাকে উদ্ধার করে আনবে।

এবার দু বন্ধুতেই উচ্চহাস্য করে উঠলেন। অন্তরালবর্তিনী অন্য দুই নারীও পরস্পরের দিকে তাকিয়ে প্রসন্ন হাসি হাসতে লাগলেন।

শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে পাটলীপুত্রের প্রাসাদ থেকে চতুর্দোলায় আরোহণ করে অপালা যাত্রা করল মাতুলালয় অভিমুখে। সঙ্গে যথোপযুক্ত রক্ষীর দল। স্বল্প দূরত্ব বজায় রেখে একটি লোহিত বর্ণের অশ্বে আরোহণ করে চলেছিলেন উদয়ভদ্র। পারিপাট্যহীন শুভ্র পোশাক, মাথায় পাগড়ীর মত জড়ানো পীত বর্ণের উত্তরীয়খানি। রূপবান দীর্ঘদেহী উদয়ভদ্রকে ঐ স্বল্প পোশাকেই মনোহর মদনের মত মনে হচ্ছিল।

প্রতিদিন প্রভাতে ও সন্ধ্যায় উদয়ভদ্রকে আহার্য পরিবেশনেব দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল রাজকুমারী অপালা। অতি যত্নে একখানি রৌপ্যপাত্রে সে সাজিয়ে দিত আহার্য। পায়সান্ন প্রতিদিন সে নিজেই রন্ধন করত।

আহারের সময় নিকটে অন্য কোনো পরিচারিকার আসার অনুমতি ছিল না। প্রয়োজন হলে নিজেই পরিবেশন করত। তাছাড়া একখানা সুচিত্রিত ক্ষুদ্র পাখা ছিল তার হাতে। সেই পাখাটি সঞ্চালিত করে সে আহারকারীর ক্লান্তি দূর করত।

উদয়ভদ্র সকৌতুকে বলত, আমি সামান্য জ্ঞানভিক্ষু রাজকুমারী, নিজের হাতে আহার্য প্রস্তুত করি, এখন তোমার এই সেবা গ্রহণ করতে গিয়ে আমার অভ্যেস না খারাপ হয়ে যায়।

অপালা উত্তর করত, আপনি তো আর চিরদিন নিজের হাতে রান্না করে খাবেন না, কেউ না কেউ একদিন সে ভার নিজের কাঁধে তুলে নেবে।

কি হবে আর কি না হবে সে কথা কি এই মুহূর্তে কেউ বলতে পারে রাজকুমারী। অধ্যাপনা করে যেটুকু অর্থ পাই তাতে পাঁচটি ছাত্রকে পোষণ করি। এর পর যতটুকু অবশিষ্ট থাকে তাতে কোনোরকমে একটা মানুষের চলে যায়। দ্বিতীয় আর একজনের কথা ভাবার কোনো উপায়ই নেই রাজকুমারী।

আপনি অনুমতি করলে সম্রাটের কাছে আপনার পারিশ্রমিক বৃদ্ধির আর্জি জানাই।

তোমার এই করুণার প্রস্তাবটি গ্রহণ করতে পারলাম না বলে দুঃখিত। বিদ্যা ছাড়া কোনো ভিক্ষাই কারু কাছ থেকে আমি গ্রহণ করি না। আর তাছাড়া সম্রাটের কোষাগার থেকে অধ্যাপকদের জন্য বরাদ্দ যে পরিমাণ অর্থ আসে তা স্বামী-স্ত্রীর একটি সংসার প্রতিপালনের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে সংকুলান না হবার কারণ তো আগেই বলেছি রাজকুমারী।

দিনের পর দিন রাজকুমারী অপালার সান্নিধ্যে প্রসন্ন হয়ে ওঠে উদয়ভদ্রের চিত্ত। মনে হয়, এমন একখানি পবিত্র মুখচ্ছবি তিনি অন্য কোথাও দেখেননি।

যাত্রার ত্রয়োদশ দিনে পূর্ণিমার শুভ্র চন্দ্রোদয়ের মুহূর্তে রাজকুমারী অপালা উদয়ভদ্রকে প্রণাম নিবেদন করল নিভৃত এক অরণ্যকুঞ্জে। পাশ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল এক পবিত্র সলিলা স্রোতস্বিনী : ভৃঙ্গারে জল পূর্ণ করে এল অপালা সে জল সিঞ্চন করল জ্ঞানভিক্ষু উদয়ভদ্রের চরণে।

উদয়ভদ্র অপালার পবিত্র মুখখানি কমলের মতো অঞ্জলিতে তুলে ধরে বললেন, এ কমল কেবলমাত্র দেবভোগ্য, মানুষের কি সাধ্য আছে একে ঘরে তুলে রাখে কল্যাণী?

সহসা সেই কমলের কোমল দুটি দল থেকে খসে পড়ল দুটি নিটোল মুক্তাবিন্দু। এ গভীর আনন্দের কি পরম বেদনার তা বোঝা গেল না।

মধ্যরাত্রে যখন প্রায় সকলেই সুষুপ্ত, এমনকি নৈশ রক্ষীরাও অগ্নিকুণ্ডের পাশে ক্লান্তিতে অবসন্ন, তখন সহসা বনভূমির দক্ষিণ প্রান্ত বিদীর্ণ করে ভয়ঙ্কর শব্দ উত্থিত হল।

সেই রাত্রে কেবলমাত্র দুজন নিদ্রাহীন নিশিযাপন করছিল। একজন পুরুষ, অন্যজন নারী। তারা ভাবছিল স্বপ্নময় কটি দিনেব কথা। তারা অনুভব করছিল আজকে মধুর মিলন-মুহূর্তগুলোর রোমাঞ্চ।

অপালা দাসী চারুকেশীকে ঠেলে তুলে দিল। সর্বাঙ্গ তাব কাঁপছে থরথর করে।

দেখতো চারুকেশী কিসের এত কোলাহল!

চারুকেশী এমনিতে খুবই দুঃসাহসী। সে নিদ্রাজড়িত দুটো চোখের পাতায় অঙ্গুলি সঞ্চালন করতে করতে বেরিয়ে গেল।

তখন অসতর্ক রক্ষীদের অনেকেই কাটা পড়েছে। বাকীরা সাধ্যমতো প্রতিরোধের চেষ্টা করছে দস্যুদের।

মুহূর্তে নিজ কর্তব্য স্থির করে ফেললেন উদয়ভদ্র। তিনি বিদ্যুৎগতিতে ঢুকে পড়লেন রাজকুমারী অপালার পটাবাসে (তাঁবু)।

উৎকণ্ঠিত অপালা কেবলমাত্র কাল গণনা করে চলেছিল। উদয়ভদ্র প্রবেশ করতেই সে তাঁকে প্রায় উদ্ভ্রান্তের মতো আলিঙ্গনে আবদ্ধ করল।

এদিকে একটি বৃক্ষের অন্তরাল থেকে দস্যুদের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল চারুকেশী। তারা তখন ঘোরতর যুদ্ধে লিপ্ত। সম্রাটের সুশিক্ষিত বাহিনীঃ কয়েকজন প্রাণপণে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল। তার চেষ্টা করছিল রাজকুমারীর অবস্থানের জায়গাটি থেকে ওদের দূরে সরিয়ে রাখার।

চারুকেশীর চোখ হঠাৎ বিস্ফারিত হয়ে গেল। তাব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে ফাঁকি দেবে সাধ্য কি! ঐ তো প্রাসাদরক্ষী সুদত্তের নিকষকৃষ্ণ ঘোড়া, আর ঐ তো তার উদরে শ্বেত চক্রচিহ্ন। সুদত্ত সবার পেছনে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ চালনা করছে। যত ছদ্মবেশই ধর, ধূলি দিতে পারবে না চারুকেশীর চক্ষে।

সবকিছু পরিষ্কার হয়ে গেল এবার। সুদত্ত চায় রাজকুমারীকে ছদ্মবেশে অপহরণ করে নিয়ে যেতে। তাই রাজপুরী থেকে পূর্বাহ্ণেই ছলনা করে পলায়ন!

অনেক ঋণে ঋণী সে রাজকুমারী কাছে। আজ সেই ঋণ পরিশোধের সময় এসেছে তার।

ছুটে গেল সে রাজকুমারী অপালার কাছে।

উদয়ভদ্র তখন বলে যাচ্ছিলেন, কোনোরকম দ্বিধা প্রকাশের সময় নেই অপালা। আমার নিশ্চিত অনুমান, এই ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীটি বনের ভেতর দিয়ে গিয়ে পড়েছে মূল নদীতে। ঐ নদী পার হলেই একটি ক্ষুদ্র বন পাওয়া যাবে। সেই বন শেষ হলেই দেখা যাবে মহারাজ ভবদেবের প্রাসাদ। তুমি তোমার বিশ্বস্ত দাসী চারুকেশীকে নিয়ে এই নদীর তীর ধরে যত দ্রুত পার চলে যাও। আমি যতক্ষণ পারি ওদের প্রতিহত করার চেষ্টা করব।

চারুকেশী ভেতরে ঢুকে বলল, রাজকুমারীকে অপহরণ করে নিয়ে যেতে এসেছে প্রাসাদরক্ষী সুদত্ত। ছদ্মবেশের আড়ালে থাকলেও আমি তাকে চিনতে পেরেছি। এখন দয়া করে শুনুন আমার পরিকল্পনা।

বলতে লাগল চারুকেশী, সময় এক মুহূর্তও নেই আমাদের হাতে। রাজকুমারী আমার পোশাকটা দ্রুত পরে নিন, আর আমাকে দিয়ে দিন আপনার মূল্যবান পোশাক আর অলংকার। দাসী তুঙ্গভদ্রাকে সঙ্গে নিয়ে কালবিলম্ব না করে নদীর তীর বরাবর অতি দ্রুত এগিয়ে চলে যান।

তাই করা হল। যাবার আগে বলল অপালা, কিন্তু তোর ছদ্মবেশ যখন ধরা পড়বে সুদত্তের চোখে তখন কি পরিণতি হবে তোর চারুকেশী!

আমাকে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে দিন রাজকুমারী। আমি আপনার ছদ্মবেশ নিয়ে ঐ কৃতঘ্নের সঙ্গে শেষ বোঝাপড়াটা করে নেব।

উদয়ভদ্রকে ছেড়ে যেতে এক তিলও ইচ্ছা ছিল না অপালার। উদয়ভদ্র তাকে প্রবোধ দিয়ে বললেন, তুমি অপহৃতা হলে আমার জীবিত থাকার কোনো অর্থই আর থাকবে না। তুমি যদি আত্মরক্ষায় সমর্থ হও তাহলে একদিন হয়তো আমরা আবার মিলিত হতে পারি।

দাসী তুঙ্গভদ্রার সঙ্গে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল রাজকুমারী অপালা। লাল ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে তলোয়ার উঁচিয়ে লড়াই-এর জায়গায় ছুটে গেলেন উদয়ভদ্র।

যুদ্ধের নিষ্পত্তি হয়েছিল এক সময়। মহারাজের অল্পসংখ্যক রক্ষীর ব্যূহকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল সুদত্তের ভাড়াটে সৈন্যরা।

শেষ পর্যন্ত সুদত্ত পৌঁছেছিল রাজকুমারীর তাঁবুতে। তার আগে উদয়ভদ্রের শাণিত অসি অন্ততঃ পাঁচজন যোদ্ধাকে ধরাশায়ী করে দিয়েছিল। শেষ অসি চালনা করেছিলেন তিনি সুদত্তের শির লক্ষ করে। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে তাকে রক্ষা করল এক তীরন্দাজ। বিদ্যুৎগতিতে একটি তীর ছুটে এসে সেই মুহূর্তে বিদ্ধ করল উদয়ভদ্রের পৃষ্ঠদেশ। উদয়ভদ্র ঘোড়ার পিঠে ঝুঁকে পড়লেন। অতি সুশিক্ষিত ঘোড়া প্রভুকে পিঠে নিয়ে ছুটে চলে গেল প্রান্তর পেরিয়ে। অর্ধচেতন উদয়ভদ্র ঘোড়ার কেশর ধরে আপ্রাণ আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে লাগলেন।

দীর্ঘপথ পার হয়ে ঘোড়া উদয়ভদ্রকে নিয়ে এল এক পাহাড়ী নদীর তীরে। ততক্ষণে পৃষ্ঠদেশের তীরটি স্খলিত হয়ে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু রক্তক্ষরণের ফলে অবসন্ন ও হতচেতন হয়ে পড়েছিলেন উদয়ভদ্র।

ক্লান্ত অশ্ব জলপানের জন্য নদীতে মুখ নামাতে গেলে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে উপলাস্তীর্ণ নদীতে পড়ে গেলেন উদয়ভদ্র। শীতল জলের ছোঁয়ায় সম্বিত ফিরে এল তাঁর কিন্তু অগভীর নদীর তীব্র স্রোতপ্রবাহে ভেসে যেতে লাগলেন তিনি। এক সময় সম্পূর্ণ চেতনা লোপ পেল উদয়ভদ্রের। যখন তিনি জ্ঞান ফিরে পেয়ে চোখ মেলে তাকালেন তখন দেখলেন, কয়েকজন বৌদ্ধ শ্রমণী তাঁকে ঘিরে বসে রয়েছেন। তাঁদের মুখ

চোখে ফুটে উঠেছে গভীর মমতা আর সেবার ভাব।

এখন দৃষ্টি ফেরানো যাক রণক্ষেত্রের দিকে।

দু-দলের হানাহানির শেষে চন্দ্রালোকে দেখা গেল জীবিত রয়েছে মাত্র চারটি প্রাণী। সুদত্ত আর তার দুজন সঙ্গী একদিকে, অপরদিকে ছদ্মবেশী রাজকন্যা চারুকেশী।

সুদত্ত রাজকুমারী অপালার তাঁবুতে ঢুকেই বলল, বহুদিনের বাসনা আজ পূর্ণ হলো দেবী। চল, আমরা দুজনে এখন চলে যাই এমন একটা দেশে যেখানে সম্রাটের ছোঁড়া তীর কখনো পৌঁছতে পারবে না।

হঠাৎ রাজকুমারীর কণ্ঠ সোচ্চার হল, পালাবার আগে আমার পুরস্কারটা দিয়ে যান প্রভু।

বিস্ফারিত চোখে তাকাল সুদত্ত। এ যে চারুকেশী! ফাঁকি দিয়ে কখন উড়ে গেছে পাখি। সে তাঁবুর বাইরে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যাচ্ছিল রাজকুমারীর খোঁজে। তাকে পেছন থেকে টেনে ধরল চারুকেশী।

যদি আমার পুরস্কারটি একান্তই দেবার মতলব না থাকে তাহলে আপনার অপূর্ব ছদ্মবেশটির জন্য আমার হাত থেকে পুরস্কার নিয়ে যান।

এই মুখরা দাসীটিকে উপযুক্ত শাস্তি দেবার জন্য ফিরে দাঁড়ানো মাত্র সুতীক্ষ্ণ এক ছুরিকা আমূল বিদ্ধ হয়ে গেল সুদত্তের বুকে। তীব্র যন্ত্রণায় পাক খেতে খেতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল সুদত্ত। তাঁবু ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এল চারুকেশী। সে ছুটে চলল সামনের দিকে।

সুদত্তের অন্য দুজন সঙ্গী, বৃক্ষের অন্তরালে কেউ আত্মগোপন করে আছে কিনা খোঁজ করতে গিয়েছিল, তারা ফিরে এসে আর কাউকে দেখতে পেল না। তারা উচ্চৈস্বরে সুদত্তের নাম ধরে ডাকতে লাগল, কিন্তু কোনো সাড়াই পাওয়া গেল না সেই রণক্ষেত্রের ভেতর থেকে।

হঠাৎ তাদের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল চারুকেশীর ওপর। তারা রাজকন্যাকে কখনো দেখেনি, তাই ভাবল, রাজকন্যা দৌড়ে পালাচ্ছে আত্মরক্ষার জন্য।

ঘোড়া ছুটল রাজকুমারীকে ধরতে।

চারুকেশী বলল, এত সহজে রাজকুমারীকে পাবে না তোমরা। আমার হাতে রয়েছে তীক্ষ্ণ ছুরিকা, ধরার চেষ্টা করলেই আমি এই ছুরিকা নিজের বুকে আমূল বিদ্ধ করে দেব। তার চেয়ে শোন আমার কথা।

ধাবমান দুই ঘোড়সওয়ার রাশ টেনে ধরলে চারুকেশী বলল, তোমরা যদি আমাকে পেতে চাও তাহলে একটি পথই শুধু খোলা আছে।

ঘোড়সওয়ার সমস্বরে বলে উঠল, কি সে পথ রাজকুমারী?

দুজন আমাকে একই সঙ্গে লাভ করবে এ অসম্ভব। তোমরা বরং যুদ্ধ শুরু কর, যে জয়ী হবে , তাকেই আমি স্বামী হিসেবে বরণ করে নেব।

চারুকেশীর মুখ থেকে কথাটি খসামাত্রই দুজন যোদ্ধা ঝাঁপিয়ে পড়ল। পরস্পরের ওপর।

দীর্ঘ সময় ধরে চলতে লাগল লড়াই। একজন অন্যজনকে অনুসরণ করে। বাতাসের বুকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে দ্রুতগামী অশ্বের পদধ্বনি।

কখনো প্রান্তরে, কখনো নদীতীরে, আবার কখনো-বা জঙ্গলের গভীরে শোনা যায় যোদ্ধাদের হুঙ্কার।

শেষ আছে সবকিছুর, শেষ আছে যুদ্ধেরও।

নদীতীর ধরে ছুটতে গিয়ে একটি ঘোড়া হঠাৎ পিছলে পড়ল তার সওয়ার নিয়ে। পেছনে ধাওয়া করছিল যে যোদ্ধা সে তার সুতীক্ষ্ণ ভল্লটি সজোরে গেঁথে দিল প্রতিদ্বন্দ্বীর বুকে।

বিজয়ী বীর ফিরে আসতেই চারুকেশী তাকে একটা তাঁবুতে নিয়ে গিয়ে তার ক্ষতস্থান ধুইয়ে দিল। সেবাযত্নে সে সুস্থ করে তুলল ক্ষতবিক্ষত মানুষটাকে।

চারুকেশী স্থির করে ফেলেছিল, সে আর ফিরে যাবে না রাজপ্রাসাদে। দাসীকে চিরদিনই বন্দি হয়ে থাকতে হয়। রানী, রাজমাতা আর রাজকন্যাকে তুষ্ট করতে হয় সেবাযত্নে। মন যুগিয়ে চলাই দাসীদের কাজ। তাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা নেই, সংসার গড়ার কামনা-বাসনা নেই।

এই তো ভাল হল, একটা সংসার গড়ার সুযোগ পাবে সে। যেহেতু মানুষটা তাকে রাজকন্যা ঠাউরেছে

সেহেতু সারা জীবন অমর্যাদা করতে পারবে না তাকে। বিধাতা এমনি করেই ঘুরিয়ে দেন ভাগ্যের চাকা।

চন্দ্র অস্তে যাবার মুখে ওরা দুজনে দুটো ঘোড়ায় চড়ে বসল। ওস্তাদ মেয়ে চারুকেশী, সে মহারানীর উদ্যানে সহিসকে উৎকোচ দিয়ে ঘোড়ায় চড়া শিখেছিল। এখন তেজী ঘোড়ার পিঠে চেপে একটুও ভয় না পেয়ে ছুটিয়ে নিয়ে চলল তার নতুন পাওয়া মানুষটার পিছু পিছু।

আশ্চর্য অনুমান উদয়ভদ্রের। যে পথরেখা তিনি এঁকে দিয়েছিলেন, তাকে অনুসরণ করে ভবদেবের প্রাসাদে এসে পৌঁছল অপালা।

একটি মাত্র দাসীর সঙ্গে সাধারণ রমণীর বেশে দৌহিত্রীকে প্রাসাদে প্রবেশ করতে দেখে বৃদ্ধ রাজা ভবদেব চোখের জল সম্বরণ করতে পারলেন না। দৌহিত্রীর মাথায় হাত রেখে বললেন, এ দীনবেশে কেন দিদি? সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের কন্যা, সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের একমাত্র ভগিনীর এ দশা কে করল?

গভীর চিন্তা, উদ্বেগ আর পথশ্রমে ক্লান্ত অপালা নিজেকে স্থির রাখতে পারল না। সে ঢলে পড়ল মাতামহের বুকের ওপর। মূর্ছিত অপালাকে অতি যত্নে ধরাধরি করে নিয়ে যাওয়া হল রাজঅন্তঃপুরে। সেখানে সেবাযত্নে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠল রাজকুমারী।

মহারাজ ভবদেব দৌহিত্রীর মুখ থেকে শুনলেন ভয়াবহ দুর্ঘটনার কথা। বর্ণনা দেবার সময় অপালার চোখের সামনে ভাসছিল উদয়ভদ্রের মুখ। বারবার চোখ দুটি অশ্রুজলে ভরে উঠছিল। সুদত্তের হাতে চারুকেশীর পরিণতির কথা ভেবে অস্থির হয়ে উঠেছিল তার মন।

মহারাজ ভবদেব তীক্ষ্ণধী ব্যক্তি। তিনি বুঝেছিলেন, যা ঘটবার তা কাল রজনীতেই ঘটে গেছে। দস্যু দমনের জন্য কোনো সৈন্য প্রেরণের প্রয়োজন নেই। তাছাড়া এ দস্যুরা এসেছে গভীর একটা উদ্দেশ্য নিয়ে। তাদের চক্রব্যূহ থেকেই ভাগ্যবলে বেরিয়ে এসেছে তাঁর দৌহিত্রী।

তবু ভবদেব কয়েকজন সশস্ত্র অশ্বারোহীকে দু-একজন বিশেষজ্ঞ পথ প্রদর্শকের সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন। অপালার কাছ থেকে বিশেষভাবে জেনে নিলেন উদয়ভদ্র আর চারুকেশীর আকৃতি-প্রকৃতি ও পরিধেয় বস্ত্র অলংকার সম্বন্ধে।

কয়েকদিন অন্বেষণের পর ফিরে এল দলটি। তারা সব কটি মৃতদেহেরই সৎকার করে এসেছে। কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করেও খুঁজে পায়নি উদয়ভদ্র কিংবা চারুকেশীকে। কয়েকটি সওয়ারহীন অশ্বকে তারা প্রান্তরে বিচরণ করতে দেখেছে। এগুলিকে মৃত সৈনিকদের অশ্ব বলেই অনুমান করেছে তারা।

তবে সঙ্গে এনেছে একটি উৎকৃষ্ট জাতের লোহিত বর্ণের অশ্ব। প্রাণীটিকে তারা নদীর ধার বরাবর ছুটতে দেখেছিল। মনে হচ্ছিল, প্রভুকে সে খুঁজছে উদ্‌ভ্রান্তের মতো। অনেক কষ্টে তাকে ধরে আনা সম্ভব হয়েছে।

অপালা অশ্বটিকে দেখেই চিনতে পারল। সে ভেঙে পড়ল কান্নায়। বলল, উদয়ভদ্র এই অশ্বে আরোহণ করে এসেছিলেন। নিশ্চয়ই তিনি অন্য কোনো স্থানে নিহত হয়েছেন। হয়তো নদীর তীর অবধি দস্যুরা তাঁর পিছে ধাওয়া করে যাওয়া আর সেখানেই তাঁকে হত্যা করে ফেলে দেয় নদীর জলে। ঐ প্রভুভক্ত অশ্ব তাই নদীর তীর ছেড়ে অন্য কোথাও যায়নি।

ভবদেব বললেন, অঘটন যা ঘটার ঘটে গেছে দিদি। এখন দুঃসংবাদটা যত সত্বর সম্ভব পাঠাতে হবে পাটলীপুত্রে। আমার প্রিয় কাচ এখন সম্রাট, সে যা ভাল বিবেচনা করবে তাই করবে।

অপালা বলল, আপনার প্রেরিত সংবাদ-বাহকের সঙ্গে ফিরে যেতে চাই মাতামহ। বড় অস্থির হয়ে উঠেছে আমার মন।

ভবদেব বললেন, আমি উপযুক্ত রক্ষী দিয়ে তোমাকে পাঠিয়ে দিতে পারি, কিন্তু সেরকম ব্যবস্থা নেওয়ার আগে চাই পাটলীপুত্রের সম্রাটের অনুমতি। তাছাড়া এ ঘটনার মূলে যদি লিচ্ছবী অঞ্চলের কোনো দস্যুর হাত থাকত তাহলে আমি নিজ দায়িত্বে তোমাকে পাঠাতাম। এক্ষেত্রে দুর্ভাগ্যবশতঃ পাটলীপুত্রের প্রাসাদরক্ষী যুক্ত। তাই তোমার প্রত্যাবর্তন সম্বন্ধে যা কিছু করণীয় তা স্থির করবে পাটলীপুত্রের সম্রাট।

অপালা এসময় তার ভ্রাতৃজায়া দত্তাদেবীর স্নেহছায়ায় থাকার জন্য অধীর হয়ে উঠেছিল, কিন্তু মাতামহের কথার যৌক্তিকতা সে অস্বীকার করতে পারল না। নীরবে মেনে নিল সে মহারাজ ভবদেবের সিদ্ধান্ত।

দ্রুতগামী দুজন অশ্বারোহী প্রেরিত হল পাটলীপুত্রে। তারা ফিরে এল পক্ষকালের মধ্যে। সঙ্গে এল সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের বিশাল এক অশ্বারোহী বাহিনী। দুই ঘোড়ার একটি রথও সম্রাট পাঠিয়েছিলেন ভগ্নীকে নিয়ে যাবার জন্য।

ভবদেব এই এক পক্ষকাল দৌহিত্রীর মানসিক শান্তির জন্য তাকে নিয়ে বৌদ্ধবিহারে ঘুরে বেড়াতেন। শ্রমণদের শান্ত জীবনযাপন অপালার মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। এক সময় তার মনের মধ্যে এমনই বৈরাগ্য জন্মে যে সে ভেবেছিল কোন বৌদ্ধ নারী-সংঘে যোগ দিয়ে সে শ্রমণীর বৈরাগ্যময় জীবনযাপন করবে। কিন্তু সে আকাঙ্খা পূর্ণ হবার আগেই রথ এল পাটলীপুত্র থেকে। অপালাকে গভীর একটি দুঃখ বুকে নিয়ে ফিরে যেতে হল পিতৃগৃহে।

জননী কুমারদেবী, মহারানী দত্তাদেবী ও সম্রাট ভ্রাতা সমুদ্রগুপ্তের একান্ত অনুরোধ সত্ত্বেও অপালা আর কোনদিন সংসার রচনায় আগ্রহী হয়নি। কেবল একটি অনুরোধ সে রক্ষা করেছিল, বৌদ্ধ নারী-সংঘে ইচ্ছে থাকলেও যোগদান করেনি সে।

সম্রাট ভগ্নীকে অত্যন্ত সমাদর করতেন। কখনো কখনো রাজকার্যে পরামর্শ নিতেন তার। অপালা শ্রমণী-সংঘে যোগদান না করেও মানবকল্যাণে নিযুক্ত করল নিজেকে। পথিপার্শ্বে বহুস্থানে স্থাপন করল জলসত্র। সেই সকল 'প্রপা'তে (জলসত্র) সে নিযুক্ত করল মানবকল্যাণব্রতী বয়স্কা রমণীদের। মাঝে মাঝে অপালা স্বয়ং ভিক্ষুণীর বেশে ঐ সকল জলসত্র পরিদর্শন করে আসত।

বেশ কয়েক বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাবার পর একটি প্রপা পরিদর্শনে এসে অপালা একটি খবর পেল। কয়েকদিন আগে এক বৌদ্ধভিক্ষু পথশ্রমে ক্লান্ত ও রৌদ্রদগ্ধ হয়ে এই 'প্রপা'তে আসেন। তিনি এমনি অবসন্ন হয়ে পড়েছিলেন যে সম্মুখস্থ তরুতলে বেশ কিছু সময় তাঁকে শায়িত অবস্থায় কাটাতে হয়। জলসত্রের কুটহারিকা (যে নারী জল বহন করে আনে) তাঁকে শর্করা খণ্ডের সঙ্গে জলপান করতে দেন। তিনি সুস্থ হয়ে কুটহারিকার মঙ্গলের জন্য করুণাময় বুদ্ধের কাছে প্রার্থনা জানান। প্রত্যাগমনের আগে তিনি জানতে চান, এই জলসত্রটি কোন মহানুভব ব্যক্তির দানে গড়ে উঠেছে। কুটহারিকা তখন চিরকুমারী ব্রতধারিণী অপালার নাম করে এবং এ কথাও বলে, বহুস্থানে তিনি এ ধরনের জলসত্র প্রতিষ্ঠা করেছেন। রাজকুমারী নিজে ঘুরে ঘুরে এই সত্রগুলি নিয়মিত পরিদর্শনও করেন।

ভিক্ষু সবিস্ময়ে তাকিয়েছিলেন কিছুক্ষণ। চলে যাবার সময় বলেছিলেন, দেবী অপালাকে জানাবেন, ভিক্ষু উদয়ভদ্র তাঁর করধৃত পবিত্র পদ্মটি করুণাময় বুদ্ধের চরণে নিবেদন করেছেন।

।।তিন।।

সমুদ্রগুপ্ত মাতৃচরণ বন্দনা করে বললেন, পরামর্শ আছে মা।

কি বিষয়ে বাবা?

সম্রাট বললেন, পিতা আমাকে এই সিংহাসনের ভার কেবল স্নেহবশতঃই দেননি, আমি তাঁর যোগ্য উত্তরাধিকারী হতে পারব, এই ভরসাতেই সাম্রাজ্য আমার হাতে অর্পণ করেছেন।

কুমারদেবী বললেন, আমি তা জানি পুত্র।

সম্রাট সঙ্গে সঙ্গে বললেন, কিন্তু মা, আমি যদি কেবল পিতার সাম্রাজ্যটুকু নিয়ে বসে থাকি তাহলে অল্পদিনের ভেতরেই এ সাম্রাজ্য ভেঙে পড়বে। আমাদের সাম্রাজ্যের বাইরে অনেক পরাক্রমশালী নরপতি আছেন। তাঁরা লোলুপ দৃষ্টিতে লক্ষ করছেন মহারাজাধিরাজ চন্দ্রগুপ্তের অমৃত পাত্রটির দিকে। আমি যে সেই হিরন্ময় পাত্রের যথার্থ রক্ষাকর্তা এটা প্রমাণ দেবার সময় এসেছে এখন।

রাজমাতা বললেন, এ বিষয়ে তোমার পরিকল্পনা আমাকে খুলে বল কাচ।

আমি দিগ্বিজয়ে যাত্রা করব মা। উত্তর দক্ষিণ, পূর্ব পশ্চিম জয় করে আমি হতে চাই একরাট সম্রাট।

কুমারদেবী কিছুক্ষণ মৌন থেকে বললেন, সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সন্তান শৌর্যে পিতাকে অতিক্রম করে যাবে, মা হিসেবে অবশ্যই আমি তা চাইব। কিন্তু এর বেশী আমার আরও কিছু চাইবার আছে পুত্র।

কি সে বস্তু মা?

মনুষ্যত্ব পুত্র। তোমার বিজয়যাত্রা যদি কেবলমাত্র অসির ঝনৎকারে পরিণত হয় তাহলে মায়ের দুঃখের আর অবধি থাকবে না। বিজয়লাভ করতে গেলে অনেক সময় প্রয়োজন হয় রক্তক্ষয়ের, কিন্তু বাবা, রক্তক্ষয় না করে যেখানে বিজয়লাভ সম্ভব সেখানে তোমার অসির জিহ্বা েন অকারণে সিক্ত না হয়। আর তাছাড়া আরও কিছু কথা আছে।

বল মা।

নারীর ওপর সম্মান দেখাতে ভুলবে না। যুদ্ধে বিজয়ী হবার পর নগরীর পথে যে বিজয় মিছিল বেরুবে, তাতে যেন ঔদ্ধত্য না প্রকাশ পায়। নতমস্তকে করজোড়ে পথ অতিক্রম করবে। বিজিতের কণ্ঠে যে জয়ধ্বনি ওঠে তা প্রাণের ভেতর থেকে নয়, ভয় থেকে। যারা পথিপার্শ্বে দাঁড়িয়েছে বিজয়ীর সম্বর্ধনার জন্য তাদের অনেকেরই স্বামী-পুত্র নিহত হয়েছেন রণক্ষেত্রে।

সম্রাট বললেন, তুমি ভুলে যেও না মা, আমি তোমারই সন্তান। পিতা আমার বাহুতে রেখেছেন তাঁর শক্তির স্পর্শ আর তুমি আমার হৃদয়ে দিয়েছ করুণার ছোঁয়া। আমি তোমার আর্শীবাদ নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করব আর সারাক্ষণ মনে রাখব তোমার এই অমূল্য উপদেশ।

আরও দু-একটি কথা আছে বাবা।

সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত তাকিয়ে রইলেন মায়ের মুখের দিকে।

কোনো দেশকে জয় করতে গিয়ে তার প্রাচীন মন্দিরাদি ধ্বংস কর না। সকল ধর্মপ্রতিষ্ঠানকেই নতমস্তকে শ্রদ্ধা জানাবে। আর একটি কথা, কৃষকদের শস্যক্ষেত্র অথবা শস্যাগারে কখনো অগ্নিসংযোগ করবে না। রণতরী ছাড়া সাধারণ মানুষের ব্যবহার্য তরণীগুলি যেন অক্ষত থাকে।

সম্রাট বললেন, আমি তোমার উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালনের চেষ্টা করব মা।

মায়ের মন্দির থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন সমুদ্রগুপ্ত।

মহামন্ত্রী, রাজপুরোহিত, নক্ষত্রদর্শ (জ্যোতিষী), চারতন্ত্রের (গুপ্তচর বিভাগ) প্রধান এবং মহাসন্ধি বিগ্রহিককে (যুদ্ধ ও সন্ধি বিষয়ে অভিজ্ঞ মহামন্ত্রী) নিয়ে সম্রাট অতঃপর ঢুকলেন অন্তিকাগারে (গোপন পরামর্শকক্ষ)।

সম্রাট এবং পারিষদদের দীর্ঘ আলোচনার পর স্থির হল, প্রথমে সৈন্যবাহিনী অগ্রসর হবে আর্যাবর্তের বিভিন্ন রাজ্য লক্ষ করে। একে একে অধিকৃত রাজ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করে তবেই তারা দাক্ষিণাত্য বিজয়ে মনোনিবেশ করবে।

মহামন্ত্রী বললেন, আর্যাবর্ত আমাদের কাছে যতখানি পরিচিত, দাক্ষিণাত্য ততখানি নয়। তাই আর্যাবর্ত বিজয় শুরু হলে আমাদের সৈন্যবাহিনীর বিক্রমের কথা ছড়িয়ে পড়বে দিকে দিকে। তখন দাক্ষিণাত্যের রাজন্যবর্গ ও জনসাধারণের উপর সম্রাটের শক্তির প্রভাব গিয়ে পড়বে। এর ফলে বেশ কিছুটা সহজসাধ্য হবে দাক্ষিণাত্য বিজয়।

সম্রাট চারতন্ত্রের প্রধানের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, মহারাজাধিরাজ চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের দিকে বিভিন্ন রাজ্য কিরূপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বলে আপনি মনে করেন?

চারতন্ত্রের প্রধান সহস্রাক্ষ বললেন, সম্রাট, দীপ্ত সূর্যকে কোন পেচকই বা প্রীতির দৃষ্টিতে অবলোকন করে! মৌর্য-সূর্য অস্তগমন করলে উল্লুরা কয়েক শতাব্দী অন্ধকার ভারতভূমি চষে বেড়িয়েছে। এখন ভারতের আকাশে উঠেছে নতুন সূর্য। তাই আপন আপন অন্ধকার নীড়ে পেচকের দল মুখ ব্যাজার করে বসে আছে, আর মনে মনে গণনা করছে উদিত সূর্যের অস্তগমনের কাল।

সম্রাট সহাস্যে বললেন, ওদের আস্তানায় আঘাত হেনে একবার উড়িয়ে দেওয়া দরকার। নইলে বাত ব্যাধিতে আক্রান্ত হবে।

সকলে সম্রাটের সরস মন্তব্যে হাস্য করতে লাগলেন।

সহস্রাক্ষ এবার বিষয়ান্তরে গেলেন, সম্রাট, আর্যাবর্তের কোন অংশে প্রথম আঘাতটি হানতে চান? একেবারে উত্তর-পশ্চিমের শক, কুষাণ অধ্যুষিত অঞ্চলে কি?

সম্রাট বললেন, গুপ্ত সৈন্যবাহিনী বিদেশিদের বিতাড়নের কাজ সহজেই সম্পন্ন করতে পারবে। কিন্তু আমরা যদি অহিচ্ছত্রের রাজা অচ্যুতকে লক্ষ করে প্রথম শরটি নিক্ষেপ করি তাহলে কি তিনি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করবেন না?

মহাসন্ধি বিগ্রহিক বীরবর্মা বললেন, কিন্তু সম্রাট, আমাদের গমনপথের পার্শ্বে প্রয়াগ ও অযোধ্যার সীমানা ছাড়ালে অনেকগুলি শক্তিশালী রাষ্ট্রের মুখোমুখি হতে হবে। তারা আমাদের এই বিশাল বাহিনীর অগ্রগমনকে কি সুনজরে দেখবে?

আমরা ইচ্ছা করেই আমাদের বাহিনীর বিশালতা ওদের দেখাতে চাই। প্রত্যাবর্তনের পথে ওদের সঙ্গে হবে আমাদের বোঝাপড়া। যাদের অন্তরে কিছু ভীতির সঞ্চার হবে তারা যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়িয়ে সন্ধি করতে চাইবে। অন্যদের সঙ্গে হবে আমাদের শক্তি পরীক্ষা।

মহামন্ত্রী বললেন, উত্তম পরিকল্পনা সম্রাট। তবে এ বিষয়ে আমাদের কিছু ভাববার আছে।

সম্রাট বললেন, এজন্যেই তো পরামর্শগৃহে সমবেত হওয়া। আলোচনার মধ্য দিয়ে পরিকল্পনার ভুলত্রুটি ধরা পড়বে।

মহামন্ত্রী অমিতোভব বললেন, আমাদের এই দিগ্বিজয় যাত্রা পূর্বাহ্নেই দর্শন করবে বিভিন্ন রাষ্ট্র। তারা আমাদের সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখবে। আমরা যখন প্রত্যাবর্তন করব তখন অনেকগুলি দিন অতিবাহিত হয়ে যাবে। এর মধ্যে এই রাষ্ট্রগুলি পরস্পর সংঘবদ্ধ হবার সুযোগ পেয়ে যাবে।

সম্রাট বললেন, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে এত বেশি স্বার্থের সংঘাত রয়েছে যে তাদের সকলের এত সহজে একত্রিত হওয়া প্রায় অসম্ভব। তবে কোনো কোনো রাষ্ট্র গুপ্ত-বাহিনীর প্রতিরোধের জন্য একত্রিত হতে পারে। আর সেরকম সম্মেলন আমাদের যুদ্ধের পক্ষে অনুকূল মনে করি।

সকলে সম্রাটের মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন দেখে সম্রাট বললেন, ছোট ছোট রাষ্ট্র সংঘবদ্ধ হলে আমাদের একই আক্রমণে অনেকখানি কাজ হয়ে যাবে। খণ্ড খণ্ড যুদ্ধে বিরাট বাহিনীকে অনেকগুলি অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়।

মহামন্ত্রী বললেন, সম্রাটের বিশ্লেষণ যথার্থই যুক্তিপূর্ণ।

সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত নক্ষত্রদর্শের দিকে তাকিয়ে বললেন, জ্যোতিষশ্রেষ্ঠ, এই অভিযান সম্বন্ধে আপনার অভিমত অত্যন্ত মূল্যবান বলে আমরা মনে করি। এতক্ষণ আপনি গণনায় ব্যস্ত ছিলেন। এখন আমাদের এই যাত্রার শুভাশুভ সম্বন্ধে আপনার গণনার ফলটি অসংকোচে ব্যক্ত করুন।

এখনো মাসাধিককাল অপেক্ষা করতে হবে সম্রাট। মার্গশীর্ষ মাসটি শুরু হওয়ামাত্র আমাদের স্বপক্ষে অনুকূল পবন বইবে। তখন কেউ সম্রাটের গতিরোধ করতে পারবে না।

সম্রাট উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠলেন, উত্তম। ঐ সময়টি সবদিক দিয়েই অনুকূল। আমার বাহিনীকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত করতে ঐ সময়টুকুর অত্যন্ত প্রয়োজন। তাছাড়া ঐ সময়ে কৃষকেরা ফসল গৃহজাত করার জন্য ব্যস্ত থাকবে। আমাদের ন্যায় সমস্ত রাষ্ট্রের সর্বক্ষণের জন্য সৈন্য মজুত থাকে না। কৃষিকর্মের শেষে কৃষকেরা যুদ্ধে অংশ নেয়। সুতরাং অসময়ে রাজার কাছ থেকে যুদ্ধের ডাক এলে তারা গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করবে। এতে আমাদেরই লাভ নক্ষত্রদর্শ ভরদ্বাজ।

সঙ্গে সঙ্গে রাজপুরোহিতের দিকে তাকিয়ে সম্রাট বললেন, এখন থেকে নিত্য মঙ্গল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন। শত্রু নিধনের জন্য বৈদিক মতে যে সকল যজ্ঞ বিধেয় সেগুলি আমাদের রণক্ষেত্র থেকে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত চলতে থাকবে।

রাজপুরোহিত পুণ্ডরীক বললেন, এই উপলক্ষে করণীয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান অবশ্যই নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিপালিত হবে সম্রাট।

সন্ধ্যায় বিলোপনভূমি (প্রসাধন গৃহ) থেকে বেরিয়েই স্বামীকে দেখতে পেলেন দত্তাদেবী। কিছুটা বিস্মিত হয়েই জিজ্ঞেস করলেন, এমন অসময়ে প্রভুর আগমন।

সম্রাট সকৌতুকে বললেন, স্বামী-স্ত্রীর দর্শনে অথবা মিলনে কি নক্ষত্রদর্শের (জ্যোতিষী) পরামর্শ প্রয়োজন?

লজ্জিত হয়ে মহারানী বললেন, আসুন সম্রাট। এতটা সৌভাগ্য আ: া করিনি।

সম্রাটকে রীতি অনুযায়ী সম্মান জানিয়ে নিজ কক্ষে আহ্বান করে নিয়ে গিয়ে বসালেন দত্তাদেবী। দীপাধারে দীপশিখা দূর করছিল সন্ধ্যার অন্ধকার। প্রাঙ্গণে যামহস্তী (প্রহরে প্রহরে যে হস্তীকে বের করে রাত্রির গভীরতা ঘোষণা করা হয়) প্রহর ঘোষণা করে গেল। মন্দিরে আরত্রিকের বাদ্যঝংকার শেষ হল সবেমাত্র। সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী উভয়েই প্রণাম জানালেন দেবতার উদ্দেশ্যে।

এবার শয্যায় অর্ধশায়িত অবস্থায় দেহভার ন্যস্ত করে বসলেন সম্রাট। শুরু হল আলাপন।

এক সময় যুদ্ধ প্রসঙ্গ এসে গেল। দত্তাদেবী বললেন, সম্রাট যতদিন না যুদ্ধ শেষ করে রাজধানীতে ফিরে আসছেন ততদিন নিদ্রাদেবীর আরাধনায় মনঃসংযোগ করা নিতান্তই কষ্টকর হয়ে উঠবে।

সম্রাটজায়ার যোগ্য উক্তি এটি নয় দত্তাদেবী।

আমি নিরন্তর আপনার বিজয়ই প্রার্থনা করব প্রভু।

সম্রাট বললেন, তোমার বিশ্রামে ব্যাঘাত যেন না ঘটে মহারানী। তাহলে রণশিবিরে বিশ্রামের জন্য প্রবেশ করেও আমি শান্তি পাব না।

মহারানী অশ্রুসজল কণ্ঠে বললেন, আমি উদ্বেগহীন নিদ্রার জন্য চেষ্টা করে যাব সম্রাট। প্রতি মুহূর্তে ভাবব, আমার স্বামী অপরাজেয়।

হঠাৎ কথান্তরে চলে গেলেন সম্রাট, এ যুদ্ধে হয়তো ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের সঙ্গে সংঘাত এড়াতে পারব না মহারানী।

বিস্মিত দৃষ্টি মেলে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন দত্তাদেবী।

আমি তোমার পিতৃকুলকেই ইঙ্গিত করছি।

মহারানী দত্তাদেবী অধোবদনে বসে রইলেন।

কিছুকাল পূর্বে মহারানীর পিতৃগৃহ থেকে একটি পত্র এসেছিল। সে পত্রে একটি অসম্মানসূচক ইঙ্গিত করা হয় সম্রাট সম্বন্ধে। সেই ইঙ্গিতবাহী ছত্র হলো, 'যে পুরুষ নিজ ভগ্নীর রক্ষাকার্যে অসমর্থ হয়, সে কি করে আমার ভগ্নীর রক্ষাকার্যে সমর্থ হবে! তাছাড়া প্রাসাদরক্ষক যদি স্বয়ং ভক্ষক হয় তাহলে সেই প্রাসাদ-স্বামীর গুণগান শতমুখে না করে উপায় কি।'

এই অশালীন উক্তিটি করেছিলেন দত্তাদেবীর জ্ঞাতিভ্রাতা গণপতি নাগ। দত্তাদেবীর পিতা রুদ্রদেবের মৃত্যুর পর তাঁর কোনো পুত্রসন্তান না থাকায় মথুরার সিংহাসন অধিকার করেন গণপতি নাগ। নতুন মহারাজের সিংহাসনে আরোহণ উপলক্ষে আয়োজিত সমারোহে যোগদানের জন্য নিমন্ত্রণপত্র আসে পাটলীপুত্রে। তার পূর্বে মহারাজ রুদ্রদেবের মৃত্যুসংবাদ বহন করে পত্র এসেছিল। সে সময় সম্রাটের ভগ্নী অপালাকে নিয়ে চলেছিল বিপর্যয়। আর সেই বিপর্যয়ের কথা জানিয়ে জননীর কাছে পত্র লেখেন দত্তাদেবী। প্রাসাদ অন্তঃপুরে পত্রটি প্রবেশের আগেই গণপতি নাগ সেটি পাঠ করেন। তাই মুকুটউৎসবে যোগদানের জন্য নিমন্ত্রণপত্রের সঙ্গে ভগ্নীকেও এই অবিবেচনাপ্রসূত পত্রটি লেখেন মথুরার নব নির্বাচিত মহারাজ।

দত্তাদেবী কতক্ষণ পরে মুখ তুলে বললেন, আমি আবাল্য দেখে এসেছি, আমার এই ভ্রাতাটি অত্যন্ত দুর্মুখ ও পরশ্রীকাতর।

সম্রাট বললেন, তুমি হয়তো জান না, আমি ওর নিমন্ত্রণপত্রের জবাবে লিখেছিলাম, উৎসবে যোগ

দিতে পারলাম না বলে দুঃখিত, তবে অদূর ভবিষ্যতে পরস্পরের সঙ্গে দেখা হবে। এখন সেই সাক্ষাতের মহালগ্নটি এসে গেছে।

দত্তাদেবী বললেন, আপনার ইচ্ছাই জয়যুক্ত হোক।

মহারানীর প্রকোষ্ঠ থেকে বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গে সম্রাট-জননীর খাস দাসী এসে নত-নমস্কারে জানাল, রাজমাতা সম্রাটের দর্শন অভিলাষী।

সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত তৎক্ষণাৎ চললেন জননী সন্দর্শনে।

মাতাপুত্রে দেখা হলে সাধারণ কুশল প্রশ্নাদির পর জননী কুমারদেবী বললেন, মন্ত্রীপরিষদে আলোচনার পর কি স্থির হলো কাচ?

মার্গশীর্ষ (অগ্রহায়ণ) মাসে শুরু হবে দিগ্বিজয় যাত্রা। নক্ষত্রদর্শ বিচার করে বললেন, সবচেয়ে প্রশস্ত সময় এই মাসটি।

কুমারদেবী বললেন, তাহলে সর্বদিক থেকে প্রস্তুত হও। আমি বীরজায়া, এখন ত্রিভুবনজয়ী বীরেব জননী হতে চাই।

সমুদ্রগুপ্ত ভূলুণ্ঠিত হয়ে জননীর পদধূলি গ্রহণ করলেন।

জননী তাঁর প্রিয় কাচকে চুম্বন করে পাশে বসালেন। বললেন. যেদিন তোমার পিতা রাজসভায় ভাবী সম্রাটরূপে তোমার নাম ঘোষণা করেন, সেদিন কি বলেছিলেন মনে আছে?

আছে মা।

সহসা সমুদ্রগুপ্তের চোখের সামনে সেদিনের দৃশ্যটি ভেসে উঠল।

পূর্ণ সভাগৃহ। অতি সুশোভিত। অমাত্যবর্গ, সামন্ত নৃপতিগণ বসে রয়েছেন যে যার আসনে। রাজ্যের বিশিষ্ট প্রজাকুল সমবেত হয়েছেন সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের মুখ থেকে ভাবী সম্রাটের নাম শোনার জন্য। উৎসুক প্রতীক্ষায় বসে রয়েছেন সকলে। রাজপুত্রেরা যে যার আসনে বসে আছেন অতি সুসজ্জিত বেশভূষায়। পিতার মুখ থেকে কার নাম উচ্চারিত হয়, তাই শোনার জন্য উৎকর্ণ হয়ে আছেন।

হঠাৎ উচ্চারিত হল সেই প্রত্যাশিত নামটি, সমুদ্রগুপ্ত হবেন আমার সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী।

অমাত্যবর্গ, সামন্তগণ এবং প্রজাকুলের উদ্বেগ এতক্ষণে প্রশমিত হল। তাঁরা ভাবী সম্রাটের জয়ধ্বনি দিতে লাগলেন। অন্য রাজকুমারেরা নীরবে বসে রইলেন। তাঁদের মুখ ততক্ষণে পাংশুবর্ণ ধারণ করেছে।

পিতার আহ্বানে সমুদ্রগুপ্ত উঠে দাঁড়ালেন। নমস্কার নিবেদন করলেন সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে। তারপর ধীর পায়ে সিংহাসন-সমীপে গিয়ে পিতার চরণ-বন্দনা করলেন। মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত পুত্রকে জড়িয়ে ধরলেন বুকে। তাঁর চক্ষু আনন্দাশ্রুতে পূর্ণ। বললেন. নিজ ভূজবলে ত্রিভুবনের অধীশ্বর হও।

আবার সভাস্থল কম্পিত করে পিতাপুত্রের জয়ধ্বনি উঠল।

সমুদ্রগুপ্ত এবার চলে গেলেন ভ্রাতৃবর্গের কাছে। অগ্রজদের পাদবন্দনা করলেন আর অনুজদের শির চুম্বন করে আলিঙ্গন দান করলেন।

ধন্য ধন্য রব উঠল।

প্রাসাদে ফিরে আসার পর জননীর পাদবন্দনা করে উঠে দাঁড়াতেই কুমারদেবী আশীর্বাদ জানিয়ে বললেন, প্রজাবৎসল নরপতি হবে, এই কামনা।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি বললেন, চল বিমাতাদের গৃহে তাঁদের পাদবন্দনা করে আর্শীবাদ ভিক্ষা করে নেবে।

সেদিন সমুদ্রগুপ্তের আচরণে অভিভূত হয়েছিলেন সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের মহিষীবৃন্দ। কাচ আপন ব্যবহারে বিমাতাদের অন্তরের আশাভঙ্গজনিত ক্ষোভ দূর করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

কুমারদেবী বললেন, আজ তুমি ভ্রাতা ও জননীদের কাছে গিয়ে আশীর্বাদ ভিক্ষা করে নাও। সকলের আন্তরিক শুভকামনা তোমাকে বর্মের মত রক্ষা করবে।

সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত সেই রজনীতে জননী ও অগ্রজ ভ্রাতাদের পাদবন্দনা করে আর্শীবাদ ভিক্ষা করে নিলেন।

।।চার।।

মাসাধিককাল ধরে চলল যুদ্ধের পূর্ণ প্রস্তুতিপর্ব। সহস্র সহস্র যোদ্ধার নিত্য মহড়া আর সম্রাটের ঘনঘন জয়ধ্বনিতে আকাশ বাতাস কম্পিত হতে লাগল। হয়রাজদের হ্রেষাধ্বনি, রণকরীযূথের বৃংহতি, ধনুকের টংকার, অসির ঝনঝনা মুহুর্মুহু উত্থিত হয়ে শোনাতে লাগল মহাযুদ্ধের পদধ্বনি।

রসদের ভাণ্ডার পূর্ণ করতে লাগল বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত ভৃত্যকুল। সসম্মানে আমন্ত্রিত হলেন আঘাতজনিত চিকিৎসা-বিদ্যায় পারদর্শী বহুসংখ্যক ভিষক্। গৃহ-চিন্তক চেটকেরা (যে সকল ভৃত্য সৈন্যদের শিবির তত্ত্বাবধান করে) কাণ্ডপটমণ্ডলগুলি (বৃহৎ শিবির) নিয়ে বিশেষভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

সমবেত হল রথকার (রথনির্মাণকারী), তক(ছুতার), কর্মার(কামার), ধনুষ্কার (ধনুনির্মাতা), জ্যাকার (জ্যা নির্মাতা), ইষুকার (বাণনির্মাণকারী) প্রভৃতি কর্মীবৃন্দ। প্রাসাদের কিছুদূরে কর্মীদের জন্য গড়ে উঠল সাময়িক এক পল্লী।

ময়দানের মধ্যভাগে বিশাল পুষ্করিণী। কোশকারীরা (অসির কোষ প্রস্তুতকারিণী) তার এক তীরে আস্তানা গাড়ল। তারই অল্পদূরে বাঁধাঘাটের পাশে রজয়িত্রীদের (বস্ত্ররঞ্জনকারী) ছাউনি পড়ল। সমবেত হল রজক, ক্ষৌরকার, চর্মকারের দল। পশুচিকিৎসকদেরও সসম্মানে নিয়ে আসা হল যুদ্ধরত পশুদের ক্ষত নিরাময়ের জন্য!

সমস্ত কর্মকাণ্ড দেখে মনে হল, স্বয়ং ইন্দ্র সুরলোক থেকে তাঁর সমস্ত বাহিনী ও উদ্যোগ আয়োজনসহ নেমে এসেছেন মর্তলোকে। খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতকে তিনি বেঁধে দেবেন একই সূত্রে। মেঘডম্বরু, বিদ্যুৎচমক, বজ্রনিনাদের ভেতর দিয়ে সেই বার্তাই ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

বৈতানবহ্নি (যজ্ঞাগ্নি) তখনো প্রজ্জ্বলিত। রাজপুরোহিত প্রথমে যজ্ঞ-তিলক এঁকে দিলেন সম্রাটের ললাটে। একে একে চতুরঙ্গ সেনাবাহিনীর চারজন সৈন্যাধ্যক্ষ যজ্ঞতিলক গ্রহণ করলেন।

এ যজ্ঞ অনির্বাণ থাকবে। সম্রাটের বিজয় যেদিন সমাপ্ত হবে শুধু সেদিনই যজ্ঞকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হবে শান্তিবারি।

এরপর প্রাসাদ পশ্চাতে রেখে সম্রাট প্রবেশ করলেন একটি শিবিরে। এখানে নীরাজন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবে।

সম্রাট নিজহস্তে প্রজ্জ্বলন করলেন দীপমালা। একখানি দীপ হস্তে তিনি চক্রাকারে প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন শিবির। অতঃপর একটি সজল পদ্ম করপুটে ধারণ করে তেমনি প্রদক্ষিণ করলেন। একে একে তুলসী ও বিল্বপত্রাদি নিয়ে ধৌত বস্ত্র পরিহিত সম্রাট শিবির পরিক্রমা শেষ করে সাষ্টাঙ্গ প্রণতিতে সমাপ্ত করলেন নীরাজন অনুষ্ঠান।

ক্রিয়াকর্মাদি শেষ হলে সম্রাট দৃপ্ত চরণে শ্বেত অশ্ববাহিত রথে আরোহণ করলেন। রক্তবর্ণের ধ্বজা বায়ুতাড়িত হয়ে পত্পত্ শব্দে উড়তে লাগল।

শঙ্খধ্বনি (শঙ্খবাদক) শঙ্খে ফুৎকার তুলল। অমনি মহাশব্দে কর্ণ বধির করে বেজে উঠল রণশিঙ্গা, কাহল, ডিণ্ডিম,পটহ, ঝল্লরী।

সম্রাটের ইঙ্গিতে শুরু হল যাত্রা। যেন গতিলাভ করল মহেন্দ্র পর্বত। সম্মুখে পথপ্রদর্শক পাঁচজন অশ্বারোহী। প্রথম অশ্বারোহী বহন করছে রাজপতাকা। পথপ্রদর্শকের পশ্চাতে সারিবদ্ধ পদাতিক বাহিনী। দীর্ঘ বাহিনীর শেষে পুনরায় শুরু হয়েছে অশ্বারোহীদের যাত্রা। তাদের পশ্চাতে সম্রাটের রথ। রথের পশ্চাতে অগ্রসর হচ্ছে গজারূঢ় বাহিনী। তাদের অনুসরণ করছে রথারূঢ় যোদ্ধৃবৃন্দ। রথের পশ্চাতে পদাতিক আবার অশ্বারোহী। সবশেষে শত শত রসদপূর্ণ শকট। তাদের প্রহরায় নিযুক্ত আছে একদল অশ্বারোহী। যেন সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত প্রসারিত দেহ নিয়ে বঙ্কিম গতিতে অগ্রসর হচ্ছে এক বাসুকী নাগ।

অশ্ববাহিত রথে ইন্দ্রের মহিমায় বসে আছেন সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত। মাঝে মাঝে তাঁর সাম্রাজ্যের ভূ-প্রকৃতি আর মানুষজনকে পর্যবেক্ষণ করছেন। ফসলে পূর্ণ হয়ে আছে শস্যক্ষেত্র। কোথাও-বা কিনাশরা ফসল

তোলার কাজে ব্যস্ত। তারা হঠাৎ এই বিশাল বাহিনীকে দেখে বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে। পল্লীপ্রান্ত থেকে ভেসে আসছে ধাতব শব্দ। কর্মারদের কর্মশালায় চলেছে লোহা পেটানোর কাজ। ঐ তো ঘুরছে কুলালদের (কুমোর) চক্র। সারি সারি নিত্য ব্যবহার্য মৃৎপাত্র শুষ্ক হচ্ছে রৌদ্রতাপে। শিশুরা খেলা বন্ধ করে, পল্লীবধূরা গৃহকর্ম থামিয়ে ভীতিবহুল দৃষ্টিতে দেখছে এই প্রায় অলৌকিক যাত্রা সমারোহ।

সম্রাট ভাবছেন, ঈশ্বরের রাজ্যের সর্বত্র চলেছে নির্দিষ্ট কর্মকাণ্ড, তাহলে এই শান্ত নিরুদ্বিগ্ন জীবনযাত্রাকে বিঘ্নিত করার কি অধিকার আছে তাঁর।

আবার এক ভাবনার চক্রে তিনি ঘুরতে লাগলেন। বিচ্ছিন্ন ভারতের রাষ্ট্রগুলি প্রায়ই হানাহানিতে ক্ষয় করছে তাদের শক্তি। মৌর্যযুগের পর বিভক্ত, বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রশক্তি বাধা দিতে পারেনি বৈদেশিক আক্রমণ। পাঁচশ বছর ধরে অস্ত্রের ঝনঝনায় সন্ত্রস্ত হয়ে আছে ভারতবাসী।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপথে বারবার বেজেছে গ্রীকদের দামামা। মধ্য এশিয়া থেকে নেমে এসেছে শকজাতি। পারস্য থেকে গিরিপথ পার হয়ে ভারত আক্রমণ করেছে পহ্লবরা। এসেছে চীনদেশীয় শক্তিধর কুষাণরা। এদের বাধা দিতে পারেননি ভারতের রাজন্যবর্গ।

এই বিশৃঙ্খলার হাত থেকে বাঁচার একটি মাত্র পথ, এক রাষ্ট্রের অধীনে খণ্ড খণ্ড ভারতকে সংহত করা।

আমার ওপর ঈশ্বর দিয়েছেন এই অতি প্রয়োজনীয় কর্মটি সম্পাদনার ভার। আমি যদি সফল হই তাহলে ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। বিচ্ছিন্ন ভারতবাসী এই বিশাল দেশটিকে নিজেদের দেশ বলে ভাবতে শিখবে, গর্ব অনুভব করবে।

এখন আমার লক্ষ্যের কেন্দ্রবিন্দু হবে আর্যাবর্ত। এই আর্যাবর্তকে ঘিরেই বারবার মৃত্যুর তাণ্ডব-নৃত্য করেছে বৈদেশিক শক্তি। সামান্য রাজ্যজয় লক্ষ্য নয় আমার। এক ছত্রতলে সকলকে সমবেত করাই এ যুদ্ধযাত্রার উদ্দেশ্য। এই মহৎ কর্মকাণ্ডে বাধা এলেই তাকে চূর্ণ করে ফেলতে হবে প্রবল প্রত্যাঘাতে।

সম্রাটের বিপুল বাহিনী একদিন এসে দাঁড়াল অহিচ্ছত্রের সন্নিকটে। খরবেগে প্রবাহিত হয়ে চলেছে রামগঙ্গা। ওপারে দেখা যাচ্ছে অহিচ্ছত্রের রাজাধিরাজ অচ্যুতের প্রাসাদ। পিতলের কলসগুলি চূড়ার আকৃতিতে শোভা পাচ্ছে প্রাসাদশীর্ষে। শেষ সূর্যের আলোকছটায় অপরূপ দেখাচ্ছে প্রস্তরনির্মিত এই প্রাসাদটি।

সম্রাট দূর থেকে দূর্গ সমেত দীর্ঘ প্রাসাদ অবলোকন করলেন। চুতর্দিক পরিখার দ্বারা পরিবষ্টিত। পরিখার বাইরে বিস্তীর্ণ অর্ধচন্দ্রাকার স্থানটি নানা ধরনের বৃক্ষে পরিশোভিত। সম্রাট স্বয়ং কবি, তাই মনে মনে স্থানটির প্রশংসা না করে পারলেন না।

প্রাসাদের উত্তরে বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত অহিচ্ছত্রের নগর ও জনপদ।

সম্রাট সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে প্রাসাদ ও জনপদের দিকে তাকিয়ে যুদ্ধের স্থান নির্বাচন করতে লাগলেন। সেনাপতিদের এক সময় আহ্বান করে তাঁর পরিকল্পনার কথাটি জানিয়ে দিলেন।

চরের মুখ থেকে তিনি সংবাদ পেয়েছিলেন, অহিচ্ছত্রের মহারানী সুদেষ্ণা এপারে পিত্রালয়ে অবস্থান করছেন। রামপুরে পিতার অসুস্থতার জন্য বেশ কিছুকাল পিতৃগৃহে রয়েছেন তিনি। এদিকে অহিচ্ছত্রের দূত দ্রুতগামী অশ্বাবাহিত রথে রওনা হয়ে গেছে মহারানীকে রাজ্যে ফিরিয়ে আনার জন্য।

শত্রুদের অগ্রগমনের সংবাদ পূর্বাহ্ণেই পেয়েছিলেন মহারাজ অচ্যুত, তাই মহারানীকে ফিরিয়ে আনার জন্য এই তৎপরতা।

মহারানী সুদেষ্ণার প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে লাগলেন সম্রাট। এদিকে তৈরি হতে লাগল নদী পারাপারের জন্য নৌকা। একখানি অতি সুদৃশ্য তরণীও প্রস্তুত হলো।

সম্রাট রাতের অন্ধকারে পঞ্চ শতাধিক উৎকৃষ্ট যোদ্ধাকে পাঠিয়ে দিলেন নদীর সুদূর পশ্চিমে। তারা ঐ পথে পার হয়ে অহিচ্ছত্রের জনপদে চলে যাবে। সেখানে তারা যাযাবরের ছদ্মবেশে জাদুর খেলা দেখিয়ে বেড়াবে। প্রাসাদের দিক থেকে রণশিঙা বেজে উঠলেই স্বমূর্তি ধারণ করে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলবে

জনপদবাসীদের, যাতে তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে রাজার সঙ্গে যুক্ত হতে না পারে।

পরিকল্পনা মতো কাজ হল। মহারানী সুদেষ্ণার রথ নদীতীরে এসে দাঁড়াল চতুর্থ দিবসে। সম্রাট স্বয়ং প্রত্যুদ্‌গমন করে সসম্মানে তাঁকে এনে বসালেন একখানি সুসজ্জিত শিবিরে।

শঙ্কা ও বিহ্বলতায় রানীর মুখমণ্ডল পাংশুবর্ণ ধারণ করেছিল। সম্রাট তাঁকে অভয় দিয়ে বললেন, আপনি আমার ভগ্নীর মর্যাদায় এখানে থাকবেন মহারানী, দাসীরা আপনার সেবায় নিযুক্ত থাকবে। যথাসময়ে আপনাকে আমরা রাজপ্রাসাদে পাঠাবার ব্যবস্থা করব।

এপার থেকে দ্রুত গেল ওপারে সম্রাটের সংবাদ বহন করে।

সম্মানীয় মহারাজ,

আমি যুদ্ধপ্রার্থী। দূর্গদ্বার উন্মুক্ত করুন। পূর্বদিকের বিশাল প্রান্তরটি হে.ক আমাদের শক্তি-পরীক্ষার ক্ষেত্র।

মহারানীর জন্য উদ্বিগ্ন হবেন না, তিনি জননীর মর্যাদায় শত্রুশিবিরে অবস্থান করছেন। আপনার কাছ থেকে হয় আত্মসমর্পণ, নয় যুদ্ধ চাই। প্রাসাদ আর দূর্গদ্বার বন্ধ রাখলে আপনি অনন্তকাল অবরুদ্ধ হয়ে পড়বেন।

সমুদ্রগুপ্ত— পাটলীপুত্র।

দূত ফিরে এল। মহারাজ অচ্যুত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। তার পূর্বে তিনি প্রাসাদে ফিরে 'পেতে চান মহারানীকে।

সুসজ্জিত তরণীতে অহিচ্ছত্রের মহারানী পার হলেন রামগঙ্গা। এবার তরণীর সঙ্গে তরণী বেঁধে তৈরি হল সেতু। সেই সেতুর ওপর দিয়ে পেরিয়ে গেল সহস্র সহস্র সৈনিক।

এপার ওপারে সমতা রক্ষা করে অবস্থান করতে লাগল সম্রাটের সৈন্যদল।

মহারানী সুদেষ্ণার প্রবেশের জন্য প্রলম্বিত হল পরিখার চক্রসংযুক্ত ঘূর্ণায়মান কাষ্ঠনির্মিত সেতু। সেই পথে প্রবেশ করল বহুসংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য।

মহারানীর জন্য উন্মুক্ত হল প্রাসাদের সিংহদ্বার। সম্রাটের নির্দেশ অনুযায়ী সারিবদ্ধভাবে অশ্বারোহীরা দাঁড়িয়ে মহারানীকে শিঙাধ্বনিসহ সম্মান প্রদর্শন করল। অতঃপর মহারানী প্রাসাদে প্রবেশ করামাত্র বন্ধ হয়ে গেল সিংহদ্বার।

সম্রাটের অশ্বারোহী সৈন্যের দল পরিখা পারাপারের নিমিত্ত চারটি সেতু নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখে দিল। পশ্চিমের আরও কয়েকটি সেতু প্রাসাদরক্ষী এবং দুর্গরক্ষীদের হাতে রইল সৈন্য চলাচলের জন্য।

এবার পত্র এল অহিচ্ছত্রের মহারাজের কাছ থেকে। তিনি জানতে চান, এ যুদ্ধের উদ্দেশ্য কি? কেবলই কি পররাজ্য লিপ্সা?

সম্রাট জানালেন, ভারতভূমি অখণ্ড না হলে পারস্পরিক যুদ্ধ এড়ানো সম্ভব নয়। তাছাড়া খণ্ডিত ভারতই বারবার বিদেশি শক্তিকে প্রলুব্ধ করেছে ভারত আক্রমণে। এর অবসান ঘটানোর জন্যই তাঁর অস্ত্রধারণ।

সম্রাট মনে করেন, আর্যাবর্তে দুটি মাত্র শক্তিমান রাষ্ট্র এ কাজে সমর্থ হতে পারে। একটি পাটলীপুত্র, অন্যটি অহিচ্ছত্র। তাই যুদ্ধে উভয়কে নিষ্পত্তি করে নিতে হবে, কে বহন করবে এই গুরুদায়িত্ব।

শুরু হয়ে গেল যুদ্ধ। শিঙাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে নগরে জনপদে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করল যাযাবর ছদ্মবেশধারী সৈনিকরা।

এদিকে দুর্গ থেকে প্রান্তরে বেরিয়ে এল মহারাজের শত শত সৈন্য। অশ্বারোহী, রথারোহী আর পদাতিক সৈন্যের দল। তারা প্রাসাদ ঘিরে রচনা করল দুর্ভেদ্য ব্যূহ।

চতুরঙ্গ বাহিনী নিয়ে একটি উচ্চস্থান থেকে শত্রুপক্ষকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন সম্রাট।

নক্ষত্রদর্শ বললেন, এ যুদ্ধে যিনি প্রথম আক্রমণ করবেন, জয়লক্ষ্মী তাঁকেই জয়মাল্য পরাবেন সম্রাট।

শঙ্খধ্বনি করে সম্রাটের সৈনাবাহিনী বিপুল বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ল শত্রুসৈন্যের ওপর। হিমালয়ের তুষার-শৃঙ্গগুলি যেন ভেঙে পড়ল একযোগে। শত শত জলধারা প্রবল গর্জনে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে লাগল পথের বাধা।

প্রথম দিনের যুদ্ধে মহারাজ অচ্যুতের প্রায় অর্ধেক সৈন্য বরণ করল বীরের মৃত্যু।

সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত জ্যোৎস্নালোকে আহত সৈন্যদের নির্বিচারে রণক্ষেত্র থেকে তুলে আনতে লাগলেন নিজ শিবিরে। সকলের জন্য ব্যবস্থা করলেন চিকিৎসা ও পথ্যের।

রাতে বিশ্রামের জন্য আপন শিবিরে প্রবেশ করেই আহতদের নিরাময়ের জন্য প্রার্থনা জানালেন ঈশ্বরের কাছে।

পরে শয্যার ওপর আসন গ্রহণ করে পাটলীপুত্রের দিকে তাকিয়ে বললেন, জননী, তোমার আশীর্বাদে আমি আহত শত্রুদেরও সেবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। তাছাড়া অহিচ্ছত্রের মহারানীকে প্রদর্শন করেছি জননীর সম্মান। তুমি নিত্য আর্শীবাদ কর জননী যেন যুদ্ধ তোমার সন্তানের হৃদয়কে গ্রাস করতে না পারে।

উপাধানে মস্তক রেখে বললেন, দত্তা, আমি গভীর তৃপ্তি বুকে নিয়ে নিদ্রার কোলে আশ্রয় নিচ্ছি, তুমি নিশ্চিন্তে বিশ্রাম গ্রহণ কর।

মধ্যরাত্রে সম্রাটকে তাঁর শয্যা থেকে ডেকে তুলল ভিল্‌সা। একমাত্র দেহরক্ষী ভিল্‌সাই এ অপ্রিয় কাজটি করার অনুমতি পেয়েছিল।

সম্রাট চোখ মেলে তাকিয়ে ভিল্‌সাকে সামনে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, সৈন্যদের কুশল তো?

হ্যাঁ মহারাজ। তবে শত্রুপক্ষের এক আহত সৈনিক ঘরে ফিরে যাবার জন্য বড় উতলা হয়েছে। চিকিৎসকদের সবরকম চেষ্টা সত্ত্বেও তার রক্তক্ষরণ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়নি। সে ক্রমশঃই দুর্বল হয়ে পড়ছে।

সম্রাট বললেন, তুমি একটি রথে তাঁকে তুলে নাও। সঙ্গে একজন চিকিৎসককেও রাখবে। সৈন্যটির নির্দেশ অনুযায়ী তাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে তার ঘরে। স্বজনের মধ্যে এই অন্তিম সময়ে সে থাকতে পারলে পরম শান্তিলাভ করবে।

পরদিন যুদ্ধ আরও ভয়ংকর হয়ে উঠল। সম্রাটের সৈন্যবাহিনী মহারাজ অচ্যুতের বাহিনীকে পিছু হটতে বাধ্য করল। তারা প্রাণরক্ষা করল কেল্লার মধ্যে আশ্রয় নিয়ে।

তৃতীয় দিনের প্রভাত হতে না হতেই জলমগ্ন হয়ে গেল সমস্ত প্রান্তর। রামগঙ্গা থেকে যে স্রোতধারা এসে পড়েছে পরিখায়, সেটি কেল্লা ও প্রাসাদ বেষ্টন করে আবার মূল নদীতে গিয়ে পড়েছে।

সেই জলধারার বহির্গমন পথটি বন্ধ করে দিতেই পরিখা প্লাবিত করে দিচ্ছে রণক্ষেত্র।

পদাতিকরা দ্রুত চলে গেল জলস্রোত নিষ্ক্রমণের পথটি লক্ষ করে।

সেখানে বহু সংখ্যায় সমবেত হয়ে আছে, মহারাজের নৌ-সৈন্যবাহিনী। বহু নৌকা সারিবদ্ধভাবে ভেসে আছে রামগঙ্গার স্রোতে।

তীর ছুঁড়ছিল সৈন্যদল নৌকা থেকে। সম্রাটের পদাতিকেরা ঢাল উঁচিয়ে পশ্চাদপসরণ করল। তারা জানত না তীরন্দাজ নৌ-সৈন্যের অবস্থিতি।

কর্দমাক্ত জলসিক্ত রণভূমিতে যুদ্ধ প্রায় অসম্ভব। হস্তী, অশ্ব, রথ সবই অচল হয়ে পড়ল। পদাতিকরাও পিচ্ছলভূমিতে যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে অগ্রসর হতে পারল না।

সঙ্গে সঙ্গে প্রান্তরের যুদ্ধ পরিহার করে নিলেন সম্রাট। ওপর থেকে স্রোতে ভাসিয়ে দিলেন সৈন্য বোঝাই বেশ কয়েকটি তরণী। বিপুল বেগে সেগুলি গিয়ে পড়ল মহারাজের রণতরীগুলির ওপর।

বহু তরী টাল সামলাতে না পেরে জলমগ্ন হল। তীরের ঘায়ে, বল্লমের খোঁচায় মারা পড়ল বহু সৈন্য। সম্রাটের নৌবাহিনী অধিকার করে নিল জলনিষ্ক্রমণের স্থানটি। তারা অবারিত করে দিল দ্বার। বিপুল গতিতে নিষ্ক্রান্ত হতে লাগল পূর্ণ পরিখার জল।

দুদিন পরে শুষ্ক প্রান্তরে শেষ যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হল। মহারাজ অচ্যুত ছিলেন যেমন সাহসী তেমনি বীর। তিনি তাঁর অবশিষ্ট সৈন্যদের নিয়ে এগিয়ে এলেন রণক্ষেত্রে।

চীৎকার করে বলতে লাগলেন, কোথায় সমুদ্রগুপ্ত, এস তোমার তরবারি নিয়ে, কতখানি শক্তিধর তার পরীক্ষা হয়ে যাবে আজ।

প্রবীণ মহারাজের প্রদীপ্ত চেহারার দিকে তাকিয়ে মনে মনে তাঁকে নমস্কার জানালেন সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত।

দু পক্ষের সৈন্যদল দুদিকে দাঁড়িয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো দেখতে লাগল দুই প্রধানের মুখোমুখি সংগ্রাম।

একটি লোহিত বর্ণের অশ্বে আরোহণ করেছিলেন মহারাজ অচ্যুত। অন্যদিকে সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের অশ্বের বর্ণ ছিল ঘোর কৃষ্ণ। একটি শ্বেত চক্র শোভা পাচ্ছিল কৃষ্ণ অশ্বের উদরে।

সুশিক্ষিত দুই অশ্ব প্রভুদের পৃষ্ঠে ধারণ করে যুদ্ধের মধ্যে বিচিত্র ভঙ্গিতে পাক খেতে খেতে রক্ষা করছিল আপন আপন প্রভুকে। তাদের ঘনঘন হ্রেষাধ্বনি যুদ্ধের আবহকে ভয়ঙ্কর করে তুলছিল।

অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন ও কৌশলী যোদ্ধা সমুদ্রগুপ্ত। মহারাজ অচ্যুতই প্রধানত আহত হচ্ছিলেন।

সমুদ্রগুপ্ত চীৎকার করে বললেন, আপনার তরবারি অপেক্ষা আমার তরবারি দীর্ঘ মহারাজ। আপনি আপনার তরবারি পরিবর্তন করুন। আমি ততক্ষণ অস্ত্র চালনায় বিরত থাকছি।

সমুদ্রগুপ্ত নিজের তরবারিখানা নিচু করে ধরামাত্র তাঁর বাম হস্তে এসে পড়ল মহারাজের তরবারির আঘাত।

সম্রাটের অশ্ব লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল হ্রেষাধ্বনি করে। বিদ্যুৎঝলকের মত একটা দীপ্তি শুধু ঝলসে উঠল। মহারাজের প্রায় বিচ্ছিন্ন দেহখানা নিয়ে পরিখা পার হয়ে লোহিত অশ্বটি ঢুকে গেল দুর্গের অভ্যন্তরে।

বন্দি হলো মহারাজের অবশিষ্ট বাহিনী। সম্রাটের জয়ধ্বনিতে প্রকম্পিত হতে লাগল অহিচ্ছত্রের আকাশ বাতাস।

মহারাজের জন্য প্রস্তুত হল চন্দন কাষ্ঠের বিশাল চিতা। প্রজাদের সঙ্গে শ্রদ্ধা জানাতে সমবেত হল সম্রাটের সমস্ত বাহিনী। সম্রাট নত-নমস্কারে শ্রদ্ধা জানালেন একজন বীরশ্রেষ্ঠকে। সমবেত জনতা ঘনঘন মহারাজ অচ্যুত ও সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের জয়ধ্বনি দিতে লাগল।

নিজ বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকে অহিচ্ছত্রের বিষয়পতি (জেলার অধিকর্তা) নিযুক্ত করে সম্রাট সসৈন্যে রওনা হলেন মথুরা অভিমুখে।

মথুরার সীমারেখায় প্রবেশ করামাত্র রথারূঢ় সম্রাট অসি কোষমুক্ত করে দেব দিবাকরের দিকে উত্তোলন করলেন। মুহূর্তে অগ্নির জিহ্বার মত জ্বলে উঠল সে অচ্ছধার (চকচকে ফলাযুক্ত) অসি। সম্রাটের সমস্ত দেহ অগ্নিরূপ ধারণ করল।

চর রাজসভায় প্রবেশ করে মহারাজ গণপতি নাগকে বলল, মহারাজ, পাটলীপুত্রের সম্রাট বিপুল বাহিনীসহ আমাদের রাজ্যসীমা অতিক্রম করেছেন।

গণপতি নাগ অট্টহাস্য করে বললেন, তোমার বুদ্ধি তো বলিহারি, একজন সামান্য রাজাকে তুমি সম্রাট বানিয়ে দিলে।

মন্ত্রী বললেন, মহারাজ, আপনার আত্মীয় সম্ভবতঃ অন্য কোথাও চলেছিলেন, মথুরার কাছে এসেই আপনার কথা মনে পড়েছে, তাই সম্মান জানাতে আসছেন।

পাটলীপুত্রের রাজার আত্মীয়তা আমার কাছে অগৌরবের, মন্ত্রী।

সহসা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে রূঢ়বাক্য প্রয়োগ করা মহারাজ গণপতি নাগের স্বভাবধর্ম।

মহামন্ত্রী মহারাজের এ ধরনের স্বভাবের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তিনি আর মহারাজের উত্তেজনার কারণ না ঘটিয়ে সংগোপনে বলাধ্যক্ষের (সেনাপতি) সঙ্গে পরামর্শে বসলেন।

বলাধ্যক্ষ চরকে ডেকে বিভিন্ন প্রশ্নাদি করে জানতে পারলেন, ব্যাপারটা বেশ গুরুতর। এ কেবলমাত্র আত্মীয় সন্দর্শনে আগমন নয়, প্রবল ঝড়ের ইঙ্গিত বহন করছে সম্রাটের আবির্ভাব।

বিপুল বাহিনী উন্মুক্ত আয়ুধ উর্ধ্বে তুলে পঙ্গপালের মত ঝাঁপিয়ে পড়েছে মথুরার ওপর। তারা

সাধারণ মানুষকে লক্ষ করে কোনো আঘাত হানছে না, কেবল অগ্রসর হচ্ছে রাজধানীর দিকে।

মহামন্ত্রী আর বলাধ্যক্ষ কালবিলম্ব না করে যোগাযোগ করলেন মহারানীর সঙ্গে।

মহারাজ গণপতি নাগ একমাত্র মহারানী বিদ্যার পরামর্শ গ্রহণ করতেন। মহারাজের ওপর মহারানী বিদ্যার প্রভূত প্রভাব ছিল। তিনি কেবল নামেই বিদ্যা ছিলেন না, যথার্থ বিদূষী ছিলেন তিনি। তাঁর পরামর্শগুলি হত কালোচিত।

মহারানী বলাধ্যক্ষ ও মহামন্ত্রীকে বললেন, আমি জানি গুপ্তসম্রাট আমাদের ওপর প্রতিশোধ নিতেই আসছেন।

মহামন্ত্রী বললেন, কিন্তু মা, আমি তো কখনো শুনিনি পাটলীপুত্রের সঙ্গে মথুরার কোনো মনান্তর হয়েছে। তাছাড়া এই দুটি রাষ্ট্র বৈবাহিক সম্বন্ধ সূত্রেআবদ্ধ।

আপনারা যা জানেন না তেমন একটি কথা আমার জানা আছে। মহারাজের হাত থেকে তীরটি ছুটে যাবার পর আমি কথাটি জানতে পারি। তখন আর আমার করার কিছু ছিল না। আসল ঘটনাটি হল, মহারাজের ভগ্নী দত্তা তাঁদের পারিবারিক একটি ঘটনার কথা জানিয়ে চিঠি লেখেন তাঁর মাকে। মহারাজ সে চিঠি পাঠ করার পর ভগ্নীকে একটি পত্র দেন। সেই পত্রে সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের শক্তিহীনতা সম্বন্ধে অনেক কটু মন্তব্য করা হয়েছিল।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস সেই অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্যেই এই অভিযান।

বলাধ্যক্ষ বললেন, এ অবস্থায় আমাদের করণীয় সম্বন্ধে আপনি কি বলেন?

প্রতিরোধ ছাড়া অন্য কোনও পথ তো আমি দেখছি না। সম্রাটের সঙ্গে সহজ পথে বোঝাপড়ার কোনো সুযোগ বা সময় এখন আর আমাদের হাতে নেই।

মহামন্ত্রী বললেন, মা, আপনি মহারাজকে বিপদ ও করণীয় সম্বন্ধে অবহিত করুন, আমরা দুর্গ ও প্রাসাদ রক্ষার চেষ্টা করছি।

মহারানীর পরামর্শ-কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে মহামন্ত্রী জনবাদীকে (বিপদের বার্তা-ঘোষক কর্মচারী) ডেকে বললেন, অবিলম্বে নগরে জনপদে ঘোষণা করে দাও, পাটলীপুত্রের বাহিনীকে প্রতিরোধের জন্যে তারা যেন প্রস্তুত থাকে।

এদিকে বলাধ্যক্ষ উঠে গেলেন দুর্গশীর্ষে। তুর্যনিনাদে জানিয়ে দিলেন শত্রুর আগমন-সংবাদ।

অবিলম্বে প্রস্তুত হয়ে দলপ্রধানের নির্দেশ অনুযায়ী সারিবদ্ধভবে দাঁড়াল সৈনিকের দল। অশ্বারোহীরা বেরিয়ে এল বাইরে। তাদের হাতে পঞ্চফলাযুক্ত সুদীর্ঘ ভল্ল। তারা দাঁড়াল অর্ধবৃত্তাকারে। তাদের ফাঁকে ফাঁকে স্থান করে নিল দক্ষ তীরন্দাজেরা। পেছনে রইল অগণিত পদাতিক। তাদের কারু হাতে খড়্গ, কারু হাতে তোমর, কেউ বা ধরেছে শাণিত-কৃপাণ।

সম্রাটের নির্দেশ ছিল, জনপদবাসীরা আঘাত করতে না এলে তাদের প্রত্যাঘাত করবে না। তবে অস্ত্র উঁচিয়ে আস্ফালন করতে করতে অগ্রসর হতে হবে। যেন বাহিনীর রুদ্ররূপ দেখে নগর ও জনপদবাসীরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

সম্রাটের বিপুল বাহিনী যখন নগরপ্রান্তে এসে পৌঁছল তখন সন্ধ্যা সমাগত। রথে বসেই সম্রাট দেখলেন, দূরে রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন প্রান্তরে মহারাজ গণপতি নাগের অগণিত সৈন্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বিস্মিত হলেন সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত। তিনি মথুরাসীমান্ত থেকে এগিয়ে এসেছেন ঝড়ের বেগে। এরই মধ্যে মথুরার মহারাজ জেনে ফেলেছেন তাঁর আগমন সংবাদ! সৈন্য-বাহিনীও প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত! মনে মনে চমৎকৃত না হয়ে পারলেন না সম্রাট।

এদিকে ধীরে ধীরে অন্ধকার ছেয়ে ফেলল চরাচর। রাত্রির বিশ্রামের জন্য শিবির স্থাপিত হল বিরাট বিরাট বৃক্ষ-সমন্বিত প্রান্তরে।

বিশ্রাম থেকে সহসা জাগিয়ে তোলা হল সম্রাটকে। ভিল্‌সা বলল, সম্রাট, আমি উচ্চ একটি বৃক্ষের

চূড়ায় বসে দেখলাম, কয়েকজন মশালধারী বিভিন্ন দিক থেকে আমাদের শিবির অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে। তারা হঠাৎ ঢাকা পড়ে যাচ্ছে কোনো কিছুর আড়ালে, আবার উঠে দাঁড়িয়ে ক্ষিপ্রগতিতে খানিকটা এগিয়ে আসছে!

সম্রাট বললেন, এই মুহূর্তে দুন্দুভিতে আঘাত হেনে সমস্ত বাহিনীকে জাগিয়ে তোল। তারা যেন সমবেতভাবে রণহুঙ্কার দেয়। শত্রুরা চতুর্দিক থেকে নিঃশব্দে শিবিরগুলিতে অগ্নিসংযোগের জন্য এগিয়ে আসছে।

তাই হল। দুন্দুভিধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে রণহুঙ্কার দিল কিছু সৈন্য। যেমনি সামুদ্রিক ঝড়ের ভয়ঙ্কর গর্জন যেন মথুরাপুরীকে প্লাবিত করে দিল।

প্রাসাদসংলগ্ন প্রান্তর থেকেও মহারাজের বাহিনী অনুরূপ গর্জন তুলল।

অরুণোদয় হতে না হতেই শুরু হয়ে গেল সংগ্রাম। গগনবিদারী হুঙ্কার, আহতের আর্তনাদ, রণবাদ্য, ধাবমান অশ্বের পদধ্বনি, ধাতব অস্ত্রের ঝনঝনা, সব মিলিয়ে এক শব্দময় নারকীয় জগতের দ্বার খুলে দিল।

প্রভাতী আকাশ জুড়ে রক্তের ঢল, তারই প্রতিচ্ছবি প্রান্তরের বুকে।

যুদ্ধের তৃতীয় দিবস পর্যন্ত জয়-পরাজয় অনিশ্চিত হয়ে রইল। চতুর্থ দিবসের অপরাহ্ন থেকে শুরু হয়ে গেল মথুরা-বাহিনীর ভাঙন। শীতের সূর্য যেমন দ্রুত ভাটার টানে অস্তাচলের দিকে গড়িয়ে যায়, তেমনি দ্রুত পিছু হটতে লাগল মথুরা-বাহিনী! শেষে সৈন্যদলকে নিয়ন্ত্রণে রাখা আর সম্ভব হল না সেনাপতিদের পক্ষে। শুরু হয়ে গেল ছত্রভঙ্গ।

পালাচ্ছে, যে যেদিকে পারছে পালাচ্ছে প্রাণভয়ে। এখন চলেছে একতরফা অরণ্য-মৃগয়া। উর্ধ্বশ্বাসে পলাতক মৃগেরা ঝাঁক ঝাঁক তীর আর ভল্ল বিদ্ধ হয়ে গ্রহণ করছে ভূমিশয্যা।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে উঠল। সৈন্যেরা রাতের বিশ্রামের জন্য প্রবেশ করল যে যার নির্দিষ্ট শিবিরে। মথুরাপুরীর প্রাসাদে একটিও দীপ জ্বলল না, শোনা গেল না সন্ধারতির মঙ্গলবাদ্য।

সম্রাটের সঙ্গে বলাধ্যক্ষদের পরমর্শ-সভা বসল। স্থির হল, এই রাত্রিতেই অধিকার করে নিতে হবে প্রাসাদ। শত্রুপক্ষের মনোবল একেবারেই ভেঙে পড়েছে। এখন প্রাসাদ ও দুর্গ দখলের যথার্থই সুবর্ণ লগ্ন।

বাছাই করা সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত হল প্রাসাদ ও দুর্গ অধিকারের জন্য। সম্রাটও রইলেন সঙ্গে। মশালধারীর দল প্রাসাদে পৌঁছে দেখল, সবকটি দ্বারই উন্মুক্ত।

আশ্চর্য হলেন সম্রাট। তিনি প্রাসাদদ্বারে অপেক্ষা করে রইলেন, সৈন্যেরা প্রবেশ করল অভ্যন্তরে।

দীর্ঘ সময় অন্তে তারা ফিরে এসে সংবাদ দিল, প্রাসাদ এবং দুর্গ সম্পূর্ণ জনহীন।

সম্রাট বিস্মিত হয়ে বললেন, সেকি!

ভিল্‌সা বলল, প্রাসাদের একটি কক্ষে এক রমণীকে আমি প্রদীপ জ্বেলে স্থির হয়ে বসে থাকতে দেখেছি।

সম্রাট সচকিত হয়ে উঠলেন। ভিল্‌সার দিকে তাকিয়ে বললেন, এস আমার সঙ্গে। পথ দেখিয়ে আমাকে নিয়ে চল সেই রমণীর কাছে।

ভিল্‌সা মশাল হাতে সম্রাটকে নিয়ে চলল প্রাসাদের অভ্যন্তরে।

নির্দিষ্ট গৃহের সামনে এলে ভিল্‌সাকে ইঙ্গিতে অপেক্ষা করতে বললেন সম্রাট। নিজে ধীর পদক্ষেপে কক্ষদ্বারে গিয়ে দাঁড়ালেন।

প্রদীপ হাতে ধরে উঠে এলেন রমণী। করুণ হাস্যে বললেন, এস ভাই, তোমারই জন্যে প্রতীক্ষা করে আছি।

সম্রাট নমস্কার জানিয়ে প্রবেশ করলেন গৃহে।

রমণী একটি দুর্লভ শয্যার পাশে নিয়ে গেলেন সম্রাটকে।

বস এই শয্যায়। ভাল করে চেয়ে দেখ চিনতে পার কিনা।

সম্রাটের মনে হল, এই গজদন্তনির্মিত পালঙ্কটি তিনি পূর্বেও দেখেছেন।

মনে পড়ল, দত্তার সঙ্গে বিবাহের প্রথম রজনীতে বর-বধূ উভয়ে এই শয্যায় উপবেশন ও শয়ন করেছিলেন।

আরও মনে পড়ল, এই পালঙ্কের অসাধারণ অলংকৃতি তাঁর শিল্পীমনকে সে রাত্রে বিশেষভাবে আলোড়িত করেছিল।

রমণী বললেন, সে রাতে তুমি ঐ পালঙ্ক আর পুষ্পসজ্জার বিশেষ প্রশংসা করেছিলে।

সম্রাট বললেন, সে রাতে একজন আমার সপ্রশংস দৃষ্টিকে আকর্ষণ করেছিলেন।

রমণী নীরব রইলেন। দরবিগলিতধারে তাঁর দুই কপোল বেয়ে অশ্রুবিন্দু গড়িয়ে পড়তে লাগল।

আপনি আমার পাশে এই পালঙ্কে উপবেশন করুন। সে রাতে নববধূর পাশে আপনিই উপবেশন করেছিলেন। সমস্ত রাতটিকে আপনি উজ্জ্বল আর মধুর করে তুলেছিলেন আপনার পরিহাস রসিকতায়।

রমণী সজল নয়নে বললেন, স্মৃতির দর্পণটি এত উজ্জ্বল, তবু তা এমন করে ভেঙে গেল কার অপরাধে ভাই! আমি জানি মহারাজের পত্রে তুমি আহত হয়েছিলে, কিন্তু আমি যদি পূর্বাহ্ণে জানতাম মহারাজ এমন একটি পত্র রচনা করেছেন তাহলে আমি তাঁকে অবশ্যই নিষেধ করতাম।

সামান্য সময় নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে আবার বললেন, চিরদিনই চিন্তায় কিছু অসংগতি আছে মহারাজের।

সম্রাট বললেন, প্রাসাদ, দুর্গ, সবই শূন্য, আপনার দাসদাসীরাও অনুপস্থিত দেখছি।

ম্লান হেসে বললেন রমণী, সম্রাটকে এতক্ষণ আপ্যায়ন করতে পারিনি, সেজন্যে সত্যিই লজ্জিত। আমি নিজেই মুক্তি দিয়েছি দাসদাসীদের। তাছাড়া দুর্গে গিয়ে আমি সৈনিকদের সমস্ত প্রাপ্য মিটিয়ে দিয়ে তাদের ঘরে ফিরে যেতে বলেছি।

মহারাজকে দেখছি না কেন মহারানী বিদ্যা?

তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছেন। আমি তাঁকে গুপ্তগৃহে রেখেছি। যদি তাঁর কাছে বিজয়ী হিসেবে তোমার কিছু প্রয়োজন থাকে তাহলে চল আমি তোমাকে নিয়ে যাই।

থাক্। এখন আপনার কাছে কেবল একটি জিজ্ঞাসা, আপনি কি আপনার রাজ্য ফিরে পেলে খুশী হবেন?

মহারানী বিদ্যা বললেন, রাজ্যপাটের মোহ আমার ঘুচে গেছে ভাই। আমি সন্তানহীনা। দত্তার স্বামী আর সন্তান এ রাজ্যের ভার নিলে আমি যথার্থই তৃপ্তি পাব। শুধু একটি অনুরোধ।

একটু থেমে বললেন মহারানী, আমাদের দুটিকে হিমালয়ের কোনো একটি আশ্রমে যদি থাকার ব্যবস্থা করে দাও তাহলে কৃতজ্ঞতার অবধি থাকবে না। আর যদি গঙ্গাকে কাছে পাই তাহলে বড় শান্তি পাব। এটি আমার গভীর অন্তরের আকাঙ্ক্ষা বলে জানবে।

পরদিন সম্রাট একখানি রথে বিশ্বস্ত অনুচরদের সঙ্গে মহারাজ গণপতি নাগ ও মহারানী বিদ্যাকে হিমালয়ের সন্নিধানে গঙ্গাতীরের একটি আশ্রমে পাঠিয়ে দিলেন। শান্ত নিরুদ্বিগ্ন পরিবেশে রাজদম্পতির জীবন অতিবাহিত হোক, এই প্রার্থনা জানালেন ঈশ্বরের কাছে।

মথুরার যুদ্ধ সমাপ্ত করে পঞ্চনদের অভিমুখে অগ্রসর হল সম্রাটের বাহিনী।

পঞ্চনদের দেশে পৌছবার আগেই অর্জুনায়ন আর আভীরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নরপতিরা এলেন উপঢৌকন নিয়ে। তাঁরা স্বীকার করে নিলেন সম্রাটের বশ্যতা। মালবের নরপতি বাৎসরিক করদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে করদমিত্র রাজ্যের মর্যাদা লাভ করলেন। অর্জুনায়ন থেকে সম্রাটের জন্য এল অপূর্ব এক উপহার। নৃত্যকলায় পটিয়সী এক কন্যা। সেই নর্তকীকে পরমাদরে গ্রহণ করলেন সম্রাট।

এরপর শতদ্রু তীরে এল সম্রাটের বাহিনী। অপূর্ব শোভাময় খরস্রোতা নদী শতদ্রুর কূলে যৌধেয়। রাজা স্বয়ং এসে বললেন, গুপ্তসম্রাটের পতাকাই হবে এখন থেকে আমার রাজপতাকা। মধ্য পাঞ্জাবের মদ্রক-নরপতি প্রতি বৎসর করদানের প্রতিশ্রুতি দিলেন সম্রাটকে।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে এল উপঢৌকন। কুষাণ আর শকজাতির নরপতিরা সম্মান জানালেন

সম্রাটকে।

একান্তে ভিল্‌সাকে ডেকে সম্রাট বললেন, তোমাকে দ্রুতগামী একটি রথ দিচ্ছি, তাই নিয়ে চলে যাও পাটলীপুত্রে। মহারানী বহুকাল আমাদের কোনো সংবাদ পাননি, তাই উৎকণ্ঠিত আছেন। তাছাড়া তুমি রাজধানীতে থাকলে আমি নগরীর সুরক্ষা সম্বন্ধে নিশ্চিত থাকতে পারব।

ভিল্‌সা বলল, বিজয় অভিযানে বেরুবার সময় মহারানী আমাকে একান্তে ডেকে বলে দিয়েছিলেন, আমি যেন সম্রাটের থেকে দূরে না থাকি।

সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত বললেন, এতদিন আমার পাশে পাশে থেকে মহারানীর আদেশ পালন করেছ, এখন সম্রাটের আদেশ পালন করার সময় এসেছে।

ভিল্‌সা নীরবে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইল।

সম্রাট আবার বললেন, উপঢৌকনের সামগ্রী তোমার সঙ্গেই আমি পাঠিয়ে দিতে চাই। এমনকি অর্জুনায়নের নর্তকী মত্তময়ূরীকেও।

পরদিনই দ্বি-অশ্ববাহিত রথে ভিল্‌সা সম্রাটের পাওয়া উপঢৌকনসহ পাটলীপুত্র অভিমুখে যাত্রা করল। সঙ্গে রইল মহা-মূল্যবান রত্ন, নর্তকী মত্তময়ূরী।

রথের সারথী আর রত্নের রক্ষক ভিল্‌সা। আরোহী অর্জুনায়নের তরুণী নর্তকী।

মত্তময়ূরী লক্ষ করল, আশ্চর্য এক সংযম বেষ্টন করে আছে রথের চালক যুবা পুরুষটিকে। সে পথ অতিক্রমের সময় নিরন্তর সজাগ ও সতর্ক।

এক সময় তাদের পার হতে হয়েছিল দীর্ঘ এক অরণ্যভূমি। করীযূথ দাঁড়িয়েছিল পথ অবরোধ করে। কখনো শঙ্খনিনাদ, কখনো তূর্যধ্বনি, আবার কখনো দুন্দুভি বাজিয়ে সে বিতাড়িত করল গজযূথকে।

রাতে পথিপার্শ্বে বিশ্রামের সময় নিদ্রাভিভূতা নর্তকীর ঘুম ভেঙে গেল একটা হুঙ্কারে। সে চকিতে ঘুম-জড়ানো চোখ মেলে দেখল, একটা চিতা ছিটকে পড়েছে পথের ওপর। রক্তে ভেসে যাচ্ছে সারা-পথ। জ্যোৎস্নার আলোকে তখন চরাচর উদ্ভাসিত।

ভিল্‌সার মুখ থেকে শোনা গেল আসল ঘটনাটি। যখন মত্তময়ূরী তন্দ্রামগ্ন আর অশ্ব দুটিও তন্দ্রাচ্ছন্ন তখন ভিল্‌সা ছিল প্রতি রাত্রির মতো প্রহরায় নিযুক্ত। আচমকা চিতাটি লাফ দেয় একটি অশ্বকে লক্ষ করে। অমনি ঝলসে ওঠে ভিল্‌সার শাণিত খড়গ। অশ্বটি অতি সামান্য আহত। তবু তার পরিচর্যায় লেগে গেল ভিল্‌সা।

পরদিন প্রভাতে আবার যাত্রা, নব নব রোমাঞ্চের মুখোমুখি হতে হতে পথ অতিক্রম।

কখনো আসর বসে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত বনস্থলীর অরণ্য-কুসুম-গন্ধ আমোদিত অঙ্গনে। ভিল্‌সা গান ধরে। আদিম অরণ্যে অরণ্যবাসী নরনারীর কণ্ঠে যে গান বেজে ওঠে সেই গান। বড় সহজ, বড় মধুর সে সুর। মুগ্ধ হয় শ্রোতা।

উৎসাহিত ভিল্‌সা এবার বৈশালীর কলামন্দিরে গায়কদের কণ্ঠের গান গাইতে থাকে। যেসব গান নর্তকীদের পায়ের মঞ্জরীকে মুখর করে তোলে, সেই সব গান।

ধীরে ধীরে নাচ শুরু হয়। মধ্যরাত্রে মনে হয় চন্দ্রালোক থেকে মর্তে নেমে এসেছে কোনো লীলাবতী সুরকন্যা। তার মঞ্জীর-ঝংকারের সঙ্গে মিশে যায় ঝিল্লির তান। নব-বসন্তে শাল আর আম্রমঞ্জরী ওড়ায় পরাগ-উত্তরীয়।

এমনি দীর্ঘ সান্নিধ্যে নর্তকীর হৃদয় একটি সুখনীড় রচনার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু কার কাছে সে মেলে ধরবে তার হৃদয়! এক আনন্দময়, বীর্যবান পুরুষ তার সঙ্গী, কিন্তু সে তো প্রেমময় নয়, কঠিন তুষারের স্তূপ। চন্দ্রকিরণে ঝলমল করে ওঠে কিন্তু বিগলিত হয় না কখনো।

জ্যোৎস্না নিশীথে বহু সময় ভিল্‌সা রথ চালনা করে নিয়ে যায়। নর্তকীকে জেগে থাকতে দেখলে সে তাকে বিশ্রাম নিতে বলে।

মত্তময়ূরী বলে, এই তো বেশ, যখন বিশ্ব-চরাচর নিদ্রায় মগ্ন তখন আমরা জেগে আছি। শুধু জেগে

নেই, দুটি নিশীথ-বিহারী পাখির মতো উড়ে চলেছি।

ভিল্‌সা বলে, দিনে চরাচর সন্তপ্ত হয়ে ওঠে, তাই শীতল রাত্রিকেই আমি রথ চালনার প্রকৃষ্ট সময় হিসেবে বেছে নিয়েছি। অবশ্য যতদিন চন্দ্রের আনুকূল্য পাব।

মত্তময়ূরী বলে, আমি লক্ষ করেছি রথ চালনার সময় তুমি নীরব থাক। একি শুধুই একাগ্রতা, না সে সময় তুমি কোনোকিছু চিন্তা কর আপন মনে?

হেসে ওঠে ভিল্‌সা, ভাবনা ছাড়া মানুষ বেঁচে থাকবে কি করে নর্তকী?

মত্তময়ূরী বলে, তুমি আমাকে ময়ূরী বলেই ডেকো বন্ধু।

আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবি, কে তোমার এমন একটি নাম রেখেছে। তোমার ঐ অপূর্ব নৃত্যের সঙ্গে এই নামটি মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ নিরুত্তর থেকে এক সময় বলে ওঠে নর্তকী, আমি অর্জুনায়নের নগরনটী মঞ্জুবাদিনীর কন্যা। শৈশব থেকে মায়ের কাছে আমি নৃত্য শিক্ষা করেছি। কোনো এক গুণী কলাবিদ আমার গৃহে এসে আমার নৃত্য দেখে এই নামকরণ করেছিলেন।

সেই গুণীকে সাধুবাদ না দিয়ে পারছি না ময়ূরী।

তোমার মুখে আমার এই নামটি শুনে বড় মধুর লাগছে ভিল্‌সা। মনে হচ্ছে বারবার আমার এই নাম তোমার মুখে উচ্চারিত হোক, আর আমি তা অনন্তকাল ধরে শুনি।

ভিল্‌সা নীরবে বসে ভাবনায় মগ্ন হয়। সে বুঝতে পারে নটী মত্তময়ূরীর মনের গতি। কিন্তু না, সম্রাটের পাওয়া উপঢৌকনের অমর্যাদা সে কিছুতেই করতে পারবে না।

এক সময় ভিল্‌সা বলে ওঠে,আমি অতি সাধারণ এক দর্বাহারের (কাষ্ঠ সংগ্রহকারী) পুত্র ময়ূরী। তোমার নামটুকু পর্যন্ত উচ্চারণের অধিকার আমার নেই। শুধু সম্রাটের করুণাই আজ আমাকে প্রাসাদের সর্বজনের কাছে এত প্রিয় করে তুলেছে।

তোমার ভেতরের সম্পদই আকৃষ্ট করেছে ভিল্‌সা। করুণা, অনাথ আতুরের প্রতিই বর্ষিত হয়। আমি যতটুকু বুঝেছি, তুমি করুণার পাত্র নও।

ক্ষণকাল অপেক্ষা করে আবার বলে চলল ময়ূরী, তুমি দর্বাহারের পুত্র বলে সংকুচিত হচ্ছিলে, কিন্তু ভেবে দেখ, আমার কোনো পিতৃপরিচয়ই আমি জানি না। তাতে বিন্দুমাত্র সংকুচিত নই আমি। আমার পিতৃপরিচয় নয়, আমার নৃত্যই আমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

ভিল্‌সা বলে, সম্রাটের কলাভবনে তুমি নিশ্চয়ই উপযুক্ত মর্যাদা লাভ করবে। নটীদের মধ্যে তোমার স্থান হবে অনেক উচ্চে।

হঠাৎ আবেগে নটীর চোখ দুটি ভরে উঠল জলে। ভগ্ন কণ্ঠে সে বলতে লাগল, আমি সম্রাটের সাধুবাদ চাই না ভিল্‌সা, আমি একটি অতি সাধারণ নারীর মত বাঁচতে চাই। নিতান্ত সাধারণ একটি কুটীরে সহজ, সরল, হৃদয়বান একজন মানুষকে সঙ্গীরূপে পেলে ধন্য হয়ে যাবে আমার জীবন।

অলক্ষ্যে থেকে ঈশ্বর বুঝি শুনতে পেলেন মত্তময়ূরীর প্রাণের কান্না। তিনি সজল বর্ষার প্রসাদ ছড়িয়ে দিলেন।

আর্যাবত-বিজয় শেষ করলেন সম্রাট স্বয়ং দুটি যুদ্ধ পরিচালনা করে। প্রত্যাবর্তনের পথে সম্মিলিত রাষ্টশক্তির সঙ্গে কঠিন সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল সম্রাটকে। প্রতি যুদ্ধে তিনি পেয়েছিলেন বিজয়ীর সম্মান। তাই পশুরাজ সিংহের মতো রণহুঙ্কারে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তিনি সম্মিলিত রাষ্ট্রশক্তির ওপর।

মাসাধিককাল যুদ্ধ চলার পর ভেঙে গিয়েছিল প্রতিরোধ। কোনো দয়া অথবা ক্ষমা প্রদর্শন করেননি সম্রাট পরাজিত রাজন্যবর্গকে। তিনি তাঁদের সম্পূর্ণভাবে উৎখাত করে নিজের বিশ্বস্ত কুমারামাত্য(প্রদেশের শাসনকর্তা), উপরিক (বিভাগের শাসনকর্তা) এবং বিষয়পতিদের (জেলার শাসনকর্তা) শাসনকর্তারূপে নিযুক্ত করেছিলেন।

এরপর একদল সৈন্যকে তিনি প্রেরণ করেন বঙ্গদেশ ও কামরূপ বিজয়ে। কারণ তিনি জানতেন যুদ্ধের

উত্তাপ দেহে মনে স্তিমিত হয়ে আসার আগেই অভীষ্ট কর্ম সিদ্ধ করে নিতে হবে।

অন্য একদল সৈন্য সম্রাটের আদেশে অগ্রসর হল, কোটার দুর্বিনীত রাজ্যকে শিক্ষা দিতে।

সম্রাট স্বয়ং পদ্মাবতীর (মধ্যপ্রদেশের এক রাজ্য) উদ্দেশ্যে অভিযান পরিচালনা করলেন। বিধ্বস্ত হল মহারাজ নাগসেনের রাজ্য পদ্মাবতী।

সম্রাট ফিরে এলেন রাজধানী পাটলীপুত্রে। তিনি অপেক্ষা করে রইলেন বঙ্গদেশ ও কামরূপের সমাচার শোনার জন্য।

অল্পদিনের ব্যবধানে একে একে আসতে লাগল শুভ সমাচার। স্বেচ্ছায় করপ্রদানে স্বীকৃত হয়েছেন নেপালের মহারাজ। ডবাক (পূর্ব আসাম), সমতট (দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গ) সংযত হয়েছে করদানে। কেবল যুদ্ধ করতে হয়েছে মহারাজ চন্দ্রবর্মার (বাঁকুড়ার রাজা) সঙ্গে। পরাজিত চন্দ্রবর্মা পরিশেষে সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করে অজস্র উপঢৌকন পাঠিয়েছেন পাটলীপুত্রে।

সম্রাট এখন বিশ্রাম চান। কেবল নিজের জন্য নয়, বিশ্রামের সুযোগ দিতে হবে সমস্ত বাহিনীকে। দাক্ষিণাত্য অভিযানের পূর্বে নতুন শক্তিতে সঞ্জীবিত করতে হবে তাঁর অজেয় সৈন্যদল।

সম্রাটের অবসর বিনোদন ও বিজয়োৎসবের জন্য সুসজ্জিত হল পাটলীপুত্র নগরী। নৃত্যগীত বাদ্যধ্বনি মুখরিত করল বাতাস, নন্দিত করল দৃষ্টি, আকুল করল শ্রবণ।

ভৃগুকচ্ছ থেকে পণ্যবাহী তরণী সুনীল সমুদ্রে তরঙ্গ তুলে অগ্রসর হল পারস্য, মিশর অভিমুখে। তারা সঙ্গে বহন করে নিয়ে গেল সম্রাটের দিগ্বিজয় সংবাদ। তাম্রলিপ্ত থেকে সারিবদ্ধ তরণী শুভ্র পাল তুলে চলল লঙ্কাদ্বীপ, পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে আর মহাচিনের উদ্দেশ্যে।

সম্রাট ভাস্করদের উৎসাহ দিলেন মন্দিরগাত্র অলংকৃত করার জন্য। শিল্পীদের পাঠালেন অজন্তায়, যে গুহাচিত্রাবলী শত শত বৎসর ধরে অঙ্কিত হচ্ছিল সেই গুহাচিত্রে নতুন কাহিনী সংযোজনের জন্য।

শ্রীলঙ্কার রাজা মেঘবর্ণ চেয়েছিলেন গয়াক্ষেত্রে একটি বৌদ্ধবিহার নির্মাণ করতে। বিজয়ের আনন্দগৌরবে আপ্লুত সম্রাট অচিরেই সে অনুমতি দান করলেন। সারা ভারতের শিক্ষাকেন্দ্ররূপে গড়ে উঠতে সাহায্য করলেন মগধের একটি বিখ্যাত বৌদ্ধ শিক্ষায়তনকে।

উৎসবের সমাপ্তিপর্বে সম্রাট বসলেন সিংহাসনে দাতার ভূমিকায়। বিজয় অভিযানে উপঢৌকন হিসেবে যা কিছু মূল্যবান বস্তু পেয়েছেন তা উপযুক্ত পাত্রে বিতরণ করার অভিলাষ।

একে একে বলাধ্যক্ষ, মহাসন্ধি বিগ্রহিক, নক্ষত্রদর্শ, চারতন্ত্র প্রধান, ভিষকেরা সম্রাটের কাছ থেকে নিয়ে গেলেন বহুমূল্য উপহার।

সৈনিক ও শ্রমিকেরা অর্থের সঙ্গে পেল নিষ্কর ভূমি।

সকলেই সম্রাটের দানে তুষ্ট আর উল্লসিত। যারা যুদ্ধে নিহত হয়েছে তাদের সমস্ত পরিবারের প্রতিপালনের ভার নিলেন সম্রাট।

জয়ধ্বনি উঠল চতুর্দিকে।

এবার সম্রাট শেষ দানটি দেবার আগে একটু ভূমিকা করে নিলেন।

আমি যে পশ্চাতে থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করিনি তার প্রমাণ আমার সৈন্য দল। শুধু তাই নয়, অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন যে আমার দেহের সর্বত্র..সে পরিচয় দিতে পারবেন আমার ভিষকেরা। কিন্তু আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে বারবার বাঁচিয়েছে যে, সে আমার দেহরক্ষী, ছায়াসঙ্গী ভিল্‌সা। আজ আমি তার হাতে আমার শেষ উপহারটি তুলে দিতে চাই।

সকলে উৎসুক আগ্রহে তাকিয়ে রইল সম্রাটের দিকে।

ভিল্‌সা আজ থেকে পেল বিষয়পতির পদ। পাটলীপুত্রের উত্তরের বিষয়টির শাসনভার ওরই ওপর অর্পিত হল।

হর্ষধ্বনি করে উঠল জনসঙ্ঘ।

সম্রাট বললেন, আমি অভিযানে যা কিছু পেয়েছি তার সবটুকুই বিতরণ করে দিয়েছি। কেবল একটি

উপহার রয়েছে আমার হাতে, আজ সেই শেষ উপহারটি আমি তুলে দিতে চাই ভিল্‌সারই হাতে।

সমবেত জনতা সেই উপহারের কথা শোনার জন্য উৎসুক হয়ে রইল।

সম্রাট বললেন, সেই মহামূল্য উপহারটি রক্ষিত আছে আমার প্রাসাদে। অর্জুনায়নের মহারাজ সেটি বিজয়ী সম্রাটকে উপঢৌকন হিসেবে দিয়েছেন। সে এক অসাধারণ গুণবতী কন্যা। ভিল্‌সা এখনো দারপরিগ্রহ করেনি, তাই তার হাতে তুলে দিতে চাই এই কন্যাটির ভার।

উল্লাসধ্বনিতে বিদীর্ণ হল আকাশ বাতাস।

সম্রাটের ইঙ্গিতে কন্যা এল সম্রাটের সিংহাসনের পাশে। সুসজ্জিত-সালঙ্কারা নতমুখী কন্যা। তার চরণসম্পাতে বেজে উঠেছিল রজত মঞ্জীর।

ভিল্‌সা প্রতিদিনের ন্যায় প্রস্তরমূর্তিবৎ দাঁড়িয়েছিল সম্রাটের পশ্চাতে। সহসা সেই স্থিরমূর্তি চঞ্চল হয়ে উঠল সম্রাটের আহ্বানে।

সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত সর্বজনের সম্মুখে ভিল্‌সার হাতে সমর্পণ করলেন মত্তময়ূরীকে।

নটীর দু নয়ন পূর্ণ হয়ে উঠেছিল আনন্দাশ্রুতে। তার প্রার্থিত যে এমন করে ধরা দেবে তা সে কল্পনাতেও আনতে পারেনি।

জনতার আনন্দধ্বনির সঙ্গে মিশে গেল প্রাসাদের মঙ্গল শঙ্খধ্বনি।

।।পাঁচ।।

ব্রাহ্মণেরা সম্মিলিতভাবে এসে বললেন, সম্রাট, আপনি 'সর্বরাজছেত্তা' উপাধি গ্রহণ করেছেন, সুতরাং আপনার 'অশ্বমেধ পরাক্রম' উপাধি গ্রহণের লগ্ন এসেছে। আপনি অনুমতি করলে আমরা যজ্ঞানুষ্ঠানের আয়োজন করি।

সম্রাট বললেন, অতি উত্তম। পিতৃদেবও তাঁর দিগ্বিজয়ের পর এই আকাঙক্ষা পোষণ করেছিলেন। কিন্তু সে অভিলাষ তাঁর পূর্ণ হয়নি। এখন আপনারা আয়োজন করুন। কিন্তু...

কিন্তু কেন সম্রাট?

শুনেছি নবনবতিটি (৯৯) যজ্ঞ সম্পাদনের পর অশ্বমোচন করতে হয়। আর অশ্বের কপালে বাঁধা থাকে জয়পত্র। সৈন্যেরা সেই অশ্ব নিয়ে পরিভ্রমণ করে। সেই অশ্ব কোনো রাষ্ট্র ধরে রাখলে তার সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়।

আপনি পূর্বাহ্নেই রাষ্ট্রবিজয় সম্পন্ন করেছেন, এখন উদ্‌যাপিত হোক অশ্বমেধ।

সম্রাট বললেন, বেশ, তাহলে অশ্বের সন্ধান করুন। শুনেছি সাধারণ অশ্বে অশ্বমেধ সম্পন্ন হয় না।

ব্রাহ্মণদের মুখপাত্র বললেন, আপনি যথার্থই বলেছেন সম্রাট। যজ্ঞের অশ্বটি হবে মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণের। মুখকান্তি সুবর্ণের তুল্য। অশ্বের উভয় পার্শ্বে থাকবে অর্ধচন্দ্রাকার চিহ্ন। বিদ্যুতের ন্যায় প্রভাযুক্ত হবে তার পুচ্ছ। উদরের বর্ণ হবে কুন্দফুলের ন্যায় শুভ্র। সবুজের আভাযুক্ত পদ চতুষ্টয়, কর্ণপ্রভা রক্তবর্ণ সিন্দুরের ন্যায়। প্রজ্জ্বলিত অগ্নিসদৃশ জিহ্বা। চক্ষু দীপ্ত সূর্যের ন্যায় তেজস্কর। অশ্ব হবে বেগবান আর সুগন্ধযুক্ত হবে তার সর্বাঙ্গ।

সম্রাট বললেন, এত বর্ণগন্ধগুণসম্পন্ন অশ্ব কোথায় পাওয়া যাবে বিপ্রবর?

হিমালয় সন্নিধানে ব্রহ্মপুরায় এক অশ্ব-ব্যবসায়ী রয়েছে। শুঙ্গ রাজারা যখন অশ্বমেধ শুরু করেন তখন তার পূর্বপুরুষদের কাছ থেকেই অশ্ব সংগ্রহ করতেন বলে শুনেছি।

সম্রাট সাগ্রহে বললেন, তাহলে আমি উপযুক্ত লোক প্রেরণ করছি ব্রহ্মপুরায়। আপনারা অন্য সকল আয়োজন করুন।

অশ্ব এল। নির্মিত হল যজ্ঞবেদী। প্রথমে যূপে বদ্ধ করা হবে ত্রিশতাধিক পশু। তাদের বধ সমাপ্ত হলে বলি প্রদত্ত হবে অশ্বমেধের অশ্ব।

যজ্ঞবেদী থেকে বৈদিক ব্রাহ্মণ-কণ্ঠ-নিঃসৃত মন্ত্রধ্বনি সৃষ্টি করেছে অদ্ভুত এক ভাব-পরিমণ্ডল। হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। ঘৃতাহুতি দিচ্ছেন অধ্বর্যু। তিনিই প্রধান ঋত্বিক। যজ্ঞবেদি নির্মাণ, যজ্ঞভূমির পরিমাণ নির্দেশ তাঁর তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছে। যজ্ঞপাত্র নির্মাণ, জলকাষ্ঠাদি আনয়ন সবই তাঁর কর্ম। তিনিই প্রজ্জ্বলিত করেছেন অগ্নি। যাজ্ঞিকগণ তাঁরই নির্দেশে কর্মরত। তিনি স্বয়ং করবেন পশুবধ। তাঁরই হাতে সম্পন্ন হবে যজ্ঞ।

নির্মিত হয়েছে একবিংশতিটি যূপ। বিল্ব, খদির, পলাশের ছয়টি করে, দেবদারুর দুইটি আর শ্লেষ্মাতক কাষ্ঠের (চালতা অথবা আতা গাছের কাঠ) একটি।

ঋত্বিকগণ যজ্ঞক্ষেত্রে মন্ত্রোচ্চারণ শুরু করেছেনঃ

' না বা উ এতয়ন্ম্রিয়সে ন রিষ্যসি দেবাঁ ইদেষি পথিভিঃ সুগেভিঃ। যত্রাসতে সুকৃতো যত্র তে যযুস্তত্র ত্বা দেব সবিতা দধাতু।'

(হে অশ্ব, আমাদের দ্বারা লুক্কায়িত হয়েও তুমি মর না বা বিনষ্ট হও না। শোভন গমনযোগ্য দেবযান পথে তুমি দেবতার কাছে যাও। সুকৃত ব্যক্তিগণ যেখানে অবস্থান করেন, সুকৃতকারী জনগণ যেখানে যান, সবিতাদেব তোমাকে সে লোকে স্থাপন করুন)।

পূর্বাহ্নে ঋত্বিকগণ শত শত পশুপক্ষী আহুতি দিয়েছেন দেবতাদের উদ্দেশ্যে।

'কৃষ্ণগ্রীবা আগ্নেয়াঃ শিতিভ্রবো বসূনাং রোহিতা রুদ্রাণাং শ্বেতা অবরোকিণ আদিত্যানাং নভোরূপাঃ পার্জন্যাঃ।'

(কণ্ঠদেশে কালোবর্ণের তিনটি পশু অগ্নিদেবতার, শুভ্র ভ্রূযুক্ত তিনটি বসুদেবতার, লালবর্ণ তিনটি রুদ্রদেবতার, সাদা ছিদ্রযুক্ত তিনটি আদিত্যদেবতার, আকাশ রঙের তিনটি পর্জন্যদেবের উদ্দেশ্যে যুক্ত করছি)।

এমনি উচ্চারিত হতে লাগল মন্ত্রের পর মন্ত্র।

অধ্বর্যু যজ্ঞকুণ্ডে নিক্ষেপ করছেন নিহত অশ্বের মেদ। অতঃপর দেহের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রতিটি অংশ নিক্ষিপ্ত হচ্ছে বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশ্যে।

অশনিদেবের তুষ্টিবিধান হচ্ছে মস্তিষ্ক দিয়ে, এমনি স্কন্ধপ্রদেশের দ্বারা তুষ্টি সাধিত হচ্ছে মরুদ্‌গণের।

পদ, পুচ্ছ, নিতম্ব, অক্ষি, লিঙ্গ কোষাদির কোনকিছুই পরিত্যক্ত হচ্ছে না, সবই উৎসর্গীত হচ্ছে দেবতাদের উদ্দেশ্যে।

যজ্ঞ পরিসমাপ্তি দিবসে যাজ্ঞিকরা গ্রহণ করলেন হোম-পরিশুদ্ধ অশ্বের কিছু কিছু মাংস।

অধ্বর্যু, যাজ্ঞিক, ও ব্রাহ্মণগণ গ্রহণ করলেন স্বর্ণ, রৌপ্য, বস্ত্র, শয্যা, গন্ধদ্রব্যাদি দান।

এই মহাযজ্ঞ অন্তে প্রকাশিত হল সম্রাটের নতুন স্বর্ণমুদ্রা। সে মুদ্রায় উৎকীর্ণ হল অশ্বমেধের অশ্বমূর্তি।

রাষ্ট্রের প্রধান, করদমিত্র, সামন্ত নৃপতি ও সর্বশ্রেণীর জনসাধারণ এই যজ্ঞে উপস্থিত থেকে সম্রাটের জয়ধ্বনিতে মুখরিত করে তুলেছিল দিকদেশ।

দীর্ঘ কয়েকটি বছর কেটে গেল দাক্ষিণাত্য অভিযানের প্রস্তুতিতে।

সম্রাট সুসজ্জিত বাহিনী নিয়ে একদিন বহির্গত হলেন বিজয় অভিযানে।

প্রথম যুদ্ধ হল মহানদীর তীরে। দক্ষিণ কোশলের রাজা মহেন্দ্র তাঁর বিপুল নৌবলের সাহায্যে ব্যূহ রচনার চেষ্টা করলেন।

সম্রাটের সৈন্যবাহিনী নেমে এসেছিল দক্ষিণ মুখে। পূর্বে বঙ্গোপসাগরের সুনীল জলরাশি। মহানদী সফেন তরঙ্গভঙ্গে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে সমুদ্রে। ব্রাহ্মণী এসে ধারা মিশিয়েছে সেই মিলনভূমিতে।

মহারাজ মহেন্দ্রের প্রাসাদ দেখা যাচ্ছিল সেই সঙ্গমক্ষেত্রের অনতিদূরে।

জলবেষ্টনীর এই অতিরিক্ত সুযোগটি গ্রহণ করেছিলেন মহারাজ। কিন্তু সবই বৃথা হল। সম্রাটের বাহিনীর ভেতর থাকত নৌবিশারদেরা। তাদের সুপরিচালনায় ব্রাহ্মণী পার হয়ে বাহিনী প্রবেশ করল

মহেন্দ্রের রাজধানীতে। দুই দিবসের যুদ্ধে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল রাজা মহেন্দ্রের বাহিনী। বৃদ্ধ রাজা যুদ্ধ করছিলেন হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করে।

অদূরে রথারূঢ় সম্রাট লক্ষ করছিলেন বৃদ্ধ মহারাজের বিক্রম। মহারাজ সিংহনাদে উৎসাহিত করছিলেন তাঁর সৈন্যদের।

কিন্তু সমরবিদ্যায় সুনিপুণ সম্রাট-বাহিনী দ্বিতীয় দিনেই চূর্ণ করে দিল মহারাজ মহেন্দ্রের প্রতাপ।

মহারাজের কটক ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলে মহারাজের শিক্ষিত হস্তী তাঁকে পৃষ্ঠে নিয়ে প্রস্থান করল। অশ্বারোহী দেহরক্ষীরাও সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করল প্রাসাদে। রুদ্ধ হল রাজপুরীর দ্বার।

কিন্তু আত্মসমর্পণ চাই। সম্রাটের বাহিনী এক সময় ভেঙে ফেলল রাজপুরীর দ্বার।

আশ্চর্য এক দৃশ্য উন্মোচিত হল।

সম্রাট দেখলেন, প্রশস্ত প্রাঙ্গণ যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে শ্বেত প্রস্তরের সোপানাবলী। ঠিক তার ওপরেই বিশাল সুসজ্জিত সভাগৃহ। উন্মুক্ত সভাগৃহের মাঝখানে সাময়িকভাবে একটি শয্যা পাতা। সেখানে শায়িত বৃদ্ধ মহারাজ মহেন্দ্র। ক্ষতবিক্ষত দেহখানি অনাবৃত। পরম যত্নে প্রায় অচেতন মহারাজের বিক্ষত শরীরে প্রলেপ দিচ্ছেন সম্ভবতঃ বর্ষীয়সী মহারানী। অন্যান্য রানীরা তেমনি সম্ভ্রান্ত আবরণ আভরণে আবৃত হয়ে এক একখানি ছুরিকা হস্তে ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছেন।

সোপানাবলীতে প্রিয়দর্শন পাঁচজন যুবা পুরুষ তরবারি হস্তে দণ্ডায়মান।

সম্রাটকে সিংহদ্বার থেকে অগ্রসর হতে দেখে পাঁচজন যুবক একসঙ্গে চীৎকার করে বলতে লাগল, আমাদের পিতা ক্লান্ত, ক্ষতবিক্ষত। তাঁর কাছে পৌছবার আগে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করুন।

স্তম্ভিত সম্রাট আবার শুনলেন নারীকণ্ঠের সমবেত উচ্চারণ, আমাদের পরম প্রেমময় স্বামী রণশ্রমে আচ্ছন্ন। এ অবস্থায় তাঁর কোনোরূপ অমর্যাদা হলে আত্মহত্যা ছাড়া কোন পথ থাকবে না আমাদের।

সম্রাট তাঁর অতি বিশ্বস্ত সুদক্ষ দেহরক্ষীদের ইঙ্গিতে তাঁর সঙ্গে আসতে বারণ করে একাই অগ্রসর হলেন।

যুবা পুরুষদের উদ্যত অস্ত্র অবনমিত হল।

বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে রাজমহিষীরা তাকিয়ে রইলেন সম্রাটের দিকে।

সম্রাট সোপান অতিক্রম করে পৌঁছলেন মহারাজ মহেন্দ্রের কাছে।

মহারাজের চৈতন্য সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয়নি। তিনি চিনতে পারলেন সম্রাটকে। ইঙ্গিতে উপবেশনের আসন দিতে বললেন।

আসন এল। সম্রাট উপবেশনের আগে হস্ত সঞ্চালনে আহ্বান করলেন তাঁর অন্যতম সেনাপতিকে।

সেনাপতি কাছে এলে তাঁকে কিছু নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন।

অচিরেই মহারাজের শয্যাপার্শ্বে প্রয়োজনীয় ভেষজাদিসহ উপস্থিত হলেন সম্রাটের শ্রেষ্ঠ ভিষগরত্ন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত প্রলেপাদির ব্যবস্থা করে দিলেন। সম্রাট স্বয়ং বৃদ্ধ মহারাজের হস্তধারণ করে তাঁকে দুশ্চিন্তার হাত থেকে আশ্বস্ত করলেন।

কয়েক দিনের মধ্যেই সম্রাটের বিচক্ষণ বৈদ্যের চিকিৎসায় মহারাজ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন। তিনি সম্রাটের ব্যবহারে এতই অভিভূত হয়েছিলেন যে স্বয়ং সম্রাটের শিবিরে গিয়ে তাঁকে 'একরাট' সম্রাটরূপে স্বীকার করে এলেন।

সম্রাটও মহারাজকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন তাঁর রাজ্যে। বললেন, আপনি কেবল বীরই নন, সৌভাগ্যবানও বটে। এমন অনুগত সন্তান ও সাধ্বী পত্নী যাঁর গৃহে তাঁকে কোনো শক্তিই পরাভূত করতে পারে না।

দক্ষিণ কোশল থেকে সম্রাট প্রবেশ করলেন মধ্যভারতের শৈল ও অরণ্য পরিবৃত অঞ্চলে। বীর বাকাটকদের সম্রাট এড়িয়ে গেলেন। তরঙ্গিত খাদ ও কঙ্করময় মালভূমি অঞ্চলে দীর্ঘকাল যুদ্ধে লিপ্ত থাকা তাঁর কাছে বিবেচনা প্রসূত বলে মনে হল না। তিনি বাকাটকদের সঙ্গে কোনো এক সময়ে বৈবাহিক সম্পর্ক

স্থাপন করে মৈত্রীবন্ধন সুদৃঢ় করতে চাইলেন মনে মনে।

তবু তাঁকে লিপ্ত হতে হল অরণ্য-সংগ্রামে। তিনি তখন সসৈন্যে যাত্রা করছিলেন গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে বেঙ্গীরাজ হস্তিবর্মার সঙ্গে বল-পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে। ঠিক সেই সময়ে তাঁর পথরোধ করে দাঁড়ালেন মহাকান্তারের ব্যাঘ্ররাজ।

কৌশলে, বিক্রমে ব্যাঘ্ররাজ যথার্থই শার্দূল। অতর্কিতে আক্রমণে বিভ্রান্ত করে দিয়ে তিনি সসৈন্যে আত্মগোপন করতে লাগলেন কান্তারে।

বেশ কয়েক মাস চলল এই যুদ্ধক্রীড়া । শেষে সুস্থিত পরিকল্পনায় সম্রাট সসৈন্যে ঘিরে ফেললেন ব্যাঘ্ররাজকে। অরণ্যে প্রজ্বলিত হলো অগ্নি। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড ঝটিকায় সে অগ্নি ছড়িয়ে. পড়ল মহাকান্তারে। গোপন আশ্রয় ত্যাগ করে বেরিয়ে এলেন সসৈন্যে ব্যাঘ্ররাজ। যুদ্ধের পূর্বেই বন্দি হয়ে গেলেন তিনি।

সম্রাট জানতে পারলেন ব্যাঘ্ররাজ বাকাটকদেরই প্রধান সামন্ত নৃপতি। তিনি তাঁর কাছ থেকে কেবলমাত্র উপঢৌকন নিয়ে তাঁকে স্ব-সিংহাসনে পুনঃস্থাপিত করলেন।

অনুরূপভাবে বেঙ্গীরাজ হস্তিবর্মাও বশ্যতা স্বীকার করে নিজরাজ্য ফিরে পেলেন। শর্ত অনুযায়ী স্থির হল, রাজ-পতাকায় এখন থেকে গ্রহণ করতে হবে গুপ্ত-সম্রাটদের ধ্বজ-চিহ্ন।

এবার আরও দক্ষিণে নেমে গেলেন বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে। উপস্থিত হলেন সমুদ্রতীরে কাঞ্চি নগরীতে।

কাঞ্চীর পল্লবরাজ বিষ্ণুগোপ দুর্গ ও প্রাসাদের দ্বার রুদ্ধ করে বসে রইলেন। তিনি একটি বিশেষ পরিস্থিতির কথা ভেবে বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। দুদিকেই আত্মমর্যাদা রক্ষার প্রশ্ন। পরমেশ্বর বিষ্ণু এ কি কঠিন সমস্যায় ফেললেন তাঁকে। যে বাক্যে আবদ্ধ তিনি সেই বাক্যটি রক্ষা করতে গেলে অবশ্যই পরিহার করতে হবে যুদ্ধ। আবার যুদ্ধে লিপ্ত হলে বাক্যভঙ্গ করতে হবে তাঁকে।

সম্রাটের শিবির সংস্থাপিত হয়েছে প্রাসাদের একপার্শ্বে। একটি পরিখা বেষ্টন করে আছে দুর্গ আর প্রাসাদ। রানীমহলের দিকে পরিখার সঙ্গে সংযুক্ত আছে একটি নয়নলোভন জলাশয়। ঐ জলাশয়ের মাঝখানে ক্ষুদ্র একটি ভূমিখণ্ড। মহারাজ বিষ্ণুগোপ কন্যা সুমঙ্গলার জন্য একটি নাটমণ্ডপ নির্মাণ করে দিয়েছেন সেখানে।

সুমঙ্গলা কেবল সুন্দরীই নয়, নৃত্য-পটিয়সী। সে সখিদের নিয়ে নৃত্যাভ্যাস করে ঐ নাটমণ্ডপে।

সন্ধ্যার অল্পকাল পরেই অন্ধকারে লুপ্ত হয়ে গেল চরাচর। বিষাদমগ্ন মহারাজ বিষ্ণুগোপের প্রাসাদ। দীপ নির্বাণের আদেশ দিয়েছেন প্রধান সেনাপতি। দূরে সম্রাটের শিবিরে ক্ষুদ্র একটি বর্তিকার আলো জ্বলে আছে নিষ্প্রভ নক্ষত্রের মতো।

কাল প্রভাতে যুদ্ধ, কিন্তু আজ রাত্রে মগ্ন হয়ে বীণা বাজাচ্ছেন সম্রাট। সমুদ্র থেকে ভেসে আসছে বাতাস। মনে হচ্ছে, যবদ্বীপ, সুমাত্রা থেকে সুগন্ধী মশলাবাহী যেসব জাহাজ সুনীল সমুদ্রে ভেসে আসছে তাদেরই সুবাসে ভরে উঠেছে রাত্রির বাতাস।

সম্রাট মগ্ন হয়ে বাজিয়ে চলেছেন বীণা, আর সে বীণার রাগ-রাগিণীর পথ বেয়ে তাঁর স্মৃতির দ্বারে এসে আঘাত হানছে সুদূর অতীতের প্রায় ভুলে যাওয়া কোনো অভিমানী বসন্তলক্ষ্মী।

মহামান্য সম্রাট, দুজন যুবতী রমণী আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী। তাঁরা অপেক্ষা করছেন বাইরে।

ভিল্সার কথায় বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে তাকালেন সম্রাট।

রমণী! নিয়ে এস ভেতরে।

কিছুক্ষণের ভেতরেই দুই যুবতী প্রবেশ করল।

সম্রাটকে নতজানু হয়ে নমস্কার করে উঠে দাঁড়াতেই তিনি তাদের উপবেশনের জন্য ইঙ্গিত করলেন।

একজন উপবেশন করল, অন্যজন এগিয়ে এল সম্রাটের কাছে। সে গজদন্ত খোদিত এক আধারে সম্রাটকে একটি পত্র দিল।

সম্রাট পত্রখানি খুলে পাঠ করলেন।

বেশ কিছু সময় চিন্তামগ্ন থেকে সম্রাট যুবতীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, কোথায় নিয়ে যাবে চল।

যুবতীদ্বয়ের পশ্চাতে সম্রাট শিবির থেকে নির্গত হলেন।

বিস্মিত-বিহ্বল ভিল্‌সা সম্রাটকে অনুসরণ করতে গেলে সম্রাট তাঁকে ইঙ্গিতে নিরস্ত করলেন।

পদব্রজে নক্ষত্রালোকে বাঁধা রাজপথ ধরে কিছুদূর আসার পর প্রাসাদ ও দুর্গের ঘনকৃষ্ণ ছবিটি চোখের সামনে ফুটে উঠল।

যুবতীদের একজন বলল, সম্রাট, এবার বাঁধা ঘাটে নামতে হবে, অনুগ্রহ করে আমার হাত ধরুন।

কৌতূহলী সম্রাট বিনা দ্বিধায় যুবতীর নির্দেশ পালন করে সোপান বেয়ে নীচে নেমে একখানি নৌকাতে গিয়ে উঠলেন।

অতি সুসজ্জিত ক্ষুদ্র এই নৌকাটি চালিয়ে নিয়ে চলল ঐ দুই যুবতী রমণী। জলে এমনভাবে তারা বহিত্র চালনা করল যাতে বাতাসে শব্দ দূরে ছড়িয়ে পড়তে না পারে।

তরণী এসে ভিড়ল রাজকন্যা সুমঙ্গলার জলমহলে।

একখানি হংস-শীর্ষ দীপাধার হাতে নিয়ে এগিয়ে এল রাজকুমারী সুমঙ্গলা।

সম্রাট সেই দীপালোকে পথ চিনে প্রবেশ করলেন রাজকুমারীর নৃত্য-নিকেতনে।

সম্রাটকে উপযুক্ত আসনে বসিয়ে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে চরণবন্দনা করল রাজকুমারী সুমঙ্গলা। অতঃপর পঞ্চপ্রদীপ নিয়ে আরতি করল সম্মানীয় অতিথির।

আরতি সমাপ্ত হলে সম্রাটের মুখোমুখি নতজানু হয়ে বসল রাজকুমারী।

আমি ভাবতে পারিনি আপনি সামান্য এক কন্যার ডাকে এতখানি পথ চলে আসবেন।

সম্রাট বললেন, হয়তো অন্য সময় হলে আমি চিন্তা করতাম, কিন্তু বীণা বাজাচ্ছিলাম আপনমনে, তাই মনটা এই পার্থিব জগতের মধ্যে ছিল না।

আমি শুনেছি সম্রাট, আপনি একজন দক্ষ বীণকার।

বীণা বাজিয়ে আমি আনন্দলাভ করি কন্যা।

রাজকুমারী বলল, যাঁর বীণার ঝংকারে আমার মঞ্জীর মুখর হয়ে ওঠে তিনি আমার গুরু এবং পিতার ঘনিষ্ঠ বান্ধব।

সম্রাট কৌতূহলী হয়ে উঠলেন, তুমি নৃত্যশিল্পী!

অতি শৈশব থেকেই আমি নৃত্যাভ্যাস করেছি, তবে আজও আমি জানি না আমার পারদর্শিতা কতখানি।

আমি আজ তোমার নৃত্য দেখব কন্যা।

কিন্তু আপনার বীণা শোনার আগ্রহ নিয়ে আমি বসে আছি।

সম্রাট অমনি বললেন, তাহলে তুমি নৃত্য শুরু কর, আমি বীণা বাজাই।

সম্রাট সুদৃশ্য পশমনির্মিত আস্তবণের ওপর শায়িত বীণাখানি অঙ্কে তুলে নিয়ে বললেন, এ যে দেখছি উৎকৃষ্ট একখানি মহতী বীণা। একে বাম স্কন্ধে স্থাপন করে বাজাতে হবে।

সম্রাট আপনমনে বীণাখানি বাঁধতে লাগলেন। অন্তরালে চলে গেল রাজকুমারী।

ফিরে এলে দেখা গেল সম্পূর্ণ নৃত্যের আবরণ, আভরণে বিভূষিতা এক দেব-নর্তকী।

শুরু হল বাদন, শুরু হলো নৃত্য। সে এক অপার্থিব পরিবেশ সৃষ্টি হল সেই জলমহলের নাটমণ্ডপে।

দীর্ঘরাত্রি পর্যন্ত চলল সেই দ্বৈতলীলা।

নৃত্যশেষে রাজকুমারী নিজহস্তে সম্রাটকে আহার্য পরিবেশন করলে সম্রাট বললেন, নিজস্ব সূপকারের দ্বারা প্রস্তুত অন্ন ব্যতীত যুদ্ধকালে কোনো খাদ্যবস্তুই গ্রহণ করা বিধেয় নয়। তবু তোমার পরিবেশিত ভোজ্য আমি গ্রহণ করব।

এ আমার পরম সৌভাগ্য সম্রাট। তাছাড়া এক অতি সামান্য কন্যার সকাতর আহ্বানে সাড়া দিয়ে আপনি অকাতরে শত্রুপুরীতে প্রবেশ করতে দ্বিধা করেননি, এতে আপনার মহান চরিত্রের অন্য একটি দিক

ফুটে উঠেছে।

সম্রাট সস্মিত মুখে বললেন, তোমার নাম সুমঙ্গলা, তাই আমি তোমার কাছ থেকে কোনো অমঙ্গলেরই আশঙ্কা করিনি। তাছাড়া তোমার পত্রের ছত্রে ছত্রে তোমার সহজ মনখানি দর্পণের মতো প্রতিবিম্বিত হয়েছিল। তুমি শরতকালীন মেঘের মতোই শুভ্র ও নির্মল।

সম্রাট শিবিরে যাত্রার জন্য উঠে দাঁড়ালে রাজকুমারী সুমঙ্গলা তাঁকে ভূলুণ্ঠিত প্রণামে শ্রদ্ধা জানাল। সম্রাট তাকে তুলে ধরে বললেন, আমার রাজগৃহে একমাত্র পুত্র চন্দ্র তোমারই বয়সী। তুমি আমার কন্যার মত।

রাজকুমারী সুমঙ্গলা বলল, যখন কন্যারূপে আমাকে গ্রহণ করলেন তখন আমার একটি বিশেষ অনুরোধ রাখতে হবে।

বল সুমঙ্গলা?

আগামীকল্য আমার বিবাহের দিন ধার্য হয়েছে। বহু পূর্ব থেকেই এই দিনটি নির্ধারিত। চোল রাজ্যের রাজপুত্র আসবেন আমাকে বধূরূপে গ্রহণ করতে। আমাদের একান্ত নিবেদন আপনি বিবাহসভায় উপস্থিত থেকে এই মঙ্গল অনুষ্ঠানের গৌরব বৃদ্ধি করুন।

সম্রাট ক্ষণকাল চিন্তা করে বললেন, তোমার পিতার কাছ থেকে আমন্ত্রণটি আসা বাঞ্ছনীয়।

অবশ্যই সম্রাট, আর সে ব্যবস্থার ভার রইল আমার ওপর।

সম্রাট সস্নেহে সুমঙ্গলার মাথায় হাত রেখে বললেন, নিশ্চিন্তে থেকো, তোমার মঙ্গলকর্ম নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হবে।

সুমঙ্গলার বিবাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সম্রাট। মহারাজ বিষ্ণুগোপ সম্রাটের উদার অন্তঃকরণের পরিচয় পেয়ে এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তিনি বিনাযুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করে নিলেন।

সম্রাটের বাহিনী কাঞ্চী পরিত্যাগের পূর্বে মহারাজ সমস্ত বাহিনীকে বিপুল ভোজে আপ্যায়িত করে প্রত্যেকের হাতে একটি করে উপহার তুলে দেন।

দাক্ষিণাত্য বিজয়যাত্রার শেষ যুদ্ধ হয় পালক্কদের সঙ্গে। সেখানেও সম্রাট পরাজিত রাজাকে উৎখাত না করে তাঁকে তাঁর রাজ্য প্রত্যার্পণ করেন। বিনিময়ে তিনি লাভ করেন চিরবন্ধুত্ব এবং অপরিমেয় রত্নরাজি।

প্রত্যাবর্তনের সময় মহা বলাধ্যক্ষ তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, মহামহিম সম্রাট, আর্যাবর্ত বিজয় কালে আপনি প্রতিটি রাজ্য জয় করে সেখানকার রাজাদের উৎখাত করেছিলেন। তাঁদের রাজ্য নিজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন। কিন্তু দাক্ষিণাত্য বিজয়ে সে নীতি অনুসরণ করেননি কেন?

সম্রাট উত্তর করেছিলেন, বার বার বৈদেশিক আক্রমণ আর্যাবর্তের রাষ্ট্রগুলিকে লক্ষ করেই হয়েছে। তাই আর্যাবর্ত রক্ষার ভার অন্যের ওপর ছেড়ে না দিয়ে নিজেই গ্রহণ করেছি। অন্যদিকে দক্ষিণভারতে সৈন্য পরিচালনা করা যে বিশেষ কষ্টসাধ্য তা আপনি লক্ষ করেছেন। তাই কেবল বন্ধুত্বের রাখীবন্ধন করেছি দক্ষিণের সঙ্গে।

একটু থেমে সম্রাট বললেন, সমগ্র ভারতরাষ্ট্র একই বন্ধনে বাঁধা পড়ুক, এই আমার ঐকান্তিক কামনা। তা সে কাজ কোনোক্ষেত্রে হতে পারে বলপ্রয়োগের দ্বারা, কোথাও বা বন্ধুত্বের দ্বারা, আবার কোথাও বা বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে।

পাটলীপুত্র নগরী আজ উৎসব সজ্জায় সেজেছে। বিজয়ী সম্রাট বহুকাল পরে ফিরে আসছেন রাজধানীতে। নানা বর্ণের পুষ্পের পাপড়িতে পরিকীর্ণ রাজপথ। প্রতি গৃহে পুষ্পমাল্যের সজ্জা, গন্ধ দ্রব্যের আয়োজন। পতাকা উড়ছে গৃহশীর্ষে।

দলে দলে নাগরিক সারিবদ্ধভাবে পথপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে বিজয়ী বাহিনীর ওপর পুষ্পবর্ষণের জন্য। উৎসুক প্রতীক্ষায় কম্পিত হৃদয়ে দাঁড়িয়ে আছে যোদ্ধাদের পরিবারস্থ মানুষজন। ঈশ্বরের কাছে মনে মনে প্রার্থনা জানিয়ে চলেছে, যেন তাদের গৃহের মানুষগুলি ফিরে আসে অক্ষত শরীরে!

সহস্র সহস্র পারাবত চক্রাকারে ঘুরছে নগরীর রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশে। শান্তিমন্ত্র উচ্চারণ করছেন বৌদ্ধ শ্রমণেরা। ব্রাহ্মণকুলের কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে বেদমন্ত্র। স্থানে স্থানে বাদ্যধ্বনির সঙ্গে জয়ধ্বনি মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে।

শ্বেত অশ্ববাহিত রথে এইমাত্র যুবরাজ চন্দ্রগুপ্ত এগিয়ে গেলেন পিতাকে প্রত্যুদ্‌গমন করে নিয়ে আসার জন্য।

সম্রাটের রথের পূর্বে যুবরাজের রথ। যেন অরুণ পথ দেখিয়ে আনছে দিবাকরকে। পশ্চাতে শ্রেণীবদ্ধ সৈন্যের সুশৃঙ্খল মিছিল।

সম্রাট প্রবেশ করলেন প্রাসাদে। পুষ্পবর্ষণ ও শঙ্খধ্বনির মধ্য দিয়ে তিনি প্রথমে রাজসভায় প্রবেশ করলেন। সেখানে স্বস্তিবচন পাঠ করলেন নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণেরা। সভাসদদের সঙ্গে প্রীতি ও সমাচার বিনিময়ের পর তিনি বিশ্রামের জন্য প্রস্থান করলেন অন্তঃপুরে।

পরদিন পাটলীপুত্রের ব্রাহ্মণ কুলতিলকেরা সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন।

সম্রাট, শেষ অশ্বমেধের লগ্ন উপস্থিত।

সম্রাট প্রসন্ন অন্তরে বললেন, উত্তম, আয়োজন করুন।

প্রবীনতম আচার্য বললেন, কিছু বাধা আছে সম্রাট, অনুমতি পেলে ব্যক্ত করি।

সম্রাট বললেন, বিনা দ্বিধায় ব্যক্ত করুন বিপ্রবর।

আপনার অসির সম্মুখে নত হয়েছেন ভারতেন শ্রেষ্ঠ রাজন্যবর্গ, কিন্তু সম্রাট এখনও অক্ষত মহিমায় বিরাজ করছেন লিচ্ছবীকুল। এ কেবলমাত্র আমাদেরই উক্তি নয় ধরিত্রী পতি, সমগ্র জনতার নিরন্তর আলোচনার বিষয়।

সম্রাট কিছু সময় নীরবে বসে রইলেন। একসময় বললেন, সত্য অনাবৃত হোক। আমার জননী লিচ্ছবী কন্যা, সে ক্ষেত্রে লিচ্ছবীদের প্রতি আমার দুর্বলতা থাকা একান্ত স্বাভাবিক। তবু যেহেতু সারা ভারতকে আমি সংঘবদ্ধ করতে চাই, সেইহেতু লিচ্ছবীরাও আমার আহ্বানে মিলিত হোক, আপনাদের ন্যায় এ আমারও কামনা।

জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলেন ব্রাহ্মণকূল।

আবার সৈন্যসজ্জা শুরু হল। মহারানী দত্তাদেবী সম্রাটকে একান্তে ডেকে বললেন, চন্দ্র (দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত) এখন বিবাহযোগ্য হয়েছে। আমি আমার পিতৃকুলের একটি কন্যাকে নির্বাচন করে রেখেছি। আপনার সম্মতি পেলে নাগবংশীয় কন্যা কুবেরমায়াকে পুত্রবধূ করে প্রাসাদে নিয়ে আসি।

সম্রাট বললেন, অতি উত্তম প্রস্তাব। যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তোমার এ পরিকল্পনা কার্যকরী হবে মহারানী।

সসৈন্যে সম্রাট লিচ্ছবীরাজ ধ্রুবদেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হলেন।

বিপুল বাহিনী দশম দিবসে এক অরণ্যের সন্নিকটে এসে শিবির সংস্থাপন করল।

সে রাতটি ছিল শুক্লা চতুর্দশী। বন্যার প্লাবনের মত জ্যোৎস্নাধারায় ভেসে যাচ্ছিল চরাচর।

সম্রাট শুভ্র একখানি পোশাকে আবৃত করলেন দেহ। শ্বেত অশ্বে আরোহণ করে নিষ্ক্রান্ত হলেন শিবির থেকে।

এই ধরনের রাত্রি সম্রাটকে যেন সম্মোহিত করে ফেলে।

সম্রাট উন্মুক্ত এক প্রান্তর লক্ষ করে সেদিকে অশ্বচালনা করলেন। কিছু পথ অগ্রসর হবার পর আশ্চর্য এক অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন সম্রাট।

সহসা মনে হল, কোনো এক জন্মান্তরে তিনি এখানে এসেছিলেন। এই পথ,এই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নিশি তাঁর একান্ত পরিচিত।

সম্রাট বেশ কিছু সময় ঐ প্রান্তরে অশ্ব নিয়ে ইতস্তত বিচরণ করলেন।

সহসা দৃষ্টি আকৃষ্ট হল একটি কুটীরের দিকে। বড় চেনা এ কুটীর। কয়েকটি কিংশুক শাখায় শাখায়

পুষ্পের প্রদীপ জ্বেলেছে।

কোথায় যেন বীণা বাজছে। একি, স্বপ্নের জগতে বিচরণ করছেন সম্রাট!

অশ্বটিকে প্রান্তরের এক শিলাখণ্ডে বেঁধে রেখে বীণার ধ্বনি অনুসরণ করে চলতে লাগলেন সম্রাট কুটীরের দিকে।

বীণাতে বাজছে রাগ বসন্ত। অপূর্ব সুর-সাধনা। সুর যেন গড়ে তুলছে ঋতুরাজের প্রতিকৃতি।

সম্রাট কুটীরের অঙ্গনে এসে দাঁড়ালেন।

আশ্চর্য! সেই কন্যা! কৈশোর থেকে তারুণ্যে উত্তীর্ণ হচ্ছে এক বর্ণগন্ধময় কুসুম। এ কন্যা বড় চেনা। একে একান্ত নিকট থেকে দেখেছে কাচ।

সম্রাট যেন বহুযুগের ওপার থেকে ডাক দিলেন, মুক্তামালা...!

কণ্ঠে হাত দিয়ে দেখলেন, সেই মুক্তামালা আজও শোভা পাচ্ছে তাঁর কণ্ঠে।

বীণা থেমে গেল। কিশোরী নেমে এল অঙ্গনে।

কে আপনি? কাকে চান?

সম্রাট বললেন, আমি মুক্তামালাকে খুঁজছি। তুমি কে?

আমি ধ্রুবা। আমার মায়ের নাম মুক্তামালা। আপনি কুটীরে এসে বসুন, মা কিছুক্ষণের ভেতরেই এসে যাবেন।

কোথায় গেছেন তোমার মা?

দাদার কাছে।

কোথায় থাকে তোমার দাদা?

কেন, মহারাজের প্রাসাদে। আপনি মহারাজ ধ্রুবদেবের নাম শোনেননি?

ধ্রুবদেব তোমার দাদা!

মায়ের আমি একমাত্র মেয়ে, আমার কোনো ভাইবোন নেই। তবে মহারাজ আমাকে বোনের মতো স্নেহ করেন।

শুনেছি, ধ্রুবদেব যুবা পুরুষ।

ঠিকই শুনেছেন। আমার বাবা ওঁর শিক্ষক ছিলেন, তাই আমাকে বোনের মতো ভালবাসেন।

তোমার বাবা কোথায়?

তিনি গত হয়েছেন। রাজবাড়িতে এখন মা বীণা শেখান।

তোমার মা কি আজ সেখানে বীণা বাজাতে গেছেন?

কিশোরী বলল, পথিক, আপনি জানেন না, পাটলীপুত্রের সম্রাট তাঁর দুর্জয় বাহিনী নিয়ে আসছেন আমাদের রাজ্য আক্রমণ করতে। মহারাজ তাই অত্যন্ত চিন্তিত। তিনি সৈন্য সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। মা সারাক্ষণ পাশে থেকে উৎসাহ দিয়ে চলেছেন তাঁকে।

যদি ঘটনা তাই হয় তাহলে তা সত্যই দুর্ভাগ্যজনক।

কিশোরী আবেগতাড়িত হয়ে বলল, মায়ের মুখে শুনেছি, সম্রাট নাকি এই লিচ্ছবীকুলেরই দৌহিত্র।

সম্রাট বললেন, আমারও তো তাই জানা আছে।

তাহলে আপনিই বলুন, পাটলীপুত্রের সম্রাটের এ কি উচিত কাজ হয়েছে? আত্মীয় বিরোধ!

সম্রাট কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, আমি যদি সম্রাট হতাম তাহলে এই সমস্যার একটা সমাধানের পথ নিশ্চয়ই খুঁজে বের করতাম।

কিশোরী সাগ্রহে বলল, কি রকম?

তুমি আমাকে একটি লেখনী আর ভূর্জপত্র দাও। আমি এই পত্রে সমাধানের একটি সূত্র দেখিয়ে দেব। এ পত্র কেবলমাত্র তোমার মায়ের হাতেই তুলে দেবে তুমি। অন্য কেউ যেন তাঁর পূর্বে এ পত্রখানি পাঠ না করেন।

পত্রখানি রচনা করে সম্রাট কিশোরীর হাতে তুলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

আপনি উঠলেন কেন, আমি অতিথিকে কিছু আহার্য দিতে চাই।

আজ থাক, কথা দিচ্ছি যদি সুদিন আসে তাহলে তোমার দেওয়া খাবার আমি সানন্দে মুখে তুলে তৃপ্তিভরে খাব।

কিশোরী বলল, আপনাকে আমার খুব ভাল লেগেছে, চলুন খানিক পথ এগিয়ে দি।

সেই জ্যোৎস্নালোক, সেই কিশোরী কন্যা, ঋতুও বসন্ত, শুধু নিঃশব্দ, অলক্ষ্য স্রোতধারার মত বয়ে গেছে মহাকাল। কিন্তু হরণ করতে পারেনি সে কিছুই। সরে গেছে মুক্তামালা, তার শূন্যস্থানটিতে এসে দাঁড়িয়েছে কিশোরী ধ্রুবা।

অশ্বারোহণের পূর্বে সম্রাট তাঁর কণ্ঠ থেকে মুক্তামালাটি খুলে নিয়ে কিশোরীর হাতে দিয়ে বললেন, এ মালাটি পত্রের সঙ্গে তোমার মায়ের হাতে তুলে দিও।

প্রিয় মুক্তামালা,

সেদিন তুমিও জানতে চাওনি আর আমিও তোমাকে দিয়ে যেতে পারিনি আমার আসল পরিচয়টুকু। আজ আমি তোমাদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছি কেবল শত্রুর মূর্তি ধরে।

তোমার আমার মাঝখানে যে সেতুখানা ভেঙে গিয়েছিল, আশ্চর্যভাবে তোমার কন্যা সেই সেতুর পাশটিতে এসে দাঁড়িয়েছে। ওই কেবল পারবে ভাঙনের হাত থেকে সবকিছু রক্ষা করতে। সেতুবন্ধনের সূত্রটি রইল ওরই হাতে।

আমার পুত্র চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য বিবাহযোগ্য। আমি তার জন্য তোমার চারুশীলা কন্যা ধ্রুবাকে বধূরূপে পেতে চাই। তোমার দিক থেকে যদি কোনো বাধা না থাকে তাহলে আমার শিবিরে ঐ মুক্তামালাটিসহ একজন দূত পাঠিও। শুনেছি মহারাজ ধ্রুবদেব ধ্রুবাকে আপন ভগিনীর মতই ভালবাসেন। তিনি যদি প্রস্তাবটি আমার শিবিরে পাঠান তাহলে তা অবশ্যই সাদরে গৃহীত হবে। এক্ষেত্রে লিচ্ছবী ও গুপ্তদের বন্ধন সুদৃঢ় হবে আর একবার।

তোমার কাচ
(সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত)

পত্রখানি পাঠ করে অশ্রুজলে সিক্ত হল মুক্তামালার দুটি চোখ।

পরদিনই বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে দূত এল। সঙ্গে সেই অমূল্য মুক্তামালা।

সম্রাট মালাখানি গ্রহণ করে দূতকে বললেন, আমি এই যাত্রাতেই বর-বধূ নিয়ে পাটলীপুত্রে ফিরে যেতে চাই। আমার পুত্র চন্দ্র এই বাহিনীব প্রধান বলাধ্যক্ষরূপে উপস্থিত রয়েছে। বিবাহের আয়োজন করুন।

যুদ্ধযাত্রা রূপান্তরিত হয়ে গেল বরযাত্রাতে।

সম্রাটের সঙ্গে চকিতে দেখা হয়ে গেল মুক্তামালার বিবাহ বাসরে।

সম্রাট কৌতুক করে বললেন, এবার শুরু হোক রাগ বসন্ত।

মুক্তামালার চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে অনুচ্চে বলল, তোমার হাতে আগে বাজুক আশাবরী, তারপর আমি বাজাব বসন্ত।

পাটালীপুত্রে ফিরে গেলে মহাসমারোহে বধূবরণ করলেন মহারানী দত্তাদেবী।

এক ফাঁকে শুধু সম্রাটের কানের কাছে মুখখানা এনে বললেন, নাগকন্যাদের বুঝি আর পছন্দ হয় না সম্রাটের?

সচকিত হয়ে সম্রাট সহাস্যে বললেন, অবশ্যই তোমার প্রস্তাবিত নাগকন্যা এই গুপ্তগুহায় প্রবেশ করবেন।

মরু-মৃগয়া

তিয়েনশান পর্বতের আড়ালে সূর্যাস্ত হয়ে গেছে। শেষ রক্তিম আভাটুকু আকণ্ঠ শুষে নিয়েছে পশ্চিম দিগন্ত। পাশাপাশি তিনখানা পটাবাসে (তাঁবু) রন্ধনের আয়োজন চলছে। যারা পটাবাস তৈরির ভার নিয়েছিল তারা তাদের কাজ শেষ করে এখন পাশে পড়ে থাকা পেটিকায় হেলান দিয়ে গল্পে মেতেছে। অন্য দলটি দ্রুত রন্ধন শেষ করার কাজে ব্যস্ত।

অতি প্রত্যুষে বেরিয়ে বণিকের দলটি বহু দুর্গম পথ অতিক্রম করে এখানে এসে পৌঁচেছে। এখন শৈলশিরার পাদমূলে চলেছে তাদের বিশ্রামের আয়োজন।

ভারতীয় এই দলটির সহযাত্রী হয়ে এসেছে এক তরুণ যুবা পুরুষ। সুদর্শন সম্ভ্রান্ত-আকৃতি। কেবল দেশ-দর্শনের ইচ্ছাই তাকে টেনে এনেছে এত দূরের পথে। যুবক কুমারায়ণ অদূরে একটি স্রোতস্বতী থেকে জল সংগ্রহের কাজে এসেছিল। সে বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করে দেখছিল চতুর্দিক। উত্তর পশ্চিমের গিরিমালা অসংখ্য উচ্চাবচ শৈলশিরায় বিভক্ত হয়ে নেমে এসেছে সমতল ভূমিতে। এই সমতলের প্রস্থ স্থানে স্থানে কিছু অধিক হলেও প্রায় ক্ষেত্রেই সংকীর্ণ। কোথাও কোথাও সবুজ শস্য ক্ষেত্রের চিহ্ন, কোথাও বা ক্ষুদ্র বৃহৎ শিলা-খণ্ডে আকীর্ণ। দক্ষিণ-পূর্ব দিকে কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র। তরঙ্গিত বালির পাহাড় দিগন্তের কোলে গিয়ে মিশেছে।

জলের পাত্রটি পূর্ণ করে কুমারায়ণ ওপরের দিকে তাকাতেই একটি দৃশ্য তার চোখের সামনে ফুটে উঠল।

সন্ধ্যার আবছায়ায় কালো হয়ে আসা পর্বতের একটি অংশে হঠাৎ দেখা গেল কয়েকটি আলোর কমল। ঐ কমলগুলি ছিন্ন মালার আকারে ওপর থেকে নচে অন্ধকারের স্রোতে ভেসে আসছিল। কখনো দৃষ্টির আড়ালে ডুবে যাচ্ছিল আবার কখনো ভেসে উঠছিল চোখের ওপর।

এক সময় হারিয়ে গেল সেই আলোর কমলগুলি। অন্ধকারে প্রস্তরাকীর্ণ পথে আস্তানার সম্মুখে মশালের সংকেত দেখে ফিরে এল কুমারায়ণ।

বণিকদের ভেতর অনেকেই পাহাড়ের ওপর সচল আলোর মালাটিকে দেখেছিল। তারা ঐ আলোর সম্ভাব্য উৎস সম্বন্ধে আলোচনা করছিল। কুমারায়ণ অভিজ্ঞ বণিকদের কথা থেকে জানতে পারল, তারা এখন ভরুক অঞ্চলের কোনো একটি স্থানে রয়েছে। এই পথেই ভরুক ছাড়িয়ে কিজিল ও কুচী নগরীতে যেতে হবে। (ভরুক, কিজিল ও কুচী মধ্য এশিয়ার প্রাচীন জনপদ)।

জনৈক বণিক বলল, ভরুকে সম্ভবত কোন উৎসব চলেছে, তারই আলো ওটা।

অন্যজন বলল, এমনও তো হতে পারে আমাদের চেয়ে অনেক বড় কোনো দল রাতে ওপরের শৈলশিরায় মশাল জ্বেলেছে।

দলপতি মন্তব্য করলেন, উৎসবের আলো হওয়াই সম্ভব। বৈশাখী পূর্ণিমা, বুদ্ধ তথাগতের জন্মতিথি। গত পরশ্ব পূর্ণিমা গেছে, হয়তো উৎসবের জের চলেছে আজও।

সহসা কুমারায়ণের মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। প্রভু বুদ্ধের জন্মোৎসব এখানে! ভারতবর্ষ থেকে এত দূরে!

সে প্রশ্ন করল, এসব অঞ্চলের মানুষ কি প্রভু অমিতাভকে এমনভাবে স্মরণ করে!

দলপতি অনভিজ্ঞ যুবকটিকে বললেন, দক্ষিণে শূলি (কাশগড়), চোক্কুক (ইয়ারকন্দ), গোদান (খোটান) আর উত্তরে ভরুক (ইয়াক-আরিক্), কুচী (কুচা), অগ্নি দেশ (কারাশর) বহুকাল আগেই প্রভু বুদ্ধের শরণ নিয়েছে।

যুবক নিজেও সম্প্রতি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছে। পণ্ডিত বংশের সন্তান সে। বেদ, উপনিষদের শিক্ষায় শিক্ষিত। অন্যদিকে পালি ও সংস্কৃত ভাষায় রচিত বৌদ্ধ শাস্ত্রগুলি অধ্যয়ন করেছে তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সে শুনেছে একাধিক ভারতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুর কথা, যাঁরা ভারত ছেড়ে বহু দূর দূরান্তে বুদ্ধের বাণী বহন করে নিয়ে গেছেন।

নিজের পরিচয় এই সার্থবাহ দলটির কাছে গোপন রেখেছিল কুমার যণ। তারা শুধু জানত, দেশ-দর্শনে আগ্রহী এক যুবক তাদের সঙ্গ নিয়েছে।

সারাদিন পথ অতিবাহনে বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল বণিকেরা। রাতের শুরুতেই আহার্য দ্রব্য গ্রহণ করে শয্যার আশ্রয় নিল। অচিরেই তন্দ্রার গভীরে তলিয়ে গেল তারা।

কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া তিথির অবগুণ্ঠন সরিয়ে চাঁদ উঁকি দিয়েছে আকাশে। নির্জন, নিঃশব্দ চরাচর। পর্বতের শৃঙ্গগুলি তুষারের মুকুট মাথায় পরে সারিবদ্ধভাবে বসে রয়েছে স্বয়ম্বর সভায় সমাহূত রাজন্যবর্গের মত। সভায় প্রবেশ করে চাঁদ এখন পরিক্রমণ করছে তাদের।

ঘুম ভেঙে গেল কুমারায়ণের। গায়ে কপিশবর্ণের পশমী উত্তরীয়খানা জড়িয়ে নিয়ে পটাবাসের (তাঁবু) বাইরে এসে দাঁড়াল সে। বৈশাখ মাস, কিন্তু নিশীথকালে এ সকল অঞ্চলে শীত প্রবল। তিন দিক ঘিরে তুষার পর্বত, সামনে বালুকা স্তূপ। বালির স্তূপগুলি আশ্চর্য রহস্যময় হয়ে উঠেছে। কুমারায়ণকে সমস্ত প্রকৃতি তাদের কাছে গিয়ে বসার জন্য আকর্ষণ করতে লাগল।

পটাবাসের অভ্যন্তরে গিয়ে কুমারায়ণ সন্তর্পণে নিজের সুষিরটি (বাঁশি) নিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। পায়ে পায়ে গিয়ে দাঁড়াল গত সন্ধ্যার সেই স্রোতস্বতীটির কাছে। গ্রীষ্মকালে পর্বতের তুষার গলে গিয়ে নদী, ঝর্ণা জলে পুষ্ট হয়ে ওঠে। কুমারায়ণ দেখল ঝর্ণাটি উচ্ছল নটীর মত পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে নৃত্য করতে করতে নেমে আসছে নীচে। চন্দ্রালোকে জলকণাগুলি নটীর দেহে হীরে মুক্তার অলঙ্কারের মত ক্ষণে ক্ষণে ঝলসে উঠছে। আবার ঝর্ণাটি সমতলে এসে পূর্ব দিকের বালুপ্রান্তরে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

কুমারায়ণকে ঐ নৃত্যপটিয়সী ঝর্ণা প্রবলভাবে আকর্ষণ করতে লাগল। এ যেন এক কুহকিনী কিন্নরী, পথিককে সম্মোহিত করে দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেল।

কুমারায়ণ ওষ্ঠে বাঁশিটি তুলে নিয়ে ফুঁ দিল। সঙ্গে সঙ্গে এক আশ্চর্য কম্পন রাত্রির নিস্তব্ধতাকে ভেদ করে জ্যোৎস্নার তরঙ্গে প্রবাহিত হতে লাগল।

কুমারায়ণ কিন্তু কোথাও উপবেশন করল না, সে ঝর্ণার জলধারার পথ ধরে বাঁশি বাজাতে বাজাতে এগিয়ে চলল।

কিছুদূরে গিয়ে এক বালির পাহাড়ের মুখোমুখি হল কুমারায়ণ। সঙ্গের স্রোতোধারাটি ঐ বালুকারাশির অভ্যন্তরে কোথাও আত্মগোপন করেছে বলে মনে হল। সে বাঁশি থামিয়ে উঠতে লাগল বিশাল বালুর স্তূপের ওপর।

ওপরে উঠে আশ্চর্য হয়ে গেল কুমারায়ণ। এতক্ষণ বালির পাহাড় যাকে চোখের আড়াল করে রেখেছিল সে একটি মরুদ্যান। যে জলধারাটি লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল বালুকা স্তূপের মধ্যে তাকে এপারে দেখা গেল। অন্তঃসলিলা ধারায় সে সৃষ্টি করেছে একটি জলাশয়। সেই জলাশয়ের চারদিক ঘিরে খর্জুর বৃক্ষ শোভা পাচ্ছে। খর্জুরকুঞ্জের পরেই একটি নাতিক্ষুদ্র প্রান্তর। কি আশ্চর্য! ওখানে দুটি শুভ্র পটাবাস আলোর সঙ্গে একাকার হয়ে মিশে আছে। সহসা চোখে তাদের অস্তিত্ব ধরা পড়া দুষ্কর।

আকাশে নক্ষত্রের দিকে একবার তাকাল কুমারায়ণ। রাত্রি প্রভাত হতে আর বেশি বাকী নেই। পুবের আকাশে শুকতারার উদয় হয়েছে।

প্রথমে কুমারায়ণের মনে হল, তাদেরই মত কোন বণিকের দল এই মরুদ্যানে এসে রাতের আশ্রয়

নিয়েছে। কিন্তু গভীরভাবে নিরীক্ষণ করে দেখতে গিয়ে সে আতঙ্কে প্রায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। প্রান্তরে ইতঃস্ততঃ ছড়িয়ে পড়ে আছে কতকগুলি মানুষ। খর্জুর বৃক্ষের অন্তরাল দিয়ে যতটুকু দেখা গেল তাতে মনে হল তাদের কারও দেহেই প্রাণ নেই।

কুমারায়ণ দুর্জয় সাহসী যুবা হলেও মুহূর্তের জন্য কে যেন তার সমস্ত মানসিক শক্তিকে নিঃশেষ করে দিয়ে গেল। সে একবার ভাবল, যে পথে এসেছে সেই পথে নিঃশব্দে ফিরে যাবে। কিন্তু পরক্ষণেই তার সাহস ও কৌতূহল একসঙ্গে ফিরে এল। সে বালির পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নীচে নামল। নিস্তরঙ্গ জলাশয়ে স্তব্ধ হয়ে চাঁদ কি যেন দেখছে। খর্জুর বৃক্ষগুলি দাঁড়িয়ে অশরীরী আত্মার মত নিজেদের ছায়াগুলোর দিকে চেয়ে আছে।

দুটি খর্জুর বৃক্ষের অন্তরাল থেকে কুমারায়ণ সবকিছু দেখতে লাগল। হ্যাঁ, তার অনুমানই সত্য। পাঁচ ছ'জন মানুষের ছিন্নভিন্ন দেহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে আছে। সবার পরণে নৈশ পোশাক। কয়েকটি অস্ত্র চন্দ্রালোকে ধাতব দীপ্তি ছড়াচ্ছিল।

এই রহস্যময় দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে কুমারায়ণের মনে হল, এরা পরস্পর যুদ্ধ করে নিহত হয়নি। কারণ বিক্ষিপ্ত অস্ত্রগুলিতে কোনরূপ রক্ত-চিহ্ন নেই। তাহলে এই হত্যাকাণ্ড কিভাবে সঙঘটিত হল? আকস্মিকভাবে কোনো শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হওয়াই সম্ভব। নিজেরা প্রত্যাঘাত হানার জন্য প্রস্তুত হবার আগেই নিঃশেষ হয়েছে।

এর পরের চিন্তা কুমারায়ণকে ভাবিয়ে তুলল। এরা কারা? কোনো বণিক দলের কাছে এ ধরনের দীর্ঘ তরবারি থাকা সম্ভব নয়। তরবারিগুলি কোষমুক্ত হলেও অতর্কিত আক্রমণে হাত থেকে স্খলিত হয়ে পড়েছিল। এরাও নিঃসন্দেহে যোদ্ধা, তবে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা সম্বন্ধে সচেতন ছিল না।

চতুর্দিক নিস্তব্ধ। প্রাণের কোনো লক্ষণই দৃষ্টিগোচর হল না কুমারায়ণের। কোন শত্রু প্রাণ সংহারের জন্য ওৎ পেতে আত্মগোপন করে আছে বলে মনে হল না।

কুমারায়ণ খর্জুর বৃক্ষের অন্তরাল থেকে প্রান্তরের দিকে পা বাড়াতে যাচ্ছিল, এমন সময় তীক্ষ্ণ হ্রেষাধ্বনি কানে এল। থেমে গেল কুমারায়ণ। সে চতুর্দিকে তাকিয়ে অশ্বের অবস্থান সম্বন্ধে জানবার চেষ্টা করতে লাগল।

জলাশয়টিকে খর্জুরকুঞ্জে বেষ্টন করেছিল। যেদিকে প্রান্তর তার বিপরীত দিকে একটি নাতি-উচ্চ বালুকাস্তূপ। ঐ স্তূপের ওপার থেকেই শব্দটা ভেসে আসছিল বলে মনে হল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর যখন আর কোনো শব্দ ভেসে এল না তখন কুমারায়ণ অতি সন্তর্পণে ঐ শব্দের পথ অনুসরণ করে চলতে লাগল। খর্জুরকুঞ্জ পার হয়ে এসে বালুকাস্তূপের ওপর আরোহন করল সে। আর একটি বিস্ময় তার চোখের সামনে উদ্‌ঘাটিত হল। যে স্রোতোধারা সুউচ্চ বালির পাহাড়ের তলা দিয়ে অন্তঃসলিলা হয়ে জলাশয়টি সৃষ্টি করেছে, সেটি ক্ষীণ ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে এপারে। সেই ধারার পাশেই একটি অতি সুদৃশ্য পটাবাস। আকারে ক্ষুদ্র। বাইরে থেকে এর অবস্থান নির্ণয় সহজ নয়। পটাবাসের সামনে দাঁড়িয়ে একটি শ্বেত অশ্ব। আর ঐ অশ্বটির অদূরে জলধারার পাশে পড়ে রয়েছে এক তরুণী। কুমারায়ণের মনে হল, এই বালির স্তূপ থেকেই মেয়েটি ওখানে গড়িয়ে পড়েছে। কারণ বালির একটি অংশে ভারী কোন বস্তুর গড়িয়ে পড়ার চিহ্ন বর্তমান।

এখন কুমারায়ণের চিন্তা এল, মেয়েটি জীবিত কি মৃত ! যে কোন কারণেই হোক মেয়েটি গড়িয়ে পড়েছে বালির স্তূপ থেকে। কিন্তু ঐ গড়িয়ে পড়াই তার মৃত্যু কিংবা মূর্ছার কারণ হতে পারে না।

কুমারায়ণ আর কোনো দ্বিধা না করে নেমে গেল নীচে। মেয়েটির কাছে গিয়ে সে পরীক্ষা করে দেখল, না, মেয়েটির মৃত্যু হয়নি। শ্বাসপ্রশ্বাস বইছে। শ্রেষ্ঠ শিল্পীর হাতে গড়া মূর্তির মত মুখখানিতে লেগে আছে ভয়ঙ্কর আতঙ্কের ছায়া।

কুমারায়ণ জলধারা থেকে জল তুলে মেয়েটির চোখে মুখে ছিটিয়ে দিতে লাগল। বরফগলা অত্যন্ত শীতল জলের স্পর্শে মেয়েটি অচিরে চোখ মেলে তাকাল। সে চোখে তখনও বিহ্বলতার ঘোর। কিন্তু

কুমারায়ণ তরুণীর অবয়বের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত ! শুভ্রবর্ণ, স্বর্ণাভ কেশ আর নীল আঁখির তারায় তরুণীকে ভিন্ন জগতের মানবী বলে মনে হল তার।

তুষারশীতল জলের ছোঁয়ায় কয়েকবার কম্পিত হল তরুণীর দেহ। ধীরে ধীরে সে উঠে বসল নিজের শক্তিতে।

সহসা সামনে কুমারায়ণকে দেখে তার চোখে মুখে ফুটে উঠল আতঙ্কের ছায়া। সে পালাবার চেষ্টা করল কিন্তু দুর্বল দেহটাকে বেশী দূর টেনে নিয়ে যেতে পারল না, আবার মাটিতে পড়ে গেল।

কুমারায়ণ আশ্বাস দিয়ে বলে উঠল, ভয় পাবেন না, আমি আপনার শত্রু নই, মিত্র। কি আশ্চর্য! কুমারায়ণের ঐ কটি কথা মন্ত্রের মত কাজ দিল।

তরুণীর গলা আবেগে কেঁপে উঠল, প্রভু বুদ্ধের জয় হোক, তিনিই এখানে আপনাকে পাঠিয়েছেন।

কিন্তু আশ্বাসের কথাকটি কুমারায়ণ উচ্ছ্বাসে উচ্চারণ করে গেলেও তরুণীটি যে তার ভাষা বুঝতে পারবে তা সে ভাবতেই পারেনি। তক্ষশীলায় প্রচলিত গান্ধার অঞ্চলের প্রাকৃতে সে কথাগুলো বলছিল। তরুণী প্রায় সমান কুশলী উচ্চারণে গান্ধার-প্রাকৃতেই জবাব দিল।

তরুণীর ভারতীয় ভাষার জ্ঞানে বিস্মিত হলেও এই মুহূর্তে কুমারায়ণের মনে হল মেয়েটিকে সামনের পটাবাসে নিয়ে যাওয়া দরকার।

সে এগিয়ে গিয়ে অসংকোচে মেয়েটির হাত ধরে বলল, চলুন, আমি আপনাকে ঐ পটাবাসের (তাঁবু) মধ্যে প্রবেশ করতে সাহায্য করি।

মেয়েটি তাকাল কুমারায়ণের মুখের দিকে। সে মুখে পৌরুষের দীপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য একধরনের সহৃদয় কমনীয়তা মাখান। সে কুমারায়ণের হাত ধরে উঠে দাঁড়াল। দুজনে প্রবেশ করল পটাবাসের মধ্যে।

অতি সুসজ্জিত অভ্যন্তর। শয্যা ও উপবেশনের স্থান নানা বর্ণের চীনাংশুকে আচ্ছাদিত। গবাক্ষপথে চন্দ্রালোকে সবই উদ্ভাসিত।

নিজে শয্যায় এলিয়ে বসে পাশের আসনে উপবেশনের জন্য ইঙ্গিত করল কুমারায়ণকে।

কুমারায়ণ বসলে তরুণীর প্রথম প্রশ্ন, আপনি কি বলতে পারেন প্রান্তরে যে শিবির রয়েছে তার কি খবর? আমি বলতে চাইছি, আমার রক্ষীদের কেউ বেঁচে আছে কি ? উঃ কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য!

কুমারায়ণ বলল, আপনি স্থির হয়ে বিশ্রাম করুন, বিচলিত হবেন না। আমার মনে হয় তাদের কেউ আক্রমণকারীদের হাত থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারেনি। আবার আপনি বিচলিত হচ্ছেন, স্থির হয়ে বসুন।

মেয়েটি কিছু সময় নীরব থেকে আবার বলল, আমার দুটি তরুণী পরিচারিকাকে ওরা আমাদের ঘোড়ায় চড়িয়ে নিয়ে গেছে। আমার ঘোড়াটি ছাড়া সবকটিই ওরা নিয়ে গেছে।

আপনার আস্তানার সন্ধান ওরা নিশ্চয় পায়নি?

আমি রাতে এখানে পৌঁছে রক্ষীদের আড়ালে থাকব বলে এই স্থানটি নির্বাচন করেছিলাম।

আপনার নির্বাচন আপনাকে রক্ষা করেছে। আচ্ছা, কারা এই আক্রমণ চালিয়েছিল তা আপনি অনুমান করতে পারেন?

আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল রক্ষীদের চীৎকারে। তারা হূন-হূন বলে চেঁচাচ্ছিল।

তারপর?

তরুণী উত্তেজনায় শয্যার ওপর সোজা হয়ে উঠে বসল। তার দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস কুমারায়ণ শুনতে পাচ্ছিল।

আমি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে বালির ঐ স্তূপটার ওপর উঠলাম। উঁকি দিয়ে যা দেখলাম তাতে আমার সমস্ত শরীর হিম হয়ে গেল। আমার কয়েকজন রক্ষীর ছিন্ন-ভিন্ন দেহ পড়ে আছে। আমার পরিচারিকাদের আকুল কান্নার স্বর আমি শুনতে পাচ্ছিলাম। ওদের তখন ঘোড়ায় তোলা হয়েছে। আর আমাদের সমস্ত ঘোড়াগুলোও তখন ওদের হেফাজতে। ওরা প্রান্তর পেরিয়ে বায়ুকোণ ধরে চলতে লাগল।

কথা বলতে বলতে এখানে একটু থামল মেয়েটি। আবার কথা যখন শুরু করল তখন গলায় লেগেছে

আতঙ্কের সুর।

ঠিক ওদের চলে যাবার মুহূর্তে ঐ খর্জুর কুঞ্জ থেকে একটি শর নিক্ষিপ্ত হল। আমারই কোন রক্ষী লুকিয়ে থেকে ঐ শর নিক্ষেপ করে থাকবে। শরটি হূন সর্দারের বাহুবিদ্ধ করল। সঙ্গে সঙ্গে ফিরে দাঁড়াল সমস্ত দলটা। চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল জায়গাটা। শর নিক্ষেপ করেই রক্ষীটি বালির পাহাড় ডিঙিয়ে পালাবার চেষ্টা করছিল কিন্তু বালি ভেঙে পালাবার আগেই ধরা পড়ে গেল। তাকে সর্দারের আদেশে বেঁধে ফেলল হূনেরা। তারপর ঐ পাহাড়ের বালি অনেকখানি সরিয়ে লোকটিকে জ্যান্ত ওর মধ্যে শুইয়ে মণ মণ বালি চাপা দিয়ে দেওয়া হল। আমি সেই মুহূর্তেই মনে হয় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে নীচে গড়িয়ে পড়েছিলাম। আর কিছু মনে নেই।

কুমারায়ণ বলল, আমি খর্জুর বৃক্ষের আড়াল থেকে যতটুকু দেখেছি তাতে মনে হয় জীবিত আর একজনও কেউ ঐ প্রান্তরে নেই। তবু আপনি এখানে অপেক্ষা করুন, আমি চারদিক একবার ভাল করে দেখে আসছি।

মেয়েটি সহসা বলে উঠল, আপনি আমাকে দয়া করে ফেলে যাবেন না। এই শবের শ্মশানে আমি দম বন্ধ হয়ে মারা যাব।

কুমারায়ণ আশ্বাস দিয়ে বলল, আমার অনুমান আপনি বুদ্ধের ভক্ত। আমার সঙ্গে প্রথম বাক্যালাপেই আপনি প্রভুর নাম উচ্চারণ করেছিলেন। আমি তাঁরই দেশের মানুষ, তাঁরই নির্দেশে পথ চলি। আপনি নির্ভয়ে থাকুন। আমি আমাদের বণিকদলকে সংবাদ দিয়ে এখুনি এখানে নিয়ে আসছি।

তরুণীটি বলল, দয়া করে অধিককাল বিলম্ব করবেন না।

কুমারায়ণ বাইরে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি এখুনি আসছি।

কুমারায়ণ প্রথমে পার্শ্ববর্তী প্রান্তরে, শিবির মধ্যে অনুসন্ধান করে দেখল, কেউ কোথাও আছে কিনা, তারপর সব শূন্য দেখে সে নিজের আস্তানার দিকে ফিরে চলল।

শেষ রাত্রে বণিকদলের প্রায় সকলেই শয্যা ত্যাগ করেছিল। কুমারায়ণকে শয্যায় দেখতে না পেয়ে ভাবছিল, খেয়ালী যুবক নিশ্চয়ই নিকটবর্তী কোন স্থানে গিয়ে থাকবে। এখুনি এসে পড়বে সে, কারণ ভোরের যাত্রার জন্য তৈরি হয়ে নিতে হবে তাদের।

কুমারায়ণ এল, কিন্তু অন্য মুখচ্ছবি। উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা, হাঁপাচ্ছিল।

দলপতি উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, কি খবর কুমারায়ণ, কোথায় গিয়েছিলে? এমন চেহারাই বা হয়েছে কেন?

কুমারায়ণ বালির পথ ভেঙে দৌড়ে আসার জন্যই হাঁপাচ্ছিল। সে বণিকদের কাছে রাতে শিবির ছেড়ে যাবার পর থেকে যে সব ঘটনা ঘটেছিল তার আনুপূর্বিক বর্ণনা দিয়ে গেল।

মুহূর্তে দলপতি ও অন্যান্য বণিকদের মুখে চোখে আতঙ্কের ছায়া ঘনিয়ে উঠল। দলপতি সঙ্গে সঙ্গে আদেশ করলেন, তাঁবু তোল। হূনেরা এই অঞ্চলেই কোথাও রয়েছে। আমরা কুচী রাজ্যে না গিয়ে ফিরে যাব বহ্লীকে।

কুমারায়ণ বলল, তাহলে আপনারা কিছু সময় অপেক্ষা করুন, আমি ঐ অসহায় মেয়েটিকে নিয়ে আসছি।

দলপতি কঠিন স্বরে বললেন, আমরা বণিক, ব্যবসায়ে লাভ করাই আমাদের উদ্দেশ্য, লোকসান নয়, যুবক। এত পথ পরিশ্রম করে এলাম লুণ্ঠিত হবার জন্যে? মূহূর্ত বিলম্ব নয়, যাবার জন্য তৈরি হও।

দেখতে দেখতে বোঝাগুলি তৈরি হয়ে গেল। কয়েকটি অশ্বেতর দাঁড়িয়ে ছিল, ভারী বোঝাগুলি তাদের ওপর চাপান হল। অতি দ্রুত এবং নিঃশব্দে কাজ শেষ হলে দলপতি দক্ষিণ-পশ্চিমে চলার আদেশ দিলেন।

কুমারায়ণ এতক্ষণ অন্যান্য বণিকদের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছিল, এখন দলপতির মুখে চলার আদেশ পেয়ে সে থমকে দাঁড়াল।

দলপতি চলার জন্য পা বাড়িয়েই থেমে গেলেন।

কি হল তোমার, দাঁড়ালে যে?

আপনার কাছে আমি অশেষ ঋণে ঋণী, কিন্তু বিবেককে বিসর্জন দিয়ে আত্মরক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনারা ব্যবসায়ী, আপনাদের পথ ভিন্ন, কিন্তু আমি সাধারণ ভ্রাম্যমাণ, আমার হারাবার কিছু নেই।

দলপতি বললেন, যুবক তোমার অভিজ্ঞতা অল্প, তার ওপর তুমি আবেগপ্রবণ. তোমাকে আমি নিজের পথে চলতে বাধা দেব না। তবে পৃথিবী বড় কঠিন জায়গা, হিসেবের সামান্য ভুল হলেই বিপদে পড়বে। তোমার মঙ্গল হোক।

দলপতি আর কোনো দিকে না তাকিয়ে দ্রুত ধাবমান দলটির পশ্চাৎ অনুসরণ করে চললেন। তাঁর মনে কুমারায়ণের জন্য সঞ্চিত হয়েছিল কিছুটা অপত্য স্নেহ। যুবকটির আচরণ তৃপ্তিদায়ক, কর্তব্যজ্ঞান প্রবল, সকলের ওপর তার বংশীবাদনের ক্ষমতা অসাধারণ। ক্লান্ত দেহমনে তার বাঁশির সুর সুধার মত কাজ করে। কিন্তু এসব কথা ভাবলে দলপতির চলে না। সারা দলের শুভাশুভের কথা তাঁকে ভাবতে হয়। একটি যুবকের ইচ্ছা পূরণের জন্য এতগুলি মানুষের বিপদের ঝুঁকি নেওয়া যায় না। তাঁর এই দীর্ঘ বণিক জীবনে কত মানুষ তিনি দেখেছেন। সাধুবেশে সঙ্গী হয়ে মহা মূল্যবান মণিরত্ন লুণ্ঠন করে পালিয়েছে. তাছাড়া দস্যুর মুখোমুখি হয়ে কত বণিক দলকে তিনি দেখেছেন ধনেপ্রাণে নিঃস্ব হয়ে যেতে।

দলটি পথের বাঁকে অদৃশ্য হলে কুমারায়ণ সেদিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। এখন এই অজ্ঞাত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে সে একা। পথ জানে না, আহার্য কিভাবে সংগ্রহ করা যাবে তাও সে জানে না। সামনে শুধু একটুকরো কর্তব্যের আলো তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।

কুমারায়ণ যখন মরুদ্যানে ফিরে এলো তখন প্রভাতের আর বিলম্ব ছিল না। মরুচর পাখির দল বৃক্ষশাখায় বসে প্রভাতী কলরবে মেতে উঠেছিল। নীল দিগন্তে ভোরের আভাস। হিরকখণ্ডের মত তখনও জ্বল জ্বল করে জ্বলছে শুকতারা।

প্রভাতের এই প্রসন্ন আয়োজনের মধ্যেও একটা বীভৎস দৃশ্য কুমারায়ণের মনকে অস্থির করে তুলল। সে এই নারকীয় পরিস্থিতির হাত থেকে কতক্ষণে মুক্তি পাবে সেই চিন্তা করতে করতে দ্বিতীয় বালির স্তূপটি পেরিয়ে তরুণীর আস্তানায় এসে ঢুকল।

শয্যায় হতচেতন হয়ে পড়েছিল তরুণীটি ! রাত্রির জাগরণে আর শঙ্কায় সে একটা ঘোরের মধ্য দিয়ে চলেছিল। কুমারায়ণ শীতল জলের স্পর্শে তাকে জাগিয়ে তুলল। তরুণী শয্যায় উঠে বসে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কুমারায়ণের মুখের দিকে। সে যেন রাতের বীভৎস হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি দেখছিল ভয়ঙ্কর একটা স্বপ্নের ঘোরে। সকালে উঠে সব মিথ্যে হয়ে যাবে এই ছিল তার আশা। কিন্তু রাতের স্বপ্নের শেষ পর্বে সে যে মানুষটিকে দেখেছিল সেই মানুষটিই যেন দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে।

বিহ্বলতা তখনও কাটেনি। সে জিজ্ঞেস করল, কে ? কে আপনি?

কুমারায়ণ বুঝল, এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে মেয়েটির ভাবান্তর অস্বাভাবিক নয়। সে অত্যন্ত কোমল গলায় বলল, আপনি বিচলিত হবেন না, আমি আপনার বন্ধু। কিছুক্ষণ আগে আমি আপনার কাছেই ছিলাম।

মেয়েটি এতক্ষণে কিছুটা স্বাভাবিক হল। তার সব ঘটনা দৃশ্যের পর দৃশ্য মনে পড়ে গেল। সে উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, আপনি আপনার বণিক দলটিকে এখানে নিয়ে আসবার জন্যে গিয়েছিলেন না? তাঁরা সবাই কোথায়?

তারা চলে গেছে।

কি সর্বনাশ! আপনাকে ফেলে। আমিই দেখছি আপনার বিপদের কারণ হলাম। আপনি হঠাৎ এসে এখানে আটকে না পড়লে এ অঘটন কিছুতেই ঘটত না।

মেয়েটির উদ্বেগ দূর করে সহজ গলায় কুমারায়ণ বলল, আপনার সঙ্কোচের কোনো কারণ নেই জানবেন। আমি একটি বণিক দলের সঙ্গী হয়ে পড়েছিলাম ঠিকই কিন্তু আমি ওদের দলের কেউ ছিলাম

না। নিছক দেশ ভ্রমণের জন্যেই আমি বেরিয়েছিলাম। পথে বণিক দলটির সঙ্গে আমার পরিচয়। পথের পরিচয় পথেই শেষ হয়ে গেল। দায় রইল না কোনো পক্ষেরই।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে কী যেন ভাবল মেয়েটি। এক সময় মুখ তুলে ধীরে ধীরে বলল, এখন আপনি কোথায় যাবেন, কি করবেন, কিছু ভেবেছেন কি?

আমাদের প্রথম কাজ হবে এই মৃত্যুপুরী থেকে এখুনি বেরিয়ে পড়া। তারপর পথেই ঠিক করা যাবে গন্তব্য।

ওরা মরুদ্যান ছেড়ে বেরিয়ে যাবার আগে মৃতদেহগুলি সমাহিত করল।পর্যাপ্ত খাদ্য সঙ্গে নিল আর চর্মাধারে ভরে নিল পানীয়। অশ্বটির পিঠে প্রয়োজনীয় দ্রব্য চাপিয়ে দিল।

পথে নেমে কুমারায়ণ বলল, আমাদের প্রথম প্রয়োজন দুজনের নাম জেনে নেওয়া, তারপর যাত্রার দিক নির্ণয় করা। আমাকে আপনি কুমারায়ণ বলে ডাকবেন।

আমি জীবা।

বিস্মিত হল কুমারায়ণ। মেয়েটির আকৃতির সঙ্গে ভারতীয়দের অনেক পার্থক্য, কিন্তু নামের মধ্যে এতখানি মিল, আশ্চর্য!

তার মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন দেখে মেয়েটি বলল, আপনার ভাষা শুনে বুঝেছিলাম আপনি ভারতীয়। আমার দীক্ষাগুরুও ছিলেন আপনার দেশেরই লোক। তিনিই আমার জন্মের পর জীবা নামকরণ করেছিলেন।

আপনি কোন রাজ্যের অধিবাসী জানতে পারি কি ?

মেয়েটি ক্ষণকাল কি ভাবল। সম্ভবত সে তার পুরো পরিচয় দেবে কিনা ভাবছিল। সে শুধু বলল, কুচী রাজ্যে আমার বাস।

কি আশ্চর্য! আমি যে বণিকদলের সঙ্গে ছিলাম তারাও কুচী রাজ্য লক্ষ করে চলেছিল।

জীবার মুখে চিন্তার ছায়া ঘনিয়ে উঠল। সে বলল, তাহলে তো ওদের মুখে আমাদের বিপর্যয়ের খবর কুচী রাজ্যে পৌঁছে যাবে।

কুমারায়ণ বলল, যদিও আমি আপনাদের বিপর্যয়ের কথা সবিস্তারে বণিকদের কাছে বলেছি তবু কুচী রাজ্যে এই মুহূর্তে খবর পৌঁছানোর সম্ভাবনা কম।

একথা কেন বলছেন? ওরা কুচীতে গেলে কথায় কথায় খবর নিশ্চয়ই ছড়িয়ে পড়বে।

আমার মুখে বণিকেরা হূন দস্যুদের খবর পেয়েই পথ বদলে বহ্লীকের দিকে চলে গেছে।

জীবা বলল, এখন তাহলে আমরা কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে যাত্রা করতে পারব।

কুমারায়ণ সামান্য চিন্তা করে নিয়ে বলল, দক্ষিণ-পশ্চিমে কেন? আপনার কুচী রাজ্য তো ওদিকে নয়।

আমরা কুচী থেকে গোদানের (খোটান) দিকে যাচ্ছিলাম। ঐ দিকেই এখন যাবার ইচ্ছে। আপনার কি ওদিকে যাবার অসুবিধে আছে?

দিকবিদিকে ঘোরাব বাসনা নিয়েই বেরিয়েছি, আমার কাছে সব দিকই সমান মূল্যবান।

তবে চলুন গোদানের দিকেই যাই।

কুমারায়ণ সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে বলল, চলুন, তবে পথের নিশানা তো আমার জানা নেই।

আমিও এই প্রথম গোদানে চলেছি, তবে এ পথের কথা গুরু ধর্মমতির মুখ থেকে বহুবার শুনেছি। আগে ধর্মমতি কুচীতেই ছিলেন। গোদানের মহারাজা অমিত্রবিজয় কুচীর মহারাজকে অনুরোধ জানিয়ে গুরু ধর্মমতিকে গোদানে নিয়ে গেছেন। সেখানে তিনি বিখ্যাত গোমতীবিহারে মহাশ্রমণের পদ অলঙ্কৃত করেছেন। গুরু ধর্মমতি কুচীকে ভুলতে পারেননি তাই বৎসরান্তে একটিবার এসে দেখা দিয়ে যান।

পথ চলতে চলতে কুমারায়ণ ও জীবার পরিচয় সহজ হয়ে উঠল।

কুমারায়ণ বলল, আপনার গোদানে যাবার বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য আছে কি ?

গোদানে 'বুদ্ধযাত্রা' উৎসব দেখার জন্যেই আমি বেরিয়েছি। অবশ্য গুরুর সঙ্গেও সাক্ষাতের বিশেষ

প্রয়োজন আছে।

গত সন্ধ্যায় পাহাড়ের ওপর থেকে আলোর একটি মালাকে নীচে নেমে আসতে দেখেছিলাম, আমাদের দলপতির অনুমান ভরুকের কোথাও বুদ্ধ উৎসব চলেছে, তারই আলো।

জীবা বলল, সূর্যাস্তের কিছু পরে ডানদিকের ঐ পাহাড় অঞ্চলটায় দেখেছিলেন কি ?

আপনার অনুমান ঠিক। আলোর একসারি পদ্ম যেন অন্ধকারের স্রোতে ভেসে আসছিল।

এখন শূলি, চোক্কুক, গোদান, ভরুক, কুচী, অগ্নিদেশের সর্বত্র চলেছে বুদ্ধ উৎসব, কিন্তু গত সন্ধ্যার ঐ আলোটি উৎসবের ছিল না।

কুমারায়ণ বলল, তবে কি কোনো বণিক দলের জ্বলন্ত মশাল দেখেছিলাম?

হ্যাঁ, মশালের আলোই দেখেছিলেন তবে সেগুলো কোন বণিকদলের হাতে ছিল না।

বিস্মিত কুমারায়ণ জিজ্ঞেস করে, তবে?

আমরাই পাহাড় থেকে নামছিলাম। আমাদের হাতেই মশাল ছিল। সন্ধ্যার আগেই ঐ মরুদ্যানে নেমে আসবার কথা কিন্তু পথে সামান্য বিপর্যয়ে আমাদের বিলম্ব হয়ে যায়। আর ঐ বিলম্বই আমাদের কাল হল।

এ কথার অর্থ একটু পরিষ্কার করে বলুন।

এখন আমার অনুমান হূন দস্যুরা দূর থেকে আমাদের ঐ আলো দেখতে পায়। তারা আমাদের অনুসরণ করে মরুদ্যানের কাছাকাছি আত্মগোপন করে থাকে। রাতে রক্ষীরা তাঁবুর মধ্যে নিদ্রা গেলে চাঁদের আলোয় হূনেরা অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। পালাক্রমে রক্ষীদের পাহারা দেবার রীতি। যে রক্ষীটি প্রহরায় নিযুক্ত ছিল, তারই মুখ দিয়ে হূন-হূন চীৎকার বেরিয়ে আসে। আমি সেই শব্দে জেগে উঠেছিলাম।

কুমারায়ণ জানতে চাইল, কোনো মূল্যবান বস্তু দস্যুরা অপহরণ করে নিয়ে গেছে কি ?

জীবা ম্লান মুখে বলল, সবচেয়ে মূল্যবান যে বস্তুগুলি দস্যুরা অপহরণ করে নিয়ে গেছে তা হল তাজা কয়েকটি প্রাণ। তার পরের মূল্যবান বস্তু জীবন্ত দুটি তরুণী।

একটু থেমে আবার জীবা বলল, আপনি কি মণিরত্ন কিছু লুণ্ঠিত হয়েছে কিনা জানতে চান?

ততক্ষণে লজ্জায় মুখ আরক্ত হয়েছে কুমারায়ণের। সে বলল, আমাকে ক্ষমা করবেন, আমি মণিরত্ন লুণ্ঠনের কথাই জানতে চেয়েছিলাম।

জীবা সহজ গলায় বলল, সেটাই স্বাভাবিক। তবে গুরুর দর্শনে যাচ্ছি তাই মণিরত্নের অলংকার সঙ্গে আনবার প্রয়োজন-বোধ করিনি। অবশ্য গুরুপ্রণামীর স্বর্ণমুদ্রাগুলি আমার সঙ্গেই আছে। দস্যুরা তার হদিশ পায়নি।

দুদিন ওরা চলল সীতা নদীর একটি উপনদী ধরে। (প্রাচীন সীতা নদীটি বর্তমানে তারিম নদী আর তার উপনদীটি বর্তমানে ইয়ারকন্দ দরিয়া)। কখনো বিস্তীর্ণ বালুভূমি পথে পড়ল, কখনো পাহাড়ের পাদদেশে বনভূমি আর ফলকর বৃক্ষের উদ্যান।

কুমারায়ণকে এখন জীবা কুমার বলেই ডাকে। কুমারের বিচিত্র জীবন-কাহিনী, তার সুখ দুঃখের আগ্রহী শ্রোতা আর অংশীদার হতে ভাল লাগে জীবার।

কুমারায়ণ কথা আরম্ভ করে, শুনেছি, তোমাদের কুচী নগরীর রাজকুমারী পরমা সুন্দরী। অবশ্য তোমাকে দেখলে সে অনুমান সত্য বলে মনে হয়।

রাজকুমারীর খবব কোথায় পেলে কুমার?

সঙ্গী বণিকদের মুখ থেকে।

তারাও কি তোমার মত শুনেছে না নিজেদের চোখে দেখেছে রাজকুমারীকে ?

দলপতি নাকি নিজের চোখে দেখেছে রাজকুমারীকে। শুধু রূপে নয়, গুণেও নাকি তিনি অনন্যা। বহু বিদ্যা তাঁর অধিগত। চতুর্দিকে তাঁর রূপ আর বিদ্যার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে।

জীবা বলে, আমার চেয়ে কুচীর রাজভগিনীকে বেশি কেউ জানে না।

রাজভগিনী বলছ কেন জীবা? উনি তো কুচীর মহারাজার কন্যা।

দুটিই সত্য কুমার। উনি রাজকন্যা ঠিক, তবে মহারাজার মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সিংহাসনের অধিকারী হয়েছেন, তাই তিনি এখন রাজভগিনী।

শুনেছি উনি অবিবাহিতা।

এ কথাও তোমার শোনা হয়ে গেছে?

শুনেছি আমাদের দলপতির মুখ থেকেই। আরও জেনেছি রাজকুমারীর বিয়ের আয়োজন চলেছে, আর সেজন্যে মূল্যবান মণিমুক্তা নিয়ে দলপতি কুচীর অভিমুখে যাচ্ছিলেন।

দুর্ভাগ্য রাজকন্যার, ভারতের লোভনীয় মণিমুক্তাগুলি তাঁর হাতছাড়া হয়ে গেল। শুনতে ইচ্ছে করে কি কি দ্রব্য ছিল বণিকের পেটিকায়। রাজভগিনীকে গিয়ে অন্তত সে সংবাদটুকু দিতে পারব।

কুমারায়ণ একটি একটি করে দ্রব্যের তালিকা পেশ করে যায়। দুর্লভ মুক্তা দিয়ে গাঁথা একটি মালা। বৈদুর্য ও ফিরোজামণির অলংকার। হীরকের একটি দর্শনীয় অঙ্গুরীয়।

অন্য কিছু? যা অলংকার নয় অথচ তৃপ্তিদায়ক।

তাও ছিল, কিন্তু সেগুলি বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে নয়।

তবে?

সেগুলি ছিল রাজভগিনীর বিবাহের উপহার।

দুর্ভাগ্য রাজভগিনীর, সেই উপহারগুলি থেকে তিনি বঞ্চিত হলেন। কি সে উপহার কুমার?

অতি সূক্ষ্ম একখণ্ড বস্ত্র যা অবগুণ্ঠনের মত ব্যবহার করলেও দেহের কিংবা পোশাকের স্বাভাবিক বর্ণকে আবৃত করবে না।

বিস্ময়কর!

শুধু তাই নয়, শিশিরসিক্ত তৃণের ওপর বিছিয়ে দিলে কেবল সবুজ তৃণগুলিই দেখা যাবে, বস্ত্র খণ্ডটি অদৃশ্য হয়ে যাবে দৃষ্টির সামনে থেকে।

আশ্চর্য!

আরও দুটি উপহার ছিল রাজভগিনীর জন্য।

কি সে উপহার? যত শুনছি ততই হতাশ হয়ে পড়ছি বান্ধবীর কথা ভেবে। সতি বেচারার কি দুর্ভাগ্য। হাতের ধন দুরন্ত নদীর প্রবাহে পড়ে হারিয়ে গেল?

রাজভগিনী বুঝি তোমার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী জীবা?

এতবড় বান্ধবী বোধকরি আর তার কেউ নেই। দেহ এবং আত্মায় আমরা নাকি অভিন্ন। রাজ্য শুদ্ধু সকলে এই কথা বলে।

এখন অন্য দুটি উপহারের কথা বলছি শোন : একটি চন্দন কাঠের ওপর খোদিত হরিণ-হরিণী। দুটি প্রাণী পরস্পর অন্তরঙ্গভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর ঠিক যেন মনে হচ্ছে তাদের নাভি থেকে সুবাস ছড়িয়ে পড়ছে।

জীবা চোখ বন্ধ করে বলল, বিশ্বাস কর কুমার আমি সেই হরিণ দুটিকে দেখতে পাচ্ছি। আর চন্দনের সুমিষ্ট সুবাস আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে আকুল করে তুলেছে।

আরও আছে জীবা, সেটিও কম আশ্চর্যজনক নয়।

কি সে বস্তু কুমার?

একটি শুক পক্ষী। একবার তার সামনে কোনো কিছু উচ্চারণ করলে সে পরমুহূর্তে অবিকল সেই কথাগুলি উচ্চারণ করবে। পুরো চারছত্র গাথা একবার শুনলেই সে মনে রাখতে পারে!

জীবা মুখে বিস্ময়সূচক শব্দ করে গালে হাত রেখে বলল, এর চেয়ে বিস্ময়কর উপহার আর কি হতে পারে।

কুমারায়ণ বলল, রাজভগিনীর প্রতি ভাগ্যদেবতা প্রসন্ন হলে আরও বড় কিছু উপহার নিশ্চয়ই তিনি পেতে পারেন।

জীবা বলল, তাই যেন সত্য হয়। আমার সখী তোমার এ কথা শুনলে অত্যন্ত খুশী হতেন। এমন কি বক্তাকেও পুরস্কৃত করতেন।

কুমারায়ণ বলল, নাই বা দিলে তোমার সখীকে এসব সংবাদ। তিনি হয়তো দুঃখ পাবেন।

উপহারের কথা না বললে তিনি আরও বেশি দুঃখ পাবেন। কারন কোনোদিনই পরস্পরের কাছে কোনো কথা আমরা গোপন করিনি।

তোমাদের বন্ধুত্ব যে কোনো মানুষের কাছে ঈর্ষার বস্তু। এমন আত্মার সঙ্গে মিলন সত্যিই দেখা যায় না। আচ্ছা জীবা, কুচীর রাজকন্যার বিবাহের কথা কি স্থির হয়ে আছে? আমি বলতে চাইছি কোনো বিশেষ ব্যক্তি কি নির্বাচিত হয়ে আছেন?

যদি বলি এখনও হয়নি তাহলে তুমিও কি অন্যতম প্রার্থী হতে চাও? আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি কুমার।

পরিহাস কোর না জীবা, আমি সামান্য ভ্রাম্যমান মাত্র। এ আমার নিছক কৌতূহলেরই প্রকাশ।

তুমি প্রার্থী হিসেবে দাঁড়ালে কারো অপেক্ষা নিষ্প্রভ হবে না কুমার। সামান্য যে কটি দিন একত্রে থেকেছি তাতেই আমি এ মন্তব্য করতে সাহসী হয়েছি।

দোহাই তোমার জীবা, বান্ধবীর কাছে এ প্রসঙ্গটি তুলে আমাকে আর সংকোচের মাঝে ফেল না।

কিন্তু কুমার আগেই তো বলেছি, তাঁর কাছে আমার কোন গোপন কথাই গোপন থাকবে না।

তবে গোদান পর্যন্ত তোমার সঙ্গী থাকব আমি, তারপর দুজনের পথ ভিন্ন হয়ে যাবে।

আমার ওপর ক্ষুব্ধ হলে কুমার? অসময়ে তুমি যেভাবে আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছ, কোন কিছুর বিনিময়ে আমি তোমার সে বন্ধুত্ব হারাতে চাই না।

কুমারায়ণ সহাস্যে বলল, তোমার ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করা আমার পক্ষে কোন দিনই সম্ভব হবে না জীবা। আমার সামর্থের মধ্যে হলে যে কোন সাহায্যের হাতই আমি তোমার দিকে বাড়িয়ে দেব।

জীবা পূর্বপ্রসঙ্গ টেনে এনে বলল, তুমি জানতে চেয়েছিলে আমার বান্ধবীর জন্য কোন নির্বাচিত প্রার্থী আছে কিনা। না, তাঁর নিজের কিম্বা রাজপরিবারের নির্বাচিত কোন প্রার্থী নেই। তবে চীন সম্রাট তাঁর পুত্রের জন্য রাজভগিনীর পাণি প্রার্থনা করে দূত পাঠিয়েছিলেন। তাছাড়া অগ্নিদেশের তরুণ রাজাও অন্যতম প্রার্থী।

কুমারায়ণ সোচ্ছ্বাসে বলল, খুবই আনন্দ সংবাদ।

না কুমার, কুচীর রাজভগিনীর প্রকৃতি একটু ভিন্ন। শক্তিমান সম্রাটের চেয়ে গুণবান বিদ্বানেরই সে পূজারী।

কুচী কিম্বা পার্শ্ববর্তী অন্য কোন রাজ্যে রাজভগিনীর মনোমত প্রার্থী পাওয়া কি সম্ভব নয়?

সে অন্বেষণ মহারাজ রজতপুষ্প করেছেন, কিন্তু উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান পাননি।

কুমারায়ণ কৌতুক করার জন্য বলল, তোমার বান্ধবীর নাসিকার উচ্চতা সাধারণের অপেক্ষা কিছু বেশী।

জীবা কথার অর্থভেদ করতে না পেরে বলল, আমাকে এ কথার অর্থটুকু বুঝিয়ে বল। আমি তোমার কথার সূক্ষ্ম তাৎপর্য ধরতে পারছি না।

সোজা কথায়, সামান্য কোন বস্তুর ওপরে তার আকর্ষণ নেই, বরং অবজ্ঞার ভাবই আছে।

আমার বান্ধবী সম্বন্ধে দয়া করে এ ধরনের মনোভাব পোষণ না করলেই আমি খুশী হব।

এ আমার সামান্য কৌতুক জীবা। এতে কোনরকম গুরুত্ব দেবে না আশা করি।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। শীতের শিহরণ সারা প্রকৃতিতে। দিবাভাগে উত্তাপ বৃদ্ধি পায়। কখনো কখনো বায়ুপ্রবাহে উত্তপ্ত বালুকা উড়ে চলে। তখন দেহের অনাবৃত অংশ জ্বলতে থাকে। কিন্তু রাতে সম্পূর্ণ অন্য অনুভূতি। বালুকা শীতল, বায়ুর প্রবাহে শীতলতা।

একই পটাবাসের দুই প্রান্তে দুটি শয্যায় দুটি নারী পুরুষে নিদ্রা যায়। সারাদিনের পথশ্রমে ক্লান্ত। তবু

তন্দ্রার কোলে সম্পূর্ণ ঢলে পড়ার আগে তারা পরস্পর নানা প্রসঙ্গে আলাপ করতে থাকে! একসময় কথা থেমে যায়। ক্লান্তিহরা নিদ্রায় বুজে আসে দু'চোখের পাতা।

কুমারায়ণ বড়ই সজাগ। সামান্য বায়ুপ্রবাহও তার বন্ধ চোখের পাতাকে খুলে দিয়ে যায়। আবাল্য একটি অভ্যাস ও অনুশীলন করে এসেছে, যা সত্যিই বিস্ময়কর। নিদ্রা তার অধিকারে। অতি অল্পকাল সে গভীর তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে, পরক্ষণেই ঘটে তার পূর্ণ জাগরণ। এমনি পর্যায়ক্রমে তন্দ্রা আর জাগরণের মধ্যে তার নিশি অতিবাহিত হয়।

রাত্রি দ্বিতীয় যামে শীতল বায়ুর স্পর্শে চোখ মেলে তাকাল কুমারায়ণ। রাত্রি কত তা তার পক্ষে অনুমান করা সম্ভব হল না। সে পাশে রাখা বস্ত্রনির্মিত স্থলী (থলি) থেকে বাঁশিটা বের করে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। শীতল নিস্তব্ধ প্রকৃতি। আকাশ নির্মল নক্ষত্রখচিত।

পূর্বদিকে দৃষ্টি পড়ল কুমারায়ণের। এক অপার্থিব আলোর খেলা চলেছে পর্বতের চূড়ায়। সাদা ও নীলের মিশ্রণজাত রঙের ফোয়ারা যেন উৎসারিত হয়েছে।

একটি ক্ষুদ্র শাখানদীর কূলে গত সন্ধ্যায় তাদের পটাবাসটি টাঙানো হয়েছিল। সেই নদীর তীরে এসে একটি প্রশস্ত শিলাখণ্ডের ওপর বসল কুমারায়ণ। দৃষ্টি রইল তার পূর্বদিকে পর্বতশিখরে। জীবা বলেছিল ঐ পর্বতমালা কিউনলুন।

আলোর উৎসে স্নান সমাপ্ত করে সদ্য যেন কেউ উঠে এলো। শিখরের আড়ালে হঠাৎ যেন সে থমকে দাঁড়িয়েছে। পরক্ষণেই উজ্জ্বল সুন্দর একটি মুখ উঁকি দিল।

চাঁদ পাহাড়ের আড়াল থেকে উঠে আসছে ওপরে। যেন সে নিশীথ স্নান শেষ করে আলোর সূক্ষ্ম বস্ত্রে দেহ আবৃত করে অভিসারে বেরিয়েছে।

কুমারায়ণের বাঁশি বেজে উঠল। সুরের মোহিনীমায়ায় আবিষ্ট হল চরাচর। সে যেন কোন আলোকতনু কন্যাকে বাঁশির সুরে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে, আর সেই কন্যা আসছে বহু যুগের, বহু জন্ম-জন্মান্তরের ওপার থেকে।

ততক্ষণে পটাবাসের অভ্যন্তরে জীবার কানেও গিয়ে পৌঁছেছে সে বাঁশির সুর। সে আশ্চর্য হয়ে উঠে বসল শয্যায়। পটাবাসের ভেতর তখন এসে পড়েছে চাঁদের এক টুকরো আলো। জীবা দেখল কুমারায়ণ তার শয্যায় নেই, নিঃশব্দে কখন উঠে গেছে।

জীবার বিস্ময় বাড়ল। তাহলে কি কুমারায়ণই সুব সাধছে বাঁশিতে ! এত দক্ষ সঙ্গীতসাধক সে! কুচীরাজ্য সঙ্গীত-কলার চর্চায় বহুখ্যাত। শূলিদেশের রাজা একবার একটি সঙ্গীত সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। সেখানে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন কুচী, সুগ্দ, কম্‌বুজ, অগ্নিদেশ, চীন প্রভৃতি দেশের বহু গুণী সুরসাধকেরা। সঙ্গীতের অনুষ্ঠান চলেছিল সপ্তদিবস ব্যাপী। যন্ত্র ও কণ্ঠসঙ্গীতের এক মহাসম্মেলন। সম্মেলন শেষে পণ্ডিতদের বিচারে কুচীর শিল্পীরাই পেয়েছিল শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা।

কুচীর গৃহে গৃহে প্রতিদিন চলে সঙ্গীতের অনুশীলন। বর্ষাকালে যখন বৃষ্টিপাত শুরু হয় তখন শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা চলে যান সন্নিহিত পর্বতের পাশে। নানা ধরনের জলপ্রপাত থেকে জল গড়িয়ে পড়ে বিচিত্র সুরধ্বনির সৃষ্টি করে। সঙ্গীতজ্ঞেরা সেইসব শব্দকে নিপুণভাবে সঙ্গীতে রূপান্তরিত করেন।

নৃত্য ও গীতে নিজেই পটিয়সী জীবা। কিন্তু আজ রাতে বাঁশির সুর তাকে সত্যিই বিচলিত করল। এমন সুরের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করতে সে তার বিংশতি বর্ষের জীবনে কাউকেই দেখেনি।

পটাবাস ছেড়ে শুভ্র পশমের একটি উত্তরীয়ে অঙ্গ আবৃত করে সে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল নদীর ধারে।

তখন ঐ চাঁদের দিকে তাকিয়ে তন্ময় হয়ে বাঁশি বাজাচ্ছিল কুমারায়ণ। জীবা ধীরে ধীরে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল, নতজানু হয়ে বসল, তবু ধ্যান ভাঙল না সুরসাধকের। সে বাঁশিতে এতক্ষণ যাকে আকুল হয়ে ডাকছে সে কি এলো তার সুরের পথ ধরে।

বাঁশি এক সময় সমে এসে থামল।

তুমি! সত্যিই আমি লজ্জিত জীবা, মাঝরাতে তোমার ঘুম ভাঙালাম। পথশ্রমে তুমি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলে।

আমার সমস্ত শ্রান্তি তুমি ঐ বাঁশি শুনিয়ে হরণ করে নিয়েছ কুমার। আমি জানতাম না এতবড় একজন শিল্পী তোমার ভেতর লুকিয়ে আছে।

তুমি যে সঙ্গীতের এতবড় বোদ্ধা তাও আমার জানা ছিল না জীবা।

আমার দেশ কুচীতে সঙ্গীতের বড় সমাদর। সেখানকার শিল্পীরা তোমাকে কাছে পেলে নিদ্রা ভুলে যাবে। শুধু তোমার বাঁশি শুনবে।

তোমার যে ভাল লেগেছে এতেই আমি খুশী জীবা।

আচ্ছা কুমার তুমি এমন অপূর্ব সঙ্গীত কোথা থেকে শিখলে?

আমি তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম জীবা। সেখানে সকল শাস্ত্র শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে।

জীবা সোচ্ছ্বাসে বলল, তক্ষশীলার নাম কুচী দেশের অধিবাসীর কাছে অপরিচিত নয়।

কুমারায়ণ বলল, ভেষজ বিজ্ঞান, চিকিৎসা শাস্ত্র, রাজনীতি, সাহিত্য, দর্শন, কলাবিজ্ঞান, গান্ধর্ববিদ্যা, ধনুর্বেদ প্রভৃতি শেখাবার ব্যবস্থা আছে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে। এককালে অস্ত্রবিদ্যা বিশারদ আত্রেয় তক্ষশীলার অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর শিষ্য ছিলেন ভেষজবিদ্ জীবক।

নিজের বিদ্যাপীঠের কথা বলতে গিয়ে কুমারায়ণ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

শোন জীবা, ভেষজবিদ্ জীবকের শিক্ষাকালের একটি ঘটনা। গুরু আত্রেয় শিষ্যদের বিদ্যা পরীক্ষার জন্য বললেন, ঐ যে সামনে পাহাড় দেখছ, ওখানে গিয়ে তোমরা গাছগাছড়া পরীক্ষা কর। যেগুলি ঔষধ তৈরির ব্যাপারে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হবে কেবলমাত্র সেইগুলিই আমার কাছে আনবে। প্রয়োজনীয় গাছ একটিও তুলবে না।

সারাদিন অপ্রয়োজনীয় গাছগুলি সংগ্রহ করে ফিরে এলো শিষ্যেরা গুরুর কাছে। আত্রেয় দেখলেন কেবলমাত্র জীবকই শূন্য হাতে ফিরে এসেছে।

আত্রেয় বললেন, কি ব্যাপার জীবক, পর্বতসংলগ্ন এতবড় অরণ্যে তুমি কি একটিও অপ্রয়োজনীয় বৃক্ষ, লতা, গুল্ম পেলে না?

জীবক উত্তর দিল, না গুরুদেব। প্রতিটি বৃক্ষ পরীক্ষা করার পর আমার মনে হয়েছে, সবগুলিই ভেষজ গুণসম্পন্ন।

জীবা বলল, আশ্চর্য গুরুর ক্ষণজন্মা শিষ্য এই জীবক। তুমি তক্ষশীলায় কি কি বিষয়ে শিক্ষালাভ করেছ কুমার? এ আমার নিছক কৌতূহল জানবে।

বিশেষভাবে ললিতকলা, গান্ধর্ববিদ্যা ও ধনুর্বেদ।

আশ্চর্য! কেবল বাঁশি নয়, শর-সন্ধানেও তোমার নৈপুণ্য আছে!

কুমারায়ণ বলল, ধনুর্বিদ্যায় ও ললিতকলায় পারদর্শিতার জন্য আমি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পুরস্কারও লাভ করেছি।

উৎসুক হয়ে উঠল জীবা, কি সে পুরস্কার কুমার?

একটি মূল্যবান অসি, একটি উষ্ণীষ আর তীরপূর্ণ তূণীরসহ ধনু।

সেই পুরস্কারগুলি এখনও কি তোমার গৃহে আছে?

সেগুলি আমার সঙ্গেই থাকে জীবা। পটাবাসের মধ্যে আমার যে চর্ম পেটিকাটি আছে তারই ভেতর সেগুলি সযত্নে রেখে দিয়েছি।

জীবা বলল, তুমি শুধু শাস্ত্রবিদ নও সুনিপুণ শস্ত্রবিদও বটে। কিন্তু সবার ওপরে তোমার সঙ্গীত প্রতিভা আমাকে মুগ্ধ করেছে।

নীরবে কিছুক্ষণ বসে রইল কুমারায়ণ। একটা সুখ-দুঃখময় স্মৃতির অতলে সে সেই মুহূর্তে তলিয়ে গেল।

তার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে জীবা এক সময় প্রশ্ন করল, কি ভাবছ কুমার? ফেলে আসা সংসারের কথা।

আমি সংসারী নই জীবা। পিতামাতা গত হয়েছেন কৈশোরে। আমার পিতা ছিলেন এক ক্ষুদ্র রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ও পুরোহিত। তাঁর মৃত্যুর পরে আমি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের ষড়যন্ত্রে রাজার অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হই। সেই বঞ্চনাই আমাকে নিজের পায়ে দাঁড়াবার শক্তি যোগায়। আমি ষোড়শ বর্ষে তক্ষশীলায় যাই। সেখানে পঞ্চবর্ষকাল বিদ্যা শিক্ষা করে যখন বেরিয়ে আসি তখন এ জগতে আমি নিঃসঙ্গ। পথই তখন থেকে আমার গৃহ। তক্ষশীলা থেকে পাটলিপুত্র পর্যন্ত যে রাজপথটি চলে গেছে আমি সেই পথ ধরে এগোতে থাকি। উদ্দেশ্য, রাজগৃহের সন্নিকটে নালন্দার মূল্যবান গ্রন্থর সংগ্রহশালাটি দেখা।

এই পথযাত্রার প্রায় প্রারম্ভেই সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ। আর এই পরিচয়ের সূত্র ধরেই আমার জীবনে নেমে এল এক ঘূর্ণাবর্ত।

হঠাৎ কথার মাঝে থেমে গেল কুমারায়ণ।

জীবা সাগ্রহে বলল, থামলে কেন কুমার? তোমার জীবনের প্রতিটি কথা শোনার জন্য আমি উৎকর্ণ হয়ে আছি জানবে।

সে এক বেদনাময় ইতিবৃত্ত জীবা। বলতে পার সেই যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তিলাভের জন্যই আমি ভারতভূমি ত্যাগ করে এতদূরে এসে পড়েছি।

আবার থামল কুমারায়ণ। দূরের পর্বতমালার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বসে রইল।

থামলে কেন কুমার? যদি কোন দুঃখবেদনা থাকে তোমার জীবনে তাহলে সে বেদনার অংশ তোমার দু'দিনের সঙ্গীকেও ভাগ করে দাও।

হাসল কুমারায়ণ। বিচিত্র জীবন, বিচিত্র তার লীলা-কাহিনী। হ্যাঁ, আমাদের দুজনের সঙ্গে সেদিনের যাত্রারও কিছু মিল খুঁজে পাওয়া যাবে।

সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারটিও আমার বেশ অভিনব।

।। দুই ।।

চলেছি তক্ষশীলা থেকে পাটলিপুত্রের রাজপথ ধরে। পথে পড়ল এমনি এক ক্ষুদ্র নদী। ক্ষুদ্র হলেও বড় সংক্ষুব্ধ সে নদী। তীরে নিবিড় বন। সারাদিন পথ চলায় ক্লান্ত ছিলাম, প্রায় অভুক্ত, বিশ্রামের প্রয়োজন। এই সুদীর্ঘ পথের ধারে ধারে পানীয় জলের কূপ ও বিশ্রাম গৃহ ছিল, কিন্তু তরুণ প্রাণের উন্মাদনাই আলাদা। যতদূর পারি পথ অতিক্রম করে যাব। নদীনালা ডিঙিয়েও বক্র পথকে সোজা করে নেব। সেই প্রেরণাতেই পথ ছেড়ে নেমে এসেছিলাম নদীর ধারে। সন্ধ্যায় নদী পার হবার চেষ্টা পরিত্যাগ করতে হল। এখন কোথায় রাতের আস্তানা পাতা যায়!

একটি বৃহৎ বটবৃক্ষ দেখে তারই ওপর আরোহণ করলাম। ওরই একটি ডালের এক সুবিধাজনক কোণে রাতের মত আশ্রয় রচনা করে নিলাম।

সন্ধ্যা নামল। কিন্তু অন্ধকার ঘনিয়ে ওঠার সুযোগ পেল না। কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদের চাঁদ প্রায় পূর্ণ একখানা থালার মত বনভূমির বৃক্ষশীর্ষে জেগে উঠল। ক্রমে ক্রমে উজ্জ্বলতর হতে লাগল জ্যোৎস্না। নীচে স্রোতস্বিনীর তরঙ্গে তখন রূপোর কুচি ছড়াচ্ছে চাঁদের আলো।

দেহের ক্লান্তি এই রমণীয় অরণ্য-সন্ধ্যায় আমাকে পরাভূত করতে পারল না। ঠিক আজ রাতের মত আমি সেদিনও বাঁশিটি বের করে চাঁদের দিকে তাকিয়ে ফুঁ দিতে গেলাম। কিন্তু ফুঁ দেওয়া আর হল না।

চাঁদের আলোয় তখন চরাচর ভেসে যাচ্ছিল। বৃক্ষরাজির আড়াল থেকে দেখলাম, অরণ্য সংলগ্ন প্রান্তরে শত শত শিবির পড়েছে। কোলাহল নেই, আলোও প্রজ্জ্বলিত হয়নি।

স্বাভাবিক ধারণাবশে ভেবে নিলাম এ কোন সংগুপ্ত সৈন্য নিবাস।

একদিকে সবুজপত্রে সমাচ্ছন্ন কতকগুলি বৃক্ষের অন্তরালে পাশাপাশি দুটি পটাবাস। বর্ণে সজ্জায় অতি

সুশোভিত। একটি ক্ষুদ্র, অন্যটি বৃহৎ। বৃহদাকার পটাবাসটি রক্তবর্ণের বস্ত্রখণ্ডে প্রস্তুত। হরিদ্রাবর্ণের কেতন উড়ছে শীর্ষে। ক্ষুদ্রটি নব কদলীপত্রের আভাযুক্ত বস্ত্রখণ্ডে নির্মিত। এটির শীর্ষে কোন ধ্বজা ছিল না। দুটি পটাবাসই আমার আশ্রয়-বৃক্ষের সন্নিকটে। কিন্তু ঘন পত্রাচ্ছাদিত বৃক্ষের অন্তরালে থাকায় পটাবাস দুটি সম্পূর্ণ দৃষ্টিগোচর ছিল না।

হঠাৎ শিবিরের দিক থেকে একটি অতি সুশোভিত হাতলযুক্ত সিংহাসন চারজন বাহক বয়ে নিয়ে এলো বৃহদাকার পটাবাসটির সামনে। এক কান্তিমান পুরুষ, তাঁকে পুরুষ-সিংহই বলা চলে, ধীর পায়ে বেরিয়ে এসে বসলেন সেই সিংহাসনে। বাহকেরা সেই সিংহাসনটি অরণ্যের মধ্য দিয়ে বয়ে এনে বসিয়ে দিল নদীতীরে। আমি এখন স্পষ্ট তাদের দেখতে পাচ্ছিলাম। বাহকেরা সিংহাসনটি বসিয়ে রেখেই চলে গেল। ধীরে ধীরে অরণ্যের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো এক যুবতী নারী। ঠিক যেন শ্রেষ্ঠ ভাস্করের হাতে গড়া কোন প্রতিমা। যুবতীর হাতে তালপত্রের সুদৃশ্য একটি ব্যজনী। সে সলজ্জ অথচ সুস্থির পদক্ষেপে এসে দাঁড়াল সেই পুরুষ-প্রধানের পশ্চাতে। অলঙ্কার শোভিত দক্ষিণ বাহুটি উত্তোলন করে অপরূপ আন্দোলনে ব্যজন করতে লাগল।

আমার আশ্রয়স্থল থেকে নাতিদূরেই ঘটনাটি ঘটছিল।

আমি এতক্ষণ লক্ষ করিনি, সেই পুরুষ তাঁর অঙ্কে কোনো একটি বস্তু বহন করে এনেছিলেন। সেই বস্তুটি উত্তোলন করতেই বুঝলাম, সেটি একটি বীণা।

তারপর শুরু হল বাদন। সেই শেফালিকা পুষ্পের মত শুভ্র জ্যোৎস্না, কলধ্বনিমুখর স্রোতপ্রবাহ, অরণ্যের পত্রকরতাল যুক্ত হল সেই বীণার ধ্বনির সঙ্গে।

আমি তন্ময় হয়ে শুনতে লাগলাম সেই অপার্থিব বীণার সুর।

শুনতে শুনতে গভীর অনুপ্রেরণার বশে কখন যে ওষ্ঠে তুলে নিলাম বাঁশিটি, তা নিজেই বুঝে উঠতে পারিনি।

ঐ বীণার ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে আমার বাঁশিও সুর মেলাল। আমি বৃক্ষের ওপরে বসে বাঁশি বাজাচ্ছিলাম, তাই আমার বাঁশির সুর বাতাসে ভর করে ছড়িয়ে পড়ছিল চতুর্দিকে।

সহসা বীণা থেমে গেল কিন্তু আমার বাঁশি থামল না। পূর্ণ শিক্ষা প্রয়োগ করে আমি যখন সম্পূর্ণ রাগটিকে রূপায়িত করে থামলাম তখন চেয়ে দেখি সেই সম্ভ্রান্ত বীণকার উঠে দাঁড়িয়েছেন। বংশীবাদককে দেখতে না পেয়ে চারদিকে তিনি মস্তক আন্দোলন করতে লাগলেন। আমি তখন নিশ্চুপ হয়ে বৃক্ষপত্রের অন্তরালে বসে আছি। দেখলাম, সেই সেবিকা কন্যাটিও বিহ্বল দৃষ্টিতে বনের দিকে চেয়ে আছে। তার করধৃত ব্যজনীটি থেমে গেছে।

পুরুষ তখন উচ্চকণ্ঠে বললেন, যদি তুমি কোন গন্ধর্ব, সিদ্দ অথবা দেবদূত হও তাহলে নেমে এস আমার সামনে। আমি তোমাকে বন্দনা করি।

বৃক্ষের ওপর থেকে আমিও বললাম, যেমন দীপ থেকে দীপ প্রজ্জ্বলিত হয়, হে মহাত্মন্, আমি আপনার বীণার রাগিণী থেকেই আমার সুরের দীপটিকে জ্বালিয়ে নিয়েছি।

তুমি যেই হও আমার সামনে এসে দাঁড়াও। সবকিছু আমার কাছে জ্যোৎস্না ধৌত অরণ্যের মত অলৌকিক বলে মনে হচ্ছে।

আমি সেই পুরুষপ্রবরের কাব্যগুণসমৃদ্ধ বাক্য শুনে অনুপ্রাণিত হচ্ছিলাম। দূর থেকে তাঁর অবয়ব আমার চোখে মহিমময় সম্রাটের মত মনে হচ্ছিল।

আমি চর্ম পেটিকা থেকে ধনু আর শর বের করে নিলাম। শরটি ধনুতে সংযোজন করে সবেগে নিক্ষেপ করলাম। তীরটি আমার অভিপ্রায় অনুযায়ী ঐ পুরুষোত্তমের পদতলের সম্মুখভাগে প্রোথিত হয়ে গেল।

তিনি প্রথমে বিচলিত হলেন, পরে উচ্চকণ্ঠে বাহবা দিয়ে উঠলেন।

আমি গাছ থেকে নেমে সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

কে তুমি?

আমি ভ্রাম্যমান এক যুবক। কুমারায়ণ আমার নাম।

নিবাস?

গান্ধার দেশে জন্ম। বর্তমানে পথই আমার বাসস্থান মহাত্মন।

তোমার আকৃতি দেখলে উচ্চ কুলোদ্ভব বলে মনে হয়।

আমি কোনো উত্তর না দিয়ে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

আমাকে বাক্যহীন দেখে এবার সেই পুরুষপ্রবর বললেন, আমি বিস্মিত হয়েছি তোমার সঙ্গীত প্রতিভায়, তার চেয়ে কম বিস্মিত হইনি তোমার শর নিক্ষেপের নৈপুণ্য দেখে। এসব তুমি কোথায় শিখলে যুবক ?

তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

আমার উত্তর শোনামাত্র সসম্ভ্রমে উক্তি বেরিয়ে এলো তাঁর কণ্ঠ দিয়ে, ভুবনবিদিত শিক্ষাকেন্দ্র। বৈয়াকরণ পাণিনী, পতঞ্জলি, রাজনীতি বিশারদ চাণক্য, শরীর বিজ্ঞানী আত্রেয়, জীবক, সর্বজ্ঞ অশ্বঘোষ -- এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই রত্নস্বরূপ ছিলেন। তুমি সেই ঐতিহ্যময় বিশ্ববিদ্যালয়েরই সার্থক শিক্ষার্থী।

ক্ষণকাল থেমে তিনি আবার বললেন, কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে পথে বেরিয়েছ কি ?

নালন্দা গ্রন্থাগারটি দেখার ইচ্ছা আমার বহুদিনের। শুনেছি গ্রন্থাগারটি বহু মূল্যবান গ্রন্থে সমৃদ্ধ।

তোমার ইচ্ছা অপূর্ণ থাকবে না যুবক। সত্যিই শুনেছ তুমি গ্রন্থাগারটির উচ্চ মানের কথা। তিনটি সুবিশাল গৃহে বহু সহস্র পুঁথি রক্ষিত আছে। একটি অট্টালিকার নাম রত্নোদধি। অন্যদুটি রত্নসাগর ও রত্নরঞ্জক। শুধু রত্নোদধিই নবতল বিশিষ্ট একখানি উচ্চগৃহ। তাহলে অনুমান কর পুঁথি সংগ্রহশালাটি কত বৃহৎ।

বললাম, আমার অপরাধ নেবেন না মহাত্মন, আপনি কি ঐ অঞ্চল নিবাসী।

যুবতীর কণ্ঠ থেকে সহসা একটি বিস্ময়সূচক ধ্বনি নির্গত হয়েই থেমে গেল।

পুরুষপ্রবর বললেন, তোমার অনুমান সত্য। এখন শোন যুবক, আমি বর্তমানে অশ্বমেধের অশ্ব নিয়ে ভারত ভ্রমণ করছি। সম্প্রতি মালব থেকে এসেছি পঞ্চনদের দেশে। যুদ্ধ আমার অভিপ্রেত নয়। মগধের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন করে বন্ধুভাবাপন্ন হলেই আমি তাকে মিত্ররাষ্ট্র হিসেবে স্বীকার করে নিচ্ছি।

যতদূর সম্ভব নত হয়ে অভিবাদন জানিয়ে বললাম, আমি কি সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের সঙ্গে বাক্যালাপের সৌভাগ্য এতক্ষণ লাভ করেছি?

আমি ভারতবর্ষের সর্বত্র ঐ নামেই পরিচিত যুবক।

বললাম, শুনেছিলাম আপনি বীর, কিন্তু এখন দেখছি শ্রেষ্ঠ এক সঙ্গীত বিশারদ।

সম্রাট আমার হাত ধরলেন, তোমার আপত্তি না থাকলে তুমি আমার সঙ্গী হয়ে থাকবে যুবক। আমি শীঘ্র রাজ্য অভিমুখে ফিরে যাব। তখন সহজেই তুমি নালন্দা দর্শন করতে পারবে।

আমি কয়েক দিনের মধ্যেই সম্রাটের অত্যন্ত প্রিয় পাত্র হয়ে উঠলাম। তিনি স্কন্ধাবারে আমাকে না রেখে তাঁর নিজের শিবিরের একান্তে আমার থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন।

প্রতিদিন সম্রাট আমার শরক্ষেপন আর অসি চালনার কৌশল লক্ষ করতেন। তিনি স্বয়ং ছিলেন শক্তিমান যোদ্ধা। আমার সঙ্গে অসিযুদ্ধে অবতীর্ণ হতেন। কোনদিন আমি জয়ী, কোনদিন বা সম্রাট বিজয়ী হতেন। কিন্তু তীরের নিশানায় কেবল সম্রাটই নন, তাঁর বিপুল সৈন্যবাহিনীর একজনও আমার সমকক্ষ ছিল না।

রাতে একান্তে সম্রাটের শিবিরে আমরা মুখোমুখি বসতাম। তিনি আমাকে সীমান্ত নগরী গান্ধার, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক ও কুষাণদের রাজ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করতেন। আমি আমার জ্ঞানবুদ্ধি মত তাঁর জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়ে

যেতাম।

কোন কোনদিন কাব্যালোচনা হত। কোথা দিয়ে যে মধ্যরাত্রি পার হয়ে যেত তা আমরা বুঝতে পারতাম না।

সম্রাট যৌধেয় থেকে মদ্রকে তাঁর অভিযান পরিচালনার বাসনা প্রকাশ করলেন। গুপ্তচরেরা খবর নিয়ে এল, মদ্রকের রাজা পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে সঙঘবদ্ধ করে সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের বিরুদ্ধে শক্তিশালী এক প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করছে।

সম্রাট কালবিলম্ব না করে স্কন্ধাবার থেকে কালজ্ঞ জ্যোতির্বেৎ'কে ডেকে পাঠালেন। তিনি সম্রাটের সামনে গণনা করে যুদ্ধযাত্রার সঠিক কাল নির্ণয় করে দিলেন।

জ্যোতির্বেত্তা বললেন, সম্রাট, গণনার ব্যাপারে আপনার সঙ্গে একান্তে আরও কিছু কথা বলার আছে।

সম্রাট সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ইঙ্গিত করতেই আমি পটাবাসের বাইরে চলে এলাম। কিন্তু আমার মনে হল কালজ্ঞ আমার সম্বন্ধেই সম্রাটের কাছে কিছু বলতে চান। কারণ কিছুকাল থেকে লক্ষ করছিলাম, সেনাপতি আমার প্রতি বিমুখ। হয়তো অল্পকালের মধ্যে রাজার এতখানি প্রিয়পাত্র হবার জন্য তিনি ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়েছেন। আর জ্যোতির্বেত্তা মহাশয়যে সেনাপতির একান্ত ঘনিষ্ঠ জন তা আমি নানা অনুষ্ঠানে লক্ষ করেছিলাম।

শেষে আমার অনুমানই সত্য হল। জ্যোতির্বেত্তার কথাগুলি আমার কানে ভেসে এল, সম্রাট, এই অভিযানে কোন বিদেশি আপনার সঙ্গে থাকলে জয় সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা দেখা দিতে পারে। তাছাড়া প্রাসাদের অভ্যন্তরে নারী রত্ন হলেও অভিযানের পথে অবশ্যই পরিত্যজ্য। আপনি দূরদর্শী, বিচক্ষণ পুরুষ, এ সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের অধিকার আপনার।

এই কটি কথা বলে জ্যোতির্বেত্তা স্কন্ধাবারে ফিরে গেলেন।

সম্রাট আমার প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ ছিলেন। তবুও তিনি জ্যোতির্বেত্তার কথা ফেলতে পারলেন না। প্রভাতে আমাকে তাঁর কাছে ডেকে বললেন, কুমার, তোমার ওপরে আমি একটি ভার অর্পণ করতে চাই।

সবিনয়ে বললাম, বলুন সম্রাট, সে তো আমার সৌভাগ্য।

আমি না বুঝেই কথাটা বললাম।

সম্রাট বললেন, তোমাকে যোগ্য বিবেচনা করেই এ ভার দিতে চাইছি। এখন শোন, অর্জুনায়ণের অভিযান থেকে যেসব উপঢৌকন আমি পেয়েছিলাম তার মধ্যে সবচেয়ে সেরা উপহার রাজকন্যা বেতসা। তুমি তাকে দেখেছ। সে আমার উপস্থাপিকার কাজে নিযুক্ত। বুদ্ধিতে দীপ্তি, স্বভাবে মিষ্টতা, কর্তব্যে নিষ্ঠা বেতসার সহজাত।

একটু থেমে সম্রাট বললেন, আমি মদ্রকে আমার বাহিনী নিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু আমি চাইনা বেতসা আমার সঙ্গী হোক। তাই তাকে আমি রাজধানী পাটলিপুত্রে পাঠাতে চাই। তুমি সম্রান্ত, বিশ্বস্ত ও শক্তিমান। আমি তোমাকে বেতসার সঙ্গে তার নিরাপত্তার ভার দিয়ে পাঠাতে মনস্থ করেছি। এখন তোমার অভিমতের ওপর সবকিছু নির্ভর করছে।

বললাম, আপনার ইচ্ছাই আমার কাছে আদেশ সম্রাট।

সঙ্গে সঙ্গে রাজচক্রবর্তী বললেন, অবশ্য থলনিয়ামক(পথপ্রদর্শক) থাকবে তোমার সঙ্গে। একখানি অশ্ববাহিত রথ আর উপযুক্ত রক্ষীও থাকবে তোমার অধীনে।

সবিনয়ে বললাম, সবকিছুই থাকবে, কেবল রক্ষীদের সঙ্গে না দিলে ভাল হয়। আমার ওপর যদি সম্রাটের ভরসা থাকে, তাহলে অন্য কোন রক্ষীর প্রয়োজন আশা করি হবে না।

সম্রাট হেসে বললেন, তথাস্তু।

বেতসার সঙ্গে শুরু হল পথচলা। রথের চালকই ছিল আমাদের থল (স্থল) নিয়ামক। আমি একটি অশ্বে আরোহণ করে বেতসার রথের সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলাম। আমাদের ইচ্ছা হলে রাতেও চলতাম। এ সময়

রথচালক আকাশে নক্ষত্র দেখে দিগ্‌ নির্ণয় করত। তার হিসেব থেকে জানতে পারি আমাদের প্রায় নব্বুই যোজন পথ অতিক্রম করতে হবে। সে রথ চালিয়ে নিয়ে যাবে মথুরা, কৌশাম্বী, শ্রাবস্তী, বৈশালী হয়ে পাটলিপুত্রে।

এ পথটি অতি সুরক্ষিত। এই পথে সার্থবাহ ও সাধারণ বণিকেরা দলে দলে যাতায়াত করে। সার্থবাহরা বলীবর্দ বাহিত দ্বিচক্রযানে পণ্যসম্ভার নিয়ে চলাচল করে। একসঙ্গে প্রায় পাঁচশত গো-শকটকে আমরা দলবদ্ধ ভাবে যেতে দেখলাম। তাদের কাছে তীরধনু ও অন্যান্য অস্ত্র-শস্ত্র ছিল। দস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হলে যাতে প্রতিরোধ করতে পারে তাই এ ব্যবস্থা। পথের স্থানে স্থানে দূরত্ব জ্ঞাপক প্রস্তর ফলক প্রোথিত দেখেছিলাম।

আমাদের রথের কেতনের প্রতীক ছিল অশ্ব। অশ্বমেধ যজ্ঞ করে একরাট হবেন সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত, তাই তাঁর ধ্বজায় অশ্ব-লাঞ্ছন।

সার্থবাহের দলটি আসছিল তাম্রলিপ্ত থেকে। তারা সম্রাটের ধ্বজাচিহ্ন রথের ওপর উড্ডীন দেখে শকট থামিয়ে নেমে এল। উপযুক্ত অভিবাদন জানাল আমাদের। তারা বেতসাকে সম্মানিত করল নারিকেল, গুবাক, সূক্ষ্ম বস্ত্র ও শঙ্খমালা দিয়ে।

প্রশ্ন করে জানতে পারলাম, এরা যাচ্ছে সিন্ধু-সৌবীর দেশে (সিন্ধু ও বিতস্তা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল)। ওখানকার বণিক সঙেঘর হাতে পৌঁছে দেবে পূর্বাঞ্চলের সদাগরী-সম্ভার। তারা সে সকল নিয়ে যাবে বর্হিভারতে।

ঘন ঘন মনুষ্য চলাচল, শকটাদির গমনাগমনের জন্য পথিপার্শ্বস্থ অরণ্য থেকে কোন হিংস্র জন্তু পথের ওপর মানুষকে আক্রমণ করতে নেমে আসত না। আমরা প্রায় নির্ভয়ে শুক্লপক্ষের রাতে দ্বিতীয় যাম পর্যন্ত পথ চলতাম।

প্রৌঢ় রথচালক গব্বারাম আমাদের খুব প্রিয় ছিল। লোকটির ছেলে বউ দুজনেই মারা গিয়েছিল। ছেলেটি বেঁচে থাকলে নাকি আমার বয়সী হত, তাই আমার ওপর গব্বার গভীর অপত্য স্নেহ জন্মে গিয়েছিল।

ঘোড়া না চালিয়ে আমি যাতে রথে চড়ে বসি সেজন্যে গব্বরাম পীড়াপীড়ি করত। আমি তাকে আশ্বস্ত করে বলতাম, দরকার হলে আমি নিশ্চয়ই রথে উঠব।

বেশ রসিক ছিল গব্বারাম। সে গ্রাম-গেয় গীত গাইত। শাশুড়ী আর বধূর কলহের কথা থাকত তার ভেতর। গান থামিয়ে সে বলত, ভাগ্যিস বউটা মরেছিল নাহলে ছেলের বউ-এর সঙ্গে খুনসুটি লেগে যেত। আর ছেলেটা মরল অকালে তাই পরের ঘরের মেয়েটাকে আর আনতে হল না।

কখনো বলত, রাজার বাড়ির ঘোড়া সামনে হাঁটে পেছনে হটে।

বলতাম, এর অর্থ কি গব্বারাম?

বলত, রাজা যখন শত্রুকে তাড়া করে নিয়ে যায় তখন ঘোড়া সামনে ছোটে, আর যুদ্ধে যখন হার হয় তখন ঘোড়া পেছনে হটে।

কখনো বলত, বউ আমার মরে বেঁচেছে, আর চোর হোঁচট খেয়ে মরেছে।

কিরকম।

ঘুমিয়ে পড়লে হঠাৎ হঠাৎ আমরা নাকটা গর্জে উঠত। অমনি বউ জেগে উঠে নাকের ফুটোয় গর্জন তেল ঢেলে দিত। আর যায় কোথা, ব্রহ্মরন্ধ্র ফাটিয়ে হাঁচি পড়ত। তারপর সব চুপচাপ। সে আর কতক্ষণ, আবার গর্জন, আবার গৃহিণীর নিদ্রাভঙ্গ। বেচারা এমনি করতে করতে বেহাল হয়ে গেল। শেষে মরে বাঁচল।

গব্বারাম থামলে আমি বললাম, চোর মরল কি করে?

চোর সিঁড়ির মাথায় উঠে এসে দরজা খোলার তাল করছিল। অমনি হাঁকার ছেড়ে নাকের গর্জন। ব্যস, বাঘ ডাকছে ভেবে ছিটকে পড়ল সিঁড়ির তলায়। নীচে ছিল পাথর, মরল মাথা ঠুকে।

গব্বারামের রসকৌতুকের ভেতর দিয়ে আমরা বড় আরামে পথ চলেছিলাম। গব্বার ওপরে খাবার তৈরির ভারও দেওয়া ছিল, কিন্তু বেতসা ওকে কিছুতেই রান্না করতে দিত না। সে নিজের হাতে খাবার তৈরি করে আমাদের খাওয়াত।

গব্বা ঘুমুলে হাজার ডাকেও তার সাড়া পাওয়া যেত না। ঠেলাঠেলিতেও তাকে জাগিয়ে তোলা ভার হত। নাকের গর্জনে বাঘেরও কাছে পিঁঠে ভেড়ার সাহস হত না।

গব্বারাম ঘুমিয়ে পড়লে আমি আর বেতসা গল্প করতাম। অর্জুনায়ণের রাজার মেয়ে সে। শোভন, সুন্দর, মার্জিত ছিল তার ব্যবহার। কিন্তু যেহেতু সে যুবতী, প্রথম বিকশিত ফুলের মত জেগে উঠেছে, সে চাইত তার সুবাসটুকু ছড়িয়ে দিতে। তারই ভেতর দিয়ে আমন্ত্রণ জানাত সে মধুকরকে। সে আমন্ত্রণে উগ্রতা ছিল না, ছিল সলজ্জ ভীরুতা।

আমি স্বভাবতই আমার তক্ষশীলার শিক্ষাজীবনের দিনগুলির কথা তাকে বলতাম। আর বলতাম আমার ভ্রাম্যমাণ জীবনের গল্প। আমি বেশ বুঝতে পারতাম, আমার কাহিনীগুলি তার মনের গভীরে রেখাপাত করছে। ধীরে ধীরে আমি তার ভেতর একটা পরিবর্তন লক্ষ করলাম। হঠাৎ আমার গল্প শুনতে শুনতে সে অন্যমনস্ক হয়ে যেত। আমি স্পষ্ট দেখতে পেতাম, তার চোখের আড়ালে জলভরা মেঘ থমথম করছে।

আমি তার ভাবান্তর লক্ষ করে আমার পথ বদলালাম। আমি তাকেই বেশী কথা বলতে দিতাম। আমি জানতাম, একজন মনের কথা অনর্গল বলে যেতে পারলে তার মনের ভার অনেকখানি হাল্কা হয়ে যায়।

কিন্তু এ ধারণা পরে আমাকে অস্বস্তির মাঝে ফেলে দিল। একদিন অনর্গল কথা বলতে বলতে সে তার গোপন মনের কথা প্রকাশ করে ফেলল। ভীরুতা কেটে গেল তার। স্পষ্ট করে না বললেও আমি বুঝলাম, সে সাম্রাজ্য, সম্রাট কিছুই চায় না, পথে পথে যাযাবরের জীবনযাপন করতে পারলে সে সুখী হয়।

আমি বললাম, বেতসা (ঐ নামেই তাকে তখন ডাকতে শুরু করেছি), তোমার জীবনের ধারা কিন্তু ঠিক খাতেই বইছে।

বেতসার গলায় বিস্ময়ের সুর, কিরকম?

বললাম, তুমি রাজার কন্যা, প্রাসাদের সম্ভ্রান্ত ও রক্ষণশীল পরিবেশে মানুষ। এদিকে ভারত সম্রাটের অন্তঃপুরে তুমি প্রবেশ করতে চলেছ। অতএব তোমার জীবনের ধারা অবিচ্ছিন্নই রইল।

ও শুধু একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে বলল, সে তুমি বুঝবে না কুমার।

এরপর আমার নীরব থাকার পালা, তবু বললাম, সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত শুধু শক্তিমানই নন হৃদয়বানও বটে। যিনি সঙ্গীতের সাধক তাঁর হৃদয় স্বভাবতই উদার হয়।

বেতসা ঐ প্রসঙ্গে ইতি টেনে দিয়ে বলল, তুমি তোমার বাঁশি বাজিয়ে শোনাবে কুমার?

আমি বুঝতে পারলাম, সম্রাট সংক্রান্ত কোন প্রসঙ্গ ও আর তুলতে চাইছে না।

আমি বাঁশি বাজালাম। ওর অনুরোধে বারে বারে।

একটি রাগ শেষ হয়ে গেলে ও কিছু মন্তব্য করল, আমি যেন এক জলচর হংসী, নদীর স্রোতে ভাসতে ভাসতে কতদূর চলে গেছি। আবার এক সময় গলায় হতাশার সুর তুলে বলল, আমাদের সোনার পিঞ্জরে একটি শুক পাখি বাঁধা ছিল। তাকে অনেক বুলি শেখান হয়েছিল। ভাল ভাল খাবারও দেওয়া হত। কিন্তু এ ব্যবস্থাটা আমার ভাল লাগল না। আমি একদিন তাকে উড়িয়ে দিলাম। সে সবুজ বনের দিকে উড়ে যাবার জন্য পাখা ঝাপটাল, কিন্তু পারল না, পড়ল গিয়ে প্রান্তরে। আমি বাতায়ন থেকে দেখলাম, একটা হিংস্র মার্জার ছুটে এসে তাকে মুখে তুলে নিয়ে গেল। আমি হাহাকার করে উঠলাম।

থামল বেতসা। আমি বললাম, আমার বাঁশি শুনে তোমার এ ধরনের একটা কথা মনে পড়ল কেন বেতসা?

ও বলল, জানি না কেন। মনে হল, তাই বললাম।

ও উদাস চোখে তারাভরা রাত্রির দিকে চেয়ে রইল! আমি সেই ভাববিহ্বল রহস্যময়ী রমণীকে দেখতে

লাগলাম।

যাত্রাপথে একদিন একটি ঘটনা ঘটল। কৌশাম্বী পেরিয়ে তখন আমাদের রথ শ্রাবস্তীর রাস্তা ধরেছে। চলেছি আমরা উঁচু-নিচু পথের ওপর দিয়ে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছোট ছোট ঝোপঝাড়। স্থানে স্থানে দু'একটি বনস্পতি শাখাবাহু মেলে দাঁড়িয়ে আছে।

সন্ধ্যার সময় যথারীতি আমরা পথের ধারে রথ থামিয়ে রাত্রিবাসের আয়োজন করলাম। যে জায়গায় আমরা আস্তানা পাতলাম তার ধারে-কাছে কোন লোকজন ছিল না। সামনে একটি উঁচু ঢিবির মত স্থান ঢালু হয়ে নীচের দিকে নেমে গেছে। ঝোপঝাড়ে স্থানটি সমাচ্ছন্ন। মধ্যরাত্রি। পটাবাসের ভেতরে বেতসা নিদ্রামগ্ন। গব্বারাম দ্বারের কাছে শয্যা গ্রহণ করে প্রবলভাবে নাসিকা গর্জন করে চলেছে। আমি রথের ভেতর আশ্রয় নিয়েছি। তুমি হয়তো জান না জীবা, নিদ্রা আমার করায়ত্ত। মুহূর্তে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে যাই, পরমুহূর্তে জাগরণ। এ আমার আকৈশোর অভ্যেস। তারপর কি হল শোন।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতে নারী কণ্ঠের আর্ত চিৎকার কানে এসে বাজল। কোমরবন্ধে সারাক্ষণ একটা কোষবদ্ধ অসি রাখতাম আমি। লাফ দিয়ে রথ থেকে পথের ওপর পড়লাম। তারপর শব্দ লক্ষ করে উঠলাম ঢিবির ওপর। ক্ষীণ চন্দ্রালোকে অস্পষ্ট দেখাচ্ছিল সবকিছু। ঢিবির ওপর দাঁড়িয়ে নীচে চোখ পড়তেই দেখলাম, পত্রাচ্ছাদিত একটি বিশাল বৃক্ষের তলায় একটি নারীকে লাঞ্ছিত করছে এক ভীষণাকার দস্যু। আমি অসি কোষমুক্ত করে বিদ্যুৎ গতিতে নীচে নেমে গেলাম।

আমাকে দেখেই যেন ঐ দস্যু রণে ভঙ্গ দিল। আমি সেই পলাতকের পশ্চাদ্ধাবন করে কয়েক পদ অগ্রসর হয়েছি হঠাৎ ঢিবির ওপর থেকে বেতসার চিৎকার শুনতে পেলাম। চকিতে পেছন ফিরে তাকাতে গেলাম, কিন্তু ততক্ষণে একটি ছুরিকা আমার বাম বাহুতে বিদ্ধ হয়েছে। আমি যদি সেই মুহূর্তে বেতসার চিৎকার শুনে ফিরে না দাঁড়াতাম তাহলে নিশ্চিত ঐ ছুরিকা আমার পৃষ্ঠদেশ ভেদ করে আমাকে অব্যর্থ মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিত।

সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ হস্তের অসিতে আততায়ীকে আঘাত করলাম। আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি ঐ ধর্ষিতা নারী স্বয়ং দস্যুদলের নেত্রী। সে পশ্চাত থেকে যে আমাকে ছুরিকাঘাত করবে তা ছিল আমার ভাবনার বাইরে।

এখন পলাতক দস্যুটি আমাকে আক্রমণ করার জন্য উদ্যত। শুধু তাই নয়, ঐ বিশাল বৃক্ষটি থেকে ততক্ষণে আরও চার পাঁচটি দস্যু ভূমিতলে অবতীর্ণ হয়েছে। তারাও ঘিরে ফেলেছে আমাকে। ওদিকে বেতসা আমার বিপদ দেখে আর্ত চিৎকার করতে করতে নীচে নেমে আসছে।

আমি আমার অসি চালনার শিক্ষা কাজে লাগালাম। দস্যুগুলি নিহত হল আমার হাতে। ওদের হত্যা করার অভিপ্রায় ছিল না আমার। আমি ওদের অস্ত্র কেড়ে নিতে পারতাম, কিন্তু ওদের মুক্তি দিলে ওরা আবার বহু পথচারীকে হত্যা করবে, তাই তাদের চরম দণ্ড দানই যুক্তিযুক্ত মনে করলাম।

বেতসাকে নিয়ে ফিরে এলাম আমাদের আস্তানায়। তখন আমার বাম বাহু থেকে রক্ত ঝরে পড়ছিল। বেতসা তার পদমর্যাদা ভুলে আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। তখন গব্বারামের নাক ডাকছিল। আমি বেতসাকে বললাম, তুমিই আমার প্রাণ রক্ষা করেছ বেতসা।

বেতসা কোনো কথা না বলে দৌড়ে চলে গেল পটাবাসের মধ্যে। জল এনে ভাল করে ধুইয়ে দিল আমার হাত। নিজের দামী ওড়নাখানা টেনে নিয়ে বাঁধতে গেলে আমি বললাম, একটু অপেক্ষা কর বেতসা, আমি আসছি।

ঢিবির পাশেই রক্ত বন্ধ করার গুণসম্পন্ন লতাগুল্ম আমি দেখেছিলাম। তাই এনে পেষণ করে ক্ষতে প্রলেপ দিলাম। আমি বাধা দেওয়া সত্ত্বেও বেতসা তার ওড়না জড়িয়ে বেঁধে দিল আমার হাত।

এবার বেতসা ঠেলে ওঠাল গব্বারামকে। সব শুনে গব্বা বলল, এখানে আর নয়, এক্ষুনি রওনা হয়ে যেতে হবে। এবার আমার স্থান হল রথে। রাত্রে পটাবাসের মধ্যে বেতসার আশ্রয়েই থাকতাম। গব্বা এ ব্যবস্থায় ভীষণ খুশী।

আমি কদিন আঘাতের তাড়নায় জ্বর ভোগ করেছি। এই কটি দিন সেবায় যত্নে বেতসা আর গব্বা আমাকে ঋণী করে রেখেছিল। যখনই রাতে আমি জেগে উঠেছি তখনি আমার শিয়রে এক নারীকে জেগে বসে থাকতে দেখেছি। আমি রাত্রি জাগরণে নিষেধ করেছি বেতসাকে, অনুরোধ করেছি বিশ্রাম নেবার জন্য, কিন্তু আমার সমস্ত নিষেধ, অনুরোধকে সে চোখের জলে ভাসিয়ে দিয়েছে।

আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম, বেতসা মনে মনে কোনো এক অসম্ভবের কামনা করছিল। তার আচার আচরণ, সেবা যত্নের ভেতর এমন অতিরিক্ত এক ধরনের উত্তাপ ছিল যা আমাকে সচকিত করে তুলছিল।

দীর্ঘদিন একই রথে পাশাপাশি বসে পথ অতিক্রম করেছি আমরা. হৃদয় উজাড় করে গল্প করেছি, কথা বলে গেছি পরস্পর। আমার বাঁশির সুরে বেতসা কেঁদেছে। সামান্য কারণে আমার ওপর দুর্জয় অভিমানে নীরব থেকেছে কতক্ষণ। কিন্তু আমার যৌবনের রক্ত চঞ্চল হলেও আমার জাগ্রত বিবেককে কখনো তা প্লাবিত করেনি। আমার মনে হত, আমি বেতসার রক্ষীমাত্র। সম্রাট যে গুরু দায়িত্ব একান্ত বিশ্বাসে ও নির্ভরতায় আমার ওপর তুলে দিয়েছেন তা যথাযথ পালন করাই আমার কর্তব্য। যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, যে পরিবেশে আমি মানুষ হয়েছি সেখানে জীবনের প্রথম পাঠ ছিল সংযম। সর্ববিষয়ে নিজেকে সংযত না করলে একাগ্রতা লাভ সম্ভব নয়। চিত্ত একাগ্র হলেই যে কোনো বিষয়ে সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী।

আলাপে বেতসার সুনিপুণ চাতুর্য আমাকে মুগ্ধ করত। অর্জুনায়ণে প্রচলিত লোককথা সে এমন দক্ষতার সঙ্গে বলে যেত যে আমি চোখের ওপর সেই সব চরিত্রকে অভিনয় করতে দেখতাম।

বেতসার হাসি, বেতসার অপাঙ্গ দৃষ্টি, এমন কি বেতসার কান্নাও আমি গভীর ভাবে উপভোগ করতাম।

এই নিবিড় সান্নিধ্য একদিন ভেঙে গেল। আমাদের রথ পাটলিপুত্রের প্রাসাদের সামনে এসে দাঁড়াল। তখন আমি অশ্বারোহণে আর বেতসা রথের ভেতরে অবগুণ্ঠনবতী।

আমি জানতাম শেষের রাত্রিটি তার কেটেছে নিদ্রাহীন। শুধু নিদ্রাহীন নয়, নিরন্তর অশ্রুপাতে সিক্ত।

মন্ত্রিন্ (প্রধানমন্ত্রী), মহাদণ্ড নায়ক (প্রধান বিচারক), প্রাসাদে উপস্থিত ছিলেন। সম্রাটের পত্র তাঁদের হাতে তুলে দিলাম।

অন্তঃপুরের অভ্যন্তর থেকে শিবিকা এলো। রানী মহলের ক্রীতদাসীরা সেই শিবিকায় অবগুণ্ঠনবতী বেতসাকে বহন করে নিয়ে গেল অন্তঃপুরে। আমি জানতাম উৎসুক, সকরুণ দুটি চোখের দৃষ্টি শিবিকার অন্তরাল থেকে আমার ওপর আছড়ে পড়ছিল।

।। তিন ।।

বিজয়ী সম্রাট ফিরে এসে মহাসমারোহে অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করলেন। উপঢৌকন নিয়ে এলো সিংহলরাজ মেঘবর্ণের প্রতিনিধি। এলো উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে শক, কুষাণ নরপতিদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিবৃন্দ। পূর্বে — কামরূপ, ডবাক, সমতট। উত্তরে নেপাল, পশ্চিমে পাঞ্জাবের যৌধেয়, মদ্রক। আর রাজপুতনা, মালব থেকে এলো রাশি রাশি উপঢোকন। দক্ষিণের কোশলরাজ, মহাকান্তারের ব্যাঘ্ররাজ, কাঞ্চীর পল্লবরাজ, কেউ স্বয়ং উপস্থিত হলেন, কেউবা পাঠালেন প্রতিনিধি।

এই উপলক্ষে প্রচলিত হল নতুন সুবর্ণমুদ্রা। মহাযজ্ঞের স্মারক হিসেবে উৎকীর্ণ হল অশ্বমূর্তি।

সমবেত রাজন্যবর্গ ও রাজপ্রতিনিধিবৃন্দ যজ্ঞ শেষে সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের 'অশ্বমেধ-পরাক্রম' উপাধি নতমস্তকে স্বীকার করে নিলেন।

সভাকবি হরিষেণ সম্রাটের প্রশস্তি রচনায় নিযুক্ত হলেন।

সম্রাটের দিগ্বিজয় যাত্রা থেকে ফিরে আসার আগে আমি নালন্দায় বৌদ্ধগ্রন্থ পাঠ ও আলোচনায় যোগ দিয়েছিলাম। এ সম্বন্ধে আমার পূর্ব শিক্ষা অনেকখানি কাজে লেগেছিল। আমি হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের মৌলিক মিলন সূত্রগুলি নিয়ে একদিন সমবেত বিদ্যার্থী ও অধ্যাপকগণের সামনে আলোচনা করলাম। আচার্যদের সাধুবাদ ও বিদ্যার্থীদের উৎসাহ, উদ্দীপনা দেখে বুঝলাম, তক্ষশীলার শিক্ষা আমার ব্যর্থ হয়নি।

মহাযজ্ঞ সমাপ্ত হবার পর সম্রাট রাজকার্যে মন দিলেন। কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত।

সারাদিন কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত থাকার পর সন্ধ্যায় তিনি সবার কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতেন। এ সময় তিনি ডুব দিতেন তাঁর কলাসাধনার মধ্যে।

সন্ধ্যা নামলেই প্রতিহারিণী এসে আমাকে ডেকে নিয়ে যেত রাজ অন্তঃপুরে।

সম্রাট তখন বসতেন অন্তঃপুরের বৃত্তাকার অঙ্গনে। সেই অঙ্গনের দ্বিতল, ত্রিতল ঘিরে ছিল রানীমহল। বৃত্তাকার অঙ্গনটি পরিক্রমা করলে সর্বদিকে দাসী পরিবৃতা রানীদের কর্মচাঞ্চল্য লক্ষ করা যেত।

সম্রাটের এই অন্তঃপুরে প্রবেশের একমাত্র অধিকার দেওয়া হয়েছিল আমাকে। আমরা দুজনে প্রায় এক প্রহরকাল সঙ্গীত সাধনায় মগ্ন থাকতাম।

আমি যখন বীণা অথবা বাঁশি বাজাতাম তখন গভীর অভিনিবেশ সহকারে শুনতেন সম্রাট, আবার সম্রাট যখন বাজাতেন তখন আমি মগধে প্রচলিত রাগিনীর কলাকৌশল মনে মনে আয়ত্ত করতাম। এমনিভাবে দুজন অসম বয়সী সুরের জগতে বিচরণ করতাম অন্তরঙ্গ সুহৃদের মত।

একদিন ঊর্ধ্বে রানীমহলের দিকে তাকিয়ে বাঁশিতে ফুঁ দিয়েছি এমন সময় একটি গবাক্ষে আমার দৃষ্টি আটকে গেল। বেতসা আমার দিকে চেয়ে আছে। দুটি চোখে উদাসী মনের ছায়া। মুখে সকরুণ এক আর্তি। হাতে সন্ধ্যা-প্রদীপ।

আমার বাঁশি থেকে সেদিন ঝরে পড়তে লাগল অবরুদ্ধ এক নারীহৃদয়ের কান্না। বাঁশি শেষ হলে তাকে আর দেখতে পেলাম না। সম্রাট আমার সেদিনের বাজনা শুনে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলেন।

আমি প্রতিহারিণীর মুখ থেকে কথায় কথায় জেনেছিলাম, অন্তঃপুরের গবাক্ষে এসে দাঁড়াবার অনুমতি একমাত্র দাসী অথবা উপস্থাপিকাদেব দেওয়া আছে। রানীরা থাকেন প্রকোষ্ঠের অন্তরালে। দাসীরা সম্রাটের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পায় না, কিন্তু উপস্থাপিকারা প্রত্যক্ষভাবে সম্রাটের সেবায় নিযুক্ত থাকে। এরা সাধারণত পরাভূত রাজা কিংবা সামন্ত নৃপতিদের কন্যা। রানীদের পরেই এদের মর্যাদা। এদের কারু ওপর সম্রাট তুষ্ট হলে রানীর মর্যাদা দিয়ে থাকেন।

পর পর তিনদিন বীণা কিংবা বাঁশি বাজাতে গিয়ে আমি ঐ একই বাতায়নে বেতসাকে দেখলাম। সামনে তার একটি প্রজ্জ্বলিত দীপ। চতুর্থ দিন কিন্তু তাকে আর আমি ঐ বাতায়নে দেখতে পেলাম না। আমার সমস্ত প্রেরণা সহসা নিভে যাওয়া দীপের আলোর মত অন্ধকারের সাগরে ডুবে গেল। বাঁশিতে আর সেদিন প্রাণের ছোঁয়া লাগল না। কুশলী বীণকার সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত বললেন, কুমার, তোমার সুর শুনলে আমার কল্পনার আকাশে অগণিত নক্ষত্রের ফুল ফুটে ওঠে, কিন্তু আজ সারা আকাশ জুড়ে মেঘের ছায়া কেন?

আমি চমকে উঠলাম, তীক্ষ্ণদর্শী মহারাজ আমার মনের কথা অনুমান করতে পারেননি তো।

সহসা আমার মুখ দিয়ে একটা কথা বেরিয়ে এলো, সম্রাট, সুরদেবী আজও এ অকিঞ্চনের গৃহ পরিত্যাগ করে আপনার প্রাসাদ দ্বারে উপস্থিত হয়েছেন।

সম্রাট হেসে উঠে বীণাটি তুলে নিলেন। সে রাতে তিনি হলেন সুরসাধক আর আমি হলাম তাঁর মুগ্ধ শ্রোতা।

পরদিন যথারীতি প্রতিহারিণী এল অতিথি নিবাসে। আমি প্রাসাদে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিলাম। কিন্তু প্রতিহারিণী আমাকে অবাক করে দিয়ে ভূর্জপত্রে লেখা একটি লিপি আমার হাতে দিলে। লিপিতে লেখা ছিল : সখা, গত সন্ধ্যায় তোমার বাঁশি আমার প্রাণে এসে পৌঁছল না কেন? আমার মন বলল, তোমার মানসী বাতায়ন থেকে সরে আসার জন্যেই বিপর্যয়। তুমি একটি কথা জেনে রেখ, তিনটি দিবস সম্রাট কাটান এক রানীর কক্ষে। চতুর্থ দিবসে তিনি চলে যান কক্ষান্তরে, অন্য রানীর প্রকোষ্ঠে। এমনি করে রানীমহল পরিক্রমা চলে তাঁর। আমি এখন প্রধানা উপস্থাপিকা, তাই যে রানীর কক্ষেই তিনি যান না কেন আমাকে তাঁর সেবায় সেই কক্ষেই তিনদিন নিযুক্ত থাকতে হয়। মহারাজ যে কক্ষে নিশিবাস করবেন কেবলমাত্র সেই কক্ষের বাতায়নেই সন্ধ্যা থেকে দীপ জ্বলবে। সেখানে উপস্থিত থেকে তৈলদান ও শিখা সংবর্ধিত করাই আমার কাজ। তুমি সন্ধ্যার আসরে এসে বৃত্তাকার অঙ্গনটি প্রদক্ষিণ করলেই যে বাতায়নে

দীপ দেখবে, জানবে সেখানেই আমি রয়েছি। তুমি সেই মুখেই তোমার আসন পাততে পার। আমিও তোমাকে মুখোমুখি দেখতে পাব।

ভয় পেয়ো না, পত্রবাহিকা প্রতিহারিণীটি অত্যন্ত বিশ্বস্তা।

তোমার পথসঙ্গিনী বেতসা।

আসরে পাতা থাকত পশমে তৈরি সুচিত্রিত এক আস্তরণ। তার ওপর উপবেশন করে আমাদের সঙ্গীত সাধনা চলত। আমি গিয়ে অঙ্গন প্রদক্ষিণ করে দেখে নিতাম আমার প্রেরণার দীপশিখাটি কোথায় জ্বলছে। সেই দিকে মুখ করে বসতাম। অঙ্গনটি বৃত্তাকার বলেই যে কোন মুখেই বসা যেত। আমার উপবেশনের পর সংবাদ গেলে মহারাজ নেমে এসে আমার মুখোমুখি বসতেন।

এমনি করে দীর্ঘ দুটি বছর কেটে গেল। দিনান্তে একটিবার হলেও আমি বেতসাকে দেখতে পেতাম। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। ও ছিল আমার প্রেরণা। এর অধিক কোন ভাবনা বেতসাকে কেন্দ্র করে আমি ভাবিনি।

কিন্তু আমি জানতে পারিনি এই দুটি বছরের মধ্যে কি প্রবল ঝড় বয়ে গেছে আর একজনের মনের ওপর দিয়ে।

জানলাম এক শীতের রাত্রে। তখন মধ্যরাত্রি। দরজায় কে যেন করাঘাত করল। আমি জেগে উঠে দরজা খুলে দিলাম। কোনও দুর্বৃত্ত যে আসেনি এ সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত ছিলাম। কিন্তু আমাকে গভীর বিস্ময়ের মধ্যে ফেলে দিল একটা চাপা কণ্ঠস্বর।

দরজা বন্ধ করে দাও কুমার।

আমি মুহূর্তে দরজা বন্ধ করে দিলাম। কিন্তু সমস্ত শরীর আমার বায়ুতাড়িত পত্রের মত থর থর করে কাঁপতে লাগল। মাঘের শেষ শীতের রাত্রে যখন সমস্ত নগরী গভীর নিদ্রায় মগ্ন তখন কৃষ্ণ অবগুণ্ঠনে সারা অঙ্গ ঢেকে প্রতিহারিণীর পরিচ্ছদ পরে সম্রাটের মোহর সঙ্গে নিয়ে অতিথি নিবাসে চলে এসেছে বেতসা।

উত্তেজনায় সেও যে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে তা তার শ্বাস-প্রশ্বাস থেকেই অনুমান করতে পারছিলাম।

তুমি! তুমি এ সময় এখানে বেতসা?

শুধু একটি কথা জানাতে এসেছি কুমার, তুমি এই পাষাণপুরী থেকে আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে চল। পৃথিবীর যে কোন ক্ষুদ্র প্রান্তে যে কোন অবস্থায় আমি তোমার সঙ্গে থাকতে চাই।

বেতসাকে আমার শয্যায় বসিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করলাম।

বললাম, আমরা তো প্রতিদিন পরস্পরকে দেখছি বেতসা। তাছাড়া সম্রাট অত্যন্ত মহানুভব, তাঁকে প্রতারণা করা কি সঙ্গত হবে? আমি জানি তিনি তোমার প্রতি গভীরভাবে আসক্ত। হয়তো অচিরেই তুমি উপস্থাপিকা থেকে রানীর পদে উন্নীত হবে। যে কোন নারীর পক্ষে এ এক পরম সৌভাগ্য নয় কি ?

হঠাৎ প্রশ্ন করল বেতসা, তুমি নারী হৃদয়ের কতটুকু জান কুমার?

স্বীকার করলাম, নারীহৃদয় সম্বন্ধে আমি সর্বজ্ঞ নই। তবু বললাম, সুস্থভাবে কয়েকদিন চিন্তা করে দেখ, উত্তেজনা প্রশমিত হলে বুঝতে পারবে, এই পলায়নের পরিকল্পনা কতদূর অসম্ভব।

বেতসা তখনও বাঁচার প্রবল ইচ্ছায় স্রোতের তৃণটিকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা চালাতে লাগল।

কুমার, তুমি হয়তো ভয় পেয়েছ। সম্রাটের সামনে থেকে কি করে পলায়ন করবে তাই ভাবছ? কিন্তু তুমি হয়তো জান না লিচ্ছবীদের উৎসবে যোগ দেবার জন্য অচিরেই সম্রাট যাবেন মাতুলালয়ে। সেই সুবর্ণ সুযোগে আমরা দুটি অশ্বে রাত্রে রাজধানী ত্যাগ করব। আমাদের প্রতিহারিণীটি আমার জন্য সবকিছু করতেই প্রস্তুত। অশ্বশালার রক্ষক আমাদের প্রতিহারিণীর প্রেমাসক্ত। সে অতি দ্রুতগামী দুটি অশ্ব দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

আমি বুঝলাম, সব আয়োজন ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ করে তবেই আমার কাছে এসেছে বেতসা। নিজের মনকে বহুদিন আমি জিজ্ঞেস করেছি নিভৃতে, আমি কি বেতসাকে ভালবাসি? উত্তর পেয়েছি, হ্যাঁ।

আমি কি তাকে একান্ত করে কাছে পেতে চাই? উত্তর পেয়েছি, না।

আমার সংস্কৃত মন সম্রাটকে প্রতারণা করতে বার বার দ্বিধাবোধ করেছে।

অন্ধকারে বেতসা তার দুটো হাত দিয়ে আমার একখানা হাতকে জড়িয়ে ধরেছিল। আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম উত্তেজনায় ওর হাত দুটো কাঁপছে।

ভাবলাম, এই মুহূর্তে ওকে নিরাশ করলে ও চরম আঘাত পাবে, কিন্তু পরমুহূর্তে মনে হল, বৃথা সান্ত্বনা দিয়ে ওর আশাকে জিইয়ে রেখে লাভ কি! আমি কোনদিনই পারব না ওর পরিকল্পনাকে রূপ দিতে। আঘাত যদি প্রথমেই পায় তাহলে সে আঘাত হয়তো একসময় সামলে নিতে পারবে কিন্তু আমার কাছ থেকে ওর আশার স্বপক্ষে সামান্য সমর্থন পেলেও ওর কামনা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠবে। তখন ওর মনের দুর্বার গতিকে ফেরান আর সম্ভব হবে না।

আমি আমার ভালবাসার নারীকে নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও বললাম, বেতসা, তুমি রাজার মেয়ে, সুন্দর সম্ভ্রান্ত তোমার আচরণ। কেবল আমি নই, ভারত সম্রাটও তোমার শোভন আচরণে মুগ্ধ। সামান্য প্রতিহারিণী, সেও দেখ কি অসামান্য ভালবাসে তোমাকে। তোমার ভেতর এমন এক যাদু আছে যার শক্তিতে সকলেই সম্মোহিত। এ অবস্থায় শুধু মানসিক উত্তেজনার বশে তুমি যদি একটি মানুষকে নিয়ে পলায়ন কর তাহলে কি কৈফিয়ৎ দেবে নিজের কাছে। সবার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ালেও নিজের কাছ থেকে কি কোনদিন পালাতে পারবে বেতসা? তুমি যদি সম্ভ্রান্ত না হতে, তোমার মন যদি উচ্চ না হত তাহলে আমি এ প্রশ্ন তোমার কাছে রাখতাম না।

একটু থেমে আবার বললাম, দিনের পর দিন তোমাকে আমি মূর্তিমতী সন্ধ্যার মত দেখেছি প্রদীপ হাতে। আর তুমি আমাকে দেখেছ গন্ধর্বের ভূমিকায়। দুজনের হৃদয়ে দুজনের ছবি চিরভাস্বর হয়ে আছে। এবার দেহধারী একজনকে সরে যেতে দাও বেতসা। যে তোমার অক্ষত হৃদয়ে ক্ষতের সৃষ্টি করেছে তাকে ক্ষমা কর না। তার গৃহ নাই, সে পথের পথিক, তাকে নিঃশব্দে চলে যেতে দাও। তাকে ঘিরে সংসার রচনার কল্পনা কর না।

আমি থামলাম। নিস্তব্ধ পরিবেশ। অন্ধকার গাঢ়তর বলে মনে হল।

সেই অন্ধকারে একটি নারী উঠে দাঁড়াল। তখনও সে ধরেছিল আমার হাত। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তার বুক ঠেলে। কয়েকটি কথা সে উচ্চারণ করল। মনে হল শব্দগুলো কোন জনমানবহীন ধূ-ধূ দিগন্ত থেকে ভেসে আসছে।

মরুভূমি দেখেছ কুমার? বড় তৃষ্ণা, বড় তৃষ্ণা তার। বুক ফাটিয়ে সে চেয়ে থাকে আগুন ঢালা আকাশের দিকে। একখণ্ড মেঘ, শুধু একবিন্দু জলের প্রত্যাশা। কিন্তু হায়......।

বেতসার হাতখানা সহসা খসে পড়ল আমার হাতের থেকে। যেমন নিঃশব্দে এসেছিল তেমনি নিঃশব্দে চলে গেল গাঢ় অন্ধকারের অবগুণ্ঠনে নিজেকে ঢেকে নিয়ে।

বেতসা চলে গেলে কতক্ষণ একটা সম্মোহনের মধ্যে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। মনে হল, সবই অবাস্তব। এতক্ষণ স্বপ্নের মিথ্যা একটা জগতে আমি বিচরণ করেছি।

বিধাতার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমার ছিল না। প্রভাতেই প্রাসাদ থেকে প্রতিহারী এসে জানিয়ে গেল, সম্রাট পক্ষকালের জন্য রাজধানী ত্যাগ করে যাচ্ছেন লিচ্ছবী রাজ্যে। ফিরে এসে তিনি শিল্পীকে যথারীতি আহ্বান জানাবেন।

আমি কি করে বেতসার দিকে মুখ তুলে তাকাব তাই যখন ভাবছি তখন এ সংবাদ বেশ কিছুটা স্বস্তি এনে দিল আমার মনে। পরক্ষণেই মন অশান্ত হয়ে উঠল। তবু দিনান্তে একটিবার তাকে দেখার সুযোগ ছিল কিন্তু তাও আর রইল না এখন।

আমি মনে মনে স্থির করে ফেললাম, পাটলিপুত্রের মায়া আমাকে কাটাতে হবে। বেতসাকে যদি আমি সত্যই ভালবেসে থাকি তাহলে যত সত্বর সম্ভব তাকে ত্যাগ করে যেতে হবে আমাকে। এতে মঙ্গল দুজনেরই।

সম্রাট ফিরলেন ফাল্গুনের সপ্তম দিবসে। আরও সপ্তাহ কাল আমার কাছে কোন আহ্বান এল না প্রাসাদ

থেকে।

আমি তখন চঞ্চল হয়ে উঠেছি সম্রাটের সাক্ষাতের জন্য। পাটলিপুত্র ত্যাগের কথা তাঁকে অবিলম্বে জানাতে হবে।

আমার ধৈর্য যখন শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছে তখন প্রাসাদ থেকে প্রতিহারী এল সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাতের আহ্বান নিয়ে।

তখন মধ্যাহ্ন। সভাকক্ষে প্রভাতী অধিবেশনের সাময়িক বিরতি। প্রতিহারীর সঙ্গে আমি প্রবেশ করলাম। সিংহাসনে বসে আছেন সম্রাট একাকী। আমি বুঝতে পারলাম, কেবলমাত্র আমারই অপেক্ষায় রয়েছেন তিনি।

কক্ষে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে আমাকে সাদর আহ্বান জানালেন সম্রাট. পাশের আসনে বসতে ইঙ্গিত করলেন। বন্ধুর মত হাস্যপরিহাসের মধ্যে আমার কুশল ইত্যাদি জেনে নিলেন।

এক সময় আসল কথাটি শোনালেন সম্রাট। আগামী বিশে ফাল্গুন রাজগৃহের (রাজগীর) পর্বত সংলগ্ন উদ্যানে প্রতি বছরের মত আয়োজন হয়েছে মদন মহোৎসবের। সেখানে মদনের অর্চনা ও সারাদিনের আনন্দ অনুষ্ঠান। সম্রাট ও অন্তঃপুরচারিকারা ছাড়া সে উৎসবে অন্য কোন পুরুষের প্রবেশ নিষেধ। এতকাল এই নিয়মই বলবৎ ছিল কিন্তু এ বছর নিয়মের কিছু পরিবর্তন ঘটান হয়েছে।

সম্রাট বললেন, কুমার, তোমার জন্য এবার নিয়ম ভাঙলাম। তুমি যথার্থ গন্ধর্ব। তুমি বীণা বাজাবে মদন মহোৎসবে, আমার উৎসব তাতেই সার্থক হয়ে উঠবে।

আমি মাথা নত করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম।

এবার সম্রাট আমার কাছে যে কথাটি ব্যক্ত করলেন তার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। সুখ দুঃখের অতীত একটা অনুভূতি আমাকে অধিকার করে রইল।

সম্রাট বললেন, ঐ উৎসবের দিনে মদনের মন্দিরে বিগ্রহের সামনে পঞ্চপ্রদীপ জ্বেলে আরতি করেন মহারানীরা। পালাক্রমে এক এক রানী মদনের পূজা সমাপ্ত করে সেই দীপের শিখায় আমার আরতি করে যান। আমি তাঁদের ললাটে আবীর তিলক পরিয়ে দি। এ বছর নতুন এক রানী আমাকে বরণ করবে। তুমি তাকে চেন কুমার। বেতসাকে তুমিই তো এনেছিলে যৌধেয় থেকে। সে এতদিন ছিল আমার উপস্থাপিকা, তাকে আমি এই মদন মহোৎসবে রানীর মর্যাদা দিতে চাই। মহারানীর পদ লাভের পরিপূর্ণ যোগ্যতা আছে তার।

একটু থেমে বললেন, এবশ্য এ উৎসবে আমি তাকে বরণ করব, স্বীকৃতিও দেব, কিন্তু বৈদিক আচারে আমি তার পাণিগ্রহণ করব রাজধানীতে ফিরে।

এতগুলি কথা বলে থামলেন সম্রাট।

আমার কিছু বলার ছিল না। আমি সম্রাটের মুখের দিকে চেয়ে তাঁর প্রতিটি কথা শুনছিলাম। আমার হৃদয় আলোড়িত হচ্ছিল। আমি আমার প্রবৃত্তিকে শাসন করছিলাম। হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হৃদয়ের কান্নাকে শুভবুদ্ধির তাড়নায় রূপান্তরিত করছিলাম প্রভাতের প্রসন্ন আলোকে।

নির্দিষ্ট দিনে সম্রাটের নির্দেশ মত আমি প্রস্তুত হয়েই ছিলাম। শুভ্র একটি অশ্বের ওপর পীতবাস পরিধান করে, মস্তকে রক্ত উষ্ণীষ ও গলায় অশোক মাল্য ধারণ করে আমি অপেক্ষা করছিলাম। প্রাসাদ থেকে পাঁচখানি রথ বেরুল। প্রতিটি রথের শীর্ষে উড়ছে মকরকেতন। মদনের আবির্ভাবের ঘোষণা উচ্চারিত।

সম্রাটের নির্দেশে আমি চলেছিলাম রথের সম্মুখে। আমাদের অজস্র ধারায় স্নান করিয়ে দিচ্ছিল প্রভাত সূর্য। পথিপার্শ্বে বসন্তের বৃক্ষরাজিতে অজস্র রক্ত পুষ্পের সমারোহে বসন্তসখা মদনের আবির্ভাবের ইঙ্গিত।

আমরা রাজ-উদ্যানে এসে পৌঁছলাম। পূর্বদিনে দক্ষ পরিচারিকারা এসে অনুষ্ঠানের সবকিছু সম্পূর্ণ করে রেখেছিল।

মধুঋতুর পত্রপুষ্পে অতি সুশোভিত উদ্যান। পশচাতের পটভূমিতে ধূমল পর্বত নীল আকাশে হেলান

দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। উদ্যানের মাঝে সাময়িকভাবে নির্মিত হয়েছে মদনের মন্দির। শীর্ষে ধ্বজদণ্ডে পুষ্প নির্মিত একটি ধনু থেকে পঞ্চমুখী শর নির্গত হবার জন্য উদ্যত।

শুরু হয়ে গেল উৎসব। সুসজ্জিত রাজনর্তকীর দল মণ্ডলাকারে নৃত্য করতে করতে প্রদক্ষিণ করতে লাগল পুষ্পিত, মুকুলিত আম্র, অশোক, কিংশুক তরুরাজি।

ওদের সম্মেলক সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে আমি কখনো বাঁশি কখনো বা বীণা বাজাতে লাগলাম।

প্রথম উদ্বোধন-পর্ব শেষ হলে শুরু হল আসল অনুষ্ঠান।

পুষ্প দিয়ে গড়া বেদির ওপর কুসুম, পল্লব শোভিত সিংহাসনে বসে রয়েছেন সুসজ্জিত সাক্ষাৎ-মদন সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত। বিশিষ্ট সেবিকারা পুষ্পে গড়া ব্যজন আন্দোলন করছে সম্রাটের দুইদিকে। একজন মহারাজের মস্তকে ধরে আছে পুষ্পপত্র নির্মিত ছত্র।

প্রধানা মহিষী প্রথমে মন্মথ মন্দিরে প্রবেশ করে দ্বার রুদ্ধ করলেন। মদনের সম্মুখে এইভাবে হবে রুদ্ধ দ্বারের অভ্যন্তরে নিভৃত আরতি। তারপর পূজা শেষে দীপ হস্তে বেরিয়ে এলেন মহিষী।

আমি সারাক্ষণই বীণায় বসন্তের বিহ্বল রাগিণী বাজিয়ে চলেছিলাম।

মহিষী অনিন্দ্য ভঙ্গীতে সম্রাটের আরত্রিক কর্ম সমাধা করলেন। সম্রাটও স্বর্ণ থালিকা থেকে আবীর তুলে নিয়ে তিলক এঁকে দিলেন মহিষীর ললাটে। চর্তুদিক থেকে পুষ্প বর্ষণ চলল কিছুক্ষণ।

এমনি করে একে একে রানীরা মন্দিরের সন্নিকটে স্থাপিত পটাবাস থেকে বেরিয়ে মদনের আরত্রিক সমাধা করলেন নিভৃতে, তারপর সম্রাটকে আরতি করে, তাঁর তিলক মাথায় নিয়ে বসলেন বেদির ওপর।

সব শেষে পটাবাস থেকে বেরুল বেতসা। রক্তবর্ণের চীনপট্ট আর রক্তবর্ণের পুষ্পালঙ্কারে তার উজ্জ্বল স্বর্ণকান্তি অগ্নিশিখার মত দীপ্ত হয়ে উঠেছিল। তাকে সাজান হয়েছিল নববধূর বেশে। তার বাম হাতে স্বর্ণ থালিকায় ছিল পুষ্পার্ঘ্য।

দ্বাররুদ্ধ করার আগে বেতসা একবার পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকাল সম্রাটের বেদির দিকে। আমার স্থির বিশ্বাস সে আমারই দিকে চেয়েছিল। তার চোখে কিসের দৃষ্টি আমি দেখেছিলাম? ভর্ৎসনা, অনুরাগ না সর্বশূন্যতা?

দ্বার রুদ্ধ হল। আমি আর কি রাগিণী বাজাব? কি সুর তুলব আমার বীণায়? ওকে যে আজ আমার সবসেরা রাগিণীটি বাজিয়ে শোনাতে হবে। আজ থেকে ও চিরদিনের মত চলে যাবে আমার দৃষ্টির অন্তরালে।

আমি আমার সকল শিক্ষা, সমস্ত প্রাণ ঢেলে বাজিয়ে শোনাতে হবে।

আমি আমার সকল শিক্ষা, সমস্ত প্রাণ ঢেলে বাজিয়ে চললাম। বসন্ত প্রকৃতি সে সুরের স্পর্শে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল।

কতক্ষণ রুদ্ধ রইল মন্দিরের দ্বার। সহসা সভয়ে আর্তনাদ করে উঠল সেবিকার দল। সচকিত হয়ে সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন সম্রাট। আমি বীণাবাদন থামিয়ে বিহ্বলের মত চেয়ে রইলাম।

ততক্ষণে মন্মথ মন্দিরের ধ্বজা স্পর্শ করেছে লেলিহান অগ্নিশিখা।

চতুর্দিকে আর্ত কলরব, অগ্নি নির্বাপনের জন্য উদ্‌ভ্রান্ত চেষ্টা, সব কিছু ব্যর্থ হয়ে গেল। বংশ ও শুষ্ক তৃণ নির্মিত মদনমন্দির সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গেল দৃষ্টির সম্মুখে। প্রবল হাহাকার ধ্বনির মধ্যে হারিয়ে গেল বেতসা।

কাহিনী শেষ করে থামল কুমারায়ণ। শুকতারা পূর্ব দিগন্তে চেয়ে আছে। জীবাও ঐ তারাটির মত কতক্ষণ চেয়ে রইল কুমারায়ণের মুখের দিকে। এক সময় কুমারায়ণের হাত ধরে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ভোর হয়ে এসেছে, চল কুমার যাত্রার আয়োজন করি।

।। চার।।

দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল গোদানের (খোটান) রাজপ্রাসাদ। কাষ্ঠনির্মিত ত্রিতল, পঞ্চতল গৃহগুলি পতাকা-শোভিত। প্রাসাদশীর্ষে স্থানে স্থানে পিত্তলের কলসাকৃতি চূড়া রৌদ্রালোকে জ্বলছিল।

জীবা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, দেখ দেখ, কি বিস্ময়! শ্বেত পারাবতগুলি সূর্যের আলো পাখায় মেখে চক্রাকারে বৌদ্ধবিহারের স্তূপ শীর্ষে উড়ে ফিরছে। দূর থেকে মনে হচ্ছে ঠিক যেন একটি শ্বেত ছত্র।

তারা যতই প্রাসাদের দিকে এগিয়ে চলেছিল, উৎসবের চিত্র ততই তাদের চোখে এসে পড়ছিল। বিভিন্ন দিকের পথ গোদান নগরীর রাজপথে গিয়ে মিশেছে। পথের মাঝে মাঝে নির্মিত হয়েছে বৌদ্ধস্তূপের আকারে তোরণ। বাতাসে উড়ছে নানাবর্ণের পতাকা। চোক্কুর (ইয়ারখন্দ) থেকে বুদ্ধযাত্রায় যোগ দিতে চলেছেন কয়েকজন ভিক্ষু। শুলিদেশ (কাশগড়) থেকে আসছে একদল অতি সাধারণ সব মানুষ। জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেল, তারা অন্ত্যজ শ্রেণীর লোক। বুদ্ধের কাছে জাতিভেদ নেই, তাই তারা এতদূর পথ পেরিয়ে এসেছে বুদ্ধযাত্রায় যোগ দিতে। সকলের মুখে সেই এক মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে :

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
ধম্মং শরণং গচ্ছামি
সংঘং শরণং গচ্ছামি।

জীবা বলল, গোমতী বিহারে মহাশ্রমণ ধর্মমতির সঙ্গে আমরা প্রথম দেখা করব, তারপর প্রবেশ করব নগরে।

কুমারায়ণ মাথা নেড়ে বলল, সেই ভাল। একজন পরিচিত মানুষের দেখা পেলে অনেক সুবিধে।

নগরীর বাইরে পথের ওপর বসে গেছে সাময়িক দোকানপাট। দূর দূর থেকে বণিকরা এসেছে তাদের পণ্য-সম্ভার নিয়ে। তারা অস্থায়ী আস্তানা পেতে সম্ভার সাজিয়ে বসেছে। চোক্কুকের ব্যবসায়ীরা বেশিরভাগ দিয়েছে খাবারের দোকান। ভারতীয় ব্যবসায়ীদের আলাদা এলাকা। সাত আটখানি দোকান পাশাপাশি। তারা এনেছে, বঙ্গ থেকে অতি সূক্ষ্ম ও মসৃণ বিলাসবস্ত্র। বারাণসী থেকে অতি বর্ণাঢ্য ও স্বর্ণসূত্রের কাজকরা পত্রোর্ণ (রেশমী বস্ত্র)। গজদন্ত নির্মিত ময়ূরপঙ্খী, নর্তকী ও সুসজ্জিত হস্তীর মূর্তি সাজিয়ে রেখেছে। মুক্তা, হীরক ও মূল্যবান প্রস্তরগুলি প্রদর্শিত হচ্ছে। এইসব দ্রব্যের ক্রেতা সাধারণত বিদেশি বণিক। তারা নিজ নিজ দেশের বাজারের জন্য সংগ্রহ করছে এসব।

পারস্য থেকে এসেছে চিত্র-সম্ভার ও পশমী পরিচ্ছদ। চীনদেশ থেকে প্রধানত চীনাংশুক।

মেলার বাইরে বিভিন্ন দেশের বণিকদের অবস্থানের জন্য স্থাপিত হয়েছে বহু ধরনের পটাবাস। রাত্রে চৈনিক বণিকেরা তাদের শিবিরের সামনে নাটকের অনুষ্ঠান করে। নাচে, গানে, কথায়, যুদ্ধে সে এক জমজমাট ব্যাপার। ভাষা না বুঝলেও উপস্থিত সকলেই উপভোগ করে সে অভিনয়।

তাছাড়া প্রতি দেশের মানুষেরই নিজস্ব কিছু আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা আছে। সারাদিনের পর পটাবাসের মধ্যে বসে তারা সেইসব আনন্দে মেতে থাকে।

জীবা, মহাশ্রমণ ধর্মমতির সঙ্গে নিভৃতে দেখা করে তার প্রয়োজনীয় কথাগুলি বলে নিল। তিনি তাকে তাঁর কালোচিত উপদেশ দিলেন। প্রত্যাবর্তনের সময় কুচীশ্বরের কাছে পত্র দেবেন বলেও জানালেন।

এরপর গোদানের মহারাজার কাছে জীবার আগমন সংবাদ পাঠালে তিনি শিবিকা পাঠিয়ে মহাসমাদরে জীবাকে অন্তঃপুরে নিয়ে গেলেন। কুমারায়ণকেও মহারাজ অমিত্রবিজয় প্রাসাদের অতিথি নিবাসে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ধর্মমতি তাকে গোমতী বিহারে নিজের কাছে রাখার ইচ্ছা প্রকাশ করায় মহারাজ ক্ষান্ত হলেন।

ধর্মমতি বিস্মিত হলেন কুমারায়ণের সঙ্গে আলাপ করে। শাস্ত্র বিষয়েই কেবল যুবকটি সুপণ্ডিত নয়, ব্যবহারিক বহু বিদ্যাতেই সে পারঙ্গম।

ধর্মমতি কুমারায়ণের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পর এক সময় তাকে বললেন, যুবক তুমি বৌদ্ধশাস্ত্রে

অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছ, কিন্তু গৃহীর জীবনই তোমাকে যাপন করতে হবে।

কুমারায়ণের প্রশ্ন, কেন প্রভু ?

এ কেনর উত্তর নেই কুমারায়ণ, আমার অভিজ্ঞতা থেকেই তোমার জীবন সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্তে এসেছি। তুমি গৃহীর জীবন গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত থেকো, মঙ্গল হবে তোমার।

কুমারায়ণ আর প্রশ্ন না তুলে অবনত মস্তকে বসে রইল। এই জ্ঞানবৃদ্ধ বহুদর্শী সাধক পুরুষটির প্রতি তার গভীর শ্রদ্ধা জন্মে গিয়েছিল। সেই মুহূর্তে তার মনে হল, মহাস্থবির ধর্মমতির এই বাণী অমোঘ।

সে এ বিষয়ে আর কিছু চিন্তা করল না। ভাগ্যের অনিবার্য বিধানের হাতে নিজেকে সঁপে দেওয়াই শ্রেয় বলে মনে করল।

তিরিশ হস্ত উচ্চতা-বিশিষ্ট রথটি যেন চলন্ত এক বৌদ্ধ বিহার। চীনপট্টের চাঁদোয়া টাঙানো হয়েছে রথের মধ্যে। পীত, শুভ্র ও গৈরিক বর্ণের পতাকায় সমস্ত রথটি সুশোভিত।

রথের মধ্যদেশে ধ্যানমুদ্রায় বসে আছেন রজত নির্মিত বুদ্ধ। তাঁর দুই পার্শ্বে দুই বোধিসত্ত্ব মূর্তি।

নগরের বহির্দ্বার দিয়ে প্রবেশ করল রথ। রথের সামনে রজ্জু ধরে আকর্ষণ করতে করতে এগিয়ে আসছেন গোমতী বিহারের শত শত ভিক্ষু। মুণ্ডিত মস্তক, পীতবসন পরিহিত।

নগরে রথ প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলবাদ্য বেজে উঠল। উত্তাল জনতা বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের জয়ধ্বনি দিতে লাগল।

মহারাজ অমিত্রবিজয় নগ্নপদে সপারিষদ এগিয়ে এলেন। পরিধানে ধৌত বস্ত্র, হাতে গন্ধ ধূপ। তিনি রথের কাছে এসে মাথার মুকুট নামিয়ে রাখলেন। ভক্তিভরে অর্চনা করে নগরের অভ্যন্তরে আকর্ষণ করে আনতে লাগলেন রথ।

বুদ্ধের রথ প্রাসাদ সংলগ্ন পথে আসামাত্র মহারানীরা গবাক্ষ পথে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। জীবাও অমৃতময় বুদ্ধের নাম উচ্চারণ করে পুষ্প বর্ষণ করল। সেই মুহূর্তে হূন দস্যুদের দ্বারা হত রক্ষীদের কথা স্মরণে আসায় দু'ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ল গাল বেয়ে। মনে মনে সে আবৃত্তি করল, হে প্রভু, এ বিশ্ব থেকে তোমার নামে যেন হিংসা বিদূরিত হয়।

কিছু সময় প্রাসাদের কাছে থেমে দাঁড়াল রথ। মহাস্থবির ধর্মমতি উচ্চারণ করতে লাগলেন বুদ্ধের অমৃত বাণী : 'মেত্তঞ্চ সব্বলোকস্মিং মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং। উদ্ধং অধো চ তিরিযঞ্চ অসম্বাধং অবেরমসপত্তং' — ঊর্ধ্বে অধোতে চারদিকে সমস্ত জগতের প্রতি বাধাহীন হিংসাহীন শত্রুতাহীন অপরিমিত মানস এবং মৈত্রী রক্ষা করবে।

মন্ত্রের মত জনসমুদ্র সেই বাণী উচ্চারণ করতে লাগল। রথ এবার এগিয়ে চলল নগরীর পথ ধরে। প্রতি গৃহ ও পথপার্শ্ব থেকে রথের ওপর বর্ষিত হতে লাগল রাশি রাশি ঋতু-পুষ্প।

গোদানে বুদ্ধযাত্রা উৎসব সমাপ্ত হলে কুচীর উদ্দেশ্যে রওনা হল জীবা আর কুমারায়ণ। মহারাজ অমিত্রবিজয় জীবার জন্য রক্ষীর ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু জীবা তাতে সম্মত না হওয়ায় মহারাজ তাদের দুজনের জন্য দুটি অশ্ব দিলেন। সঙ্গে এসেছিল যে শ্বেত অশ্বটি তাতে পটাবাস ও যাবতীয় খাদ্যসামগ্রী বয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা হল।

গোমতী বিহারে মহাশ্রমণ ধর্মমতির আশীর্বাদ ভিক্ষা করে নিল তারা। এবার দুজনে ধরল ভিন্ন পথ। চোক্কুক, শূলি ও ভুরুকের সার্থবাহ চিহ্নিত পথ।

দীর্ঘ পথযাত্রায় জীবা আর কুমারায়ণ পরস্পরেব অনেক কাছে সরে এলো। কুমারায়ণের স্মৃতিতে অস্পষ্ট হয়ে এলো বেতসার মূর্তি। কুমারায়ণ বেতসাকে ভালবেসেছিল ঠিক কিন্তু তাকে নিয়ে সংসার রচনার কল্পনাও করেনি। সে জানত এ অসম্ভব। সম্রাট যাকে গ্রহণ করেছেন তাকে যৌবনের উন্মাদনায় হরণ করে নিয়ে যাওয়া শুধু অন্যায় নয়, পাপ। আর যেহেতু সম্রাট তার শত্রু নন সেজন্যে তাঁর কাছ থেকে

তাঁর সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে যাবে কোন দুর্বুদ্ধির তাড়নায়?

তবু জীবার সঙ্গে প্রথম প্রণয়ের মুহূর্তগুলোতে বার বার কুমারায়ণের চোখের ওপর বেতসার মুখ ভেসে উঠেছে। কখনো মনে হয়েছে জীবা নয়, অবিকল বেতসা চলেছে, তার পাশে পাশে। আর তারা শূলি দেশের পথে নয়, শ্রাবস্তীর পথ ধরেই চলেছে।

এই মায়া-দৃষ্টি কেটে যেতে বেশি সময় লাগেনি কুমারায়ণের। বর্ষার মেঘ সরে গিয়েও যেমন শরতের আকাশে তার ছায়া রাখে, তারপর হেমন্তের অবগুণ্ঠনের আড়ালে অবলুপ্ত হয়ে যায়, কুমারায়ণের মনে বেতসার স্মৃতিও তেমনি ধীরে ধীরে উজ্জ্বল থেকে ধূসর হয়ে গেল

কথা হয় জীবা আর কুমারায়ণের। একের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ে অ'ন্যর হৃদয়ে।

কুমার প্রশ্ন করে, আচ্ছা জীবা, আমাদের এই মিলনে তোমার বান্ধবীর কাছ থেকে কোনো বাধা আসবে না তো?

জীবা বলে, বান্ধবীর কাছ থেকে বাধা না এলেও তোমার জীবার কাছ থেকে আসবে।

বিস্মিত হয় কুমারায়ণ, একথা কেন জীবা?

কারণ সে আমার অভিন্ন হৃদয়। তাকে অনূঢ়া রেখে আমাদের মিলন কি সম্ভব?

তোমার বান্ধবীর মিলনবাসর হয়ে গেলে পর, আমরা মিলিত হব। তার আগে নয়।

সহসা উচ্ছ্বসিত হয় জীবা, জান কুমার, ছোটবেলা আমরা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম একই মানুষকে দুজনে বরণ করব।

সরস হয়ে ওঠে কুমারায়ণের জিহ্বা। বলে, এখনও কি সেই বাসনা?

অমনি জীবা বলে, আমার মন থেকে এখনও প্রতিজ্ঞা মুছে যায়নি কুমার।

আশ্চর্য বন্ধুত্ব তোমাদের। আমি তো ভাবতেই পারি না আমার ভালবাসার ধনকে আমি অন্যের সঙ্গে ভাগ করে নেব।

জীবা হেসে বলল, এমন বন্ধুত্ব ত্রিভুবনে যে কোথাও নেই তা তোমাকে স্বীকার করতেই হবে।

আমি বিস্মিত, তবু মানছি জীবা।

এবার ভিন্ন প্রসঙ্গের অবতারণা করে জীবা, আমার ভেতর তুমি কি এমন দেখেছ কুমার যা তোমার মনকে আমার দিকে টেনে এনেছে?

বেশ কিছুক্ষণ জীবার দিকে চেয়ে থেকে কুমারায়ণ বলে, তোমার ঐ দুটি নীল চোখের তারায় আকাশ দেখেছি আমি। তারপর সোনালি সূর্যের অনেক লেখা দেখেছি সে আকাশে।

আমার চোখেই কি শুধু তোমার আমন্ত্রণ ছিল কুমার?

তোমার কথায়, তোমার চিন্তায়, তোমার অভিজাত ব্যবহারে আমার নিজের ছায়া দেখেছি, এ আমার মনের কাছে দ্বিতীয় আমন্ত্রণ জীবা। বলতে পার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ, অপ্রতিরোধ্য।

আমি তোমার কি দেখে ভালবেসেছি জান? শুধু তোমার দিকে চেয়ে।

শুধু আমার দিকে চেয়ে?

হ্যাঁ কুমার। মরুদ্যানের সেই বিভীষিকার কথা ছেড়ে দিলে আমি প্রথম যখন তোমাকে পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখি তখন মনে হয়েছিল আমি যেন একটি কাচখণ্ডের ভেতর দিয়ে এপার ওপার দেখছি।

একটু থেমে আবার বলল, তেমনি স্বচ্ছ, তেমনি নির্বাধ।

আবার তেমনি ভঙ্গুরও, হাসতে হাসতে বলল কুমারায়ণ।

না কুমার, স্বচ্ছতার ভেতর যে সহজ শক্তি থাকে সেখানে তুমি অপরাজেয়। সে পৌরুষ অর্জন করতে হয় না, সে সহজাত।

ওরা কিজিল নদী পেরিয়ে আসে। ঘোড়ার পায়ে বাধা পেয়ে বরফ গলা জলে মুক্তো ছড়ায়। ওরা পাশাপাশি চলে ঘোড়া ছুটিয়ে, আবার কখনো ধীরে ধীরে, হাতে হাত স্পর্শ করে।

চলার পথে জীবা জানতে চায়, কুমার এমন কোন চরিত্রের কথা শোনাও যা তোমার জীবনে স্মরণীয়

হয়ে আছে।

একটু ভেবে নিয়ে কুমারায়ণ বলে, এই মুহূর্তে একটি চরিত্রের কথা আমার মনে পড়ছে জীবা। অসাধারণ এক পুরুষ।

অসাধারণদের কথা শুনতে আমি ভালবাসি কুমার।

তক্ষশীলায় আমার ধনুর্বিদ্যার গুরু ভবদেবের কথাই বলব। বিদ্যাশিক্ষার শেষে আমরা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চলে আসার আগে গুরুদক্ষিণা দেবার জন্য তাঁর কাছে যাই। তিনি বললেন, যা চাই তা দিতে পারবে?

আমরা বললাম, সাধ্যমত চেষ্টা করব গুরুদেব।

আগে শোন একটা কাহিনী। এক রাজকুমার তীরধনু নিয়ে শিকার করে বেড়াত। একদিন বনের সবুজ লতাপাতার আড়ালে দুটো আশ্চর্য সুন্দর চোখ দেখতে পেল। সে-দুটো অবাক-করা-চোখ তার দিকেই চেয়ে ছিল। রাজকুমারের শিল্পীমন সব ভুলে ঐ চোখের দিকে চেয়ে রইল। কিন্তু হঠাৎ এক সময় রাজকুমারের ভেতর শিল্পীকে হত্যা করে জেগে উঠল একটা ব্যাধ। সে ধনুতে শরযোজন করে নিক্ষেপ করল হরিণটির এক চক্ষু লক্ষ করে। সেই তীরবিদ্ধ চোখ নিয়ে তরুণ হরিণটি প্রান্তর পেরিয়ে দৌড়তে লাগল। একবার মাটিতে গড়িয়ে পড়ে আবার প্রাণ নিয়ে লাফিয়ে পালায়। একসময় সে বনান্তরে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু আবার ফিরে এলো সে। প্রতি রাত্রে রাজকুমারের স্বপ্নের ভেতর। সে রাজকুমারের সামনে এসে দাঁড়ায়। শুধু চেয়ে থাকে তার দিকে। রাজকুমারের নিক্ষিপ্ত তীর বিদ্ধ হয়ে আছে তার বাম চোখে। হরিণটি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে তার চোখের ভাষায় যা বলে তার অর্থ, তুমি নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাও আর আমি মৃত্যু যন্ত্রণা চোখে নিয়ে বনে কান্তারে ঘুরে বেড়াই। তুমি যদি আমার মত তীরবিদ্ধ হতে তাহলে বুঝতে আমার যন্ত্রণা।

আজও সে প্রতিরাত্রে আসে সেই রাজকুমাররূপী ব্যাধের কাছে।

থামলেন গুরু ভবদেব।

আমি জানতাম, ভবদেব এক রাজার পুত্র ছিলেন। স্বেচ্ছায় রাজ্য ত্যাগ করে তক্ষশীলায় ধনুর্বেদের আচার্য পদ নিয়ে চলে এসেছেন।

বললাম, গুরুদেব, একি আপনার আত্মকাহিনী?

হাসলেন গুরু। বললেন, এবার দক্ষিণা চাইব। আমার জন্য নয়, ঐ হরিণটির আত্মার শান্তির জন্য।

সবাই আমরা তাঁকে সাধ্যমত দক্ষিণা দেবার প্রতিশ্রুতি দিলাম।

এবার আমাদের গভীর বিস্ময়েব মাঝে ফেলে গুরু ভবদেব বললেন, ঐ যে লতাপত্রে আচ্ছাদিত স্থানটি দেখা যাচ্ছে, আমি ওর আড়ালে গিয়ে দাঁড়াব। শুধু আমার মুখ আর দুটি চক্ষু তোমরা দেখতে পাবে। এখন বল তোমাদের ভেতর কে আমার বাম চক্ষুর তারায় তীরবিদ্ধ করতে পারবে?

সবাই আমরা অধোবদনে দাঁড়িয়ে রইলাম।

গুরু বললেন, আমি অন্য কোন দক্ষিণা চাই না তোমাদের কাছে। তোমরা গৃহে ফিরে যাও। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হও, এই আশীর্বাদ করি। কল্যাণ হোক তোমাদের।

সবাই আমরা গুরুকে প্রণাম করে ফিরে এলাম।

পরদিন ভোরে যে যার নিজ নিজ দেশের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল। আমি কিন্তু পথে নেমেও যেতে পারলাম না। ফিরে গেলাম গুরু ভবদেবের ভবনে।

আমাকে দেখেই গুরুর মুখে পরিতৃপ্তির হাসি দেখা দিল। তিনি বললেন, আমি জানতাম তুমি আসবে। আর তুমিই পারবে আমার শাপমোচন করতে।

আমি তখন চোখের জলে ভাসছি। গুরু কাছে টেনে নিয়ে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আমার চোখের জল মুছিয়ে দিলেন।

বললেন, আমার পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা কেউ নেই, তুমিই আমার সব। আমি আমার সাধনায় আয়ত্ত শেষ শরক্ষেপণের কৌশলটিও একমাত্র তোমাকেই শিখিয়ে দিয়েছি। তুমি আমাকে গুরু দক্ষিণা দিয়ে যাবে

এই প্রত্যাশা নিয়ে আমি তোমার দিকে চেয়ে বসে আছি কুমারায়ণ।

একি আমার পাপ নয় গুরুদেব?

গুরুকে পাপ থেকে মুক্ত করে দেবার মত পুণ্য কর্ম আর কি হতে পারে কুমারায়ণ।

অস্থির হয়ে জীবা প্রশ্ন করল, তুমি তীরবিদ্ধ করলে?

করেছিলাম জীবা। তবে বাম আঁখির তারা আমার তীরে সূক্ষ্মাগ্র একটি তণ্ডুলের পরিমাপে প্রবেশ করে ভূমিতে পতিত হয়েছিল। আশ্চর্য! গুরুর মুখে যন্ত্রণার কোন চিহ্ন ফুটে উঠতে আমি দেখিনি।

পরে শ্রেষ্ঠ ভেষজবিদ সোমপ্রভের চিকিৎসায় তিনি সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। যদিও বাম চক্ষুর দৃষ্টি তিনি আর ফিরে পাননি।

জীবা বলল, সত্যি, এক অসাধারণ ব্যক্তির অদ্ভুত প্রায়শ্চিত্ত।

কুমারায়ণ বলল, বণিক দলের সঙ্গে ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে আসার আগে আমি গুরু ভবদেবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, আমার প্রায়শ্চিত্ত সার্থক ও সম্পূর্ণ হয়েছে কুমার। রাত্রে সেই তীরবিদ্ধ হরিণ আর আমাকে স্বপ্নে দেখা দিতে আসে না। আমি নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাই।

এইখানেই থামল কুমারায়ণ। এক সময় বলল, তোমাদের দেশে গুরুকে দক্ষিণা দেবার রীতি নেই জীবা?

আছে বইকি। আমরা ভারতীয় আদর্শে দীক্ষিত ও শিক্ষিত। আমরা রোম দেশের মানুষ। বহু শতাব্দী আগে আমাদের পূর্বপুরুষ যাযাবর হয়ে কুচীতে আর অগ্নিদেশে এসে বসবাস করে। তারপর প্রায় পাঁচশত বছর আগে ভারত থেকে ভিক্ষুরা এসে আমাদের দীক্ষা দেন। সেই থেকে আমাদের নিজস্ব কুচীর ভাষার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সংস্কৃত আর প্রাকৃত ভাষা শিখে থাকি। হাঁ, তুমি গুরু দক্ষিণার কথা বলছিলে না? আমি গুরু ধর্মমতির কাছে বৌদ্ধ শাস্ত্র পাঠের শেষে দক্ষিণা দিতে চাই। তিনি বললেন, আমি এখন দক্ষিণা নেব না, আমার সঙ্ঘ নেবে।

বললাম, কবে আমার সে সৌভাগ্য হবে প্রভু ? আর কি বস্তু দক্ষিণা রূপে পেলে আপনার সঙ্ঘের তৃপ্তি?

গুরু বললেন, তুমি যখন সংসারে প্রবেশ করে জননীপদ লাভ করবে তখন তোমার প্রথম পুত্র সন্তানটি সঙ্ঘে দক্ষিণারূপে দিও।

কি উত্তর দিলে তুমি জীবা?

কুমারায়ণের একটি হাত নিজের দুটি হাতের মধ্যে ভরে নিয়ে তার চোখে চোখ রেখে জীবা বলল, আমি গুরুকে উত্তর দিয়েছিলাম, সে আমার পরম সৌভাগ্য।

কুমারায়ণ বলে উঠল, তোমার দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হবে জীবা।

ক্ষণকাল থেমে আবার বলল, এই মুহূর্তে ক্ষুদ্র একটি পরিকল্পনা আমার মাথায় এসেছে। তুমি অভয় দাও তো বলি।

নির্ভয়ে বল, আমার কাছে তোমার গোপন কিছু তো থাকতে পারে না কুমার।

কুমারায়ণ বলল, যদি আমাদের প্রথম পুত্রসন্তান হয় তাহলে তার নামের সঙ্গে জড়িয়ে থাকবে আমাদের দুজনের নাম। সে যদি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ হিসেবে কোনদিন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে তাহলে পুত্রের নামের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও লাভ করব অমরত্ব।

জীবা তদ্গত হয়ে বলল, প্রভু তথাগত যেন আমাদের ইচ্ছা পূর্ণ করেন। কুমার, এখন বল কি সে নাম, যার ভেতর আমরা দুজনেই জড়িয়ে থাকতে পারি? সন্তানের মধ্যে জনক-জননী।

কুমারজীব।

দুটি চোখ বন্ধ করে কতক্ষণ বসে রইল জীবা। এক সময় চোখ মেলে কুমারায়ণের দিকে চেয়ে বলল, অপূর্ব! অপূর্ব তোমার নামকরণ। কুমার দেখ, আমাদের সন্তান কুমারজীব একদিন প্রভুর কৃপা লাভ করে জগৎবিখ্যাত হয়ে উঠবে।

।। পাঁচ ।।

কুচী নগরী উৎসব-সজ্জায় সেজেছে। রাজকন্যা তথা রাজভগিনীর স্বয়ম্বরা। কুচীতে স্বয়ম্বরার অনুষ্ঠান এই প্রথম। ধর্মগুরু মহাস্থবির ধর্মমতি জীবার হাতে পত্র দিয়ে মহারাজ রজতপুষ্পকে এই স্বয়ম্বর অনুষ্ঠান করার জন্য পরামর্শ দান করেছেন।

পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিতে উন্মাদনার অন্ত নেই। মহারাজ রজতপুষ্প প্রতিটি রাজ্যে ভগিনীর স্বয়ম্বরার জন্য নিমন্ত্রণপত্র পাঠিয়েছেন। কেবল পার্শ্ববর্তী রাজ্যে নয়, সুদূর চীনেও দূত গেছে আমন্ত্রণ পত্র নিয়ে।

যথাসময়ে একজন রাজপুত্র অথবা রাজার প্রেরিত সেনাপতি কুচীতে উপস্থিত হয়ে কুচীশ্বরের মহা সমাদরপূর্ণ আতিথ্য গ্রহণ করেছেন।

অগ্নিদেশের যুবক রাজা এই স্বয়ম্বরের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে এসেছেন। রক্তসূত্রে অগ্নিদেশেব মানুষেরা কুচীর জ্ঞাতিস্থানীয়। তাই অগ্নিদেশের রাজার কাছ থেকে বারে বারে প্রস্তাব এসেছে কুচীশ্বরের ভগিনীর পাণি প্রার্থনা করে। কিন্তু রাজভগিনী কর্ণপাত করেননি এ প্রস্তাবে। তিনি লোকমুখে সংবাদ পেয়েছেন অগ্নিদেশের রাজা অত্যন্ত ক্রুরমনা ও সংগ্রামপ্রিয়।

কুচী ও অগ্নিদেশের মধ্যে বহু পূর্ব থেকে রাজকীয় অনুষ্ঠানে যাতায়াত আছে। সেই সূত্রে একাধিকবার কুচীতে এসেছেন অগ্নিদেশের রাজা। আসবপানে গভীর আসক্তি তাঁর। মৃগয়াতেও সমান আকর্ষণ।

রাজভগিনীকে একবার দর্শন করে এবং তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপ করে তিনি এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে নিজ রাজ্যে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যাবার জন্য বহু চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সেবার রাজভগিনীর সবিনয় অসম্মতি তাঁকে নিরাশ করেছিল।

এবার স্বয়ম্বর সভায় পূর্বাহ্ণে এসেই গোপনে সংবাদ সংগ্রহের জন্য চর নিযুক্ত করেছেন। সভাতেই ঘোষণা করা হবে প্রতিযোগিতার বিষয়। সমবেত প্রতিদ্বন্দ্বীরা সেই প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে নিজ নিজ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখবেন। যিনি শ্রেষ্ঠ হবেন তাঁরই কণ্ঠে পড়বে জয়মাল্য। অগ্নিদেশের রাজা তাই আকুল হয়েছেন প্রতিযোগিতার বিষয়টি পূর্বাহ্ণে জানার জন্য।

চীন থেকে এসেছেন যুবরাজ। সঙ্গে এনেছেন প্রবল শক্তিমান এক দৈত্যবিশেষকে। যুবরাজের হয়ে সে-ই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে। প্রতিযোগিতায় এ ধরনের অংশগ্রহণে কোন বাধা ছিল না।

পর্বতের সানুদেশে এক সঙ্গীত-শিল্পীর গৃহে কুমারায়ণের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ঐ আত্মভোলা সঙ্গীত-শিল্পীটির তরুণী পত্নী জীবার অন্তরঙ্গ বান্ধবী। সেই সূত্রে শিল্পীর গৃহে শিল্পীর বাসের ব্যবস্থা।

সঙ্গীতস্রষ্টা হিসেবে কুচীদেশের শিল্পীটির তুলনা মেলে না। প্রতি প্রভাত এবং সন্ধ্যায় শিল্পী গৃহসংলগ্ন উদ্যানে সমবেত পাখিদের সম্মেলক কলরব শুনে সুরসৃষ্টির প্রেরণা পেতেন। তাছাড়া প্রতিটি সুকণ্ঠ পাখির স্বরক্ষেপণে সুরসৃষ্টির বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য তিনি লক্ষ করতেন। পর্বতকন্দরে, বালুভূমিতে, বৃক্ষপত্রে বায়ুর শব্দসৃষ্টির পার্থক্য সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন।

একদিন শিল্পী দীর্ঘ সময় অনুপস্থিত দেখে কুমারায়ণ তাঁর খোঁজে পর্বত সানুদেশে গিয়েছিল। সেখানে বহু সন্ধানের পর খোঁজ পাওয়া গেল সুরস্রষ্টার। তিনি একটি প্রপাতের ধারে দাঁড়িয়ে ধারা পতনের ধ্বনি শুনছিলেন আর দুটি ধাতু যন্ত্রের অনুরণন তুলে ধ্বনি মেলাবার চেষ্টা করছিলেন।

কুমারায়ণ যখন অনুরুদ্ধ হয়ে শিল্পীর সামনে বাঁশি বাজিয়ে শোনাত তখন শিল্পী তন্ময় হয়ে তা শুনতেন। নতুন রাগগুলি তুলে নিতেন নিজের সুর সাধনার যন্ত্রে। মাঝে মাঝে বাহবা দিয়ে উঠতেন। কুমারায়ণ যাতে তাঁর গৃহের আতিথ্য ত্যাগ করে চলে না যান সেজন্যে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাতেন। জীবা যে কুমারায়ণের মত এক গুণী শিল্পীকে তাঁর গৃহে কৃপা করে রাখবার সুযোগ করে দিয়েছেন সেজন্যে বার বার কৃতজ্ঞতা জানাতেন জীবার কাছে।

কুমারায়ণের সঙ্গে দেখা করতে আসত জীবা। সে সময় আত্মভোলা শিল্পীটিকে অন্তরালে সরিয়ে নিয়ে যেত তাঁর বুদ্ধিমতী স্ত্রী। জীবা এসে প্রাসাদের খবরাখবর দিত। হূন দস্যুদের কাছ থেকে কিভাবে জীবার দুজন অপহৃত পরিচারিকা রাতের অন্ধকারে আত্মগোপন করে পালিয়ে এসেছিল, কিভাবে তারা পর্বতগুহায়

দিন যাপন করে রাতের বেলা পথ অতিক্রম করত তারই রোমাঞ্চকর কাহিনী একদিন শুনিয়ে গেল জীবা। মেয়েগুলির ওপর কোন অত্যাচার নাকি হূন দস্যুরা করেনি। তারা পারস্যের বণিকদের কাছে ওদের বিক্রয় করে দেবার জন্য নিয়ে যাচ্ছিল।

জীবার সঙ্গে কুমারায়ণের মাঝে মাঝে রাজকুমারীর প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা হত।

কুমারায়ণ বলত, স্বয়ম্বরার অনুষ্ঠান তোমার সখী কিভাবে নিয়েছেন জীবা?

গুরু ধর্মমতির ইচ্ছাকে সখী শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন।

কুমারায়ণ প্রশ্ন তুলত, যদি রাজকন্যার অমনোনীত সেই চীনের যুবরাজ কিংবা অগ্নিদেশের রাজা বিজয়ী হন তাহলে তাঁদের কিভাবে গ্রহণ করবেন তোমার সখী?

জীবার উত্তর, প্রভু বুদ্ধের করুণার ওপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস। তিনি মনে করেন যথার্থ যোগ্যতম প্রার্থীই তাঁর জীবনকে ধন্য করার জন্য আসবেন।

স্বয়ম্বর সভার আর মাত্র সপ্তাহকাল বাকি। প্রতিযোগীরা চতুর্দিক থেকে এসে সমবেত হয়েছেন প্রাসাদে। তাঁরা শুভদিনটির জন্য অপেক্ষা করছেন দুরু দুরু বক্ষে।

জীবা এলো কুমারায়ণের সঙ্গে দেখা করতে। মুখখানি তার জলগর্ভ মেঘের মত থমথম করছে।

কুমারায়ণ সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে, কি হল জীবা? তোমাকে এমন বিমর্ষ তো কোনোদিন দেখিনি?

জীবা দুটি হাত জড়িয়ে ধরে কুমারায়ণের। চোখ দুটো তার অশ্রুভারে টলমল করছে।

বল জীবা, কি হয়েছে তোমার?

আগে তুমি কথা দাও, আমার একটি কথা রাখবে?

আমি তোমাকে গভীরভাবে বিশ্বাস করি জীবা, তাই কোন প্রশ্ন না করেই কথা দিচ্ছি, তোমার কথা রাখব।

জীবা বলল, আমার সখী বড়ই বিপন্ন হয়ে পড়েছেন কুমার। তোমার সাহায্য ছাড়া তাঁর উদ্ধারের আর কোন উপায় নেই।

কি বিপদ জীবা?

দক্ষিণদেশের একটি মানুষের সঙ্গে তীর্থযাত্রায় তাঁর দেখা হয়। পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। বড় বিদ্বান, বড় গুণী সেই মানুষ, কিন্তু একেবারে নিরহঙ্কার।

অধীর কুমারায়ণ বলে, এখন সমস্যা কোথায় জীবা?

সখীর সেই পুরুষপ্রবর এখনও জানেন না যে তাঁকে স্বয়ম্বরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে রাজভগিনীকে জয় করতে হবে।

এ তোমার সখির অত্যন্ত অবিবেচনার কাজ হয়েছে জীবা। তাঁকে যথাসময়ে সংবাদ দেওয়া উচিত ছিল।

সখীর এখনও ধারণা প্রভু বুদ্ধ তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন।

ক্ষুব্ধ কুমারায়ণ বলে, প্রভুর প্রতি বিশ্বাস রাখা ভাল কিন্তু নিষ্ক্রিয় থাকা নির্বোধের কাজ।

একটু থেমে কুমারায়ণ আবার বলে, মহামান্য রাজভগিনীর প্রতি কোনোরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা আমার পক্ষে শোভনও নয়, সমীচীনও নয়। এখন বল জীবা আমার মত ক্ষুদ্র মানুষ তাঁর কি উপকারে আসতে পারে।

তুমি ক্ষুব্ধ হোয়ো না কুমার, তাহলে কোনো প্রার্থনাই আমি তোমার কাছে আর সহজভাবে জানাতে পারব না।

তুমি নিশ্চিন্তে বল জীবা, আমি সাধ্যমত সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত।

শোন কুমার, এই প্রতিযোগিতায় একাধিক রাজা, মহারাজা নিজেরা অংশগ্রহণ না করে তাঁদের প্রতিনিধি নিয়োগ করবেন। এই ব্যবস্থা নিয়ম বহির্ভূত নয়। আমার সখীর প্রিয় মানুষটির প্রতিনিধি হয়ে তুমি যদি প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ কর তাহলে তিনি তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবেন।

তাতে আমি প্রস্তুত, কিন্তু যাঁরাই প্রতিনিধি নিয়োগ করবেন তাঁরা তো সকলেই স্বয়ং উপস্থিত। তোমার

বান্ধবীর পুরুষপ্রবরটি এখনও অনুপস্থিত, তাতে চতুর্দিকে গুঞ্জন কিংবা প্রশ্ন উঠতে পারে। সে ক্ষেত্রে পুরো স্বয়ম্বর সভাটাই একটা রণক্ষেত্রে পরিণত হতে পারে।

জীবা ক্ষণকাল চিন্তা করে বলল, এ দিকটা ভেবে দেখিনি কুমার। তোমার অনুমান সত্য হতে পারে। তাহলে এখন উপায়!

জীবা ও কুমারায়ণ চিন্তায় মগ্ন হল!

জীবা সহসা বলে উঠল, একটা উপায় হতে পারে কুমার, অবশ্য যদি তুমি অনুগ্রহ করে রাজী হও।

অনুগ্রহের কথা বলছ কেন জীবা? তোমার সখীর জন্য কিছু করতে পারলে কৃতার্থ হই।

তুমি নিজেই প্রতিযোগিতার প্রার্থী হিসেবে যোগ দাও। তুমি জয়ী হলে রাজকুমারী তোমার অধিকারে আসবে, তখন তুমি তাকে তোমার ইচ্ছামত দান করতে পারবে।

কুমারায়ণ কিছু সময় নীরব থেকে বলল, জীবা, একি খুব সঙ্গত প্রস্তাব হল? আমি রাজকুমারীকে অর্জন করে অন্যকে দান করব, একি নিয়মবহির্ভূত কাজ হবে না?

জীবা বলল, আমি তোমাদের ভারতীয় মহাকাব্য মহাভারত পাঠ করেছি। সেখানে ভীষ্মদেব এমনি কাজই করেছিলেন।

কুমারায়ণ সামান্য সময় চিন্তা করে বলল, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক জীবা। এখানে আমার কোনো নিজস্ব মতামত থাকতে পারে না।

স্বয়ম্বরার দিন চতুর্দিকে লোকে লোকারণ্য। শিক্ষায় দীক্ষায়, শিল্প-সংস্কৃতি-চর্চায় কুচীর নাম বহুদূর পরিব্যাপ্ত। সমস্ত প্রাসাদ এবং নগরী শিল্পীদের অক্লান্ত চেষ্টায় পরম শোভাময় হয়ে উঠেছে। কুমারায়ণের বন্ধু শিল্পীটির ওপর ভার পড়েছে সঙ্গীত পরিবেশনের। সম্মেলক ও একক সঙ্গীত তাঁরই পরিচালনায় প্রস্তুত হয়েছে।

নৃত্য প্রদর্শনেরও ব্যবস্থা আছে। সঙ্গীত পরিচালকের পত্নী ও জীবা কুচীর তরুণী কন্যাদের নৃত্য শিক্ষা দিয়ে অনুষ্ঠানের উপযুক্ত করে তৈরি করেছে।

প্রতিটি সুযোগ্য প্রতিযোগীকে সজ্জিত সভামণ্ডপে নিয়ে আসছে একজন করে তরুণ। শুভ্র পোশাকে তাদের দেবদূতের মত মনে হচ্ছে। তাদের তূণীরে তীর, হাতে ধনু। চন্দ্রাতপের তলায় নির্দিষ্ট আসনে বসান হচ্ছে প্রতিযোগীকে। তরুণরা ধনু আর তুনীভরা তীর রেখে যাচ্ছে তাদের পাশে।

এবার শুরু হবে প্রতিযোগিতা। সভামণ্ডপের সম্মুখে বিস্তীর্ণ ময়দান। ঘন সবুজ শষ্পে আচ্ছাদিত। তার মাঝে দুটি লৌহদণ্ড পরস্পরের থেকে বেশ খানিক ব্যবধানে প্রোথিত। একটি লৌহ রজ্জু দুটি দণ্ডের মাঝে টেনে বাঁধা হয়েছে। এখন বিংশতিটি রৌপ্য বলয় ঐ রজ্জুতে নির্দিষ্ট দূরত্বে সংলগ্ন। এমনভাবে বলয়গুলি রাখা হয়েছে যার মধ্যদিয়ে ফলাযুক্ত একটি তীর চলে যেতে পারে। ঐ বিংশতিটি রৌপ্য বলয়ের একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। রাজভগিনী বিংশতি বর্ষেই পদার্পণ করেছেন।

প্রতিযোগী অশ্বে আরোহণ করে প্রান্তর প্রদক্ষিণ করবেন দ্রুত লয়ে। তারপব সহসা অশ্বকে চিহ্নিত একটি রেখার সামনে এনে দাঁড় করাবার সঙ্গে সঙ্গেই শর নিক্ষেপ করবেন। ঐ শর বলয়গুলির ছিদ্রপথ ভেদ করে চলে যাবে। তীরটি বলয় ভেদ করে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে একটি দোদুল্যমান সূত্রকে ছিন্ন করবে। ঐ সূত্রের প্রান্তে বাঁধা একটি ফল গড়িয়ে পড়বে মাটিতে।

দ্বিতীয় প্রতিযোগিতা অসিযুদ্ধ। পরস্পরের দেহে বিন্দুমাত্র আঘাত না করে অসিযুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। অসি হস্তচ্যুত হলে প্রতিযোগী পরাজিত বলে সাব্যস্ত হবে। শেষ পর্যন্ত যার হাতে অসি থাকবে সেই হবে বিজয়ী।

এরও একটি তাৎপর্য আছে। সংসারে বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে তাদের নিরস্ত্র করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

তৃতীয় এবং শেষ প্রতিযোগিতাটি অভিনব। বুদ্ধের উপদেশ ও বাণী সম্বলিত গ্রন্থ সূত্রপিটকের কয়েকটি পত্র একটি রক্তকষায় বর্ণের রেশমী বস্ত্রে আবৃত করা হয়েছে। প্রাসাদের শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্বেত পারাবতগুলি

একটি রজ্জুতে সেই পুঁথিটি বহন করে নিয়ে যাবে শূন্য মার্গে। অশ্বারোহী প্রতিযোগীকে শর নিক্ষেপে ঐ রজ্জুটিকে ছিন্ন করে ধর্মগ্রন্থটিকে মৃত্তিকায় পতনের আগেই লুফে নিতে হবে।

এই প্রতিযোগিতাটির তাৎপর্য, ধর্মকে রক্ষা করতে হবে পতনের হাত থেকে।

প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল।প্রথম প্রতিযোগিতায় কেবলমাত্র দুজন বিশটি রৌপ্য বলয় ভেদ করে সূত্রে দোদুল্যমান ফলটিকে মাটিতে ফেলতে সমর্থ হল। একজন অগ্নিদেশের রাজা, অন্যজন কুমারায়ণ। তারা প্রথম প্রতিযোগিতায় সমান শক্তিধর বলে ঘোষিত হল।

দ্বিতীয় প্রতিযোগিতায় চীনের প্রতিনিধি মহাবিক্রমে আঘাত হেনে অগ্নিদেশের রাজার তরবারি হস্তচ্যুত করে দিল। এদিকে দ্বাদশজন অস্ত্র চালনা করতে করতে অবশিষ্ট রইল দুজন মাত্র, কুমারায়ণ আর চীনযুবরাজের প্রতিনিধি।

দীর্ঘক্ষণ অসিযুদ্ধ চলল দুজনের। ক্রীড়াক্ষেত্র ছাড়িয়ে সংলগ্ন পর্বত সানুদেশ পর্যন্ত প্রসারিত হল সে সংগ্রাম। অবশেষে কুমারায়ণের অসি হস্তচ্যুত হয়ে উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হল! সঙ্গে সঙ্গে কল্পনাতীত ক্ষিপ্রতায় সে অসি মৃত্তিকা স্পর্শ করার পূর্বেই ধরে নিল কুমারায়ণ। কিন্তু চীনের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠল। বিচারকেরা দ্বিমত পোষণ করলেন।

কুমারায়ণ কিন্তু স্বীকার করে নিল তার পরাজয়। একটি ভীতত্রস্ত ধাবমান মুষিককে পদাঘাত থেকে রক্ষা করতে গিয়ে যে মুহূর্তকাল মাত্র সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল তারই পূর্ণ সুযোগ নিয়ে চীনের প্রতিনিধি তাকে পরাজিত করল।

এখন শেষ প্রতিযোগিতার প্রতিদ্বন্দ্বী রইল মাত্র তিনজন। কারণ অন্য প্রতিযোগীরা দুটির মধ্যে একটিতেও জয়লাভ করতে না পারায় তৃতীয় প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। প্রতিযোগীর সংখ্যা হ্রাসের জন্য পূর্বাহ্ণেই ঘোষিত হয়েছিল এই নিয়ম।

এখন প্রাসাদশীর্ষ দিক থেকে তিন ঝাঁক পারাবত পর্যায়ক্রমে উড়ে আসবে রজ্জুতে বাঁধা গ্রন্থ নিয়ে। প্রথমে অগ্নিদেশের রাজা, পরে চীনের প্রতিনিধি, সর্বশেষে কুমারায়ণ অংশগ্রহণ করবে প্রতিযোগিতায়।

অগ্নিদেশের রাজা শরাঘাতে রজ্জু ছিন্ন করলেন। বিদ্যুৎ গতিতে অশ্ব ছুটিয়ে নিয়ে গেলেন, কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারলেন না। বস্ত্রখণ্ডে বাঁধা পুঁথি ভূমি স্পর্শ করল।

চীনের প্রতিনিধি ছিন্ন করলেন রজ্জু, পড়ন্ত পুঁথিটিকে স্পর্শও করলেন কিন্তু ধরে রাখতে পারলেন না।

কুমারায়ণ তদগত চিত্তে বুদ্ধের নাম স্মরণ করে সমস্ত দেহমন একাগ্র করল। প্রাসাদ-শীর্ষে সখী পরিবৃতা রাজকন্যাও তখন প্রভু বুদ্ধের নাম জপ করছিলেন।

শেষবারের মত গ্রন্থখানি নিয়ে উড়ে আসছে পারাবতের ঝাঁক। অনুত্তেজিত কুমারায়ণ অনায়াস দক্ষতায় তীর ছুঁড়ল। সঙ্গে সঙ্গে যেন একটি উড়ন্ত অশ্ব উড়ন্ত পারাবতগুলির দিকে এগিয়ে গেল। সূত্রপিটক গ্রন্থখানি পক্ক ফলের মত খসে পড়ল অশ্বে উপবিষ্ট কুমারায়ণের করপুটে।

ভারতীয় পরিব্রাজক এই তরুণের বিস্ময়কর বিজয়ে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে জয়ধ্বনি দিতে লাগল কুচীবাসী নরনারী। প্রাসাদশীর্ষে মুদ্রিত দুটি নয়ন খুলে গেল রাজকন্যার। সহচরীরা উল্লাস প্রকাশ করতে লাগল রাজকন্যাকে ঘিরে।

এরপর প্রসাধিত হয়ে সভামণ্ডপে একে একে প্রতিযোগী এসে আসন গ্রহণ করলেন। জনতা এই বিশিষ্ট অতিথিদের ঘিরে দাঁড়াল। এখন শুরু হবে আসল অনুষ্ঠান। বিজয়ী বীর লাভ করবে রাজকন্যার জয়মাল্য। বেড়ে উঠল নেপথ্য সঙ্গীতের সুর। তরুণীরা রাজহংসীর মত লীলায়িত ছন্দে জনতার হৃদয়ে তরঙ্গ তুলে প্রবেশ করল সভামঞ্চে। তারা সঙ্গে নিয়ে এলো কুচীর সেরা সুন্দরী ও বিদুষী রাজকন্যাকে।

মহারাজ রজতপুষ্প ভগিনীর হাত ধরে সভা প্রদক্ষিণ করালেন।

ধীর পায়ে রাজকন্যা এগিয়ে এলেন অর্ঘ নিয়ে। আরতি সমাপ্ত করলেন কুমারায়ণের। কুমারায়ণ নতমুখে চেয়ে আছে মৃত্তিকার দিকে। জীবার অনুরোধ রক্ষা করতে পেরেছে, এই পরিতৃপ্তিতে সে আজ পূর্ণ। এখন রাজকুমারীকে তাঁর প্রার্থিত পুরুষের হাতে তুলে দিতে পারলেই তার এতখানি প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ

সার্থক হয়ে উঠবে।

হঠাৎ রাজকন্যার হাতের মালা তার কণ্ঠে এসে পড়তেই কুচীবাসী জনতা জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল। অমনি চোখ তুলে তাকাল কুমারায়ণ। রাজকুমারীর স্বর্ণ থালিকায় আর একখানি মালা তারই অপেক্ষায় পড়ে রয়েছে।

এবার রাজকুমারীকে মাল্যদান করতে হবে। থালা থেকে মালাটি তুলে নিয়ে সসঙ্কোচে পরাতে গিয়ে থেমে গেল কুমারায়ণের হাত। স্থির হয়ে রইল আঁখির তারা।

মুখোমুখি দুটি নীল চোখে তখন হাসির ঝিলিক।

অস্ফুট স্বরে কুমারায়ণ বলল, তুমি!

হ্যাঁ, আমি রাজকন্যা জীবা, রাজভগিনীও বটে। থেমে গেলে কেন কুমার, মালা দেবে না আমার গলায়?

একি বিস্ময়! একি অভাবনীয় রোমাঞ্চ! কুমারায়ণ পরম অনুরাগে তার বধূর কণ্ঠে পরিয়ে দিল মালা।

রাত্রে প্রাসাদে পাশাপাশি শুয়ে জীবার হাতখানা বুকের ওপর টেনে নিয়ে কুমার বলল, গোদান থেকে কুচীর পথযাত্রা আমাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে জীবা। তোমার ছলনাও।

ছলনা কোনো কোনো ক্ষেত্রে মধুর হয় কুমার।

কিন্তু জীবা আমি তো জয়ী নাও হতে পারতাম, —অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করে কুমারায়ণ।

তোমার শক্তির ওপর আমার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। প্রতিযোগিতার সময় আমি আঁখি বন্ধ করে প্রভু বুদ্ধকেই শুধু স্মরণ করেছি।

দেখ কি আশ্চর্য, সিদ্ধার্থ গোপাকে ত্যাগ করে পথে নেমে এলেন আর আমি জীবাকে গ্রহণ করে সংসারে প্রবেশ করলাম।

গুরু ধর্মমতি তো তোমাকে বলেই ছিলেন, গৃহীর জীবন তোমাকে যাপন করতেই হবে।

সত্যিই তিনি ত্রিকালদর্শী।

জান কুমার, অগ্নিদেশের রাজা কামকান্তি গত সন্ধ্যাতেই প্রাসাদ ত্যাগ করে গেছেন।

কুমারায়ণ বলল, যাত্রার আগেই আমার সঙ্গে দেখা করে তাঁর রাজ্যে যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে গেছেন এবং একটি প্রলোভনও দেখিয়েছেন।

কি রকম?

কুচী থেকে উত্তরাপথ ধরে চীন সাম্রাজ্যের তুন হোয়াং-এ যেতে গেলে অগ্নিদেশ থেকেই নাকি যথার্থ মরুভূমির শুরু। ঐ পথে না এগিয়ে দক্ষিণের রেশম-পথের দিকে চললে মরুভূমির মধ্যে এক বিস্ময়কর হ্রদের সন্ধান পাওয়া যাবে। ঐ হ্রদ কখনো পূর্ণ, কখনো শূন্য। সীতা নদীর জল মরুভূমির ভেতর দিয়ে এসে ঐখানেই পড়ছে। কোনো ঋতুতে জলোচ্ছ্বাসে হ্রদটি ভরে উঠছে, কোনো ঋতুতে বা তাকে শুষে নিচ্ছে মরুভূমির তৃষ্ণা। এখন ঐ লবণ হ্রদের (লবনোর)তীরে একটি ক্ষুদ্র বনভূমি গড়ে উঠেছে। ঐ বনভূমিতে মৃগয়ার আমন্ত্রণ জানিয়ে গেলেন অগ্নিদেশের রাজা।

তুমি কি উত্তর দিয়েছ?

গ্রহণ করেছি তাঁর আমন্ত্রণ। তবে জানিয়েছি, অচিরে সম্ভব না হলে অদূর ভবিষ্যতে অবশ্যই যাব। মৃগয়ার চেয়ে মরুভূমি অতিক্রমের রোমাঞ্চ আমার কাছে অধিক আকর্ষণীয়।

জীবা কোনো মন্তব্য না করে বলল, কামকান্তি যাত্রার আগে আমার সঙ্গেও দেখা করেছিলেন।

তোমাদের পুরোনো বন্ধু, দেখা করে যাওয়াই স্বাভাবিক।

তিনি আমাকে বহুমূল্য একটি বজ্রমণিখচিত (হীরক) অঙ্গুরীয় দিয়ে গেছেন।

কুমারায়ণ কোনো মন্তব্য করল না।

জীবা আবার বলে, অঙ্গুরীয়টি আমার হাতে উপহার হিসেবে তুলে দিয়ে বললেন, বিজয়ী হয়ে এটি

অঙ্গুলীতে পরিয়ে মহারানীর মর্যাদায় রাজ্যে নিয়ে যাব ভেবেছিলাম, কিন্তু বিধি বাম হল। এখন যা তোমাকে নিবেদন করব বলে এনেছি তা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারব না। তোমার হাতেই তুলে দিয়ে যাচ্ছি, ইচ্ছে হলে গ্রহণ কর না হলে বিলিয়ে দিও পথের কোনো ভিক্ষাজীবীকে।

কুমারায়ণ উঠে বসল শয্যায়।

নিশ্চয়ই তুমি অঙ্গুরীয়টি সবিনয়ে গ্রহণ করেছ?

জীবা দ্বিধা জড়িত গলায় বলল, ইচ্ছা না থাকলেও প্রত্যাখ্যান করতে পারিনি কুমার।

উপযুক্ত কাজ করেছ জীবা। প্রত্যাখ্যান করলে তুমি তোমার মনুষ্যত্বের অবমাননা করতে। সত্যি, আমি এতগুলি প্রতিযোগীর নিরাশার কারণ হয়েছি বলে নিজেকে অপরাধী মনে করছি।

এতে অপরাধ কিছু নেই কুমার। জগতে আশা থাকলেই নিরাশাও থাকবে। সকলের প্রত্যাশা কোনদিনই একসঙ্গে পূর্ণ হবার নয়।

শোন জীবা, চীনের যুবরাজ আমাকেও একটি উপহার দিয়েছেন।

কৌতূহল জীবার কণ্ঠে, কি উপহার কুমার?

যে অসির আঘাতে তাঁর প্রতিনিধি আমাকে পরাভূত করেছিলেন, সেই অসি।

জীবা নীরব। কুমারায়ণ বলল, অসিটি আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে চীনের যুবরাজ সহাস্যে বললেন, এটি কাছে থাকলে চরম গর্বের দিনেও কিছুটা বিনীত থাকতে পারবেন।

জীবা বলল, অসি দানের ভেতর প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপটা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ। কোন উত্তর দাওনি যুবরাজের কথায়?

দিয়েছি জীবা, আমার মত করে দিয়েছি। বলেছি, আপনার কথা মনে থাকবে। যদি কখনো গর্ব করার দিন আসে তাহলে তা যেন এমন গর্ব হয় যাতে এ বিশ্বের সকলেরই অংশ থাকে।

জীবা কুমারায়ণকে জড়িয়ে ধরে বলল, তুমি নইলে এমন উত্তর কে দেবে কুমার।

প্রভাতে চীনের যুবরাজ দেশে ফিরে যাবার সময় কুচীশ্বরকে একটি আলেখ্য উপহার দিয়ে গেলেন। চীনপট্টের ওপর অঙ্কিত বিশাল এক কল্পিত পক্ষযুক্ত সরীসৃপ। নাসা থেকে নির্গত হচ্ছে ভয়ঙ্কর অগ্নি।

বিজ্ঞ মন্ত্রীরা বললেন, শুনেছি এই সরীসৃপ চৈনিকদের কাছে একটি শুভ লক্ষণ। কিন্তু যে প্রতীক চীনের পক্ষে শুভ, তা অন্যের পক্ষে অশুভ হওয়া অসম্ভব নয়। সরীসৃপের নাসারন্ধ্র থেকে নির্গত অগ্নি যে একদিন কুচীরাজ্য পর্যন্ত পৌঁছবে না, তার কি নিশ্চয়তা আছে।

কুচীশ্বর মন্ত্রীদের ব্যাখ্যা শুনে বললেন, আপনাদের ব্যাখ্যা বিজ্ঞজনোচিত। আমার মনে হয় চীনের যুবরাজ অনেক ভেবেচিন্তে দেশ থেকে এই চিত্রটি এনেছিলেন। স্বয়ম্বর সভায় পরাভূত হলে এই চিত্রখানি উপহার দিয়ে যাবেন, এই ছিল তাঁর অভিপ্রায়! অর্থাৎ কুচীর সঙ্গে চীনের নিরন্তর সংগ্রাম।

মন্ত্রীরা বললেন, আমরা সেই আশঙ্কাই করছি।

এতে আশঙ্কার কিছু নেই। রাজ্য থাকলেই শত্রুর সঙ্গে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। প্রস্তুতিতে ভাটার টান পড়লেই অন্য দিক থেকে প্রবল জোয়ার উঠে আসবে।

ঘণ্টাধ্বনি হয়। পর্বত-সংলগ্ন বিহারে নির্দিষ্ট সময় অন্তর ঘণ্টা বাজতে থাকে। শত শত ভিক্ষু ঐ ঘণ্টাধ্বনির নির্দেশে প্রায় নিঃশব্দে সমস্ত কাজ সমাধা করে। মহারাজ রজত পুষ্প এই বিপুলায়তন বিহারের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেন।

মহাভিক্ষু রত্নসম্ভব বাহ্লীক থেকে এসে কুচী-বিহারের অধ্যক্ষের আসনে বসেছেন। তিনি গান্ধারের বেশ কয়েকজন শিল্পী ও ভাস্করকে সঙ্গে এনেছেন। তার মধ্যে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ভারতীয় শিল্পীর সংখ্যাই বেশী। তারা এখন কুচীর অন্তর্গত কিজিলের পর্বতগুহায় বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ ও বুদ্ধ-কাহিনীর চিত্রাঙ্কনে ব্যস্ত।

কুমারায়ণকে কুচীশ্বর রাজপুরোহিতের মহাসম্মান দান করেছেন। মহারাজ রজতপুষ্প ভগিনীগত প্রাণ। নিজের কোন সন্তানাদি না থাকায় সমস্ত স্নেহ ভালবাসা নির্ঝরের মত নিরন্তর ঝরে পড়ছে জীবার ওপর।

জীবা বৌদ্ধ ভিক্ষুণী সঙ্ঘের প্রাণ। নিত্য যাতায়াত তার ভিক্ষুণী বিহারে। বৌদ্ধ গ্রন্থের আলোচনা ও

অনুবাদে তার সক্রিয় অংশগ্রহণ সুবিদিত। এতখানি পাণ্ডিত্য ও বিচক্ষণতা বৌদ্ধ মহাসঙ্ঘের খুব কম ভিক্ষুরই রয়েছে।

জীবা কুমারায়ণের সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করে গভীর আনন্দ পায়। সারাদিনের অধিকাংশ সময়ই তার স্বামীর কাছে বেদ, উপনিষদের পাঠ গ্রহণে কাটে। কুসংস্কার থেকে মুক্ত তাদের মন। তাই সর্বধর্মের সকল শাস্ত্রের প্রতি তাদের অনুরাগ। গ্রহণে, বর্জনে, মঙ্গল চিন্তায় তারা দুটিতে একাত্ম।

খবর আসে গুপ্তচরের মুখে, অগ্নিদেশ চীন বাহিনীর বশ্যতা স্বীকার করে আত্মরক্ষায় সমর্থ হয়েছে। এখন সৈন্যবাহিনী এগিয়ে আসছে কুচীর পথে।

মহারাজ রজতপুষ্প গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে যান। মন্ত্রী আর সেনাপতিদের সঙ্গে দিবারাত্রি চলে পরামর্শ। স্থির হয় চীন বাহিনীকে প্রবল বিক্রমে প্রতিরোধ করবে কুচীর রাজশক্তি। বশ্যতা স্বীকার করে চীন সাম্রাজ্যের অধীনস্থ সামন্ত রাজার স্বীকৃতি লাভ করার চেয়ে যুদ্ধে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হওয়াও শ্রেয়।

সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে নগরীর দিকে দিকে। ত্রস্ত নগরবাসীরা ভীড় জমায় পথেঘাটে।

কুমারায়ণ আর জীবা রাত্রি দিন ঘুরে ঘুরে তাদের মনে সাহস যোগায়।

শয্যায় শুয়ে ঘুম আসে না কুমারায়ণের চোখে।

জীবাকে ধরে বলে, জান জীবা, এই স্বয়ম্বরার অনুষ্ঠানই যত বিপত্তির কারণ হল।

এ কথা কখনো উচ্চারণ করো না কুমার। দাদা শুনলে গভীর ব্যথা পাবেন। মহারাজ রজতপুষ্প সত্যকে আড়াল করে বিবেককে কখনো বিক্রয় করবেন না।

দেখ জীবা, রাজায় রাজায় আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপিত হলে রাজ্য আক্রান্ত হবার আশঙ্কা থেকে রক্ষা পায়। আমাদের দেশে সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের পিতা মহারাজাধিরাজ চন্দ্রগুপ্ত এই পথই অনুসরণ করেছিলেন। তিনি শক্তিশালী লিচ্ছবী গণরাষ্ট্রের কন্যা কুমার দেবীকে বিবাহ করেছিলেন। তার ফলে তাঁর পুত্র সম্রাট সমুদ্রগুপ্তকে শক্তিশালী রাজাদের দ্বারা আক্রান্ত হতে হয়নি। উপরন্তু শক্তিশালী মাতুল বংশের সঙ্গে যুক্ত থাকায় তিনি প্রভূত ক্ষমতাধর হয়েছেন।

জীবা বলল, বিশাল চীনের বিপুল সৈন্যবাহিনী আমাদের নেই কিন্তু সংগ্রামের দুটি হাতিয়ার আমাদের আছে। একটি, সৈন্যদের অদম্য মনোবল, যা দেশকে ভালবাসা থেকে জন্মেছে, আর অন্যটি, পার্বত্য পরিবেশ, যা যুদ্ধের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল।

কুমারায়ণ বলল, জীবা, ওরা কিজিলের গিরিসঙ্কট পার হয়ে কুচীর সমভূমিতে প্রবেশ করবে। আমি কিজিলেই ওদের প্রতিহত করবার একটা পরিকল্পনা নিয়েছি।

বিস্মিত জীবা বলল, তুমি! তুমি যুদ্ধের পরিকল্পনা নিয়েছ? কি বলছ কুমার!

হ্যাঁ জীবা, এতে তোমার সামান্য সাহায্য চাই।

কি পরিকল্পনা তোমার, এবং তাতে আমাকেই বা কি ধরনের সাহায্য দিতে হবে বল?

তোমার শিক্ষিত পারাবত দু'একটি কাজে লাগবে আমার।

জীবা বলল, তোমার যতগুলি দরকার তাই পাবে তুমি।

এ যুদ্ধে আমার ভূমিকা হবে, রাজপ্রাসাদের পারাবতকূলের রক্ষক ও শিক্ষাদাতা।

এরপর জীবা নিবিষ্ট হয়ে শুনল কুমারায়ণের পরিকল্পনা।

সব শুনে বলল, তোমার জীবন-সংশয় হতে পারে কুমার।

যুদ্ধে সবারই যখন জীবন-সংশয় তখন তার থেকে নিজেকে মুক্ত রাখি কি করে বল? আমি কুচীবাসীর একান্ত আপনার জন হতে চাই।

তুমি তো তাই।

না জীবা, শিল্পীর বাড়ি থেকে আজ সন্ধ্যায় ফেরার সময় নিজের কানে নাগরিকদের সমালোচনা শুনেছি।

কি রকম?

স্বয়ম্বরসভায় চীন-যুবরাজের পরাজয়কেই তারা এ যুদ্ধের কারণ বলে অনুমান করছে। আর পরোক্ষভাবে এ জন্য আমাকেও দায়ী করছে।

জীবা ক্ষণকাল স্থির থেকে বলল, প্রভুর দয়ায় ওরা যেন একদিন নিজেদের ভুল বুঝতে পারে।

কিজিলের পাহাড় কেটে গুহামন্দির তৈরির কাজ চলছে। ভারতীয় স্থপতি ও ভাস্করদের নির্দেশে শত শত শ্রমিক পাহাড়ের দুই প্রান্ত বিদীর্ণ করে গুহা তৈরির কাজে ব্যস্ত। মৃত্তিকার অভ্যন্তরে মুষিকের শতমুখ গর্তের মত তারা পাহাড়ের অভ্যন্তরে নির্মাণ করে চলেছে সুড়ঙ্গ পথ। ভারতভূমির সন্তান, প্রধান স্থপতি হিরণ্যগর্ভ। তারই নির্দেশে প্রস্তর বিদীর্ণ করে চলেছে সুড়ঙ্গ নির্মাণের কাজ।

কুমারায়ণের পরিচয় পেয়ে স্থপতি হিরণ্যগর্ভ যেন আপনজন লাভের আনন্দ অনুভব করছে। সুদূর পাটলিপুত্র থেকে স্থপতি প্রথম যৌবনে এসেছিল গান্ধারে। সেখানে কিছুকাল শিক্ষালাভ করে কুভা নদীর উপত্যকা বেয়ে এসে পৌঁছেছিল নগরহারে। সেখান থেকে সার্থবাহের পায়ে চলা পথে আরও এগিয়ে এসে পৌঁছেছিল কপিশায়। সে সময় গান্ধারের চেয়ে কপিশা ছিল আরও সমৃদ্ধশালী। ভারতবর্ষ থেকে উত্তরবাহিনী প্রধান পথ কপিশা হয়ে বাহ্লীক ও অন্যান্য দেশে পৌছেছে। হিরণ্যগর্ভ কপিশা থেকে দুর্গম কুশান উপত্যকা পেরিয়ে একসময় বাহ্লীকে এসে পৌঁছায়। বাহ্লীকেই কেটে যায় তার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি। সেখানে স্থপতি বিদ্যায় সে লাভ করে চরম উৎকর্ষ। কর্মের মধ্যে নিজেকে নিবেদন করে সংসারজীবন যাপনের কথা সে একেবারেই ভুলে যায়। প্রৌঢ়ত্বের প্রারম্ভে হিরণ্যগর্ভ বাহ্লীকের মহাশ্রমণ রত্নসম্ভবের কাছে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে। তারপর কুচীর বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ হয়ে আসার সময় যে স্থপতি ও ভাস্করের দলটিকে রত্নসম্ভব সঙ্গে এনেছিলেন তাদের সঙ্গেই এসেছিল হিরণ্যগর্ভ। এখন নিজের কৃতিত্বে সে শ্রেষ্ঠ স্থপতির আসন লাভ করেছে।

অসমবয়সী কুমারায়ণকে পুত্রের মত স্নেহের চোখে দেখে হিরণ্যগর্ভ, আবার বন্ধুর মত তার সঙ্গে আলাপ আলোচনায় মত্ত হয়।

দুদিন আগে একটি বিষয় নিয়ে দুজনের ভেতর গূঢ় এক পরামর্শ হয়ে গেছে। কিজিলের পর্বত বিদীর্ণ করা সুড়ঙ্গ-পথগুলির প্রত্যেকটি ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করেছেন দুজনে। তারপর পরস্পরকে শুভকামনা জানিয়ে বিদায় নিয়েছে তারা।

কিজিলের কাছাকাছি এসে থেমে দাঁড়াল চীনের পুরোবাহিনী।

অদূরে, যেখানে বালু প্রান্তর শুরু হয়েছে সেখানে দাঁড়িয়ে তিনটি সাধারণ মানুষ কি নিয়ে যেন বিবাদ শুরু করেছে।

অশ্বারোহী চীনা সেনাপতি ইঙ্গিতে ওদের কাছে ডাকলেন। আঞ্চলিক অধিবাসীদের কাছ থেকে কিছু তথ্য সংগ্রহ করাই তাঁর উদ্দেশ্য।

ওরা কাছে গিয়ে যথারীতি অভিবাদন জানাল। ওদের দেখে মনে হল ওরা ভয়ে কাঁপছে।

সেনাপতি প্রশ্ন করলেন, কি করছ তোমরা এখানে? কি তোমাদের পরিচয়?

দুজন পরস্পরের মুখের দিকে নির্বোধের মত তাকাতে লাগল। বোঝা গেল তারা সেনাপতির ভাষা বোঝেনি।

তৃতীয়জন চীনে ভাষাতেই উত্তর করল, মহাশয়, লৌহ খনিত্র হাতে যে ব্যক্তিটিকে আপনি দেখছেন উনি কিজিলের পাহাড়ে সুড়ঙ্গ নির্মাণের কাজে নিযুক্ত।

সেনাপতির প্রশ্ন, পর্বতে সুড়ঙ্গ নির্মাণ কেন?

বৌদ্ধ গুহা-মন্দির তৈরির কাজ চলেছে। রাজপ্রাসাদ থেকে গুপ্ত কয়েকটি সুড়ঙ্গ পথ কিজিলের বৌদ্ধ গুহা-মন্দির পর্যন্ত নির্মাণ করা হয়েছে। নতুন সঙ্ঘারামে উৎসব হলে যাতে প্রাসাদের রানী মহল থেকে রানীরা সহজে আসতে পারেন।

সঙ্ঘারাম কি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে?

সব কাজই শেষ। সামনের পূর্ণিমা তিথিতে নব সঙ্ঘারাম প্রতিষ্ঠার কথা কিন্তু যুদ্ধের জন্য সব অনুষ্ঠানই বন্ধ হয়ে গেছে।

তুমি কে? তুমি এতসব কথা জানলে কি করে?

মহামান্য বলাধ্যক্ষ, আমি ভারতীয় পক্ষীতত্ত্ববিদ, কুচীর রাজপ্রাসাদে রাজকীয় পারাবতদের শিক্ষাদানের কাজ নিয়ে এসেছি। ঐ সুড়ঙ্গবিদটিও ভারতীয়। আমার পূর্ব পরিচিত।

আর ঐ তৃতীয়জন, তোমাদের ভেতর সবচেয়ে যে বয়োবৃদ্ধ? যার হাতে বাজপাখি রয়েছে?

ওর সঙ্গে আমাদের কোনো পরিচয় নেই মহাশয়। শিকারী বাজ নিয়ে পাখি ধরাই ওর কাজ। আজ পক্ষকাল হল ভুরুক, চোক্কুক, গোদানের রাজাদের কাছে প্রাসাদ থেকে যুদ্ধের খবর জানিয়ে যত পারাবত পাঠান হয়েছে তারা আর ফিরে আসেনি। তাই মহারাজ ক্ষিপ্ত হয়ে আমার বহিষ্কারের আদেশ দিয়েছেন। প্রাসাদের সম্মুখের সিংহদ্বারগুলি যুদ্ধের কারণে বন্ধ থাকায় আমি গুপ্ত সুড়ঙ্গপথে কিজিলে চলে এসেছি। সুড়ঙ্গের মুখে আমার পরিচিত বন্ধুটির সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। তিনি তখন একাই সুড়ঙ্গের দ্বার রক্ষা করছিলেন। কারণ আর সকলে যুদ্ধের ভয়ে পুরাতন সঙ্ঘারামে ভিক্ষুদের মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে।

সেনাপতি প্রশ্ন করলেন, পারাবত ফিরে এলো না বলে তোমাকে বিতাড়িত করা হল?

হ্যাঁ মহামান্য বলাধ্যক্ষ। আমরা ভারতীয়, কুচীবাসীর কাছে বিদেশি। মহারাজের ধারণা হয়েছে চীনের সঙ্গে ভারতীয়দের ধর্ম, বাণিজ্য, সর্বদিক দিয়েই সংযোগ বেশী, তাই বুঝি আমি ইচ্ছা করেই পারাবতদের ভুল পথে প্রেরণ করেছি।

হা হা করে হেসে উঠলেন সেনাপতিপ্রবর।

মহাশয়, কুচীশ্বরের ধারণা যে সত্য নয় তা আমরা দু'বন্ধু প্রমাণ করে দিতে পারব।

কি রকম?

এই বৃদ্ধ পক্ষী শিকারীই সব অঘটনের মূল।

পরিষ্কার করে বল।

আমরা দুই ভারতীয় মনের দুঃখে এখানে পরিভ্রমণ করছিলাম হঠাৎ দেখলাম রাজপ্রাসাদ থেকে সংবাদবাহী দুটি পারাবত উড়ে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে ঐ বৃদ্ধের হাতের বাজটি উড়ে গিয়ে একটি পারাবতকে ধরে আনল। অন্যটি ততক্ষণে গোদানের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। এখন আমরা ওকে প্রশ্ন করে জানতে পেরেছি, ভুরুকের কাছাকাছি এক মরুদ্যানে ও কদিন ধরেই পাখি ধরার জন্য আস্তানা গেড়েছিল। ঐ মরুদ্যান বরাবর পথ গেছে গোদানের দিকে। আমরা প্রাসাদ থেকে যত পারাবত ভুরুক, চোক্কুক, অথবা গোদানের দিকে উড়িয়েছি, তাদের প্রায় সবকটিকে যাবার অথবা ফিরে আসার পথে ঐ লোকটা বাজ দিয়ে ধরে নিয়েছে।

সেনাপতি সাগ্রহে বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করলেন, পারাবতের গলায় বাঁধা কোন বস্তু তুমি পেয়েছ কি ? পেয়ে থাকলে দিয়ে দাও।

লোকটা সেনাপতির ভাষা বুঝল না। তখন তৃতীয় লোকটি আঞ্চলিক ভাষায় তাকে সেনাপতির কথা বুঝিয়ে বলল। বৃদ্ধ দু'চার কথা বলার পর তার ঝুলি থেকে একটি রৌপ্যনির্মিত কবচ বের করে দেখাল।

তখন দোভাষী সেনাপতিকে বুঝিয়ে বলল, পাখি ধরাই লোকটির কাজ। কবচের ভেতর কি আছে না আছে তা দেখার কাজ ওর নয়। ও কবচগুলো মরুদ্যানের আশেপাশে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। কেবল কিছু আগে যে পাখিটি ধরেছে, তার গলায় একটি রৌপ্য কবচ ছিল, তাই সেটি রেখে দিয়েছে। দরকার হলে নিতে পারেন মহাশয়।

সেনাপতি কবচটি হাতে নিয়ে তার ভেতর কিছু দেখতে না পেয়ে বললেন, কই কিছু তো দেখছি না।

দোভাষী লোকটি বলল, ধাতুর গায়েই তো সংক্ষেপে সব কথা লেখা আছে মহাশয়।

পড়ে শোনাও কি লেখা আছে।

প্রাসাদের পক্ষী বিশারদ উল্টেপাল্টে দেখে পড়তে লাগল। অবশ্য চীনে ভাষায় রূপান্তরিত করে।

মহামহিম মহারাজ, গোদান, সমীপেষু —

গোদানেশ্বর, মহা বিপদ আসন্ন। চীন রাক্ষস এগিয়ে আসছে কুচীর দিকে। আপনারা চোক্লুক, ভুরুক বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হয়ে ওদের আক্রমণ করুন পেছন দিক থেকে। আমরা প্রচুর খাদ্য আর সৈন্য নিয়ে প্রাসাদ ও নগর রক্ষার ব্যবস্থা করেছি। দুর্ভেদ্য প্রাসাদে প্রবেশের একটিও ছিদ্রপথ রাখিনি। মাসাবধি ওদের যুদ্ধে নিযুক্ত করে রাখতে পারব বলে মনে করি। তার ভেতর ঐ হীন দল চীনাদের উপযুক্ত শিক্ষা দিন। বিনীত . কুচীশ্বর।

চীনের সেনাপতি বহুক্ষণ আপন মনে কিছু চিন্তা করলেন। পরে অধীনস্থ সৈন্য পরিচালকের সঙ্গে অনুচ্চে পত্র সম্বন্ধে পরামর্শ করলেন। শেষে আদেশ দিলেন, অগ্রসর না হয়ে এইখানেই শিবির স্থাপন কর। আর এই তিন ব্যক্তিকে শিবিরের মধ্যে রেখে উপযুক্ত খাদ্য পানীয়ের ব্যবস্থা করে দাও।

রাত্রে দোভাষী লোকটির সঙ্গে নানা আলোচনা ও পরামর্শের পর স্থির হল, চীনা বাহিনীর প্রধান অংশটি রাত্রেই সুড়ঙ্গ পথে একেবারে প্রাসাদে গিয়ে পৌঁছাবে। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দলটি বৃদ্ধ পক্ষী-শিকারীর সঙ্গে যাবে মরুদ্যানে। তারা সেখানে শিবির ফেলে কুচীশ্বরের মিত্র বাহিনীর আগমনের প্রতীক্ষা করবে।

সুড়ঙ্গ নির্মাতা আর প্রাসাদের রক্ষী-বিশারদকে নিয়ে বিশাল এক বাহিনী নিঃশব্দে স্বল্প চন্দ্রালোকে পাহাড়ে আরোহণ করতে লাগল।

গুহামুখে পৌঁছে প্রথমে সেনাপতি সুড়ঙ্গ নির্মাতার সঙ্গে দুটি সৈন্যকে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য পাঠালেন।

মশাল জ্বেলে আঁকাবাঁকা সুড়ঙ্গপথে তারা বহুদূর অগ্রসর হল। এরপর সুড়ঙ্গ সংলগ্ন অতি ক্ষুদ্র গবাক্ষ পথে চেয়ে দেখল রাজপ্রাসাদ অতি সন্নিকটে। ফিরে এল সৈন্য দুটি সুড়ঙ্গবিদকে সঙ্গে নিয়ে।

এরপর স্বয়ং সেনাপতি তার বাহিনী নিয়ে নির্ভয়ে অগ্রসর হল।

অদ্ভুত নির্মাণ-কৌশল এই সুড়ঙ্গের। দুর্বল চুনা পাথরের স্তর যেদিক দিয়ে গেছে সেই স্তরটিকে চিহ্নিত করেছে সুড়ঙ্গবিদ। তারপর সেই স্তরটি ধীরে ধীরে কাটতে কাটতে তৈরি করেছে দীর্ঘ সুড়ঙ্গপথ। সুড়ঙ্গের ওপরে মাঝে মাঝে তৈরি করা হয়েছে বায়ু চলাচলের জন্য গোল আকৃতি বিশিষ্ট ঝর্ঝরী।

মশাল জ্বেলে চলেছে মশালধারী, তার সামনে পেছনে অস্ত্রধারী চীনা বাহিনী। পক্ষীবিশারদ ও সুড়ঙ্গ বিদকে সঙ্গে নিয়ে সামনে চলেছেন সেনাপতি। একটি বিষাক্ত সর্প তার সমস্ত দেহটাকে ঢুকিয়ে নিচ্ছে গর্তের মধ্যে।

প্রাসাদ-প্রাকারে সংলগ্ন সুড়ঙ্গের বহির্গমন মুখ। একটি বিশাল প্রস্তর নির্মিত কপাট ফেলা আছে সেখানে। প্রাসাদের দিকে শিকলে বাঁধা প্রস্তরচক্র ঘুরিয়ে কপাটটিকে সরাতে হয়।

পক্ষীবিশারদ সেনাপতিকে বলল, দুটি শক্তিশালী সৈনিক আমাদের দুজনের সঙ্গে দিন। আমরা পাশের সোপান বেয়ে মাথার ওপর ক্ষুদ্র নির্গমণ পথে বেরিয়ে প্রস্তর চক্র ঘুরিয়ে দ্বার উন্মুক্ত করে দেব।

সেনাপতির নির্দেশে দুটি সমর্থ-সৈনিক বেরিয়ে গেল সুড়ঙ্গের ছিদ্র পথে দুজন পথ প্রদর্শকের সঙ্গে। সহসা প্রবল আঘাতে দুটি সৈনিক ছিটকে পড়ে গেল গভীর খাদে। ওপরের খোলা বৃত্তাকার বহির্গমন পথটি পাথরের দৃঢ় ঢাকনায় বন্ধ হয়ে গেল।

পক্ষী বিশারদরূপী কুমারায়ণ আর সুড়ঙ্গবিদ হিরণ্যগর্ভ তখন পাহাড়ের ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে প্রবেশ মুখের দিকে। একসময় নির্দিষ্ট স্থানে এসে পৌঁছল তারা। পাথরের স্তূপের আড়ালে রক্ষিত ধনুটি তুলে নিল কুমারায়ণ, শরযোজন করে গুহামুখে চারজন রক্ষীকে বধ করল। তারপর অতি ক্ষিপ্রতায় প্রস্তরচক্র ঘুরিয়ে সৈন্যদের প্রবেশ পথের দ্বার রুদ্ধ করে দিল।

প্রাসাদে যখন দুজনে এসে পৌঁছল তখন ক্লান্তি ও উত্তেজনায় কম্পিত হচ্ছে শরীর। মহারাজ রজতপুষ্প

বলাধ্যক্ষদের নিয়ে আলোচনায় বসেছিলেন। কুমারায়ণের মুখে সকল কথা শুনে উপস্থিত সকলেই বিস্মিত, স্তম্ভিত, হতবাক।

কুমারায়ণ বলল, মহারাজ চীনাদের ঐ ক্ষুদ্র দলটিও উপেক্ষণীয় নয়। এই মুহূর্তে ভুরুকের মরুদ্যানের দিকে সৈন্য প্রেরণ করুন। শত্রুকে আকস্মিক আঘাত হেনে বিপর্যস্ত করে দেওয়াই বিধি।

সঙ্গে সঙ্গে সিংহদ্বার খুলে গেল। অশ্বারোহীরা বেরিয়ে গেল নগর পথে। নগরের ফটক থেকে সৈন্যরা তাদের পশ্চাতে সারিবদ্ধ ভাবে অগ্রসর হল।

সবে চীনা সৈন্যরা শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে মরুদ্যানে এসে শিবির সংস্থাপনে ব্যস্ত এমন সময় আক্রান্ত হল কুচীর পরাক্রান্ত সৈন্যদের দ্বারা। প্রতিআক্রমণ করার অবকাশই পেল না তারা। কিছু হল নিহত, অধিকাংশই হল বন্দি।

এদিকে দুদিন সুড়ঙ্গের অভ্যন্তরে বন্দি থেকে চীনা সৈন্যরা ক্ষুধা, তৃষ্ণা আর প্রাণভয়ে মৃতপ্রায় এবার সুড়ঙ্গের উপরিস্থিত ছিদ্রপথ উন্মুক্ত করে দেওয়া হল। এক একটি সৈনিক বাইরে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাদের অস্ত্রহীন করে বন্দি করা হল। পরে এই শক্তিহীন সৈন্যদের অগ্নিদেশের প্রান্ত পর্যন্ত বিতাড়িত করে দিয়ে এল কুচীর সৈন্যদল। এমন অসম্মানজনক আত্মসমর্পণ চীনকে বোধকরি আর কখনো বরণ করতে হয়নি।

।। ছয়।।

জীবা, সত্যি?

লক্ষণ তাই। আমার বৃদ্ধা ধাত্রীমা এ বিষয়ে নিশ্চিত।

অন্ধকার শয্যায় জীবার হাতখানা নিজের বুকের ওপর চেপে ধরে কুমারায়ণ বলে, প্রতিদিন তথাগতের চরণে প্রার্থনা জানাও জীবা, তোমার অনাগত সন্তান যেন তাঁর শরণ লাভ করে।

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল জীবা।

এমন আনন্দ সংবাদকে অশ্রুজলে ভাসিয়ে দিচ্ছ?

জীবা কতক্ষণ কোন কথা বলতে পারল না। একসময় কুমারায়ণের হাতখানা শক্ত করে চেপে ধরে বলল, আমি চেয়েছিলাম, পুত্রসন্তান কোলে এলে তোমার মত যেন বীর হয়।

আর কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হলে তোমার মত যেন বুদ্ধের উপাসিকা হয়, তাই না?

আমি আর কিছু চাইব না। প্রভুর ইচ্ছাই হবে আমার ইচ্ছা।

যদি পুত্র হতো তার নাম তো আগেই আমরা স্থির করে রেখেছি। দেখ জীবা, তোমার সন্তান তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ করবে। সে তার পিতার চেয়েও অনেক বড় বীর হবে। এ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বীরেরা তার সম্মুখে অস্ত্র সমর্পণ করে গ্লানিমুক্ত হবে। বিজয়ী হয়ে তোমার পুত্র কুমারজীব একদিন মানুষের হৃদয়-সিংহাসনে সম্রাট হয়ে বসবে।

কুমার, তেমন সন্তান-সৌভাগ্য কি আমার হবে। জীবা কি চিরকুমার, চিরজীবী পুত্রের জননী হতে পারবে?

তাইতো বলছিলাম, প্রভুর কাছে প্রতিদিন প্রার্থনা জানাও। গভীর আন্তরিক প্রার্থনা কখনো নিষ্ফল হয় না।

কুমারায়ণের মুখ দিয়ে সে রাতে যেন প্রভু বুদ্ধই এই সত্য উচ্চারণ করেছিলেন।

যথাকালে ভূমিষ্ঠ হল কুমারজীব। পিতার মত অবয়ব, মাতার মত বর্ণ। শৈশব থেকেই তার চোখে মুখে ফুটে উঠত আশ্চর্য সব জিজ্ঞাসা। তার সব জিজ্ঞাসার উত্তর ছিল বিদুষী মায়ের মুখে।

পঞ্চমবর্ষে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কুমারজীবের শিক্ষারম্ভ হল। কিন্তু অনুষ্ঠানিক বিদ্যারম্ভের পূর্বেই সে বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিল। বহু বৈদিক সূক্ত তখন তার কণ্ঠস্থ। কুচীয়, সংস্কৃত ও চৈনিক, এই ত্রিভাষা শিক্ষার কাজ তার অনেকদূর অগ্রসর হয়েছিল।

অসীম প্রতিভাধর এই শিশুর জন্য নিত্য প্রভুর কাছে প্রার্থনা জানায় জীবা। পুত্রের জন্য কোন গর্ববোধ

নেই তার মনে। সে জানে জননীর অহঙ্কার অনেক সময় সন্তানের পতনের কারণ হয়। বিনয় আর নম্রতা যে শ্রেষ্ঠ প্রাথমিক শিক্ষা, সেই সত্যে অবিচলিত থেকে সে শিশুপুত্রকে শিক্ষা দিয়ে যায়।

মহারাজ রজতপুষ্প কেবল ভাগিনেয়ের অলৌকিক প্রতিভার কথা শত মুখে প্রকাশ করে বেড়ান। জীবা অনুযোগ জানিয়ে বলে, দাদা অতিরিক্ত বায়ুর তাড়নায় অগ্নি যে কেবল প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে তা নয়, নির্বাপিত হবার সম্ভাবনাও থাকে।

মহারাজা ভগিনীর কথায় কর্ণপাত না করে বলেন, আমার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী যে একজন অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ সেটা বহু পূর্ব থেকেই প্রত্যেকের গোচরে আনা ভাল। আমার অবর্তমানে জ্ঞাতিরা হিংসাকাতর হয়ে উঠবে। তাদের মুখ পূর্বাহ্নেই বন্ধ করা চাই। এই দেখ না, চীনের আক্রমণের সময় স্বয়ম্বরসভার কথা তুলে আমার জ্ঞাতিরাই কুমারায়ণের বিরুদ্ধে সারা নগরে অপপ্রচার করে বেড়াল। তারপর নাগরিকেরা যেই তার কৃতিত্বের পরিচয় পেল অমনি জ্ঞাতিদের মুখ বন্ধ হল। এখন কুমারায়ণের নামে সারা নগরী পাগল।

একটু থেমে গলা নামিয়ে অভিজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞের মত বললেন, জীবা, এই উপযুক্ত সময়, পিতার সঙ্গে সঙ্গে পুত্রের নামটা গাঁথা হয়ে যাক নাগরিকদের মনে।

অবুঝ অগ্রজকে বোঝাতে পারে না জীবা যে পৃথিবীতে সাম্রাজ্যের অধিকারী হওয়াই পরম ধন লাভ নয়, তার চেয়ে অনেক বড় সম্পদ অপেক্ষা করে আছে মানুষের জন্য। যে অর্জন করতে পারে সে ধন সেই হয় রাজরাজেশ্বর। পৃথিবীর সম্রাট তাঁর চরণতলেই মুকুট নামিয়ে রাখেন।

জীবা আঘাত দিতে পারে না স্নেহপ্রবণ অগ্রজকে। সে মহারাজ রজতপুষ্পের উচ্ছ্বাসের মাঝখানে নীরব হয়ে থাকে।

অগ্নিদেশের রাজা কামকান্তির কাছ থেকে বিশেষ দূতের মাধ্যমে পত্র এলো। পত্রটি কুমারায়ণের উদ্দেশ্যে রচিত।

প্রিয় সখা,

চৈনিক আক্রমণ প্রতিরোধে এবং তাদের বিশাল বাহিনীকে পর্যুদস্ত করার ব্যাপারে আপনি যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তা কেবল কুচী নয়, অগ্নিদেশবাসীরাও গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করে।

আজ ষষ্ঠ বর্ষ অতিক্রান্ত হল, সেই আমাদের শেষ সাক্ষাৎ হয়েছিল স্বয়ম্বর সভায়। আমি দেশে ফিরে আসার আগে লবণহ্রদে আপনাকে মৃগয়ার আমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছিলাম। আমি ভুলিনি আমার প্রতিশ্রুতি। এখন রাজ্য উপদ্রবমুক্ত। মৃগয়া যাত্রার জন্য আমি প্রস্তুত। আপনি কি বন্ধু এ মৃগয়ায় আমার সহগামী হবেন? যদি ইচ্ছা থাকে তাহলে মহারাজ রজতপুষ্পের সঙ্গে পরামর্শ করে দূতের সঙ্গেই চলে আসুন

আপনার চির বিশ্বস্ত সুহৃদ্ কামকান্তি।

ভ্রাম্যমাণের রক্ত কুমারায়ণের দেহে প্রবাহিত। পত্র পাওয়া মাত্র সে মরুযাত্রার জন্য উৎসুক হয়ে উঠল। মৃগয়া তার কাছে উপলক্ষ্য মাত্র, আসল লক্ষ্য মরুকান্তারে ভ্রমণ।

মহারাজ রজতপুষ্প বললেন, মৃগয়ার আহ্বান এলে তাকে গ্রহণ করাই বীরের ধর্ম। তুমি বীর, নিঃসন্দেহে এ আহ্বান তোমার গ্রহণ করা উচিত। তবে কামকান্তি বিশুদ্ধ মনের অধিকারী নয়, তাই সতত সাবধান হয়ে থাকাই বাঞ্ছনীয়।

রাত্রে জীবার সঙ্গে সাক্ষাৎ, অনুমতি দাও জীবা।

মন বড় বিচলিত কুমার।

কেন জীবা?

গোদানের মহারাজ অমিত্রবিজয়ের কাছ থেকে আহ্বান এলে নির্দ্বিধায় তোমাকে অনুমতি দিতাম। কিন্তু কামকান্তির সমস্ত মন কামনায় পূর্ণ, সে আহত বিষধর, তাকে বিশ্বাস নেই।

জীবা, মিথ্যা তোমার শঙ্কা। স্বয়ম্বরের এতকাল পরেও কারও মনে ঈর্ষা থাকতে পারে, আমি বিশ্বাস করি না। আর তাছাড়া কামকান্তি কুচী রাজের কাছে কৃতজ্ঞ। চীনা শত্রুকে অগ্নিদেশ থেকে কুচীশ্বরই

বিতাড়িত করেছেন।

তুমি যাত্রার জন্যে মনে মনে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছ, তোমাকে আমি বাধা দেব না। সাবধানে থেকো, প্রভুকে স্মরণ কর।

মনে মনে হাসল কুমারায়ণ, মৃগয়া যাত্রার পূর্বে আর যাকে স্মরণ করা যাক না কেন অহিংসার পূজারী প্রভু বুদ্ধকে নিশ্চয়ই নয়। মুখে বলল, অবশ্যই সাবধানে থাকব। তবে এই সত্যটি স্থির জানবে, মানুষ ভবিতব্যের অধীন। আমার যদি কোনো বিপদ আসে তাহলে তা তোমার দু-বাহুর আকুল বন্ধনের মাঝে বাঁধা থেকেও আসতে পারে।

মরুচর একটি অশ্বে আরোহণ করে কুমারায়ণ অগ্নিদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। যাবার আগে কুমারজীবকে বুকে তুলে নিয়ে অস্ফুটে বলল, জননীর চরণ শরণ করে বিশ্ববিজয়ী হও পুত্র।

জীবা যাত্রাকালে একটি শিক্ষিত পারাবত সঙ্গে দিয়ে বলল, তোমার তূণীরের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। অগ্নিদেশে গিয়ে ওকে সেই গোপন প্রকোষ্ঠে রেখে দিও। যে কোন বিপদে সংবাদ পাঠিও ওর মাধ্যমে। আশাকরি তার প্রয়োজন হবে না। ও তোমার সঙ্গে ফিরে আসবে।

কুমারায়ণ অগ্নিদেশে উপস্থিত হলে তাকে মহাসমাদরে গ্রহণ করলেন কামকান্তি। কিন্তু মৃগয়াযাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ থাকায় কুমারায়ণের অনুমতি নিয়ে পরদিনই লবণহ্রদের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। কয়েকজন অভিজ্ঞ পরিচারক সঙ্গে চলল প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী মরুচর অশ্বের পিঠে বোঝাই করে নিয়ে।

গোবি মরুর প্রান্ত ঘেঁষে শুরু হল যাত্রা। এ এক ভয়ঙ্কর সুন্দর পথ। ধূ ধূ মরু, প্রাণকে নিশ্চিহ্ন করে শুষে লেহন করে নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে দিগন্ত লক্ষ করে। জ্যোৎস্নারাতে অপার রহস্যময় মনে হয় ঐ মরু সমুদ্রকে। প্রদীপ্ত নক্ষত্রের চোখ মেলে রাত্রির আকাশ চেয়ে চেয়ে তার রহস্যের সন্ধান করে বেড়ায়। এ সময় শীতল পরিবেশের সুযোগে সমস্ত দলটি হেঁটে চলে। নক্ষত্রবিদ অভিজ্ঞ পরিচালক আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। রাত্রে কিছু সময় বিশ্রাম। প্রভাতে রৌদ্রের কমনীয় আলোয় আবার যাত্রা। কিন্তু তা বেশী সময়ের জন্য নয়। সূর্য ক্রমে রুদ্র হয়ে ওঠে। আকাশ থেকে ঝলকে ঝলকে বর্ষিত হয় অগ্নি। অমনি শুরু হয়ে যায় মরু-নর্তকীদের নৃত্য। আগুনের উত্তরীয় উড়িয়ে সোনালি ঘাঘরা ঘুরিয়ে তারা বিশাল মরুপ্রান্তরে ঘূর্ণি-নৃত্য নেচে চলে।

এ সময় পুরো দলটি শিবিরের মধ্যে অবস্থান করে।

একদিন ওরা পথ চলতে চলতে মরু ঝড়ের মুখোমুখি পড়ে যায়; নিজেদের আবৃত করে পড়ে থাকে বালির প্রান্তরে। ঝড় সরে গেলে উঠে দাঁড়ায় স্তূপীকৃত বালুকা সরিয়ে। কিন্তু বিপত্তি দেখা দেয় পুরো দলটির যাত্রাপথে। অবলুপ্ত হয়ে গেছে পদচিহ্ন। সামনে সৃষ্টি হয়েছে অগণিত ক্ষুদ্র বৃহৎ বালির তরঙ্গ।

প্রায় মধ্য গগনে সূর্য। প্রাণঘাতী রশ্মির শরে বিদ্ধ হচ্ছে চরাচর। শিবির সংস্থাপন করে বিশ্রামের আয়োজন করা হল। সন্ধ্যায় চাঁদের উদয়। পথপ্রদর্শক শিবির থেকে বেরিয়ে পথের সন্ধান করতে লাগল। প্রায় মধ্যরাত্রে তাকে ফিরে আসতে দেখা গেল। অত্যন্ত উৎফুল্ল। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পশুকঙ্কাল আর মনুষ্য করোটীর চিহ্ন খুঁজে পেয়েছে সে। এই মরুভূমির স্থানে স্থানে কালে কালে হতভাগ্য পথিকেরা মরুঝড়ে অথবা জলাভাবে ভয়ঙ্কর মৃত্যুর কবলে পড়েছে। তারাই তাদের বিক্ষিপ্ত দেহাবশেষে রেখে দিয়েছে দিগভ্রষ্ট পথিকের জন্য দিকচিহ্ন।

আবার পথযাত্রা। শেষ রাত্রে ক্লান্ত অবসন্ন যাত্রীরা শিবির রচনা করে নিদ্রা যায়। কুমারায়ণের ঘুম আসে না। এই ত্রিংশৎ বৎসর জীবনকালের মধ্যে সে কত পথই না অতিক্রম করেছে। কত বিচিত্র অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়েছে তাকে। এ যাত্রা কুমারায়ণের অভিজ্ঞতায় আর এক সংযোজন। সে পায়ে পায়ে পটাবাসের বাইরে বেরিয়ে আসে।

একটা শব্দ ভেসে আসছে। শেষ রাতের হাওয়া যেন মৃত পশুদের পিঞ্জর ও করোটী ভেদ করে উঠে আসছে হাহাকার শব্দ করতে করতে। এ শব্দে বুক কেঁপে ওঠে যাত্রীদের, কিন্তু অসীম সাহসী কুমারায়ণ

মরুবক্ষে উত্থিত এই ভয়ঙ্কর শব্দের উৎস অনুসন্ধান করতে থাকে।

ভোর হয়, থেমে আসে বায়ুপ্রবাহ। শব্দের তীক্ষ্ণতা কমতে কমতে নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

আবার চলা, আবার বিশ্রাম। এখন সীতানদীর তীর ধরে চলেছে তারা।

বিংশতি দিবসের মরুযাত্রা অবশেষে সমাপ্ত হয় লবণহ্রদে এসে। সীতা নদীর জলধারাও এই হ্রদে এসে তার দীর্ঘ পথযাত্রার সমাপ্তি টানে। উৎসমুখে তুষার বিগলিত হলে পূর্ণ হয় এ হ্রদ। ক্ষীণ জলধারা প্রবাহিত হলে হ্রদের অভ্যন্তরে বালুকারাশি সে জল শুষে নেয়।

লবণহ্রদ ও সীতানদীর অর্ধ যোজন স্থান ব্যাপী সবুজ তৃণ ও অরণ্যভূমি। কোথা থেকে একদল হরিণ কোন্ আদি যুগে এখানে এসে পড়েছিল। তাদেরই সন্তান-সন্ততি ত পূর্ণ হয়ে আছে অঞ্চলটি।

অভাবনীয় মৃগকুলের সমাবেশ।

শিবির স্থাপন করা হয়েছে সন্ধ্যা লগ্নে। কামকান্তি আর কুমারায়ণ অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে একবার বহির্গত হল। তারা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে লাগল।

সীতা নদীর ক্ষীণ জলধারা এসে পড়ছে লবণহ্রদের মধ্যভাগে। যেখানে জল এসে পড়ছে সেখানে সেই জলসম্ভার যেন পাতালের নাগলোকের নাগেরা মুহূর্তে শুষে নিচ্ছে। সারা হ্রদের জলহীন ঈষৎ সিক্ত বালুকা পিপাসার্ত রসনার মত পূর্ণ জলের প্রত্যাশায় পড়ে আছে। বৃক্ষের আড়ালে পূর্ণিমার চন্দ্রোদয় হল। যেখানে সীতানদীর জলধারা এসে হ্রদে পড়ছে সেই জলস্রোতের দুইপার্শ্বে নেমে এসেছে হরিণের বৃহৎ একটি দল। তারা জলপান করছে।

কামকান্তি বললেন, মধাহ্নের কিছু পূর্বে আর এই সন্ধ্যা লগ্নে হরিণেরা হ্রদের বুকে নেমে এসে ঐ স্রোতোধারায় জলপান করে। আমাদের মৃগয়া শুরু হবে কাল মধ্যাহ্নের কিছু আগে।

একটু থেমে পরিকল্পনাটির পূর্ণ রূপদান করলেন কামকান্তি।

আপনি কুমারায়ণ, কাল হ্রদের ওপারে বৃক্ষের আড়ালে অশ্বারোহণে অপেক্ষা করবেন। মধ্যাহ্নে জলপান করতে আসবে মৃগের দল। আমরা ওদের পলায়নের পথ বন্ধ কবে আপনার দিকেই তাড়না করব। আপনি সেই অবকাশে অশ্ব চালনা করে নেমে আসবেন শুষ্ক হ্রদের বুকে। পশ্চাতে তাড়া খেয়ে সামনে বাধা দেখে ওরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে শূন্যে লাফিয়ে উঠবে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে ওদের লক্ষ করে আপনি শর সন্ধান করবেন।

কুমারায়ণ বলল, অসামান্য পরিকল্পনা আপনার কামকান্তি। যথার্থ মৃগয়াবিলাসী আপনি।

হা-হা করে হেসে উঠলেন মহারাজ কামকান্তি। মুহূর্তে হ্রদের বুক থেকে অস্বাভাবিক এক ধ্বনি শুনে অদৃশ্য হয়ে গেল হরিণের দল।

পরদিন মধ্যাহ্নে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে মরুভূমি। পূর্ব পরিকল্পনা মত হ্রদের ওপারে অশ্বারোহণে প্রতীক্ষা করছে কুমারায়ণ।

ঐ তো জলধারা বেয়ে নেমে আসছে হরিণের দল। তারা জলপান করছে। তূণীরে তীর, হাতে ধনুশ্বর, কুমারায়ণ উদ্‌গ্রীব প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে আছে। কখন ওঠে মৃগ বিতাড়নের কোলাহল, অমনি অশ্বারোহণে নেমে যাবে বিদ্যুৎগতিতে।

সহসা প্রচণ্ড কোলাহলে বিদীর্ণ হল মরু-তপ্ত বাতাস। ওপারের বনভূমি আলোড়িত করে বেরিয়ে এলো কামকান্তি সদলবলে।

হরিণেরা প্রাণভয়ে ছুটে আসছে এপার লক্ষ করে! কিন্তু সহসা থমকে দাঁড়াল কিসের আশঙ্কায়! কে যেন নিষিদ্ধ এলাকায় প্রবেশ নিষেধের তর্জনী তুলে ধরল।

কুমারায়ণ শ্বেত অশ্বপৃষ্ঠে নেমে আসছে বিদ্যুৎগতিতে। ওপার থেকে কৃষ্ণ একটি অশ্বে কিছু পথ নেমে এসে অশ্বের রাশ টেনে ধরল কামকান্তি।

সহসা একি হল! অশ্বসমেত কুমারায়ণকে গ্রাস করতে লাগল ধরিত্রী। চোরাবালির মৃত্যু-গহ্বর ক্ষুধার্ত

অজগরের মত উদরের গভীরে টানতে লাগল তাকে।

বিহ্বল কুমারায়ণ অশ্ব থেকে লাফ দিয়ে পড়ল। কিন্তু পরিত্রাণের পথ নেই। পদতলের বালুকা পিচ্ছিল সরীসৃপের মত সরে সরে যাচ্ছে।

কুমারায়ণ দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করে আর্ত চীৎকারে কামকান্তিকে সাহায্যের জন্য আকুল আহ্বান জানাল।

গগন বিদীর্ণ করে অট্টহাসি হেসে উঠল কামকান্তি। হাসির শব্দে হরিণেরা ঝড়ের মুখে শুকনো পাতার মত উড়ে চলে গেল অরণ্যের গভীরে।

কুমারায়ণ চোখের সামনে দেখতে পেল মহা নিপাত। তার হাত চলে গেল তূণীরের প্রকোষ্ঠে। পারাবতটিকে দু'হাতে তুলে ধরে উড়িয়ে দিল আকাশে। শিক্ষিত পারাবত ডানা মেলে উড়ে চলল কুচী অভিমুখে।

সবিস্ময়ে কামকান্তি তাকাল পারাবতের দিকে। ক্ষণকাল মাত্র। মুহূর্তে হাতের ধনু তুলে ধরল উড়ন্ত পাখি লক্ষ করে।

তীর আর ছোঁড়া হল না। কুমারায়ণ শেষবারের মত হাতে তুলে নিয়েছে ধনু। অব্যর্থ লক্ষ্যে তার নিক্ষিপ্ত তীর কামকান্তির বক্ষ বিদীর্ণ করে বেরিয়ে গেল।। কৃষ্ণ অশ্বটি সম্মুখের দুটি পা উর্ধ্বে তুলে তীব্র হ্রেষাধ্বনি করে উঠল। হ্রদের বুকে নিক্ষিপ্ত হল কামকান্তির প্রাণহীন দেহ।

বালির অতলে তলিয়ে যেতে যেতে কুমারায়ণ দেখল, চোখের ওপর প্রদীপ্ত সূর্য চিতার মত দাউ দাউ করে জ্বলছে, আর তার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে এক নারী!

কে ! কে ও!

এ জীবনে কুমারায়ণের মুখ দিয়ে এই শেষ বাক্য উচ্চারিত হল।

পৃথিবীর আলো মুছে যাবার আগে কুমারায়ণ চিনতে পারল সে নারীকে। তীব্র অন্তর্ভেদী দৃষ্টি মেলে তারই দিকে চেয়ে আছে বেতসা।

অনির্বাণ

একদল অশ্বারোহী রেশম পথ ধরে বিদ্যুৎ-চমকে ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে গেল পূব থেকে পশ্চিমে। পাথরের স্তূপের আড়াল থেকে রুদ্ধশ্বাসে তাদের দেখতে লাগল ভিক্ষুণী। সাত বছরের শিশুপুত্রটি মায়ের মুখের দিকে চেয়ে বসে রইল। তার শিশু মনও কি যেন একটা আতঙ্কের আঁচ পেয়ে স্তব্ধ হয়ে গেছে।

দূরে শোনা গেল প্রাণ বিদীর্ণ করা আর্তনাদ। দস্যুরা নিঃসন্দেহে কোনো বণিক দলের ওপর চড়াও হয়েছে।

তিনদিন এক পরিত্যক্ত চৈত্যের মধ্যে আত্মগোপন করে আছে মা আর ছেলে। পাহাড়ের স্তূপ আর গজিয়ে ওঠা ঝোপঝাড় বৃক্ষে স্থানটি সমাচ্ছন্ন।

এক সময় দীর্ঘ দিনের অবসানে সন্ধ্যার ছায়া নেমে এল। কিউনলুন পর্বতমালার কোনো এক শিখর ছুঁয়ে চন্দ্রের উদয় হল। বাইরে বৃক্ষপত্রে পদধ্বনি শুনে শিশুটি মায়ের দৃষ্টি আকষর্ণ করে বলল, মা, পূজারী দাদু এসে গেছে।

পূজারী চৈত্যের ভেতর ঢুকে বাতি জ্বালিয়ে চতুর্দিক নিরীক্ষণ করলেন। তারপর মৃদুস্বরে ডাক দিলেন, মা, বেরিয়ে এসো।

ভিক্ষুণী ছেলের হাত ধরে বেরিয়ে এল স্তূপের আড়াল থেকে। চৈত্যের ভেতর প্রবেশ করে বসল প্রস্তরের মসৃণ মেঝেতে। বর্তিকার স্বল্প আলোয় গুহার অভ্যন্তরে দেয়াল-চিত্রগুলি যেমন রহস্যময় তেমনি জীবন্ত বলে মনে হচ্ছিল। রং এত উজ্জ্বল, বিষয় এমন প্রাণবন্ত যে মনে হচ্ছিল অঙ্কিত চরিত্রগুলি চোখের সামনে অভিনয় করে চলেছে।

ভিক্ষুণীর বয়স অষ্টবিংশতি বর্ষ। অতি উচ্চ বংশোদ্ভব বলে মনে হয়। সুষমামণ্ডিত পূজারিণী-মূর্তি। সপ্তমবর্ষীয় বালকটির সঙ্গে তাঁর দেহ-সৌষ্ঠবের কিছু পার্থক্য ছিল। ভিক্ষুণীর কেশ মধুবর্ণ, আঁখি-তারকায় নীলের ছোঁয়া। কিন্তু বালকের কেশ ও আঁখি তারকার বর্ণ ভ্রমর-কৃষ্ণ।

ভিক্ষুণী ধীর কণ্ঠে বলল, বাবা, আজ একটা আর্তনাদ শুনলাম, মনে হল, দস্যুদল কোনো সার্থবাহকের দলকে আক্রমণ করেছে।

ঠিকই শুনেছ মা। হুন দস্যুরা হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে সোনার বুদ্ধমূর্তি। তারা দলে দলে ছড়িয়ে পড়েছে উত্তর আর দক্ষিণের রেশম পথে। তাদের ধারণা, তিয়েনশান পর্বতের সানুদেশে বৌদ্ধবিহার থেকে স্বর্ণ মূর্তিটি অপহৃত হয়েছে, সেটি কোনো বণিকদলের কর্ম। তাই তারা শুধু তিয়েনশান নয়, কিউনলুনে পাদদেশেপ্রসারিত পথটিকেও পাহারা দিয়ে চলেছে।

ভিক্ষুণী বুদ্ধ-মূর্তিটি ঝুলি থেকে বের করে বসিয়ে দিল প্রস্তর বেদির ওপর। কি অপার আনন্দময় মূর্তি, বরাভয় মুদ্রায় বসে আছেন বুদ্ধ, তথাগত। স্বল্প দীপালোকেও ঝলমল করে উঠছে রাজ-রাজেশ্বরের দেহ।

পূজায় বসলেন পূজারী। করজোড়ে প্রার্থনায় বসল ভিক্ষুণী। শিশু পুত্রটিও জননীর পাশে জোড়হস্তে নতজানু হয়ে রইল। কোনো ভেরী বাজল না, কোনো ঘণ্টাধ্বনিও শোনা গেল না।

পূজা শেষে পূজারী বললেন, প্রভুর কৃপায় এই পরিত্যক্ত চৈত্য আজ তিনদিন নন্দনলোকে রূপান্তরিত হয়ে গেল মা। তিনিই তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এলেন এখানে। প্রভু আমাকে আজ এই শিক্ষা দিলেন, যেখানে শূন্য সেখানেই বিরাজ করছে পূর্ণ।

ভিক্ষুণী বলল, কিন্তু বাবা, মনের একটি ক্ষত থেকে যে নিরন্তর রক্ত ঝরে পড়ছে, তাকে রোধ করি কোন সান্ত্বনার প্রলেপে? নিরপরাধ বণিকদলের কেন এই নির্যাতন?

নিরীহ বণিকদল নির্যাতীত হচ্ছে, তাতে তোমার তো কোনো অপরাধ নেই মা। তোমার রাজকুল থেকে প্রদত্ত এই মূর্তি। তুমি ভিক্ষুণী হয়ে তাঁর পূজায় নিযুক্ত। তুমি তাঁকে নিয়ে চলেছ সেই দেশে যেখান থেকে একদিন তাঁর মৈত্রীর বাণী ছড়িয়ে পড়েছিল দিকে দিকে।

প্রভুকে যে এতদিন সর্ব জীবের প্রতি করুণাময় জেনে এসেছি বাবা।

মৃদু হেসে পূজারী বললেন, কোন্ পথে তাঁর করুণা নেমে আসবে সে কি কেউ বলতে পারে মা। ঐ যে সামনের ঝর্ণা, একদিন বুকের মধ্যে তুষার গলা জল নিয়ে বয়ে যেত, কত মানুষ সংসার পেতেছিল তার দুই তীরে. আজ সে ঝর্ণাও শুকিয়েছে, মানুষজন চলে গেছে ঐ নীচের উপত্যকায়। পূজা নিয়ে কেউ আর এত ওপরে উঠে আসে না। এ বুড়ো বয়সে তাঁরই ডাকে আমাকে আসতে হয় পাহাড় ভেঙে। এ বিপদের দিনে তিনি নিজেই তোমাদের ডেকে নিয়ে এলেন তাঁর আশ্রয়ে, এ কি কম করুণা।

ভিক্ষুণী নীরবে শুনল বৃদ্ধ শ্রমণের কথাগুলি। সে দেখল প্রভুর প্রশান্ত মুখে লেগে আছে সে কথার সমর্থন।

পঞ্চম দিনের প্রভাত তখনও রাত্রির অন্ধকার ভেদ ক'রে আবির্ভূত হয়নি, তিনটি ছায়ামূর্তি বেরিয়ে গেল চৈত্য ছেড়ে। তারা পামীরের দুর্গম মালভূমির পথেই দক্ষিণে অগ্রসর হতে লাগল।

প্রভাতের কৈশোর-কমনীয়তা যখন যৌবনের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত তখন পূজারীকে প্রণতি জানিয়ে ভিক্ষুণী বলল, বাবা, এই অশক্ত শরীরে আপনি অনেকখানি পথ অতিক্রম করেছেন এখন অনুগ্রহ করে স্বস্থানে ফিরে যান। আমাদের যাত্রাপথে কেবল আপনার আশীর্বাদ প্রার্থনা করি।

পূজারী বললেন, প্রভুর আশীর্বাদেই তোমার যাত্রা সফল হবে মা।

বন্ধুর পার্বত্য পথে মা ও ছেলে সাতদিন অতিক্রম করার পর এক সন্ধ্যায় এসে পৌঁছল তুষারাচ্ছাদিত এক পর্বতের সানুদেশে। প্রভু বুদ্ধের কৃপায় এখানেও তারা লাভ করল একটি গুহার আশ্রয়। যতদূর দৃষ্টি যায় তরুলতার চিহ্নমাত্র নেই। রাত্রি অধিক হবার সঙ্গে সঙ্গে বাইরে ঝড়ের গর্জন শোনা যেতে লাগল। শুরু হল প্রচণ্ড শৈত্য-প্রবাহ। প্রভুর নাম জপ করতে লাগল ভিক্ষুণী। এক বক্ষে সোনার বুদ্ধমূর্তি, অন্য বক্ষে সন্তানকে ধারণ করে সে প্রতীক্ষা করতে লাগল প্রভাতের। প্রবল বায়ু যখন নৈশ অন্ধকার বিদীর্ণ করে বয়ে যাচ্ছিল তখন মনে হচ্ছিল সহস্র হুন ও তাতার অশ্বারোহী দিগ্‌বিদিক কাঁপিয়ে ছুটে চলেছে।

গুহার অভ্যন্তরে সামান্যমাত্র বায়ু প্রবেশ করলেই শীতের শ্বাপদের দংশনে অস্থির হয়ে উঠছিল গুহাবাসীরা। কিন্তু প্রভুর অপার কৃপায় রজনীর শেষ যামে তুষারপাতের ফলে গুহামুখ প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়ে তীক্ষ্ণ ঝড়ের হাওয়া প্রবেশের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিল। গুহা মুখে বসে সন্তানকে শীতের দংশন থেকে রক্ষা করে প্রভাতের জন্য প্রহর গণনা করছিল জননী। শেষ রাত্রিতে ঝড় থেমে গিয়ে এক অদ্ভুত জ্যোতি ছড়িয়ে পড়েছিল চরাচরে। গুহার বরফাচ্ছাদিত রন্ধ্রপথে সেই জ্যোৎস্নাধৌত জ্যোতির্লোকের দিকে তাকিয়ে ভিক্ষুণীর স্মৃতির দ্বার ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হয়ে গেল। সে দেখল, এক তরুণ কুমার তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কুমার বলল, কোনো ভয় নেই। আমার হাত ধর। বিপদের পথে আমি হব তোমার সঙ্গী।

বহু দুর্গম পথ অতিক্রম করে একদিন তারা এসে পৌঁছল এক স্বর্গরাজ্যে। সেখানে বহু সমারোহে পালিত হল তাদের মিলন-উৎসব।

কুমার বলল, জীবা, আমাদের সন্তান যখন ভূমিষ্ঠ হবে তখন উভয়ের মিলিত নামেই সে হবে পরিচিত।

জীবা পরম আগ্রহে প্রিয়তমের হাতখানি বুকের মধ্যে নিয়ে বলল, বল কুমার কি হবে তার নাম?

কুমারজীব।

অভিনব। জনকজননী বেঁচে থাকবে চিরকাল পুত্রের নামের মধ্যে।

তাই তো কাম্য জীবা। পুত্র হোক জগৎ বিখ্যাত, পিতা-মাতা থাক তার খ্যাতিতে লীন হয়ে।

সহসা ঈশান কোণ থেকে ছুটে এল দুরন্ত এক ঝড়। জীবার কাছ থেকে সেই ঝড়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে

চিরদিনের মত হারিয়ে গেল কুমার। শুধু স্মৃতিচিহ্নরূপে থেকে গেল তাদের সম্মিলিত কামনার ধন কুমারজীব।

প্রবল শীতের মধ্যে জননীর উত্তপ্ত কোলের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে কুমারজীব পার্শ্ব পরিবর্তন করামাত্র বন্ধ হয়ে গেল জীবার স্মৃতিরোমন্থন। জীবা আবেগে চুম্বন করল পুত্র কুমারজীবকে।

ভোরের আলো ফুটে উঠল একসময়। বরফের স্তূপ সরিয়ে গুহা থেকে বেরিয়ে এল মাতাপুত্র। প্রস্তরাকীর্ণ গিরিপথ। তার ওপর বরফের শ্বেত আস্তরণ পাতা। পদে পদে পদস্খলনের সম্ভাবনা।

কুচীর রাজকন্যা হলেও জীবা শ্রমণী, তাই কষ্ট সহিষ্ণুতা তার ধর্ম। তাছাড়া তিয়েনশান পর্বতমালার কোলে আশৈশব কাটানোর ফলে তাকে মুখোমুখি হতে হয়েছে তুষারপাতের। তবে পামীরের এই নুড়িপাথর পরিকীর্ণ পথটি সম্বন্ধে তার কোনো ধারণা ছিল না। সারারাত তুষারপাতের ফলে প্রস্তরগুলি শুভ্র আস্তরণের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল, তাই সহজ ছিল না পথ অতিক্রম করা। নুড়িগুলি এমনি শিথিল যে পদপাতের সঙ্গে সঙ্গে তা সরে সরে যাচ্ছিল, যার ফলে ভিক্ষুণী সন্তান নিয়ে রোধ করতে পারছিল না পতন।

অল্পকালের মধ্যে ক্লান্ত হয়ে পড়ল ভিক্ষুণী। সে ঐ তুষারের ওপরেই অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সূর্যের আলো কাঁচা সোনার মত ছড়িয়ে পড়েছে পর্বতের চূড়ায়। সেই সোনার ঢল ধীরে ধীরে তুষার প্রবাহের মত নেমে আসছে পর্বতের গা বেয়ে। সে এক অবর্ণনীয় শোভা। ভিক্ষুণী জীবার মনে হল, প্রভুর করুণা নেমে আসছে আলোর ধারা হয়ে। সত্যিই তাই এলো। পর্বতের সানুদেশ একসময় প্লাবিত হয়ে গেল আলোর বন্যায়। ধীরে ধীরে গলে যেতে লাগল তুষারের আস্তরণ। মনে হল, কেউ যেন শুভ্র একখানা চাদর উৎসবের শেষে গুটিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে।

সহসা ভিক্ষুণী জীবার চোখ আটকে গেল পর্বতের দক্ষিণ প্রান্তে। একটি খরস্রোতা জলধারা হাওয়ায় ভেসে যাওয়া গতিশীল মৃগের মত কিছু পথ ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে গভীর গিরিখাদে।

সোনার বুদ্ধ মূর্তিটি বুকে জড়িয়ে ভিক্ষুণী চোখের জলে ভাসতে লাগল। প্রভাতে ঐ গিরিনদীর ওপরেও শুভ্র তুষারের আস্তরণ বিছানো ছিল। তখন অদৃশ্য ঐ নদীকে চিহ্নিত করা ছিল প্রায় দুঃসাধ্য এক ব্যাপার। সেই প্রথম প্রভাত মুহূর্তে পুত্রের হাত ধরে যদি ঐ নদীর ওপর বিছানো শুভ্র আস্তরণে পা ফেলে জীবা যাত্রা করত, তাহলে সে যাত্রা গিয়ে থামত ঐ খাড়াই গিরিখাদের অতল তলে।

নদীর ধারে পর্বতের বাঁকে এসে দাঁড়াল একটি মানুষ। পেছনে একটি ভেড়া। লোকটির বুকের মধ্যে তার বাচ্চা। মানুষটি নদীর ওপর জমে থাকা কঠিন তুষারস্তূপে পা ফেলে পেরিয়ে এল এপারে।

জীবার সামনে এসে লোকটি কেমন যেন হতচকিত হয়ে গেল। তার বিস্ময়ের কারণ, এই দুটি প্রাণী রাতের প্রচণ্ড তুষার ঝড়ের মধ্যে কাটাল কোথায়!

পরমুহূর্তে তার মনে হল, সামনের গুহাটি প্রবল ঝড়ের হাত থেকে তাদের রক্ষা করেছে।

জীবা বলল, আপনি কি এই অঞ্চলের অধিবাসী?

প্রৌঢ় মেষপালক হুব্‌বা ভিক্ষুণী জীবার কথায় অভিভূত হয়ে গেল। সামান্য মেষপালককে কেউ সম্মান দেখিয়ে 'আপনি' সম্বোধনে কথা বলবে এ যে তার ভাবনারও বাইরে। তাছাড়া এই মহিলা তো সামান্য নয়, এর রূপ এর পোশাক-পরিচ্ছদ সত্যিই অসামান্য। হুব্‌বার মনে হল, কোনো অলৌকিক জগৎ থেকে এ নারী সহসা তার সামনে আবির্ভূত হয়েছে। সে সসংকোচে বলল, আমি হুব্‌বা, ভেড়া চরিয়ে বেড়াই। আমাকে সম্মান দেখিয়ে কথা বললে আমারই পাপ হবে মা।

প্রভু বুদ্ধের কাছে সকলেই মানুষ বাবা। তাঁর কাছে ভিক্ষুক আর রাজায় কোনো তফাৎ নেই।

হুব্‌বা বলল, আমরা কিরঘিজ মা, আমরা গরুভেড়া নিয়ে কিলিক গিরিপথের আশেপাশে চরিয়ে বেড়াই।

জীবা বলল, শুনেছি কিরঘিজরা লোক হিসেবে খুবই ভাল।

হুব্‌বা বলল, ভালমন্দ বুঝিনা মা, ঘুরে বেড়াই আকাশের তলায়, শুয়ে থাকি ঘাসের বিছানায়। মক্‌কির রুটি পাকাই চমরীর দুধে চুবিয়ে খাই। কোনো অতিথি পথের মাঝে এসে পড়লে আমরা মনে করি স্বর্গ

থেকে কোনো দেবতা নেমে এল। আমাদের সামান্য যা থাকে তাই দিয়ে তার আপ্যায়ন করি।

ভিক্ষুণী জানতে চাইল, এদিকে কোথায় চললে বাবা?

যাযাবর কিরঘিজটি কিছু সময় চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। এক সময় কাতর কণ্ঠে বলল, আমি আমার ছেলেকে দেখতে এসেছি মা।

তোমার ছেলে! সে কোথায় থাকে ? এদিকে তো কোনো ঘরবাড়ি নজরে পড়ল না।

সে অনেক কথা মা। আমার ছেলেটা আস্ত একটা পাগল ছিল। ছোট ছেলে, তবু দলছুট হয়ে এদিক-ওদিক ঘোরা চাই। মা ছিল না, তাই বোধহয় পেছুটানও ছিল না তার।

ভিক্ষুণী জীবা সাগ্রহে শুনতে লাগল এই সহজ সরল যাযাবরটির কথা।

একটু থেমে হুব্‌বা বলল, গরমের দিনগুলোতে আমরা পশুর পাল নিয়ে ওপরের পাহাড়ে আসি। সেবারও এসেছিলাম। এই পাহাড়ের একটু নীচে অনেক বড় একটা চারণভূমি আছে। সেখানে আমরা পশু চরিয়ে বেড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ আমার বারো বছরের ছেলেটা উধাও হয়ে গেল। জানতাম মা, এটা ওব রোগ। আর এও জানতাম এদিক-ওদিক ঘুরে-ফিরে ও আবার ফিরে আসবে ডেরায়। কিন্তু সাঁঝ ঘনিয়ে এল, ছেলেটা আর ফিরে এল না। রাতে ঝড় উঠল। ভোরে জেগে উঠে দেখি পর্বতের সারা গা বরফে ঢাকা। আমি ছুটে এলাম মা এই পথে। ওকে খুঁজে পেলাম। তুমি যেখানটিতে দাঁড়িয়ে আছ তার একটু ডাইনে। সাদা বরফের চাদরখানা গায়ে জড়িয়ে যেন ঘুমিয়ে আছে।

জীবা নিজের ছেলের গায়ে হাত রেখে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

লোকটি তার ভেড়া আর ভেড়ার বাচ্চা নিয়ে এগিয়ে এল সেই জায়গাটিতে যেখানে কয়েক বছর আগে তার কিশোর পুত্রটি রাতের তুষার ঝড়ে সমাধিস্থ হয়েছিল।

লোকটি থলির ভেতর থেকে শুকনো রুটি আর কিছু খাবার বের করে ঐ জায়গাটার ওপর রাখল। তারপর ভেড়ার দুধ দুইয়ে ঐ খাবারগুলো ভিজিয়ে দিলে।

এবার জীবার দিকে তাকিয়ে ধরা গলায় বলল, যেদিন ও দল থেকে বেরিয়ে যায় সেদিন কিছু খেয়ে আসেনি, তাই প্রতি বছর এমন দিনে ওকে একবার করে খাইয়ে যাই। ওর মা থাকলে কি না খেয়ে পালিয়ে আসতে পারত।

জীবা শুধু বলল, তোমার ছেলে পরম করুণাময় বুদ্ধের চরণে আশ্রয় লাভ করুক, এই কামনা করি।

যাযাবর কিরঘিজটি জীবার প্রার্থনার মর্ম উপলব্ধি করতে না পারলেও এটুকু বুঝল যে, এই দেবীমূর্তি তার ছেলের মঙ্গলের জন্যই কোনো দেবতার কাছে প্রার্থনা জানাল।

এবার হুব্‌বা তার ডেরায় ফিরে যাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, কোন দিক থেকে আসছ মা, আর যাবেই বা কোথায়?

বহুদূর উত্তরে কুচী রাজ্য থেকে আসছি আমি, যাব দক্ষিণে ভারতবর্ষে।

বণিকদের কাছ থেকে এ দুটো জায়গার নাম শুনেছি মা, তবে কোথায় তা জানা নেই।

জীবা গুহাটির দিকে আঙুল তুলে বলল, কাল ঝড়ের ভেতর আমরা ঐ গুহাতেই আশ্রয় নিয়েছিলাম। সকালে উঠে দেখি সামনের ঐ পাহাড়ি নদীটি বরফে ঢাকা। দেখতে দেখতে সূর্যের তাপে বরফ গলে গেল আর নদীটি তার ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ল। ভাগ্যে পা পড়েনি বরফ ঢাকা নদীর ওপর তাহলে একেবারে খাদে গিয়ে পড়তে হত।

হুব্‌বা বলল, এখন কোনো ভয় নেই, তুমি এসো মা আমার সঙ্গে। আমিই তোমাদের ওপারে পার করে দেব।

অতি সাবধানে শক্ত বরফখণ্ডের ওপর পা রেখে হুব্‌বা মা ও ছেলেকে নদী পার করে নিয়ে এল।

একটু নীচেই সবুজ ঘাসের চারণভূমি। শত শত ভেড়ার পাল আর চমরী চরছে। বিচ্ছিন্নভাবে তাঁবু পড়েছে দু'দশটি। রঙিন পোশাক পরা মেয়েরা তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এসে বাসনকোসন মেজে ঘরে তুলছে।

হুব্‌বার সঙ্গে ছেলের হাত ধরে ভিক্ষুণী জীবা এসে দাঁড়াতেই চারণভূমিতে হৈ-চৈ পড়ে গেল। কোথা

থেকে এল মেয়ে। এ তো তাদের মত যাযাবর নয়। কুচীর ভাষার সঙ্গে শূলী (কাশগড়) দেশের ভাষার তফাৎ আছে। আবার পামীরের বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষা এক নয়। কিন্তু কুচীর রাজকন্যা জীবা প্রখর বুদ্ধিশালিনী। সে কুচীতে আগত বণিকদের কাছ থেকে নানা অঞ্চলের ভাষা শিখে নিত। বণিকরা চলার পথে একই অঞ্চলের ওপর দিয়ে বহুবার আসা-যাওয়া করার ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষায় রপ্ত হয়ে উঠত। স্বাভাবিক আগ্রহের ফলে জীবার পক্ষে সেইসব ভাষা শিখে নেওয়া বড় একটা সময়সাপেক্ষ বা কঠিন ব্যাপার ছিল না। তাই কিরঘিজদের সঙ্গে উভয়পক্ষের বোধগম্য ভাষাতে মোটামুটি কথা চালিয়ে যেতে তার অসুবিধে হল না।

কিরঘিজ মেয়েরা ওকে কাছে পেয়ে আর ছাড়তে চায় না। ওর চুল কেন সোনালি, ওর চোখ কেন নীল, এইসব প্রশ্নের জবাব দিতে হল জীবাকে। কিরঘিজ জাতের মানুষগুলোই হাসিখুশিতে ভরা। তারা কুমারজীবকে চমরীর পিঠে চড়িয়ে তৃণভূমিতে ঘোরাতে লাগল। জীবা আর তার ছেলে তিনটি দিনের আগে অতিথিবৎসল কিরঘিজদের হাত থেকে ছাড়া পেল না।

ওদের কাছ থেকে চলে আসার সময় কিরঘিজ মেয়েরা মা আর ছেলের জন্য হাতে বোনা দু'খানা কম্বল দিল, ওজনে যা হাল্কা, গায়ে জড়ালে গরম। হুব্বা এক কাণ্ড করে বসল। সে জোর করে তার একটা চমরী গাই জীবাকে দিয়ে বলল, এ দুধও দেবে আবার দরকার মত তোমাদের বোঝাও বইবে। নিয়ে যাও মা, ভারী শান্তি পাব। আমার ধন আর কে নেবে বল।

জীবার সঙ্গে সঙ্গে হুব্বা এল কিছু পথ এগিয়ে দিতে। ফিরে যাবার সময় হুব্বাকে জীবা বলল, মা যেমন করে তার সন্তানটিকে ভালবাসে তুমি তেমন করে ভালবাসবে তোমার চারদিকের মানুষকে।

হুব্বা বলল, বড় ভাল কথা বলেছ মা, আমি সারাজীবন তোমার এ কথাটি মেনে কাজ করার চেষ্টা করব।

এ আমার কথা নয় বাবা, যিনি পৃথিবীর সবাইকে সমান চোখে দেখেন সেই বুদ্ধ করুণাময়ের কথা।

হুব্বা কুমারজীবকে কোলে তুলে আদর করল। তারপর হাতের পাতায় চোখের জল মুছতে মুছতে চলে গেল চারণভূমির দিকে। জীবার শেষ কথাটি যখন সে ভাবত তখন তার হৃদয়খানা আকাশ হয়ে যেত।

চমরী গাইটিকে তাড়াতে তাড়াতে ভিক্ষুণী জীবা এক সময় এসে পৌঁছল একটি হ্রদের ধারে। বিশাল হ্রদটি নীলকান্তমণির মত নীল জলে ভরে আছে। তার চারদিকে পর্বতশ্রেণী। কোনো কোনো পর্বতগাত্রের রঙ গৈরিক, কোনোটি বা নীলাভ। অধিকাংশ পর্বতশৃঙ্গ তুষার মুকুট পরে জলের আরশিতে প্রতিবিম্ব দেখছে।

ক্লান্ত জীবা কাষ্ঠ নির্মিত পাত্রে জল ভরে নিল। আচমন, স্নানাদি করে পথের শ্রান্তি দূর করল। কুমারজীবও যথাবিহিত স্নান শেষে মায়ের পাশটিতে বসে দেখতে লাগল হ্রদের শোভা।

কি পরিষ্কার স্বচ্ছ জলের হ্রদ। মনে হচ্ছে জলের মধ্যে আর এক তুষার রাজ্য। সে জগৎ আলৌকিক, আশ্চর্য মায়াময়।

জীবা ভাবল একটি রাত্রি সে এই বিশাল জলাশয়ের কূলে কাটিয়ে দেবে। পর্বতগাত্র সংলগ্ন গুহার অভাব নেই এখানে।

দ্বিপ্রহরে আহার শেষ করে মাতা পুত্র হ্রদের তীর ধরে যাত্রা করল দক্ষিণে। এই পথেই তারা বেরিয়ে যাবে ভারতের দিকে। বেলা শেষে হ্রদের দক্ষিণ তীরে পৌঁছে রাতের আশ্রয়ের জন্য একটি গুহা খুঁজে নিল তারা।

সূর্যাস্তের রঙ তখন পশ্চিম আকাশ থেকে চুঁইয়ে পড়েছিল হ্রদের জলে। শ্বেতবর্ণের তুষারশৃঙ্গগুলি সেই জলে স্নান করে সিঁন্দুর বর্ণ ধারণ করেছিল। একঝাঁক হংস বলাকা উড়ে গেল পুব থেকে পশ্চিমে। তারা শূন্যের বুকে সুন্দর একটি ত্রিভূজ তৈরি করে উড়ে চলেছিল। তাদের পাখার শব্দ শুনে করতালি দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল বালক কুমারজীব।

কৃষ্ণা প্রতিপদ তিথির চাঁদ উঠল পাহাড়ের আড়াল থেকে। মনে হল, কোনো দেবকন্যা তার লজ্জারুণ

মুখখানা বের করে সরসীর আরশিতে নিজেকে দেখার চেষ্টা করছে।

রাত গভীর, কুমারজীব ঘুমিয়ে পড়েছে। শ্বেত পুচ্ছ শিলার ওপর ছড়িয়ে চমরী গাভীটি নিদ্রামগ্ন। একা জেগে আছে জীবা। চন্দ্র মধ্য গগনে। স্নিগ্ধ জ্যোতির্ময় মূর্তি। জীবার মনে হল, এক পরম সুন্দর পুরুষ এমনি এক নিশীথে চলে গেলেন কপিলাবস্তু ত্যাগ করে। পেছনে পড়ে রইল বহু আকাঙ্ক্ষিত প্রাসাদ বিলাস, বৈভব। আর রইল পশ্চাতের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ পত্নী যশোধরা, পুত্র রাহুল।

সংসারের সীমা ভেঙে গেছে তাঁর কাছে। পরিবারের গণ্ডী, রাজ্যের গণ্ডী ভেঙে গিয়ে সারা বিশ্ব তাঁর ভাবনায় হয়ে উঠেছে এক নীড়।

জীবা নির্নিমেষ তাকিয়ে রইল মধ্যযামের চন্দ্রের দিকে। পৃথিবীর পর্বত, নদী, অরণ্য, সমুদ্র, লোকালয়, সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে তার স্নিগ্ধ কিরণধারা। পক্ষপাতিত্ব নেই বিতরণে। ভূবন ভরে সাম্য আর মৈত্রীর প্রবাহ।

ভিক্ষুণী জীবার কণ্ঠ থেকে নির্গত হতে লাগল বুদ্ধ-বন্দনার সুর। ধর্মকে, সঙ্ঘকে, সবার ওপরে তোমাকে অনুসরণ করব প্রভু।

সঙ্গীতের জন্য বিখ্যাত কুচী রাজ্য। রাজকন্যা জীবা আশৈশব সঙ্গীত সাধিকা। তার কণ্ঠের স্তোত্রধ্বনি জলতলের ওপর দিয়ে সুরতরঙ্গ বিস্তার করে দূর থেকে দূরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

এক সময় নিশীথের অবসান সূচিত হল প্রভাতী বায়ু-প্রবাহে। জীবা পরম বিস্ময়ে দেখল, হ্রদের পশ্চিম পর্বত-দেহে সংলগ্ন হয়ে আছে চন্দ্র আর পূর্ব শৈল-শীরে নবোদিত দিবাকর।

হ্রদের সীমা অতিক্রম করে ওরা নামতে লাগল মালভূমির উৎরাই পথে। অপরাহ্নকালে সহসা এক রূপলোক যাত্রীদের চোখের সামনে ফুটে উঠল। সবুজ অরণ্য-বৃক্ষের অন্তরালে পার্বত্য জনপদ। অরণ্যলোক ঘিরে ধূম্রবর্ণ পর্বত শ্রেণী। ঐ পর্বতের পশ্চাতে শুভ্র তুষার শোভিত শৈলমালা। সে এক মনোরম দৃশ্য। যাত্রা থামিয়ে জীবা পুত্রকে নিয়ে অপার বিস্ময়ে দেখতে লাগল সেই স্বর্গীয় শোভা।

এক সময় তারা নেমে এল অরণ্যঘেরা জনপদের কাছে। প্রস্তর ও কাষ্ঠ নির্মিত গৃহগুলি দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। রক্তিম ধ্বজা উড়ছিল কোনো মন্দির শীর্ষে। পাহাড়ের ঢালুতে ফলকর বৃক্ষ। ছোট্ট একটি নদীর ধারে ক্ষেতি। কয়েকজন ক্ষেতিকার গরু নিয়ে শস্য মাড়াইয়ের কাজে ব্যস্ত।

মানুষগুলি ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল জীবা আর তার পুত্রকে। এই সম্ভ্রান্ত যাত্রীরা যে সাধারণ বণিক নয় তা তারা বুঝতে পারল। তারা পরস্পর কি যেন পরামর্শ করল। একজন ছুটল গ্রামের দিকে।

অল্পবিস্তর সমতলের ওপরেই অরণ্যের অবস্থান। জীবা এতকাল পরে একটি গ্রামের মধ্যে প্রবেশের সুযোগ পেল। কিছু পথ অগ্রসর হতেই তারা গাছগাছালির অন্তরাল থেকে শুনতে পেল সঙ্গীতের শব্দ। ক্রমে সে শব্দ এগিয়ে আসতে লাগল। বালিকা কণ্ঠের সম্মিলিত সঙ্গীত-ধ্বনি।

জীবা পথের ওপরেই দাঁড়িয়ে পড়েছিল। সম্মেলক সঙ্গীতের দলটি তার কাছে এসে থেমে গেল। বালিকাদের দলটির পেছনে গ্রামের আবাল-বৃদ্ধবণিতাকে দেখা যাচ্ছে। প্রবীণ এক ব্যক্তি এগিয়ে এল সামনে। বলল, আপনি দয়া করে আমাদের গ্রামে এসেছেন। আপনাকে অতিথি হিসেবে পেলে আমরা ধন্য হব।

সমস্ত শব্দগুলি পরিচিত না হলেও বহু ভাষাবিদ জীবার পক্ষে বিষয়টি বুঝে নিতে অসুবিধে হল না। সেও সবিনয়ে বলল, আপনাদের ভালবাসায় আমি বাঁধা পড়লাম।

কথা কটি বলে জীবা এমন এক নির্মল হাসি হাসল যা উপস্থিত গ্রামবাসীদের অভিভূত করল।

এরপর কোনো আপত্তি না শুনে একটি বলিষ্ঠ পুরুষ কুমারজীবকে কাঁধে তুলে নিয়ে গ্রামের ভেতর যাত্রা করল। জীবার হাত ধরে বালিকার দল মহানন্দে চলল তাদের বসতি এলাকার দিকে।

মন্দির সংলগ্ন একটি গৃহে স্থান পেল জীবা আর তার পুত্র। প্রতিটি গৃহ থেকে জীবার জন্য এল আহার্য। জীবা কণামাত্র রেখে বাকি সবই ফিরিয়ে দিল গৃহস্বামীদের। কিন্তু সে লক্ষ করল, প্রতি গৃহ থেকে একটি শুষ্ক ডাল কিংবা একখণ্ড কাঠ রেখে যাওয়া হচ্ছে বিরাট এক উনুনের ধারে।

এটি হুঞ্জাদের গ্রাম। হুঞ্জারা বড় অতিথি বৎসল। এই গ্রামে ছোট্ট একটি বন আছে। হুঞ্জারা বড় সাবধানে ওই বন থেকে কাঠ সংগ্রহ করে। সেই কাঠগুলি তারা বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়ে গিয়ে জ্বালানি হিসেবে বিক্রি করে আসে।

জীবা মন্দিরের পুরোহিতকে এক সময় প্রশ্ন করে জানতে পারল, অতিথির শীত নিবারণের জন্য প্রতিটি গৃহস্থ তাদের মুল্যবান সঞ্চয় থেকে ঐ কাঠের টুকরোগুলি দিয়ে গেছে।

সাত দিনের আগে হুঞ্জাদের গ্রাম থেকে মুক্তি পেল না জীবা। ভিক্ষুণী জীবার আচরণে তারা এত মুগ্ধ হল যে প্রতি সন্ধ্যায় জীবার কথা শোনার জন্য তারা মন্দির প্রাঙ্গণে জড়ো হতে লাগল।

জীবা বুদ্ধের নানা জন্মের কাহিনীগুলি তাদের সামনে বলে যেত। তারপর সেইসব কাহিনীর ভেতর সংসারী মানুষের জন্য যেসব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, সে-সব বুঝিয়ে বলত। মানুষগুলি ছিল বড় সরল। তারা সকলেই ভিক্ষুণী জীবার কাছ থেকে গ্রহণ করল বুদ্ধের ধর্ম। এমনকি মন্দিরের পুরোহিতও নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে বৌদ্ধ শ্রমণে পরিণত হল। ভিক্ষুণী জীবা এই পুরোহিতের ওপর দিয়ে গেল প্রভু বুদ্ধের ধর্ম রক্ষার ভার।

আবার পথ। এখন সবচেয়ে দুর্গম বুর্জিল গিরিপথটি পার হতে হবে। এর চড়াই আর উৎরাই দুটিই বিপদজনক। সবে গ্রীষ্ম ঋতুর শুরু। পর্বত দেহে ঘন বরফ থাকলেও সানুদেশ থেকে সরে গেছে বরফ। তাই চলার পথে তুষার থেকে পিছলে পড়ার সম্ভাবনা কম। তবু মা ও ছেলে সতর্কতার সঙ্গে পার হচ্ছিল গিরিপথ। কোথাও বহু নিম্নে দেখা যাচ্ছিল সূক্ষ্ম পথরেখা। কিন্তু সেখানে পৌঁছবার উৎরাই পথটি ছিল সম্পূর্ণ খাড়াই। এই খাড়াই পথে নামা ছিল খুবই বিপদজনক। জীবা একটি রজ্জুতে বেঁধে রেখেছিল কুমারজীবের কটিদেশ। সেই রজ্জুর একপ্রান্ত ছিল তার নিজের কোমরে বাঁধা। সে উৎরাই পথে পুত্রকে বলছিল, প্রভু তথাগতের ভক্তের কখনও পতন হয় না। তুমি সাহস সঞ্চয় করে নেমে যাও। কেবল পায়ের তলায় উপযুক্ত প্রস্তরের সন্ধান করে পা রেখো। নিম্নে খাদ কত গভীর সে কল্পনা মনে স্থান দিও না।

অলৌকিক প্রতিভাধর জাতক ছিল কুমারজীব। ইতিমধ্যেই সে মায়ের শিক্ষাধীনে থেকে বৌদ্ধ শাস্ত্রে পণ্ডিত হয়ে উঠেছিল। তার চিত্ত ছিল স্থির। তাই সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করছিল মাতৃআজ্ঞা।

জীবা দুর্গম পথ অবরোহণ করতে করতে ভাবছিল, সংসারে যার চিত্ত স্থির সে অদেখাকে দেখতে পায়, অশ্রুতকে শুনতে পায়। সে পূর্ব থেকেই নিজেকে সবকিছুর জন্য প্রস্তুত রাখতে পারে।

জীবা পুত্রকে সম্বোধন করে বলছিল, সমতলভূমির ওপর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত প্রস্তর পড়ে থাকলে কেউ যেমন ভূতল স্পর্শ না করে নির্ভয়ে প্রস্তরের ওপর পা রেখে অবলীলায় চলে যেতে পারে, তুমিও সেইভাবে নির্ভয়ে চড়াই উৎরাই অতিক্রম করার চেষ্টা করবে।

দুর্গম গিরিপথ পার হয়ে ওরা একসময় এসে দাঁড়াল পর্বত নিম্নে। দূরে শৈলশ্রেণীর মধ্যবর্তী অরণ্য তার রৌপ্যসূত্রের ন্যায় গিরিনদী দেখা যাচ্ছিল।

জীবা বলল, চমরীটিকে হুঞ্জাদের কাছে রেখে এসে উপযুক্ত কাজই করা হয়েছে।

কুমারজীব বড় ভালবেসে ফেলেছিল গাভীটিকে। সে চমরীকে সঙ্গে আনতে না পারায় মনে মনে বড় কাতর হয়ে পড়েছিল। মায়ের মন্তব্য শুনে সে বলল কেন মা?

হয়ত পার্বত্য জীবটি আমাদের চেয়েও অবলীলায় নেমে যেতে পারত, কিন্তু যদি সে অক্ষম হত তাহলে তাকে যে কোনো স্থানে পরিত্যাগ করে চলে যেতে পারতাম না। সেক্ষেত্রে আমাদের পড়তে হত উভয় সংকটে।

একটু থেমে বলল, বাবা, কোনো বিষয়েই মায়ায় আবদ্ধ হতে নেই। মাকে ভালবাসবে কিন্তু সে ভালবাসা কখনো তোমাকে যেন মায়ায় বন্দি করে ফেলতে না পারে।

কিছু বুঝল, হয়তো বা কিছু বুঝল না কুমারজীব। সে মাকে গভীরভাবে বিশ্বাস করতেই শিখেছিল। মায়ের এক একটি বাক্য তার হৃদয়ে তথাগতের বাণীর অমৃতময় প্রতিধ্বনি বলে মনে হত।

সেদিন সন্ধ্যায় ওরা পর্বত সংলগ্ন বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। অদূরেই দেখা যাচ্ছিল একটি গুহা।

গুহার সম্মুখভাগে পড়েছিল বৃহদায়তন একখণ্ড শিলা।

জীবা চলার পথে সারাদিন কিছু ডালপালা সংগ্রহ করেছিল। সেই ডালপালা জড়ো করে চকমকি ঠুকে সে আগুন জ্বালিয়েছিল। তার উদ্দেশ্য ছিল বাইরে যতক্ষণ না অসহ্য শীত পড়ছে ততক্ষণ এই বৃক্ষতলে বসেই নৈশ্য আহার ইত্যাদি প্রস্তুত করে নেবে। তারপর প্রয়োজনে আশ্রয় নেবে ঐ পর্বতগুহায়।

পরিকল্পনা মত কাজও করেছিল সে। হঠাৎ একটি কাশির শব্দে চমকে উঠল জীবা।

শব্দটা আসছিল গুহার দিক থেকে। অন্ধকারে কোনোকিছুই দেখা যাচ্ছিল না।

হঠাৎ আগুনের শিখায় জীবা দেখল একটি মনুষ্য-মূর্তি। গরমের পোশাকে সারাদেহ আবৃত করে দাঁড়িয়ে আছে সামনে।

পাশেই কুমারজীব নিদ্রামগ্ন। জীবা চিরদিনই নির্ভীক। সে স্পষ্ট কণ্ঠে তার মাতৃভাষায় জিজ্ঞেস করল, কে আপনি?

আশ্চর্য! পুরুষটিও কুচীর ভাষায় জবাব দিল, আমি একজন বণিক।

আপনি কি কুচী কিংবা অগ্নিদেশ থেকে আসছেন?

হ্যাঁ, সম্প্রতি আমি কুচী থেকেই আসছি। তবে আমি কুচীর মানুষ নই।

জীবা বলল, তা আমি বুঝেছি। আপনার আকৃতিতে কুচীর মানুষের আদল নেই।

আমি কাশ্মীরী বণিক।

আমরা কাশ্মীরে চলেছি। কিন্তু আপনার দলের অন্য বণিকেরা কই? কোনো বণিক তো একা একা পথ চলেন না।

আপনি ঠিকই ধরেছেন। আমরা একসঙ্গে প্রায় কুড়িজন পথ চলছিলাম। হুন দস্যুরা আক্রমণ করায় আমরা যে যেদিকে পেরেছি পালিয়েছি, আর একসঙ্গে মিলিত হতে পারিনি।

জীবা জানতে চাইল, ওদের আক্রমণের কারণ?

কুচী নগরী থেকে নাকি একটি সোনার বুদ্ধমূর্তি চুরি গেছে। ঐ হুন দস্যুদের ধারণা, কোনো বণিক দলের এই কাজ। তাই তারা হন্যে হয়ে খুঁজছে ঐ সোনার মূর্তিটি লুঠ করে নেবার জন্য।

মূর্তিটি যে চুরি গেছে একথা ওদের কে বললে?

আমি লোকমুখে যতটুকু শুনেছি, মূর্তিটি ছিল এক বৌদ্ধ বিহারে। সেখানে আর সে মূর্তিটি নাকি দেখা যাচ্ছে না।

এরপর জীবা নিরুত্তর রইল। লোকটি এবার আগুনের ধারে বসে হাত মুখ গরম করতে লাগল। একসময় জীবার দিকে চেয়ে বলল, আপনারা রাতে এই গাছতলাতেই কাটাবেন নাকি?

জীবা বলল, উপায় কি, গুহা তো একটিমাত্র, তাও আকারে বড় নয়।

আমার কাছে ছোট একটি তাঁবু আছে। হয় আপনি গুহা নিন, নয়তো তাঁবু।

আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা নেই। আপনি যা দেবেন তাই নেব।

বণিকটি ক্ষণকাল কি যেন চিন্তা করে বলল, আপনারা গুহার ভেতরে থাকুন, আমি বাইরে তাঁবুতে থাকব।

জীবা তার প্রস্তুত করা কিছু খাদ্য লোকটির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, যৎসামান্য গ্রহণ করলে আমি বিশেষ তৃপ্তিলাভ করব।

লোকটি সাগ্রহে এবং সানন্দে জীবার দেওয়া খাদ্যবস্তু গ্রহণ করল।

রাতে ব্যবস্থামত গুহার ভেতরেই আশ্রয় নিল জীবা। বণিকটি বাইরে তাঁবুর ভেতর প্রবেশ করল।

অপরিচিত মানুষ সন্নিকটে, তাই বেশীর ভাগ রাত জেগেই কাটাতে হল জীবাকে।

আকাশে ক্ষীণ শশাঙ্ক দেখা দিল ভোররাতে। তন্দ্রাচ্ছন্ন জীবা সহসা তাকিয়ে দেখল মানুষটি কখন উঠে তাঁবু গুটিয়ে নিয়েছে। সঙ্গে সামান্য যা বোঝা ছিল তাও বেঁধে নিয়েছে পিঠে। লোকটি গুহার দিকে একবার ফিরেও তাকাল না। নিঃশব্দে আলো অন্ধকারের ভেতর দিয়ে উৎরাই পথে নেমে গেল।

জীবা বণিকটির আচরণ সম্বন্ধে ভাবতে লাগল। তার মনে হল, বণিকটিকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। বণিকের কাছে সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু হল, সময়। ঐ মানুষটি মনে মনে ভেবেছে, একটি নারী ও একটি বালকের সঙ্গে পথ চলতে গেলে অনেকখানি সময় তার অযথা নষ্ট হয়ে যাবে। তার চেয়ে বিদায় না নিয়ে নিঃশব্দে চলে যাওয়াই শ্রেয়।

বণিকটি কিন্তু মনে মনে যাই ভাবুক, কার্যক্ষেত্রে ঘটল ভিন্ন রকম। সদাগরদের বাঁধাধরা পথ ধরে সে চলে গেল। জীবা চলল, অজানা, অচেনা পথ আবিষ্কার করতে করতে। যেখানে বাঁধা পথ ধরে এগোলে পাহাড় পরিক্রমা করতে হবে সেখানে তার আনাড়ী পা খাড়াই পথে নেমে অনেকখানি দূরত্ব কমিয়ে আনল। এমনিভাবে চলতে গিয়ে সে বণিকটির কিছু আগেই কাশ্মীরের সীমানায় পৌঁছে গেল।

কাশ্মীর রাজ্যে প্রবেশের বিভিন্ন দিক আছে। ঐ প্রবেশপথগুলির মুখে একটি করে শুল্ক-চৌকি থাকে। বণিকদের কাছ থেকে ঐ সকল প্রবেশ পথে কর আদায় করা হয়। তাছাড়া বিদেশি শত্রুর ওপরেও লক্ষ্য রাখা হয় ঐ প্রবেশ পথের সন্নিকটে কোনো সুউচ্চ বৃক্ষে অবস্থিত গৃহ থেকে।

জীবা প্রবেশ পথের সম্মুখে এসে পড়া মাত্রই রক্ষীরা তাকে আটকাল। পরণে ভিক্ষুণীর পোশাক, নিঃসন্দেহে বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী। কিন্তু অবয়বে জীবা বিদেশিনী। তাই রক্ষীরা তার ঝোলাঝুলি পরীক্ষা করে দেখতে চাইল।

সন্ধানে পাওয়া গেল সেই সোনার বুদ্ধমূর্তি। শৌল্কিক (শুল্ক গ্রহণকারী রাজকর্মচারী) বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় জিজ্ঞেস করল, কোথা থেকে আপনি আসছেন?

কুচী নগরী থেকে।

আমাদের কাশ্মীরী বণিকেরা পণ্য নিয়ে গোদান, শূলি, কুচী, অগ্নিদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে গমনাগমন করে থাকে।

জীবা বলল, আমারও সেকথা অজানা নয়।

আপনাকে দেখে নিশ্চিত অনুমান করতে পারি, আপনি বৌদ্ধ ভিক্ষুণী।

মহাশয়, আপনার অনুমান যথার্থ।

শৌল্কিক এবার প্রশ্ন করল, কিন্তু কি কারণে আপনার কাশ্মীরে আগমন, জানতে পারি কি?

এই বালক আমার একমাত্র সন্তান। শুনেছি কাশ্মীর বিদ্যাচর্চার একটি পীঠস্থান। আমি পুত্রের উপযুক্ত শিক্ষার আশায় এই মহান দেশে এসেছি।

সাধু পরিকল্পনা আপনার। সুদূর কুচী নগরীতে অবস্থান করেও আপনি যেভাবে সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেছেন তাতে আমি বিস্মিত হয়েছি।

কুচী নগরীতে বৌদ্ধধর্ম-চর্চার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত আর পালি ভাষার চর্চাও হয়ে থাকে।

আপনি এখন কোথায় যেতে চান?

ভেবেছি নগরীতে প্রবেশ করে প্রথমে একটি আশ্রয়ের সন্ধান করব। তারপর উপযুক্ত ও অনুকূল সময়ে পুত্রের শিক্ষার একটা ব্যবস্থা করা যাবে।

শৌল্কিক মানুষটি বণিকদের কাছ থেকে উৎকোচ গ্রহণে অত্যন্ত সিদ্ধহস্ত হলেও বিদ্যাচর্চার প্রতি চিরকালই তার কিছু অনুরাগ আছে। সে বলল, আপনি ভিক্ষুণী, কিন্তু যুবতী। কাশ্মীরে সম্পূর্ণ নবাগতা। কাশ্মীর সম্বন্ধে সংক্ষেপে দু'চার কথা নিবেদন করছি। হয়তো আপনার উপকারে আসতে পারে।

জীবা সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে বক্তার দিকে তাকিয়ে রইল।

শৌল্কিক বলতে লাগল, মহারাজ কনিষ্ক যে সাম্রাজ্য পত্তন করেছিলেন, পরবর্তী কুষাণ সম্রাটেরা তাকে রক্ষা করতে পারেননি। এখন সেই বিশাল সাম্রাজ্য খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত। যাঁরা কুষাণ সম্রাটদের দ্বারা রাজ্যের বিভিন্ন অংশ শাসনের কাজে নিযুক্ত ছিলেন সেই 'কিদার কুষাণে'রা এখন স্বাধীনভাবে সেই সকল অংশের অধীশ্বর। আপনি বুঝতেই পারছেন রাজ্য খণ্ড খণ্ড হয়ে যাবার ফলে পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব কম। মাঝে মাঝে যুদ্ধ বিগ্রহের ভেতর দিয়ে শক্তি পরীক্ষাও হয়ে যায়।

একটু থেমে শৌল্কিক বলল, আপনি বুদ্ধিমতী, আপনাকে এতগুলি কথা বলার অর্থ হল, প্রতিটি পদক্ষেপে বিচার ও বিবেচনার প্রয়োজন।

জীবার কণ্ঠে কৃতজ্ঞতার সুর, আপনি অযাচিতভাবে যে উপদেশ দিলেন তা চিরদিন আমার মনে থাকবে।

শৌল্কিক বলল, আপনার এই সুবর্ণ নির্মিত বুদ্ধ মূর্তিটি সম্বন্ধে আমি কিছু প্রশ্ন করলাম না। আপনি বৌদ্ধ ভিক্ষুণী, তাই বুদ্ধের মূর্তি বহন করে নিয়ে চলেছেন। এর বেশী আমার জানার প্রয়োজন নেই।

শৌল্কিককে সকৃতজ্ঞ নমস্কার জানিয়ে জীবা সন্তানের হাত ধরে শ্রীনগর অভিমুখে অগ্রসর হতে লাগল।

বেশ কিছু পথ ঋজু বৃক্ষের ছায়াতপের মধ্য দিয়ে যাত্রা করে মা ও ছেলে এক প্রবাহিনীর তীরে এসে পৌঁছলো। লোক মুখে জানতে পারল, এই সেই বহুশ্রুত বিখ্যাত নদী বিতস্তা।

কূলে এসে উপলাস্তৃত ভূমিতে বসল দুজনে। নদীর ওপারে তখন তরী নিয়ে যাত্রা করেছে পাটনী।

হঠাৎ অশ্বখুরের ধ্বনি শুনে পশ্চাতে ফিরে তাকাল জীবা। প্রায় মুখোমুখি এসে দাঁড়াল তিনজন অশ্বারোহী। তারা একে একে ঘোড়া থেকে নামতেই জীবা উঠে দাঁড়াল। আশ্চর্য! পথে পরিচিত সেই কাশ্মীরী বণিকটিও অশ্বারোহণে এসেছে।

দ্রঙ্গাধিপ (শত্রু আগমন পর্যবেক্ষণের জন্য পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত উচ্চ মঞ্চে যিনি অধিষ্ঠান করেন) বললেন, ইনি নগরাধিপ (নগর পরিচালক)। আর ঐ বণিকটি নিশ্চয়ই আপনার পূর্ব পরিচিত।

জীবা মাথা নেড়ে জানাল, প্রশ্নকর্তার ধারণা সঠিক।

এবার নগরাধিপ কথা বললেন, আপনি যখন শৌল্কিকের সঙ্গে কথা বলছিলেন তখন মঞ্চ থেকে দ্রঙ্গাধিপ আপনার হাতে একটি সোনার বুদ্ধ মূর্তি দেখতে পান। উনি বৃক্ষের ওপর অবস্থিত পর্যবেক্ষণ মঞ্চ থেকে নেমে আসেন। শৌল্কিক ওঁকে জানান, আপনি ভিক্ষুণী, পূজার জন্য মূর্তিটি সঙ্গে রেখেছেন। কিন্তু......

একটু থেমে নগরাধিপ বললেন, কিন্তু ওঁদের কথোপকথনের সময় এই বণিকটি উপস্থিত হয়। সে জানত না আপনার কাছে সোনার একটি বুদ্ধ মূর্তি আছে। তারপর ঐ বণিকের কাছ থেকেই শোনা গেল কুচীর বিহার থেকে সোনার বুদ্ধ মূর্তি অপহরণের কথা। হুন দস্যুদের হাতে বণিকদের লাঞ্ছনার কথা। এ বিষয়ে আপনার কিছু বক্তব্য আছে কি ?

সামান্য মাত্র। আমি রাজপরিবারের কন্যা। ভিক্ষুণী ব্রত গ্রহণ করে প্রাসাদ থেকে বিহারে যাবার সময় এই মূর্তিটি সঙ্গে নিয়ে যাই। হুন দস্যুরা ছদ্মবেশে নিশ্চয়ই এই মূর্তি বিহারে গিয়ে দেখে থাকবে। তারপর এক সময় মূর্তিটি নেই দেখে কোনো বণিকদল অপহরণ করে নিয়ে গেছে ভেবে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ভারতীয় বণিকদলের ওপর তাদের সন্দেহের কারণ, বৌদ্ধ বিহারে আরতির জন্য ওরাই চামর বিক্রয় করে। কোনো কোনো সময় বণিকদল বিহারের মধ্যেই রাত কাটায়। এখন হুন দস্যুরা যে স্বর্ণ মূর্তিটি লাভের সুযোগ খুঁজছিল, তা যদি অন্য কেউ অপহরণ করে তাহলে স্বভাবতই তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে। অবশ্য এ সকল আমার নিজের অনুমান।

কথাগুলি বলে সে বুদ্ধ মূর্তিটি ঝুলি থেকে বের করে নগরাধিপদের দেখাল।

জীবার আড়ালে দ্রঙ্গাধিপের সঙ্গে আলোচনা করলেন নগরাধিপ। পরে জীবার দিকে ফিরে বললেন, আপনার কথায় সত্য থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু আমরা মহারাজ মেঘবাহনের অধীনস্থ কর্মচারী মাত্র। আপনি অনুগ্রহ করে রাজসমীপে চলুন। সেখানেই আপনার বক্তব্য রাখবেন।

জীবা সস্মিত মুখে বলল, এসেছি কাশ্মীরে, আপনাদের অনুগ্রহে রাজদর্শনও সম্ভব হচ্ছে, একি কম কথা!

শ্রীনগরে বিতস্তা নদীর কূলে মহারাজ মেঘবাহনের রাজধানী। নদীর তীরে উদ্যান বেষ্টিত রাজপ্রাসাদ। পশ্চাতে অরণ্য আর পর্বতের সবুজ, নীল আর শুভ্র সুষমা। অদূরে পর্বত বেষ্টিত হ্রদ। গ্রীষ্মে ঐ হ্রদে নববধূর মত বিকশিত হয়ে উঠেছে শতদল পদ্ম।

কাষ্ঠ ও প্রস্তর নির্মিত ত্রিতল রাজপ্রাসাদ। প্রাসাদ শীর্ষে পিত্তল নির্মিত গম্বুজ। শ্বেত হংসের মত দুখানি প্রমোদতরণী প্রাসাদ সংলগ্ন ঘাটে বাঁধা রয়েছে। মহারাজ জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রে ঐ তরণীতে প্রমোদবিহারে বহির্গত হন। বিতস্তা থেকে যে নহরটি (খাল) হ্রদে গিয়ে পড়েছে, সেই নহর ধরে তরণী হ্রদে প্রবেশ করে। নহরের দুই তীরে দীর্ঘ কাণ্ড বিশিষ্ট পত্রাচ্ছাদিত বৃক্ষরাজি। এই নহরপথটি মহারাজের একান্ত ব্যক্তিগত ভ্রমণ-পথ। মহারানী অমর্তপ্রভার আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করার জন্য তিনি বিবাহের অব্যবহিত পরেই এই নহরটি খনন করে হ্রদের সঙ্গে যুক্ত করেন। সে আজ দশ বৎসর পূর্বের ঘটনা।

মহারানী ছিলেন মহারাজ মেঘবাহনের যথার্থ-ই হৃদয়েশ্বরী। রাজ অন্তঃপুরে তিনি ছিলেন পরিচারিকা পরিবৃতা একেশ্বরী। মহারানী চার বছর আগে মহারাজকে একটি চম্পক পুষ্প উপহার দিয়ে অকস্মাৎ অমর্তলোকে প্রস্থান করেন। সেই উপহারকে আশ্রয় করেই মহারাজ মেঘবাহন পত্নী বিয়োগের সান্ত্বনা খুঁজে বেড়ান। রাজকন্যা চম্পা এখন মহারাজের নয়ন-মণি। রাজকার্যের ফাঁকে ফাঁকে তিনি চলে আসেন অন্তঃপুরে। শিশুকন্যাটির দিকে চেয়ে থাকেন এক দৃষ্টিতে। উদ্বেলিত হৃদয়ের স্নেহপ্রবাহ উচ্ছ্বসিত অশ্রুবারিতে ঝরে পড়ে।

সেদিন সভাতে বসেছিলেন মহারাজ মেঘবাহন। অবসর খুঁজছিলেন অন্তঃপুরে যাবার। সহসা সম্মুখ দ্বার দিয়ে প্রবেশ করলেন নগরাধিপ। মহারাজের উদ্দেশ্যে যথাবিহিত অভিবাদন জানিয়ে রাজকুমারী জীবার বৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন।

প্রকাশ্য রাজসভাতে বিচারার্থিনী হলেও কোনো নারীর প্রবেশের নিয়ম ছিল না। সভা সংলগ্ন একটি কক্ষে পশ্চাৎ দ্বার দিয়ে নিয়ে যাওয়া হত বিচারার্থিনীকে। সেখানে দরজা আবৃত করে ঝুলত বংশ-শলাকা নির্মিত চিক। উপবেশনের পর অন্তরাল থেকে উত্তর দেওয়ার রীতি ছিল।

মহারাজ মেঘবাহন সকল কথা শুনে ভিক্ষুণী জীবাকে অন্তঃপুরে নিয়ে যাবার আদেশ দিলেন। দৌবারিককে বললেন, ভিক্ষুণীর থাকার ব্যবস্থা যেন তাঁর ইচ্ছামত করা হয়। উপযুক্ত সময়ে তিনি ভিক্ষুণীকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।

জীবা সপুত্র চলল রাজ অন্তঃপুরে। দৌবারিক পরিচারিকাদের হাতে জীবাকে সমর্পণ করে মহারাজের নির্দেশটি জানিয়ে দিল। পরিচারিকা নবাগতা জীবাকে সসম্ভ্রমে নিয়ে চলল অন্তঃপুরের দক্ষিণ প্রস্থে। রানীমহলের একেবারে বিপরীত দিকে এই প্রস্থ। রাজগৃহে কোনো উৎসব উপলক্ষ্যে আত্মীয় সমাগম হলে মহিলারা ঐ প্রস্থটি অধিকার করে থাকেন। বর্তমানে কোনোরূপ উৎসব অনুষ্ঠান না থাকায় ঐ মহলটি শূন্য পড়েছিল।

জীবা ও তার পুত্রকে সবিনয়ে একটি বাসযোগ্য কক্ষ বেছে নিতে বলল পরিচারিকারা। জীবা নিম্নতলে অবস্থিত অতিক্ষুদ্র একটি কক্ষ তার অবস্থানের জন্য বেছে নিল।

অন্তঃপুরে জীবার আগমনের তৃতীয় দিনে মহারাজ মেঘবাহনের মনে পড়ল ভিক্ষুণী জীবার কথা। অমর্তপ্রভার মৃত্যুর পর তিনি কোনো নারীর প্রতি সাধারণত দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন না। স্ত্রীর মৃত্যুর শোক, প্রায় চার বৎসর অতিক্রান্ত হলেও তিনি ভুলতে পারেননি।

রাজসভা থেকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করেই তিনি একদিন চম্পাকে দেখতে না পেয়ে, চম্পা, চম্পা বলে ডাক দিতে লাগলেন। অলিন্দ থেকে অন্তঃপুর-অঙ্গনের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, চম্পা, মুণ্ডিতমস্তক একটি বালকের সঙ্গে খেলায় মত্ত হয়ে আছে। বালকটি কেবল সুদর্শনই নয় সহাস্য ও লাবণ্যময়।

তিনি পরিচারিকাকে প্রশ্ন করে জানতে পারলেন, বালকটি, সম্প্রতি আগত বিদেশিনী মহিলাটির সন্তান। অমনি মহাবাজ মেঘবাহনের মনে হল ভিক্ষুণী এবং তার সোনার বুদ্ধমূর্তিটি সম্বন্ধে এখনও তিনি রাজা হিসেবে কোনো প্রশ্নাদি করেন নি।

পরিচারিকাকে তিনি বললেন, অন্তঃপুরের সাক্ষাৎ কক্ষে ভিক্ষুণীকে নিয়ে এস। কক্ষের মধ্যবর্তী চিকগুলি ফেলে দাও।

প্রধানা পরিচারিকা সুরঙ্গিনী মহারানী অমর্তপ্রভার বড় প্রিয়পাত্রী ছিল। সেজন্য মহারাজ সুরঙ্গিনীকে

অত্যন্ত সুনজরে দেখতেন। আর একমাত্র সুরঙ্গিনীই মহারাজ মেঘবাহনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারত।

সুরঙ্গিনী বলল, মহারাজ আমরা অতিথিকে উপযুক্ত কক্ষ দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি অতি ক্ষুদ্র নিম্নতলের সামান্য একটি কক্ষ অবস্থানের জন্য নির্বাচন করেছেন। তাছাড়া স্বপাকে নিরামিষ আহার করেন, তাও দিনান্তে একবার। শিশুপুত্রটিও এ ধরনের জীবন যাপনে অভ্যস্ত।

মেঘবাহন সস্মিত মুখে বললেন, আমি জানি সুরঙ্গিনী, তুমি থাকতে অতিথির কখনও অযত্ন হবে না।

একটু থেমে আবার বললেন, ভিক্ষুণীর বালক পুত্রটিকে চম্পার সঙ্গে খেলা করতে দেখলাম। মনে হল চম্পা বালকটিকে খেলার সঙ্গী হিসেবে পেয়ে খুবই খুশী হয়েছে।

মহারাজ, আপনার অনুমান যথার্থ। সারাদিন চম্পা অতিথি মহলে থাকতেই ভালবাসে। ওর যথাসময়ে স্নান আহার করানো এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মেঘবাহন বললেন, আহা, মা হারা মেয়ে, ও যাতে এতটুকু আনন্দ পায় তাতেই আমি খুশী।

সুরঙ্গিনী বলল, মহারাজ, ঐ ভিক্ষুণী ইতিমধ্যেই চম্পাকে কতকগুলি স্তোত্র সুর করে গাইতে শিখিয়েছেন। চম্পার গলায় ঐ স্তোত্র শুনলে আপনি মুগ্ধ হয়ে যাবেন।

আচ্ছা, চম্পাকে একবার আমার কাছে নিয়ে এস তো। আমি ওর গান শুনব।

একটু কি ভেবে নিয়ে বললেন, আচ্ছা থাক্, ওরা দুজনে খেলছে খেলুক। তুমি বরং ভিক্ষুণীকে সাক্ষাৎ-কক্ষে নিয়ে এস।

চিকের অন্তরালে এসে বসেছে জীবা। মহারাজ এপারে বসেছেন একটি আরাম কেদারায়।

মহারাজ মেঘবাহন কথা শুরু করলেন, অতিথিশালায় আপনার কোনো অসুবিধে হয়নি তো?

জীবা বলল, অযাচিতভাবে আপনার এত অনুগ্রহ লাভ করে আমার সংকোচের শেষ নেই মহারাজ।

এটা আমার কর্তব্য বলেই জানবেন। আচ্ছা, আমি অত্যন্ত বিস্মিত হচ্ছি আপনার মুখে বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ শুনে। সেদিন নগরাধিপের বিবরণ থেকে জেনেছিলাম, আপনি সুদূর কুচীদেশবাসিনী। বৌদ্ধধর্ম বহু পূর্ব থেকেই ওসব দেশে ছড়িয়ে পড়েছে জানতাম, কিন্তু সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন ওসব অঞ্চলে যে এমন ভাবে হয়েছে তা আমার জ্ঞানের বাইরে ছিল।

মহারাজ, কুচীদেশবাসীরা কিন্তু সংস্কৃতের অনুশীলন করে না।

তাহলে আপনি শিখলেন কি করে?

আমার স্বামীর কাছ থেকে।

তিনিও তো কুচীদেশের অধিবাসী, তিনি শিখলেন কি করে?

না মহারাজ, আমার স্বামী ছিলেন এই ভারতবর্ষেরই মানুষ। তিনি অতিশয় বিদ্বান ও সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান ছিলেন। তক্ষশীলা ছিল তাঁর শিক্ষাক্ষেত্র। একসময় তিনি গৃহত্যাগ করে বণিক দলের সঙ্গে কুচীর দিকে যাত্রা করেন। অনেক বাধা-বিঘ্নের ভেতর দিয়ে যাত্রা করে তিনি অবশেষে কুচীর রাজগৃহে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানেই আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও বিবাহ।

মহারাজ বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, যথার্থই এ এক স্মরণীয় ঘটনা। সুদূর কুচী রাজ্যের সঙ্গে ভারতবর্ষের এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সম্পর্ক !

একটু থেমে আবার বললেন, আপনার কথা থেকে অনুমান, তিনি আর জীবিত নেই।

সঠিক অনুমান মহারাজ। তাঁর মৃত্যুর পরে আমি সর্বতাপহর, শান্তিময় প্রভুর চরণে আশ্রয় নিয়েছি।

সেই মুহূর্তে সহসা মহারাজ মেঘবাহনের অমর্তপ্রভার কথা মনে পড়ল। তাঁর হৃদয় অকস্মাৎ পত্নী-বিরহ ব্যথায় আর্দ্র হয়ে উঠল।

মহারাজ বললেন, এখন বলুন, আপনাকে আমি কিভাবে সাহায্য করতে পারি?

জীবা সবিনয়ে বলল, মহারাজ, আপনার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। সম্পূর্ণ অপিরিচিত স্থানে আপনার আশ্রয় না পেলে আমার বিপর্যয়ের শেষ থাকত না। তবে অনুগ্রহ করে যখন সাহায্যের কথা

তুললেন তখন বলি, রাজগৃহ থেকে দূরে কোনো নির্জন স্থানে আমার থাকার যদি একটু ব্যবস্থা করে দেন, তাহলে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

মহারাজ বললেন, দুটি দিন প্রাসাদে অবস্থান করুন, এরই মধ্যে আপনার ইচ্ছানুযায়ী ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

সামান্য সময় নীরবতার পর জীবা বলল, মহারাজ, এখনও আমার বিচার স্থগিত রয়েছে।

সে কি ! কিসের বিচার?

নগরাধিপ যে কারণে আমাকে আপনার বিচার সভায় উপস্থিত করেছিলেন। সেই সোনার বুদ্ধমূর্তিটি প্রসঙ্গে।

মহারাজ সস্মিত মুখে বললেন, সে বিচারের নিষ্পত্তি অনেক আগেই হয়ে গেছে। কুচীর রাজকন্যা বুদ্ধমূর্তি অপহরণ করবেন, এ কি বিশ্বাসযোগ্য।

মহারাজ, আপনি যেভাবে কুচীর রাজদুহিতার মর্যাদা রক্ষা করলেন তাতে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা আমার নেই।

প্রাসাদ থেকে কিছু দূরে পর্বতের কোলে নির্জন উদ্যান। একটি নৃত্যশীলা ঝর্ণা পাহাড়ের মসৃণ শিলাখণ্ডে নূপুরের নিক্কণ তুলে নেমে আসতে আসতে একেবারে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে একটি পাহাড়ী নদীতে। স্থানটির প্রাকৃতিক শোভা যেমন মনোরম তেমনি প্রকৃতির দ্বারাই সে সুরক্ষিত। এক ধরনের মৃগ ও শশক জাতীয় প্রাণী সেই উদ্যানের শোভা বর্ধন করছে। স্থানে স্থানে ফলকর বৃক্ষের সমাবেশ। মহারাজ মেঘবাহন এখানে একটি পর্ণকুটির নির্মাণ করে রেখেছেন। রাজকার্যে ক্লান্তি এলে কয়েকটি দিনের জন্য তিনি প্রাসাদ ছেড়ে চলে আসেন এই নির্জন নিবাসে। পাখির কাকলি, মৃগের লীলায়িত উল্লম্ফন, ঝর্ণার গান, মেঘের সঞ্চরণ তাঁর মনের মধ্যে জমে ওঠা ক্লান্তিকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

এই উদ্যান বাটিকাটি তিনি ভিক্ষুণী জীবার অবস্থানের জন্য নির্বাচন করে নৌকা যোগে সপুত্রক জীবাকে সেখানে পাঠিয়ে দিলেন। কেবলমাত্র বৃদ্ধ উদ্যানরক্ষক রইল মাতাপুত্রের দেখাশোনার ভার নিয়ে।

এই শান্ত প্রকৃতির কোলে গাছের ছায়ায়, তৃণ-সজ্জায় দেহ এলিয়ে শুয়ে থাকে জীবা। যেমন সন্তান শুয়ে থাকে জননীর বুকে পরম শান্তিতে। ঝর্ণার জলে স্নান সেরে চীনপট্টে দেহ আবৃত করে জীবা বসে থাকে পূর্বমুখী হয়ে। মনে মনে স্মরণ করতে থাকে প্রভু তথাগতকে। সহসা পর্বত শীর্ষে জ্যোতির্ময় সূর্যের আবির্ভাব হয়। ধীরে ধীরে আলোর বন্যায় ভেসে যায় অরণ্য, নদী, প্রান্তর। আকাশের বুকে পাখা মেলে হংস বলাকা উড়ে যায় কোনো পদ্মে ভরা সরসী লক্ষ করে।

জীবার চোখ ভরে আসে জলে। দুটি গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে সে অশ্রু।

দূরে অরণ্য বৃক্ষের আলোছায়ায় বৃদ্ধ উদ্যানরক্ষকের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় কুমারজীব। প্রকৃতির গাছপালা পশুপাখির সঙ্গে নিবিড় পরিচয় ঘটে তার। বৃদ্ধ উদ্যানরক্ষক কৌতূহলী বালকটির প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে স্নেহে বিগলিত হয়ে যায়।

এদের দেখলে বাল্মীকির তপোবনের ছবি চোখের ওপর ফুটে ওঠে।

জীবা ভাবে, দুঃখের কত দুর্গম পথ তাকে পার হয়ে আসতে হয়েছে। স্বামীর অকাল মৃত্যুর দুঃখ বুকে নিয়ে শিশু পুত্রটিকে সঙ্গী করে কত অচেনা অজানা পথ সে পার হয়ে এসেছে। ভবিষ্যতের একটি স্বপ্ন ধ্রুব নক্ষত্রের মত তাকে পথ দেখিয়ে টেনে এনেছে সুদূর ভারতভূমিতে। তার পুত্র এই মহান ভারতের বুকে শিক্ষালাভ করে হয়ে উঠবে বিশ্ববরেণ্য।

সহসা জীবার ভাবনার পথ বেয়ে এসে দাঁড়ান মহারাজ মেঘবাহন। কৃতজ্ঞতায় নত হয়ে আসে জীবার মস্তক। ঝড়ঝঞ্ঝা বিপর্যয়ের মাঝে তার মনে হয় মেঘবাহন প্রসারিত করে রেখেছেন তাঁর অভয় হস্তখানি।

সপ্তাহ অন্তে রাজগৃহ থেকে নৌকা এল খাদ্য দ্রব্যাদি নিয়ে। জীবা দেখল তার প্রয়োজনের তুলনায় আয়োজন অনেক বেশী। সে পত্রযোগে রাজাকে জানাল, মহারাজ, আমি ভিক্ষুণী। দিনান্তে একবার মাত্র

আহার্য গ্রহণ করি। আপনার প্রেরিত সাপ্তাহিক খাদ্যসম্ভার আমার ভাণ্ডারে উদ্বৃত্ত হয়ে যায়। অপচয় আমাকে পীড়িত করে। অথচ আপনার প্রীতির দানকে আমি ফিরিয়ে দিই এমন ধৃষ্টতা আমার নেই। অনুগ্রহ করে মাসান্তে সম পরিমাণ খাদ্য পাঠিয়ে আমাকে মানসিক বেদনার হাত থেকে নিষ্কৃতি দিন।

পত্রপ্রাপ্তির একমাস পরে রাজগৃহ থেকে খাদ্যসম্ভার নিয়ে নৌকা এল। সুভদ্র পোশাকে সজ্জিত রাজার নৌ-চালক নৌকা বাঁধল উদ্যানের ঘাটে।

একটি একটি করে প্রয়োজনীয় সামগ্রী এনে তুলল উদ্যান বাটিকায়। কাজ শেষ হলে জীবা একটি পাত্রে কিছু ফল মিষ্টান্ন এনে নৌ-চালককে খেতে দিয়ে বলল, বহুপথ অতিক্রম করে আপনি নিশ্চয়ই ক্লান্ত। সামান্য কিছু গ্রহণ করলে তৃপ্ত হব।

কৃতজ্ঞতার হাসি ফুটে উঠল নৌ-চালকের মুখে। সে জীবার প্রদত্ত পাত্র থেকে আহার্য গ্রহণ করে পরিতৃপ্তির সঙ্গে ভোজন করতে লাগল।

ভোজনের অবকাশে বাক্যালাপ চলছিল জীবা আর নৌ-চালকের মধ্যে।

জীবা বলল, আপনি এই উদ্যান বাটিকায় এর আগে নিশ্চয়ই নৌকা নিয়ে এসেছেন।

মহারাজকে কতবার আমিই তো এখানে নৌকা করে এনেছি।

আপনি কি কেবল মহারাজেরই নৌকা চালনা করেন?

আপনার অনুমান সত্য। তবে মহারাজের সঙ্গে আমার আরও একটি সম্পর্ক আছে। আমরা একসময় সহপাঠী ছিলাম। গুরু মাধবস্বামীর পাঠশালায় শৈশবে একই সঙ্গে পাঠ গ্রহণ করেছি। পরে সিংহাসনে আরোহণ করে মেঘবাহন আমার ইচ্ছা অনুযায়ী নৌ-চালনার ভারটি আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, মরুদ্‌বাহন, শৈশবে যেমন তুমি আমার বন্ধু ছিলে আজও ঠিক তেমনি রইলে।

আমি বললাম, সে কি করে হয় মহারাজ!

তখন মেঘবাহন আমাকে বুকে টেনে নিয়ে বললেন, মরুদ্‌বাহন, তুমি আমার সঙ্গে প্রভুর সম্মান দেখিয়ে কথা বলতে এলে আমিও জেনো সিংহাসন থেকে সরে দাঁড়াব।

জীবা অভিভূত হয়ে বলল, আশ্চর্য মহানুভব আপনাদের মহারাজ।

আপনি এইমাত্র মহারাজকে যে বিশেষণে ভূষিত করলেন তা একমাত্র মেঘবাহন ছাড়া অন্য সকলেই সমর্থন করবে।

আপনার বন্ধু বুঝি প্রশংসায় সংকোচ বোধ করেন?

তিনি আমার বন্ধু আবার তিনি আমার প্রভুও। অন্যেরা আমাকে তাঁর সেবক বলুক, এটাই আমি চাই। কেবল তিনি আমাকে যখন বন্ধু বলে বুকে স্থান দেন তখনই আমি বুঝতে পারি, আমরা এক আত্মা, অভিন্ন হৃদয়।

জীবা অনুভব করল, এই নৌ-চালক সামান্য কেউ নন, অসামান্য এঁর অনুভূতি। গুরু মাধবস্বামীর শিক্ষা এঁদের চরিত্র গঠনে নিশ্চয়ই প্রভূত সাহায্য করেছে।

সঙ্গে সঙ্গে জীবার মনে উদিত হল আপন সন্তানের শিক্ষা প্রসঙ্গ। কুমারজীবের জন্য এমন গুরুর প্রয়োজন যিনি কেবলমাত্র তাকে শাস্ত্রীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলবেন না, চরিত্র গঠনে, মনের ঔদার্য বিকাশে সাহায্য করবেন।

জীবা বলল, আজ আপনার সঙ্গে কথা বলে প্রভূত আনন্দ পেলাম। আপনি যদি এই নদীপথে কখনও কোনো কর্মান্তরে যান তাহলে অনুগ্রহ করে এই উদ্যান বাটিকায় অবতরণ করলে গভীর তৃপ্তি লাভ করব।

আপনার আমন্ত্রণের কথা আমি ভুলব না।

আহারান্তে জীবার কাছে বিদায় নিয়ে নৌ-চালক প্রস্থান করল।

একদিন স্বয়ং মহারাজ মেঘবাহন এলেন উদ্যান বাটিকায়। সেদিন বুদ্ধের জন্মান্তরের কাহিনীগুলি পুত্রকে শোনাচ্ছিল জীবা। হিরন্ময় রৌদ্রে স্নাত হচ্ছিল সপত্র বৃক্ষরাজি। ধরণীর বুকে উদ্গত তৃণেও প্রবাহিত

হচ্ছিল সেই আলোর তরঙ্গ।

জীবা শোনাচ্ছিল বারাণসীরাজ আর কোশলরাজের কাহিনী। তদ্গত হয়ে সে কাহিনী শুনছিল কুমারজীব। বৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়িয়ে আর একজন নিঃশব্দে অনুভব করছিলেন সে কাহিনীর সত্য!

দুই রাজার যশোগানে চতুর্দিক মুখরিত। নগরবাসীদের কারোর কণ্ঠেই শোনা যায় না মহারাজাদের নিন্দাবাদ। এতে খুশী হবারই কথা, কিন্তু তাঁদের দুজনের কেউই খুশী হতে পারলেন না। ছদ্মবেশে তাঁরা তখন নিজ নিজ রাজ্য থেকে রথারোহণে বেরিয়ে পড়লেন জনপদ পরিক্রমায়। যদি কিছু ত্রুটি ধরা পড়ে তাহলে তা সংশোধন করে নেবেন। নিজ নিজ চরিত্রকে আরও শুদ্ধ আরও উজ্জ্বল করে তুলবেন।

ভাগ্যের এমনি পরিহাস যে জনপদেও তাঁরা কারোর মুখে কোনো নিন্দাবাক্য শুনতে পেলেন না।

এবার প্রত্যাবর্তনের পালা। যে যার রাজ্যের দিকে ফিরে চলেছিলেন বিষণ্ণ মনে। হঠাৎ একটি সংকীর্ণ পথে মুখোমুখি হল দুটি রথ। কোশলরাজের সারথি হেঁকে বলল, রথ ফেরাও, পথ ছাড়। দেখছ না, কোশলরাজ মল্লিক রয়েছেন আমার রথে।

সহাস্যে বারাণসীরাজের সারথি বলল, তুমি বোধহয় জান না আমার রথে কে রয়েছেন। সর্ব গুণান্বিত বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্ত।

কোশলরাজের সারথিও হটবার পাত্র নয়। সে অমনি বলল, তাহলে গুণ মান, বিষয়-সম্পদের বিচার হোক। যিনি অন্যের চেয়ে ছোট হবেন তিনিই পথ ছাড়বেন।

রাজি হয়ে গেল বারাণসীরাজের সারথি। অমনি একে একে চলল উত্তর প্রত্যুত্তর। কিন্তু কি আশ্চর্য! উভয়ের রাজ্যের আয়তন, সম্পদ, সৈন্যবল, এমন কি বয়ঃক্রমও এক। তাহলে কে বড় কে ছোট তার বিচার হবে কি করে!

বারণসীরাজের সারথি তখন বলল, যিনি চরিত্র গুণে মহত্তর তাঁকেই ছেড়ে দিতে হবে পথ। এখন বল তোমাদের রাজার চরিত্রমাহাত্ম্য?

কোশলরাজের সারথি বলল, তবে শোন আমাদের মহারাজের চরিত্র-কথা। যিনি কঠোর তাঁর সঙ্গে তিনি কঠোর ব্যবহার করেন। কোমল স্বভাব যাঁর তাঁর সঙ্গে করেন কোমল ব্যবহার। সাধুজনের কাছে তিনি পরম সাধু, আর শঠকে শিক্ষা দেন শঠতার দ্বারা। এখন বল, তোমাদের মহারাজের গুণপনা।

হেসে বলল বারাণসীরাজের সারথি, আমাদের মহারাজ কিন্তু ভাই ওভাবে মানুষের সঙ্গে ব্যবহার করেন না। তিনি ক্রোধী মানুষকে জয় করেন শান্ত ব্যবহারের দ্বারা। সাধু ব্যবহারে তিনি দূর করেন অসাধুর সকল দোষ। দানের দ্বারা তিনি কৃপণের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটান। আর সত্যকে আশ্রয় করে তিনি সরিয়ে দেন মিথ্যার আবরণ।

এইখানে গল্পে ছেদ টেনে দিয়ে জীবা বলল, এখন বলতো, এই দুই রাজার মধ্যে কে বড়?

কুমারজীব মায়ের মুখের দিকে চেয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলল, বারাণসীরাজ মা। কোশলরাজকেই ফিরিয়ে নিতে হবে তাঁর রথ।

সাধু! সাধু!

জীবা আর কুমারজীব শব্দ লক্ষ করে একই সঙ্গে পার্শ্ববর্তী অরণ্যের দিকে ফিরে তাকাল। বৃক্ষের অন্তরাল থেকে কুমারজীবকে সাধুবাদ জানাতে জানাতে সামনে এসে দাঁড়ালেন মহারাজ মেঘবাহন।

মাতা পুত্র ততক্ষণে একই সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েছে।

জীবার কণ্ঠে বিস্ময়, মহারাজ! আজ কি সৌভাগ্য আমার।

আমারও কম ভাগ্য নয়। কোশল আর বারণসীরাজের কাহিনী শুনলাম আপনার কণ্ঠে। তারপর 'কে বড়' তার সমাধানও করে দিল আপনার প্রতিভাধর পুত্র কুমারজীব।

জীবা সহসা কোনো কথা বলতে পারল না। সে সঙ্কোচে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইল। পরক্ষণেই সচেতন হয়ে ছুটল কুটিরের অভ্যন্তরে। আসন এনে বিছিয়ে দিল ছায়াতরুর তলায়-তৃণভূমিতে।

রাজা আসন গ্রহণ করলে মাতা পুত্র অদূরে তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরে উপবেশন করল।

মহারাজকে এই প্রথম সম্পূর্ণ মূর্তিতে দেখল জীবা। রাজগৃহে চিকের অন্তরাল থেকে স্পষ্ট দেখা যায়নি যাঁকে তিনি আজ সমস্ত আবরণ সরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রান্তরে।

জীবা আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করছিল, মহারাজ মেঘবাহনের সঙ্গে কি নিবিড় সাদৃশ্য আর একজনের। সেই প্রশস্ত উন্নত ললাট, সুগঠিত নাসিকা, আয়ত চক্ষু, বলিষ্ঠ পৌরুষ-দীপ্ত মূর্তি। কুমারায়ণ! হ্যাঁ কুমারায়ণই যেন রাজা মেঘবাহনের পোশাক পরে বসে রয়েছে জীবার মুগ্ধ বিস্মিত দৃষ্টির সামনে।

মুহূর্তে মোহভঙ্গ হল রাজার কণ্ঠস্বরে। মহারাজ মেঘবাহন বললেন, রাজগৃহ থেকে আপনার চলে আসার পর একজন হারিয়েছে তার সবচেয়ে প্রিয় বস্তুকে।

চমকে উঠল জীবা। কার কথা বলতে চাইছেন মেঘবাহন! কে সেই একজন! আর তার প্রিয় বস্তুটিই বা কি !

জীবা সুভদ্র হাসি হেসে রাজার মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল। রাজা নিজেই কুহেলিকা সরিয়ে আসল কথাটি পাড়লেন, কুমারজীবের চলে আসার পর চম্পা তার খেলার সাথীকে হারিয়ে বড় আনমনা হয়ে পড়েছে।

জীবা অমনি বলে উঠল, কেমন আছে চম্পা? তাকে সঙ্গে আনলে এখানে দুদণ্ড খেলতে পেয়ে খুব খুশী হত সে।

মহারাজ মৃদু হেসে বললেন, ইচ্ছে করেই আনিনি তাকে। এখানে একবার এলে সে আর ফিরে যেতে চাইবে না। আপনিও নিশ্চয়ই চাইবেন না, একটি কন্যা তার বাবার চোখের আড়ালে থাকুক।

না মহারাজ।

জানি না, আপনার ভেতর কি যাদু আছে। এখনও সে আপনার কথা ভুলতে পারেনি। প্রতি সন্ধ্যায় ঘুমের কোলে ঢলে পড়ার আগে আপনার মুখে গল্প শোনার জন্য উতলা হয়।

চম্পার জন্য আমারও কষ্ট হয় মহারাজ। সেও কুমারজীবের মত আমার এক সন্তান। মাতৃহারা মেয়েটি ক'দিনের ভেতরই আমার বুকের মধ্যে তার ঠাঁই করে নিয়েছে।

মহারাজ কিছুক্ষণ নীল শৈল সংলগ্ন একখণ্ড মেঘের দিকে চেয়ে রইলেন। তাঁর মনে হল, মেঘখণ্ডটি তার উপযুক্ত আশ্রয়ই নির্বাচন করে নিয়েছে।

এবার মহারাজ জীবার দিকে তাকিয়ে ভিন্ন কথার অবতারণা করলেন, আপনি কুমারজীবের অধ্যয়নের বিষয়ে কিছু ভেবেছেন কি ?

জীবা বলল, বহু আশা নিয়ে কুমারজীবের পিতৃভূমিতে এসেছি মহারাজ। তিনি ছিলেন তক্ষশীলার অন্যতম কৃতবিদ্য ছাত্র। আমি সেই বহুবিদিত বিশ্ববিদ্যালয়ে কুমারজীবকে যথার্থ শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে চাই।

মহারাজ বললেন, নিশ্চয়ই আপনার ইচ্ছে একদিন পূর্ণ হবে। কিন্তু বিদ্যার্থী ষোড়শ বর্ষে প্রবেশ না করলে তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অধিকার পাবে না।

জীবার আশাভঙ্গের ম্লান ছায়া ঘনিয়ে উঠল। সে বলল, যদি কেউ তার যোগ্যতার প্রমাণ দিতে পারে, তাহলেও কি শিথিল হবে না নিয়মের বাঁধন?

মহারাজ বললেন, তক্ষশীলার ঐ এক নিয়ম। আজ আটশত বৎসরেরও অধিককাল ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়নি।

সামান্য সময় কি যেন চিন্তা করে নিয়ে আবার বললেন, আমারই রাজ্যের একেবারে প্রান্তসীমায় থাকেন মাধবস্বামী। তিনি আমার গুরু ছিলেন। বড় বিচিত্র জীবন তাঁর।

সেই মুহূর্তে জীবার মনে পড়ল এই গুরু মাধবস্বামীর প্রসঙ্গ সে নৌচালকের মুখেও শুনেছে। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকের মত তার চিন্তায় প্রতিভাত হল, মহারাজ ও সেদিনের সেই নৌচালকের কণ্ঠস্বর, বাগ্‌ভঙ্গীর মধ্যে কি আশ্চর্য মিল!

পরক্ষণেই মহারাজের কথার সূত্রে সে ফিরে গিয়ে বলল, সে কি রকম মহারাজ?

মেঘবাহন বললেন, তাঁর জীবনে বৈচিত্র্যের শেষ নেই। আজ কেবল তাঁর শিক্ষাজীবনের কথাটুকুই আপনাকে শোনাই।

জীবা সাগ্রহে মহারাজ মেঘবাহনের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

মাধবস্বামী তক্ষশীলারই ছাত্র ছিলেন। তিনি প্রায় সর্ববিদ্যা বিশারদ। চিকিৎসা শাস্ত্রে তাঁর খ্যাতি সারা রাজ্যে সুবিদিত। অস্ত্রবিদ্যায় তাঁর নৈপুণ্য যে কোনো সৈন্যাধ্যক্ষকে লজ্জা দিতে পারে। তাছাড়া হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শনে তাঁর ব্যুৎপত্তি প্রশ্নাতীত।

জীবা সোচ্ছ্বাসে বলল, আশ্চর্য প্রতিভাধর!

রাজা বললেন, সেই কৃতি পুরুষটি পাঠসমাপনান্তে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান আচার্যকে প্রণাম করে দাঁড়ালেন তখন আচার্য বললেন, মাধব, তুমি গুরুকুলের মুখ উজ্জ্বল করেছ, এখন যে কোন একটি বিষয়ে অধ্যাপনার ভার গ্রহণ কর।

মাধবস্বামী সবিনয়ে বললেন, আচার্যদেব, আমার অধীত বিদ্যার ফল সর্বসাধারণে লাভ করুক, এই আমার মনের বাসনা। আপনি আশীর্বাদ করুন, জনপদে থেকে যেন চিরদিন মানুষের সেবা করে যেতে পারি।

জীবা অভিভূত হয়ে বলল, এমন গুরুর চরণে আপনিই মাথা নত হয়ে আসে।

মহারাজ বললেন, আমার পিতৃদেব বহু সম্মান দেখিয়ে গুরুমাধবস্বামীকে এ রাজ্যে নিয়ে আসেন। তাঁর ইচ্ছানুযায়ী একটি আশ্রমে তাঁর অবস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। পরে আমার গুরুদক্ষিণা হিসেবে পিতৃদেব মাধবস্বামীকে সম্পূর্ণ আশ্রমটি দান করেন। দীর্ঘকাল গুরুদেব ঐ আশ্রমে থেকে বহু জনপদবাসীকে বিদ্যা দান করেছেন। এখন বার্ধক্যে কেবল আর্ত, রোগগ্রস্তের চিকিৎসায় সময় অতিবাহিত করেন।

মহারাজ, গুরু মাধবস্বামীর কাছে আমার কুমারজীবের পাঠগ্রহণ কি সম্ভব?

আজ আমার এখানে আসার প্রধান উদ্দেশ্য কিন্তু তাই। কেবল কুমারজীব নয়, আমি আমার কন্যার শিক্ষার কথাও ভেবেছি। গুরু রাজী হলে প্রতিদিন প্রভাতে রাজগৃহ থেকে নৌকা আসবে চম্পাকে নিয়ে। পথে এই উদ্যান বাটিকায় নৌকা থামিয়ে তুলে নেওয়া হবে কুমারজীবকে। দুজনে সারাদিন গুরুগৃহে বিদ্যাভাস করে সন্ধ্যায় ফিরে আসবে ঐ নৌকোয়।

জীবা অভিভূত হয়ে বলল, আপনার করুণার ঋণ কোনদিন পরিশোধ করতে পারব না মহারাজ। শুধু অনুরোধ, রাজকার্যে অবসর পেলে এই উদ্যান বাটিকার কথা যেন আপনার স্মরণে আসে।

মহারাজ বললেন, আপনার আমন্ত্রণের কথা আমি ভুলব না।

মেঘবাহন নৌকা নিয়ে রাজপুরীর দিকে অগ্রসর হলেন। নদীর কূলে দাঁড়িয়ে জীবার মুখে ফুটে উঠল একটুকরো হাসি। মহারাজের ছদ্মবেশ খসে পড়ল তার চোখের সামনে। বিদায় মুহূর্তে মহারাজের শেষ কথাটি সেদিনের নৌচালকের শেষ কথার অবিকল প্রতিধ্বনি হয়ে বাজতে লাগল, 'আপনার আমন্ত্রণের কথা আমি ভুলব না।'

।। দুই।।

মহারাজ মেঘবাহন চম্পা আর কুমারজীবের সঙ্গে গুরুর চরণবন্দনা করে উঠে দাঁড়াতেই মাধবস্বামী রাজার মুখের ওপর প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করে বললেন, বহুদিন পরে তোমাকে আশ্রমে দেখে বড় আনন্দ পেলাম মেঘবাহন।

রাজা বললেন, আচার্যদেব পক্ষকালও অতীত হয়নি, আমি আপনার চরণবন্দনা করে গেছি।

পক্ষকাল প্রিয়জনের অদর্শন এক যুগের ব্যবধান বলে মনে হয়।

আবার প্রসন্ন হাসিতে মুখখানিকে উদ্ভাসিত করে বললেন, মহারাজ মেঘবাহন, এখন বল, এই শিশু চারাগাছ দুটিকে সঙ্গে নিয়ে এখানে আগমনের হেতু ? বৃদ্ধের নয়নরঞ্জন আর হৃদয়হরণের জন্য কি ?

আচার্যদেব, এই চারাদুটি আপনার স্নেহস্পর্শে সংবর্ধিত হতে চায়।

বড় অসময়ে নিয়ে এলে মেঘবাহন। চারাগাছগুলি পুষ্পিত হবার কাল পর্যন্ত কি ইহলোকে বিধাতা আমাকে অবস্থানের সুযোগ দেবেন?

আমি সেই বিশ্বাস নিয়েই তো আপনার কাছে এদের এনেছি গুরুদেব।

তথাস্তু। তোমার শুভ ইচ্ছা পূর্ণ হোক। তবে মেঘবাহন, আশ্রমের অধ্যক্ষের জীর্ণতার সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমটিও স্বাভাবিক কারণে জীর্ণ হয়ে পড়েছে। এর ভেতর ঐ শিশুদের পরিচর্যার ভার নেওয়া কি সম্ভব হবে?

প্রতিদিন প্রভাতে বিদ্যার্থীদের আপনার আশ্রমে পৌঁছে দিয়ে যাব, সন্ধ্যাকালে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাব এদের। সারাদিন এরা প্রকৃতির মাঝে থেকে আপনার পাঠ গ্রহণ করবে। আমি রাজগৃহ থেকে আশ্রমের উদ্যান সংস্কারের জন্য অবিলম্বে কয়েকজন পরিচর্যাকারীকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

হ্যাঁ, আর একটি কথা।

বলুন গুরুদেব।

তুমি তো বাক্‌কে জান, যে আমার কাছে প্রতিপালিত হচ্ছে। সে তোমার কন্যার সঙ্গী হতে পারবে।

এ তো চম্পার মস্ত বড় লাভ গুরুদেব।

আরও একটি কথা তোমাকে জানাবার আছে।

বলুন।

বিতস্তার ওপারে রাজা অমিতবীর্যকে তুমি জান। সেই অমিতবীর্য তার অষ্টমবর্ষীয় পুত্র বিক্রমকেশরীর শিক্ষার ভার আমার ওপর অর্পণ করে নিশ্চিন্ত হতে চায়। আমি জানি, তোমাদের রাজপরিবারের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক মধুর নয়। এ ক্ষেত্রে তোমার কি অভিমত তা আমাকে স্পষ্ট করে জানাও।

আপনি জানেন গুরুদেব, এককালে ওরা ছিল আমাদের নামমাত্র করদ-মিত্র রাজ্য। পিতৃদেবের সময়ে অমিতবীর্যের পিতা আমাদের কর দান বন্ধ করে বন্ধুত্বের বন্ধন ছিন্ন করে। সেই থেকে তিক্ত না হলেও সম্পর্ক মধুর নয়।

তাহলে তুমি নিশ্চয়ই চাইবে আমি বিক্রমকেশরীর শিক্ষার ভার গ্রহণ না করি।

তা কেন চাইব গুরুদেব। যথার্থ শিক্ষকের কাছে শত্রুমিত্রের কোনো ভেদাভেদ নেই।

বড় তৃপ্ত হলাম তোমার কথায় মেঘবাহন। তোমার ক্ষেত্রে আমার শিক্ষা যে ব্যর্থ হয়নি তা জেনে আজ আমার শিক্ষক জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কারটি পেয়ে গেলাম।

এরপর গুরু মাধবস্বামী চম্পার দিকে চেয়ে বললেন, কই গো, আমার ফল কই?

চম্পা অসংকোচে বলল, এই যে ফুল, এই তো আমি এসেছি।

এটি গুরু মাধবস্বামী আর চম্পার অনেকদিনের উত্তর প্রত্যুত্তর। পিতার সঙ্গে চম্পা এ আশ্রমে প্রায়ই এসে থাকে। তাই মাধবস্বামীর সঙ্গে তার ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে এক মধুর সম্পর্ক।

এবার মেঘবাহন কুমারজীবকে গুরুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য সামনে নিয়ে এলেন। আনুপূর্বিক বর্ণনা করে গেলেন কুমারায়ণ আর জীবার কাহিনী। শেষে বললেন, গুরুদেব, হয়তো এই বালকটির ভেতরেই আপনি খুঁজে পাবেন আপনার এতকালের শিক্ষকতা জীবনের শ্রেষ্ঠ ছাত্রটিকে।

গুরু মাধবস্বামী কুমারজীবের পবিত্র বিদ্যা-বিনত মুখখানির দিকে কতক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, জন্মান্তরের সংস্কার আছে এর ললাটে। একদিন রাজ রাজেশ্বর হতে পারে এ বালক।

আশ্রমে ফুল, লতাপাতা, পাখির সঙ্গে বিদ্যার্থীদের হল প্রথম প্রণয়। প্রকৃতিপাঠ থেকে শুরু হল তাদের বিদ্যাচর্চা। চারটি তাজা প্রাণের স্পর্শে মাধবস্বামীর দেহ থেকে জরা নিল বিদায়। তিনি সহসা প্রদীপ্ত হয়ে উঠলেন।

রাজা অমিতবীর্যের পুত্র বিক্রমকেশরী প্রকৃতিতে চারজনের ভেতর ছিল দুর্দান্ত। তার বাক্য ছিল বলদৃপ্ত, আচরণ ছিল শক্তিমান সৈনিকের মত। গুরু মাধবস্বামী নিপুণ ছিলেন অসিচালনা আর শরসন্ধানে। তিনি বিক্রমকেশরীর প্রবণতা অনুযায়ী তাকে নতুন নতুন অস্ত্রশিক্ষার পাঠ দিতে লাগলেন। রণনীতির পাঠক্রমেও

সে ছিল বিশেষ আগ্রহী।

অন্যদিকে সমবয়সী দুই সখির পঠনপাঠনের চেয়ে আশ্রমের তরু অন্তরালে ঘুরে ফেবাতেই ছিল বিশেষ আগ্রহ। প্রজাপতির পেছনে ধাওয়া করা, ফলের জন্য বিশেষ বিশেষ তরুতলে সন্ধান, এই ছিল দুই সখির নিত্যকর্ম।

মাধবস্বামী দুই কন্যাকে মাঝে মাঝে আশ্রমের কাজে নিযুক্ত করে রাখতেন। পরিবেশকে কিভাবে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন রাখা যায় সে শিক্ষা দিতেন। অবসর সময়ে বহু মনোরঞ্জক ও শিক্ষাপ্রদ গল্প শোনাতেন।

গুরু মাধবস্বামী লক্ষ করতেন, দুই সখির প্রকৃতিতে কিছু ভিন্নতা আছে। বাক, চঞ্চল আর চম্পা, গভীর। রাজকন্যার আচরণের ভেতর সামান্যতম ঔদ্ধত্য প্রকাশ পেত না, প্রকাশিত হত তৃপ্তিদায়ক মধুরতা। অপরদিকে বাকের চঞ্চলতা ছিল উপভোগ্য। সে সারাক্ষণ নানা ·াজের ভেতর নিজেকে ছড়িয়ে জড়িয়ে রাখতে ভালবাসত।

কুমারজীব ছিল এদের মধ্যে স্বতন্ত্র। তার নিষ্ঠা, শ্রম, আগ্রহ গুরু মাধবস্বামীকে সারাক্ষণ আকৃষ্ট করে রাখত। হিন্দু এবং বৌদ্ধ দর্শনের মূল বিষয়গুলি কুমারজীবের আয়ত্ব করতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হত না। ছাত্রের গভীর আগ্রহ এবং বোধশক্তি উদ্দীপ্ত করত গুরুকে। বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে, স্থূল থেকে সূক্ষ্মে তিনি বিচরণ করতেন প্রতিভাধর ছাত্রকে নিয়ে।

প্রতিটি বিষয়েই ছিল কুমারজীবের একাগ্রতা। শিক্ষার পঞ্চম বর্ষে একদিন দুই সখিতে কুমারজীব আর বিক্রমকেশরীকে টেনে নিয়ে গেল বনের মধ্যে। বিশাল একটি শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট বৃক্ষের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখাল একটি স্বর্ণ বর্ণের ফল। ডালের আড়ালে ফলের বৃন্তটি প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে। ঐ ফলটি শরাঘাতে ভূপাতিত করার চেষ্টা করলেই ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যেতে পারে। এখন সামান্য মাত্র যেটুকু বৃন্ত দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল কেবল সেই স্থানটিতে আঘাত করলেই ফলটি অক্ষত অবস্থায় নিম্নের তৃণভূমিতে পতিত হতে পারে।

এই অবস্থায় দুবার শর-সন্ধানেও যখন ব্যর্থ হল বিক্রমকেশরী, তখন ধনুশ্বর হাতে তুলে নিল কুমারজীব। জয় হল একাগ্রতার। কুমারজীবের নিক্ষিপ্ত শর বৃন্তের ক্ষুদ্র অংশটিতে আঘাত করল। নিঃশব্দে ফলটি পতিত হল তৃণভূমিতে।

চম্পা ফলটি কুড়িয়ে এনে কুমারজীবের হাতে তুলে দিয়ে বলল, এ ফল তোমার। তুমি ছাড়া কেউ ফলটি এমন করে পাড়তে পারত না।

কুমারজীব বলল, আমার চেয়ে অনেক বড় ধনুর্ধর বিক্রমকেশরী। আজ হয়তো ওর ইচ্ছাই ছিল না এই ফলটিকে বৃক্ষ থেকে ছিন্ন করার। তাই ও বিফল হয়েছে।

বাক্ বলল, বেশ, অন্য কোনো লক্ষ্য স্থির করে ধনুর্বিদ্যার পরীক্ষা হোক।

ক্রোধে, অপমানে তখন স্ফুরিত হচ্ছিল বিক্রমকেশরীর ওষ্ঠ। সে সহসা কোষ থেকে অসি বের করে প্রচণ্ড বেগে এবং কৌশলে ঘোরাতে লাগল। অসহায় তিনটি প্রাণী দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল বিক্রমকেশরীর অসিচালনার কলাকৌশল।

কতক্ষণ পরে ঘর্মাক্ত দেহে অসিখানা কুমারজীবের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, সাধ্য যদি থাকে প্রদর্শন কর অসিচালনার কৌশল।

বাক্ উৎসাহ দিয়ে বলল, তুলে নাও তরবারি, দেখিয়ে দাও তোমার কৃতিত্ব।

কুমারজীব মাটি থেকে সযত্নে তরবারিখানা তুলে নিয়ে মাথায় ঠেকাল। তারপর ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গেল বিক্রমকেশরীর দিকে। বলল, এ তরবারি আমার হাতে শোভা পায় না ভাই বিক্রম। যথার্থ বীরের হাতেই এ অসির শোভা আর সার্থকতা। আজ থেকে আমি সবার সামনে প্রতিজ্ঞা করছি, কখনো, কোনো অবস্থাতেই আর অস্ত্র ধারণ করব না।

বিক্রমকেশরীর ক্রোধ ততক্ষণে মন্দীভূত হয়েছে। সে তরবারিখানা হাতে তুলে নিয়ে বীরের মত কোষবদ্ধ করল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে ফলটি তুলে নিয়ে চম্পা ছুঁড়ে ফেলে দিল নদীর জলে। বলল, এই

ফলটাই যত নষ্টের গোড়া। ও এখন ডুবে মরেছে। এবার চল, আমরা মিলেমিশে খেলা করি।

মহারাজ অনিন্দ্যসুন্দর মূর্তিতে উদ্যান-বাটিকা উজ্জ্বল করে আবির্ভূত হন। জীবা পরম সমাদরে রাজাকে অভ্যর্থনা জানায়। দীর্ঘ সময় কেটে যায় সুখ-দুঃখের আলাপনে।

জীবার কাছে দু'দণ্ড বসতে পারলে রাজা অন্তরে বড় শান্তি পান। রাজপুরীতে যখন অবসর যাপন করেন তখন মনের মধ্যে চেপে বসে পাষাণের ভার। অমর্তপ্রভা-শূন্য পুরী অন্ধকারপুরী বলে মনে হয়। চম্পা অন্তঃপুরে থাকলে তিনি তাকে কাছে ডেকে নেন। অন্ধকার মনের কোণে একটুকরো আলো এসে পড়ে। চম্পার অবর্তমানে তিনি প্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন তরী নিয়ে। পৌঁছে যান উদ্যান বাটিকায়। সুমার্জিত একটি মন তাঁর জন্য প্রতীক্ষা করে থাকে। সেই মনে অনুরণিত হয় রাজার গোপন ব্যথার অস্ফুট ক্রন্দন-ধ্বনি।

মহারাজের সঙ্গে সুখদুঃখের আলাপনের সময় সহসা উদাস হয়ে যায় জীবা। তার মনে হয়, মহারাজ তার পরম বন্ধু। কুমারায়ণের পরে এতবড় সহৃদয় সুহৃদ তার জীবনে আর আসেনি। আবেগময় তাঁর আচরণ, কিন্তু কোনোভাবেই লঙ্ঘিত হয় না সম্ভ্রমের সীমা।

মহারাজ চলে গেলে জীবা মনে মনে ভাবে, সে কি দুর্বল হয়ে পড়েছে। তার আচরণের কোথাও কি এমন কিছু আছে যার সূত্র ধরে রাজার নিভৃত ভাবনার শাখা-প্রশাখা পুষ্পিত হতে পারে। হয়তো, হয়তো নয়। একই দুঃখে দুজনকে করেছে সমব্যথী।

একদিন মহারাজের সঙ্গে জীবার কথোপকথনের সময় আশ্রমপ্রসঙ্গ এসে পড়ল।

জীবা বলল, মহারাজ, কুমারজীব বলেছিল, তার সহপাঠী বিক্রমকেশরী তেজস্বী ও নির্ভীক।

মেঘবাহন বললেন, যে কোন রাজসন্তানের এসকল গুণ থাকা অবশ্য কর্তব্য।

অস্ত্রবিদ্যায়ও সে প্রভূত দক্ষতা অর্জন করেছে।

সে খবর আমার অজ্ঞাত নয়। তবে আপনার পুত্র কুমারজীব বড়ই বন্ধুবৎসল। নিজের চেয়ে বন্ধুদের কৃতিত্ব সবার সামনে প্রচার করতে পারলে সে খুশী হয়।

মানুষকে বড় করে দেখতে শিখলে একদিন হয়ত নিজেও বড় হতে পারবে।

মহারাজ বললেন, গুরু মাধবস্বামী একদিন আমাকে বলেছিলেন, বৌদ্ধশাস্ত্রে তাঁর অধীত বিদ্যা থেকে কুমারজীবকে দেবার মত আর তাঁর কিছু নেই। এখন আপনার পুত্র গুরুদেবের কাছ থেকে গ্রহণ করছে হিন্দু দর্শনশাস্ত্রের পাঠ। তাছাড়া পালি, প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষাতে ব্যুৎপত্তি অর্জনের চেষ্টা করছে।

ও গুরু নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালনের চেষ্টা করে মহারাজ।

একটু থেমে প্রসঙ্গান্তরে গেল জীবা, মহারাজ, কুমারজীবের কাছে শুনেছি, চম্পা বৈদিক স্তোত্রগুলি অপূর্ব সুরেলা কণ্ঠে নিবেদন করতে পারে। শুধু তাই নয় ওরা যখন পাঠের অবসরে বিতস্তার তীরে ঘুরে বেড়ায় তখন চম্পা সুললিত কণ্ঠে আবৃত্তি করে শোনায় কত কাব্য।

প্রাসাদে কিছু কিছু স্তোত্র ওর মুখে আমি শুনেছি। এসব গুরু মাধবস্বামীরই কৃপা। উপযুক্ত আধারে তিনি উপযুক্ত বস্তু পরিবেশন করেন। এই ধরুন না, আশ্রম-কন্যা বাকের কথা। তিনি তাকে শিক্ষা দিচ্ছেন সমাজবিদ্যা। সমাজ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা থেকে সমাজ ব্যবস্থার ক্রটিবিচ্যুতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করে তাকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন।

জীবা বলল, আমার ক্রটি নেবেন না। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না গুরু মাধবস্বামী কেন বাককে সমাজবিদ্যায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠলেন।

মহারাজ মেঘবাহন বললেন, কারণটি অন্যের অজ্ঞাত হলেও আমার অজানা নয়।

জীবা কৌতূহলী হয়ে তাকিয়ে রইল রাজার মুখের দিকে।

মহারাজ একটু থেমে বললেন, গুরু মাধবস্বামী একদিন আমাকে আশ্রমকন্যা বাকের পূর্ব ইতিহাস বলেছিলেন। সমাজের একটি নিষ্ঠুর প্রথার ভেতর থেকে তুলে এনেছিলেন বাক্‌কে। আপনি যদি বাকের

কাহিনী শুনতে চান তাহলে আপনাকে শুনতে হবে গুরু মাধবস্বামীর পরিব্রাজক জীবনের কাহিনী।

মাধবস্বামী বেরিয়েছিলেন দেশভ্রমণে। বিচিত্র আচার-আচরণ আর বহু ধর্মের দেশ এই ভারতবর্ষ। তাকে দেখার, তার বিষয়ে জানার অপার আগ্রহ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন তিনি। বয়স হয়েছিল তাঁর, কিন্তু মনের শক্তি ছিল অটুট। চিরকুমার মাধবস্বামীর পেছনের কোনো টান ছিল না। তিনি দেশভ্রমণে যাবার সময় আমার শত অনুরোধেও একটি সামান্য তাম্রমুদ্রা গ্রহণ করেননি। বলেছিলেন, ভয় নেই, তোমার গুরু কখনও অভক্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে না।

পাটলিপুত্রে পৌঁছে তিনি সেখানকার বিখ্যাত বিদ্যায়তনগুলি দর্শন করলেন। তাঁর অনুসন্ধিৎসার পরিচয় পেয়ে বিদ্যায়তনের অধ্যক্ষ তাঁকে বহু সমাদরে আতিথ্য দান করলেন। সেখানে তিনি কয়েক দিবস অতিবাহিত করলেন হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শন আলোচনায়। নালন্দা থেকে নিমন্ত্রিত হয়ে পণ্ডিতেরা এলেন সে আলোচনায় যোগদান করতে। গুরু মাধবস্বামী সাধ্যমত শাস্ত্র আলোচনা করলেন, কিন্তু বৌদ্ধ শাস্ত্রে পরম সুপণ্ডিত গুরুদের কাছে তিনি নতি স্বীকার করতে বাধ্য হলেন। নিরভিমান ব্যক্তি মাধবস্বামী। তিনি বৌদ্ধ পণ্ডিতদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিক্ষা করলেন। হিন্দুদর্শন আলোচনায় পাটলিপুত্রের পণ্ডিতদের সঙ্গে তিনি তুল্যমূল্য বিবেচিত হলেন।

গুরু মাধবস্বামীর অন্তরে কিন্তু শান্তি ছিল না। তিনি নিশাকালে শয্যা গ্রহণ করে পার্শ্ববর্তী কক্ষের আবাসিকদের আলোচনা শুনতে পেলেন। তাতে মগধ ও তক্ষশীলার বিদ্যায়তনের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা চলছিল। মগধের তুলনায় তক্ষশীলা যে এখন নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে সে বিষয়ে বক্তারা মন্তব্য করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করছিল না।

দীর্ঘরাত্রি গুরু মাধবস্বামী নিদ্রাহীন কাটাতে লাগলেন। শয্যা তাঁর কাছে মনে হল কণ্টকাকীর্ণ। তিনি তক্ষশীলার ছাত্র। তাঁর পরাভবের অর্থ তক্ষশীলার অসম্মান। মধ্যরাত্রে শয্যার পাশে এসে দাঁড়ালেন বৈয়াকরণ পাণিনী। বললেন, পড়েছ অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ? চারি সহস্র সূত্রের সমাবেশ সেখানে। আমি যখন তক্ষশীলায় অধ্যাপনা করি তখন ছাত্রদের পড়াতে পড়াতে রচনা করেছিলাম এই ব্যাকরণ। এখন সারা ভারতবর্ষ অনুসরণ করে এই গ্রন্থ। আমি তোমার মত এককালে ছাত্রও ছিলাম তক্ষশীলার।

পাণিনী অন্তর্হিত হলে আবির্ভূত হলেন ব্রাহ্মণ চাণক্য। বললেন, আমিও তো ছাত্র ছিলাম তক্ষশীলার। আমার রচিত অর্থশাস্ত্র ভারতের শ্রেষ্ঠ বিদ্যায়তনগুলির অবশ্য পাঠ্য গ্রন্থ। তুমি নিশ্চয়ই পড়েছ আমার বহুশ্রমে রচিত পুস্তক।

ভেষজবিদ্ জীবক এলেন এরপর। বললেন, সাত বৎসরকাল আমি তক্ষশীলায় আয়ুর্বেদ শিক্ষা করেছি। বহু বৃক্ষ, লতাগুল্মের ভেষজগুণ পরীক্ষা করে আমি গুরুর কাছ থেকে লাভ করেছি উপাধি। এই পাটলিপুত্রেই আমি শুরু করেছিলাম আমার চিকিৎসা। মহারাজ বিম্বিসারকে দুরারোগ্য ব্যাধির হাত থেকে মুক্ত করেছিলাম আমি। তাছাড়া তথাগত বুদ্ধের চিকিৎসার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার একাধিকবার। তুমি তো ভেষজবিদ্যা আয়ত্ব করেছ তক্ষশীলায়। আমারই শিক্ষাকেন্দ্রে তোমার শিক্ষা। তুমি তো ক্ষুদ্র নও।

সর্বশেষে এসে দাঁড়ালেন সুশ্রুত। বললেন, একশত সাতাশ প্রকার স্থূল ও সূক্ষ্ম যন্ত্র ব্যবহার করেছি আমি শল্যচিকিৎসায়। অস্থি সংযোজন, অঙ্গচ্ছেদ ও বিজোড়ন, যকৃৎ বিচ্ছেদ, প্লীহা বিদারণ প্রভৃতি বিষয়ে আমার অস্ত্রোপচার পদ্ধতি এখনও যত্নে অনুশীলন করা হয়। আমার আবিষ্কৃত সূক্ষ্ম অস্ত্রে আমি একটি কেশকে লম্বালম্বি ভাবে দ্বিখণ্ডিত করতে পারতাম। তুমি আমাদের সকলের প্রিয় সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তোমাকে ন্যূন ভাববার অধিকার কারও নেই। মহাচীন, গ্রীস, ইরাণ, বহ্লীক, গান্ধার আর ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনে বিদ্যার্থীরা সমবেত হয় তাকে কি কোনোভাবে ছোট করা যায়।

প্রভাতে শয্যাত্যাগ করে মাধবস্বামী নিজেকে গ্লানিমুক্ত মনে করলেন। তিনি নগরীর বিভিন্ন চিকিৎসা কেন্দ্রে ঘুরে ঘুরে পাটলিপুত্রের চিকিৎসকদের অজ্ঞাত সব ভেষজ রোগীদের ওপর প্রয়োগ করতে লাগলেন। দু'দিনের মধ্যেই আশ্চর্য সব ফল ফলতে দেখা গেল। মুহূর্তে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল মাধবস্বামীর নাম। কাতারে কাতারে রোগী আসতে লাগল জনপদ থেকে। তিনি পাটলিপুত্রের চিকিৎসকদের রোগ সম্বন্ধে

পরামর্শ দিতে লাগলেন। চারদিকে ধ্বনি উঠল, তক্ষশীলার এক ধন্বন্তরি চিকিৎসক এসেছেন।

সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত সদ্য দিগ্বিজয় সমাপ্ত করে মগধে ফিরেছিলেন। শোনা গেল তিনি বিশেষভাবে অসুস্থ। রথ থেকে অতর্কিতে প্রস্তরাকীর্ণ পথে পড়ে গিয়ে তাঁর উরুর অস্থি ভগ্ন ও স্থানচ্যুত হয়েছে।

রাজচিকিৎসকের প্রলেপ, বন্ধন ইত্যাদি ক্রিয়াকর্মে ব্যথার উপশম হচ্ছিল না। ঠিক সেইসময়ে পাটলিপুত্র ত্যাগ করে পূর্বমুখে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন গুরু মাধবস্বামী। বিশেষ বার্তাবহ রাজগৃহ থেকে পত্র নিয়ে এল পাটলিপুত্রের বিদ্যাভবনের অতিথিশালায়।

প্রধান অমাত্য পত্রটি লিখেছেন গুরু মাধবস্বামীকে। সম্রাটের কর্ণে নাকি প্রবেশ করেছে গুরু মাধবস্বামীর চিকিৎসা বিষয়ে বিশেষ দক্ষতার কথা। তিনি তাঁর রোগারোগ্যের জন্য গুরু মাধবস্বামীর সাহায্যপ্রার্থী।

শেষে লিখেছেন, ভ্রাম্যমাণ মাধবস্বামীর ভ্রমণের সমস্ত ব্যয়ভার সম্রাট বহন করতে ইচ্ছুক। তাছাড়া সম্রাটের চিকিৎসা বাবদ ইচ্ছানুযায়ী সুবর্ণমুদ্রা তিনি রাজকোষ থেকে গ্রহণ করতে পারবেন।

গুরু মাধবস্বামী সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ আয়ুর্বেদ বিশারদ ঋষি চরক তাঁর গ্রন্থের শুরুতে উল্লেখ করেছেন, 'অর্থের জন্য চিকিৎসা করবে না। সর্বজনের হিতকামনাই হবে চিকিৎসকের আদর্শ।'

আমি দুটি শর্তে সম্রাটের চিকিৎসার ভার নিতে পারি। প্রথমতঃ ব্যয়বহুল ভ্রমণ আমার অভিপ্রেত নয়। সেক্ষেত্রে ভ্রমণের ব্যয়ভার বহনের প্রশ্ন ওঠে না। দ্বিতীয়তঃ সুবর্ণমুদ্রার বিনিময়ে আমি সম্রাটের চিকিৎসা করতে অক্ষম।

শেষে গুরু মাধবস্বামী লিখলেন, যেহেতু কয়েক দিবস সম্রাটের রাজ্যে আমি অতিথি সেহেতু সম্রাটের চিকিৎসার ভার নেওয়া আমার কর্তব্য বলে মনে করি। অবশ্য পূর্বোক্ত দুটি সর্ত সাপেক্ষে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সম্রাটের প্রেরিত অমাত্য স্বয়ং উপস্থিত হয়ে বহু সম্মান দেখিয়ে প্রাসাদে নিয়ে গেলেন গুরু মাধবস্বামীকে।

সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত বড়ই কাতর হয়ে পড়েছিলেন। অসহ্য যন্ত্রণায় নিদ্রাহীন নিশি যাপন করছিলেন তিনি। গুরু মাধবস্বামী পরীক্ষা করে বললেন, অস্ত্রোপচারের আশু প্রয়োজন।

সন্নিকটে দাঁড়িয়েছিলেন রাজার জ্যৈষ্ঠ্য পুত্র রামগুপ্ত। তিনি বললেন, আপনি নিশ্চয়ই জানেন কার ওপর আপনি অস্ত্রোপচার করতে চলেছেন?

মাধবস্বামী উত্তর করলেন, সম্রাটই আমাকে তাঁর চিকিৎসার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

শল্য চিকিৎসায় কোনো বিপর্যয় ঘটলে আপনি তার সমূহ দায়িত্ব বহন করতে প্রস্তুত আছেন?

গুরু মাধবস্বামীর মুখে কঠিন উত্তর এসে গিয়েছিল, কিন্তু তার পূর্বে সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, কুমার, চিকিৎসকের সঙ্গে এভাবে বাক্যালাপ রীতি বিরুদ্ধ। আমি এই পরিব্রাজককে সসম্মানে আমার চিকিৎসার জন্য আহ্বান করে এনেছি। জীবন-মৃত্যুর সমস্ত দায়-দায়িত্ব আমার।

গুরু মাধবস্বামী বেদনাহর ঔষধ রাজার ওপর প্রয়োগ করে অস্ত্রোপচার করলেন। নির্দিষ্ট স্থানে অস্থি-সংস্থাপন করে উত্তম ভেষজপ্রলেপ দিয়ে নূতন বস্ত্র খণ্ডে বেঁধে দিলেন।

সম্রাট ঔষধের প্রয়োগে সংজ্ঞাহীনের মত শয্যায় পড়ে রইলেন। মাসাধিককাল গুরু মাধবস্বামী রইলেন প্রাসাদে। সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলেন।

প্রাসাদ ত্যাগ করে চলে আসার সময় হলে সমুদ্রগুপ্ত গুরু মাধবস্বামীকে বললেন, অর্থের বিনিময়ে কখনো প্রাণকে কেনা যায় না। যে চিকিৎসক মৃত ব্যক্তিকে জীবন দান করেন তাঁকে অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করাও অসম্ভব। তবু একটি অভিলাষ আছে, পূর্ণ করা না করা সম্পূর্ণ আপনার ইচ্ছাধীন।

মাধবস্বামী বললেন, বলুন সম্রাট, কি আপনার অভিলাষ?

সম্রাট বললেন, আমি আপনাকে 'ভিষক-রত্ন' উপাধিতে ভূষিত করতে চাই।

মাধবস্বামী সামান্য সময় ভেবে বললেন, রাজি আছি সম্রাট, তবে আপনার মানপত্রে এইটুকু কথা যেন সংযোজিত হয়, ভুবনবিদিত তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যার্থী মাধবস্বামী।

সম্রাট বললেন, অবশ্যই আপনার ইচ্ছানুযায়ী সুবর্ণপত্রে তক্ষশীলার নাম খোদিত থাকবে।

মানপত্র প্রদানের দিন বিরাট মণ্ডপের তলায় স্বয়ং সম্রাট পায়ে হেঁটে এসে বসলেন। বিভিন্ন বিদ্যায়তনের মহা মহা পণ্ডিতেরা সমবেত হলেন সভায়। নগরবাসী, জনপদবাসীতে পূর্ণ হয়ে গেল সভাস্থল।

পণ্ডিতেরা গুরু মাধবস্বামীর প্রশস্তি গাইলেন দেবভাষায়। সম্রাট প্রদত্ত মানপত্র পাঠ করলেন মগধ বিদ্যালয়ের প্রধান আচার্য।

তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি এইভাবে ঘোষিত হলে অন্তরে পরম শান্তি নিয়ে গুরু মাধবস্বামী আবার পথে নামলেন।

দীর্ঘ সময় মাধবস্বামীর পাটলিপুত্র পরিভ্রমণের কাহিনী শুনিয়ে মহারাজ মেঘবাহন কিছু সময়ের জন্য স্থির হয়ে বসে রইলেন।

জীবার দুই চোখে তখন অশ্রুর প্লাবন।

মহারাজ মেঘবাহন মুখ তুলে বিস্মিত হয়ে বললেন, আপনার চোখে অশ্রু!

জীবা চোখের জল মুছে বলল, মহারাজ, গুরু মাধবস্বামীর কাহিনী শুনে অন্তরে গভীর আনন্দের সঞ্চার হওয়াই স্বাভাবিক কিন্তু সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের প্রসঙ্গ উঠলে আমি আর নিজেকে স্থির রাখতে পারি নি।

এই অস্থিরতার কারণটুকু জানতে পারি কি ?

বলব মহারাজ, অসঙ্কোচেই বলব। সে কাহিনী অনেক দীর্ঘ। অতি সংক্ষেপে তার সার কথাটুকু আপনাকে নিবেদন করছি।

জীবা শুরু করল, আমার স্বামীর সঙ্গেও আকস্মিক ভাবে দেখা হয়ে যায় সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের।

বিস্মিত হয়েমেঘবাহন বললেন, আশ্চর্য! কোথায়, কিভাবে?

আমার তরুণ স্বামী তখন তক্ষশীলার পাঠ শেষ করে নালন্দার পথে যাত্রা করেছেন অনেক কৌতূহল নিয়ে। পথে এক অরণ্যে হঠাৎ সম্রাটের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে যায়।

মেঘবাহন বললেন, অরণ্যে, সম্রাটের সঙ্গে!

হ্যাঁ মহারাজ, সম্রাট তখন যৌধেয়, অর্জুনায়ণ জয় করার জন্য এগিয়ে চলেছেন। সন্ধ্যায় এক নদীতীর সংলগ্ন অরণ্যে পড়েছে সম্রাটের বিপুল বাহিনীর শিবির। সেখানে এক বৃক্ষে রাত্রিবাসের জন্য আমার স্বামীও আশ্রয় নিয়েছিলেন। সন্ধ্যার অরণ্যে চন্দ্রোদয় হল। সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত হাতে তুলে নিলেন তাঁর বীণা। অপূর্ব সুরের যাদুতে আচ্ছন্ন হল চরাচর। সেই মুহূর্তে আমার স্বামী ওষ্ঠে তুলে নিলেন তাঁর নিত্যসঙ্গী মুরলী। সম্রাটের বীণার সঙ্গে সঙ্গে সুমধুর মিলন ঘটল বাঁশরীর।

সহসা বন্ধ হয়ে গেল সম্রাটের বীণা। তিনি আমার স্বামীকে আহ্বান জানালেন তাঁর মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্য।

আমার স্বামী সম্রাটের সামনে এসে দাঁড়ালেন। সেই থেকে গভীর প্রীতির বন্ধন গড়ে উঠল সম্রাটের সঙ্গে আমার স্বামীর।

সেই সময় আর একটি ঘটনা ঘটল, যার ভেতর জড়িয়ে পড়ল আমার স্বামীর সঙ্গে একটি মেয়ের ভাগ্য।

কথার মাঝে থেমে গেল জীবা। সে ভাবতে লাগল ঘটনার শেষ অংশটুকু সে কেমন ভাবে বলবে।

তাকে থামতে দেখে মহারাজ মেঘবাহন বললেন, ঘটনা বর্ণনা করতে যদি আপনার দ্বিধা আসে তাহলে আপনাকে নিশ্চয়ই বলার জন্য আমি অনুরোধ জানাব না।

না মহারাজ, আজ সেই ঘটনার আবর্তে ভেসে যাওয়া দুটি নরনারীর কেউই ইহলোকে বর্তমান নেই। আমি নির্দ্ধিধায় সেই সত্য কাহিনীর চুম্বকটুকু আপনাকে শোনাচ্ছি।

সম্রাটের কাছে নতি স্বীকার করে কোনো রাজা কর দানে তাঁকে তুষ্ট করেছেন, কেউ বা রাজপতাকায় গুপ্ত সম্রাটের প্রতীক গ্রহণ করে স্বীকার করেছেন তাঁর বশ্যতা। আবার কোন রাজা উপঢৌকন রূপে

সম্রাটের হাতে সমর্পণ করেছেন আপন কন্যাকে।

তেমনি এক কন্যা সে সময় সম্রাটের সঙ্গে সেই অরণ্যে অবস্থান করছিল। নাম তার বেতসা। এরপর অরণ্য ত্যাগ করে সম্রাট যখন পশ্চিম মুখে অভিযানের জন্য প্রস্তুত হলেন তখন জ্যোতিষ শাস্ত্রবিদ বললেন, মহারাজ, নারীকে সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করলে শুভ ফল প্রাপ্তির সম্ভাবনা কম।

সম্রাট জ্যোতিষের বাক্য শিরোধার্য করলেন। তিনি আমার স্বামীকে আহ্বান করে বললেন, কুমারায়ণ, নালন্দায় যাবার অভিপ্রায় ছিল তোমার। আমি দ্রুতগামী অশ্ব-যোজিত রথ দিচ্ছি। তুমি বেতসাকে নিয়ে চলে যাও আমার প্রাসাদে। তুমি বিদ্বান, সঙ্গীতে অনুরাগী, তার ওপর নিপুণ অস্ত্রবিদ। তোমার ওপর বেতসার নির্বিঘ্ন যাত্রার ভার দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই।

আমার স্বামী সম্রাটের কাছ থেকে দায়িত্ব পেয়ে বেতসাকে নিয়ে চললেন পাটলিপুত্র অভিমুখে। দীর্ঘ পথযাত্রায় নানা ঘটনার মধ্যে আমার স্বামীর বীরত্ব, বুদ্ধিমত্তা ও সহৃদয়তার পরিচয় পেয়ে বেতসা তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়।

মহারাজ মেঘবাহন সবিনয়ে প্রশ্ন করলেন, আপনার স্বামীও কি বেতসার প্রতি অনুরক্ত হয়েছিল?

হ্যাঁ মহারাজ। তবে তিনি সম্রাটের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার কোনো কাজই করেননি।

পরে যখন সম্রাট প্রাসাদে ফিরে এলেন তখন প্রতিদিন প্রাসাদ থেকে অতিথিভবনে আমার স্বামীর কাছে আহ্বান আসত। দুজনে প্রাসাদের অন্তঃপুরে বহুরাত্রি অবধি সঙ্গীত চর্চায় মগ্ন থাকতেন। সেখানে চকিতে বেতসার সঙ্গে হয়তো দৃষ্টি বিনিময় হত আমার স্বামীর।

একসময় সম্রাট গেলেন তাঁর মাতুলালয়ে। সেই সুযোগে এক রাত্রে প্রাসাদ থেকে অতিথিভবনে চলে এল বেতসা। সে তখন উত্তেজনায় কাঁপছিল। সে যা বলে গেল তার অর্থ হল, অতি দ্রুতগামী দুটি অশ্বের ব্যবস্থা সে করেছে। পলায়নের এই সুবর্ণসুযোগ।

আমার স্বামী তাকে অনেক বুঝিয়ে নিবৃত্ত করলেন। কিন্তু যার অন্তরে রাত্রিদিন জ্বলছে কামনার অগ্নি, তাকে নিবৃত্ত করবে কে!

সম্রাট ফিরে এলেন। ফাল্গুনে প্রাসাদ থেকে দূরে রাজ-উদ্যানে শুরু হল মদনমহোৎসব। এ উৎসবে রানী ও রাজপুরাঙ্গনারাই উপস্থিত থাকেন। পুরুষ কেবলমাত্র সম্রাট। সেখানে বিশেষভাবে নির্মিত মদনমন্দিরে রানীরা একে একে প্রেমের দেবতা মদনকে অর্ঘ্য দান করেন। তারপর রাজাকে রঞ্জিত করেন কুমকুম চূর্ণে।

সেই মদনমহোৎসবেই সম্রাট বেতসাকে প্রধানা সেবিকার পদ থেকে রানীর মর্যাদা দান করবেন, এমনই পরিকল্পনা ছিল। সম্রাট দীর্ঘদিনের নিয়ম ভঙ্গ করে সেই উৎসবে সঙ্গে নিলেন আমার স্বামীকে।

উৎসবের সমাপ্তিপর্বে ঘটল সেই দারুণ অঘটন। বেতসা মদনমন্দিরে আরতি শেষ করে মহারাজের চরণে কুমকুম দিতে আসবে, আর মহারাজ তাকে বরণ করবেন রানীর মর্যাদায়। কিন্তু বেতসা আর মদনমন্দির থেকে বেরিয়ে এল না। সহসা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল দাহ্যপদার্থে তৈরি মন্দিরটি। মুহূর্তে সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে গেল। এমনি করে বেতসা বেছে নিল তার আত্মহননের পথ।

মহারাজ মেঘবাহন বললেন, আশ্চর্য ঘটনা!

জীবা বলল, আপনার মুখে সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের কথা শুনে বেতসা আর আমার স্বামীর কথা মনে পড়ল। তাই চোখের জল রোধ করতে পারিনি মহারাজ।

জীবা কিছু সময় নীরব থেকে বলল, এখন বলুন মহারাজ বাক্ আর গুরু মাধবস্বামীর কাহিনী।

মহারাজ শুরু করলেন, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়নি, মাধব-স্বামী প্রবেশ করলেন গঙ্গাতীরবর্তী একটি গ্রামে। গ্রামখানি ছিল ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত। তিনি ক্ষুধার্ত ছিলেন তাই সম্মুখে যে গৃহটি দেখলেন, সেখানেই আহার্যের জন্য কিছু প্রার্থনা করতে মনস্থ করলেন।

দ্বারে কয়েকবার করাঘাত করতেই একটি শিশুর ক্রন্দনধ্বনি শোনা গেল। পরক্ষণেই দরজা খুলে সামনে এসে দাঁড়াল একটি যুবতী। বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসরের অনধিক বলেই মনে হল।

মাধবস্বামী বললেন, মা, আমি পরিব্রাজক। বড়ই ক্ষুধার্ত। কিছু আহার্যের প্রত্যাশা করি।

যুবতী বধূটি গৃহে প্রবেশ করে একটি আসন এনে দাওয়ায় বিছিয়ে দিয়ে বলল, আপনি আসন গ্রহণ করুন বাবা, সামান্য যা আছে তা আপনার সেবার জন্য এনে দিচ্ছি।

মাধবস্বামী লক্ষ করলেন সারা গৃহে দারিদ্র্যের ছাপ। তারই ভেতর থেকে বধূটি সামান্য কিছু আহার্য এনে রাখল।

তার পরিবেশনের মধ্যে এমন আন্তরিকতা আর শ্রী ছিল যে গুরু মাধবস্বামী মুগ্ধ হয়ে গেলেন। আহারান্তে আচমন করে এসে জিজ্ঞেস করলেন, মা, তোমার বাড়িতে কোনো পুরুষমানুষকে দেখছি না কেন?

আমার স্বামীই এ বাড়িতে একমাত্র পুরুষ। কিন্তু বাবা, তিনি বড়ই অসুস্থ। তাঁর উত্থানশক্তি নেই।

কে তাঁর চিকিৎসা আর দেখাশোনা করছে মা?

শূন্যের দিকে দুটি হাত তুলে মেয়েটি জানিয়ে দিল, ভগবান।

মুখে বলল, প্রতিবেশী জ্ঞাতিগোত্র কিছু দূরেই রয়েছেন, তবে তাঁদের সঙ্গে বড় একটা সম্প্রীতি নেই। তাঁরা এতবড় বিপদের কথা শুনে একবারও এসে দাঁড়াননি।

আমি একবার তোমার স্বামীকে দেখতে পারি মা?

আসুন বাবা।

বধূটি মাধবস্বামীকে পথ দেখিয়ে ভেতরে নিয়ে গেল। শয়ন গৃহখানি অতি ক্ষুদ্র। একটি প্রদীপ গৃহকোণে প্রজ্জ্বলিত। শিশুকন্যাটি অকাতরে নিদ্রা যাচ্ছে। সম্ভবত দ্বারে করাঘাতের শব্দে সে একবারমাত্র জেগে উঠে ক্রন্দনের মাধ্যমে তার প্রতিবাদ জানিয়েছিল।

রোগগ্রস্ত ব্যক্তিটির বিশেষ কোন চেতনা ছিল না। গুরু মাধবস্বামীর নির্দেশে বধূটি গৃহকোণ থেকে প্রদীপটি রোগীর শয্যাপার্শ্বে নিয়ে এল। রোগীর মুখমণ্ডলে এসে পড়েছে ক্ষীণ আলোক রশ্মি। চমকে উঠলেন গুরু মাধবস্বামী। ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলেন ঘরের বাইরে।

একটু পরেই বধূটিও তাকে অনুসরণ করে এসে দাঁড়াল। সহসা চিন্তিত মাধবস্বামীর দুটি পা জড়িয়ে ধরে মেয়েটি বলল, বাবা, কেমন দেখলেন? উনি এ যাত্রায় রক্ষা পাবেন তো?

মেয়েটির মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে মাধবস্বামী বললেন, কোথাও কি কেউ অমর আছে রে মা। কেউ আজ, কেউ কাল। দেহের ছায়ার মত মৃত্যু ঘুরে ফিরছে জীবনের সঙ্গে।

মেয়েটি এখন স্থির হয়ে বসে বলল, বাবা, আমি আমার ভাগ্যের পরিণতি বুঝে নিয়েছি। আমি জানি, আমার ভাগ্যের দেবতা আজ সন্ধ্যায় আপনাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমার অনুরোধ ওঁর দেহাবসান যতদিন না হয় আপনি কৃপা করে এখানে অবস্থান করুন! উপযুক্ত সময়ে হয়তো আপনি মেয়েকে কিছু সাহায্য করতে পারবেন।

প্রথমে মেয়েটি দুর্বল হয়ে পড়েছিল, পরে তার মানসিক শক্তি প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। এই পরিস্থিতিতে মাধবস্বামী তার চিত্তের দৃঢ়তা দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন।

মাধবস্বামী বললেন, মা, তোমার অন্তরের শক্তি দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। তাই তোমার কাছে সত্য গোপন করে লাভ নেই। তুমি প্রস্তুত হও মা। গ্রামস্থ জ্ঞাতিদের সংবাদ দাও। শেষ কৃত্যে তাঁদের সাহায্য তোমার অবশ্য প্রয়োজন। আমি চিকিৎসা শাস্ত্রে পারদর্শী। সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত স্বয়ং আমাকে শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকের শিরোপা দিয়েছেন। কিন্তু মা, তোমার স্বামীর ক্ষেত্রে আমি অসহায়। স্বয়ং কৃতান্ত রোগীর শিয়রে এসে বসে আছেন। তাঁর ছায়া পড়েছে তোমার স্বামীর মুখে। মর্ত্যবাসী আমার এ ক্ষমতা নেই যে কৃতান্তকে সরিয়ে আমি তোমার স্বামীকে উদ্ধার করি। আমার ধারণা, আকাশের ঐ চন্দ্রমার অস্তগমনের সঙ্গে সঙ্গে তোমার স্বামীও এই মরদেহ ত্যাগ করে অমরলোকে প্রস্থান করবেন।

মেয়েটি অবস্থার গুরুত্ব ও অনিবার্যতা উপলব্ধি করে গুরু মাধবস্বামীর উপদেশমত জ্ঞাতি ও গ্রামস্থ মানুষজনকে সংবাদ দেবার জন্য চলে গেল। যারা বিপদে একবারও পাশে এসে দাঁড়ায়নি তারা ভীড় করে এল মৃত্যুদৃশ্য দেখতে।

গুরু মাধবস্বামীর অনুমান মিথ্যা হয়নি। চন্দ্রের অস্তগমনের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণের প্রাণপুরুষ মহাশূন্যে বিলীন হয়ে গেল।

এরপর দিবালোক প্রস্ফুটিত হলে সমাজপতিদের সভা বসল। সিদ্ধান্ত হল, বধূকেও স্বামীর সঙ্গে সহমৃতা হতে হবে। গর্ভস্থ সন্তান থাকলে স্ত্রীলোকের স্বামীসহ চিতারোহণ নিষিদ্ধ হত কিন্তু এক্ষেত্রে কন্যার বয়স এক বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে।

বিদ্যুৎ চমকের মত সহমরণের খবর গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে প্রচারিত হয়ে গেল। দলে দলে নারী পুরুষ শঙ্খধ্বনি করে, কাঁসরঘণ্টা বাজিয়ে জড়ো হতে লাগল অরণ্য সংলগ্ন গঙ্গা তীরবর্তী শ্মশানে। স্থানটি কয়েক দণ্ডের মধ্যে পূর্ণ হয়ে গেল কোলাহলে।

মেয়েটি গুরু মাধবস্বামীকে অনুচ্চে বলল, বাবা, এই আমার নিয়তি। ওরা আমাকে বাঁচতে দেবে না। সমাজপতি আমার স্বামীর জ্ঞাতিভ্রাতা। আমার এই ক্ষুদ্র ভদ্রাসনটির ওপর তাঁর বহুদিনের লোভ। অর্থ দিয়ে ক্রয় করতে চেয়েছিলেন, সম্মত হননি আমার স্বামী। এখন সুবর্ণসুযোগ তাঁর হাতে। অবশ্য স্বামীর ভিটেয় যদি আমি বসবাসও করতাম তা হলেও ওরা আমাকে সম্মানের সঙ্গে বাঁচতে দিত না। তার চেয়ে আমার মৃত্যু ভাল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মেয়েটি বলল, শুধু ভাবনা আমার শিশুকন্যাটিকে নিয়ে।

একটু থেমে কাতর গলায় বলল, বাবা আপনি কি আমার অসহায় হতভাগ্য মেয়েটিকে রক্ষা করতে পারেন না? আপনি রাজি থাকলে আমি সমাজপতির কাছে শেষ অনুরোধ জানাব, মেয়েটিকে আপনার হাতে তুলে দেবার জন্য। তাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, লোভী মানুষটা আপত্তি জানাবে না। তার পথের শেষ কাঁটাটি সরে যাবে ভেবে বরং খুশীই হবে।

তাই হল। মেয়েটির ভার তার মায়ের শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী অর্পণ করা হল গুরু মাধবস্বামীর হাতে।

বধূটি চিতায় যাবার আগে বলেছিল, বাবা কার না ইচ্ছে করে এ পৃথিবীতে বাঁচতে। কে চায়, জ্বলন্ত আগুনে অসহায় অবস্থায় পুড়ে ছাই হয়ে যেতে।

তার শেষ কথা ছিল, আপনি আমার শিশুকন্যাটিকে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকুন। আমি ওর দিকে চেয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করব।

থামলেন মহারাজ মেঘবাহন। বললেন, এই হল আশ্রম কন্যা বাকের ইতিহাস। গুরু মাধবস্বামী যে উপযুক্ত আধারে উপযুক্ত শিক্ষার পানীয়টি ভরে দিতে জানেন, আশা করি সে সম্বন্ধে আপনার ধারণা এখন স্পষ্ট হল। বাকের সমাজবিদ্যা শিক্ষার পেছনে গুরুর এই নির্মম অভিজ্ঞতাই কাজ করে চলেছে।

জীবা বলল, বিচিত্র অভিজ্ঞতা গুরু মাধবস্বামীর।

।। তিন।।

তুমি তক্ষশীলায় কেবল যুদ্ধবিদ্যাই শিখবে বিক্রমকেশরী?

তার সঙ্গে রাজনীতির পাঠ নেব বাক্।

মানুষের কথা জানবে না, মানুষের সুখ দুঃখের কথা?

হেসে বলল বিক্রমকেশরী, সেটা তোমার জন্যে তোলা রইল।

এমন কথা বল না বিক্রম। তুমি একদিন রাজার আসনে বসবে, তার আগে মানুষের কিসে সুখ কিসে দুঃখ জেনে নেবে না? রাজা হলে তাকে প্রজার দুঃখ দূর করতে হবে।

প্রজা যদি রাজাকে ভয় না করে তাহলে তার কাছ থেকে সমীহ আদায় করা যায় না বাক্।

কিন্তু ভালবাসা? তার চেয়ে মূল্যবান মানুষের কাছ থেকে পাবার কি আছে বল? তুমি মানুষকে ভালবাসলে একদিন তার হৃদয়ে রাজার আসনে বসবে।

তোমার কথা মনে রাখব বাক্।

এবার লঘু হল বাকের কণ্ঠ, তুমি তক্ষশীলায় গিয়ে শুধু আমার কথাগুলোই মনে রাখবে, আমাকে মনে

রাখবে না?

মনে রাখব বাক্! আমি কখনো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলে তুমি কেমন করে আমার অস্ত্রগুলো লুকিয়ে ফেলতে সে কথা মনে পড়বে। আরও মনে পড়বে, তুমি আমাকে অব্যর্থ লক্ষ্যভেদের জন্য কত প্রেরণা দিতে।

সে কথা থাক, এখন আমার একটি শুধু অনুরোধ তোমার কাছে।

বল।

তক্ষশীলায় গিয়ে কুমারজীবের সঙ্গে অটুট রাখবে তোমার বন্ধুত্ব।

আমার দিক থেকে চেষ্টার কোনো ত্রুটি থাকবে না।

তা হলেই আমি নিশ্চিন্ত বিক্রম।

এত বিশ্বাস তোমার কুমারজীবের ওপর?

বাক্ বিক্রমের হাত স্পর্শ করে বলল, তোমার ওপরেও আমার বিশ্বাস কম নয় বিক্রমকেশরী। তবে তুমি রাজার ছেলে, সহসা ক্রোধের বশবর্তী হও। তোমার শৌর্য, বীর্য, বিবেচনার অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছি আমি। আবার কুমারজীবের স্থির শান্ত ভাব, বন্ধুপ্রীতির প্রশংসাও কম করিনি।

একটা কথার স্পষ্ট উত্তর দেবে বাক্?

নিশ্চয়ই।

তুমি দুজনের ভেতর কাকে বেশী ভালবাস?

দুজনের প্রতি আমার ভালবাসার কোনো তারতম্য নেই।

উত্তেজিত হল বিক্রমকেশরী, এ হয় না বাক্ হতে পারে না। এক নদী তার দুই শাখানদীকে সমান জল কখনো ভাগ করে দিতে পারে না।

সজল হয়ে উঠল বাকের চোখ। তার দুই কপোল বেয়ে দুটি অশ্রুবিন্দু গড়িয়ে পড়ল। বিক্রমকেশরী বিচলিত হয়ে বলল, বাক্, তুমি কাঁদছ!

অমনি হাসি ফুটে উঠল সজল মেঘে রৌদ্রের লীলার মত।

বাক্ বলল, তোমরা দুজনেই আমার দু'বিন্দু অশ্রু। আমার ভালবাসা, আমার আনন্দ সেই অশ্রুবিন্দুর ওপর পড়ে রামধনুর খেলা খেলে।

বিক্রম অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলল, ঐ যে বনের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে কুমারজীব আর চম্পা। চল ওদের ধরা যাক।

বাক্ আর বিক্রম দুজনেই ওদের দিকে এগিয়ে গেল।

চম্পা হাতে ধরে রাখা একটি ফুল বিক্রমকেশরীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, এই নাও তোমার উপহার।

ফুলটি হাতে ধরে গন্ধ নিয়ে বিক্রম বলল, চমৎকার, যেমন দেখতে তেমনি মিষ্টি গন্ধ।

বাক্ সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য করল, ঠিক চম্পার মত।

কুমারজীব হেসে বলল, আমি তোমার মন্তব্যকে পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি বাক্।

বিক্রম বলল, আমার কিন্তু ভিন্ন মত। সৌন্দর্য সম্বন্ধে আমার দ্বিমত না থাকলেও চম্পা তার সৌরভ সম্বন্ধে কৃপণ। সবাইকে সে তার অন্তরের সুবাস বিলিয়ে দেয় না।

বিক্রমের মন্তব্যে আহত বাক্ বলল, চম্পা কৃপণ নয় বিক্রম, ও ভীরু। নিজেকে প্রকাশ করতে চিরদিনই দ্বিধা ওর।

বিক্রম এবার সম্পূর্ণ ভিন্ন কথার অবতারণা করে বলল, চল চম্পা, বনের থেকে মনের মত ফুল তুলে তোমাকে উপহার দিই।

কুমারজীব বলল, বিক্রমের তুলনা নেই। ওর আপাত কঠোর মনের ভেতর আর একটা কোমল দরদী মন লুকিয়ে রয়েছে। যাও চম্পা, বীরের হাত থেকে শ্রেষ্ঠ পুরস্কারটি নিয়ে নাও।

বিক্রমের সঙ্গে চম্পা চলে গেল অরণ্যের মধ্যে।

বাক্ এবার মুখোমুখি হল কুমারজীবের।

তুমি অতুলনীয় কুমারজীব।

তক্ষশীলায় যাত্রার আগে একি বাকের উপহার?

আমার উপহার দেবার সম্পদ বা সামর্থ্য কোথায় কুমারজীব।

কেন, বাকের সুললিত বাক্য কি যে কোন মূল্যবান বস্তুর চেয়েওশ্রেষ্ঠ উপহার নয়।

তুমি নির্লোভ তাই সামান্য মুখের কথা তোমার কাছে এত দামী।

এবার ভিন্ন একটি কথার অবতারণা করল কুমারজীব, গুরু মাধবস্বামী কি বলেছেন জান?

বাক্ মুগ্ধ শ্রোতার মত মুখখানি কাত করে কুমারজীবের দিকে চেয়ে রইল।

'তক্ষশীলার পাঠ শেষ করে ফিরে এসে যদি আমাকে আর দেখতে না পাও তাহলে বাকের শুভাশুভের ভার তুমিই গ্রহণ কর।'

বাকের মুখ সহসা প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। পরমুহূর্তেই ম্লান ছায়া ঘনাল সে মুখে। সে বলল, আচার্যদেব কেন এমন কথা বললেন কুমারজীব! তিনি কি তাঁর জীবনকাল খুবই সীমিত বলে ভাবছেন!

তা নয় বাক্। মানুষের আয়ুষ্কাল সম্বন্ধে কে কবে নিশ্চিতভাবে শেষ কথাটি বলতে পেরেছে! তিনি হয়তো সম্ভাবনার ওপর নির্ভর করেই কথাগুলো বলেছেন।

সে যা হোক্, আচার্যের কথার কি উত্তর দিলে তুমি?

গুরুর আদেশ শিরোধার্য করতে হয় বাক্। এখানে কোনোরকম উত্তর প্রত্যুত্তর চলে না।

বাক্ কৌতুক ভরা কণ্ঠে বলল, ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা বাড়ল আমার, কি বল?

দায়িত্ব পালনের অক্ষমতা জানিয়ে গুরুর আদেশকে তো এড়িয়ে যেতে পারি না।

এবার বাক্ বলল, দাঁড়াও, তোমার জন্যে একটি উপহার তৈরি করে রেখেছি, নিয়ে আসি।

কি উপহার বাক্?

বাঃ, উপহারের কথা আগেভাগে কেউ বলে দেয় নাকি। নিয়ে আসি, তখন নিজেই দেখতে পাবে।

বাক্ আশ্রম-কুটীরে চলে গেল। কুমারজীব একাকী আশ্রমের তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরে দাঁড়িয়ে তার দীর্ঘ আশ্রম-জীবনের কথা ভাবতে লাগল।

কত শিক্ষা, কত সুখ, কত সাহচর্য। গুরুর সর্ববিষয়ে কি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি! তাঁর সান্নিধ্যে প্রাণ পূর্ণ আর ধন্য হয়ে যায়। অন্যদিকে বাক্, সে যেন আশ্রমের ছায়াতরু। তপ্ত, ক্লান্ত মনকে এমন করে স্নিগ্ধ শান্তিতে ভরে দিতে তার জুড়ি নেই।

বিক্রমকেশরীর অন্তরে প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার, সে রাজপুত্র। কিন্তু সে গুণহীন নয়। বীর্যবান, বন্ধুবৎসল। কেবল প্রতিযোগিতায় পরাজিত হলে সে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, তখন তার হিতাহিত জ্ঞান সাময়িকভাবে লুপ্ত হয়ে যায়। এ সম্ভবত রাজরক্তের অন্ধ অহঙ্কার।

কিন্তু কি আশ্চর্য! চম্পা সামনে এলে বিক্রমকেশরীর আচরণে ঔদ্ধত্য প্রকাশ পায় না। সে চম্পার সান্নিধ্য ভীষণভাবে কামনা করে। চম্পা তার প্রশংসা করলে সে সেই প্রশংসাকে তৃষ্ণার্তের মত পান করে তৃপ্ত হয়।

চম্পা মহারাজ মেঘবাহনের কন্যা, তাই কি রাজপুত্রের তার প্রতি প্রচ্ছন্ন আনুগত্য? তার সামান্য প্রশংসায় সে বিহ্বল, বিগলিত?

চম্পা! অসামান্য ঔদার্য নিয়ে জন্মেছে সে। যা কিছু তার আছে সবকিছু বিলিয়ে দিয়েই তার আনন্দ। অভিজাত তার পদক্ষেপ, ততোধিক অভিজাত তার আচরণ। সে আচার্যের প্রতিটি বাক্য বৈদিক ঋষির নির্দেশ বলে মনে করে। বন্ধুদের সঙ্গে তার সদাচারের তুলনা হয় না। প্রতিটি পশুপক্ষীর প্রতি তার করুণার শেষ নেই। অশেষ ঐশ্বর্যের অধিকারিণী সে, তাই অহঙ্কার তাকে অধিকার করতে পারে নি।

শ্যামল প্রান্তরের বুকে দাঁড়িয়ে নির্মল নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে কুমারজীব মনে মনে স্তোত্রের মত উচ্চারণ করতে লাগল, হে আকাশ, তুমি তোমার মেঘবারি বর্ষণে আমাদের আশ্রমটিকে স্নান করিয়ে দিও। তোমার সূর্যালোক স্পর্শে অরণ্য বৃক্ষগুলি লাভ করুক নবীন জীবন। তোমার চন্দ্রকিরণে স্নিগ্ধ হোক্, পূর্ণ

হোক্ আশ্রমবাসীর প্রাণ।

এবার আশ্রমের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল, হে আশ্রমজননী, তোমাকে ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে আমাদের। যেখানে যাই, যতদূরে যাই, কখনো ভুলতে পারব না তোমার কথা। বৃদ্ধ আচার্যদেব রইলেন, আর রইল আমাদের সবার প্রিয়সখী বাক্। তুমি তাদের জননীর সদা জাগ্রত দৃষ্টিতে রক্ষা কর।

বাক্ সামনে এসে দাঁড়াল।

কুমারজীব তার দিকে হাতখানি প্রসারিত করে দিয়ে বলল, কই আমার উপহার?

বাকের মুখে হাসির রেখা। সে একখানি চিত্রিত পট কুমারজীবের হাতে ধরিয়ে দিল।

কুমারজীব পরতে পরতে পটখানি খুলে চোখের সামনে মেলে ধরল। চারি অংশে বিভক্ত পট। প্রথম অংশে, সিদ্ধার্থ চলে যাচ্ছেন রাজপুরী ত্যাগ করে। পেছনে প্রাসাদ, সামনে রথ। সিদ্ধার্থের দৃষ্টি অন্তর্লোকে।

দ্বিতীয় অংশে, পত্নী যশোধরা রাহুলকে বুকে জড়িয়ে নির্নিমেষ চেয়ে আছেন রাজপথের দিকে। সর্বস্ব হারানোর হাহাকার স্তব্ধ হয়ে আছে তাঁর দৃষ্টিতে।

এরপর তৃতীয় অংশে, বুদ্ধ বসে আছেন মহাদ্রুমের তলায়। শিষ্যেরা বসে আছেন তাঁর সম্মুখে। বুদ্ধ তথাগত দক্ষিণকর উত্তোলন করে তাঁদের উপদেশ দান করছেন।

চতুর্থ বা শেষদৃশ্যে বুদ্ধ বসেছেন আহারে, তাঁকে আহার্য নিবেদন করছেন আম্রপালী।

সবার নিম্নে লেখা আছে একটিমাত্র ছত্র : 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি'।

এবার বাকের মুখের দিকে তাকাল কুমারজীব। আনন্দে বিস্ময়ে সে রুদ্ধবাক।

তুমি খুশী হওনি?

কুমারজীব বলল, এ আনন্দ প্রকাশের ভাষা আমার নেই আমি বাক্!

বা তুমি চিত্রাঙ্কন করতে, কিন্তু এমন জীবন্ত চিত্র তোমার তুলিতে প্রকাশ পাবে তা ছিল আমার কল্পনারও বাইরে। তোমার অন্তরের আসনে প্রভু বুদ্ধ বিরাজ না করলে সম্ভব হত না এমন ধ্যানের সৃষ্টি।

একটি কথা বলবে?

বল।

তোমার বিদায় দিনের স্মরণে চম্পা তোমাকে কি দিয়েছে?

সর্বস্ব।

সর্বস্ব!

হাঁ বাক্। সে আমার অঞ্জলিতে তার মুখখানা রেখে শুধু বলেছে, আমার যা কিছু সব তোমাকে দিলাম।

তুমি কি বললে?

বললাম, আমি ভিক্ষু, বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত, তা জেনেও তুমি আমাকে সর্বস্ব দান করলে! জান না আমাদের নিজের বলতে কিছু রাখতে নেই, সবই ধর্ম সঙ্ঘের।

চম্পা বলল, আমি তো সমর্পণ করে মুক্ত, তারপরের করণীয় তোমার।

বাক্ উদ্গত অশ্রুকে রোধ করে বলল, চম্পা সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার তোমার হাতে তুলে দিয়েছে কুমারজীব।

অন্তরের স্পর্শমাখা সকল উপহারই মূল্যের বিচারে সমতুল্য বাক্। তোমরা দুটিতে কুমারজীবের স্মৃতিতে সমানভাবে সঞ্জীবিত রইবে চিরদিন।

কুমারজীব বিক্রমকেশরীর সঙ্গে শিক্ষার অভিলাষে চলে গেছে তক্ষশীলায়। জননী জীবা পুত্রকে বিদায় দিয়েছে হাসিমুখে কিন্তু নিশীথ শয্যায় শুয়ে উপাধান সিক্ত করেছে চোখের জলে।

মহারাজ মেঘবাহন সবকিছুই অনুভব করেন। জীবার মাতৃহৃদয়ের বেদনা তাঁরও হৃদয়ে গিয়ে বাজে। তিনি প্রায়ই প্রাসাদ থেকে উদ্যানবাটিকায় নিয়ে আসেন চম্পাকে। কয়েকদিন চম্পা কাটিয়ে যায় জীবার সান্নিধ্যে। জীবা স্নেহমমতায় পূর্ণ করে দেয় রাজকন্যা চম্পার হৃদয়।

কখনো মহারাজ একাই আসেন জীবার নিঃসঙ্গতাকে দূর করতে। দীর্ঘ দশটি বছরের সান্নিধ্য দুটি

হৃদয়কে অনেক কাছে এনে দেয়। মহারাজ যখন অমর্তপ্রভার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে পীড়িত হয়ে পড়েন তখন প্রাসাদ ছেড়ে চলে আসেন উদ্যান-বাটিকায়। জীবা মহারাজের মুখের দর্পণে মনের প্রতিবিম্ব দেখতে পায়। উত্তপ্ত আন্তরিকতায় সে মহারাজকে অভ্যর্থনা জানায়। সময়োচিত বাক্যালাপে ধীরে ধীরে লঘু হয়ে আসে মহারাজের মনের ভার।

জীবা রাজাকে শোনায় বুদ্ধের জন্মান্তরের কাহিনীগুলি। মহারাজ মেঘবাহন তন্ময় হয়ে শোনেন সে সকল অমৃত কথা। পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক আর ধর্মজীবনের এমন দিক নেই যা বুদ্ধের জন্মান্তরের কাহিনীগুলির মধ্যে পাওয়া যায় না। মহারাজের চরিত্র, তাঁর জীবনধারা, তাঁর লোকব্যবহার, রাজ্যশাসন প্রণালী ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হতে থাকে। মেঘবাহন মনে মনে তথাগত বুদ্ধের চরণে আত্মসমর্পণ করেন।

একদিন জীবার মুখে জাতক কাহিনী শুনতে শুনতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল। জীবা উদ্যান-বাটিকায় রক্ষিত সুবর্ণ নির্মিত বুদ্ধের বন্দনা শুরু করল। জীবার কণ্ঠের স্তবগান সন্ধ্য সমীরে অপূর্ব সুরধ্বনি তুলে ছড়িয়ে পড়ল জলস্থল আর নভোলোকে।

মহারাজ মেঘবাহন তদ্‌গত চিত্তে সেই ধ্বনি শুনতে শুনতে রূপান্তরিত হয়ে গেলেন মৌর্যসম্রাট ধর্মাশোকের অমৃতসত্তায়। ঠিক সেই মঙ্গলমুহূর্তে উদ্যানসংলগ্ন পর্বত শিখরে শুভ্র পূর্ণ চন্দ্রের উদয় হল। মহারাজ সেই শান্ত জ্যোতির্ময় চন্দ্রের দিকে তাকিয়ে করুণাময় বুদ্ধের আবির্ভাব অন্তরে অনুভব করলেন। মুখে উচ্চারিত হল সেই পরমবাণী : বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।

ধীরে ধীরে মহারাজ মেঘবাহনের পাশে এসে দাঁড়াল জীবা।

মহারাজ তাব দিকে তাকিয়ে বললেন, আজ আমার সমস্ত অন্তর চাইছে আপনাকে কিছু দিয়ে তৃপ্ত হতে। আপনি আপনার অভিলষিত বস্তু প্রার্থনা করুন, আমি অর্পণ করে কৃতার্থ হই।

জীবা অনুভব করল মহারাজ মেঘবাহনের দিব্য-উপলব্ধি ঘটেছে। সে বলল, মহারাজ, আপনি চিরদিনই দাতা আর আমি ভিক্ষুণী। আমার তো আপনার কাছে নিত্য প্রার্থনা। আপনি তা পূর্ণও করে এসেছেন এতদিন। তবু যখন নতুন করে প্রার্থনার অধিকার দিলেন তখন আমার অন্তরের বহুদিনের একটি আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপদানে সাহায্য করুন।

প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি পূর্ণ হবে আপনাব আকাঙ্ক্ষা।

জীবা চন্দ্রালোকিত পর্বতের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলল, মহারাজ, ঐ পর্বত আপনার মহৎ দানে রূপান্তরিত হোক একটি বৌদ্ধ বিহারে। সারা কাশ্মীরে ভিক্ষুণীদের জন্য এটিই হোক প্রথম বিহার।

মহারাজ বললেন, শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের আহ্বান জানিয়ে তৈরি হবে এই বিহার। আমার রাজকোষ উন্মুক্ত থাকবে এই বিহার নির্মাণের কাজে।

মহারাজ বহু অর্থ ব্যয়ে গান্ধার থেকে শিল্পীদের আহ্বান করে নিয়ে এলেন। তাদের সঙ্গে যুক্ত হল ভারতীয় ভাস্করের দল। তারা পাহাড় কেটে তৈরি করতে লাগল চৈত্য, স্তূপ, স্তম্ভ। ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে লাগল দৃষ্টি নন্দন এক বিহার। তক্ষণ শিল্পীদের নিপুণ হাতে খোদিত হতে লাগল বিনয়পিটকের (বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের পালনীয় বিধি নিষেধ) বাণী। মূর্তি শিল্পীরা বুদ্ধ আর বোধিসত্ত্বকে অবলম্বন করে রচনা করে চলল ভাস্কর্যের অপূর্ব নিদর্শন। গুহাগাত্রে বর্ণপ্রলেপে চিত্র-শিল্পীরা অঙ্কন করতে লাগল বুদ্ধজীবনের বহু বিচিত্র ঘটনাবলী।

সপ্ত বর্ষের কঠোর শ্রম আর শ্রদ্ধায় গড়ে উঠল নয়নাভিরাম বৌদ্ধ বিহার। তার উদ্বোধনের দিন নির্ধারিত হল, কুমারজীব আর বিক্রমকেশরীর তক্ষশীলা থেকে প্রত্যাবর্তনের পরদিবস। ঠিক সেই দিনটিই আবার বৈশাখী বুদ্ধ পূর্ণিমার শুভলগ্ন।

সুসমাপ্ত বিহারটি এখন নির্জন। উদ্বোধন দিনের অপেক্ষায় সুশোভিত।

বিহারের মধ্যবর্তী চৈত্যের শীর্ষদেশ অর্ধ ঘণ্টাকৃতি। চৈত্যের দুই পার্শে সারি সারি গুহা। প্রবেশমুখে

এক একটি নিপুণ ভাস্কর্য-খোদিত স্তম্ভ। স্তম্ভগাত্রে বিনয় পিটকের উৎকীর্ণ উপদেশাবলী। চৈত্যের প্রবেশ পথের দুই পার্শ্বে মূল্যবান প্রস্তর নির্মিত উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি। প্রসন্ন, করুণাঘন, বরাভয়দাতা। গুহাগুলির অধিকাংশই সুধাস্ফটিক পাষাণ নির্মিত। পর্বতের সানুদেশ থেকে মণি-সোপান (শ্বেত পাথরের সিঁড়ি) উর্ধ্বে চৈত্যের পাদপীঠে গিয়ে শেষ হয়েছে।

পর্বত সংলগ্ন উপবীতের মত যে ঝর্ণার ধারা নিম্নের স্রোতস্বিনীতে এসে পড়ত সেটির শুভ্র, সুশীতল বারি ধরে রাখা হয়েছে কয়েকটি প্রস্তরনির্মিত কৃত্রিম জলাধারে।

যে দুই প্রান্তে বিহার শেষ হয়েছে তারপর থেকেই পার্বত্য-অরণ্যের শ্যাম শোভা সমগ্র বিহারটিকে অপূর্ব মহিমা দান করেছে।

চন্দ্রালোকে স্বপ্ন পরিবেশ। চৈত্যের তোরণ-শীর্ষ থেকে প্রলম্বিত পিত্তল নির্মিত ঘণ্টাগুলি বায়ুতাড়িত হয়ে মধুর ধ্বনিতরঙ্গের সৃষ্টি করছিল।

সোপানের ওপর দাঁড়িয়েছিল দুটি মূর্তি। একটি নারী, অন্যটি পুরুষ।

পুরুষ মূর্তিটি প্রথমে কথা বলল, আজ থেকে সারা রাজ্যে পশুহত্যা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে।

নারী বলল, বুদ্ধের অপার করুণা নিরন্তর এ রাজ্যের ওপর বর্ষিত হবে।

বিহার নির্মাণের যে প্রতিশ্রুতি আমি দিয়েছিলাম তা পূর্ণ করতে পেরে আজ আমি পরম সুখী।

আপনার জন্য রইল আমার শ্রদ্ধা, ভালবাসা, কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য।

পুরুষ বলল, এই বিহারের একটি নামকরণ প্রয়োজন।

নারী স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, স্থির হয়ে আছে এর নাম।

শোনার জন্য অধীর আগ্রহ নিয়ে পুরুষটি বলল, শুনতে পারি কি সেই বিশেষ নাম?

'অমর্ত-বিহার'। এই বিহারের ভেতর দিয়ে মহারানীর নামটিকে চিরস্মরণীয় করে রাখতে চাই। অমর্ত-প্রভা অমরত্ব লাভ করুন এই বিহারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে।

তিনি আজ যেখানেই থাকুন, পরম তৃপ্তিলাভ করবেন। এ খবরে সবচেয়ে খুশী হবে আমার চম্পাবতী।

প্রাসাদের প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে মহারাজ মেঘবাহন চম্পা চম্পা বলে কন্যাকে ডাকতে লাগলেন।

চম্পা ত্রস্ত পায়ে মহারাজের সামনে এসে বলল, এই যে আমি বাবা।

মহারাজ পরম আদরে কন্যাকে নিয়ে গেলেন উপবেশন-কক্ষে। নিজের পাশে বসিয়ে বললেন, মা, আজ বিহারে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে তোমার জন্যে বয়ে এনেছি একটি সংবাদ।

কি সংবাদ বাবা?

ভিক্ষুণী জীবা নতুন বিহারের নামকরণ করেছেন তোমার মায়ের নামে। 'অমর্ত-বিহার'।

অসাধারণ পরিকল্পনা জননী জীবার। আমরা যখন বিহার রচনা আর তার উদ্বোধনের উন্মাদনায় মত্ত, তখন কিন্তু তিনি ভোলেননি আমার জননীর কথা।

মহারাজ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন কতক্ষণ। একসময় চম্পার দিকে চোখ তুলে বললেন, মা, কিছুদিন থেকে তোমাকে একটি কথা বলব বলে আমি মনে মনে বড় অস্থির হয়ে উঠেছি।

চম্পা বাবার বুকে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, কিসের অস্থিরতা বাবা? আমার সঙ্গে কথা বলবে, তাতে আবার অস্থিরতা কি ? এখন সহজ করে বল তোমার কথা।

তুমি আমার একমাত্র কন্যা মা, তোমাকে আমি সুখী দেখতে চাই।

আমি অসুখী রয়েছি তোমাকে কে বললে বাবা।

তুমি বড় হয়েছ মা, এখন তোমাকে নতুন জীবনে প্রবেশ করতে হবে। তুমি সুখী হবে আমরাও সুখী হব।

চম্পা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, তুমি আমাকে তোমার কাছ থেকে সরিয়ে দিতে চাও বাবা।

আমি তোমাকে আমার কাছে রাখতে চাই মা। এখন শোন আমি কি চাই। আমার কথা শেষ হলে তুমি

তোমার মতামত জানিও।

চম্পা তাকিয়ে রইল তার বাবার মুখের দিকে।

মহারাজ বললেন, কুমারজীব কালই ফিরে আসছে রাজধানীতে। যুবক হিসেবে সে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। তুমি তাকে দীর্ঘদিন অতি নিকটে থেকে দেখেছ। আমার ইচ্ছে তোমার জীবনের সঙ্গে তার জীবন যুক্ত হোক।

তোমার ইচ্ছার সঙ্গে আমার ইচ্ছার কোনো বিরোধ নেই বাবা। আমিও দীর্ঘদিন মনে মনে প্রস্তুত হয়েছি তাকে গ্রহণ করবার জন্য।

উল্লসিত হয়ে উঠলেন মহারাজ মেঘবাহন, শুধু তোমার মত নেওয়া হয়নি বলে আমি কুমারজীবের জননীর কাছে এ প্রস্তাব রাখতে পারিনি মা।'

এখনও আমার সব কথা বলা হয়নি বাবা। আমি নিশ্চয়ই কুমারজীবকে চাই, তবে সংসার জীবনের ভেতর বন্দিকরে রাখার চেষ্টা করলে কোনো দিনও পাব না তাকে। বন্ধনের মাঝে সে ধরা দেবার নয়।

তবে তুমি কিভাবে তাকে পেতে চাও?

এই বিপুল পৃথিবীর সঙ্গে যেখানে তার যোগ, সেখানে বাঁধতে হবে আমার মিলনের মঙ্গলসূত্রটি। আমি জানি, ঐ একটিমাত্র স্থান যেখানে আমি ওকে চিরদিনের বন্ধনে ধরে রাখতে পারব।

মহারাজ মেঘবাহন কন্যার মস্তকে হাত রেখে বললেন, মা, তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কোনো দিনই কোনো কথা বলিনি, আজও বলব না। শুধু বলব, জীবনে তুমি যে পথই বেছে নাও, ঈশ্বর যেন তোমাকে আনন্দ আর শান্তি থেকে বঞ্চিত না করেন।

আজ বুদ্ধ পূর্ণিমার পবিত্র তিথি। প্রভাতের আলোক প্রস্ফুটিত হবার আগেই প্রাসাদ সংলগ্ন বিতস্তার বুকে ভেসে এল শত শত নৌকা। নগর, জনপদ শূন্য করে নরনারী, শিশু, বৃদ্ধ, যুবা আজ সমবেত হয়েছে প্রাসাদের সম্মুখে। এই প্রাসাদ থেকেই বেরুবে শোভাযাত্রা। সেই যাত্রা শেষ হবে অমর্ত-বিহারের পাদদেশে।

প্রভাত সূর্যের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে রাজপ্রাসাদ থেকে শোনা গেল মাঙ্গলিক বাদ্যধ্বনি। দ্বাদশটি পুষ্পমাল্য শোভিত তরণী একে একে বেরিয়ে এল প্রাসাদ সংলগ্ন ঘাট থেকে। মুণ্ডিত মস্তক ভিক্ষুণীরা বসে আছেন সেই সব তরণীতে। চীনাংশুকের ধ্বজা উড়ছে প্রভাত সমীরে।

প্রথম তরণীতে স্বয়ং মহারাজ। তাঁর দুই পার্শ্বে চম্পা আর বাক্। তরণীর একেবারে সম্মুখে চিত্রিত ছত্রের তলায় উচ্চ আসনে উপবিষ্ট কুমারজীব। বৌদ্ধ শ্রমণের কাষায় বর্ণরঞ্জিত বস্ত্র পরিধানে। মুণ্ডিত মস্তক। দুই নেত্রে অপার করুণার ছায়া। প্রথম সূর্যের আলোকে প্রদীপ্ত মুখমণ্ডল।

কুমারজীবের হস্তে একটি অপূর্ব প্রস্তর নির্মিত কলস। সেই কলস গাত্রে উৎকীর্ণ বুদ্ধ-বাণী। কলসের অভ্যন্তরে বহু শ্রমে সঞ্চিত বুদ্ধের পূতাস্থি কণিকা। অমর্ত-বিহারে রক্ষিত হবে সেই অমূল্য সম্পদ।

কুমারজীবের পার্শ্বে তার আবাল্য সুহৃদ বিক্রমকেশরী। অঙ্গে যুবরাজের বর্ণাঢ্য পরিধেয়।

আজ এই মহাসমারোহে যার অনুপস্থিতি এই তরণীর সকলকে গভীর ভাবে আলোড়িত করেছে, তিনি এই বিশেষ তরণীর সমস্ত আরোহীর গুরু মাধবস্বামী। মাত্র ছয় মাস পূর্বে আশ্রমের প্রশান্ত পরিবেশে তিনি চিরশান্তি লাভ করেছেন। বুদ্ধের পূতাস্থি বাহিত প্রথম তরণীর পশ্চাতে পুষ্পমাল্য শোভিত একাদশটি তরণী সারিবদ্ধভাবে এগিয়ে চলেছে। তার পশ্চাতে মিছিল করে এগিয়ে আসছে আবাল-বৃদ্ধবণিতা পূর্ণ শত শত তরণী।

সুমধুর, সুগম্ভীর বাদ্যধ্বনির সঙ্গে মধ্যে মধ্যে উচ্চারিত হচ্ছে প্রভু বুদ্ধের নাম-গান। পার্শ্ববর্তী পর্বতে উঠছে সে ধ্বনির প্রতিধ্বনি। তুষার পর্বতশৃঙ্গগুলি সোনার মুকুট পরে, গায়ে শুভ্র উত্তরীয় জড়িয়ে স্থির হয়ে দেখছে এই পবিত্র সুন্দর শোভাযাত্রা। যেন দেবলোক থেকে অভ্যাগতরা এসে আসন গ্রহণ করেছেন।

শোভাযাত্রা এসে পৌঁছল উদ্যান বাটিকায়। সমবেত জনতা এই স্থানে অবতরণ করল, নৌকা থেকে সম্মিলিত কণ্ঠে জয়ধ্বনি উঠল অমিতাভ বুদ্ধের।

চৈত্যের শীর্ষে ধাতু নির্মিত একটি বুদ্ধ মূর্তি শোভা পাচ্ছে। প্রভাতেব আলোকপাতে সে মূর্তি উজ্জ্বল সুন্দর সুষমামণ্ডিত হয়ে উঠেছে। সমবেত জনতা দেখল চৈত্যের পাদপীঠ থেকে সোপান বেয়ে নেমে আসছে একটি মূর্তি। সূর্যালোকে উদ্ভাসিত সেই দেবী প্রতিমা। তিনি বিহারের শেষ সোপানটিতে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর দিকে পূতাস্থি-কলস নিয়ে এগিয়ে গেল কুমারজীব। তিনি কলস গ্রহণ করলেন। সম্মিলিত কণ্ঠে ধ্বনিত হল —

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
ধম্মং শরণং গচ্ছামি
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

ভিক্ষুণীদের সঙ্গে নিয়ে সেই শ্রমণী উঠে চলে গেলেন সোপান বেয়ে। চৈত্যের অভ্যন্তরে সুবর্ণ নির্মিত বুদ্ধের সিংহাসনের তলদেশে রক্ষিত হল সেই কলস।

সারাদিন অর্চনার শেষে ভাবাপ্লুত জনতা সন্ধ্যালগ্নে ফিরে গেল নিজ নিজ গৃহাভিমুখে।

চন্দ্রোদয় হল। বৈশাখী বুদ্ধ-পূর্ণিমার দীপ্তি নিয়ে পর্বত শীর্ষে দেখা দিল নীল নভোলোকবিহারী শশাঙ্ক।

উদ্যান বাটিকায় দেখা গেল আলাপনিরত কয়েকটি মূর্তি।

চম্পা বলল, বাবা, আমি জননী জীবার কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেছি, রাজপ্রাসাদে আর ফিরে যাব না।

মহারাজ মেঘবাহন উদ্গত অশ্রু রোধ করে বললেন, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক মা। শুধু অনুরোধ, যদি কোনোদিন এই উদ্যানবাটিকায় আসি তাহলে বিহার থেকে নেমে এসে একবার দেখা দিয়ে যেও।

এবার কুমারজীবের দিকে ফিরে মহারাজ বললেন, কুমারজীব, তুমি আর তোমার জননী আজ যে আলো জ্বেলে দিলে তাকে প্রজ্জ্বলিত রেখো, এই কামনা। আমার রাজ্যের প্রতিটি মানুষ আজ ভগবান বুদ্ধের শরণ নিয়েছে। ধীরেধীরে তাদের মন থেকে দূর হয়ে যাচ্ছে সংস্কারের অন্ধকার। তুমি সমস্ত রাজ্যের ধর্মরক্ষক হয়ে মহামতি অশোকের আদর্শে সুস্থ, সমৃদ্ধ ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা কর।

মহারাজ।

বল কুমারজীব। আমি পুত্রহীন কিন্তু তুমি আমার দৃষ্টিতে পুত্রেরও অধিক। চম্পা আজ ভিক্ষুণী, শুধু তুমি রইলে আমার দৃষ্টির সামনে। ধর্মানুশাসনে রাজ্য রক্ষা কর।

মহারাজ, আমি পিতৃহীন। জননীর হাত ধরে সম্পূর্ণ অপরিচিত এই রাজ্যে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে আপনি পিতৃস্নেহে আমাকে রক্ষা করেছেন। আজ আমার যদি কিছু আত্মিক উন্নতি ঘটে থাকে তাহলে মহারাজের কাছে ঋণস্বীকার না করে আমার উপায় নেই। কিন্তু মহারাজ—।

বল কুমারজীব। আমার কাছে কোনো কুণ্ঠা রেখো না!

মহারাজ, অন্তরে আমি পেয়েছি প্রভুর আদেশ। তিনি আমার হাতে তুলে দিয়েছেন দীপ। তাঁর ইচ্ছায় আমাকে সেই দীপ নিয়ে চলতে হবে। যেখানে অন্ধকার সেখানে জ্বালাতে হবে আলো। তিনি আমার হাতে তাঁর দীপটি ধরিয়ে দিয়ে বিশ্বপথিক করে দিয়েছেন মহারাজ।

স্তব্ধ হয়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন মেঘবাহন। তাঁর হৃদয় সব হারানোর বেদনায় ভেঙে পড়তে চাইল। কিন্তু পরক্ষণেই এক আশ্চর্য শক্তি তাঁকে সঞ্জীবিত করে তুলল। তিনি ধীরে ধীরে বললেন, বিশ্ব মানবের জন্য যে প্রাণ কাঁদে তাকে আমি দুটো বাহুর বাঁধনে বেঁধে রাখব এমন সাধ্য কই। তোমার জ্ঞানের আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ুক, তাতেই আমার পরম শান্তি আর পরিতৃপ্তি খুঁজে পাব কুমারজীব।

এবার জীবার দিকে তাকিয়ে বললেন, কুমারজীবের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করছে দুটি শুভ নক্ষত্র। তার একটি নক্ষত্র আপনি অন্যটি ভগবান বুদ্ধ। আপনি শুকতারার মত তাকে দিয়েছেন প্রভাতের সন্ধান। আর করুণাময় বুদ্ধ ধ্রুবনক্ষত্রের মত স্থির আলোকের লক্ষ্যে তাকে আকর্ষণ করে নিয়ে চলেছেন।

সামান্য সময় নীরব থেকে বললেন, একটি শিশুকে একদিন আপন পক্ষচ্ছায়ায় আবৃত করে নিয়ে এসেছিলেন। আজ সে নিজেই আলোর জগতে দুটি পাখা মেলে দিয়েছে। তবু বলব, জননীর নিরন্তর দৃষ্টি থেকে সে যেন বঞ্চিত না হয়। আপনি থাকুন কুমারজীবের সঙ্গে, তাহলে দূরে থেকেও আমি গভীর শান্তি

লাভ করব।

মহারাজ নীরব হলেন। চন্দ্রালোকিত উদ্যান-বাটিকার ওপর দিয়ে বয়ে চলে গেল এক ঝলক সুশীতল বাতাস।

কুমারজীব বলল, মহারাজ, বন্ধু বিক্রমকেশরীর সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। আপনি জননীর সঙ্গে বাক্যালাপ করুন। আমি এখুনি ফিরে আসছি।

কুমারজীব চলে গেল বিক্রমের কাছে। বাকের সঙ্গে সেখানে তক্ষশীলা নিয়ে আলাপ করছিল বিক্রমকেশরী। সে আলাপে যোগ দিল কুমারজীব। তক্ষশীলার কত বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা দুবন্ধু শোনাতে লাগল বাক্‌কে। একসময় কুমারজীব বিক্রমকেশরীকে লক্ষ করে বলল, বিক্রম, একই বিশ্ববিদ্যালয়ে একই আচ্ছাদনের তলায় থেকে আমরা পাঠাভ্যাস করেছিলাম। পাঠশেষে তক্ষশীলার প্রধান আচার্যের কাছ থেকে স্ব স্ব বিভাগে শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কারও লাভ করেছিলাম। আমি পেয়েছিলাম গান্ধারের ধাতু নির্মিত বুদ্ধমূর্তি। তুমি পেয়েছিলে দশার্নের শিল্পীদের হাতে তৈরি তরবারি। সেদিন আমি তোমার কৃতিত্বে উল্লসিত হয়ে তোমাকে বন্ধত্বের নিদর্শন হিসেবে কিছু দেবার প্রস্তাব করেছিলাম। যত তুচ্ছই হোক, তা তুমি সানন্দে গ্রহণ করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে। আমি আজ তোমাকে সেই বস্তুটি দিতে চাই বিক্রম। সেটি অকিঞ্চিৎকর কি অমূল্য সে বিচারের ভার রইল তোমার ওপর।

বিক্রমকেশরী দক্ষিণবাহু প্রসারিত করে বলল, তোমার দান আমার কাছে চিরজীবন পরম গৌরবের হয়ে থাকবে কুমারজীব। সেখানে মূল্যের বিচারে কখনো দানের পরিমাপ করা যাবে না।

বাক্‌কে কাছে টেনে নিয়ে এসে কুমারজীব বলল, এ রত্ন তোমার অচেনা নয় বন্ধু। গুরু মাধবস্বামী তক্ষশীলা যাত্রার আগে আমাকে একান্তে বলেছিলেন, ফিরে এসে যদি আর আমাকে দেখতে না পাও তাহলে বাকের দায়িত্বভার তুমি গ্রহণ কর।

সেদিন বাকের অগ্রজ হিসেবে যে দায়িত্ব মাথা পেতে নিয়েছিলাম আজ সেই অধিকারে পরম স্নেহের ভগ্নীকে তোমার হাতে আমার প্রতিশ্রুত উপহার হিসেবে সমর্পণ করতে চাই।

বিক্রমকেশরী বাকের হাত ধরে বলল, এ উপহার অনন্য কুমারজীব। আমি সারাজীবন নিষ্ঠার সঙ্গে এর মর্যাদা রক্ষার চেষ্টা করব।

কুমারজীব, মহারাজ মেঘবাহন, জননী আর চম্পার কাছে সংবাদটি পরিবেশন করামাত্র উদ্যান-বাটিকায় একটি উল্লাসের হিল্লোল প্রবাহিত হল। বাক্ ও বিক্রমকেশরী কাছে এসে সকলকে যথাযোগ্য অভিবাদন জানালে কুমারজীব বলল, মহারাজ, বিক্রমকেশরী আপনার পুত্রস্থানীয় এবং গুণগ্রাহী। সে অস্ত্রবিদ্যায় শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন হিসেবে দশার্ণের তরবারি লাভ করেছে। আপনি আপনার রাজকার্যে এই শৌর্যশালী, বিবেচক তরুণ যুবকের পরামর্শ ও সক্রিয় সহযোগিতা গ্রহণ করলে লাভবান হবেন বলে মনে করি।

মহারাজ মেঘবাহন বললেন, দীর্ঘকাল যে দুটি পরিবার বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে মানসিক দিক থেকে, সেই দুই পরিবারের মিলনের দূত হয়ে এসেছে বিক্রমকেশরী। আমার রাজকার্যে এখন থেকে সে-ই হবে আমার ব্যক্তিগত প্রধান পরামর্শদাতা।

এবার কুমারজীব একটি নিভৃত তরুতলে নিয়ে গেল চম্পাকে।

আজ আমার আনন্দের শেষ নেই চম্পা।

নির্নিমেষ কুমারজীবের মুখের দিকে চেয়ে রইল ভিক্ষুণী।

একটু থেমে আবার বলল কুমারজীব, যে মহাবস্তুর স্পর্শ লাভ করে তুমি রাজ্য সম্পদ তুচ্ছ জ্ঞানে ভিক্ষুণী সাজলে সেই বস্তু তোমাকে দিব্য আনন্দ দান করুক।

চম্পা বলল, তুমি শুধু কামনা কর, ক্ষুদ্র সুখের গণ্ডী পার হয়ে আমরা যেন চিরস্থায়ী আনন্দের জগতে মিলিত হতে পারি।

সেটা শুধু তোমার আমার হৃদয়ের কথা নয় চম্পা, যিনি আজ আমাদের হৃদয়ের অধীশ্বররূপে বিরাজ

করছেন, তাঁরও এই অভিপ্রায়।

তোমার দেখা কি আর কোনোদিনও পাবনা কুমারজীব?

পাবে বইকি। ধ্যানের ভেতর দিয়ে যখনই ইচ্ছে হবে তখনই পরস্পর লাভ করব পরস্পরের সান্নিধ্য। সেখানে বিচ্ছেদ নেই চম্পা।

জননী জীবার সঙ্গে কুচীতে ফিরে চলেছে কুমারজীব। করুণাময় বুদ্ধের অসামান্য আলোকদূত চলেছে ভারতভূমি ছেড়ে বহির্ভারতের পথে। মহারাজ মেঘবাহন তঁর সাম্রাজ্যের শেষ সীমা পর্যন্ত নির্মাণ করে দিয়েছেন বিজয় তোরণ। বুদ্ধের ধর্মবিজয়ের স্মারকচিহ্ন এগুলি।

পথের দুদিকে জনপদবাসীরা দিচ্ছে জয়ধ্বনি। পুষ্প বৃষ্টি করে জননী ও পুত্রের পথকে কুসুমাস্তীর্ণ করে দিচ্ছে বিচ্ছেদ-আকুল জনতা।

একসময় তারা পার হয়ে গেল রাজ্যের সীমা। যে পথ দিয়ে এসেছিল একদিন সেই পথ ধরেই ফিরে চলল কুচী অভিমুখে। এখন পথ পরিচিত। অন্তরের অনির্বাণ আলোকে উদ্ভাসিত।

।। চার ।।

পথের ওপর হুঞ্জাদের সেই গ্রাম। বৌদ্ধ স্তূপ নির্মাণ করেছে হুঞ্জারা। জীবা আর কুমারজীবকে লাভ করে তাদের আনন্দের সীমা পরিসীমা নেই। বহুদিন পরে যেন তারা ফিরে পেয়েছে হারানো আপনজনকে। কিছুতেই ছেড়ে দেবে না তাদের। কুমারজীব দেখল, গ্রামটি যেন আনন্দ-নিকেতন। প্রতিদিন কিশোরী মেয়েরা নৃত্যের লীলায় তাদের আহ্বান করে নিয়ে যায় মন্দিরে। সেখানে গ্রামবাসীরা বসে থাকে বুভুক্ষুর মত বুদ্ধের অমৃত বাণী শোনার আশায়। কুমারজীব গল্পের ছলে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেয় জীবনের পরম সত্যের রূপ।

একটি বছর হুঞ্জাদের মধ্যে অতিবাহিত করে, পার্বত্য গ্রামগুলিতে প্রচারকার্য পরিচালনা করল কুমারজীব। সম্পূর্ণ হুঞ্জা অধ্যুষিত অঞ্চলটিকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করে মাতা পুত্র চলল শূলিদেশ লক্ষ করে।

দুর্গম পামীর অতিক্রমের পথে দেখা হয়ে গেল কিরঘিজদের সঙ্গে। তেমনি উষ্ণ অভ্যর্থনায় সংবর্ধিত হল তারা। এবার কুমারজীবের মুখে তারা শুনল বুদ্ধের জীবনী ও বাণী। যাযাবর কিরঘিজরা দলে দলে গ্রহণ করল বৌদ্ধধর্ম।

পামীর পার হয়ে শূলি, চোক্কুক, গোদানে চার বছরেরও অধিককাল ঘুরে ফিরল মাতা পুত্রে। সেখানকার রাজগৃহে, বিহারে তারা সম্মানিত হল রাজাধিরাজ ও রাজমাতার মত। প্রতিটি ধর্মালোচনা সভায় কুমারজীব বৌদ্ধশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়ে বিমুগ্ধ করল বৌদ্ধশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের। বিদ্যার্থী আর বণিকদের মুখে মুখে কুমারজীবের নাম ছড়িয়ে পড়ল দিগ্বিদিকে।

কুমারজীব জননীর সঙ্গে এবার যাত্রা করল কুচীর উদ্দেশ্যে। পথে পড়ল সেই ভগ্ন বুদ্ধমন্দির, যেখানে হুন দস্যুদের ভয়ে তারা আত্মগোপন করেছিল। মেষ চারকদের কাছে সংবাদ নিয়ে তারা জানতে পারল বৃদ্ধ পুরোহিত বহু পূর্বেই দেহ রক্ষা করেছেন।

আবার যাত্রা। পথে সঙ্গী হল নূতন নূতন বণিকের দল। নিজ নিজ পথে আবার চলে গেল তারা। যেখানে মানুষের সঙ্গ সেখানেই কুমারজীব প্রচার করে চলে প্রভুর অমৃত বাণী। কুমারজীবের দিব্যকান্তি দর্শনে আকৃষ্ট হয় পথচারী। তার কণ্ঠ নিঃসৃত উপদেশে সম্মোহিত হয়ে যায় শ্রোতার হৃদয়।

দূরে তিয়েনসান পর্বতের তুষার চূড়ায় তখন অস্ত সূর্যের শেষ রশ্মির সমারোহ। একটি পার্বত্য পথ ধরে নামছিল মাতা পুত্রে। অদূরে কুচীর বৌদ্ধ স্তূপের ওপর ধাতু নির্মিত চূড়াগুলি অস্তরাগে অলৌকিক মহিমা লাভ করছিল। সহসা সামনে পথ অবরোধ করে দাঁড়াল অস্ত্রধারী সৈনিক। থেমে গেল যাত্রা।

কোথায় চলেছ তোমরা?

কুমারজীব উত্তর করল, কুচীর বৌদ্ধ বিহারে।

কি নাম তোমার?

ভিক্ষু কুমারজীব।

কুচী অবরুদ্ধ, তোমরা ক্ষণকাল এখানে অবস্থান কর। চীন সম্রাটের অনুমতি এলে তবেই প্রবেশের অধিকার পাবে।

বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হলে এক অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কুমারজীব ও জীবার সম্মুখে এসে অভিবাদন জানিয়ে বললেন, সম্রাট আপনাদের কুচীতে প্রবেশের পূর্ণ অধিকার দিয়েছেন।

জননীর হাত ধরে কুমারজীব নেমে চলল কুচী নগরীর প্রবেশ পথের দিকে। দুজনের হৃদয়ই চিন্তা ভারাক্রান্ত। কুচী আক্রান্ত, অবরুদ্ধ। মহাচীনের বাহিনী নিয়ে চীন সম্রাট স্বয়ং উপস্থিত।

জীবা ভাবছে অগ্রজ রজতপুষ্পের কথা। কুচীর বিপত্নীক আর নিঃসন্তান মহারাজ, ভাগিনেয় কুমারজীব-অন্ত প্রাণ ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, তাঁর সিংহাসনে তাঁর অবর্তমানে উপবেশন করুক তাঁর প্রাণপ্রিয় ভাগিনেয়। কিন্তু জীবা তাঁর অগ্রজের আশা পূর্ণ হতে দেয়নি। সে তখন পেয়েছে অন্য আলোকের সন্ধান। সে শুনেছে সেই রাজপুত্রের কাহিনী যিনি সিংহাসন, সম্পদ, সহধর্মিনী, সন্তান সবকিছু ত্যাগ করে চলে এসেছিলেন বিরাট বিশ্বে মানুষের দুঃখমোচনের জন্য। সেই রাজ্যহীন রাজরাজেশ্বরের পথ ধরে চলুক তার একমাত্র সন্তান, এই ছিল জীবার অভিলাষ।

মহারাজ রজতপুষ্প কোনোদিনই কোনো কাজে বাধা দেননি ভগ্নী জীবাকে। কুমারায়ণের সঙ্গে ভগ্নীর বিবাহে তিনি দান করেছিলেন পূর্ণ সম্মতি। অনুষ্ঠিত হয়েছিল স্বয়ম্বর সভা। নিজের কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে সেদিন তক্ষশীলার তরুণ ছাত্র কুমারায়ণ তাকে লাভ করেছিল। স্বয়ম্বর সভায় আরও যাঁরা সেদিন উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে চীনের যুবরাজ আর অগ্নিদেশের রাজা আজও মুছে যায়নি তার স্মৃতি থেকে। সেই চীনের প্রতিহিংসাপরায়ণ যুবরাজ কি এতকাল পরে সম্রাটের সর্বশক্তি নিয়ে এল সেদিনের পরাভবের প্রতিশোধ নিতে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হবার সঙ্গে সঙ্গে মাতাপুত্রে এসে দাঁড়াল কুচীর তোরণ দ্বারে। নগরীর বিপণী, রাজপ্রাসাদ অন্ধকারে মগ্ন। সামান্যমাত্র আলোকরশ্মি দেখা গেল না কোনো ছিদ্রপথে। বৌদ্ধবিহার থেকে শোনা গেল না সান্ধ্য পূজার সুগম্ভীর ঘণ্টাধ্বনি।

উন্মুক্ত তোরণদ্বার পেরিয়ে তারা নগরীর পথ ধরে অগ্রসর হতে লাগল।

জীবা বলল, কুমারজীব, চল আমরা দক্ষিণের পথ ধরে বিহারের দিকে অগ্রসর হই।

প্রাসাদে গেলে আমরা মহারাজের মুখ থেকে সব খবর জানতে পারতাম মা।

আমরা বৌদ্ধ ভিক্ষু, ভিক্ষুণী বাবা। রাজগৃহ আমাদের আশ্রয়স্থল নয়। বিহারেই আমরা জানতে পারব রাজ্যের সর্বশেষ পরিস্থিতি।

কুচী বিহারের সর্বাধ্যক্ষ যখন সংবাদ পেলেন শ্রমণী জীবা পুত্র কুমারজীবকে নিয়ে ফিরে এসেছেন, এবং অপেক্ষা করছেন বিহারের দ্বারদেশে, তখন তিনি ভগবান বুদ্ধের আরতির দীপখানি তুলে নিয়ে দ্রুত পায়ে নেমে এলেন বিহারের বর্হিদ্বারে।

প্রদীপখানি মাতাপুত্রের মুখের সামনে তুলে ধরলেন বিহারের প্রধান ভিক্ষু।

জীবা বলল, চিনতে পারবেন কি বিনয়রত্ন?

ভিক্ষুণী রাজভগ্নী জীবাকে চিনতে পারবনা! কিন্তু এ তুমি কাকে সঙ্গে করে এনেছ জীবা! এই জ্যোতির্ময় যুবার পরিচয় কি ?

জীবা বলল, এই যুবক বুদ্ধের সেবক, আমার পুত্র কুমারজীব।

প্রদীপ ভূমিতে রেখে বিহারের বৃদ্ধ ধর্মাধ্যক্ষ দুবাহুর আলিঙ্গনে গভীরভাবে বন্দি করে ফেললেন কুমারজীবকে।

কতক্ষণ পরে আলিঙ্গন মুক্ত করে বললেন, এরই ভেতর তোমার নাম ছড়িয়ে পড়েছে সারা বৌদ্ধ

জগতে। বৌদ্ধশাস্ত্রে তুমি অর্জন করেছ অদ্বিতীয় পাণ্ডিত্য। তুমি যুবক হলেও আমার নমস্য।

প্রত্যভিবাদন জানিয়ে কুমারজীব বলল, অপরাধী করবেন না মহাত্মা, আমি প্রভু বুদ্ধের দীন সেবকমাত্র।

এরপর সেই রাত্রির অন্ধকারে স্বল্প দীপালোকে বিহারের শত শত ভিক্ষু কুমারজীবের দর্শনের জন্য প্রার্থনা গৃহে সমবেত হল। সেখানেই জীবা ও কুমারজীব জানতে পারল রাজ্যের ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা।

বৃদ্ধ হয়েছেন মহারাজ রজতপুষ্প। নেই কোনো উত্তরাধিকারী। পরম বৌদ্ধ তিনি, কিন্তু সাম্রাজ্য রক্ষায় যে শক্তির প্রয়োজন তা নেই তাঁর অধিকারে। তাই চীন সম্রাটের আক্রমণের সংবাদ পেয়ে প্রাসাদ ছেড়ে তিনি দুর্গে আশ্রয় নিয়েছেন। অধিকাংশ নাগরিক অনুগমন করেছে তাঁর। চীনের সৈন্যরা সম্রাটের নির্দেশে অবরোধ করেছে দুর্গ।

চীন চায় কুচীর মহারাজ বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করুন, না হলে ভয়াবহ ধ্বংসের মুখোমুখি হতে হবে কুচী রাজ্যকে।

মহারাজ রজতপুষ্প মাথা পেতে নেবেন না পরাজয়। তিনি পরাভবের চেয়ে মৃত্যুবরণ শ্রেয় বলে মনে করছেন।

পরদিন প্রভাতে একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটল। মহারাজ রজতপুষ্প গুপ্তপথে দুর্গ থেকে এলেন বিহারে। মহাধ্যক্ষ, দর্শন-গৃহে আহ্বান করে নিয়ে এলেন জীবা আর কুমারজীবকে। সুদীর্ঘ বিংশতিবর্ষ পরে অশ্রুর ভেতর দিয়ে মিলন ঘটল ভ্রাতাভগ্নীর।

কুমারজীবের দিকে নির্নিমেষ চেয়ে রইলেন মহারাজ রজতপুষ্প। দুচোখে অশ্রুর প্লাবন।

শেষে চক্ষু মার্জনা করে মঠাধ্যক্ষের দিকে একটি সন্ধিপত্র এগিয়ে দিয়ে বললেন, পড়ে দেখুন।

বিস্মিত মঠাধ্যক্ষ পত্র পাঠ করে চেয়ে রইলেন কুমারজীবের মুখের দিকে।

মহারাজ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, অসম্ভব শর্ত। রাজ্যের বিনিময়ে আমি আমার প্রাণের সম্পদ বিলিয়ে দিতে পারি না।

মঠাধ্যক্ষ সন্ধিপত্রখানি জীবার হাতে এগিয়ে দিলেন। জীবা পাঠ করে সেই পত্রখানি তুলে দিল কুমারজীবের হাতে।

কুমারজীব দেখল, সন্ধি পত্রটি চীন সম্রাটই প্রেরণ করেছেন। তাতে লেখা আছে :

কুচীর মহামান্য মহারাজ সমীপে নিবেদন এই, দুটি প্রস্তাব আপনার বিবেচনার জন্য প্রেরিত হল। প্রথম প্রস্তাব, যুদ্ধ ও কুচীর ধ্বংস। দ্বিতীয় প্রস্তাব, মহাজ্ঞানী কুমারজীবকে চীন গমনের অনুমতি দান। দ্বিতীয় প্রস্তাবটি গ্রহণযোগ্য হলে চীনের বাহিনী বিনা যুদ্ধে ফিরে যাবে মহাচীনে।

শেষে একটি ছত্র সংযোজিত হয়েছে : আমরা জানি কল্য সন্ধ্যাকালে তিনি কুচী নগরীতে প্রবেশ করেছেন।

পত্রপাঠ শেষ করে জননীর দিকে তাকিয়ে উল্লসিত হয়ে উঠল কুমারজীব।

বলল, আপনারা আমার জন্য অযথা চিন্তা করে ক্লিষ্ট হবেন না। এ চীনের সম্রাটের সন্ধিপত্রের ভেতর দিয়ে ভগবান তথাগতেরই নির্দেশ। মহাভারত থেকে যা আমি সংগ্রহ করে এনেছি, তাই চায় মহাচীন। যুদ্ধ নয়, শান্তিই মানব সমাজের পরম কাম্য। আমি মহাচীনে যাত্রার জন্য প্রস্তুত।

যাত্রার দিন দেখা গেল চীনের সম্রাট নিজের রথে পরম সমাদরে তুলে দিলেন বৌদ্ধ ভিক্ষু কুমারজীবকে। সেই রথ আকর্ষণ করে নিয়ে চলল সাতটি শ্বেতবর্ণের অশ্ব। সম্রাট স্বয়ং সেই রথের পশ্চাতে অশ্বারোহণে চললেন ধর্মচক্র বহন করে।

প্রদীপ্ত সূর্যের দেশে বিশ্বের রাজাধিরাজ যাত্রা করলেন মহাধর্মবিজয়ে।